
যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
ঈদ
সংখ্যা ২০২২

Keya Cosmetics Ltd.

Kleeno

DISH WASH

তেল-চর্বি তো যাবেই
সাথে জীবাণুও!



জীবাণুমুক্ত করে

সহজে ঝকঝকে পরিস্কার

গলে কম তাই অধিক সাশ্রয়ী

সেলফিন
আগামীর ব্যাংকিং

চলতে ফিরতে জানিতে
ব্যাংকিং করি মনের খুশিতে

- ইন্সট্যান্ট ভার্চুয়াল প্রিপেইড কার্ড (ভিসা/মাস্টারকার্ড)
- নিজে নিজে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা
- সরাসরি বৈদেশিক রেমিট্যান্স গ্রহণ
- ইউটিলিটি (ডেসকো, ডিপিডিসি, তিতাস ও ওয়াসা) বিল প্রদান
- ই-টিকেটিং (বাস, এয়ার ও লঞ্চ)
- রিকোয়েস্ট মানি, এটিএম ক্যাশ আউট
- ই-কমার্স/মার্চেন্ট পেমেন্ট
- স্কুল/কলেজ ফিস পেমেন্ট
- খিদমাহ্ (ক্রেডিট) কার্ডের বিল প্রদান
- যেকোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট/কার্ডে ফান্ড ট্রান্সফার
- যেকোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট/কার্ড, এমক্যাশ ও সিআরএম এর মাধ্যমে ইন্সট্যান্ট ক্যাশ ইন



এক অ্যাপেই
সকল ব্যাংকিং সমাধান

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

www.islamibankbd.com
contact center 16259 or 02-8331090



সঞ্চয়ে নারী হোক স্বাবলম্বী

শিখা
ডিপোজিট স্কিমস

নারীর অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে আকর্ষণীয় মুনাফা সম্বলিত সময়োপযোগী ও বিশেষায়িত ডিপোজিট স্কিম- **"শিখা ইচ্ছে", "শিখা অবিরত", "শিখা সঞ্চয়" ও "শিখা প্রজ্বলন"** নিয়ে লংকাবাংলা আছে নারীদের পাশে। এই স্কিমগুলোর আওতায় সকল বয়সী নারীরা তাদের সুবিধাজনক সময়কাল পর্যন্ত ফিক্সড ডিপোজিট অথবা মাসিক ডিপিএস এর মাধ্যমে অর্থ জমা করে মুনাফা গ্রহণ এবং বিশেষ প্রয়োজনে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। আর তাই নারীর অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার অংশীদার হতে ও তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে লংকাবাংলা নিয়ে এসেছে **"শিখা ডিপোজিট স্কিমস"**।

পাশে আছে, পাশেই থাকবো।

FinSmart
GET IT ON Google Play | Download on the App Store
Shikha' Chatbot
www.lankabangla.com
lankabanglafinance
ISO 27001:2013 Certified
PCI DSS Compliant
বিস্তারিত জানতে ১৬৩২৫

লংকাবাংলা™
ফাইন্যান্স

স্বপ্ন দেখার কি আছে?

ওয়ান ব্যাংকে আসুন

আর সহজেই স্বপ্নকে সত্যি করে নিন













ওয়ান ব্যাংক
লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়ঃ
এইচআরসি ভবন, ৪৬ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন: + ৮৮ ০২ ৫৫০১২৫০৫, ফ্যাক্স: + ৮৮ ০২ ৫৫০১২৫১৬
ক্লিক: www.onebank.com.bd কল সেন্টার: ১৬২৬৯

EXPERIENCE LUXURY WITH BANK ASIA CREDIT CARD



VALUE ADDED SERVICES

- Easy Buy Facility @ 0% interest
- Hospital Bill EMI Facility @ 5% Interest (Flat)
- Buy One Get One Free* (BOGO) Facility
- Any POS Purchase EMI Facility @ 9% interest (Flat)
- Complementary Airport Protocol Service Facility*
- Free Balaka Lounge Access Facility*
- Reward Point Redeem Benefits
- Triple Benefit Credit Shield Facility
- Discount Facilities on Renowned Merchant Outlets

WE OFFER

- Minimum Fees & Charges
- No CIB Charge
- Free SMS Service
- Free Supplementary Card

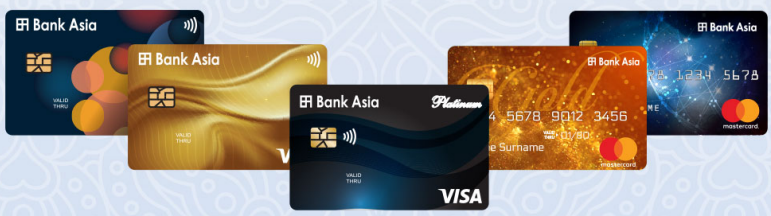

*T&C Apply

cards.bankasia-bd.com

24/7 SERVICE 16205

Bank Asia

Life is more rewarding with EBL Cards



To know about special Ramadan offers on EBL cards, please scan:

EBL 24X7 CONTACT CENTER 16230 or 09612316230

ebl.com.bd

myebl

Eastern Bank Ltd.
Simple Math®

16434
al-arafahbank.com

লা রিবা
মাস্টার কার্ড

সুবিধা বেশি, ঝামেলা কম

বাংলাদেশে এই প্রথম সুদমুক্ত ডুয়েল কারেন্সি
সমৃদ্ধ লা রিবা মাস্টার কার্ড





মুদারাবা
সঞ্চয়ী হিসাব

যিনি সঞ্চয়ী, তিনি জয়ী

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক-এর মুদারাবা
সঞ্চয়ী হিসাব আপনার বর্তমান ও আগামীকে
করবে মুনাফা সমৃদ্ধ ও নিরাপদ

মাসিক কিস্তি
ভিত্তিক মেয়াদী জমা

প্রতি মাসের জমায়, এককালীন বিশাল আয়

সহজ কিস্তিতে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা
বিনিয়োগ করুন, মেয়াদান্তে অনন্য মুনাফা
উপভোগ করুন



আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

aibl
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
Al-Arafah Islami Bank Limited
সর্বদাই শরীয়াহ্

www.al-arafahbank.com

বসুন্ধরা গ্রুপ

বসুন্ধরা আবাসিক

একদম রেডি প্লট, কিনলেই হাতে পাচ্ছেন দলিল। ২৪ ঘণ্টার নিরাপত্তার নিশ্চয়তাসহ বিদ্যুতায়ন মানসিক সুস্থির সম্পন্ন বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে এক অনন্য পরিমিত উদ্যানে ঝকঝকে মনের মতো করে নিজের বাড়ি/ফ্ল্যাট-এর স্বপ্নটি মাত্রিক ছোন আর এখনি শুরু করুন বাড়ির কাজ।

বসুন্ধরায় রেডি প্লট বুঝে নিন আজ কাল থেকে শুরু করুন বাড়ির কাজ

বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে বাড়ি বানাবেন কেন?

- উন্নত ৩০০ ফুট পুরাতন এয়ারপোর্ট রোডের
- পশ্চিমে ৯২০ ফুট মাদানী এভিনিউ
- ব্লক M ও N সংলগ্ন ২৩০ ফুট সড়ক
- ব্লক P সংলগ্ন ২০০ ফুট সড়ক
- L ব্লক-এর মাঝখানে ৯০০ ফুট সড়ক
- I (ext.)-4 অবস্থান ৩০০ ফুট সড়ক
- ব্লক H থেকে I এর মাঝ বরাবর ৮০ ফুট এর ২টি সড়ক
- ব্লক G থেকে E (এয়ারপোর্টের দিকে) এর সম্মুখে অবস্থান ১০০ ফুট সড়ক



বিস্তারিত জানতে:

০১৭৮০১৩৫৪১, ০১৭৮০১৩৫৪২, ০১৭৮০১৩৫৪৩, ০১৭৮০১৩৫৪৪, ০১৭৮০১৩৫৪৫, ০১৭৮০১৩৫৪৬, ০১৭৮০১৩৫৪৭, ০১৭৮০১৩৫৪৮, ০১৭৮০১৩৫৪৯

বসুন্ধরা আবাসিক

www.bashundhararesidential.com


বার্জার
রবিয়াল্যাক
No.1
PAINT SELLING BRAND
রঙাও জীবন
ইফেক্টস
BERGER
Trusted Worldwide

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও প্রকাশক
সাঈদ হোসেন চৌধুরী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
কাজী রুকুনউদ্দীন আহমেদ

সাহিত্য সম্পাদক
সালাম সালেহ উদদীন

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
মো. নুরুল হক

বিশেষ প্রতিনিধি
কাজী দ্বীন মোহাম্মদ

প্রচ্ছদ
মো. আবুল কালাম আজাদ হিরণ

গ্রাফিক্স
মো. আবু বকর সিদ্দিক বাবু

বিজ্ঞাপন
মো. ইব্রাহীম খলিল স্বপন
মো. মোস্তাফিজুর রহমান শামীম

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
মো. জাহাঙ্গীর আলম

বিপণন ব্যবস্থাপনা
মো. বিল্লাল হোসাইন
খন্দকার আবদুর রশিদ লিটন
আব্দুল আজিজ

মূল্য : ২০০ টাকা

যায়যায়দিন

ঈদ আনন্দ

বছর ঘুরে আবার এসেছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদকে বরণ করে নিতে চাচ্ছে সবাই অকৃপণভাবে। বাঙালি এমনিতেই উৎসবপ্রিয়। জীবনের নানা পর্বে উৎসবকে জুড়ে দিতে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশে আবহমানকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে ধারা বয়ে চলেছে বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে তার বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশেষ করে প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। ঈদুল ফিতর মুসলমানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব।

প্রতি বছরের মতো এবারও নানা রঙে রাঙিয়ে তোলা হচ্ছে ঈদ উৎসবকে। সবমিলিয়ে ঈদকে নান্দনিক উৎসবের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে বাঙালি। আর এখানেই উৎসবমুখর বাঙালির বিশেষত্ব।

ঈদ আনন্দকে পরিপূর্ণ ও নিবিড় করতে প্রতি বছরের মতো এবারও বর্ধিত কলেবরে, দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদে, বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় লেখায় এবং বিন্যাসে সমৃদ্ধ যায়যায়দিন ঈদ ম্যাগাজিন পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছে। দেশের খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় লেখক, বুদ্ধিজীবীদের লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে ঈদ সংখ্যাটি। এতে রয়েছে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, স্মৃতিকথা, ফ্যাশন, রূপচর্চা, রান্না-বান্না, চলচ্চিত্র ও খেলাধুলা। ঈদের আনন্দকে রাঙিয়ে তুলতে ও বাড়তি দ্যোতনা দিতে আমাদের এই বিশেষ আয়োজন।

এবারের ঈদ হোক গ্লানি ও হতাশা মোচনের। ঈদ হোক আনন্দময় ও উপভোগ্য। যায়যায়দিনের লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, হকার, শুভানুধ্যায়ী সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ শুভেচ্ছা।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও প্রকাশক : সাঈদ হোসেন চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : কাজী রুকুনউদ্দীন আহমেদ
প্রকাশক কর্তৃক এইচআরসি মিডিয়া ভবন, লাভ রোড, ৪৪৬/ই+এফ+জি তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে প্রকাশিত ও যায়যায়দিন প্রিন্টার্স লিমিটেড থেকে মুদ্রিত
পিএবিএক্স : ৮৮৭ ০২০৮-১২, ফ্যাক্স : ৮৮৭-০২০২, রিপোর্টিং : ৮৮৭-০২১৪, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭-০২২৩, ফ্যাক্স : ৮৮৭-০২০১
সার্কুলেশন : ৮৮৭-০২২৪, E-mail : country_jjd@yahoo.com, advertise_jjdin@yahoo.com, Website : www.jaijaidinbd.com


metro plus 110 cc
নতুন দিনের স্টাইল
TVS
ডুয়েল টোন
SPECIAL EDITION
মাইলেজ
৮৬
কি.মি./লি.
১১০ সিসি ইকোপ্রোস্ট ইঞ্জিন
মানবদেশের ট্যাঙ্ক
ফল-গিয়ার ইলেকট্রিক স্টার্ট
টিউবলেস টায়ার সাথে রোটো-স্পেটাল ডিস্ক ব্রেকের পাওয়া যায়
সার্ভিস রিমাইন্ডার সুবিধা সহ ফাস্টিফাইনেশন ডিজিটাল ডিসপ্লে
ডুয়েল টোন
কালো সাদা
সাদা কালো
কালো নীল
6 FREE SERVICE
TVS Auto Bangladesh
www.tvsabl.com | TVS Bangladesh | ০১৯৯৯৯৯৯৪২২২, ০১৯৯৯৯৮৯৯৯৯



সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী * মুক্তির প্রশ্নটা রয়েই গেছে –১১
ওয়াকিল আহমদ * রাজধানী ঢাকার গল্প –১৭
আবুল কাসেম ফজলুল হক * বাংলাদেশে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা –২২
মোনায়েম সরকার * মুজিবনগর সরকার –২৪
তারাপদ আচার্য্য * মুক্তিযুদ্ধে একজন রিকশাঅলা ও নৌকার মাঝি –২৮
হরিপদ দত্ত * ধনতান্ত্রিক রুশ সাম্রাজ্যের উত্থান –২৬
মাহবুবআলম * ইউক্রেন সংকট বদলে যাচ্ছে বিশ্বব্যবস্থা –২২৫
ড. মতিউর রহমান * সামাজিক পুঁজির সংকট ও করণীয় –৩০
সরকার মাসুদ * বয়স্ক পাঠকের সাহিত্য –৩৪
গুলশান আরা * শিকড়ের পরিচয় কখনো ভুলে না যাই –৩৩৫
মীর নাজিম উদ্দিন আহমেদ * বীমা শিক্ষা সচেতনতায় করণীয় –৭৪
জোবায়ের আলী জুয়েল * বাংলাদেশের ঈদ উৎসব –৩৬
মানজুরুল ইসলাম * সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা –১৮৩
ওমর খালেদ রুমি * স্বাধীন বাংলাদেশে ইতিহাস বিমুখ হয়ে নতুন প্রজন্মের বেড়ে ওঠা –৪১

গল্প

হাফিজ উদ্দীন আহমদ * ইন্সপেকশন –৯৪
রোকেয়া ইসলাম * তুমি রবে গরবে –২৩০
আহমদ মতিউর রহমান * শুভ বিবাহ –২২৭
রেজাউল করিম খোকন * অন্ধকার সময় –৮৫
আরিফ মঈনুদ্দীন * প্রতিদান –১৪০
স. ম. শামসুল আলম * খুঁতখুঁতে তুবার জীবন্ত পোস্টমর্টেম –১৮৬
নাহার ফরিদ খান * ঝরাপাতা –১৪৩
আশরাফ উদ্‌দীন আহমদ * সেদিনও উঠেছিল চাঁদ দিয়েছিল জ্যোৎস্না –৩৩৮
জহির আহমেদ * বুলু –৩২৩
সমীর আহমেদ * আমাদের গ্রামে ফুটেছিল অলকানন্দা ফুল –৩১২
শারমিন সুলতানা রীনা* গর্ভধারিণী –১৮৯
মিতা সালেহ উদদীন* কাক খায় কাকের মাংস –৩২৫
আসিফ উদ্দিন রেজভী* নিঃসঙ্গতার চোরা স্রোত –৩৩৩
শওকত নূর* কেতাবপুরের হাট –৩৪৬
ফারহানা সিনথিয়া * রূপকথা –৩১৯




ইউনিভার্সেল
কার্ডিয়াক হাসপাতাল
"হার্টের যত্নে
যেকোন মুহূর্তে
আমরা আছি
আপনার পাশে
করোনারি এনজিওগ্রাম
পেস মেকার প্রতিস্থাপন
করোনারি এনজিওপ্লাস্টি
প্রাইমারী পিসিআই
করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং
হাই রিস্ক ও রিডু বাইপাস সার্জারী
অলুভ প্রতিস্থাপন (AVR, MVR, DVR)
ট্রেডিশনাল অব ক্যালট (শিশুদের জন্মগত ত্রুটি)
কম্বাইন্ড প্রসিডিওর (CABG & Valve)
পাঁজরের হাড় না কেটে মাত্র ২ ইঞ্চি ফুটো দিয়ে হার্টের অপারেশন (MICS)
ইউনিভার্সেল কার্ডিয়াক হাসপাতাল
(সাবেক- আয়েশা মেমোরিয়াল কার্ডিয়াক হাসপাতাল)
নিউ এয়ারপোর্ট রোড (ফ্লাইওভার সংলগ্ন), মহাখালী, ঢাকা
যোগাযোগ : +৮৮ ০২ ৪৮১১১৪০১-০২, ৪৮১১৭৮০২
ই-মেইল : info@umchltd.com, amshltd@gmail.com
facebook.com/umchltd
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের এপয়েন্টমেন্ট: ০১৮৪১ ৪৮০০০০
হেল্পলাইন
১০৬৬৭
০১৬০৬ ১১১ ২২২



উপন্যাস

আতা সরকার * অবলা বোধন – ৬২
সারোয়ার কবীর * প্রতিনায়ক –১১০
আহমদ বশীর * অনুবর্তন – ১৫৮
মাসুদুজ্জামান * হে প্রেম হে অশ্রুশিখা –২০৬
সালাম সালেহ উদদীন * মহাকালের সৌরভ –২৫৪

কবিতাগুচ্ছ –৫২-৬০
মহাদেব সাহা, ফারুক মাহমুদ, হাসান হাফিজ, ফরিদ আহমদ দুলাল, সোহরাব পাশা, নাহার আহমেদ, ইদ্রিস সরকার, আনোয়ার কামাল, মামুন মুস্তাফা, রনি অধিকারী, খালেদ রাহী।

কবিতাগুচ্ছ –৯৮-১০২
বাবুল আনোয়ার, দুখু বাঙাল, রেজাউদ্দিন স্টালিন, বদরুল হায়দার, বিমল ভৌমিক, চঞ্চল শাহরিয়ার, বাবুল তালুকদার, দালান জাহান, মনসুর হেলাল, কামরুল হাসান।

কবিতাগুচ্ছ –১৪৬-১৫৪
রহমান মুজিব, সেলিম মাহমুদ, মেহেদী ইকবাল, শিউল মনজুর, এমরান হাসান, রকিবুল হাসান, জসীম উদ্দীন মুহম্মদ, জে এম আজাদ হোসেন।

কবিতাগুচ্ছ –২০২-২০৪
গোলাম কিবরিয়া পিনু, শাশ্বত হাসান, শাহরিয়ার সোহেল, শাকিলা নাছরিন পাপিয়া, রওশন রুবী, গোলাম সরোয়ার, মধুমিতা বিশ্বাস।

কবিতাগুচ্ছ –২৪৪-২৪৬
মুস্তফা হাবীব, সমর চক্রবর্তী, মাসুদ অর্ণব, রেবেকা ইসলাম, বজলুর রশীদ, মাহমুদুজ্জামান জামী, শাহিন শাজনীন, ফাহমিদা ইয়াসমিন।

অনুবাদ গল্প

বায়ালের আর্তনাদিগণ
মূল: গোলাম হোসাইন সায়েদি
ফারসি থেকে অনুবাদ: শাকির সবুর –৮৮
মাটির মেয়েটি
মূল: ইসাবেল আইয়েন্দে
ভাষান্তর- মিরন মহিউদ্দীন –৩৩০
এখনও একটি গুলি বন্দুকে আছে
মূল : ডিঙ লিঙ
অনুবাদ : শাহাজাদা বসুনিয়া –২৩৫

উপাখ্যান

জোবায়ের আলী * মমতাজের শেষ বাসনা ও আগ্রার তাজমহল –৩১৫

যুদ্ধ

আহমেদ নিলয় * পৃথিবীর ভয়াবহ যেসব যুদ্ধ –১৮০



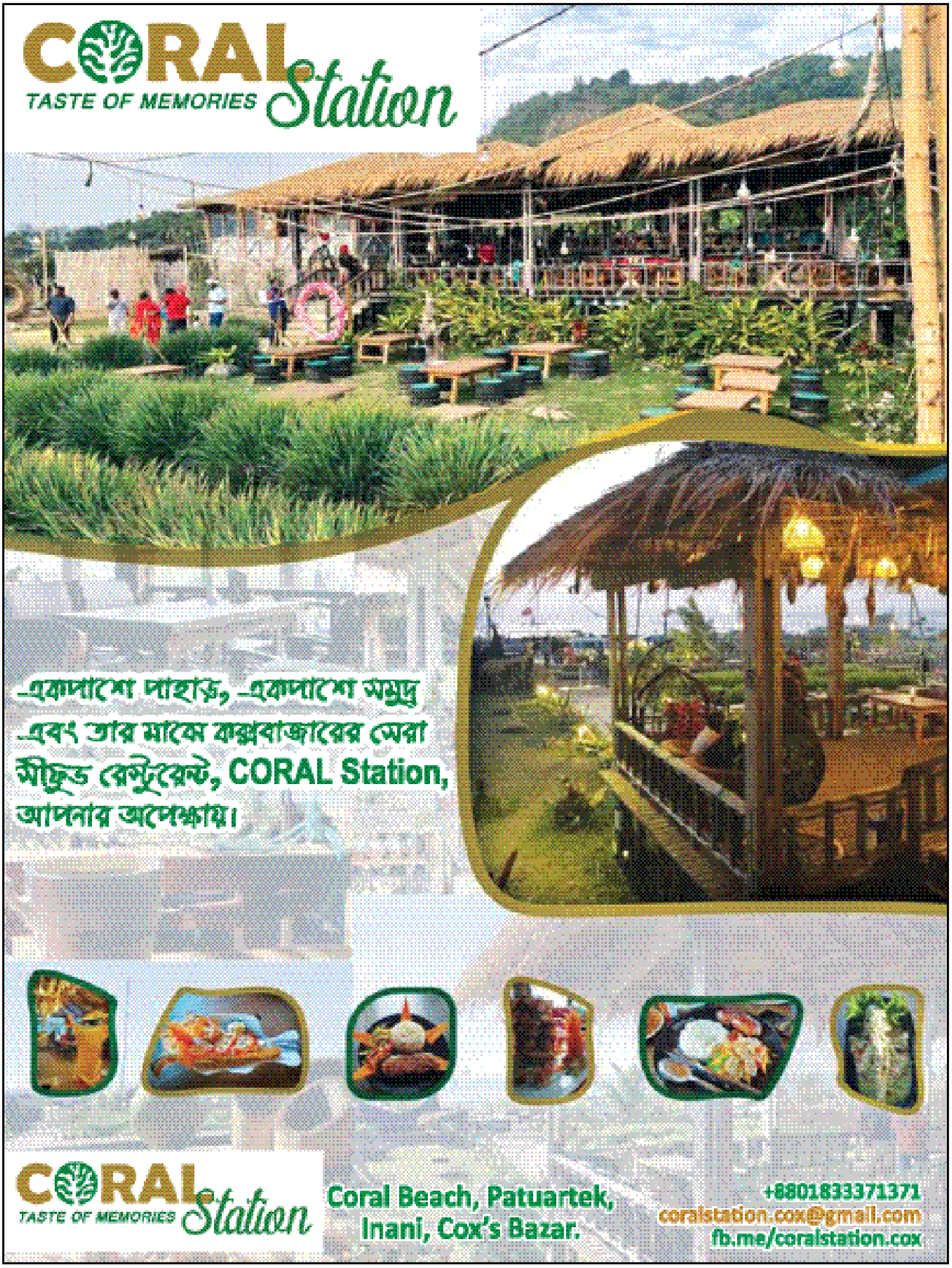
CORAL Station
TASTE OF MEMORIES
একপাশে পাহাড়, একপাশে সমুদ্র
এবং তার মাঝে কক্সবাজারের সেরা
সীফুড রেস্টুরেন্ট, CORAL Station,
আপনার অপেক্ষায়।
CORAL Station
TASTE OF MEMORIES
Coral Beach, Patuartek,
Inani, Cox's Bazar.
+8801833371371
coralstation.cox@gmail.com
fb.me/coralstation.cox



মুক্তিযুদ্ধ
মোহাম্মাদ নজাবত আলী * মুক্তিযুদ্ধের মূল কেন্দ্র ভূমি –৩৯

সংস্কৃতি
অবিনাশ পুরকায়স্থ * অভিনেতা জিয়া উদ্দিন শিপন –১৯১
স্নিগ্ধা পাল নূপুর * সব্যসাচী শিল্পী হাসান জাহাঙ্গীর –৩২৯
লেমন লিজা * মঞ্চের হ্যামলেট মাসউদ সুমন –২৫০

সংগীত
জ. রহমান * প্লেব্যাক সিঙ্গার রুলিয়া আজম –৩২১

স্মৃতিকথা
রণেশ মৈত্র * ষাটের অগ্নিঝরা দিন কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সাথে –১৯

ভ্রমণ
তপন কুমার দাশ * তেগাতাই আকাশ প্রাসাদ –২৩২
মোবাশ্বির হাসান শিপন : ভোলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর প্রাচীন স্থাপত্যের হাতছানি –১০৪

ব্যক্তিত্ব
ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ * দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতায় শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের ভূমিকা –৩২

চলচ্চিত্র
জাহিদ রহমান * সোনালী যুগের নূতন –২৮৫

নাটক
ড. মুকিদ চৌধুরী* কলকাতার গালিব –১৬৭
আসাদুল ইসলাম * গোলপোস্ট –৭৬
প্রশান্ত হালদার * পাশে কেউ ছিল –৪৫

মূকাভিনয়
অপূর্ব কুমার কুণ্ডু * মূকাভিনয় সংগ্রামী রিজোয়ান রাজন –২৮৩

অভিনয়
দিগন্ত প্রান্তর * সংস্কৃতিতে হাসনাহেনার সুবাস তাসনী চৌধুরী হানসা –২৩৯

নৃ-গোষ্ঠী
ড. হারুন রশীদ* গারো নৃ-গোষ্ঠীর কৃত্যমূলক প্রণয় উপাখ্যান –৪২

ঈদ ফ্যাশন
সাবিকুন্নাহার রীপা * ঈদ ফ্যাশনে বৈচিত্র্য –২৯০

রূপচর্চা
তাসমিন আহমেদ * ঈদে রূপচর্চা –৩০০

ঈদ রেসিপি
শরমিন আহমেদ * ঈদের রান্না –৩০৫

খেলা
জাহিদ রহমান * দুয়ারে কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল –১৯৪

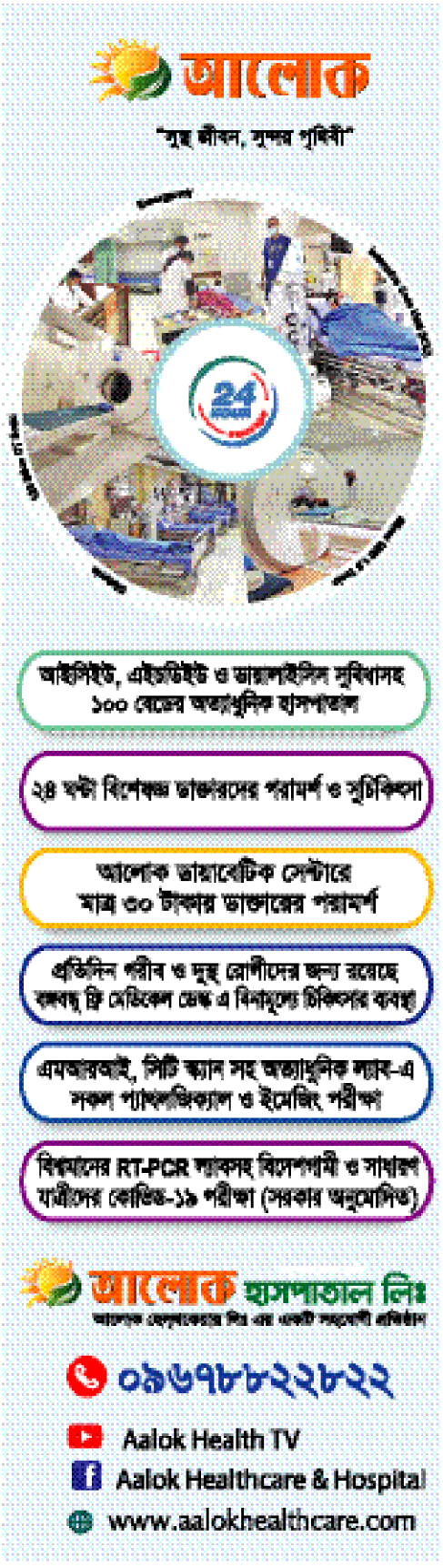


বিকাশ
পেমেন্ট হোক
বিকাশ-এ
২০% পর্যন্ত
ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক ও ডিসকাউন্ট*
BUY 1 GET 1 FREE
সেইভমন্টে
সব অফার জানতে
স্ক্যান করুন
16247



প্রবন্ধ

মুক্তির প্রশ্নটা রয়েই গেছে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

স্বাধীনতা কতটা এসেছে এবং কী পরিমাণে তাৎপর্য হয়েছে তা নির্ণয় করার অনেকগুলো নিরিখ আছে। প্রধান নিরিখ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। আরেকটি জরুরি নিরিখ হচ্ছে মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার। প্রশ্নটা প্রতি বছরেই নতুন করে ওঠে, এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বরং আগের চেয়ে বেশি করেই উঠেছে সেটা হলো এতসবসংগ্রাম ও অগ্রগতির পরেও জীবনের সর্বস্তরে ও পর্যায়ে বাংলা ভাষার প্রচলনটা কেন ঘটছে না। প্রশ্নটি এবারে আরও বেশি করে শোনা যাওয়ার কারণ হতে পারে দুটি। এক. স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর চলে যাচ্ছে, তবু বাংলা ভাষার প্রচলন নেই- উচ্চ আদালতে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ, উচ্চশিক্ষায় সে অব্যবহৃত, উচ্চ প্রশাসনে উপেক্ষিত, উচ্চ শ্রেণিতে অসম্মানিত। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে সংবাদপত্র ও আকাশমাধ্যমের সংখ্যা বেড়েছে, তাদের ভেতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা জনগ্রাহ্য প্রসঙ্গগুলোকে সামনে আনার ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষার প্রশ্নের চেয়ে অধিকতর জনগ্রাহ্য প্রসঙ্গ আর কীইবা হতে পারে?


ধর্মীয় আস্থায় ব্যাংকিং
বিশিষ্ট ইসলামিক ব্যক্তিত্বদের দ্বারা গঠিত স্বাধীন শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি (SSC) কর্তৃক পরিচালিত 'এমবিএল তাক্বওয়া' ইসলামিক ব্যাংকিং সারা দেশে ৪৫টি ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে।
তাক্বওয়া ইসলামিক ব্যাংকিং সেবাসমূহ
ডিপোজিট প্রোডাক্ট ও স্কিম
• আল-ওয়াদিয়াহ কারেন্ট একাউন্ট (AWCA)
• মুদারাবা সেভিংস একাউন্ট (MSA)
• তাক্বওয়া বোনাস সঞ্চয় হিসাব
• মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট একাউন্ট (MTDR)
• মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প
• মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ডিপোজিট একাউন্ট (MSND)
• মুদারাবা মাসিক মুনাফা আমানত প্রকল্প
• মুদারাবা দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প
• তাক্বওয়া সুপার মুনাফা আমানত প্রকল্প
• তাক্বওয়া মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় প্রকল্প
• তাক্বওয়া স্কুল ব্যাংকিং হিসাব
বিনিয়োগ সুবিধাসমূহ
• বাই-মুরাবাহা • বাই-মুয়াজ্জাল • বাই-সালাম
• বাই-ইসতিস্না • মুশারাকা
• হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (HPSM)
• এমবিএল তাক্বওয়া আবাসন (HPSM গৃহায়ন বিনিয়োগ)
• কর্জ (Qardh) • আমদানী-রপ্তানী বিনিয়োগ ইত্যাদি
অন্যান্য সেবাসমূহ
• তাক্বওয়া ডেবিট কার্ড • তাক্বওয়া ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড
• রেইনবো ডিজিটাল ব্যাংকিং
• দেশব্যাপী সকল শাখার সাথে অনলাইন ব্যাংকিং
• BEFTN ও RTGS
বাংলার ব্যাংক
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
দক্ষতাই আমাদের শক্তি
www.mblbd.com facebook.com/mercantile.bd



স্বাস্থ্য পরীক্ষা
ঘরে বসেই

ল্যাবএইড হোম কেয়ার
(রোগীর স্যাম্পল সংগ্রহ ও রিপোর্ট ডেলিভারি)

আপনার অথবা রোগীর সুবিধার্থে, ডায়াগনস্টিক/
প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার স্যাম্পল সংগ্রহ ও রিপোর্ট
ডেলিভারির জন্য ল্যাবএইডের এই হোম সার্ভিস সুবিধা।

যোগাযোগ 10606
017 6666 3333


MTB
CARDS
towards a cashless society
Celebrate
THE JOY OF EID-UL-FITR
WITH YOUR MTB CREDIT CARD
Enjoy 10X MRewardz Points at Leading Grocery Stores
Agora
Shwapno
KHULSHI MART
meena Bazar
THE BASKET
unimart
Scan for more details
Conditions Apply
CALL 16219
Offer valid till Eid day 2022
MTB
mutualtrustbank.com
Tweet2MTB
Mutual.Trust.Bank


www.sjiblbd.com
মুদারাবা
বাসিক আমানত
প্র ক ল্প
প্রতি মাসে স্বল্প সঞ্চয়
এক সাথে অনেক
টাকা দেবে নিশ্চয়
প্রতি মাসে ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার
যে-কোনো পরিমাণ টাকা জমা করে বিভিন্ন মেয়াদে
অর্জন করুন এককালীন বৃহৎ অংকের অর্থ (প্রাক্কালীন)
Shahjalal Islami Bank
L I M I T E D
Committed to Cordial Service
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক


ঈদ মোবারক
পটুয়াখালীবাসীকে জানাই
পবিত্র ঈদ উল ফিতরের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
■ নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।
■ নিয়মিত পানির বিল পরিশোধ করুন।
■ আপনার শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।
মহিউদ্দিন আহম্মেদ
মেয়র, পটুয়াখালী পৌরসভা, পটুয়াখালী



নিবন্ধ

রাজধানী ঢাকার গল্প

ওয়াকিল আহমদ

৪০০ বছর পার হওয়ার পর রাজধানী ঢাকা সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও আগ্রহ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা ঢাকাকে জানতে চায়। ঢাকাকে জানার কৌতূহল আমরাও পোষণ করি। 'বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি'র শহর ঢাকা প্রবাদতুল্য বচনটি দীর্ঘদিন থেকে শুনে আসছি। তবেএর উৎপত্তির ইতিহাস এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জানার সুযোগ হয়নি। এটি কি কেবল কথার কথা, না বাস্তবেএর কোনো অস্তিত্ব ছিল। অনেক সময় বহুত্ব অর্থে এ ধরনের সংখ্যার কথা বলা হয়। বায়ান্ন ও তেপ্পান্ন কি সে রকম বহুত্ববাচক, না প্রকৃত সংখ্যাবাচক? বায়ান্ন বাজারের ও তেপ্পান্ন গলির তালিকা আগে আমার চোখে পড়েনি। এজন্য বহুত্ববাচক জ্ঞান করেই এর অস্তিত্ব ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। 'যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন' বলে একটি প্রবাদ আছে, যার অর্থ প্রায় অভেদ বা ভেদশূন্য। 'বেপরোয়া ভাব' বোঝাতেও এর প্রয়োগ আছে। বস্তুত এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার; উভয়কে এক করে দেখা যায় না।

বচনটির উৎপত্তি যে 'পুরান ঢাকা'কে কেন্দ্র করে, তা অবধারিত সত্য। 'বাজার' ফারসি শব্দ, অর্থ নিয়মিত পণ্য বেচাকেনার স্থান। 'গলি' হিন্দি শব্দ, যার অর্থ সরু পথ বা রাস্তা। মোগল আমল থেকে ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠে। এখানে বুড়িগঙ্গা পূর্বে-পশ্চিমে বিস্তৃত। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, উত্তরে ফুলবাড়িয়া, পূর্বে পোস্তগোলা ও পশ্চিমে মিরপুর- এটাই ছিল পুরান ঢাকার পরিধি ও বিস্তৃতি। বায়ান্ন বাজার, তেপ্পান্ন গলির সন্ধান এ পরিধির মধ্যেই করতে হবে।

বায়ান্ন বাজার

আগে বাজারের কথাই ধরা যাক। প্রথমে আমরা একটা তালিকা প্রস্তুত করতে চাই; তালিকায় বাজার ও এর সমতুল্য হাট বা হাট্টা, গঞ্জ, গোলা, মণ্ডি ইত্যাদি শব্দও গ্রহণ করেছি। হাট বা হাট্টা সংস্কৃত 'হট্ট' শব্দজাত, যার অর্থ সপ্তাহে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট দিনে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান; ফারসি 'গনজ' থেকে বাংলা গঞ্জ গৃহীত, এর অর্থ ব্যবসাকেন্দ্র; গোলা শব্দের উৎপত্তি আরবি 'গিল্লাহ', এর এক অর্থ শস্যাদি সংরক্ষণের স্থান, অপর অর্থ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান স্থান; মণ্ডি ফারসি শব্দ, এর অর্থ যে স্থানে পাইকারি হারে বেচাকেনা হয়। ঢাকা শহরে যেসব স্থানের নামের সঙ্গে এসব শব্দ যুক্ত আছে, আমরা সেসব স্থানকেও তালিকায় গণ্য করেছি। এবার তালিকাটি পেশ করা যায়।

বিভিন্ন সূত্র থেকে নামগুলো গৃহীত হয়েছে।
১. দেওয়ান বাজার- দেওয়ান <দীওয়ান, ফারসি; অর্থ- রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মকর্তা)। দেওয়ানি বৃত্তি বা পদবিধারী কোনো ব্যক্তির নামানুসারে দেওয়ান বাজার নামকরণ হয়েছে। ২. উর্দুবাজার- উর্দু ফারসি শব্দ, অর্থ সেনা ছাউনি; সেনানিবাস সংলগ্ন বাজার অর্থে উর্দুবাজার নামকরণ হয়েছে। ৩. বকশিবাজার- বক্সি <বখ্শী, অর্থ- খাজনা আদায়কারী রাজকর্মচারী, বেতন বণ্টনকারী রাজকর্মচারী, সেনাধ্যক্ষ ইত্যাদি। ৪. বেগমবাজার- যেখানে সম্ভ্রান্ত মহিলারা বেচাকেনা করে। তুর্কি ভাষায় 'বেগম' স্ত্রীলিঙ্গ, 'বেগ' পুংলিঙ্গ; সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিম মহিলাকে বেগম বলে। ৫. কারওয়ান বাজার-কারওয়ান <কারওয়াঁ, ফারসি, অর্থ- অভিযাত্রী দল; তুলনীয় caravan, ইংরেজি। ৬. কাপ্তানবাজার- কাপ্তান <captain, ইংরেজি, অর্থ- জাহাজের নাবিক বা অধ্যক্ষ, সর্দার। ৭. বাংলাবাজার- বাংলাদেশের নামে এ বাজারের নামকরণ হয়। সম্ভবত এখানে দেশীয় ব্যবসায়ীদের আনাগোনা বেশি ছিল। ৮. চকবাজার- মোগল আমলে এটি প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র ছিল, বৃত্তাকার এ বাজারের চারপাশ ঘিরে রাস্তা ছিল। চক (<চতুষ্ক, সং) অর্থ- বৃত্তাকার ভূমি বা ময়দান। ৯. তাঁতিবাজার- তাঁতি (<তন্ত্র + ই, সং)- বস্ত্রবয়নকারী। ১০. শাঁখারীবাজার-শাঁখারি (<শঙ্খ + আরি, সং) অর্থ- শঙ্খবণিক, শঙ্খ ব্যবসায়ী। ১১. লক্ষ্মীবাজার। লক্ষ্মী সম্পদের দেবী; সম্পদের প্রাচুর্য থেকে এরূপ নামকরণ হয়ে থাকতে পারে।
১২. চুরিহাট্টা- যে হাটে চুরি (<চুড়ি) বিক্রয় হয়। ১৩. মুরগিহাট্ট- যে হাটে মুরগি (<মুর্গ, ফারসি + ই) বিক্রয় হয়। ১৪. পাথরহাট্টা- যে হাটে পাথর বিক্রয় হয়। ১৫. রুইহাট্টা- যে হাটে রুই মাছ বিক্রয় হয়। ১৬. কাঁসরহাট্টা- যে হাটে কাঁসা-নির্মিত তৈজসপত্র বিক্রয় হয়। ১৭. টাকার হাট- যে হাটে টাকার লেনদেন হয়। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীর সঙ্গে অর্থ লেনদেনে 'বাট্টা প্রথা' চালু ছিল।
১৮. নুনগোলা। ১৯. আমলীগোলা- প্রকৃত নাম আমীরগোলা; লোকমুখে আমীর 'আমলী' হয়েছে। ২০. পোস্তগোলা। ২১. আলুপট্টি/আলুবাজার। ২২. বাঁশপট্টি। ২৩. ডালপট্টি- যে বাজারে ডাল বিক্রয় হয়। ২৪. ধানমণ্ডি- যেখানে পাইকারি দরে ধান বেচাকেনা হয়। ২৫. মৈশুণ্ডি (<মহিষ + মণ্ডি)- যেখানে গরু-মহিষ বেচাকেনা হয়। ২৬. নবাবগঞ্জ- নবাবের আবাস সংলগ্ন বাজার। ২৭. ফরাশগঞ্জ- যে বাজারে ফরাশ বা কার্পেট বিক্রয় হয়। ফরাস আরবি শব্দ, অর্থ কার্পেট। ২৮. রহমতগঞ্জ- রহমত ঢাকার অস্থায়ী সুবেদার ছিলেন; তার নামে এরূপ নামকরণ হয়েছে। ২৯. দয়াগঞ্জ। ৩০. ইমামগঞ্জ। ৩১. বেগমগঞ্জ। ৩২. এনায়েতগঞ্জ- এনায়েত খাঁ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন; তার নামে এরূপ নামকরণ হয়েছে। ৩৩. কোম্পানীগঞ্জ- কোম্পানি আমলের ব্যবসা কেন্দ্র। ৩৪. গার্ডবাজার- গার্ড ইংরেজি শব্দ, অর্থ পাহারাদার। কোম্পানি আমলে বাজারটি চালু হয়। ৩৫. ঠাটারি বাজার- ঠাটারি অর্থ- বাজিকর। ৩৬. পাদশাহী বাজার- চকবাজারের পূর্ব নাম পাদশাহী বাজার; এখানে রাজপরিবারের সদস্যরা কেনাকাটা করতেন। ৩৭. মুনওয়ার খাঁ বাজার- মুনওয়ার খাঁ ঈশা খাঁর দৌহিত্র ছিলেন; তার নামানুসারে ওই নাম হয়েছে। ৩৮. আল্লুর বাজার- আল্লাইয়ার খাঁ মোগল সেনাপতি ছিলেন; তার নামানুসারে 'আল্লাইয়ার খাঁ বাজার' লোকমুখে 'আল্লুর বাজার' হয়েছে। ৩৯. সিদ্দিক বাজার- সিদ্দিক বংশীয় কোনো ধার্মিক ব্যক্তির নামানুসারে সিদ্দিক বাজার হয়েছে। ৪০. নাজিরা বাজার- নাজির আদালতের কর্মচারী, তিনি পেয়াদাদের তত্ত্বাবধান করতেন; এরূপ কোনো নাজিরের নামে নাজিরা বাজার নামকরণ হয়েছে।
৪১. চৌধুরী বাজার- মূল্য নিয়ন্ত্রক কর্মচারীর উপাধি ছিল চৌধুরী; কোনো শহর- চৌধুরীর নামে এরূপ

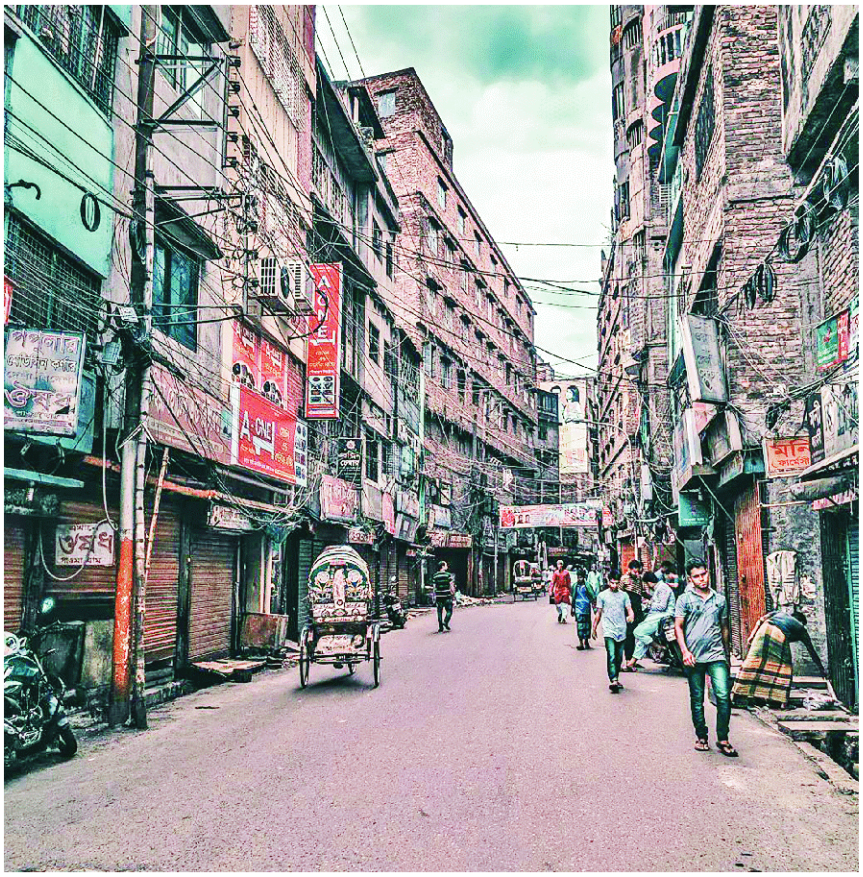

নামকরণ হয়েছে। ৪২. মগবাজার- মগ অধ্যুষিত অঞ্চলের বাজার। এরা আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। ৪৩. দলতি বাজার। ৪৪. চুহারা বাজার। ৪৫. রায়েরবাজার। ৪৬. কলতাবাজার। ৪৭. আমীনবাজার। ৪৮. বাবুবাজার। ৪৯. শেওড়াবাজার। ৫০. মিরণজল্লা বাজার- মীর জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিরণের নামে এরূপ নামকরণ হয়েছে। 'ঝিল' থেকে জল্লা শব্দের উৎপত্তি; মিরণ এটি কেটে প্রসারিত করেন। 'মিরণ কি জল্লা' নামে পরিচিত এই ঝিলে কাঠখড়ির নৌকা এসে ভিড়ত। এ সূত্রে সেখানে একটি বাজারও গড়ে ওঠে। ৫১. শ্যামবাজার-দেবতার নামে শ্যামবাজার নামকরণ হয়েছে। কলকাতাতেও শ্যামবাজার আছে। ৫২. শেখ সাহেব বাজার- মূলে এটি শিখ সম্প্রদায়ের বাজার ছিল। 'শিখ' লোকমুখে 'শেখ' হয়েছে।

তিপ্পান্ন গলি

প্রাচীন গলির নাম পাওয়া যায় না। মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ড খুঁজলে হয়তো অনেক নাম বেরিয়ে আসবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে তথ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন। ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ঢাকায় বিভিন্ন চাকরিজীবী, পেশা ও বৃত্তিজীবী মানুষ বসবাস করত। 'টোলা/টুলি'-অন্তক স্থানগুলো স্পষ্টত লোকবসতিকে সূচিত করে, যেমন মোগলটুলি, কায়েতটুলি, টিকাটুলি, পাটুয়াটুলি, আর্মানিটোলা, কলুটোলা, কুর্মিটোলা, নয়াটোলা, মালাকারটোলা, সাঙ্গতটোলা ইত্যাদি। পাড়া, পুর/পুরি, দেউড়ি, বাগ, তলা/তলি-অন্তক স্থানগুলোও লোকবসতিসূচক। যেখানে লোকবসতি আছে, সেখানে চলাচলের জন্য গলি বা রাস্তাও আছে। প্রাচীন শহরগুলোর রাস্তা হতো ছোট ও সরু। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হতো বলে লোকে অলিগলি পছন্দ করত; যানবাহনের জন্য প্রশস্ত রাস্তার আবশ্যক হতো। গলি শব্দান্তক কিছু নাম জানা যায়, যেমন গান্ধী গলি, নাসওয়ালা গলি, বাগডাসা গলি ইত্যাদি। বাগডাসা গলি গ্রিক ব্যবসায়ীদের মহল্লার সঙ্গে জড়িত ছিল। গলির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'লেন'; পাতলা খান লেন, আগা সাদেক লেন, আগা মসি লেন, জিন্দাবাহার লেন, শাঁখারি বাজার লেন ইত্যাদি পূর্বে গলি ছিল; ইংরেজ শাসনামলে গলি লেন হয়েছে। 'কুচা' শব্দের অর্থ গলি, পাতলা খান লেনের পূর্ব নাম ছিল 'কুচা পাতলা খান'। 'লালচান্দ মোকিম কুচা' এরূপ একটি গলি ছিল।

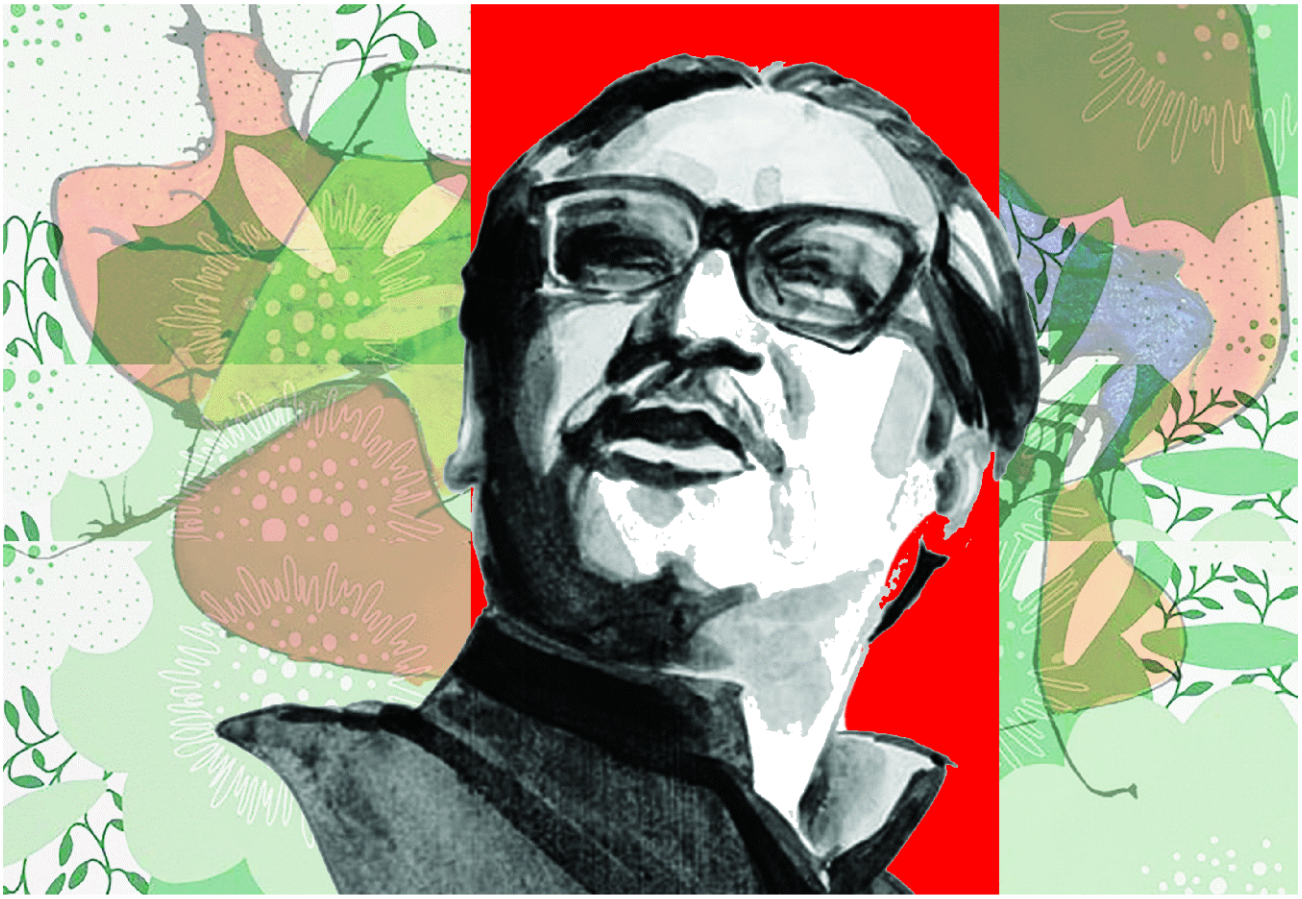

স্মৃতি কথা

ষাটের অগ্নিঝরা দিন কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সাথে

রণেশ মৈত্র

ষাটের দশক। কঠিন সামরিক শাসননের জাঁতাকলে পূর্ববাংলা নিষ্পিষ্ট। স্বৈরাচারী সামরিক শাসক, তৎকালে 'লৌহমানব' বলে পরিচিত পাকিস্তানি জেনারেল ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবখানের অত্যাচারে জর্জরিত সমগ্র পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্ববাংলা। আর তার প্রতিবাদে, সামরিক শাসনের আশু অবসানের দাবিতে ছাত্র যুবসমাজ, গণতন্ত্রকামী সবরাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা দেশের রাজপথগুলোকে দৃপ্ত পদভারে প্রকম্পিত করে চলেছেন। সামরিক শাসনের কঠোরতা তার থোড়াই পরোয়া করে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে তুলছেন। সরকার তার প্রতিশোধ নিচ্ছে হাজার হাজার নেতাকর্মীকে বিনাবিচারে আটক করে কারারুদ্ধ করার মাধ্যমে। ওই কর্মসূচি যেমন পাকিস্তান সরকার তেমনই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি গ্রুপ) ছাড়া অন্যসব দলকেও আতঙ্কিত করে তোলে। তারা সরাসরি শেখ মুজিবকে পুনর্বার 'পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমন' আখ্যায়িত করেন। শেখ মুজিবচলে আসেন পূর্ববাংলায়, ঢাকা নগরীতে। দিন কয়েকের মধ্যে তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদসহ প্রথম সারির কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার হলেন। শেখ মুজিব(তখনও তিনি 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবেভূষিত হননি) ছাড়া অন্য নেতাকে প্রদেশের অপরাপর কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলি করে দেওয়া হয়। মুজিবভাই থেকে যান একা এক বিশাল ওয়ার্ডে। আমি ওই দফায় গ্রেপ্তার হই ঠিক যেদিন পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, দুপুরবেলায়। খেতে বসেছিলাম দেড় বছর কারারুদ্ধ থাকার পর। আগের দিন মুক্তি পেয়ে বাসায় আসি। পরদিনই আবার সরকারি আতিথ্য নিতে হলো, স্ত্রী-সন্তানদের রেখে। এবার গ্রেপ্তার জন্মদোষে।

অর্থাৎ হিন্দু ঘরে জন্ম নিয়েছিলাম তাই। পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে জরুরি অবস্থা দিয়ে 'শত্রু সম্পত্তি আইন' জারি করে। পাশাপাশি নেতৃস্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানদের গ্রেপ্তার শুরু করে। অবশ্য ৮/৯ মাস পর অন্য হিন্দু নেতাদের মুক্তি দেওয়া হলো। আর আমরা যারা ন্যাপ-সিপিবিকরতাম তাদের রেখে দেওয়া হলো। খুশি হয়েছিলাম, বাঁচা গেল, কারণ রাজনৈতিক পরিচয়টা পুনরুদ্ধার হলো। কিন্তু মুক্তি কবে পাওয়া যাবে তা অনুমান করা যাচ্ছিল না। এমন সময় আমার স্ত্রী পূরবী মৈত্র এলেন আমাদের ইন্টারভিউ নিতে। উৎসাহিত করলেন আমাকে 'ল' পরীক্ষা দিতে। রাজি হলাম, বললাম নতুন পাস করা আইনজীবীদের জাজ থেকে সিলেবাস জেনে নিয়ে কিছু বইপত্র পাঠাতে। তিনি পাবনায় ফিরে সাধ্যমতো বই সংগ্রহ করে পাঠালেন। আমাকে অনেক আগেই আরও কয়েকজন বন্দিসহ পাবনা জেলা কারাগার থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে গিয়েই পূরবী ইন্টারভিউ নেন। যা হোক, পরীক্ষা দিতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে, তিনি নিয়মিত কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তা জানিয়ে ওই মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করতে হয়। ওই অনুমতি পাওয়ার পর উচ্চতম কারাকর্তৃপক্ষের (ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস) কাছে দরখাস্ত করে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে আবেদন জানাতে হয়। এ সবফর্মালিটি শেষ হতে হতে কয়েক মাস লেগে গেল। সেই ফাঁকে পড়াশোনাও চলল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা জানানো হলো কর্তৃপক্ষকে। পরে আমাকে জানানো হলো, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের কারাগারগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং সেখানে আমাকে বদলি করা হলো। তখন তো যমুনা সেতু নির্মিত হয়নি। তাই ট্রেনে সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথগঞ্জ ফেরিতে যমুনা পার হতে হতো। সরাসরি ট্রেনে রাজশাহী থেকে ঢাকার ইন্টার-ক্লাস টিকিটের যাত্রী। সাথী তিন বন্দুকধারী পুলিশ যার মধ্যে একজন সম্ভবত জমাদার-জাতীয় ছিলেন। পুলিশ দেখে ট্রেনের যাত্রীরা কেউ ভাবত চোর-ডাকাত, কেউ বা চোরাকারবারী প্রভৃতি। পরে কম্পার্টমেন্টের সবার ভুল ভাঙলো যখন আমি একগাদা সংবাদপত্র কিনলাম এবং তাদের দু'একজনের সঙ্গে কথা বললাম। রাজবন্দি জানার পর কী যে সম্মান যাত্রীরা দিলেন তা স্মরণীয়। তবে সেই আমলের মতো রাজবন্দিদের সম্মান আজ নাকি বিন্দুমাত্র অবিশিষ্ট নেই। কারণ রাজনীতি এখন হয়ে পড়েছে সন্ত্রাসনির্ভর ও দুর্নীতিপরায়ণ আমাদের রাজনীতি। যখন থেকে রাজনীতি-আদর্শ তিরোহিত হতে থাকে তখন থেকে রাজবন্দিদের সম্মান-মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। যাহোক, আমার সঙ্গে সঙ্গে এসকর্ট করা পুলিশরা পর্যন্ত চা-নাশতা-মিষ্টি পেয়ে গেলেন যাত্রীদের কাছ থেকে। আরও পেলাম দামি সিগারেটের কার্টুন (তখন ধূমপানের অভ্যাস ছিল রীতিমতো)। ঢাকা পৌঁছালাম পরদিন সকাল ৮টার দিকে। জেলখানায় যেতে আরও ঘণ্টাখানেক। তখন ফুলবাড়ি স্টেশন ছিল ঢাকার স্টেশন। জেলখানায় গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই ডেপুটি জেলর, যিনি রাজবন্দিদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, এলেন। দেখি তিনি পূর্বপরিচিত। চমৎকার ব্যবহার। কাগজপত্র সবজমা নিয়ে এসকর্ট পার্টিকে বিদায় দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে আমি কোন ওয়ার্ডে থাকতে চাই তা জানতে চাইলেন। জানালাম. এবার পরীক্ষা দিতে এসেছি। তাই পরীক্ষা পর্যন্ত জেনারেল ওয়ার্ডে যাবনা। আমাকে নিরিবিলি পড়াশোনা করতে হবে, তাই কোন সেলে দিলে ভালো হয়। অতঃপর ঘণ্টাখানেক আরও অপেক্ষা করার পর ডেপুটি জেলর নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন old 20 cells-এ; সেখানে গেটমুখী একটি সেল আমার জন্য বরাদ্দ। ইতোমধ্যেই তা ধুয়ে-মুছে একটি লোহার খাট, চেয়ার টেবিল, খাবার জল, গেলাস দেওয়া হয়েছে। বেলা অনুমান সড়ে এগারটা। কিছু কথাবার্তা বলে যাওয়ার সময় ডেপুটি জেলর বললেন, 'আপনার এ সেলগুলোতে প্রবেশের প্রধান দরজা সর্বদা বন্ধ থাকবে। ভেতরে হাঁটাচলা করবেন'। বললাম, 'এটা তো শাস্তি'। হেসে ডেপুটি জেলর 'উপায় নেই' বলেই চলে গেলেন, ওই দরজাটাও তালাবদ্ধ হয়ে গেল। স্নান সেরে বিছানা পেতে শুয়ে বিশ্রাম নিলাম। বেলা একটার দিকে দুপুরের খাবার এলো। খেয়ে লম্বা ঘুম। রাতে ট্রেনে-স্টিমারে তো ঘুমাতে পারিনি তেমন একটা। বিকেল পাঁচটার দিকে এক সিপাই এসে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে বলল, বাইরে এসে দেখুন আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন। তাড়াতাড়ি উঠে হাত-মুখ ধুয়ে মেইন দরজা খোলা পেয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি মুজিবভাই দাঁড়িয়ে তার বিশাল বপু নিয়ে। হাতে সেই চিরচেনা চুরুটের কালো পাইপ। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ন্যাপ নেতাকেও গ্রেপ্তার করল? ন্যাপ তো আইয়ুবের পক্ষে।' আমিও হেসে বললাম, 'সে জন্যই তো আপনারও এক বছর আগে আমাকে ধরে এনেছে।' মুজিবভাই বললেন, 'আরও কাউকে ধরেছে নাকি? বললাম অনেককে। সংখ্যায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর তিনগুণ হবে। খোঁজ নিয়ে দেখুন। তিনি বললেন, 'বেশ চলুন এখন হাঁটা যাক'। মুজিবভাই-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ১৯৫৩ সালে, পাবনায় আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত বগা ভাইয়ের বাড়িতে। আমি তখন ছাত্র ইউনিয়ন করি। ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়েছিলাম তার কাছে, ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য সবদলের (কমিউনিস্ট পার্টিসহ) একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি ও মওলানা ভাসানী উদ্যোগী ভূমিকা নেন। তিনি বলেছিলেন, মওলানা সাহেবও তিনি এ ব্যাপারে একমত। তবে শহীদ সাহেব(হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী) ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে রাজি করানোর চেষ্টা চলছে। সেটা সফল হলে যুক্তফ্রন্ট হয়ে যাবে। আমরা বলেছিলাম, সফল তো হতেই হবে, নইলে আমরা ছাত্রসমাজ ছাড়বনা। এভাবেএরপর যতবারই তিনি পাবনা এসেছেন ততবারই সাক্ষাৎ হয়েছে, অন্তরঙ্গভাবেআলাপ-আলোচনাও হয়েছে। পাবনায় তখন ছাত্র ইউনিয়ন ছিল প্রধান ছাত্র সংগঠন-ছাত্রলীগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। ফলে তা বুঝতে পেরে সেভাবেতিনি গুরুত্ব দিতেন। মওলানা ভাসানীর তো কথাই নেই। তিনি তো ছাত্রলীগের চেয়ে ছাত্র ইউনিয়নকেই তার আপন বলে মনে করতেন, মূলত ছাত্র ইউনিয়নের অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সমাজতন্ত্রকামী নীতির জন্য। ১৯৬২ সালে বা তার কিছু পরে যখন এনডিএফ গঠিত হয় তখন মুজিব ভাই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাবনা আসেন জনসভা করতে। সেই জনসভার শুরুতে উপস্থিত বিশাল জনতাকে সামাল দিতে মাইক আমার হাতে দেওয়া হয়। আমরা মুহুর্মুহু স্লোগান তুলি 'মওলানা ভাসানীর মুক্তি' 'এক ইউনিট', সিয়াটো-সিন্টে চুক্তি বাতিল' প্রভৃতি দাবিতে। নেতারা ছিলেন সার্কিট হাউসে, আর জনসভা ওই ভবনের সামনে পাবনা স্টেডিয়ামে। নেতারা মঞ্চে এলে তাদের স্বাগত জানাই; আমরা দিচ্ছি জিন্দাবাদ প্রভৃতি স্লোগান; কণ্ঠে আরও ছিল মওলানা ভাসানীর মুক্তি, সম্রাজ্যবাদ ও এক ইউনিট বিরোধিতা। স্লোগানগুলো শুনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মনে মনে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। সে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটালেন সভা শেষ হলে সার্কিট হাউসে ফিরে গিয়ে। সেখানে তিনি মুজিবভাইকে ডেকে বললেন, ওই স্লোগানগুলো কেন এত দেওয়া হলো? মুজিবভাই বাইরে এসে বারান্দায় আমার কাছে কৌশল করে বিষয়টি জানতে চাচ্ছিলেন। বললাম, স্লোগানগুলোর প্রতিটি পাবনা এনডিএফ কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত। আপনি প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন মনসুর সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি তাই করলেন। মনসুর সাহেবস্বীকার করলেন। তা শহীদ সাহেবকে জানালে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'What is their members?' আমি তখন তার রুমের কাছাকাছি। তাই নিজেই জবাবদিলাম, 'not less than Awami Leage' ...তিনি এ জবাব শুনে ফুঁসতে থাকলেন। যাহোক, অতঃপর পাবনা থেকে পরদিন তাদের সঙ্গেই আমি উত্তরবঙ্গ যাব'সংবাদ'-এর পক্ষ থেকে তাদের ট্যুর কভার করার জন্য। সারাপথ ট্রেনে। নানা জায়গায় এডিএফ নেতাদের এ সফর উত্তরবঙ্গের মানুষ ও বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের মনে সামরিক শাসনবিরোধী জোয়ারে সঞ্চার করেছিল। আর সংবাদে আমার রিপোর্টটি দেখে মুজিবভাই তো বেজায় খুশি। তিনি যাত্রাপথ সাংবাদিকদের খোঁজখবর নিতে তাদের কামরায় ছুটে আসতেন, কোনো সমস্যা আছে কিনা জানতে চাইতেন। হাতে করে আনতেন সংবাদ ও ইত্তেফাক। ইত্তেফাকের বিশেষ সংবাদদাতার সামনেই বলতেন, 'সংবাদের রিপোর্টিংই হচ্ছে বেস্ট'। যাহোক, এবার জেলখানার প্রসঙ্গে চলে আসি। প্রায় আধা ঘণ্টা হাঁটতে হাঁটতে শেষে আমার লকআউটের সময় এসে যাওয়ায় দুজন মিলে হাঁটা বন্ধ করতে হলো। মুজিবভাই চলে গেলেন তার দেওয়ানি ওয়ার্ডে (বলা হতো দেওয়ানি ফটক)। গিয়ে তিনি দুখানি খবরের কাগজ পাঠিয়ে দিলেন। ওই পড়তে পড়তে আহারাদি শেষ করে সেদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে এক পেয়ালা চা মুখে দিতেই দরজার ওপাশে মুজিবভাই এসে হাজির। বেরিয়ে পড়লাম হাঁটতে। মুজিবভাই দেশের কোনো খবর জানা আছে কিনা, ঢাকায় আমার পক্ষে লোকজন কী বলল জানতে চাইলেন। আমি জানালাম, ক্রমেই মানুষ আইয়ুব সরকারের বিরোধী হয়ে উঠছে এবং ছয় দফার সমর্থনে এসে শামিল হচ্ছে। শিগগিরই একটা বড় রকমের বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে বলে মনে হলো, যদি আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ যৌথভাবেআহ্বান জানায়। তিনি বললেন, যৌথভাবেআহ্বান করা সম্ভবহবেকিনা জানি না, তবে আওয়ামী লীগ যেন আহ্বান জানায় সে চিন্তায় আছি। যে ভয়ঙ্কর অত্যাচারী শাসক ক্ষমতায়, তাই সংগঠিত হাতে সময় লাগতে পারে। তবেউভয়ের মধ্যে কথা থাকল দলীয় উৎস থেকে কোনো গোপন খবর এলে তা আমরা পরস্পর রক্ষা করব। ন্যাপ তখনও অবিভক্ত যদিও ভেতরে ভেতরে রুশ-চীন মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে ভাঙনের সুর বেজে চলছিল। বাংলাদেশে যারা চীনের মতাদর্শের সমর্থক ছিলেন, জাতীয় রাজনীতিতে তারা সামাজিক শাসক আইয়ুবকে সমর্থন দিয়ে বসায় জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। অন্যপক্ষে ন্যাপের বিশাল অংশ সমর্থন করতেন রুশ মতাদর্শ এবং জাতীয় রাজনীতিতে তারা সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরতন্ত্রবিরোধী, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী। তাই দেখা গেল চীনপন্থি নামে অভিহিতরা উগ্র আওয়ামী

লীগবিরোধী; অন্যপক্ষে রুশপন্থিরা আওয়ামী লীগের বহুদিকের বিরোধী হলেও গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠায় নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে প্রত্যয়ী। ১৯৬৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাপ বিভক্ত হয়। চীনপন্থিরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এবং রুশপন্থিরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল ওয়ালি খানের নেতৃত্বে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মেদের নেতৃত্বে গঠিত হয়। স্বল্পকালের মধ্যেই এটি সমগ্র পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। বিরোধ দেখা দেয় মুজিব-ভাইয়ের ছয় দফা কর্মসূচি নিয়ে। চীনাপন্থিরা আইয়ুবের সুরে ওই কর্মসূচিকে মার্কিনী ষড়যন্ত্র এবং পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী বলে প্রচার করে। আর রুশপন্থিরা একে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের অনুসারী বলে তার প্রতি সমর্থন জানায়।



কিন্তু ১৯৬৬ সালে আনুষ্ঠানিক বিভক্তি না হওয়ায় রুশপন্থি ন্যাপ নেতারা ব্যক্তিগতভাবে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ছয় দফা কর্মসূচিতে সমর্থন জানান। এ কথা মুজিবভাইকে খোলামেলা বলে আমি নিজেও সেই মতের অর্থাৎ রুশপন্থি মতবাদের অনুসারী বলে উল্লেখ করলে তিনি বিস্মিত ও আনন্দিত হন। যাই হোক, এভাবে দিন চলতে থাকল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। ঘোষণা করা হলো ৭ জুন আওয়ামী লীগ বন্দিমুক্তি ও অপরাপর দাবিতে হরতাল আহ্বান করেছে। খবরটি সংবাদপত্র মারফত আমরা জানতে পেলাম। দিবসটি ছয় দফা দিবস হিসেবেও কোনো কোনো সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয়। ইতোমধ্যে মে মাস থেকেই আমার 'ল' পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ৭ জুন তারিখে একটি পরীক্ষা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই জানিয়ে রেখেছেন। দিনটি যতই নিকটে আসতে লাগল আওয়ামী লীগের ওপর সরকারি নির্যাতন-নিপীড়নও বাড়তে থাকল। ওইদিন হরতাল, মিছিল ও জনসভার কর্মসূচি ছিল। সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই সন্ধ্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দেওয়ালের বাইরে থেকে সহস্র কণ্ঠে যখন স্লোগান ধ্বনিত হতো 'জয় বাংলা' 'জাগো বাঙালি জাগো'- কারাপ্রকোষ্ঠে লক-আপে বসেও আমরা উজ্জীবিত হতাম। এভাবে ৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোর নিয়ন্ত্রক বরাবর দরখাস্ত করলাম যেহেতু জনগণ ৭ জুন হরতাল বা কর্মবিরতি ডেকেছে, তাই তার সমর্থনে আমি ওইদিনকার পরীক্ষা দিতে বিরত থাকব। জমাদারের হাতে দরখাস্ত দিয়ে অফিসে পাঠালাম। কিন্তু জমাদার অফিসে যাওয়ার পথে মুজিব ভাইয়ের ওয়ার্ডে গিয়ে সালাম জানাতেই তিনি দরখাস্তটি পড়ে জমাদার সাহেবকে বলে পাঠালেন আমি যেন দরখাস্তটি প্রত্যাহার করে নিই কারণ পরীক্ষার সঙ্গে সারাজীবনের ক্যারিয়ারের প্রশ্ন জড়িত। আন্দোলনের জন্য তো সারাটি জীবনই রয়েছে। আমি বিনয়ের সঙ্গে তার কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললাম, জনগণ আন্দোলনে থাকবে আর আমি নিজের ক্যারিয়ারের জন্য আরামে বসে পরীক্ষা দেবো তা হবে না। দরকার হলে পরের বছর পরীক্ষা দেবো- এই বলে জমাদার সাহেবকে দ্রুত দরখাস্তটি অফিসে নিয়ে জমা দিতে বললাম। ছুটে এলেন জেলার ডেপুটি জেলর। তাদেরও একই অনুরোধ। আমি তা মানতে অপারগতা জানিয়ে দ্রুত দরখাস্তটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বললাম। তারা অফিসে ফেরত গিয়েই দরখাস্তটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। বিকেলে হাঁটার সময় মুজিবভাই প্রসঙ্গটি তুলে বললেন, কাজটি কিন্তু ভালো হলো না। আমার ভিন্নমত পুনরায় তাকে জানালাম। তিনি বললেন, ছাত্রলীগের কোনো নেতা তো পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকবে না। সেখানে অন্তত নিজ দলের অনুমতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। বললাম, তারাও তো সম্ভবত আপনার অনুরূপ পরামর্শই দিতেন। পরে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আসলে আমার তো ছয় দফা না, এক দফা। স্বাধীন বাংলা'। উত্তরে বললাম, 'পারবেন না। কারণ আপনার কেবলা তো আমেরিকামুখী। তারা কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কদাপি সমর্থন করেনি, করবেও না। হেসে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমেরিকাই বটে তবে ভায়া ইন্ডিয়া।' বললাম. 'ইন্ডিয়ার ভিন্ন ভিন্ন লবি আছে, তাই তাদের মাধ্যমে সোভিয়েতের শরণাপন্ন হোন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'দেখা যাক।' অতঃপর ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ হলো। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগারে আটক থাকলেন। ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বিজয়ীর বেশে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো একদিনে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি পাবনা সফরে এলেন। পাবনাবাসীর পক্ষ থেকে তাকে হেলিকপ্টার থেকে নামার পর প্রায় হাজার খানেক অভ্যর্থনাকারীর অন্যতম হিসেবে পাবনা স্টেডিয়ামে আমিও লাইনে দাঁড়িয়ে, তবে একটু পেছনের দিকে তৃতীয় সারিতে। বঙ্গবন্ধু রুশপ্রদত্ত হেলিকপ্টার থেকে নেমে পুলিশের আনুষ্ঠানিকতা শেষে অভ্যর্থনাকারীদের প্রথম সারি থেকে করমর্দন করতে লাগলেন। হঠাৎ আমার ওপর চোখ পড়তেই লাইন ও কর্ডন ভেঙে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। দীর্ঘ আলিঙ্গন শেষে বললেন, 'কী, বলেছিলাম না দেশ স্বাধীন করে ছাড়ব? উত্তরে আমিও বললাম, 'আপনার মার্কিনী কেবলার সহযোগিতায় বিজয় অর্জিত হয়নি, হয়েছে আমার বলা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায়'। হেসে বললেন, 'কথাটি পাঁচ বছর আগে ঢাকা জেলে হয়েছিল। আজও মনে আছে দেখছি।' বললাম, 'ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনিই এতদিন পরে তা মনে করিয়ে দিলেন।' এবারে আবার ফিরে যাই আবার সেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। একদিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তবে দিন-তারিখ মনে নেই। বিকাল চারটের দিকে একটা স্লিপ হাতে হেড ওয়ার্ডার এসে আমার হাতে দিলেন। দেখি তাতে লেখা আছে- 'ফর ইন্টারভিউ মি, রণেশ মৈত্র, সিকিউরিটি প্রিজনার। 'জিজ্ঞেস করলাম, 'কার সাথে ইন্টারভিউ?' হেড ওয়ার্ডার বললেন 'তা কিছু বলেনি।' কাপড়-চোপড় পরে ডিটেনশন অর্ডারটা হাতে নিয়ে চললাম রাজবন্দিদের ইন্টারভিউ রুমে। ঢুকতেই দেখি, মুজিবভাই বসা। সামনে বসে আছেন এক মহিলা তার কিশোরী কন্যাকে নিয়ে। তবে দুজনের কাউকেই চিনি না। আর এক কোণায় বসে আছেন আমার বাল্যবন্ধু ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম। তিনিই এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার দিকে পা বাড়াতেই মুজিবভাই একটু দাঁড়াতে বলে ভাবীর দিকে ইশারা করে বললেন, 'আপনার ভাবী।' আমি তাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানালাম। আর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের মেয়ে হাসিনা।' বলেই মেয়েকে বললেন, 'ইনি তোমার চাচা, রণেশ মৈত্র। পাবনার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা। বয়সে জুনিয়র হলেও আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। সালাম করো।' হাসিনা এগিয়ে আসতে নিলে বললাম, 'তুমি অনেক বড় নেতার মেয়ে, নিজেও ভবিষ্যতে বড় হবে আশা করি। সেভাবে নিজেকে গড়ে তোলো।' অতঃপর ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমার আটকাদেশ বেআইনি দাবি করে হাইকোর্টে রিট করতে চান। সম্মতি চাইলে তা দিলাম। আটকাদেশটি প্রয়োজন বলায় পকেটে থাকা আটকাদেশটি ডেপুটি জেলারের মাধ্যমে দিলাম। বাইরের কিছু খবরাখবর আকার-ইঙ্গিতে শুনলাম। মুজিবভাই আমীর-উল-ইসলামকে বললেন, 'শোন আমীরুল, টাকা যা লাগে আমি দেবো, তুমি রিটটা ভালো করে করবে। দরকার মনে করলে বড় কোনো সিনিয়র আইনজীবীকেও সঙ্গে নিও। তার দ্রুত মুক্তি পাওয়া খুবই প্রয়োজন।' হেসে আমীর-উল বললেন, 'টাকা লাগবে না, রণেশ আমার বাল্যবন্ধু, একসঙ্গে অতীতে জেল খেটেছি। ওর কেস অবশ্যই ভালোভাবে করব।' বলেই একটি ওকালতনামাতে সই নিলেন। ডেপুটি জেলর আইনসম্মতভাবে প্রতিস্বাক্ষর করে আমীর-উলকে দিলেন। আসলেও তিনি একটি পয়সাও না নিয়ে খেটেখুটে রিটটি করে কয়েক মাসের মধ্যেই উচ্চ আদালতের নির্দেশে আমাকে মুক্ত করেন। ওইদিন ইন্টারভিউয়ের পর রাতে দেখি বিশাল এক ভুঁড়িভোজের ব্যবস্থা। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার উপলক্ষে ভাবী নিজ হাতে রান্না করে এনেছিলেন বিস্তর আইটেম। ছিল সবই অত্যন্ত সুস্বাদু। মনে আছে ইলিশ মাছের পাতুরির কথা যেন আজও জিভে লেগে আছে। ভাবী যে এত ভালো রান্না করতে জানতেন তা আদৌ জানতাম না। আমি লিচু থেকে শুরু করে মৌসুমী নানা ফল দেখেছিলাম যা আমার ভাগ্যেও প্রচুর পরিমাণে জুটে গেল।



প্রবন্ধ

বাংলাদেশে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা

আবুল কাসেম ফজলুল হক

বাংলাদেশে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার দরকার। এর জন্য প্রথম পর্যায়ে দরকার সর্বজনীন কল্যাণে বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দূরদর্শী চিন্তাভাবনা, আলোচনা-সমালোচনা ও বিচার-বিবেচনা। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ধারণা যদি ঠিক হয়, তাহলে সেই লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে চেষ্টা চালালে সমাধানযোগ্য সবসমস্যারই সমাধান করা যাবে। লক্ষ্য ও যাত্রাপথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে এগোতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি ও শ্রমশক্তির কল্যাণে উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু নৈতিক চেতনা নিম্নগামী হওয়ার ফলে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ মানবিক গুণাবলি হারিয়ে ফেলছে।

এ অবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের অন্য সবব্যবস্থারও সংস্কার দরকার। অভীষ্ট সংস্কারের জন্য দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা লাগবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য আর কায়েমি-স্বার্থবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য এক নয়। আমরা পরিবর্তন চাই সর্বজনীন কল্যাণে। কায়েমি-স্বার্থবাদ যাদের চালিকাশক্তি, তাদের সঙ্গে সর্বজনীন-কল্যাণবোধ যাদের চালিকাশক্তি, তাদের বিরোধ চিরকালের। সর্বজনীন কল্যাণে, অশুভবুদ্ধিকে দমন করে, শুভবুদ্ধি অবলম্বন করে এগোতে হবে।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবস্থা বিরাজ করছে, তাতে সহজে এর উন্নতি সাধন সম্ভবহবেনা। অভীষ্ট নির্ণয়ের ও অভীষ্ট অর্জনের জন্য যারা কাজ করবেন, তাদের সংঘবদ্ধ দূরদর্শী ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অগ্রাধিকার ঠিক করে পর্যায়ক্রমে এগোতে হবে। প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে কর্মসূচিভুক্ত করা যেতে পারে :

১. প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণির পরিবর্তে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত রেখে এর মানোন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে পরবর্তী সবশিক্ষার ভিত্তি। পঞ্চম শ্রেণির ও অষ্টম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করতে হবে। স্কুল থেকে প্রাথমিক (পিইসি) ও নিম্নমাধ্যমে (জেএসসি) শিক্ষা সমাপনের সার্টিফিকেট দেওয়া হবেএবং এগুলোর প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি থাকবে।

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং কোচিং সেন্টার, গাইড বুক ইত্যাদির ব্যবসাতে স্বর্ণযুগ দেখা দিয়েছে। এগুলো বাতিল করা হলে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা এবং দেশি-বিদেশি যে সবশক্তি এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে তারা পরিবর্তনে বাধা দেবে। জনমত প্রবল হলে পরিবর্তনে সরকার রাজি হবে।

২. কথিত সৃজনশীল পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তন করে এমন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবেযা শিক্ষার্থীদের মনে পাঠানুরাগ, অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানস্পৃহা, স্বাজাত্যবোধ, সামাজিক সম্প্রীতি, দেশপ্রেম, সুনাগরিকত্ববোধ ও উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগাবে। পরীক্ষার জন্য মূলত বর্ণনামূলক উত্তরের পদ্ধতিকে নবায়িত ও বিকশিত করে কার্যকর করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আনন্দের যোগ ঘটাতে হবে। বর্তমানে শিশু-কিশোররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে শিক্ষার্থী হিসেবে, কিন্তু তার পরেই তারা বইয়ের বোঝা পিঠে নিয়ে পরীক্ষার্থী হয়ে যায়, শিক্ষার্থী আর থাকতে পারে না।

এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। সারা দেশের পাবলিক পরীক্ষার ফল এক কেন্দ্র থেকে প্রকাশ করা এবং ফল প্রকাশের সময় শিক্ষার পরীক্ষা সর্বস্ব ধারণা প্রচার করা বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় শিক্ষা বোর্ডগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, ইউনেসকো ও ইউনিসেফের অন্ধ-অনুসারীরা পরীক্ষাপদ্ধতির অভিপ্রেত পরিবর্তন সাধনে বাধা দেবে। সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের অনুসারীরা দুর্বল জাতিগুলোতে শিক্ষার উন্নতি চায় না- তারা কেবল ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে

শিক্ষার্থীদের ও অভিভাবকদের সন্তুষ্ট রাখার ব্যবস্থা চায়। জ্ঞানেই শক্তি, জ্ঞানেই কল্যাণ-বৃহৎ শক্তিবর্গ এটা বোঝে এবং জ্ঞানকে তারা কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। বাংলাদেশকে চলতে হবে জাতীয় ঐক্য অবলম্বন করে, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনা নিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করে।

৩. ইংলিশ ভার্সন বিলুপ্ত করতে হবে। যারা সন্তানদের যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে নাগরিক করার জন্য, কিংবা বড় চাকরি পাওয়ার জন্য ইংরেজি মাধ্যমে পড়াতে চান, তাদের জন্য ব্রিটিশ সরকার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও স্থানীয় ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ও-লেভেল, এ-লেভেল চালাচ্ছে। তা ছাড়া আছে বিদেশি সরকার দ্বারা পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যমের আরও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সে সবের পাশে ইংলিশ ভার্সনের দরকার নেই। ইংলিশ ভার্সনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তার দ্বারা রাষ্ট্র, জাতি ও জনগণের কোনো কল্যাণ হচ্ছে না।

বাংলাদেশে যারা আজকাল কেবল বিশ্বমান অর্জনের কথা বলেন তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ও জনজীবনের অবস্থার কথা একটুও ভাবেন না। যারা দ্বৈত নাগরিক, যাদের স্ত্রী অথবা স্বামী অথবা সন্তান দ্বৈত নাগরিক কিংবা বিদেশি নাগরিক, তারা যাতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপসচিব থেকে সচিব, জজকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হবে বাংলাদেশের ভূভাগে উন্নত জনজীবন, উন্নত জাতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলা। জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের মূলনীতি হবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সর্বজনীন কল্যাণ।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা শেখার ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব উন্নত করতে হবে। সারা দেশে সব শিশুকে বিদেশি ভাষা শেখানোর দরকার নেই। জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী সংখ্যা নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ও আরও কয়েকটি বিদেশি ভাষা ভালো করে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর উন্নত ও অনুন্নত কোনো রাষ্ট্রেই, সব শিশুকে বিদেশি ভাষা শেখানো হয় না। বর্তমানে মূলধারার (এনসিটিবি যে ধারার পাঠ্যপুস্তক জোগান দেয়) বাংলা মাধ্যমে ইংরেজি শেখানোর যে ব্যবস্থা আছে, তার পুনর্গঠন দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অন্তত একটি বিদেশি ভাষা সব শিক্ষার্থীকে ভালো করে শিখতে হবে। বিদেশি ভাষার জ্ঞান দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা সবাইকেই গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবঅবস্থা অনুযায়ী সারা দেশে (ক) প্রাথমিক পর্যায়ে (পঞ্চম শ্রেণি) পরে একটি শাখায় এবং (খ) নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ের (অষ্টম শ্রেণি) পরে অন্য একটি শাখায় পেশামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। এটা করা গেলে ঝরে পড়ার সমস্যার সমাধান হবে। পেশামূলক শিক্ষার এই দুই ধারার পাঠ্যসূচিতেই পেশামূলক বিষয়গুলোর সঙ্গে বাংলা ভাষা, জাতীয় ইতিহাস, পৌরনীতি ও নীতিশিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় রূপে স্থান দিতে হবে।

পেশামূলক শিক্ষার এই দুই ধারার বাইরে মূলধারার বাংলা মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক শাখাকে একীভূত করে এক ধারায় পরিণত করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মানববিদ্যা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এই তিন শাখা থাকবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জাতীয় ইতিহাস, পৌরনীতি ও নীতিশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় রূপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মূলধারার বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নত করতে হবে। মানববিদ্যা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইত্যাদি সব ধারার উচ্চশিক্ষার ভিত্তিরূপে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার তিন শাখার পাঠ্যসূচিকে পুনর্গঠন করতে হবে।

সারা দেশে গরিবদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষার ফল ও অন্যান্য দিক বিচারে মেধাবী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমানে বাংলা মাধ্যমের মূলধারা খুব বেশি ত্রুটিপূর্ণ ও অবহেলিত। মূলধারার বাংলা মাধ্যমের শিক্ষাকে উন্নত করা হলে তার পাশে মাদ্রাসা ধারাও উন্নতিতে আগ্রহী হবে। মূলধারার বাংলা মাধ্যমকে উন্নত করা হচ্ছে না বলেই গোটা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

৬. মাদ্রাসার বেলায় মাদ্রাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। যে অবস্থা চলছে, তাতে বিরোধমূলক নীতি পরিহার করে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নতির নীতি গ্রহণ করতে হবে। সবকিছু করতে হবে রাষ্ট্রের সংবিধানের আওতায় থেকে।

৭. বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে সেমিস্টারের মেয়াদ চার মাস কিংবা ছয় মাসের পরিবর্তে এক বছর করতে হবে। পরীক্ষার ফল গ্রেড পয়েন্টে প্রকাশ করা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এই পদ্ধতিকে উন্নত করতে হবে। গবেষণায় গবেষকের স্বাধীনতা যতটা সম্ভব বাড়াতে হবে। উচ্চশিক্ষার বিশ বছরমেয়াদি কৌশলপত্রের স্থলে রাষ্ট্রীয় অর্থে, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ অবলম্বন করে, নতুন উচ্চশিক্ষানীতি প্রবর্তন করতে হবে। গোটা শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

৮. জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ ভিত্তিক কর্মনীতি নিয়ে গ্রেকো-রোমান-ইউরো-আমেরিকান সভ্যতার প্রগতিশীল মহান বিষয়াদিকে-দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য, প্রযুক্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদিকে আমাদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসম্ভব গ্রহণ করতে হবে, আর তাদের উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী বিষয়াদিকে যথাসম্ভব পরিহার করে চলতে হবে।

বিশ্বায়নের কর্তৃপক্ষ (যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, ন্যাটো, জি সেভেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, জাতিসংঘ) ও তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্পর্কে সচেতন থেকে কাজ করতে হবে। বাইরে থেকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে নিজেদের বিবেচনায়, নিজেদের সততায় থেকে নিজেদের সত্তাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। শিক্ষাক্ষেত্রে এ সব বিষয়ে পরিপূর্ণ সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে।

৯. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্ভবপর সকল পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা করার, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, বিচারব্যবস্থা ও ব্যাংকিংয়ে বাংলা প্রচলনের, বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার এবং বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির লক্ষ্যে দূরদর্শী জাতীয় পরিকল্পনা ঘোষণা করে কাজ করতে হবে। উচ্চশিক্ষায়, গবেষণায়, বিচারব্যবস্থায় ব্যাংকিং ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চায় বাংলা ভাষা অবহেলিত বলেই বর্তমান পর্যায়ে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব বেশি দিতে হবে। বাংলা ভাষা, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর ভাষা, ধর্মীয় ভাষায় ও বিদেশি ভাষা ইত্যাদি বিবেচনা করে সুষ্ঠু জাতীয় ভাষানীতি অবলম্বন করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে জনজীবনের বৈচিত্র্য ও ঐক্য দুটোতেই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ও সবার উন্নতির নীতি অবলম্বন করতে হবে। এসবনিয়ে চিন্তায় ও মতপ্রকাশে বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

১০. শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে-

(ক) সারা দেশে বিভিন্ন ধারার পেশামূলক শিক্ষার মাধ্যমে বৃহত্তম-সংখ্যক যোগ্য, দক্ষ, উৎপাদনক্ষম, উন্নত-চরিত্রবল-সম্পন্ন কর্মী সৃষ্টি হয়; (খ) শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শক্তিমান রাষ্ট্ররূপ বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ও ভালোভাবে পরিচালনা করার উপযোগী শিক্ষিত লোক তৈরি হয় অধিকন্তু (গ) দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য, প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞানী ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আরও অনেক গুরুতর বিষয় আছে যেগুলোকে পর্যায়ক্রমে কর্মসূচিভুক্ত করে নিয়ে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশের সামনে আছে অজস্র সমস্যার মধ্যেও মহান সবসম্ভাবনা। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সম্ভাবনার বাস্তবায়ন সম্ভব। জনসাধারণকে জাগতে হবে, ঘুমিয়ে থাকলে কোনো সম্ভাবনাই বাস্তবায়িত হবেনা। কর্মসূচি গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নের জন্য গড়ে তুলতে হবে সংঘশক্তি।

জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য পর্যায়ক্রমে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি নিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। আন্দোলন গড়ে ওঠার আগেই সরকার যদি সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তার বাস্তবায়ন শুরু করে, তাহলে তা সরকার ও জনগণ সবার জন্যই কল্যাণের হবে। বাংলাদেশকে বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নয়নশীল রাখতে হবে। গোটা শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণ দরকার।

যদি কোনো বিশ্বসরকার গঠিত হয় তাহলে তার রূপ ও প্রকৃতি হওয়া উচিত আন্তঃরাষ্ট্রিক-ফেডারেল; এবং তাতে জাতিরাষ্ট্র, জাতি, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষাকে বিকাশশীল রাখতে হবে। বিশ্বসরকারের কাছে খুবকম বিষয়েরই ক্ষমতা থাকবে, জাতীয় সরকারের কাছেই থাকবে অভ্যন্তরীণ সবক্ষমতা। বিশ্বসরকার হবে জাতীয় সরকারগুলোর ঊর্ধ্বতন এক সরকার। বিশ্বসরকারের কাছে একটি সেনাবাহিনী রেখে সবরাষ্ট্রের অবলম্বন করে জনগণের স্বাধীন প্রগতিশীল গণরাষ্ট্র রূপে গড়ে তোলা আমাদের কেন্দ্রীয় কর্তব্য। জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ অবলম্বন করে বিশ্বব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে। সেই লক্ষ্যে পৃথিবীর সবরাষ্ট্রে, জনজীবনের প্রগতিশীল সমৃদ্ধিমান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে নতুন কার্যক্রম শুরু করা দরকার। সবরাষ্ট্রেই শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন।



প্রবন্ধ

মুজিবনগর সরকার

মোনায়েম সরকার

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। বর্তমানে এই জায়গার নামকরণ করা হয় 'মুজিবনগর' নামে। মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে যারা অবগত আছেন- তাদের কাছে এই লেখার গুরুত্ব অতটা না থাকলেও নতুন প্রজন্মের মানুষের কাছে সেদিনের ইতিহাস নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার কীভাবে, কোন প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়েছিল প্রতিটি বাঙালিরই তা জানা উচিত। সময়ের হিসাবে মুজিবনগর সরকারের বয়স ৫১ বছর হলেও আজও আমার কাছে মনে হয় সেদিনের ঘটনা। ৫১ বছরের স্মৃতি কিছুটা ধূসর হলেও সেই স্মৃতি কোনো দিনই মলিন হওয়ার নয়। অত্যন্ত বিপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচরগণ এই সরকার গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১০ এপ্রিল চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশের মানুষ এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ পরাধীন ছিল। তার নিজস্ব মানচিত্র ছিল না, পতাকা ছিল না, ছিল না শাসনতন্ত্র তথা সংবিধান। এগুলো সবই এখন বাংলাদেশের আছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে একটি স্বৈরাচারী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার আপামর জনতা যে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে- সেই প্রতিরোধই পরে বিজয় রূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছে। শুধু জনগণের ঐক্যের শক্তিতে একটি ছোট্ট ভূখণ্ডের মানুষ স্বাধীন হতে পারে এই অপরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে সম্ভবত বাঙালিরা স্থাপন করেছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর তৎকালীন পূর্ব বাংলায় প্রতিদিনই ঘটতে থাকে অভাবিত ঘটনা।

পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের পরে উন্মত্ত হয়ে ওঠে বাঙালি জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য। 'একটি বুলেট একটি বাঙালি'- এমনটাই ছিল পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর মনোভাব। অপ্রত্যাশিত সেই দম আটকানো পরিবেশে বাঙালি মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে। মুক্তির লক্ষ্যে তারাও সংঘটিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাকিস্তানের কারাগারে। দেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধ। কীভাবে ওই মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে তা ছিল অনেকটাই অনিশ্চিত পথযাত্রা। যেই বঙ্গবন্ধুর ডাকে সর্বস্তরের বাঙালি রাজপথে নেমে লড়াই করবে সেই বঙ্গবন্ধু তখন বাঙালির মাঝে নেই। দিশেহারা বাঙালির সামনে তখন আবির্ভূত হন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহচর। তারা বুদ্ধির বলে দিশেহারা বাঙালি জাতিকে একসূত্রে গাঁথার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার গঠন করেন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। এই সরকার গঠন প্রক্রিয়ার ভেতরে অনেক দূরদর্শী মানুষের শ্রম জড়িত ছিল। দেশ-বিদেশের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী এসে দাঁড়িয়েছিল মুজিবনগর সরকারের পাশে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ধারাকে একটি সুশৃঙ্খল রূপ দিতে এবং বাঙালির বিজয় নিশ্চিত করতে মুজিবনগর সরকারের অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে বাঙালিদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। ১৭ এপ্রিল এই সরকারের মন্ত্রিপরিষদ শপথ গ্রহণ করে। এই শপথ শুধু একটি অস্থায়ী সরকারের শপথ অনুষ্ঠান ছিল না- এই অগ্নিশপথের মধ্যে নিহিত ছিল পরাধীন পূর্ব বাংলাকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও স্বাধীন করার প্রেরণা। বলতে দ্বিধা নেই মুজিবনগর সরকার গঠিত ও তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ফলে দেশে-বিদেশে বাঙালিদের পক্ষে জনমত সুদৃঢ় হয়। তখন বাংলাদেশবিরোধী চক্র ছাড়া পৃথিবীর সকল শান্তি ও স্বাধীনতাকামী মানুষই বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। মুজিবনগরের সরকারের যারা সম্মানিত সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে দুই-একজন বাদে সকলেই বাংলাদেশের অস্তিত্বে আস্থাবান ছিলেন। তারা একটি স্বাধীন স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার জন্য শেষ পর্যন্ত বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে গেছেন। তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের যারা প্রাণ ভোমরা ছিলেন- দুই-একজন বাদে তারা প্রত্যেকেই দেশপ্রেমিক ছিলেন। ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনকের বিশ্বস্ত সহচর। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর এরাও অনেকে অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে নির্মমভাবে নিহত হন।

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গঠিত হলেও এদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ভারতের মাটি থেকে। কলকাতা ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িতে এই সরকারের অফিস স্থাপন করা হয়। সেখান থেকেই পরিচালিত হয় মুজিবনগর সরকারের চোখ ধাঁধানো কর্মকাণ্ড। মুজিবনগর সরকারের সবচেয়ে বড় অবদান বাংলাদেশকে স্বাধীনতা উপহার দেওয়া। সেদিন এই সরকারের সদস্যগণ যেভাবে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করেছে আজকের দিনে তা ভাবতে গেলে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমিও লড়াই করেছি। খুব কাছ থেকে দেখেছি মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ড। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি ঘটনাই মুজিবনগর সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করাসহ এমন কোনো কাজ নেই যা তারা করেনি। এমনকি যুদ্ধ-আক্রান্ত বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনার কৌশলও নির্ধারণ করে মুজিবনগর সরকার। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য মুজিবনগর সরকারের অনন্য অবদান আজ আমরা অনেকেই ভুলতে বসেছি। কেউ কেউ সেই ইতিহাস ভোলাবার ষড়যন্ত্রও করেছে। এখনও সেই ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে বলেই মনে করি।

একটি অসম যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেও কীভাবে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা জুগিয়েছে তার একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। মুক্তিযুদ্ধ যখন চলছে আমি তখন ন্যাপকর্মী (ন্যাপ মোজাফফর)। সে সময় কলকাতায় ন্যাপ অফিসের যাত্রা শুরু হলে আমি তখন পার্টি কর্তৃক অফিস সম্পাদক হিসেবে ন্যাপ অফিসের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। আমাদের অফিসে তখন অনেক মানুষই আসতেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য তখন বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। তেমনি একটি বিষয় ছিল প্রকাশনা। একদিন আমি গ্রেনেড হাতে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার একটি দৃশ্য সম্বলিত 'মুক্তিযুদ্ধের জয়ের কৌশল' নামে একটি বইয়ের কভার এঁকে দেয়ার অনুরোধ জানাই পটুয়া কামরুল হাসানকে। সেদিন কামরুল হাসানের সঙ্গে বরেণ্য কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানও ছিলেন। তিনি আমার এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বরং উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলেন- 'ইডিয়েট, কামরুলের কী গ্রেনেড আঁকার জন্য জন্ম হয়েছে? যে কোনো আর্মির বইয়ে গ্রেনেডের ছবি পাবে তাই দিয়ে বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে নাও।' এই বলে তিনি হনহন করে চলে যান। পরের দিন- 'ওরা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি' (ANNIHILATE, THESE DEMONS)- সম্বলিত ক্যাপশন সহযোগে ইয়াহিয়ার দানবাকৃতি মুখের রক্তাক্ত ছবি সহযোগে একটি পোস্টার ডিজাইন করে নিয়ে আসেন। এই পোস্টার দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়ে উঠি এবং তাকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ভাইয়ের কাছে যেতে বলি। তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদও পোস্টারটি দেখে অত্যন্ত খুশি হন এবং পটুয়া কামরুল হাসানকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করেন। এই পোস্টারটি পরবর্তী সময়ে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং সারাবিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন তোলে।

কথাটি এই কারণে বললাম যে, একটি সরকার যখন প্রবাসের মাটিতে বসে স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে তখন একটি সামান্য পোস্টার নিয়েও যে সেই সরকার কতটা আবেগী ছিল সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। মুজিবনগর সরকার বাঙালির বিজয় ত্বরান্বিত করতে এমন কোনো পদক্ষেপ নেই যা তারা গ্রহণ করেনি। এ প্রসঙ্গে আট সদস্যবিশিষ্ট ক্যাবিনেট কলসালটিং কমিটির কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। এই কমিটিতে ছিলেন- তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, কমরেড মনি সিং, মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ। এই ক্যাবিনেট কনসালটিং কমিটির দূরদর্শিতার কারণেই রাশিয়া জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভেটো দেয় এবং আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের বিরুদ্ধে রাশিয়া ২০তম নৌবহর পাঠানোর ঘোষণা দিলে সপ্তম নৌবহর ফেরত যেতে বাধ্য হয়। বহির্বিশ্বে বাঙালিদের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকা, চীন, মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ছিল। এমনকি ক্যাবিনেট কনসালটিং কমিটির সদস্য বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক আহমেদও নানারকম ষড়যন্ত্র করেছিল মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধে। এদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। বাঙালির স্বল্পশক্তি দিয়ে পাকিস্তানের মতো একটি বৃহৎ শক্তিকে পরাজিত করার ইতিহাস মুজিবনগর সরকারের হাতেই রচিত হয়েছিল। এজন্য মুজিবনগর সরকারকে চিরদিন আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

আজকের বাংলাদেশ মূলত ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত। কিন্তু এই অর্জনের পেছনে ছিল মুজিবনগর সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও জাতীয় চারনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামানের অসামান্য আত্মত্যাগ। মুজিবনগর সরকার সেদিন সবরকমের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে যেভাবে বাংলার মাটিকে শত্রুমুক্ত করে এবং স্বাধীনতা এনে দেয় তা এক বিস্ময়কর মহা-উপাখ্যানই বটে।

মুজিবনগর সরকারের প্রসঙ্গ এলেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকারকে। এছাড়া ডি.পি. ধর, পিএন হাকসার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বেজনেভ, পদগোর্নি, কোসিগিনের ভূমিকার কথাও বিনম্রচিত্তে স্মরণ করতে হয়। সেদিনের সেই প্রতিকূল পরিবেশে বাঙালি ও বাংলাদেশবান্ধব এসব মহান মানুষ ও তাদের দেশ আমাদের পাশে না দাঁড়ালে যুদ্ধ নিঃসন্দেহে আরও দীর্ঘায়িত হতো এবং বাঙালির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেত।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছে আজকের নতুন বাংলাদেশ। এই নতুন বাংলাদেশ এক সময় 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে খেতাব পেলেও এখন এদেশ বিশ্বের সামনে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ১৯৭১ সালের মতো সব বাঙালিকেই আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করা দরকার। দল-মত-নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ দেশকে গড়ে না তুললে কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না। দেশের স্বার্থে, মুক্তিযুদ্ধে নিহত এবং সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের ত্যাগকে মহিমান্বিত করতে আজ আমাদের সব বিভেদ ভুলে গিয়ে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের মতো আবার শপথ নিতে হবে- এদেশ আমাদের অহঙ্কার। আমাদের দেশ আমরাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং মুজিব আদর্শে গড়ে তুলবো। জয় বাংলা।

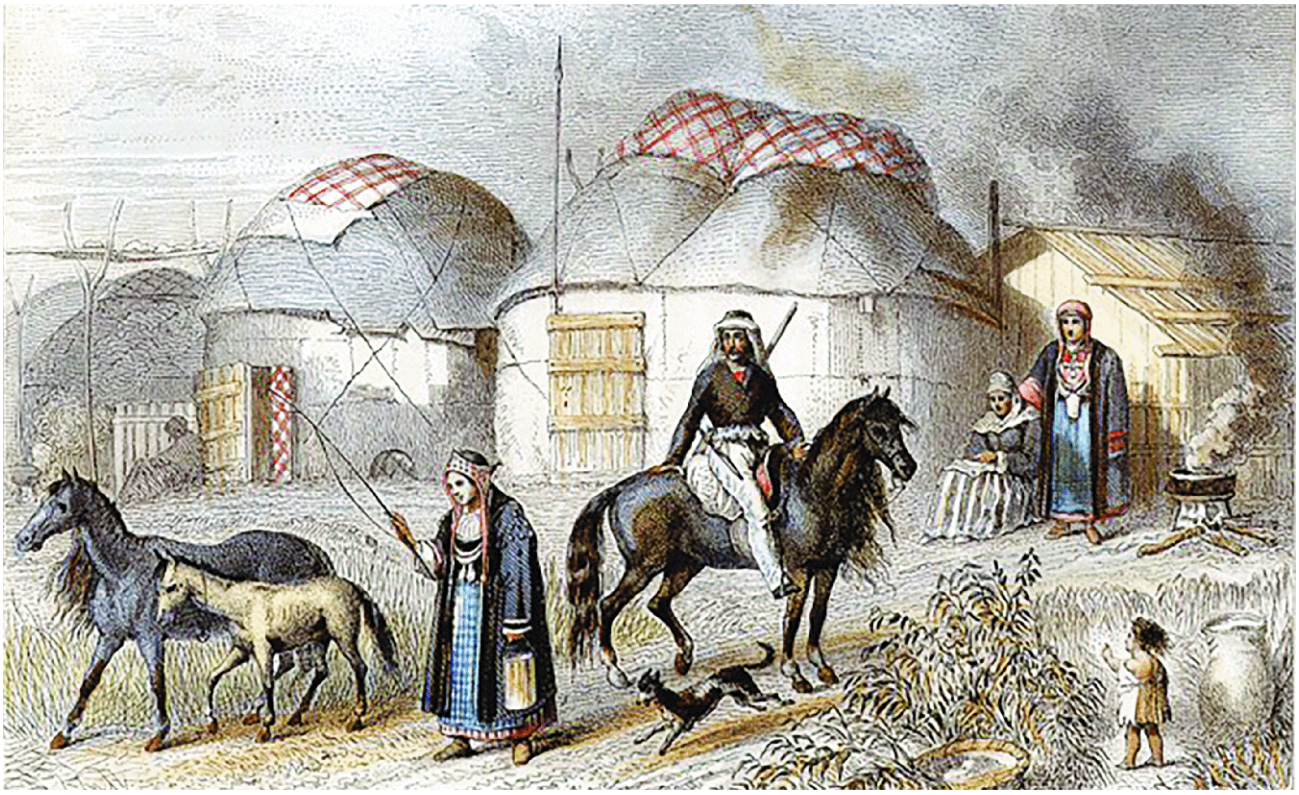

নিবন্ধ

ধনতান্ত্রিক রুশ সাম্রাজ্যের উত্থান

হরিপদ দত্ত

শি চিনপিং-এর বর্তমান চীন নয়, অতীতের মাও সে তুং-এর চীনারা সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রুশদের বিদ্রুপ করে ডাকত 'সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ'। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ। আজ সেদিন অতীত। এর ভেতর রাশিয়ার ভলগা নদী আর চীনের হোয়াং হো নদী দিয়ে লাখো কোটি কিউসেক পানি গড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে। বিলোপ হয়েছে রাষ্ট্র আর সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। অসামান্য অভূতপূর্ব ঘটনা বটে। যেদিন এ ঘটনা ঘটে প্রকৃত অর্থে সেদিন থেকেই বিশ্বরাজনীতি নতুন বাঁক নেয়। অন্যদিকে, সেদিন আফগানিস্তান থেকে মার্কিন শক্তি তালেবানদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে কেটে পড়ে, সেদিন থেকে বিশ্বরাজনীতি পুনরায় বাঁক বদল ঘটায়। এটা আর গোপন রইল না যে মার্কিন মহাশক্তির দিন ফুরিয়েছে। নতুন শক্তির উদ্ভব ঘটছে। এটাই ইতিহাসের কণ্ঠস্বর।

কে বা কারা সেই নবউত্থিত শক্তি? নয়া পুঁজিবাদী রাশিয়া এবং ছদ্মবেশী সমাজতন্ত্রী নব্য ধনতন্ত্রী চীন ভেঙে যাওয়ার পরেও রাশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র। সমাজতন্ত্র পতনের পর দীর্ঘ শীতঘুমে পতিত হয়েছিল রাশিয়া। তারপর একদিন মিখাইল গর্বাচেভ আর ইয়েলেৎসিনের রাশিয়ার নবজাগরণ ঘটে। বিশ্ব তখনই শঙ্কিত হয় যখন আচমকা সে তারই হারানো ভূখণ্ড নতুন রাষ্ট্র ইউক্রেন আক্রমণ করে বসে। কার নেতৃত্বে? ভ্লাদিমির পুতিন। এই মানুষটি ছিলেন কমিউনিস্ট রাশিয়ার সর্বশেষ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা প্রধান। সমাজতান্ত্রিক যুগ আর পুঁজিবাদী যুগের 'যুগসন্ধির' নেতা। আজকের যুদ্ধ শঙ্কিত বিশ্ব ভেবেছিল বোধকরি মহাশক্তিধর যে রাশিয়ার পতন ঘটেছে সে আর কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারবেনা। মূল ইতিহাস হয়ে গেছে দেশটি।

কিন্তু না। ইউক্রেন যুদ্ধ প্রমাণ করল মানবসভ্যতার নতুন এক সংকট তৈরি হয়েছে। রুশ জনগণও এমন যুদ্ধ চায়নি। প্রতিবাদ দমন করা হচ্ছে গায়ের জোরে, সামরিক কায়দায়। ভ্লাদিমির পুতিনের স্বপ্নে রয়েছে, স্মৃতিতে রয়েছে অতীতের বিশাল সোভিয়েত সাম্রাজ্য। ক্রিমিয়া দখল তার প্রমাণ। চেচনিয়ার বিদ্রোহকে নির্মম হাতে দমন তার প্রমাণ বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। রাশিয়ার উত্থানে ইন্ধন দিয়েছে তার অতীতের বেদনাময় স্মৃতি। বিশ্বসেরা শক্তির পতন ঘটেছিল মিখাইল গর্বাচেভের হাত ধরে। চোখের সামনে ভেঙে গেল দেশ। স্বাধীন হয়ে গেল খণ্ডিত অংশগুলো। ষোল আনা সুযোগটা নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়ার চারপাশের নতুন রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবক সেজে বসে মার্কিনিরা। সমরাস্ত্র দিয়ে তাদের বলীয়ান করে তোলে। বাণিজ্যে বখরা বসায়। ন্যাটোর সদস্য বানিয়ে রাজনীতিতে নাক গলায়। সঙ্গত কারণেই রাশিয়া সন্দিহান হয়, শঙ্কিত হয়। মার্কিন এবং তার মিত্ররা চারপাশ ঘিরে ধরছে না তো? তার হারানো অতীত গৌরবের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে না তো? সময় গড়িয়ে চলে। রাশিয়া বুঝতে পারে সারা বিশ্বের জ্বালানি শক্তি তেল-গ্যাসের প্রায় অর্ধেকের মালিক সে নিজে একা। ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ তার তেল সম্পদের মুখাপেক্ষী। তেল

উত্তোলন এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে আরব মধ্যপ্রাচ্যের মতো পরনির্ভর নয়, বরং প্রযুক্তি শক্তিতে বিশ্বসেরা। তার এই তেল সম্পদ পুনরুজ্জীবিত করে তাকে। সোভিয়েত ভেঙে গেলেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি জ্ঞান তো হারায়নি সে। রাশিয়া বুঝতে পারে মার্কিনিদের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিহত করার জন্য যে ন্যাটো গঠিত হয়, সমাজতন্ত্র পতনের পরেও তাকে টিকিয়ে রাখা হয়। অথচ রাশিয়ার নেতৃত্বে যে ওয়ারশো জোট তৈরি হয় তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর সে ন্যাটোর হস্তক্ষেপ হতে থাকে রাশিয়াকে ঘিরে। তার সীমান্তে ন্যাটোর তৎপরতাও লক্ষ করা গেছে। সবমিলিয়ে আতঙ্কিত রাশিয়া আক্রমণ করে বসে মার্কিন প্রভাবিত ইউক্রেনকে।

তারপরও এটাকে সমর্থন করা যায় না, রুশ বাহিনী ইউক্রেনে ঢুকে পড়বে। বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেবে সোভিয়েত জামানায় তৈরি আধুনিক নগরগুলোকে। বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না। সার্বভৌম বলে তো একটা কথা থাকে। তবেইউক্রেনেরও উচিত নয় মার্কিনিদের বাড়ির অন্দরমহলে ডেকে আনা। এটাও সত্য যে, বিশ্বরাজনীতিটা দ্রুত বদলাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে যে বদলটা এসেছিল, উপনিবেশগুলো স্বাধীন হচ্ছিল, জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং মানবসভ্যতার মনন জগতেরও বিবর্তন ঘটছিল। আজকের বদলটা হুবহু তা নয়। আজকের বাস্তবতা হচ্ছে পুরাতন বিশ্বশক্তির ক্ষয় হচ্ছে, দুর্বল হচ্ছে। উদ্ভবঘটছে নয়াশক্তি চীন আর রাশিয়ার। কেবল যে সমরশক্তির দিকে তা তো নয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও। বিশ্ববাণিজ্যের ভরকেন্দ্রের বদল হচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিনি বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে চীন। সস্তা পণ্যে সয়লাবকরে দিয়েছে বিশ্ববাজার। জাপানিদের উন্নতমানের শিল্পের যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশকে দূরে ঠেলে চীন তার সস্তা পণ্যে বাজার দখল করেছে। চীনা নয়া বাণিজ্য সেলফোন বা মোবাইলের নতুন নতুন সংস্করণ ক্রেতার হাতে তুলে দিচ্ছে। আধুনিক ক্ষুদ্র যুদ্ধাস্ত্র বাণিজ্যে ক্রমেই চীন সনাতনী দেশগুলোকে টপকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রত। অন্যদিকে পতিত সমাজতন্ত্রের দেশ রাশিয়া তার বিশাল তেল ভাণ্ডারকে সামনে রেখে পুঁজিবাদের নয়া কৌশল ধরে মাথা উঁচু করছে। বিশ্ববাসীকে এটা মনে রাখতে হবেরাশিয়ায় পতন ঘটেছে সমাজতন্ত্রের। কিন্তু তার বিজ্ঞান-প্রকৌশল প্রযুক্তি জ্ঞানের তো পতন ঘটেনি। বরং তার বাজেটের বড় অংশ ব্যয় করে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। করোনাকালে দ্রুত নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার তারই প্রমাণ। অত্যাধুনিক অস্ত্র আবিষ্কার করার প্রমাণ বর্তমানে ইউক্রেনে নতুন মডেলের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের দৃষ্টান্ত।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগাবসান ঘটেছে, এমনটা বলা শুরু হয়েছিল রুশ-মার্কিন নয়া সম্পর্কের কারণে। সমাজতন্ত্রের পতনের পর বাস্তবঅবস্থাটা খানিকটা এমনই ছিল। কিন্তু রাশিয়ার নয়া উত্থানের পর আমাদের সন্দেহ হয় আসছে দিনে ঠাণ্ডা যুদ্ধটা হবে রুশ আর চীনের ভেতর। চীন বর্তমানে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় রুশদের সমর্থন করছে। কেননা তিব্বত দখলের পর চীনের দখলটা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকং। হংকং মুঠোয় যাওয়ার পর দৃষ্টিটা পড়েছে বিপ্লবের সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া তাইপে বা তাইওয়ানের ওপর। চীন জানে জাতীয়তাবাদী চীনা নেতা বিপ্লবের পর চিয়াংকাইসেক তাইওয়ানকে কমিউনিস্ট চীনের বাইরে নয়া এক চীন বানিয়েছিলেন। আজ আর সেই দিন নেই। যে কোনো অসিলায় চীন পুনর্দখলের জন্য তাইওয়ানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে সময় তার রাশিয়ার সমর্থন প্রয়োজন পড়বে। সেই হিসেবেই চীন আজ ইউক্রেন আক্রমণে রুশদের পক্ষ নিয়েছে। তবে এটাও সত্য যে চীনা কূটনীতি বোঝা বড় সহজ নয়।

যে কোনো জাতি বা রাষ্ট্রের নবউত্থানের অধিকার আছে। এটাও তো মিথ্যে নয় যে, একের উত্থানের ফলে অন্যকে সংকটে পড়তে হবে। এ কথা কী করে আমরা অস্বীকার করতে পারি যে, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের স্বপ্ন আর দুঃসময় স্মৃতিতে রয়েছে অতীতের অখণ্ড বিশাল সোভিয়েত সাম্রাজ্য? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এমন স্বপ্ন স্মৃতিতে তাড়িত হতে হয় আজকের খণ্ডিত পাকিস্তানকে। তাই বাঙালির প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ আজও তাড়িত করে পাকিস্তানিদের। তবে ইউক্রেনকে স্বাধীন হতে গিয়ে বাঙালির মতো এক সাগর রক্ত দিতে হয়নি, বন্দুকের একটি গুলিও খরচ করতে হয়নি, মাত্র একটি ঘোষণা।



পুতিনের রাশিয়া নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে তখনই যখন দেখে মার্কিনিরা সোভিয়েত থেকে বেরিয়ে যাওয়া নতুন রাষ্ট্রগুলোতে মাথা ঘামাচ্ছে। অস্ত্র দিচ্ছে। গভীর মিত্রতায় আবদ্ধ হচ্ছে। তা ছাড়া রাষ্ট্রগুলোও মার্কিন নির্ভরতার দিকে ঝুঁকছে। ইউক্রেনের বেলায় তা-ই ঘটেছে। তাছাড়া মস্কোর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েনে পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। এক সময়ের মহাশক্তিধর জাতিটির হঠাৎ মহাপতন তা মেনে নেয়নি। তাই উন্নত প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের জ্বালানি শক্তির বিশাল ভাণ্ডার। হিসাবকষে দেখা গেছে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক তেল-গ্যাস উত্তোলন করে রাশিয়া। তাই আরব-মধ্যপ্রাচ্য নির্ভরতা বা হিসাবটা বদলে যাচ্ছে। মস্কো তাই তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে চায়। অবশ্য পথটা আলাদা। পূর্বে যে গৌরব দিয়েছিল সমাজতন্ত্র তা আজ ফিরে পেতে হবেপুঁজিবাদের পথে। পুঁজিবাদের পথ বড় কঠিন। প্রচলিত কথাটি হচ্ছে 'সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর।' বিশ্ববাসী পুতিনের রাশিয়াকে এমনি অবস্থায় দেখতে চায় না। এটা শান্তির পথ নয়। সভ্যতার মহাসংকটের গভীর অন্ধকারের পথ। ইউক্রেনীয় যুদ্ধ বিশ্বকে নতুন করে উদ্বাস্তু বা শরণার্থী সৃষ্টির আতঙ্কে ঠেলে দিয়েছে। রোমানিয়াসহ অপরাপর দেশে প্রাণভয়ে ইউক্রেনীয়রা দলে দলে পালাচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ এই শরণার্থীরা নতুন করে ইউরোপে মানবিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকট বৃদ্ধি করেছে। এমনিতেই ইউরোপ এশীয় এবং আফ্রিকান শরণার্থীদের চাপে রয়েছে। এখন কোনো দেশ আর শরণার্থীদের জায়গা দিতে রাজি নয়। দরিদ্র এশীয় এবং আফ্রিকান শরণার্থীরা সর্বদাই তাদের গতিমুখ উন্নত ইউরোপ বা আমেরিকার দিকে ঘুরিয়ে দেয় উন্নত জীবনের আশায়। আজ যে গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তার মূলে শরণার্থী সংকট। শ্বেতাঙ্গ তরুণ সমাজের ভেতর জার্মান হিটলারের উগ্র মতাদর্শ আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠছে। প্রশাসনের ভেতরও এদের প্রভাববৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজতন্ত্রী নয়, পুঁজিবাদী মস্কো বা ক্রেমলিনের উত্থানে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ উদ্বিগ্ন। সমাজতন্ত্র পরিত্যাগকারী রাশিয়া কোনো দিনই ভেঙে যাওয়া ভূমিকে ফিরে পাবেনা। কিন্তু তার বিশাল জ্বালানি ভাণ্ডার এবং অত্যাধুনিক সামরিক ভাণ্ডার যদি তাকে অন্ধ করে দেয় এবং হারানো সোভিয়েত ইউনিয়নের স্মৃতি স্বপ্ন যদি তাকে উস্কানি দেয় তবেবিশ্বে এক মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হবে। আমাদের বিশ্বাস মার্কিন শক্তির ক্রম অবক্ষয় এবং চলমান বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে রুশ উত্থানের উন্মাদনা যদি বৃদ্ধি পায় তবেবিশ্ব মহা সংকটে পতিত হবে। একদিকে রুশ শক্তি, অন্যদিকে চীনের উত্থান বিশ্বমানবতার কল্যাণে লাগুক এমন আশা করি। তাদের উত্থান নতুন শান্তির বিশ্ব গড়ার পথ দেখাক আমরা তা চাই। এমনিতে করোনা রোগ মানবসভ্যতাকে নাজেহাল করে দিয়েছে, তার সঙ্গে ভ্লাদিমির পুতিনের উগ্রবাদ যোগ হলে মহাবিপদ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে যে মনুষ্যত্ব বা মানবতা তার জয়ধ্বনির ভেতর এই গ্রহে মানুষ টিকে থাকবে, অন্যথা নয়। এটা যেমনি বুঝতে হবেরাশিয়াকে, চীনকে, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও। তাই আমাদের প্রত্যাশা রুশ সাম্রাজ্যের নবউত্থান মানবসভ্যতার মঙ্গলে আসুক, ধ্বংসে নয়। সন্দেহ এখানেই, ধনতান্ত্রিক নয়া রুশ কি মানুষের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবে?



নিবন্ধ

মুক্তি যুদ্ধে একজন রিকশাঅলা ও নৌকার মাঝি

তারাপদ আচার্য্য

১৯৭১ সাল। স্বাধীনতার উত্তাল মুহূর্ত। বাংলার মানুষের চোখে ঘুম নেই। মনের ভেতর ভয় আর হতাশা- কাকে হারাবো, কাকে দেখবো বা কাকে দেখবো না। নিদারুণ এক কপাল কুঁচকানো মুহূর্ত। পিতা-মাতাদের উঠতি বয়সি সন্তানদের নিয়ে ভয়। কারণ, স্বাধীনতা যুদ্ধ যে নিশ্চিত হবে এটা মোটামুটি সবাই জানত।

দিনটি ছিল ২৫ মার্চ, ১৯৭১। খবর পাই রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অনেক পুলিশ নিহত হয়েছেন পাকিস্তানি আর্মিদের হামলায়। শহরেও চলছে তাণ্ডব। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা। স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু ২৭ মার্চ। পাকিস্তানি আর্মিরা ফতুল্লা থেকে গোলাগুলি করতে করতে নারায়ণগঞ্জ শহরে ঢুকতে থাকে। পথে পঞ্চবটি হরিহর পাড়ায় নারায়ণগঞ্জ থানার প্রাক্তন দারোগা বিশ্বেশ্বর বাবুর বড় ছেলে প্রণবকুমার দুলাল এবং তার বন্ধু চিত্তরঞ্জন সাহা আর্মিদের হাতে নিহত হন। পঞ্চবটি স্মৃতিবেদী সেই নির্মমতার সাক্ষ্য আজও বহন করছে। একই দিনে সাত্তার জুটমিলের মালিকের ছেলে পাকসেনাদের হাতে নিহত হন। আরও নিহত হন আমাদের মহল্লার শাহ সুজা রোডের আমিনা মঞ্জিলের গফুর সাহেবের স্ত্রী আমিনা বেগম। আমরা কী করব? কোথায় যাব? শহরের নানা মানুষের নানা প্রশ্ন। পাকিস্তানি আর্মিরা যাকে পাচ্ছে তাকেই গুলি করে হত্যা করেছে। তাদের হিংস্রতা চরমে পৌঁছে গেছে। আমরা আমাদের মহল্লা শাহ্? সুজা রোডে

থাকতে পারলাম না। চরম নিরাপত্তার অভাব। পাইকপাড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম জলিল সাহেব সবাইকে বললেন, আপাতত সবাই নিরাপদ জায়গায় চলে যাও। বিশেষ করে তিনি হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সতর্ক করে দিলেন। আমরা অর্থাৎ বাবা-মা, দুই বোন, তিন ভাইসহ সকলে বিক্রমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। আবুল্লাহপুর পৌঁছানোর পর এক পরিচিত রিকশাঅলা (নামটা আজ আর মনে নেই) আমাদের হাঁটিয়ে ও রিকশায় করে গোপন পথ দিয়ে নিয়ে যান রামপাল গ্রামের বিনয় পালের বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে কোনো টাকা-পয়সা ছিল না। তাই তার ভাঙা সেদিন দিতে পারিনি। কিন্তু সেদিন তার মধ্যে কোনো রাগ কিংবা ক্ষোভ দেখতে পাইনি। বরং উপকার করতে পেরে খুব খুশিই ছিলেন তিনি।

যে বাড়িতে গিয়ে উঠি তাদের ওপরই আমাদের খাওয়া-দাওয়া চলতে থাকে। একদিন খবর পাই আব্দুল্লাহপুরে কামিনী পালের বাড়িতে পাকিস্তানি আর্মিরা ক্যাম্প করেছে (সে ক্যাম্পের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র একদিন)। সে রাতেই পাকিস্তানি আর্মিরা কামিনী পালের বাড়িতে অবস্থানরত ২১ জন মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। আমরা জায়গা পরিবর্তন করি। টঙ্গীবাড়ি সুনীল বোসের বাড়ির পাশের এক বাড়িতে গিয়ে উঠি। নিরাপত্তার খাতিরে সবাই মিলে রাতে পাহারা দেই। একদিন টঙ্গীবাড়ি থানার ওসি গোপনে প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে খবর পৌঁছে দেন এ মহল্লায় যেন কোনো যুবক-যুবতী না থাকে। সঙ্গে ভাই-বোন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। রামচন্দ্রপুর, আব্দুল্লাহপুর থেকে আমি ও দু'বোন রওনা দেই। তখন সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা। জুলাই মাস। প্রচুর পানি। এক নৌকার মাঝি আমাদের নিয়ে যান তার বাড়ি রাতে থাকার জন্য। মনটা ভয়ে দুরু দুরু করলেও উপায়ন্তর না দেখে মাঝির বাড়িতে গিয়েই উঠি। রাত তখন দশটা। তিনি আমাদের একটি ঘরে খাবার-দাবারসহ সবকিছু ব্যবস্থা করে বললেন, আপনারা ঘুমান, আল্লার রহমতে কোনো সমস্যা নেই। মাঝি পাশের ঘরে চলে গেলেন। দেখলাম জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন। মাঝিকে এমন অবস্থায় দেখে মনে সত্যিই সাহস সঞ্চার হলো। সে রাতে বৃষ্টি ছিল। চারদিক কাজল কালো অন্ধকার। ভুতুড়ে পরিবেশ। ঝিঁঝিপোকা ও ব্যাঙের ডাক। ইতোপূর্বে কখনো গ্রামে থাকিনি। ভেতরে ভেতরে ভয়, তবুও ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পরি তা আর মনে নেই।

তখন ভোর প্রায় পাঁচটা। মাঝি এসে আমাদেরকে ডেকে উঠালেন। পূর্বাকাশে তখনো সূর্য ওঠেনি। রাতের অন্ধকার অনেকটাই কেটে গেছে। চারদিকে পাখির কিচিরমিচির শব্দ। হয়তো কিছুক্ষণ পরই সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। মাঝি বললেন, আপনারা কোথায় যাবেন? উত্তরে বললাম, ভারত। ঠিক আছে, চলুন। এই বলে মাঝি নৌকা সীমানায় পৌঁছে দিল। আগরতলায় পৌঁছানোর পর শুরু হলো নতুন সমস্যা। শরণার্থীতে ক্যাম্প ভর্তি। কোনো নতুন শরণার্থীদের স্থান নেই। খুঁজে খুঁজে একজন বাংলাদেশি হোটেল মালিকের সন্ধান পাই। হোটেলটির নাম সুব্রত হোটেল। ক্লান্ত দেহে হোটেলের বারান্দায় চুপ করে বসে স্থানীয় সংবাদপত্রে চোখ বুলাচ্ছি। হঠাৎই চোখ চলে গেল নারায়ণগঞ্জের একজন পরিচিত বাসিন্দার দিকে। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তোমরা অন্য রাজ্যের ক্যাম্পে চলে যাও। আমি তোমাদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমরা অন্য রাজ্যের ক্যাম্পে না গিয়ে কোলকাতায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করি তাকে। সে সময় ট্রাক দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থীরা যাচ্ছে। আমাদের একটি ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে সিট ঠিক করে দেন। আগরতলা ধর্মনগর নেমে সোজা কোলকাতা চলে যাই। ওখানে উঠি আমার জ্যাঠা মহাশয়ের বাড়ি। সল্ট লেকের আউট সাইড শরণার্থীর কার্ড করি। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত রিলিফের চাল-ডাল ও নিজে ছাত্র পড়িয়ে আপন দেশ ছেড়ে কাটাই পরবাসে।

আজ অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। স্মৃতির আঙিনায় ভেসে ওঠে সেইসব দিনগুলোর কথা। মনে পড়ে সেই রিকশাঅলা, নৌকার মাঝির কথা। যুদ্ধ চলাকালীন সেই বিপর্যয়ের সময় তারা যদি আমাদের সহযোগিতা না করত তাহলে কি যে হতো! স্বাধীনতার এতো বছর পরেও খুঁজে বেড়াই সেই দুটি মুখ। যাদের নাম-ঠিকানা কিছুই আমার জানা নেই। তারপরও অন্তর থেকে তাদের জানাই গভীর শ্রদ্ধা। দেশের স্বাধীনতার জন্য এমন অনেক রিকশাঅলা, মাঝি, কুলি, কৃষক, মুক্তিযোদ্ধা, কোনো মা, বোন, গ্রামের কোনো ডাক্তার কিংবা মুচি এক কাতারে দাঁড়িয়ে একে অন্যের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর তাদেরই হাত ধরে এসেছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমরা একে অন্যের হাতে হাত রেখে আবার এক কাতারে দাঁড়িয়ে দেশটাকে কি সত্যিকারের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি না?





নিবন্ধ

সামাজিক পুঁজির সংকট ও করণীয়

ড. মতিউর রহমান

করোনাভাইরাস ডিজিস-১৯ (কোভিড-১৯) পুরো বিশ্বকেই উলটপালট করেছে। ২০১৯-এর ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। বাংলাদেশে এটি শনাক্ত হয় ২০২০ সালের মার্চে। দুই বছরেরও বেশি সময় চলা এ ভাইরাসের সংক্রমণ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বকে ব্যাপকভাবে পালটে দিয়েছে। কোভিড-১৯ আমাদের চিরচেনা জগৎকে সবদিক দিয়ে অপরিচিত করে দিয়েছে। মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এ রোগের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যগত ও মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক গবেষণা হয়েছে। শুধু আর্থিক দিক থেকেই বিবেচনা করলে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে এ রোগের অভিঘাত ব্যাপকতর, যা ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান হচ্ছে।

সামাজিক পুঁজি (সোশ্যাল ক্যাপিটাল) প্রধানত সমাজবিজ্ঞানের একটি প্রত্যয় বা ধারণা। আমেরিকান সমাজ সংস্কারক লিডা জুডসন হানিফান ১৯১৬ সালে 'ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যে শুভেচ্ছা, সহযোগিতা, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক' বোঝাতে সামাজিক পুঁজি শব্দটি ব্যবহার করেন। সামাজিক পুঁজির ধারণাটি সর্বপ্রথম ১৮৯০-এর দিকে ব্যবহৃত হয়। তবে ১৯৯০-এর পর থেকে সমাজবিজ্ঞানী, সমাজচিন্তক ও উন্নয়নসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে সমাজ বদলের ধারণাগুলোর মধ্যে সামাজিক পুঁজি সবচেয়ে জনপ্রিয়। সাধারণভাবে মানুষের মনোগত অবস্থা বা মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে কোনো ধরনের বৈষয়িক স্বার্থে চিন্তা না করে কাউকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপৃত করতে পারাকেই সামাজিক পুঁজি হিসাবে চিহ্নিত করা

হয়। সামাজিক পুঁজির তিনটি মৌলিক গুণ রয়েছে যথা-সামাজিক পুঁজি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উৎস; এটি পারিবারিক সহযোগিতার উৎস এবং এটি পরিবারের বাইরের নেটওয়ার্কগুলোর মধ্য দিয়ে সুফল লাভের উৎস।

কোভিড-১৯ এর দরুন সৃষ্টি হওয়া ভয়াবহ আর্থিক মন্দা ও জনস্বাস্থ্য সংকটের সময় আরও একটি ঘটনা প্রায় অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে; আর তা হলো, সামাজিক পুঁজির সম্ভাব্য সংকট বা ক্ষয়। অর্থনীতিবিদদের মতে, সামাজিক পুঁজি শ্রম ও মূলধনের মতোই একটি দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সামাজিক সংহতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্দার ফলে যদি সামাজিক পুঁজির ক্ষয় ঘটে, তা অর্থনীতির ওপর মন্দার কুপ্রভাবকে আরও প্রকট ও সুদূরপ্রসারী করে তুলতে বাধ্য। সামাজিক পুঁজির প্রধান স্তম্ভ দুটি যেমন: এক. মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস এবং দুই. সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা। যে সমাজে বিশ্বাস ও আস্থার মাত্রা যত বেশি, সামাজিক পুঁজির নিরিখে সেই সমাজের অবস্থা তত উন্নত।

কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি সামাজিক পুঁজির এই দুটি স্তম্ভকে ভেঙে দিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা অনেক আগেই সতর্ক বার্তা প্রদান করেছিলেন। কারণ, কোভিড-১৯ এর মতো তীব্র সংক্রামক রোগ থেকে বাঁচতে আমরা নিজেদের সমাজ থেকে যতদূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন করেছি। বলতে গেলে প্রায় সবরকম সামাজিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। অচেনা মানুষের সঙ্গে মেলামেশার তো প্রশ্নই ওঠে না। এর ফলে সমাজে তৈরি হয় গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তার ওপর, সাধারণ মানুষ যদি মনে করে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এ সংকট মোকাবিলায় যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে না বা এ সংকট নিরসনে যথেষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না; তখন তাদের মনে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরও তীব্র ক্ষোভ জমা হতে থাকে। সময়ের সঙ্গে এ কারণগুলোর জন্যই ক্ষয় হতে শুরু করে সামাজিক পুঁজি। এতে সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রতি তারা ঝুঁকে পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে তাদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত করতে পারে।

একথা বলা যায়, কোভিডের অভিঘাত সত্ত্বেও বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক সাফল্য ধরে রাখতে পেরেছে। বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, অর্থনৈতিক সক্ষমতা বেড়েছে, জীবনযাত্রার মানও কিছুটা উন্নত হয়েছে। বিভিন্ন মেগা প্রকল্প যেমন: পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা বন্দর, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, মেট্রোরেল প্রভৃতি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু একটা বিষয় আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে আর তা হলো, সামাজিক অবস্থা। মানুষে মানুষে আন্তরিকতা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আস্থা প্রভৃতি; যা সামাজিক পুঁজির অন্যতম উপাদান। এ পুঁজির ঘাটতি থেকে তৈরি হয় সামাজিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্য।

কোভিডের অভিঘাতে সামাজিক পুঁজির এ সব উপাদানে ফাটল ধরেছে কিনা, এ সম্পর্কিত কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে ও বিভিন্ন ঘটনা সংঘটনের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায়, আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, পারস্পরিক বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর মানুষের আস্থা প্রভৃতিতে অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সব ঘটনা হয়তো আগেও ছিল; কিন্তু করোনাকালে এগুলো আরও বেড়ে গেছে। আস্থা ও বিশ্বাস সমাজ থেকে উঠে গেলে সমাজে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সামাজিক পুঁজি কমে গেলে সামাজিক নৈরাজ্য ও অর্থনৈতিক পতন ঠেকানো সম্ভব হয় না। কয়েকটি বিষয় এখানে তুলে ধরলে হয়তো এ সামাজিক সংকট সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করা সম্ভব হবে। যেমন: করোনা মহামারির কারণে প্রায় দেড় বছর ধরে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এতে ছাত্রছাত্রীদের মনোজগতে বিশাল একটি পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভয়, সংকীর্ণতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার মতো বিষয়গুলো তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। এটিও সামাজিক পুঁজি ক্ষয়ের একটি নমুনা। কারণ, শিক্ষা হলো সামাজিক পুঁজির অন্যতম উপাদান, যার মাধ্যমে সমাজ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সামগ্রিকভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে। এ ছাড়া প্রায় দুই বছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদারতাবোধ নষ্ট হয়েছে। কূপমণ্ডূকতা ও অন্ধকারের সংস্কৃতি দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা এ ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, করোনাকালে বাংলাদেশে প্রায় তিন কোটি বা তারও অধিক মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছেন। করোনায় নবসৃষ্ট এ বিরাট জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্র বা সরকার ব্যর্থ হলে তাদের মধ্যে তৈরি হতে পারে অপরাধপ্রবণ আচরণ, যা সামাজিকভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অনাস্থারই জন্ম দেবে। এ ছাড়া এই করোনাকালে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত বিরাট জনগোষ্ঠীর মনোজগতে ঘটে গেছে ব্যাপক পরিবর্তন। মানসিক স্বাস্থ্যের সংকটে মানুষ দিশাহারা হয়; ঠিক-বেঠিক নির্ণয় তাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। এ কারণে তাদের সহজেই প্রভাবিত করা যায়। জাতীয় জনস্বাস্থ্যের দুরবস্থা থেকে আমরা এর কিছু লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

করোনা মহামারি শেষ হতে না হতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, শ্রীলংকায় অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতিও সাধারণ মানুষের মনোজগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও বেকারত্ব, আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যকার সম্পর্কের পরিবর্তন, মাদক, অর্থ পাচার, নারী ও শিশু পাচার, ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হওয়া, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, বৈষম্য, অসমতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি অনেক বেড়ে গেছে। এগুলোকে সামাজিক পুঁজির সংকটের উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যায়। সুতরাং, একথা বলা যায়, সামাজিক পুঁজি না বাড়লে বা এর ক্ষয়রোধ করা সম্ভব না হলে সমাজে নৈরাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা পাবে; অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। এমনকি রাজনৈতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। যেমনটি আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিভিন্ন দেশে দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং, এখনই এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। সরকারি উদ্যোগে দ্রব্যমূল্যসহ সব ধরনের নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় নিয়ে আসা; ক্রমবর্ধমান অপরাধ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দূরকল্পে ব্যাপক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ; ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ; শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও মাদক, খুন, জখম, ছিনতাই, নারী নির্যাতন, নারী পাচার. সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ও অর্থ পাচার প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সুশীলসমাজও এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

কোভিডের কারণে আমাদের দেশে সামাজিক পুঁজির কতটা ক্ষয় হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে সামাজিক পুঁজিতে সংকট যে তৈরি হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিহাস বলে, ভেঙে পড়া অর্থনীতি যতবার সমাজের গায়ে আঁচড় বসিয়েছে, যতবার দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সাধারণ মানুষের; ততবারই বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে সমাজে ও রাষ্ট্রে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত করোনা মহামারিসৃষ্ট ক্ষতবিক্ষত সমাজ পুনর্গঠনের। করোনাসৃষ্ট আর্থিক সংকটের আসল গভীরতা, ব্যাপ্তি ও মেয়াদ আমাদের এখনকার অনুমানের চেয়েও হয়তো অনেক বেশি হতে পারে। আমাদের মতো দেশে এর ফলে নানা রকম সামাজিক অস্থিরতা এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা মারাত্মক রূপ নিতে পারে; যার কিছু কিছু আমরা ইতোমধ্যেই পর্যবেক্ষণ করছি। সুতরাং, এ ধরনের অবস্থা মোকাবিলায় আমাদের সবাইকে সেভাবেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

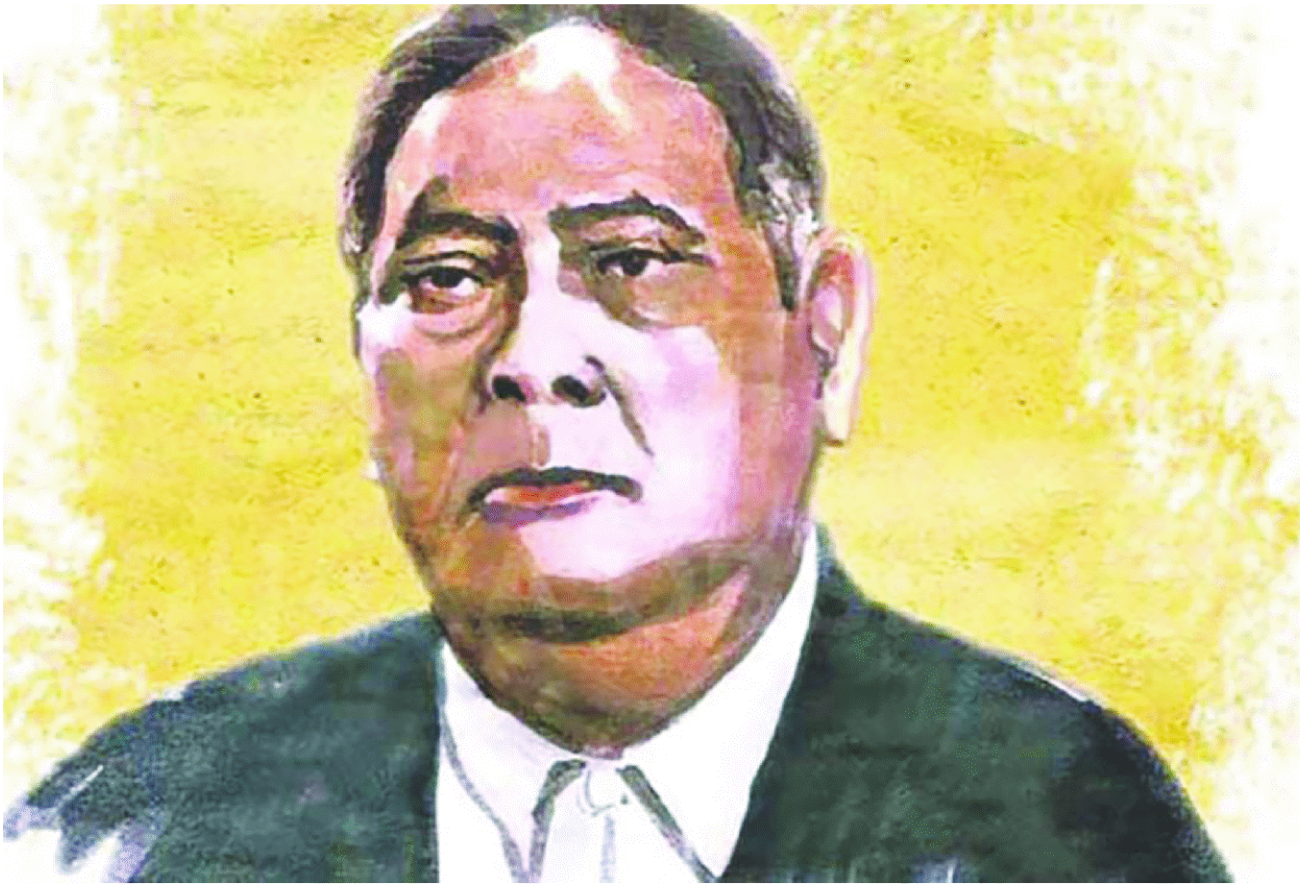

প্রবন্ধ

দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতায় শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের ভূমিকা

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

অবিভক্ত বাংলার জাতীয় নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতার জন্য ছিলেন সুপরিচিতি। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। সর্বভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ফজলুল হক। তার আপসহীন ন্যায়নীতি ও অসামান্য বাক্‌পটুতার কারণে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন শেরে বাংলা নামে। সর্বভারতীয় রাজনীতির পাশাপাশি গ্রামবাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বপ্রথম তিনি একটি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। বরিশাল জেলায় বাকেরগঞ্জের বর্ধিষ্ণু গ্রাম সাতুরিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর। আইনজীবী কাজী মুহম্মদ ওয়াজেদ ও সাহিদুন্নেসা খাতুনের একমাত্র পুত্র ছিলেন তিনি। এ কে ফজলুল হকের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বাড়ির পরিবেশে। বাড়িতেই তিনি আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরে তিনি ভর্তি হন বরিশাল জেলা স্কুলে এবং সেখান থেকে ১৮৯০ সালে এন্ট্রান্স পাস করার পর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রখর মেধাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন ফজলুল হক। সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন বিশিষ্ট রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ফজলুল হকের মেধায় তিনি বিশেষভাবেআকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি একই বছরে রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যা তিনটি বিষয়ে অনার্সসহ কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক পরীক্ষা পাস করেন, যা ছিল একটি বিরল দৃষ্টান্ত। ইংরেজি ভাষায় এমএ পাঠ শুরু করলেও পরে তিনি গণিতশাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি নেন ১৮৯৬ সালে। কথিত আছে তিনি ইংরেজি ভাষায় এমএ পড়তে গেলে তার এক সহপাঠী তাকে বলেছিলেন মুসলমান শিক্ষার্থীরা অঙ্ক

পড়তে ভয় পায়। সে কারণেই কি তিনি ইংরেজিতে এমএ পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? ওই সহপাঠীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মাত্র ছয় মাসের প্রস্তুতি নিয়ে অঙ্কে প্রথম শ্রেণিতে এমএ পাস করেন ফজলুল হক। তিনি আইনেও স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এবং কলকাতার খ্যাতনামা আইনজীবী স্যার আশুতোষ মুখার্জির অধীনে আইনের শিক্ষানবিশ হয়েছিলেন। দু'বছর শিক্ষানবিশির পর তিনি কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবেআইন ব্যবসা শুরু করেন। যদিও এক বছরের মাথায় পিতার মৃত্যুর পর তিনি ফিরে গিয়েছিলেন বরিশালে এবং সেখানে বরিশাল আদালতে যোগ দিয়েছিলেন।

আইন ব্যবসা ছেড়ে ফজলুল হক সরকারি চাকরি নিলেন ১৯০৬ সালে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ফজলুল হক ১৯১১ সালে। আবার তিনি ফিরে গেলেন কলকাতা হাইকোর্টে আইনের পেশায়। সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থা দেখেছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাদের ওপর জমিদার ও মহাজনদের নির্মম অত্যাচার। তার সেই অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী জীবনে দরিদ্র নিপীড়িত কৃষক সমাজের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে তিনি প্রবর্তন করেছিলেন ঋণ সালিশি বোর্ড, প্রণয়ন করেছিলেন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর এ নিয়ে বাংলার জনগণ বিভক্ত হয়ে পড়লে, ঢাকার চতুর্থ নবাবস্যার খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুর মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি সংগঠন তৈরির কথা ভাবেন। তিনি ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলন থেকেই জন্ম নেয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। ঢাকার আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ফজলুল হক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হন তিনি ১৯১৩ সালে এবং ১৯১৬ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি। ওই একই সময়ে পাশাপাশি তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক এবং পরে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। দিল্লিতে ১৯১৮ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ফজলুল হকই ছিলেন একমাত্র বাঙালি যিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে তিনি যে প্রস্তাবউত্থাপন করেছিলেন, তা 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে অভিহিত হয়। এই চুক্তির অন্যতম একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মি. হক। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রাদেশিক পর্যায়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়। ওই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। উনিশ শ' চব্বিশ সালে তিনি বাংলার শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন এবং ১৯৩৫ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন তিনি। তিনিই ছিলেন এ পদে অধিষ্ঠিত প্রথম বাঙালি মুসলমান।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পরপর বেশ কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতিত্বে। লন্ডনে অনুষ্ঠিত ১৯৩০-৩১ সালের প্রথম বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মি. গান্ধী। দ্বিতীয় বৈঠকে অবশ্য যোগ দিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু মুসলিম লীগ ওই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিল। ফজলুল হক ওই বৈঠকে বাংলা এবং পাঞ্জাবের মুসলমানদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব দাবিকরেছিলেন। তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষেও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার পর ১৯৩৭ সালে সেখানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে প্রজা পার্টি নামে সামন্ততন্ত্রবিরোধী যে দল ছিল ফজলুল হক সেটির রূপান্তর ঘটান কৃষক-প্রজা পার্টি নামে রাজনৈতিক দলে। ওই নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে তার দল তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবেআত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং নির্দলীয় সদস্যদের সঙ্গে জোট গঠন করেন মি. হক এবং এ. কে ফজলুল হক হন অবিভক্ত বাংলার প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশন। ২২ থেকে ২৪ মার্চ তিন দিনের ওই অধিবেশনে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় প্রথম 'পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক। ১৯৫৪ সালের শেরে বাংলা এ কে ফজলুক হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে গঠিত হলো যুক্তফ্রন্ট। এই ফ্রন্ট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি।

২৩ মার্চ ব্রিটিশ ভারতের পূর্ব এবং উত্তরপশ্চিমের মুসলমান প্রধান অংশে 'স্বায়ত্তশাসিত পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার দাবিসংবলিত সেই প্রস্তাবগৃহীত ও পাস হয় ওই অধিবেশনে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে 'লাহোর প্রস্তাব' ছিল একটি ঐতিহাসিক দলিল, যা পরে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত হয়। তার ওই বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে পাঞ্জাববাসীরা তাকে উপাধি দিয়েছিল শের-ই-বঙ্গাল অর্থাৎ বাংলার বাঘ। তখন থেকে তিনি শেরে-বাংলা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদের দীর্ঘ প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তিনি বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। এ সময়ে তিনি 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠন করেন, যার ফলে দরিদ্র চাষিরা সুদখোর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা পায়। ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাওয়ার পর ফজলুল হক ঢাকায় চলে যান এবং ১৯৫২ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে দেশের সাধারণ নির্বাচনে তিনি 'যুক্তফ্রন্ট' দলের নেতৃত্ব দিয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র গৃহীত ও কার্যকর হওয়ার পর তিনি স্বারষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিয়ে করাচি থেকে ঢাকা চলে যান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯২০ সাল থেকে নির্বাচনী রাজনীতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসারের ফলে এ দেশের অধস্তন রায়তদের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে জনমত ক্রমেই সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, বাংলার রায়ত শ্রেণির অধিকাংশই ছিল ভূমিতে অধিকারবিহীন। যেসবরায়ত এক নাগাড়ে কয়েক বছর কোনো ভূমিতে দখলদার ছিল, ওই বিলে তাদেরকে সে ভূমিতে অধিকার প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। অধিকন্তু এই বিলে বর্গাদারকেও ভূমিতে অধিকার দেওয়ার প্রস্তাবকরা হয়। আইনসভায় ভূম্যধিকারী গোষ্ঠী প্রস্তাবটির চরম বিরোধিতা করে, কিন্তু তা মুসলমান সদস্যগণসহ কৃষকদরদি দলগুলোর দ্বারা সমর্থিত হয়। কয়েকটি সংশোধনীসহ প্রস্তাবটি আইন পরিষদে পাস হয়। বস্তুত এ সংশোধনীগুলোর ফলে আইনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এ আইনের অধীনে একজন নিমস্বত্ব রায়ত কোনো নির্দিষ্ট জমি ক্রমাগত বারো বছর ভোগ দখল করে থাকলে প্রতিযোগিতামূলক হারে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে সেই জমির ওপর সে অধিকার লাভ করে। এই রায়তদের রাজস্ব বৃদ্ধি করার এবং রাজস্ব না দেওয়ার জন্য তাদের উৎখাত করার অধিকার জমিদারদের হাতে সংরক্ষিত থাকে। এর ফলে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯২৮ নিমস্বত্ব রায়তদের বাস্তবসুবিধা প্রদান করতে পারেনি, তবেকাগজে-কলমে এটি একটি রাজনৈতিক দলিল হিসেবেই থেকে যায়। এ. কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন পাস করে আইনটির দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করে।

কৃষি আর শিক্ষাই তো ওই সময়ের পূর্ব বাংলার মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দুটি বিষয়। এই দিয়েই তিনি গরিবমানুষদের মন জয় করেছিলেন। এই গরিবনিয়ে কারবারই হয়তো সাধারণের কাছে তার এত বড় বড় ডিগ্রি, কৃতিত্বকে আড়ালে রেখে দেয়। খুবকম মানুষই এত নিচে নেমে কাজ করতে পারেন অথবা নিজেই দান হয়ে নেমে আসতে পারেন গ্রহীতার ভিড়ের মধ্যে। আবুল কাশেম ফজলুল হক আর শেখ মুজিবুর রহমান এই কাজটি করতে পেরেছিলেন বাংলার রাজনীতিতে। পূর্ব বাংলার মানুষের হৃদয়ের এত কাছের মানুষ বলেই হয়তো ফজলুল হকের একাশি বছর বয়সেও ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বড় নির্বাচনে তাকে কেন্দ্রে রেখেই সবাই আবর্তিত হয়েছিল! বাংলার রাজনীতিবিদদের সেই ধারণা একেবারে মিছে ছিল না। নির্বাচনের ফলাফলই সেই ইতিহাসের স্মারক হয়ে আছে। বাংলার রাজনীতিতে ফজলুল হকের পরবর্তী বা তারও পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানেরা যে প্রবেশ করতে পেরেছিল তার পথটি তৈরি করেছিলেন ফজলুল হক। ক্রমে বাংলার রাজনীতিতে আবুল কাশিমের প্রয়োজনায় এই ধারাটিই প্রধান হয়ে উঠেছিল এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

পরিশেষে বলতে পারি যে, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতায় শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম

শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক এর কর্ম ও রাজনীতি জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন বাংলার কৃষকের মুক্তি আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নেতা। সর্বোপরি, ব্রিটিশ-ভারতে শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন একজন প্রথম সারির নেতা তথা কৃষি, কৃষক ও সাধারণ প্রজার রক্ষাকর্তা।



প্রবন্ধ

বয়স্ক পাঠকের সাহিত্য

সরকার মাসুদ

উনিশ নব্বই/ একানব্বই সালের কথা। ঢাকায় এসে গ্রাসাচ্ছাদনের মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করেছি। ভালো চাকরির স্বপ্ন মাথায় কিন্তু লেখক হিসেবেনিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনাটিই তীব্রতর। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প ও আলোচনামূলক গদ্য বেরোচ্ছে নানা পত্রিকায়। ওই সময় আমার পিতা একবার ঢাকায় আসেন। আমি যে নিয়মিত লেখালেখি করি এবং এই পথে নিজেকে শক্তভাবেদাঁড় করাতে চাই- এটা তিনি জানতেন। আমার কিছু লেখা, ততদিনে তিনি পড়েও ফেলেছিলেন। একদিন, মধ্যাহ্নভোজের পর, আমাকে বললেন, 'দ্যাখ রে বাবা। তোর যে বয়স সে হিসেবে তুই খারাপ লিখিস না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস, বয়স্ক পাঠকের সাহিত্য রচনা করতে না পারলে কোনো লাভ হবেনা।'

সেই থেকে ওই 'বয়স্ক পাঠকের সাহিত্য' কথাটা আমার কানে লেগে আছে। প্রধানত, তিনটি কারণে পিতার ওই পরামর্শকে শিরোধার্য করেছিলাম। ১. আমার পিতা সে আমলের কলেজে-পড়া মানুষ যখন এমনকি ম্যাট্রিক পরীক্ষার সার্টিফিকেটে সবাই মোটামুটি সম্মানজনক সরকারি চাকরি জুটত।

২. ইংরেজি ভাষাটা তিনি ভালোই জানতেন এবং দেশি-বিদেশি সাহিত্য (বিশেষ করে উপন্যাস ও প্রবন্ধ) পড়তে দেখতাম তাকে। স্পষ্ট মনে আছে, তারাশঙ্করের 'গণদেবতা,' বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি,' সমরেশ বসুর 'বাঘিনী, আলাউদ্দীন আল আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' এবং শামসুর রাহমানের 'বিধ্বস্ত নীলিমা' বইগুলো রাত জেগে তাকে পড়তে দেখেছি নিবিষ্ট মনে।

৩. সরকারি কোয়ার্টার্সে থাকতাম আমরা। বাসার আসবাবপত্র দরজা জানালাতেই তার উন্নত রুচির প্রকাশ লক্ষ করেছি আমি।

এখন বুঝতে পারি, পিতার সেই উপদেশ মান্য করে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইনি, বরঞ্চ উপকৃতই হয়েছি। শৈশব থেকেই আমার বই পড়ার অভ্যাস। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রূপকথা ও বিখ্যাত মানুষদের জীবন কাহিনিভিত্তিক অনেক বই এনে দিতেন বাবা। সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বইও আনতেন মাঝে মাঝে। অল্প কিছুদিনের ভেতর ওগুলো পড়ে শেষ করতাম আমি। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় একটা পদ্য লিখেছিলাম 'সকাল' নামে। সেটাই প্রথম প্রচেষ্টা। তারপর কলেজের দুই বছরে নিজ হাতে সেলাই করা সম্পূর্ণ সাদা পৃষ্ঠার একটা খাতা প্রায় ভরে ফেলেছিলাম পদ্য লিখে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আমার ওই পাঠাভ্যাস নেশায় পরিণত হলো। তারও বছর দশেক পর অনুধাবন করি, কেবল পড়লেই হবেনা, নবীন লেখক হিসেবে নিজেকে এগিয়ে নিতে হলে, 'বয়স্ক পাঠকের সাহিত্য' রচনা করতে হলে আমাকে বেশি করে পাঠ করতে হবেদেশ-বিদেশের সেই সমস্ত প্রবীণ লেখকের বইপত্র যারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কীর্তিমান। বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকগণ, আশা করি, বুঝতে পেরেছেন, 'বয়স্ক পাঠক' বলতে আমি এখানে নিছক বয়সের ভারে ক্লান্ত ব্যক্তিদের বোঝাচ্ছি না, বরং বলছি তাদের কথা যারা অল্প বয়স্ক থেকেই মানসম্পন্ন বইপুস্তক পড়ে রুচিকে উন্নত করেছেন এবং যাদের আছে গ্রন্থের ভালোমন্দ বিচারের সহজাত প্রতিভা। সেই শ্রদ্ধেয়জনদের রুচির উপযুক্ত সাহিত্য লেখার জন্য বড় রকম প্রস্তুতি প্রয়োজন। জীবন বৈচিত্র্যে ভরপুর। প্রতিটি মানুষের জীবনেই গল্প আছে। প্রত্যেকটি গল্পই কি সাহিত্যের উপযোগী? অজস্র চরিত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে

চারপাশে। তাদের মধ্যে অল্প কয়েকটিকে আমরা তুলে আনি গল্পে, উপন্যাসে। Skating and Other observations নামের একটি কাব্যগ্রন্থ পড়েছিলাম বহু আগে। সেই থেকে পর্যবেক্ষণ (ঙনঃবৎধঃরড়হ) বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিই। ভাবি, আমার জীবনাভিজ্ঞতার কোন কোন অংশ বেশি আলোকিত; জীবনের কোন ঘটনাগুলো আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে। লেখার আগে আমাকে ভাবতে হয় কোনগুলো নেবো, কোনগুলো বাদ দেবো। যেগুলো নেবো আমার রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি? যদি প্রত্যেকের ব্যবহার প্রয়োজনীয় মনে হয় তাহলে কোথা থেকে নেবো তাদের আর কী অর্থেই বা সেগুলো প্রযুক্ত হবে? বিষ্ণুদের একটি প্রবন্ধগ্রন্থ আছে। নাম 'রুচি ও প্রগতি।' বইটি আমি প্রথম পড়ি তিরিশ বছর আগে। এটা সেই অল্প কিছু বইয়ের একটি যেগুলোর নাম আমাকে খুবনাড়া দিয়েছে। বিশেষ করে ১প্রগতি' শব্দটির প্রয়োগ। সত্যিই তো, জীবনে সুরুচি অর্জন করতে না পারলে সুলিখিত সাহিত্যগ্রন্থও রচনা করা সম্ভবহয় না। সাহিত্যকের সাধনা, অতএব, সুরুচিও অর্জনের সাধনা।

পাঠকেরও কিছু চেষ্টা থাকা দরকার। দরকার খোঁজ-খবর রাখারও। গত একশ বছরের শিল্প-সাহিত্যের গতি প্রকৃতি বিষয়ে যদি মোটামুটি ধারণাও থাকে তাহলে আশা করা যায় সেই পাঠক নতুন ধাঁচের সাহিত্যকে কম-বেশি সমর্থন করবেন। তা নাহলে হবেকি, তিনি হয়তো শামসুর রাহমানের কবিতা পছন্দ করবেন, কিন্তু আবদুল মান্নান সৈয়দের বা মুস্তফা আনোয়ারের কবিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। ওয়ালীউল্লাহর 'লাল সালু' তার ভাল লাগবে অথচ একই লেখকের 'কাঁদো নদী কাঁদো'কে মনে হবেপাগলের প্রলাপ। জীবনের অন্য অনেক ক্ষেত্রে উন্নত রুচির স্বাক্ষর রেখেছেন এমন মানুষও আধুনিক কবিতা বা উপন্যাস না-ও পড়তে পারেন যদি তার সাহিত্যপাঠেরই অভ্যাস না থাকে। রুচির ব্যাপারটাও তাই বিচিত্র ও ভাবনাউদ্দীপক।

মানবজীবন স্বতস্ফূর্তভাবেই অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিক্ষিত মানুষের রুচি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়। অল্প বয়সের ভালো লাগা অসংখ্য গল্প-উপন্যাস বাতিল হয়ে যায় পরিণত বয়সে। কেননা আবেগ-উচ্ছাসের জায়গা তখন দখল করে নেয় মানসিক স্থিরতা ও বুদ্ধি-বিবেচনা। লেখকের পক্ষে নিজের লেখার অতটা বিরুদ্ধে যাওয়া খুবই কঠিন। লেখা লেখকের কাছে সন্তানের মতো। তা সত্তেও কেউ কেউ সেটা পেরেছেন বা পারেন। এই কেউ কেউ রা বিরল ব্যক্তি যারা তাদের অনুসন্ধানী পাঠাভ্যাস এবং তুলনামূলক বিচার বুদ্ধির জোরে তা করার সামর্থ্য রাখেন। আমি খেয়াল করে দেখেছি, অসংখ্য লেখকের পঁচিশ বছরের লেখার আর পঞ্চাশ বছরের লেখার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। আমার প্রজন্মেরও অনেকের মধ্যেই এমনটা দেখা গেছে। এদেরকে আমার সুইফট বর্ণিত লিলিপুটের মতো মনে হয় যারা। ছ'ইঞ্চির বেশি কিছুতেই বাড়ে না। এই লেখকরা অর্বাচীন আত্ম তৃপ্তিতে ভোগেন এবং আত্মতুষ্টির অদ্ভুত এক ঘেরাটোপে নিজেদের বয়স বাড়ান। অপর পক্ষে কম বয়সে রচিত লেখাকে কিংবা প্রাপ্ত বয়সেরও অনেক রচনাকে যারা মূল্যহীন জ্ঞান করেন এবং নিজের লেখাকে পরিবর্তিত ও ঋদ্ধ করতে চান, কিছুটা হয়তো করতে পারেনও তারাই উত্তর কালে শ্রদ্ধেয় বিবেচিত হন। সৃজনশীলতা চিরকাল প্রথম তাকে লালন করে। অনেকেই ষাটোর্ধ্ব বয়সে লিখতে পারলেই খুশি হন। কিন্তু লেখালেখিতে সচলতাই মুখ্য নয়। বিষয়বস্তু, ভাষা ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি, উপস্থাপনরীতি-অন্তত এর যে কোনো একটি ক্ষেত্রে সজীবসৃষ্টিশীলতার প্রয়োজন আছে এবং এই সবকিছুর সঙ্গেই প্রাগুক্ত 'রুচি ও প্রগতি বিষয়টি ওৎপ্রোতভাবেজড়িত। ভেবে দেখুন, আব্দুল আলীমের গান কিংবা জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবি বোঝার জন্য পান্ডিত্য না থাকলেও চলে। বিশেষণ নিরপেক্ষ মনের গুঢ় চৈতন্যস্তরে ওই বোধ জন্মে। কিন্তু রিলকের বা এলিয়টের কাব্য, কামুর কিংবা ওরহান পামুকের উপন্যাস, হাসান আজিজুল হকের গল্প ভালো লাগার জন্য চর্চিত রুচির বিকল্প নেই। পাঠকের ক্ষেত্রে রুচির পরিপক্কতা যেমন উন্নতমানের গ্রন্থ অনুধাবনের বড় এক শর্ত, তেমনি লেখকের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। মনে রাখা ভালো, বিশেষভাবেপ্রতিভাবান নবীন সাহিত্যকর্মীদের আমাদের নমস্য প্রত্যেক কবিও গদ্যকার তাদের জীবনের একটা বড় অধ্যায় অতিবাহিত করেছেন সজ্ঞান প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে এবং সুনামের শক্ত ভিত তৈরি হয়ে যাওয়ার পরেও তারা আত্মপ্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে; অসংখ্যবার আত্মসমালোচনা করেছেন নিজের নিভৃতে। আজ চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন-এই বয়সের লেখকদের বিরাট অংশের লেখা পড়ে মনে হয় এরা প্রত্যেকেই এক একটি বউন্না ফল। দেখতে অবিকল কদবেল, কিন্তু আসলে বউন্না ফল। আরও মনে হয়, জীবনের এতটা বছর এরা পার করেছেন। কখনো কি নিজেকে এই প্রশ্ন করেছেন, কেন এসবলিখছি, কিভাবেএ অবস্থার আশান্বিত উত্তরণ সম্ভব? মূল সমস্যা হলো মননের দারিদ্র। তাছাড়া কেউ যদি আত্মিক দুর্দশা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যান, তিনি কি করে নিজের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাবেন? বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও জটিল এ জন্য যে, এক্ষেত্রে শতকরা নব্বইজনই তাদের ত্রুটি দেখতে পান না অথবা এত কম দেখতে পান যে সেই দেখাটা শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে আসে না। এদের সিংহভাগই আবার নিজেদের 'কাজ'কে সমৃদ্ধ স্তরের মনে করেন, যদিও আসলে তা নয়। এ জাতীয় অন্ধতা আর যা-ই হোক বয়স্ক পাঠকের উন্নতমনের খোরাক জোগাতে পারে না। বয়স্ক পাঠকরা, আমরা জানি, সাধারণত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন। স্বভাবতই তারা সাহিত্যেও জীবনকে বস্তুনিষ্ঠভাবেচিত্রায়িত হতে দেখতে চান। এমনকি কবিতার মতো ইঙ্গিতধর, রহস্যমধুর সাহিত্য মাধ্যমেও তারা জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ভালোবাসেন। আবার পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে জীবনের নানামাত্রিক অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে তার গ্রন্থমূল্য উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাও কাজ করে পাঠকের মনে। লেখকের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পাঠকের বাস্তবতা জ্ঞান ও কল্পনা যখন এক বিন্দুতে মেলে তখন পাঠক বিস্মিত হয়ে বলেন, আরে তাইতো! জীবন তো এমনই! কিন্তু এটা আমার মাথায় আসেনি।

সাহিত্যরুচি মেধা, সৃষ্টিপ্রতিভা ও বয়সের সম্মিলিত অবদান। যৌবনকালেই যারা অগ্রসর চিন্তা ও লিখনরীতির পরিচয় রাখতে পারেন, পরিণত বয়সে তারাই তাদের সাহিত্যভাবনা ও রচনাপ্রযুক্তিকে সুদৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হন পাঠরুচি নির্ভর করে পাঠকের অর্জিত বিদ্যাবুদ্ধি, সহজাত অনুসন্ধিৎসা ও যাচাই প্রবণতার ওপর। একজন মানুষ কেমন পরিবেশে বেড়ে ওঠেন, তার আশপাশের লোকজন কি ধরনের বই পড়েন বা তাদের কথাবার্তা, আলাপের ধরণ কেমন; তার পাঠক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এসবের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতি জনপ্রিয় লেখকদের বইয়ের প্রতি এই-যে হাজার হাজার মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েন তার কারণ কি? তার প্রধান কারণ ওইসবমানুসের মনের বয়স না বাড়া। এ ধরনের মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারেন না। তাদের মাথায় এটা আসেই না যে, দু'চারজন লেখকের দ্বারা তারা আচ্ছন্ন তাদের বাইরেও লেখক আছেন এবং তাদের ভেতর অধিক শক্তিশালী লেখক থাকতেই পারেন। ফলে কি হয়? জনপ্রিয় লেখকরা তাদের হালুইকরসুলভ পুনরাবৃত্তির ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকেন এবং ওই পাঠকরাও রসগোল্লাসদৃশ রচনা খেতে থাকেন বছরের পর বছর। স্মর্তব্য, জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় প্রথমত জনশ্রুতি দ্বারা। জনশ্রুতি সেইসব পাঠককে সহজেই প্রভাবিত করতে পারে যাদের নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা চালিত হওয়ার ক্ষমতা নেই। এরা সব অপরের মুখে ঝাল খাওয়া বিভ্রান্ত পাঠক।

সচেতন পাঠকবৃন্দ অবশ্য বয়সে বয়সে একটু একটু করে তাদের সুরুচি নির্মাণ করেন। এই নির্মাণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মানুষের শুধু পাঠকসত্তা নয় বিচিত্র ব্যক্তিচরিত্রও প্রতিফলিত হয়। পাঠক তার পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা-না লাগার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। লেখকের বেলায় ব্যাপারটা অত সহজ ও সাবলীল নয়। কেননা তাকে অনেক কিছু ভাবতে হয়। তাকে লিখতে বসার আগে রচনার ভাব ও ভাষাশৈলীতে সুরুচিরক্ষা, পাঠকের বোধগম্যতা, গল্পের গ্রহণযোগ্যতা, নামকরণ এইসব সাত-পাঁচ চিন্তা করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, কমলকুমার, সন্দীপন বা শহীদুল জহিরের মতো ব্যতিক্রমী প্রতিভারা এসব হয়তো কমই ভেবেছেন। কিন্তু যারা প্রধানত ভাষার প্রযুক্তিবিদ নন, সেই লেখকদের উদ্বেগটা বেশি। বিশ্বায়ন ও কর্পোরেট বাণিজ্যের বর্তমান যুগে সাহিত্যকেও ষোলআনা পণ্য বানিয়ে ফেলা হয়েছে। হ্যাঁ, একটা উপন্যাস বা গল্পের বইও পণ্য যেহেতু তা বিক্রয়যোগ্য। কিন্তু লাক্স সাবান আর উপন্যাসের মধ্যকার পার্থক্য ভুলে গেলে চলবেনা। এ বড় পরিতাপের কথা যে, লেখকদের অধিকাংশই আজ এই পার্থক্যের কথা মাথায় রাখেন না। সাহিত্য যে কেবল চারপাশের পরিবেশ, মানবমনের আলো-ছায়া বা দেশ বাস্তবতা বুঝবার ও বোঝাবার মাধ্যম নয়, তা উন্নত জাতের বিনোদনও বটে এটা তাদের মাথায় কেউ ঢুকিয়ে দিতে পারবেনা, যদি নিজেরাই না বোঝেন। সারা বছর দৈনিকের-মাসিকের পাতায় সাহিত্যনামধারী যেসববস্তু ছাপা হয় সেগুলোর ক'টি প্রকৃত সাহিত্য? এমনকি লিটল ম্যাগাজিন নামে যেসবকাগজ বেরুচ্ছে, দু'চারটা ছাড়া সেগুলো আর পাঠযোগ্য নয় আজ। এমন হওয়াই স্বাভাবিক, যেহেতু এখন সাহিত্য সম্পাদক নেই বা আছে মাত্র দু'চারজন এবং লেখকরা দ্রুত খ্যাতিপ্রত্যাশী। কিভাবে বয়স্ক পাঠকের সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব, কি উপায়ে সমৃদ্ধ করা যাবে লেখক-ইমেজ সেদিকে তাদের মনোযোগ নেই।



প্রবন্ধ

বাংলাদেশের ঈদ উৎসব

জোবায়ের আলী জুয়েল

মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হচ্ছে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। সারা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত জাঁকজমক ও ধুমধামের সঙ্গে এই ধর্মীয় দিবস দুটি পালিত হতে দেখা যায়। ঈদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম ঈদ পালিত হয় দ্বিতীয় হিজরির ০১ শাওয়াল মোতাবেক ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ মদিনায়। আর মক্কায় প্রথম ঈদ পালিত হয় অষ্টম হিজরি মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর প্রায় ১১ দিন পর। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবেইসলাম প্রচার শুরু হয় ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ। বাংলাদেশে প্রথম কোথায় ঈদ পালিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ধারণা করা যায় সন্দীপ অঞ্চলে প্রথম ঈদের জামায়াত হয়েছিল। ঢাকায় সম্ভবত প্রথম ঈদ উদযাপিত হয় সুলতানি আমলে (১৩০০-১৫৩৮ খ্রি.) মোটামুটি দুইশত বছরের বেশি সময়ে নগর কেন্দ্রিক ঈদ উৎসবের কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে এখন যেভাবে ঈদ উৎসব পালিত হচ্ছে, একশ' বছর আগেও কি এভাবে হতো? সাধারণ মানুষ কি আজকের মতো অধীর আগ্রহ, উৎসাহ নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন ঈদের চাঁদের দিকে? ঈদের ধুমধামের দিকে? ইতিহাস বলে 'না'। তবে সে আমলে কীভাবে বাংলাদেশে ঈদ উৎসব পালিত হতো।

আমাদের সবারই স্মরণ রাখতে হবে বিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা মেলে না। জ্ঞান আহরণের উৎসই জিজ্ঞাসা। রাসুল (সা.) বলেছেন "জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীনেও যাও। সুতরাং এই প্রবন্ধে বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কারও ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আঘাত দেওয়ার জন্য আমার এ লেখা নয়। প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার জন্য আমার এই অবগাহন। আমি একজন মুসলমান হয়ে নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করি।

রমজান মাস মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র মাস এবং কোরআনে একমাত্র এ মাসের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ মাসেই নাজিল হয়েছে কোরআন শরিফ। প্রথম ওহি পেয়েছিলেন

মুহম্মদ রাসূল (সা.)। গিয়েছিলেন তিনি মেরাজে। মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার আগে রমজানের সঙ্গে পরিচয় ছিল না মুসলমানদের। এর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল হিজরতের পরেই। রমজান শব্দটি আরবি 'রমজ' ধাতু থেকে আগত। রমজান মানে দাহ, তাপ বা পোড়ানো। চন্দ্রবর্ষই নিয়ন্ত্রিত করে মুসলমানদের উৎসব। অনেক আগে প্রাচীনকালে গরমের মৌসুমে এই মাস পড়ত বলে এর নাম হয় রমজান। রমজানের সঙ্গে উপবাসের প্রতি শব্দের ধ্বনিগত কোনো মিল নেই। উপবাসের আরবিনাম হচ্ছে "স ও ম"। এর অর্থের সঙ্গে উপবাস ব্রতের কোনো মিল নেই। এর আভিধানিক অর্থই হলো আরাম বা বিশ্রামে থাকা। রমজান শেষে ঈদুল ফেতর। ঈদের অর্থ হলো উৎসব এবং আভিধানিক অর্থ হলো বার বার ফিরে আসা। ঈদ শব্দটি মূলত সিরিয়ার। ঈদ শব্দটির আদি অর্থ ও তার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম নিরীক্ষণ করে দেখে মনে হয় হয়তো এককালে এ ধরনের এক সামাজিক উৎসবের সঙ্গে পরিচিত ছিল সিরিয়ার দামেস্কের জনগোষ্ঠীর অধিবাসীরা। হয়তো সিরিয়ার দামেস্কের কৃষিজ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল এই আজকের ঈদ উৎসব এবং তাদের কাছ থেকেই আচার-অনুষ্ঠান জ্ঞাপক শব্দের মতোই আরবরা আমদানি করেছেন বর্তমান এই ঈদ উৎসব ও তার প্রকৃতিকে। ঈদ উৎসব মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস বিশ্লেষণ করলে আমাদের মনে রাখতে হবে এদেশে মুসলমানরা ছিল বহিরাগত। কারণ যেভাবে অতীতে পালিত হতো এই ঈদ উৎসব তাতে লোকায়ত বিশ্বাস আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে হিন্দু রীতিনীতি প্রভাবই ছিল বেশি।

ইসলাম প্রচারের শুরুতে অর্থাৎ আদি বাঙালি মুসলমানরা কীভাবে ঈদ উৎসব পালন করতো তা রীতিমতো গবেষণার বস্তু। তবে বলা যেতে পারে আদিতে প্রচার করা আরবের উদযাপিত ঈদের আদি রূপই হয়তো তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু কালের গর্ভে সময়ের বিবর্তনে সে রূপ চিরতরে হারিয়ে গেছে। কখনো ধর্ম নেতারা মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তাদের নিজের গড়া নতুন অনুষ্ঠান। কখনো শাসক শ্রেণির নির্দেশে যুক্ত হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম। কখনো বা লৌকিক ধর্মের প্রভাব এসেছে লৌকিক আচার অনুষ্ঠান নিয়ে। সেজন্য আবারও বলতে হয় বাংলাদেশে যেভাবে ঈদ উৎসব পালিত হচ্ছে তাতে সেখানে প্রভাব ফেলেছে কৃষিজীবী মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস। হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি প্রভাবিত করেছে আপামর এই বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীকে।

উৎসব হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ শতবর্ষ আগে ঈদের দিনটি কীভাবে পালন করতেন সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আর্থ সামাজিক পটভূমিতে মানুষের মনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফলে। এখানে পুরানো আমল বলতে আমরা আশি-নব্বই বছরের বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরতে চাই। শতবর্ষ আগে সাহিত্য, সংবাদ সাময়িকী পত্রে ঈদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিবরণ আমরা পাইনি। এ দেশের হিন্দু, মুসলমান যিনিই আত্মজীবনী লিখে গেছেন তাদের রচনায় আমরা দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, মহররম এমন কি রথযাত্রা, দোল পূর্ণিমা, দিপালী উৎসব এরূপ বিভিন্ন পূজা-পার্বণ সম্পর্কে বিস্তর উল্লেখ দেখতে পাই। শুধু পাওয়া যায়না ঈদুল ফিতর সম্পর্কে। তবে একালে যারা জন্মেছেন তাদের বিবরণীতে কচিৎ ঈদুল ফিতর সম্পর্কে খানিকটা তথ্য পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় ঈদুল ফিতরের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসব শতবর্ষ আগেও বাঙালির ঘরে ঘরে আজিকার মতো অনাবিল হাসি, আনন্দের বার্তা বয়ে আনতে পারেনি। এ থেকে যদি আমরা বলি ঈদুল ফিতর সেকালে বাংলাদেশে তেমন কোনো বড় উৎসব হিসেবে পালন হয়নি তবে কি তা ভুল বলা হবে? মনে হয় নিশ্চয়ই না। আজ আমরা যে ঈদের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি, বাঙালির ঈদকে দেখি একটা সামাজিক ধর্মীয় বড় উৎসব হিসেবে তা কিন্তু সত্তর-আশি বছরের ঐতিহ্য মাত্র। বর্তমানে গ্রাম বাংলায় রোজা ও ঈদ যেভাবে পালিত হচ্ছে তা কিন্তু সে আমলে নব্বই বছর আগেও অবশ্যই মোটেই এভাবে পালিত হতো না। ব্রিটিশ আমলে যে উৎসব সবচেয়ে ধুমধামের সঙ্গে এ বাংলায় প্রচলিত ছিল এবং ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে সবচেয়ে বেশি ছুটি বরাদ্দ ছিল তা হলো খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের "ক্রিসমাস ডে"। ব্রিটিশ আমলে বিদ্যার দিক থেকে মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে হিন্দুদের থেকে ছিল অনেক পিছিয়ে। ফলে "ক্রিসমাসের" পরেই সরকারিভাবে তো বটেই সম্প্রদায়গত আধিপত্য এবং ঐতিহ্যের কারণে এই অঞ্চলে হিন্দুদের "দুর্গাপূজা" হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়, জমকালো এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। অফিস আদালতে ইংরেজ আমলে সরকারি ছুটির পরিমাণ ঈদের থেকেও পূজার জন্যে ছিল অনেক বেশি। সে আমলে সরকারি নথি পত্রে ও পূজা সম্পর্কে আছে পর্যাপ্ত তথ্যাদি।

শাসক ইংরেজরা স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের ঈদকে গুরুত্ব দেয়নি। এজন্য সরকারি ছুটির বরাদ্দ ছিল কম। তাছাড়া মুসলমানদের পক্ষে ঈদকে সে আমলে উৎসবে পরিণত করা সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে। কারণ গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মুসলমান ছিল বিত্তহীন ও নিরক্ষর। বরং মুসলমানের মহররমের বিশেষ করে তাজিয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় বিস্তর জায়গায় ও সংবাদপত্রে। এটি সে সময় ঢাকায় বেশ জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে পালিত হতো। ঢাকার হোসেনি দালান ছিল শিয়া সম্প্রদায়ের মহররমের পুণ্যভূমি। মুসলমানদের উৎসবের শ্রেষ্ঠ প্রাণকেন্দ্র নবাবী আমল থেকেই পৃষ্ঠপোষকতা ছিল এর পেছনে। ঈদ মুসলমানদের প্রধান উৎসব হিসেবে পালিত না হওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ ছিল বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা। ফরায়েজী আন্দোলনের আগে (১৮১৮ খ্রি.) গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের কোনো ধারণা ছিল না বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে। ইসলাম ধর্মে লোকজ উপাদানের আধিপত্য ছিল প্রায় ক্ষেত্রেই হিন্দু রীতিনীতির ওপর। ১৮৮৫ সালে জেমস ওয়াইজ তার "Notes on the Races castos and trades Eastern Bengal London" বইতে লিখেছেন-

"বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সরল অজ্ঞ কৃষক। ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ঈদের দিনে গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়েছেন ঈদের নামাজ পড়বেন বলে, কিন্তু সে সময়ে দুর্ভাগ্য এই যে, জামাতের একজনও জানতেন না কীভাবে ঈদের নামাজ পড়তে হয়। পরবর্তীতে ঢাকায় নৌকা যোগে এক যুবক যাচ্ছিলেন তাকেই ধরে নিয়ে এসে পড়ানো হয়েছিল ঈদের নামাজ"। ঐতিহাসিক মুনতাসির মামুন উল্লেখ করেছেন তাঁর পিতার সহকর্মী যিনি ছিলেন সে আমলে একজন নামজাদা পীর, তাঁকে বলেছিলেন "মুসলমান ছিলাম বটে [তার জন্ম ১৮৯৮ সালে] কিন্তু ছেলেবেলায় রোজা বা ঈদ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। মসজিদ ছিল হয়তো কয়েক গ্রাম মিলে একটি। সে সময় বাংলা "মাসিক সঞ্জীবনী" পত্রিকার সম্পাদক (কৃষ্ণ কুমার মিত্র) লিখেছিলেন [উনিশ শতকের মাঝামাঝি ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন] "সে সময় মুসলমানরা নামাজ পড়িত না। গ্রামে কোনো মসজিদ ছিল না। স্থানে স্থানে দরগা ছিল। মুসলমানরা তহবন্দ বা লুঙ্গি পরিত না। কাছা কোঁচা দিয়া ধুতি পরিধান করিত। তাহাদের অনেকের নাম ছিল যেমন, গোপাল, ঈশান, ধীরেন ইত্যাদি। মুসলমানরা সেই সময় দুর্গা, কালী, মনসা প্রভৃতি পূজার ভোগের জন্য কুমড়া, কলা, মানকচু ও বলির জন্য পাঁঠা দিতো। তাহাদের দর্গায় গরু প্রভৃতি জন্তুর মূর্তি রাখা হইতো। মাদার বাঁশের খেলা হইতো (অধুনালুপ্ত পাক-ভারতের বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক সূফী সাধক হযরত বদীউদ্দীন শাহ-ই-মাদার)।

বাঁশের উপর লম্বা চুল বাঁধিয়া হিন্দু-মুসলমান সবাই দল বাঁধিয়া বাড়িতে বাড়িতে চাল সংগ্রহ করিত। দর্গাতে শিরনী দিতো। মানত করিতো। মুসলমানরাই বলির জন্য হাঁস দিতো। মুসলমানরা সেকালে কালী পূজার জন্য পাঁঠা বলি দিতো। দুর্গা পূজার জন্য ডিম দিতো।

আবুল মনসুর আহমেদ তাঁর আত্মজীবনীতে আরও লিখেছেন "উনিশ শতকের শেষার্ধেও সে সময় নামাজ রোজা চালু ছিল না। তাদের গ্রামাঞ্চলে ছিল না কোনো মসজিদ। তরুণদের তো কথাই নেই। বয়স্করাও সকলে রোজা রাখতেন না। দিনের বেলা তারা তামাক ও পানি খেতো। শুধু ভাত খাওয়া থেকে বিরত থাকত। পানি ও তামাক খাওয়াতে রোজা নষ্ট হতো না। এই বিশ্বাস ছিল তখন তাদের মনে। রোজার মাসে মাঠে যাওয়ার সময় একটা বাঁশের চোঙ্গা রোজাদাররা সঙ্গে রাখতেন। পানি বা তামাক খাওয়ার শখ হলে এই চোঙ্গার খোলা মুখে মুখ লাগিয়ে খুব জোরে দম ছাড়া হতো। মুখ তোলার সঙ্গে সঙ্গে খুবতাড়াতাড়ি গামছা, নেকড়া বা পাটের টিপলা দিয়ে চোঙ্গার মুখ কষে বন্ধ করা হতো, যাতে বাতাস বের হয়ে আসতে না পারে। তারপর আবশ্যক মতো পানি ও তামাক পান করে চোঙ্গাটা আবার মুখের কাছে ধরা হতো। খুব ক্ষিপ্র হাতে চোঙ্গার টিপলাটা খুলে মুখ লাগিয়ে চুষে চোঙ্গায় বন্ধ রোজা মুখে আনা হতো এবং ঢোক গিলে একেবারে পেটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হতো। খুব ধার্মিক ভালো মানুষ দু'একজন এমন করাটা পছন্দ করতেন না বটে কিন্তু সাধারণভাবে সে সময় এটাই চালু ছিল।"

"তাবাকাৎ-ই-নাসিরি"র লেখক ঐতিহাসিক মিনহাজ উস-সিরাজ সেকালের ঈদ উৎসব সম্পর্কে জানিয়েছেন, "বাদশাহ ধর্মীয় আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন, ঈদের নামাজ পড়ানোর জন্য নিয়োগ করতেন ধর্মীয় ইমাম। শহরের বাইরে উন্মুক্ত জায়গায় অথবা গ্রামে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হতো এবং এসব স্থানকেই ঈদগাহ নামে অভিহিত করা হতো।"

আগেই বলা হয়েছে ঈদ সম্পর্কে আমরা সেকালে যে বিবরণ পাই তা থেকে ধরে নেয়া যায় রমজান মাস থেকেই শুরু হতো ঈদের প্রস্তুতি। এ উৎসব শুরু হতো রমজানের চাঁদ দেখা থেকে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না।

আবুল মনসুর আহমেদ সেকালে ঈদের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে আরও বলেছেন, "এই অঞ্চলে কোনো মসজিদ বা জুমার ঘর ছিল না। বৎসরে দুইবার ঈদের জামায়াত হইতো বটে কিন্তু তাতে বড়রাই শামিল হইতো। তাই জামায়াতে খুবঅল্প লোকই দেখা যাইতো। সাধ্যমতো নতুন কাপড়-চোপড় পরিয়া লোকেরা বেদম গান-বাজনা করিতো। সারারাত ঢোলের আওয়াজ পাওয়া যাইতো। প্রায়ই বাড়ি বাড়ি ঢোল ডাগর দেখা যাইতো। ঈদের জামায়াতেও লোকেরা কাছা, ধুতি পরিয়াই যাইতো। নামাজের সময় কাছা খুলিতেই হইতো। সে কাজটাও তাহারা নামাজে দাঁড়াইবার আগেতক করিত না। প্রথম প্রথম নামাজের কাতারে বসিবার পর অন্যের অগোচরে চুপি চুপি কাছা খুলিয়া নামাজ শেষ করিয়া কাতার হইতে উঠিবার আগেই আবার কাছা দিয়া ফেলিত"।

অজ্ঞতা ও কুসংস্কার তখন বাঙালি মুসলমান সমাজকে নিদারুণভাবেগ্রাস করে। তারা সহজ সরল ইসলাম ভুলে গিয়ে রমজানে ও ঈদ উৎসবের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বহু কুপ্রথা, অন্ধবিশ্বাস, ইসলামবিরোধী আচার-অনুষ্ঠানে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে সময় সত্যিকারের ইসলাম হারিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপে লিপ্ত থেকে অন্ধকারের অতল তলে হারিয়ে যায়। তখনকার মুসলমানদের সমাজে এই অধঃপতন দেখে সে সময়ে ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রি.) স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। জেমস ওয়াইজ আরও লিখেছেন দীর্ঘকাল হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকার ফলে ঈদ উৎসবের ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের মতো যেসবকুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস প্রবেশ করে তার বিরুদ্ধে হাজী শরীয়তুল্লাহ সর্বপ্রথম আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি ইসলাম ধর্মের বহু দেব-দেবী, ভ্রান্ত অলীক বিশ্বাসও পাপপূর্ণ নতুন প্রথাগুলোর উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন করেন। এভাবেহাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘকাল যাবৎ পূর্ব বঙ্গের মুসলমান সমাজ থেকে বহু অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করেন।

এবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক। সেকালে ঢাকায় রমজানের চাঁদ দেখার জন্য বিকাল থেকেই বড় কাটরা, আহসান মঞ্জিল, হোসেনি দালানের ছাদে ভিড় জমে উঠত। চাঁদ দেখা মাত্রই পরস্পর সালাম বিনিময় এবং সেই সঙ্গে গোলাবাজি ও তোপের আওয়াজ সারা ঢাকা শহর প্রকম্পিত ও মুখরিত হয়ে উঠতো। ঢাকার রমজান ও ঈদের বড় আকর্ষণ ছিল রকমারি খাবার। রোজায় ঘরে পর্যাপ্ত ইফতারি থাকা সত্ত্বেও সবাই একবার 'চকে' ছুটে যেতেন। চকবাজার সেই মোগল আমল থেকেই তার ঈদের আভিজাত্য বজায় রেখেছে। চকবাজার সেই আমল থেকেই ব্যবসা, বাণিজ্য ও খাবার দাবার এবং আড্ডার মুখ্য কেন্দ্রস্থল ছিল। 'চকে' সে আমলের রকমারি ইফতারি খাবারের মধ্যে বিখ্যাত ছিল শিরমাল, বাখরখানি রুটি, চাপাতি, নানরুটি, কাকচা, নান খাদাই, শিককাবাব, হান্ডি কাবাবমাছ ও মাংসের কোপ্তা, সামী কাবাব, টিকিয়া কাবাব, পরোটা, বোগদাদী রুটি, শরবতী রুটি ও মোরগ কাবাব, ফালুদার শরবত, জাফরান শরবত, বেলের শরবত ও নানা রকম ফল। 'চক' এখনও রোজার সময় প্রায় সেই পুরনো ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছে। ঢাকার তোরাবন্দি খাবারও ছিল ঈদ উৎসবে বিখ্যাত। বিশেষ উৎসবে এর কদর ছিল অভাবনীয়। এই খাবারে থাকতো চার প্রকারের রুটি, চার রকমের পোলাও, চার রকমের নানরুটি, চার প্রকারের কাবাব, পনির, বিরিয়ানি, চাটনি অর্থাৎ প্রত্যেক পদের খাবার চার প্রকারের মোট চব্বিশ পদের নিচে খাবার থাকত না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আশি-নব্বই বছর আগেও ঈদুর ফিতর বাংলাদেশে কোনো ধর্মীয় উৎসবহিসেবে পালিত হয়নি একথা নিঃশংসয়ে বলা যেতে পারে।

মোগল আমলে ঈদের দিন যে হৈ চৈ ও বর্ণাঢ্য আনন্দ উৎসব পালিত হতো তা বহিরাগত উচ্চ পদধারী বা ধনাঢ্য মুসলমানদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। এসবের সঙ্গে সাধারণ গ্রাম বাংলার মানুষের ছিল যোজনব্যাপী ব্যবধান। আর সে আমলে ধনাঢ্য মুসলমান ব্যক্তিরা পথে প্রচুর পরিমাণ টাকা কড়ি ছড়িয়ে দিতেন, গরিবদের কাছে কিছু দান-খয়রাতও করতেন এমন তথ্য সে আমলে বিদ্যমান রয়েছে। মোগলরা যে ঈদকে গুরুত্ব দিতেন তা বোঝা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় শাহী ঈদগাহের ধ্বংসাবশেষ দেখে। এ রকম একটি ঈদগাহ এখনো বিদ্যমান রয়েছে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায়, শাহ সুজা যখন বাংলার সুবাদার তখন তার প্রধান আমাত্য মীর আবুল কাসেম ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন এই ঈদগাহটি। সুবাদার, নাজিম ও অন্যান্য মোগল কর্মকর্তারা নামাজ পড়তেন এখানে। তবেএ কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবেমোগল আমলে ঈদের দিন ঈদগাহে যেতেন শুধু মোগলরাই। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্থান সেখানে কখনোই ছিল না। মুষ্টিমেয় মোগল আমাত্য ও কয়েকজন ধনী মানুষ পড়তো সেখানে ঈদের নামাজ।

এ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশকের গ্রামাঞ্চলে ঈদ পালনের কয়েকটি বর্ণনা পাই খন্দকার আবু তালিবের নিবন্ধ থেকে "রোজার পনেরো দিন যাওয়ার পর হতেই গৃহবধূরা নানা রকম নকশি পিঠা তৈরি করতে আরম্ভ করতো। এদের মধ্যে ফুল পিঠা, পাপর পিঠা, ঝুরি, হাতে টেপা সেমাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শবেকদরের রাতে মেয়েরা মেহেদী এনে তা বেটে হাতে নানা রকম চিত্র আঁকতো। ফুল পিঠা তৈরি করার সময় বউয়েরা 'প্রিয় স্বামী', আর অবিবাহিত মেয়েরা 'বিবাহ' ও 'প্রজাপতি' এঁকে রাখতো। ঈদের দিনে যুবক-যুবতী বন্ধু-বান্ধবীদের পাতে দেয়ার জন্যেই এ ধরনের ফুল পিঠা তৈরি করা হতো"।

সেকালের বাংলার রোজা ও ঈদ একালে এখন অবশ্যই ভিন্নতর রূপ পেয়েছে। বছর ঘুরে আসে, গ্রামে রোজা, রমজান মাস, গ্রামবাংলার মানুষের কাছে পরম বিশ্বাস চাঁদ দেখে রোজা শুরু, চাঁদ ওঠা দেখে রোজার শেষ। চাঁদই তাদের লক্ষ্যস্থল। রমজানের ঈদে চাঁদ দেখার জন্য একালে পাড়ায় পাড়ায় ধুম পড়ে যায়। পবিত্র ঈদের চাঁদ দেখে তারা সালাম করে। সালাম করে বাড়ির গুরুজনদের। কখনো বা বাজি ফোটায়। বন্দুক মেরে দশ গ্রামের লোককে জানিয়ে দেয়। রাতে আতশবাজি ও আলোকমালায় সজ্জিত করে আবাসগৃহ, সাইরেন বাজায়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ধুম পড়ে যায় রোজা রাখার জন্য। বিশেষত ভোররাতে সেহেরি খাওয়ার সময় তাদের ঘুম থেকে না ডাকলে ভীষণ কুরুক্ষেত্র বেঁধে যায় পরদিন। রোজা থাকতে দাও আর না দাও অন্তত শেষ রাতে উঠে সবার সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেহেরি খায়। এতে অনাবিল আনন্দ ফুর্তি ও প্রতিযোগিতা চলে কে বেশি রোজা রাখতে পারে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগেও আমরা গ্রাম বাংলার এরূপ স্বচক্ষে রমজান মাসে দেখেছি। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ আগেও যেমন বঞ্চিত ছিলেন ঈদের আনন্দ থেকে এখনো বঞ্চিত আছেন তদ্রুপ, প্রতিনিয়ত, মোগল আমলের ইতিহাসে আমরা দেখেছি বিত্তবানরা ঈদের দিন ছুড়ে দিচ্ছেন রেজগি পয়সা আর সাধারণ, নিরন্ন, বঞ্চিত মানুষ তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন কাড়াকাড়ি করে। এখনো তার এ আমলে কোনো হেরফের হয়নি বরং বঞ্চনা আরও বেড়েছে। আমরা চোখের সামনে দেখেছি বাংলাদেশে ধনীর গৃহে যাকাতের কাপড় নেওয়ার জন্য ছিন্ন মূল মানুষের হুটোপুটি লাইন তা আমাদের হতভাগ্য, বঞ্চিত, দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের চেহারাই তুলে ধরে। সুতরাং ঈদুল ফিতরের আনন্দ সাধারণ মানুষের মনে আজ আর কোনোই রেখাপাত করে না। ঈদুর ফিতরের জামায়াত এর আগে থেকেই বিত্তবানদের ফেতরার অর্থ ও সাহায্য নেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় শত শত ছিন্নমূল মানুষদের। উৎসব সর্বাঙ্গীণ আনন্দময়, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে তখনই যখন আসে বিত্ত বণ্ঠনের সামঞ্জস্য। তা না হলে ধর্মীয় উৎসব(ঈদুর ফিতর) মূল আবেদন হ্রাস পায়।

ফরায়েজী আন্দোলন এবং পরবর্তী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনসমূহ পাল্টে দিতে পেরেছিল বাংলাদেশের এই মুসলমানদের মনমানসিকতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও লৌকিক, স্থানীয় উপদানসমূহ বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছে ঈদের সঙ্গে। অনেকগুলো এসেছে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন উৎসবও লোকাচার থেকে।

এই শতকের শুরু থেকেই যখন রাজনৈতিকভাবে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখন থেকেই গুরুত্ব পেয়েছে ঈদ। বাংলাদেশের দুটি ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা) জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। এদেশে স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে ঈদ এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে আগের অজ্ঞতাও তেমন নেই এখনকার মুসলমানদের মধ্যে। ফলে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম প্রধান দেশে ঈদ এখন নিজের গৌরবোজ্জ্বল, ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান করে নিয়েছে এবং আমাদের বাংলাদেশেও তা বিরাট গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে। মুসলমানদের ধর্মীয় তামুদ্দনিক জাগ্রত্য করেছে এই ঈদুল ফিতর, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সবাইকে ঈদ মোবারক। কবির ভাষায় বলতে গেলে-

"এসো মুসলিম তসলিম নাও,
নাও এ তোহফা বেহেশতের
তশতরী ভরে শীরনি বিলাও
নির্মল ইনসানিয়াতের।"



মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের মূল কেন্দ্র ভূমি

মোহাম্মাদ নজাবত আলী

বাঙালি জাতি হাজার বছর পরাধীন ছিল। কিন্তু একটি সংগ্রামী জাতি হিসেবেও বাঙালি বিশ্বে সুপরিচিত। যুগ যুগ ধরে কারও অধীনে মাথা নত করে থাকা বাঙালির স্বভাব নয়। তাই স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালি জাতি নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে। সেই তিতুমীর-খুদিরাম থেকে শেখ মুজিব পর্যন্ত আমাদের গর্ব ও বাঙালি সংগ্রামী ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এসবই বাঙালির দেশ প্রেমের এক গৌরবময় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন বাঙালি জাতির স্বাধীনতার মহানায়ক। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিলেন তার প্রবাদ পুরুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। তাই একাত্তরের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষাধিক জনতার সামনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি বাংলার স্বাধীনতার জন্য ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালির স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য ২৫ মার্চ রাতে রক্তের হোলি খেলায় মেতে ওঠে। ২৫ মার্চের সে ভয়াল রাতে পাক বাহিনী পিলখানা রোড, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন হলগুলোসহ পুরো ঢাকা নগরীতে ইতিহাসের এক বর্বরোচিত গণহত্যা চালায়। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ মধ্যে রাতে বাঙালির হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। গোটা বাংলাদেশ ছিল অবরুদ্ধ ও যুদ্ধের ময়দান। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। আর ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল সে প্রাচীন জেলারই আর এক আম্রকাননে জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমান জেলা) বৈদ্যনাথতলা নামে একটি গ্রামের নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। কী অভাবনীয় পরিকল্পনা অন্য কোনো নাম কারও মাথায় আসেনি। এখানেও

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাফল্যেও বড় পরিচয় পাওয়া যায়। এ মুজিবনগরই ছিল যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাজধানী। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে সত্তর সালের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এ মুজিবনগর সরকার ১০ এপ্রিল গঠিত হলেও ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। নবগঠিত মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তবে তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় উপ-রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সেদিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রথমে সশস্ত্র বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। তারপর একে একে নেতারা মঞ্চে এসে বসলেন। জনাব আ. মান্নান শুরু করেন অনুষ্ঠানের সূচি। প্রথমে নতুন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক দলিল ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন দলের চিপ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির যে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ জন্ম নিল তার নাম হলো স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথা বারবার বললেন। তার প্রতিজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, আত্ম ও স্বার্থ ত্যাগ এবং বিরাট রাজনৈতিক জীবনের বর্ণনা দেন উপস্থিত জনতা ও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদিকের সামনে। তিনি বলেন, আজ এই আম্রকাননে একটি জাতির জন্ম নিল। বিগত বছর বাংলার মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিজস্ব নেতাদের নিয়ে এগোতে চেয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী তা হতে দিল না। ওরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। তাই আজ আমরা লড়াইয়ে নেমেছি। এই লড়াইয়ে জয় আমাদের অনিবার্য। আজ না জিতি কাল জিতব। কাল না জিতি পরশু জিতবই। পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলো তা চির দিন অম্লান ও অক্ষুণ্ন থাকবে। বিশ্বের মানচিত্র থেকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ব মুছে ফেলার শক্তি কারও নেই।

তাছাড়া মুজিবনগরের এ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য বিশ্বের সব দেশের প্রতি আহ্বান জানান। যার ফলশ্রুতিতে বিশেষ করে ভারত, রাশিয়ার সাহায্য-সহযোগিতায় এবং মুক্তিপাগল জনতার সশস্ত্র লড়াই অপরিমেয় দেশপ্রেম মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশে স্বাধীন হয়। এত কম সময়ে স্বাধীনতা অর্জন বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে স্বাধীনতার যাত্রা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলেন যার সফল পরিণতি ঘটান মুজিবনগর সরকার। প্রকৃতপক্ষে মুজিবনগর বাঙালি জাতি মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে বিশ্ব ইতিহাসে মুজিবনগর এখন বাঙালির তীর্থ ক্ষেত্র। সেই ১৯৪৭ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের জন্ম দেন। মূলত বাঙালি জাতির মুজিবকেই ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতা ও আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে বেছে নেয়। সেই মুজিবনগর এখন মুজিবনগর বা অস্থায়ী সরকার হচ্ছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কেন্দ্রভূমি। বাঙালির তীর্থক্ষেত্র। প্রতি বছর মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও সমাজের সর্বস্তরের জনগণ। নতুন প্রজন্মকে মুজিবনগর ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। ২৪ বছরের পাকিস্তানি সরকারের শাসন শোষণের ইতিহাস পাল্টে দিয়ে স্বাধীন সর্বভৌম একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে ২৪টি ত্রিভুজাকৃতির যে, দেয়াল রয়েছে যা ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন শোষণের এক জলন্ত প্রতীক হিসেবে বিরাজ করছে। এই দেয়ালগুলো বৃত্তাকারে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সু-উচ্চতায় স্থীর হয়েছে। মূলত মুজিবনগর সরকারই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আঁতুরঘর।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অস্থায়ী মুজিব নগর সরকারের গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অস্থায়ী মুজিবনগর ছিল যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের রাজধানী। সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে মুজিবনগর সরকারের সুদক্ষ পরিকল্পনায়। যেকোনো জনযুদ্ধকে পরিচালিত করে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার যেটা মুজিবনগর সরকারের ছিল। কেন না মুজিবনগর সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল তাজউদ্দীন আহমেদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তাজউদ্দীন আহমদের যথেষ্ট ভূমিকা ও গুরত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অথচ স্বাধীনতার ৫০ বছর পর ও তাকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ করি না।



যা হোক, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে অভাবে ১৮৫৭ সালের বাংলা সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। সে ক্ষেত্রে মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি দ্রুত ত্বরান্বিত হয় এবং মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশে জনগণের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা দেশপ্রেম এবং মুজিবনগর সরকারের সুদক্ষ নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনায় তা সম্ভব হয়। তাই ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারের সঠিক পরিকল্পনা ও সুযোগ্য নেতৃত্ব সর্বোপরি যুদ্ধ পরিচালনায় নানা কৌশল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাদের নাম ও অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।



নিবন্ধ

স্বাধীন বাংলাদেশে ইতিহাস বিমুখ হয়ে নতুন প্রজন্মের বেড়ে ওঠা

ওমর খালেদ রুমি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে যখন বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন তখনই বাংলাদেশ একটা অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। তারপর একের পর এক সামরিক শাসন, সংবিধানকে দুমড়ে-মুচড়ে অকার্যকর করে রাখা, এমন সব সংশোধনী আনা যা পরবর্তীতে পুরো জাতির ইজ্জত আর অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। জেলখানায় আটক অসহায় নিরপরাধ চার নেতাকে ঠান্ডা মাথায় হত্যার মধ্যদিয়ে যে রক্তের ঋণ তৈরি হয়েছে জাতি কি কোনোদিন তা শোধ করতে পারবে। এরকম একটা এলোমেলো পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে আমরা স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করে ফেললাম।

যারা যুদ্ধের পরপরই জন্মেছি তারাও আজ পঞ্চাশে উপনীত। মোটামুটি বলতে গেলে একটা প্রজন্ম তার জীবন ও যৌবনের মূল্যবান সময়টা এই স্বাধীন বাংলায় পার করে ফেলেছে। কিন্তু তাদের যৌবনের সেই সোনালি সময়ের একটা বিরাট সময় (অর্থাৎ ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০) এই ১৫টি বছর (যখন তাদের মানসিক ভিত্তিটা গড়ে উঠেছে) কেটেছে দু'জন সামরিক শাসকের সময়কালকে দেখে। একজন জিয়া যিনি চালাক, ধীর, স্থির, শান্ত, চৌকস আর অন্যজন তার অনুসারী এরশাদ যিনি রোমান্টিক, চপলমতি, আংশিক কবি, উন্নয়নকামী, আধুনিক, রাজনৈতিক দর্শনশূন্য চতুর মানুষ।

সবচেয়ে বড় কথা হলো- ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সময়কালটায় যা কিছু ঘটেছে তা যেমন একটা গণতন্ত্রমনা জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে তেমনি পুরো প্রজন্মটাকে একটা বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। এই সময়ে যারা বেড়ে উঠেছে তাদের কাছে রাজনীতিটা একটা তামাশা বই অন্যকিছু মনে হয়নি। এতে রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। অথচ পুরো পাকিস্তান সময়কালটাতে আমাদের পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, তাদের সততা, সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো ছিল গর্ব করার মতো।

কিন্তু দেখতে দেখতে চোখের সামনে থেকে ধানগুলো সরে গিয়ে চিটাগুলো ভেসে উঠল। তারা কর্তৃত্বও করল। সর্বনাশ করে দিয়ে গেল আমাদের শুদ্ধ জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনার সুস্থ ধারার। আমরা আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাসের সঠিক তথ্যগুলোতে এই প্রজন্মকে জানাতে ব্যর্থ হলাম। ফলাফল আর কিছু নয়। অস্তিত্বহীন একটা ইতিহাস বিমুখ প্রজন্ম আমাদের মাথার উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। আর এ সবনিয়ে যদি কেউ কথা বলে তো সে হচ্ছে পাগল, মাতাল, উন্মাদ। এই সবকারণেই অনেক সময় অনেক জাতিকে পরবর্তীতে উচ্চমূল্য পরিশোধ করতে হয়। খেসারত দিতে হয় অনেক বড় ধরনের। আর এর থেকে বেরোনোরও পথ থাকবেনা যদি না আমরা সময়মতো সচেতন না হই। তাহলে কি একথা বলব যে সময় ফুরিয়ে গেছে। হয়তো এখনো নয়। তবে ফুরিয়ে যাবে। কারণ সবকিছুরই একটা মেয়াদ থাকে। মেয়াদ ফুরিয়ে এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের এই প্রজন্মকে ইতিহাসের সঠিক জ্ঞানটা দিতে হবে। নইলে পরবর্তী প্রজন্মগুলোও ধীরে ধীরে এক ধরনের ইডিয়টে পরিণত হবে।

এখন কথা হচ্ছে এই দায়িত্ব কে বা কারা পালন করবে। সরকার? জনগণ? বুদ্ধিজীবী? আমলা? নাকি বিদেশ থেকে আসা কেউ? কে? কে হবেসেই মহান ত্রাণকর্তা যে জাতিকে অন্ধকার (যা দেখা যায় না) থেকে আলোতে নিয়ে আসবে।

সরকার যথেষ্ট করছে। তবে দায়িত্ব শুধু সরকারের একার নয়। আমাদেরও কাজ আছে। যে যার জায়গা থেকে প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে। নিজের ক্ষুদ্র অবস্থান, ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়েই এগিয়ে আসতে হবে। জানান দিতে হবে আমরা ঘুমিয়ে পড়িনি, জেগে আছি, ১৬ কোটি বাঙালির এই দেশ এত সহজে ফুরিয়ে যেতে পারে না। এর ইতিহাস এত সহজে ম্লান হওয়ার নয়।

মনে রাখতে হবেআমাদের রয়েছে রাজনৈতিক ত্যাগ আর মহিমার আদর্শ। জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। এই প্রজন্মকে সত্যিকারের ইতিহাসমুখী হতেই হবে।



নৃ গোষ্ঠী

গারো নৃ-গোষ্ঠীর কৃত্যমূলক প্রণয় উপাখ্যান

ড. হারুন রশীদ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রসীমায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গারো নৃ-গোষ্ঠী একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। প্রায় প্রতিটি নৃ-গোষ্ঠীর মতো এদেরও রয়েছে নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত স্বতন্ত্র পরিচয়। এ ছাড়া রয়েছে লোকজ সংস্কার, উপকথা, লোককথা, কৃত্যমূলক গীত ও গেয় আখ্যানপালার সুবিশাল সম্ভার। কিন্তু অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর মতো এই নৃ-গোষ্ঠীরও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সামগ্রিক রূপটি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ বাঙালিদের নিকট অপরিজ্ঞাত থেকে গেছে। এর রয়েছে নানাবিধ কারণ। তবে বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমাদের অন্বিষ্ট গারোদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র, 'রে-রে নাট্যপালা'। এর আগে নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। নৃ-গোষ্ঠী সমূহের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সামগ্রিক রূপটি বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিদের নিকট অপরিচিত রয়ে গেছে। এর পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। বাংলাদেশের নৃ-গোষ্ঠী জনসাধারণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। এর পেছনেও সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। সুদূর অতীতকালে তারা যখন এ অঞ্চলে অভিবাসন শুরু করে তখন পূর্ববাসস্থলের ভৌগোলিক আবহের সঙ্গে যে অঞ্চলের মিল পেয়েছে সেখানেই তৈরি করেছে আবাসন। অর্থাৎ পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী তারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত

অঞ্চলে আবাস গড়ে তোলে। এর ফলে ভৌগোলিকভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিদের সঙ্গে এদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এভাবে মূল জনস্রোতের জীবন, সংস্কৃতি ও ভাষা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ক্রমেই তাদের দূরত্ব স্থায়ী হয়। অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর মতো টিবেটো-বার্মান ভাষা বৈশিষ্ট্যের[২] গারো নৃ-গোষ্ঠী গারো পাহাড় ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের সমতলভূমিতে আবাসন রচনা করে। এ অঞ্চলের দুর্গমতা বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গত কারণেই এ সব নৃ-গোষ্ঠীর একটি ভৌগোলিক দূরত্ব সৃষ্টি করে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনে নৃ-গোষ্ঠী নরনারী ও তাদের সংস্কৃতি ক্রমেই বৃহত্তর জনজীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া বাঙালিদের সঙ্গে নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা, রীতিনীতি, ধর্মীয় কৃত্যাদি, আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্য, সাংস্কৃতিক ও কৃষিপদ্ধতির কারণেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এ দূরত্ব শুধু বাঙালিদের সঙ্গেই নয়, নিজেদের সঙ্গে নিজেদেরও। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণ তাদের সংস্কারবদ্ধ রাখতে পছন্দ করে। শান্তিপ্রিয় গারো নৃ-গোষ্ঠীও এই সংস্কারের বাইরে নয়। সঙ্গত কারণেই বহির্জগতের সঙ্গে উভয় নৃ-গোষ্ঠীর একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া ভৌগোলিক পরিমণ্ডল অভিন্ন না হওয়ায় এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য সূচিত হয়। তাই বাংলাদেশের এক অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। নৃ-গোষ্ঠী সমূহের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভাষারীতি কালের স্রোতে বাহিত হয়ে চলেছে তাদের সমাজে। অধিকাংশ নৃ-গোষ্ঠী বিশ্বাস করে তারা এ দেশের ভূমিজ সন্তান নয়। তাই নিজেদের গুটিয়ে রাখতে, তাদের আচরিত জীবনযাপন পদ্ধতি ও ভাষারীতি যতটা সম্ভব আঁকড়ে থাকতে তারা সদা তৎপর। গবেষকের মতে, বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী তাদের ভাষার আদি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে নিজস্ব স্থানিক ভাষা বা বাচন প্রণালি। তেমনিভাবে গারো ভাষার 'টিবেটো-বার্মান পরিবারের' বোড়ো শাখার ভাষা বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের কাছে তা দুর্বোধ্য। সঙ্গত কারণে দেখা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে ভৌগোলিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আর এই দূরত্বই সামগ্রিকভাবে লঘু নৃ-গোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারা থেকে করেছে বিচ্যুত। অথচ এদের ঔজ্জ্বল্যটুকু ধরে রাখতে পারলে, সর্বসাধারণ্যে তুলে ধরতে পারলে শুধু সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীই নয়, সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে সবাই। এ জন্যই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সারল্যে ভরা জীবনাচারের অধিকারী ক্ষুদ্র এসব নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে সবাইকে কৌতূহলী করে তোলা একান্ত অপরিহার্য।

বাংলাদেশে অভিবাসনকারী বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর অন্যতম গারো নৃ-গোষ্ঠী। ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরের গভীর অরণ্য, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দী, শেরপুর, নখলা, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা এবং বাংলাদেশ অংশের গারো পাহাড়ের টিলায় এই নৃ-গোষ্ঠী ঐতিহাসিক কাল থেকেই বসবাস করে আসছে। মঙ্গোলয়েড মহাজাতির নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে বিদ্যমান। অনেকে অবশ্য মনে করেন এরা মঙ্গোলয়েড মহাজাতির একটি শাখা Bodo-এর অন্তর্ভুক্ত। গারোদের বিশ্বাস খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সাল থেকেই তারা উল্লিখিত অঞ্চলে বসবাস করে আসছে।

গারো নৃ-গোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র ধর্ম মতে বিশ্বাসী। তাদের সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকেই গড়ে উঠেছে এই ধর্ম বিশ্বাস। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন গারো সংস্কৃতির বীজমন্ত্র তাদের ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত। প্রকৃতি পূজক বা পাথর পূজক সাংসারেক গারো সংস্কৃতিতে তাই কৃত্য বা Ritual অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর কৃত্য বা Ritual হচ্ছে নাটের প্রাণকোষ।

গারোদের নাট্যপালা 'রে-রে' আলোচনার পূর্বে জাতিগত থিয়েটার বা Ethnic Theatre সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। নৃ-গোষ্ঠী নাট্য বিষয়ে আধুনিক গবেষক এবং নাট্যকলার শিক্ষক লুৎফর রহমান মনে করেন, 'কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর যে সব পৌরাণিক উপকথা, সংস্কার, লোকাচার ও আত্মিক বিশ্বাসের অভিজ্ঞান সেই জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কৃত্য বা উৎসবে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বিভিন্ন নৃত্য-গীত ও নাট্যমূলক শিল্পরীতিরূপে প্রচলিত তাই এক কথায় নৃ-গোষ্ঠী নাট্য বা Ethnic Theatre.' অন্যকথায় 'কোনো পালা বা নাট্যকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত কৃত্য যখন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নৃ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে একান্তভাবে উদ্ভাসিত করে তখন তাকে জাতিগত থিয়েটার বা Ethnic Theatre বলা যায়'।

গারোদের জাতিগত বিশ্বাসের অভিজ্ঞান হচ্ছে- 'সৃষ্টির আদি অবস্থায় বিশ্বজগৎ বলতে কিছুই ছিল না। এই পৃথিবীর চারদিকে তখন নিঃসীম কালো ঘোর অন্ধকার ও অসীম জলরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল। চারদিকে কেবল পানি আর পানি ছাড়া কোথাও আলো, ভূমি, প্রাণী বা গাছপালার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই অবস্থায় 'তাতারা-রাবুগা' (গারোদের সৃষ্টিকর্তার নাম) পৃথিবী সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করলেন। তার এই জাগ্রত ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য তিনি তার সহকারী দেবতা 'নস্তু-নপান্তু'কে মনোনীত করলেন। 'নস্তু-নপান্তু' একজন স্ত্রী লোকের বেশে তার সহকর্মী 'মাচি'র সহায়তায় পৃথিবী সৃষ্টির কাজে মনোনিবেশ করলেন।

এদের সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস আরও বিস্তৃত এবং ব্যাপক। সৃষ্টিতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা লাভের পর সংস্কৃতিবান এই জাতির নৃত্য-গীত-নাট্যের পরিচয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

গারো নৃ-গোষ্ঠীর রয়েছে সমৃদ্ধ পুরাণ বা Myth. এ সব পুরাণ কথার বাঁকে বাঁকে প্রাত্যহিকতার নানান প্রতিকূলতার মধ্যদিয়েও গড়ে উঠেছে নানান উপকথা। মাতৃতান্ত্রিক গারো নৃ-গোষ্ঠীর সামাজিক জীবনে রয়েছে 'মাহারী' ও উত্তরাধিকার (নক্না) নির্বাচনের সুকঠিন নিয়ম। এ ছাড়া 'Cross Cousin Marriage Syestem'-এর নিগড়ে পিষ্ট গারো নারী-পুরুষের প্রেম পরিণয়ের ভিত্তিতে সৃষ্ট বেশকিছু পালার সন্ধান মেলে।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ওয়ানগাল্লা, চিরিং, ফদিনি, কান্দোদোলং প্রভৃতি। এর মধ্যে ওয়ানগাল্লা উৎসবের নানান পর্যায়ে বিচিত্র নামের মোট পঁয়তাল্লিশ থেকে ছাপ্পান্ন প্রকার নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। তারমধ্যে 'রে-রে' এক প্রকার নৃত্য-নাট্য। এই সব নৃত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগীতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কোথাও কেবলমাত্র আদিম অভিনয়। এতদ্ব্যতীত রয়েছে নাট্যিক সংলাপভিত্তিক নৃত্য-গীত ও অভিনয়। গারো নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন গোত্রের অন্যতম 'দোয়াল' এবং 'ব্র্যাক' গোত্রের মধ্যে প্রেম, বিরহ, মিলনভিত্তিক 'রে-রে' নৃত্যগীত প্রচলিত। ওয়ানগাল্লায় সালজং, সোআৎসা, খ্রাং, রংদিকমিন্তে, নক্‌নিমিন্তের পূজা সম্পন্ন হলে খামাল (কামাল) ও নক্‌মার নৃত্যের পর প্রচুর মদ্যপান করে সব গারো পূজারী। (তবে গারোরা নেশাখোর মদ্যপ জাতি নয়। এরা নিছক নেশা করার জন্য মদ পান করে না। মদ্যপান এদের দৈবশক্তি লাভের উপাচার।) প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করার ফলে এক সময় তারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় আরম্ভ হয় 'রে-রে' নৃত্য-গীত। রে-রে মূলত অবিবাহিত নারী-পুরুষের নৃত্য-গীত। বিবাহিত অল্পবয়স্করাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর নৃত্য-গীতের মৌল উদ্দেশ্য গারো যুবক যুবতীদের মধ্যে প্রণয় সংঘটন।

রে-রে সংলাপভিত্তিক নৃত্য। তাৎক্ষণিকভাবে মুখে মুখে রচিত হয় সংলাপের ভাষা। সংলাপগুলো ব্যক্তিনির্ভর এবং একই সঙ্গে ব্যক্তির সৃজন ক্ষমতা নির্ভরও। এ নৃত্যে নারী-পুরুষ প্রথমে দুই ভিন্ন সারিতে দাঁড়ায়। যখন নাচ শুরু হয় দুটো সারি একত্রে মিলে। একসারিতে তারা এমনভাবে অবস্থান করে যাতে একজন নারীর পেছনে একজন পুরুষ অনায়াসেই দাঁড়াতে পারে। এতে নৃত্যরতরা জোড়ায় জোড়ায় আলাদা হওয়ার সুযোগ পায়। নৃত্যের পর্যায়ক্রমে কখনো বা তারা মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রতিদলে থাকে একজন করে মূল গায়ক। বাকিরা পালন করে দোহারের ভূমিকা। প্রথম পক্ষের মূল গায়েন বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নৃত্য সহকারে সঙ্গীতের মাধ্যমে তার প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন করে। দোহারগণ 'হারা...রা' ধ্বনিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

একই প্রক্রিয়ায় অন্যপক্ষের মূল গায়েন প্রথম পক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেয়। এভাবেই পুরো একটি 'রে-রে' নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। এতে বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো মুদ্রার ব্যবহার নেই। যুবক-যুবতীরা কখনো দুই হাত কোমরের কাছে নিয়ে এসে কব্জি বাঁকিয়ে আনমিত অবস্থায় কোমরে ন্যস্ত করে এবং কোমর দোলায়।

বাদ্যযন্ত্রের তালে চলে স্টেপিং। কখনো একহাত ভাঁজ করা অবস্থায় উপরে উঠে যায় প্রায় মাথার কাছাকাছি। অন্যহাত বেঁকে আসে বুকের কাছে। কখনো হাতগুলো পাখির ডানার মতো দুলতে থাকে। আবার কখনো নৃত্যরতরা দুই হাত কাঁধের উপরে কান সমান উচ্চতায় রেখে নৃত্য করে। কখনো নৃত্যরত নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে মস্তক হেলিয়ে নৃত্য করে। মুখ চলে আসে মুখের কাছে। চোখ নিবদ্ধ হয় চোখে। আর তখনই মন বিনিময়ের মাহেন্দ্রক্ষণ। মন দেওয়া-নেওয়ারপালা সংলাপের মাধ্যমে কি প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয় তার নমুনা দেখা যাক।-

পুরুষ (মূল গায়ক) : ও .....
খাউই সাৎনা রে 'এ' আ
মাৎশা মান্না লাউয়া না (২)
ওয়াল জামেং গিছা নিন
জাংগি মারা কাউয়ানা।
দোহার : হারা ... রা হারা .... রা (২)
নারী (মূল গায়ক) : ও .....
ওয়াল জামেং গিছা নিন
কাউয়ার লাগি জাংগি গাছ
নারী : ও ..... বিয়ান বেলার আগেই
পাতছ
কাউয়ার লাগি জাংগি খান
আমার জানা রে-রে গুলান
কিয়ের লাইগ্যা বিলাইতাম।
পুরষ : ও .... রে-রে গাওনের লাইগা
আইছ



জাংগি মারা কাউয়ানা (২)
চিংঙেই রে রে মান্না' খা
রন' জা মাইছা নাৎস না।
দোহার : হারা.....
রা..... হারা ..... রা (২)]
ভাষাগত দুর্বোধ্যতার কারণে গারো ভাষায় সংলাপ আর দীর্ঘায়িত না করে বরং এর আধুনিক বাংলা অনুবাদ কেমন দেখা যাক।-
পুরুষ : ও..... খা উই হিচতাম গিয়া আমি
পাইলাম এক রাউগ্যা মাছ
বিয়ান বেলার আগেই পাতলাম
এমুন ভাগ্য দিল কে
আরও কাছে আইও না
রেগে গাইবাম তোর লগে।
নারী : ও .... কাছে আমি যাইতাম না
তুমি বড়ই বেহায়া
রে-রে গাওনের সাধ থাকলে
চাইও না আর ট্যাগাইয়া।
পুরুষ : ও..... ও সুন্দরী যুবতী লো
লওনা আমার সাথে
মন রংগে গাই রে-রে
তাল বেতাল সুরেতে।
নারী : ও... তাল বেতাল সুরেতে
গাইবা তুমি রে-রে গান
কার কাছে কইয়া যাইবা
মনের গোপন কথা খান।
পুরুষ : ও.... পাওডা বুঝি হইল লেংড়া
উইঠ্যা মঠ গড় টিলা
রে-রে গাইতাম আইয়া দেহি
মনটা হইছে পাগিলা
নারী : ও..... মন হইছে পাগল গো
গাইতে আইয়া রে-রে
বউডা তুমার দেইখ্যা আইলাম
কান্দে দুর্গাপুরে।
পুরুষ : ও.... বউরে আমার দেইখ্যা আইছ
কান্দে দুর্গাপুর
সুন্দরী গো
তারে ছাইড়া দিয়া আমি
বিয়া করবাম তোরে।
নারী : ও..... আর কেমনে কইবাম সই
নির্লজ্জ এই বেহায়ারে
এইখানেই শেষ করলাম
আমার রে-রে পালারে ॥

আলোচ্য রে-রে সঙ্গীতটিতে সুস্পষ্ট একটি কাহিনী রয়েছে। নাটকীয়তায়পূর্ণ সে কাহিনীতে বিদ্যমান ঘটনার পূর্বে সংঘটিত কিছু ঘটনার আভাস। কাহিনী বিন্যাস করলে দেখা যায়-রে-রে নৃত্য শুরু হয়েছে। যুবক নৃত্যরত সঙ্গিনীকে জানায় যে, সে প্রথম দর্শনেই মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়েছে। তার এই আকুতি সে জানায় ছন্দে-সুরে রূপকের আশ্রয়ে, 'খা উই হিচতাম গিয়া আমি/পাইলাম এক রাউগ্যা মাছ/বিয়ান বেলার আগেই পাতলাম/কাউয়ার লাগি জাংগি গাছ'। এখানে 'রাউগ্যা মাছ' আদিবাসীর অন্যতম 'Sex simble কাউয়া শব্দটি রূপসী যুবতীর রূপক। প্রেমজ ফাঁদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'জাংগি গাছ' শব্দটি।

এভাবেকথোপকথনের মাধ্যমে নৃত্য-গীতের অন্তরালে ভানভণিতার আশ্রয়ে চলে গারো যুবক-যুবতীর মন দেওয়া-নেওয়া। এটি তাদের সামাজিক রীতি। রীতিটি এমনই যে মন দেওয়া-নেওয়ার মতো একান্ত ব্যক্তিগত আবেগটিও প্রকাশ করতে হয় প্রকাশ্যে। এ পালার নারী চরিত্রটি বড়-চণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধা চরিত্রের অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রেমার্ত কৃষ্ণ রাধাকে প্রেম প্রস্তাব দেয়। কিন্তু রাধা নানা অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান করলেও সেটি আসলে তার বাইরের রূপ। মনে মনে সে আসলে কৃষ্ণকেই লালন করে। অনুরূপ রে-রে পালার নারী চরিত্রটি প্রেমজ পুরুষ বিবাহিত জেনেও তার প্রেম প্রস্তাবেসাড়া দেয়।

গারোদের আরও অনেক রে-রে পালা রয়েছে। সেগুলোর কাহিনীতে ভিন্নতা থাকলেও সবগুলোর লক্ষ্য 'প্রণয় সংঘটন' এবং বিষয়বস্তু 'প্রেম'। সংস্কৃতির অবক্ষয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তেও গারো নৃ-গোষ্ঠী বিলুপ্তির করাল গ্রাস থেকে এই চমকপ্রদ শিল্প নিদর্শনটি আজ অবধি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। আর বস্তু সর্বস্ব জীবনের নানান সঙ্কটে মন্ময় এই শিল্পরীতিটি অস্তিত্বের মর্মমূলে কোমল স্পর্শ বুলায় বলেই হয়তো এটিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে গারোরা।



নাটক

পাশে কেউ ছিল

গল্প : আহসানুল হক শোভন
নাট্যরূপ : প্রশান্ত হালদার

[একটি মাঝারি আয়তনের টি-শপ কাম রেস্টুরেন্ট। বেশ অভিজাত। ভেতরটায় ছোট ছোট গোল গোল টেবিলে আর চেয়ারে সাজানো। আলো, নানারকম পেইন্টিং ও অন্যসব মিলিয়ে ছিমছাম পরিবেশ। এখানে আগতদের নিয়ন্ত্রিত ও সংযত চলাচল, সবাই কথা বলে বেশ নিচুস্বরে- অর্থাৎ ওয়েটার থেকে শুরু করে কেউই উচ্চকিত নয়। এই টি-শপ কাম রেস্টুরেন্টের খণ্ডিত একটা অংশ দেখা যাবে মঞ্চে- যেখানে একেবারে গোটাকতক টেবিল মাত্র।
নাটক শুরু হলে দেখা যাবে কোণায় এক নম্বর টেবিলে বসে অপেক্ষা করছে শুচি। তার বেশ হ্যাপি মুড। ক্যাটালগ উল্টে-পাল্টে দেখছে। হাতের ঘড়িতে সময় দেখলো একবার। ওয়েটার-১ এলো শুচির কাছে।]

ওয়েটার-১ : ম্যাম-
শুচি : আমাকে চা দেবেন, প্লিজ।
ওয়েটার-২ : চা কোনটা দেবো ম্যাম?
শুচি : (ক্যাটালগের পাতা উল্টায়) এটা- তিন নম্বর।
ওয়েটার-১ : ওকে ম্যাম (অন্য টেবিলের দিকে চলে যাচ্ছে)।
শুচি : দুই কাপ।
ওয়েটার-১ : দুই কাপ?
শুচি : (মুচকি হাসতে হাসতে) কোনো প্রবলেম?
ওয়েটার-১ : (কিছুটা বিব্রত হয়ে) নো ম্যাম, দুই কাপ। চা'র সঙ্গে টা?
শুচি : না।

[ওয়েটার তার নোটশিটে লিখে নিয়ে চলে যায়।]
শুচি : ভাবছে, আমি একা মানুষ, দুই কাপ চা কী করবো-
[টি-শপে প্রবেশ করে মিতু ও অপু। তারা ২ নম্বর টেবিলে এসে বসে।]
অপু : এক্সকিউজ মি-
[অপুর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় ওয়েটার-২]
ওয়েটার-২ : স্যার-
অপু : এক ডজন মিনি সিঙাড়া।
মিতু : এক ডজন?
অপু : তাহলে দুই ডজন?
মিতু : যাহ্।
অপু : কেন, তুই খাবি না?
মিতু : তাই বলে ডজন ডজন?
অপু : আরে বাবা, মিনি সিঙাড়া, মিনি- এতটুকু, মার্বেলের মতন।
ওয়েটার-২ : মার্বেলের চেয়ে একটু বড় স্যার।
অপু : না, মার্বেলের মতোই- বড়ো মার্বেলের মতো বলা যায় বড়জোর। তুই ক'টা খাবি বল?
মিতু : আচ্ছা, যা আনবি আন।
অপু : না না, তুই বল ক'টা খাবি, আমারটার থেকে কিন্তু ভাগ বসাতে পারবি না।
ওয়েটার-২ : স্যার, এক ডজনই দি।

অপু : তুই দুটো, আমি দশটা। অথবা তুই চারটা, আমি আটটা। বা তুই তিনটা, আমি নয়টা।
ওয়েটার-২ : আর কিছু?
অপু : উম্?
ওয়েটার-২ : চা দেবো স্যার?
অপু : চা দেবেন মানে, চা খাওয়ার জন্যই তো আমরা এখানে আসি। তারপরই না চায়ের সাথে টা। কী বলিস?
ওয়েটার-২ : ক'টা স্যার?
অপু : এক ডজন।
ওয়েটার : স্যার!
মিতু : কী!
অপু : হাঃ হাঃ... দুটো। দুটো চা, সাত নম্বর।
[ওয়েটার-২ নোটশিটে টুকে নিয়ে চলে যায়। ওয়েটার-১ এসে দুই কাপ চা এক নং টেবিলে রেখে চলে যায়। শুচি চায়ের কাপ দুটো টেবিলের মাঝখানে পাশাপাশি সরিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে থাকে কারও জন্য। ওয়েটার-২ এসে দুই নম্বর টেবিলে সিঙাড়ার প্লেট রাখে।]
অপু : থ্যাংকস্।
[ওয়েটার-২ চলে যায়। অপু একটা সিঙাড়া মুখে পুরে দেয়।]
অপু : আ...আ...আ... গরম...
মিতু : ফেলে দে, ফেলে দে মুখ থেকে-
অপু : না... না... না...
মিতু : গাল পুড়ে যাবে।
[অপু মুখটা কষ্টে নাড়াচাড়া করে কোনোরকমে গিলে ফেলে মুখেরটুকু। ক্লান্ত হয়ে গেছে। টিস্যু নিয়ে মুখ মোছে।]
মিতু : রাক্ষস! অপেক্ষা করতে জানে না, ধৈর্য নেই!
অপু : গরম গরম না খেলে কোনোকিছু খাওয়ার কোনো মানে হয়?
মিতু : থাম তো। ফাজিল!
[এক নম্বর টেবিলে শুচি চায়ের কাপ দুটো নিয়ে খেলছে- একেকবার একেক রকমভাবে দূরে-কাছে কাপ দুটো রাখছে, আবার স্থানান্তর করছে, আবার অন্য রকম। দুই নম্বর টেবিলে ওয়েটার-২ এসে দুই কাপ চা রাখে টেবিলে।]
মিতু : বিলটা একটু রেডি করে রাখবেন, প্লিজ।
[ওয়েটার-২ সম্মতি জানিয়ে চলে যায়]
অপু : (চায়ের কাপে চুমুক দিতে যায়) আহ্, এ চায়ের ঘ্রাণই আলাদা। জোস্!
মিতু : আস্তে আস্তে (থামিয়ে দেয় অপুকে)!
অপু : কী?
মিতু : গরম, গাল পুড়িয়ে ফেলবি!
অপু : গরম না খেলে চা খাওয়ার কোনো মানে আছে! কত দূর থেকে এখানে এসেছি, চা খেতেই তো।
মিতু : একটু পরে খা না রে বাবা।
অপু : ঠিক আছে। এই রাখলাম চা। মাত্র ৬০ সেকেন্ড- ১ মিনিট, তারপর আর কারো কথা শুনবো না। এই রাখলাম।
[এক নম্বর টেবিলে শুচি চায়ের দুটো কাপ নিয়ে নানারকম নাড়াচাড়া করছে। এদিকে মিতু ও অপু যার যার কাপ সামনে রেখে অপেক্ষা করছে। দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। এক সময় ফিক করে হেসে দেয় মিতু, অপুও।]
মিতু : এবার খা।
অপু : থ্যাংকস্।
[এরা দুজন চা খাচ্ছে, আর নানা রকম দুষ্টুমি করছে। হঠাৎ এদের দুজনের দিকে চোখ পড়ল শুচির, অবাক হয়ে দেখছে এদের- একসময় হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল তার। ওয়েটার-২ আসে দুই নম্বর টেবিলে।]
মিতু : বিলটা দেন, প্লিজ।
[ওয়েটার-২ বিলবুক রাখে টেবিলে, চলে যায়। বিলবুকটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নেয় অপু।]
মিতু : ভালো হবে না কিন্তু।
অপু : আজকের বিলটা আমি দিই, প্লিজ।
মিত : না।
অপু : প্লিজ, তুই তো প্রায়ই দিস।
মিতু : এখানে এসে কোনোদিন আমাকে বিল দিতে দিসনি।
অপু : তুই আসতে চাস না, অনেক দূর, আমিই তোকে অনুরোধ করে নিয়ে আসি।
মিতু : কিন্তু এখানে এলে আমার খুব ভালো লাগে জানিস। মনটা ভালো হয়ে যায়।
অপু : মন ভালো করার জন্য প্রয়োজনে সুদুর চীন পর্যন্ত যাও।
[অপু ম্যানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে রাখে বিলবুকের মধ্যে]
অপু : ওর টিপসের টাকাটা কী করি বল তো, আমার কাছে তো খুচরা টাকা-
মিতু : টিপসের টাকাটা আমি দিই?
অপু : নো প্রবলেম।

[মিতু টাকা বের করে বিল বুকের মধ্যে রাখে। দুজন উঠে পড়ে, বেরিয়ে যায়, উচ্ছল দুই তরুণ-তরুণী। ওরা বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত শুচি দেখলো ওদের, তাকিয়ে থাকলো। শুচির মুখটা ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে এলো। কপালে হাতের মুঠি ছুঁইয়ে মন খারাপ করে বসে রইল। এভাবে বেশ কিছু সময়। এমন সময় টি-শপে প্রবেশ করে আহমেদ- একজন বয়সি ভদ্রলোক। দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, কী যেন ভাবে, তারপর একটি খালি টেবিলে (তিন নম্বর টেবিলে) বসে পড়ে। তার টেবিলে বিপরীত দিকে আরও একটি খালি চেয়ার। ওয়েটারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে। কিছুক্ষণ পর ওয়েটার-১ আসে।]
ওয়েটার-১ : এক্সকিউজ মি স্যার-
আহমেদ : ও, হ্যাঁ।
ওয়েটার-১ : কী দেবো স্যার?
আহমেদ : এ টি-শপ কত দিন আগে চালু হয়েছে? জানো? মানে, অনেক পুরনো? নাকি-
ওয়েটার-১ : আমি তা জানি না স্যার। তবে আমি এখানে তিন বছর প্রায়, তা ধরেন স্যার- আড়াই বছরের বেশি।
আহমেদ : তাই?
ওয়েটার-১ : হ্যাঁ স্যার। আপনি বুঝি এ শহরে নতুন?
আহমেদ : উম?
ওয়েটার-১ : স্যার, এ শহরে প্রথম এসেছেন বুঝি?
আহমেদ : হুম। এই প্রথম এলাম এ শহরে। দেশের অনেক শহরে গেছি নানান সময়। কখনো কাজে, কখনো এমনি, বেড়াতে। কাজ ছাড়াও, মন বললেই আমরা দুজন বেরিয়ে পড়তাম হুটহাট- শুধু বেড়াতে যাওয়ার জন্য। তবে অচেনা কোনো শহরে বেড়াতে যাওয়ার ঝোঁক ওর বেশি ছিল।
ওয়েটার-১ : ব্যাপারটা দারুণ স্যার!
আহমেদ : হ্যাঁ।
ওয়েটার-১ : অচেনা শহরই বেড়ানোর জন্য ভালো স্যার। সবকিছু অচেনা লাগে, নতুন লাগে। সবকিছুই তখন ভালো লাগে স্যার।
আহমেদ : ঠিক বলেছ। একটা বিস্ময় থাকে, একটা ঘোর থাকে, নতুন কিছু চেনার বা জানার আগ্রহ থাকে। মনে কৌতূহল থাকে, প্রশ্ন থাকে। কৌতূহল মেটবার পর একটা আনন্দ থাকে- অচেনা কাউকে বিয়ে করার পর ঠিক যেমন। বুঝতে পারছো?
ওয়েটার-১ : ইয়েস স্যার।
আহমেদ : এই, তুমি বিয়ে করেছ?
ওয়েটার-১ : না স্যার।
আহমেদ : তাহলে কী করে বুঝবে এসব? না, তুমি ঠিক বুঝবে না।
ওয়েটার-১ : (চুপ)
আহমেদ : প্রেম করো, প্রেমিকা আছে তোমার?
ওয়েটার-১ : আছে স্যার। ওর নাম বাণী।
আহমেদ : হুম্, তাহলে অনেকটা বুঝতে পারবে। কোথায় থাকে সে, এখানে?
ওয়েটার-১ : এখানে নয় স্যার, অন্য শহরে, তার নিজের শহরে।
আহমেদ : তোমার প্রেমিকাকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।
ওয়েটার-১ : জ্বি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।
শুচি : ওয়েটার-
ওয়েটার-১ : স্যার, আমি একটু ঐ টেবিলটা থেকে আসি?
আহমেদ : হ্যাঁ শিওর। আমি তো তোমাকে আটকে রেখেছি, গল্প শুরু করে দিয়েছি। যাও প্লিজ, কাজটা সেরে আসো।
ওয়েটার-১ : থ্যাংক ইউ স্যার।
[ওয়েটার-১ গিয়ে শুচির টেবিলের সামনে দাঁড়ায়]
ওয়েটার-১ : ইয়েস ম্যাডাম-
[শুচি চায়ের কাপ দুটো সামনে রেখে বসে আছে, গালে হাত রেখে টেবিলে ভর দিয়ে, আনমনা। ওয়েটার-১ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে কিন্তু শুচি কিছু বলছে না, তার দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। ওয়েটার-১ অপেক্ষায় থাকলো কিছু সময়।]
ওয়েটার-১ : ম্যাডাম-
শুচি : উম? কিছু বলবেন?
ওয়েটার-১ : ম্যাডাম, চা তো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাচ্ছেন না যে? এ্যা-
শুচি : হ্যাঁ, খাবো। থ্যাংক ইউ।
ওয়েটার-১ : ওয়েল কাম।
[ওয়েটার-১ আবার আহমেদের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আহমেদ তখন ক্যাটালগ দেখছিল।]

ওয়েটার-১ : স্যার-
আহমেদ : হ্যাঁ। তো তোমাদের এ টি-শপে তো অনেক রকম চা পাওয়া যায়।
ওয়েটার-১ : সাত রকম স্যার। সাত রকমের চা পাওয়া যায়। চায়ের জন্যই আমাদের টি-শপ বিখ্যাত।
আহমেদ : তা সাত রকম চায়ের স্বাদ নিতে হলে তো এ শহরে অন্তত সাত দিন থাকতে হবে, কী বলো?
ওয়েটার : সে আপনি থাকতেই পারেন স্যার, আর তা না থাকতে পারলে ফাঁকে ফাঁকে এসে এক দিনে কয়েক রকমের চা খেয়ে যেতে পারেন।
আহমেদ : সাত রকম চায়ের মধ্যে এখানে কোন চা-টা বেশি চলে?
ওয়েটার-১ : সবই ভালো চলে স্যার। তবে এক, তিন, আর সাত নম্বর খুব বেশি চলে। আপনাকে কোনটা দেবো স্যার?
আহমেদ : হ্যাঁ, সেটাই ভাবছি। একটু ভাবতে সময় দাও। আমাদের অত তাড়াহুড়া নেই।
ওয়েটার-১ : ঠিক আছে স্যার, আমারও তাড়াহুড়া নেই। আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা এ টি-শপে বসে থাকতে পারবেন। তাড়াতাড়ির জন্য আমরা কাউকে তাগাদা দিই না। এটাও এ টি-শপের একটা বৈশিষ্ট্য স্যার। আমরা মনে রাখি- এখানে যারা আসে তারা শুধু চা খেতেই আসে না। অবসর সময়ও কাটাতে আসে- সে একাই হোক, দুজনই হোক, আর দলবেঁধেই হোক। সব আপনাদের সুবিধার্থেই স্যার।
আহমেদ : আমরা এ শহরে আসার আগে শহর সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু খোঁজ নিতে আমাদের এক বন্ধুর সাথে কথা বলেছি। কথা বলার সময়- সেই তোমাদের টি-শপের খোঁজটা দিয়েছিল।
ওয়েটার : ভালোই হয়েছে স্যার, আপনি এসেছেন। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা, আর আপনার বন্ধুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আপনি কত নম্বর নিতে চান আমাকে জানালেই হবে।
আহমেদ : আচ্ছা। আচ্ছা, বলো তো ইয়াংরা- মানে তরুণরা তোমাদের কোন চা-টা বেশি পছন্দ করে?
ওয়েটার-১ : তিন, আর সাত।
আহমেদ : আবার তো ধন্দে পড়ে গেলাম। একটা নম্বর হলেই সুবিধে হতো।
ওয়েটার-১ : আপনি স্যার তাহলে-
আহমেদ : ঠিক আছে, তিন আর সাত-ই সই। এখন তিন নম্বর দাও, সন্ধেবেলা এসে সাত নম্বর খেয়ে যাবো আমরা।
ওয়েটার-১ : ঠিক আছে স্যার, একটু অপেক্ষা করুন।
আহমেদ : আচ্ছা চা খাওয়ার আগে ছোটখাটো কিছু আছে খাওয়ার মতো, তোমাদের এখানে?
ওয়েটার-১ : নিশ্চই স্যার। চায়ের আগে টা, তাই তো?
আহমেদ : হ্যাঁ হ্যাঁ।
[ক্যাটালগের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখায়, আহমেদ দেখতে থাকে।]
ওয়েটার-১ : এ পৃষ্ঠাতে স্যার। কোনটা খাবেন, বলুন।
আশিক : এ্যা ... এটা দাও। চা-টা একটু পরে দিও। ঠিক আছে?
ওয়েটার-১ : ঠিক আছে স্যার।
[ওয়েটার-১ চলে যায়। সাইফ প্রবেশ করে, এসে বসে দুই নম্বর টেবিলে। বসে বসে মোবাইল ফোন ঘাটতে থাকে। আহমেদ কথা বলছে তার বিপরীত পাশের চেয়ারে বসা কল্পিত মানুষটির সাথে।]
আহমেদ : অর্ডার দিয়েছি সিঙাড়া, আর একটা মিষ্টিজাতীয় কিছু- কী যেন নাম। মিষ্টিটার কী যেন নাম- মনে পড়ছে না। এখানকার। স্থানীয়। কোনো নতুন জায়গায় এলে সেখানকার নতুন খাবারটা খেয়ে দেখবো না? আহা, নামটা মনে নেই, ওয়েটার এলে জিজ্ঞেস করে নেবো। দাঁড়াও, এই ক্যাটালগেই নামটা আছে, তুমি পড়েছ নাম নিয়ে, নামে কী এসে যায়-
(ক্যাটালগের পাতা উল্টাতে উল্টাতে থেমে যায়) ও, তাই বলো, আমার ডায়াবেটিস! ডাক্তারের নিষেধ আছে! সেই জন্যই তুমি এত আপত্তি করছো। তাই তো বলি- হঠাৎ মিষ্টি নিয়ে পড়লে কেন! দেখো, আর কত বছরই বা বাঁচবো- খাই না একটু। প্লিজ। একটু। হাঃ হাঃ হাঃ রাজি হলে শেষ পর্যন্ত। অসংখ্য ধন্যবাদ এই সহানুভূতির জন্য। তুমিও একটু খেয়ে দেখো, একবার খেলে কিচ্ছু হবে না। না, হবে না, আমি বলছি হবে না। নাহলে কিন্তু আমিও খাবো না। কী করব? ফেরত দিয়ে দেবো। অর্ডার দেয়া জিনিস ফেরত নেবে না? পার্শ্বেল করে দিতে বলব, ফিরে গিয়ে রেস্টহাউসের গার্ডকে দিয়ে দেবো। থাক, খেতে হবে না কাউকে।
[আহমেদ মুখ গোমড়া করে বসে রইল। খানিক বাদে ওয়েটার-১ এলো মিষ্টি আর সিঙাড়া নিয়ে। আহমেদের টেবিলে রাখল। মিষ্টির পাত্রে একটিমাত্র চামচ। হঠাৎ ওয়েটার-১ খেয়াল করল শুচিকে- ঠাঁই চুপচাপ বসে আছে। ওয়েটার-১ গিয়ে দাঁড়ায় শুচির টেবিলের সামনে।]
ওয়েটার-১ : ম্যাডাম, ম্যাডাম-
[শুচি কোনো কথা বলে না, তাকিয়ে থাকে ওয়েটারের দিকে।]
ওয়েটার-১ : ম্যাডাম, সেই থেকে চুপচাপ বসে আছেন- চা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কোনো সমস্যা না তো ম্যাডাম?
শুচি : (তাকিয়ে আছে)।
ওয়েটার-১ : চা পাল্টে দেবো?
শুচি : না।
ওয়েটার-১ : আবার গরম করে দিই?
শুচি : না, লাগবে না।
ওয়েটার-১ : (চুপ)
শুচি : দরকার নেই।
ওয়েটার-১ : (চুপ)
শুচি : কোনো দরকার নেই।
[ওয়েটার-১ আরও অল্প সময় দাঁড়িয়ে থেকে কোনো উপায় না দেখে ফিরে যায়। শুচি তার হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকায়। একটি চায়ের কাপ হাতে তুলে তাকিয়ে থাকে কাপের দিকে। তারপর চুমুকে চুমুকে চা-টুকু শেষ করে। খালি কাপটা উপুড় করে টেবিলে রাখে। অন্য কাপ সে স্পর্শও করে না আর।]
শুচি : (বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে চলে-)
এক কাপ চা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি
অপেক্ষারও তো একটা সীমা আছে অথবা বয়স।
আমি কি এখনো স্কুল-পালানো কিশোরী
ঝোপঝাড়ে শেষ ঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকব?
আমার শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে সেই কতকাল
দপ্তরিরা ঘুমাতে গেছে।
এখন হাজার রকম ব্যস্ততা আমার
এখন বড়জোর কারও জন্য এককাপ
চা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি।
এখন কুশল জিজ্ঞাসা ছাড়া দু'দণ্ড সময় নেই
তবু তোমার জন্য একটি একলা চেয়ারে বসে
এক কাপ চা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে করতে
দেখেছি
এত ঠাণ্ডা করে চা এর আগে কখনও আমি পান করিনি।
এরকম শীতল পাখি কবে থেকে পোষা ছিল
বুকের খাঁচায়?
[এরপর শুচি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটি একশো টাকার নোট বের করে ক্যাটালগের ভিতরে রেখে উঠে দাঁড়ায়। দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বেরিয়ে চলে যায়। ওয়েটার-২ এসে দুই নম্বর টেবিলে এক কাপ চা রেখে চলে যায়। এক তরুণ যুগল- লিমা ও মাহমুদ প্রবেশ করে বসে এক নম্বর টেবিলে, মুখোমুখি।]
আহমেদ : গোমড়া হয়ে থেকো না, চাদরটা ঠিকমতো গায়ে জড়িয়ে বসো, ঠান্ডা লেগে যাবে। খুব ছোট্ট শহর এটা, শহরের চারপাশ গ্রাম, তাই ঠান্ডাটা বেশি। দেখো, বয়স হয়েছে, এখন আর তোমাকে এসব গোয়ার্তুমি মানায় না। ... আমারও বয়স হয়েছে নাকি! না, তুমি পাশে থাকলে আমি সবসময় পঁচিশ, পঁচিশ বছরের কী বলে- ঐ টগবগে যুবক। হাঃ হাঃ হাঃ ... হেসে ফেললে তো শেষমেশ। তোমার এই হাসিটাই আমাকে বেয়াড়া হতে সাপোর্ট দেয়। হাঃ হাঃ হাঃ। ... ওয়েটার? ওয়েটারকে ডাকব? সিঙাড়া খাবে না? গরম গরম কচুড়ি চাই? ঠিক আছে তাই হবে, এখনই ডেকে অর্ডার দিচ্ছি।
[আহমেদ এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওয়েটারকে খোঁজে, হাত নেড়ে ওয়েটারকে ডাকে। ওয়েটার-১ কাছে আসে।]
আহমেদ : ওয়েটার, ও সিঙাড়া খাবে না।
ওয়েটার-১ : অর্ডার করা জিনিস স্যার-
আহমেদ : ঠিক আছে- এটা পার্সেল করে দিও। ওর জন্য গরম গরম কচুড়ি দাও।
[ওয়েটার-১ বুঝে উঠতে পারে না বিষয়টা, তাই দাঁড়িয়ে থাকে।]
ওয়েটার-১ : (স্বাগত) কার জন্য?
আহমেদ : আছে না কচুড়ি তোমাদের মেন্যুতে?
ওয়েটার-১ : আছে স্যার।
আহমেদ : তাহলে? দাঁড়িয়ে আছো যে?
(কল্পিত সঙ্গীকে) আচ্ছা, কচুড়ি আসতে আসতে আমরা ততক্ষণে মিষ্টিটা খাই। খাও। আগে মিষ্টিমুখ, পরে ঝালমুখ।
[চামচে করে আশীষ মিষ্টি থেকে কেটে একটু নিজের মুখে দেয়]
আহমেদ : কী ব্যাপার বলো তো। চামচ



একটা কেন? দুজন মানুষের জন্য একটা চামচ দেওয়া হয় বুঝি তোমাদের এখানে? কী হলো? হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

ওয়েটার-১ : কিন্তু স্যার...!

আহমেদ : চুপ। বেশি কথা বললে আমি তোমাদের ম্যানেজারকে ডাকব। চাকরির মায়া আছে তো, নাকি?

ওয়েটার-১ : জ্বি স্যার, স্যরি স্যার।

[ওয়েটার-১ বিব্রত হয়ে সরে যায়। অবাক হয়। নিরুপায় হয়ে আরেকটা চামচ আনতে বেরিয়ে যায়।]

আহমেদ : আজ-কালকার ছেলে-ছোকড়ারা জানি কেমন, কথা শুনতে চায় না। দিয়েছি ব্যাটাকে একটা ধমক! মানুষ দু'জন, অথচ চামচ একটা- কোন কথা এটা? না আমি পরে খাচ্ছি, আরেকটা চামচ আসুক, একসাথে খাবো। অথবা... আরেকটা চামচের দরকার কী, একটা চামচেই তো আমরা খেতে পারতাম- আমরা আমরাই তো। কী- আমার খাওয়া চামচে তুমি খাবেনা? এমন ভাবকরছো যেন আমার এঁটো খাওনি কোনোদিন। তাহলে আসুক চামচ।

[দুই নম্বর টেবিলে ছেলেমেয়ে দুজন দুজনের দিকে অপলক চেয়ে আছে। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়ে আহমেদের।]

আহমেদ : ঐ টেবিলের ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখো- কীভাবে দুজন দুজনার চোখের দিকে তাকিয়ে একে অন্যের মাঝে হারিয়ে গেছে। আশপাশে কারও দিকে কোনো খেয়াল নেই। ঠিক যেমনটি করে একসময় আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যেতাম। আমি এখনো ঠিক আগের মতোই তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যাই, তুমিই খেয়াল করে দেখো না।

[ওয়েটার-১ আরও একটা চামচ ও কচুড়ির প্লেট নিয়ে ফিরে আসে। সে চুপচাপ টেবিলে কচুড়ি সাজিয়ে দিয়ে পাশে চামচটা রেখে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে খেয়াল করে। বৃদ্ধ আহমেদ চামচটা তুলে নেয়। খাওয়া শুরু করেছে। তার সামনের চেয়ারটাতে কেউ বসে নেই। তবু সে সামনে বসা চেয়ারে কাল্পনিক কাউকে খাইয়ে দেওয়ার ভান করছে। আবার নিজেই নিজের হাতটা ঘুরিয়ে এমনভাবে খাচ্ছে যেন অন্য কেউ তাকে খাইয়ে দিচ্ছে।]

আহমেদ : মিষ্টিটাও মজার, কচুড়িটাও দারুণ। (একটা কচুড়ি নিয়ে) এটাতে একটা কামড় দাও। আহা, আমি খাচ্ছি, তুমি আগে এক কামড় নাও। কেমন, মজার না? খুবমজার। ... এই, তোমার গালে তো কী লেগে আছে। (একটা টিস্যু নিয়ে) দেখি দেখি, মুখটা একটু এগিয়ে আনো তো আমার দিকে, আরও একটু এগিয়ে দাও মুখটা- আরও একটু-

[আচমকা সঙ্গীর মুখে চুম্বন দেয় আহমেদ]

আহমেদ : ও মা, এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন অপরাধ করে ফেলেছি। ওরকম ছি ছি করছো কেন! কী করলাম আবার? তোমাকে চুম্বন করলাম, তাতে কার বাপের কী? আরে না, কে দেখে ফেলবে? কেউ দেখেনি। বিশ্বাস করো কেউ দেখেনি। এখানে কেউ কারও দিকে তাকায় না।

[আহমেদ উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে ভর দিয়ে ঝুঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছে সঙ্গীকে। তখন দেখা যাবে শুধু ওয়েটার-১ নয়- এক নম্বর টেবিলের সাইফ দুই নম্বর টেবিলের মাহমুদ ও লিমাও এবং অন্যরাও আহমেদের দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে দেখছে। আহমেদের সেদিকে খেয়ালই নেই। ওয়েটার-১ এর চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে।]

ওয়েটার-১ : (স্বাগত) বুড়ো মানুষটা তার সামনে যাকে বসিয়ে কল্পনা করে খাওয়াচ্ছেন, তিনি হয়তো এখন আর এই পৃথিবীতে নেই। হয়তো একটা সময় দুজন একসঙ্গে ছিলেন। আজও সেই মানুষটার প্রতি বৃদ্ধের টান অনুভব করেন। এ মানুষটা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন হয়তো এভাবেই তার ভালোবাসার মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে কাটিয়ে দেবেন। হোক তা কল্পনা, তাতে কীই বা আসে যায়।

[ওয়েটার-১ বেরিয়ে যায়। আহমেদ একইভাবে টেবিলে ঝুঁকে আছে। এক ও দুই নম্বর টেবিলের ওরা আহমেদের কাছে চলে এসেছে।]

মাহমুদ : আংকেল, আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন? আমাদের সাথে গাড়ি আছে, আপনাকে বাসায় পৌঁছে দি?

[আহমেদ অবাক হয়ে তাকায় তাদের দিকে। এর মধ্যে চা নিয়ে আসে ওয়েটার-১।]

ওয়েটার-১ : প্লিজ, আপনারা একটু সরে যান। স্যারকে বিরক্ত করবেন না, প্লিজ। স্যার এখন ম্যাডামের সাথে চা খাবেন।

[ওয়েটার-১ ওদের সরে যাওয়ার জন্য ইশারা করে। ওরা নিজ নিজ টেবিলে গিয়ে বসে পড়ে আবার।]

ওয়েটার-১ : ম্যাডাম, আপনারা এখন আয়েশ করে চা খান, তিন নম্বর চা। বিকেলে দুজন এসে সাত নম্বর চা-টা খেয়ে যাবেন আবার। ম্যাডাম, আপনার চায়ে কি চিনি দেবো? দেবো? আপনার না ডায়াবেটিস ম্যাডাম? ও সামান্য একটু? দিচ্ছি। এই যে এতটুকু দিচ্ছি। আরেকটু? দিচ্ছি। নিন, এবার খেয়ে দেখুন।

[ওয়েটার-১ কাঁধের তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে কাল্পনিক ম্যাডামের ফাঁকা চেয়ারটার দিকে হাসি হাসি মুখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে]

ওয়েটার-১ : কেমন লাগছে ম্যাডাম? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ম্যাডাম, স্যারেরটায় কি চিনি দেবো?

আহমেদ : সামান্য একটু দাও।

ওয়েটার-১ : দেবো ম্যাডাম? দেবো না? স্যারের উইদাউট সুগার? ঠিক আছে ম্যাডাম।

[পরবর্তী চায়ের কাপটা আহমেদের দিকে এগিয়ে দেয়। আহমেদ চায়ের কাপটি হাতে তুলে নেয়, একটা চুমুক দেয়।]

আহমেদ : (স্বাগত) প্রত্যেক মানুষেরই হয়তো কল্পনার কেউ একজন থাকে, যাকে হয়তো মনে মনে সে সারাজীবন যত্নে মমতায় বহন করে চলে। হয়তো মনে মনে তার সাথে কথা বলে, আড্ডা দেয়, আদর করে। সারাজীবন। হয়তোবা।


দিনরাত ২৪ ঘণ্টায়
সোনালী e-wallet আপনার সেবায়
সোনালী ব্যাংক এর মোবাইল
অ্যাপে ঘরে বসেই ব্যাংকিং
ডিপিএস জমা করা যায়
একাউন্ট ব্যালেন্স ও স্টেটমেন্ট দেখা
সোনালী ব্যাংকের যেকোন
একাউন্ট বা ওয়ালেটে টাকা ট্রান্সফার
কেনাকাটায় QR পেমেন্ট সুবিধা
একাউন্ট থেকে ওয়ালেট
ওয়ালেট থেকে একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার
ইউটিলিটি বিল-পে
BEFTN-এর মাধ্যমে যেকোন
ব্যাংকের একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার
মোবাইল রিচার্জ
সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখা ও
এটিএম বুথের লোকেশন জানা যায়
সোনালী ব্যাংকের
ক্রেডিট কার্ডের বিল জমা
Welcome to Sonali e-Wallet
Tap to continue
অ্যাপ ডাউনলোড করুন এখনই
ANDROID APP ON Google play
Download on the App Store
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

মুজিব বর্ষে শুভ দিন
শূন্য সুদে কৃষি ঋণ

(* শর্ত প্রযোজ্য)







করোনা কালে
দুধ না ফেলে ঘি বানান
দুগ্ধ খাতে জাগুক প্রান



রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণে নিবেদিত একটি লাল সবুজ ব্যাংক

www.rupalibank.org

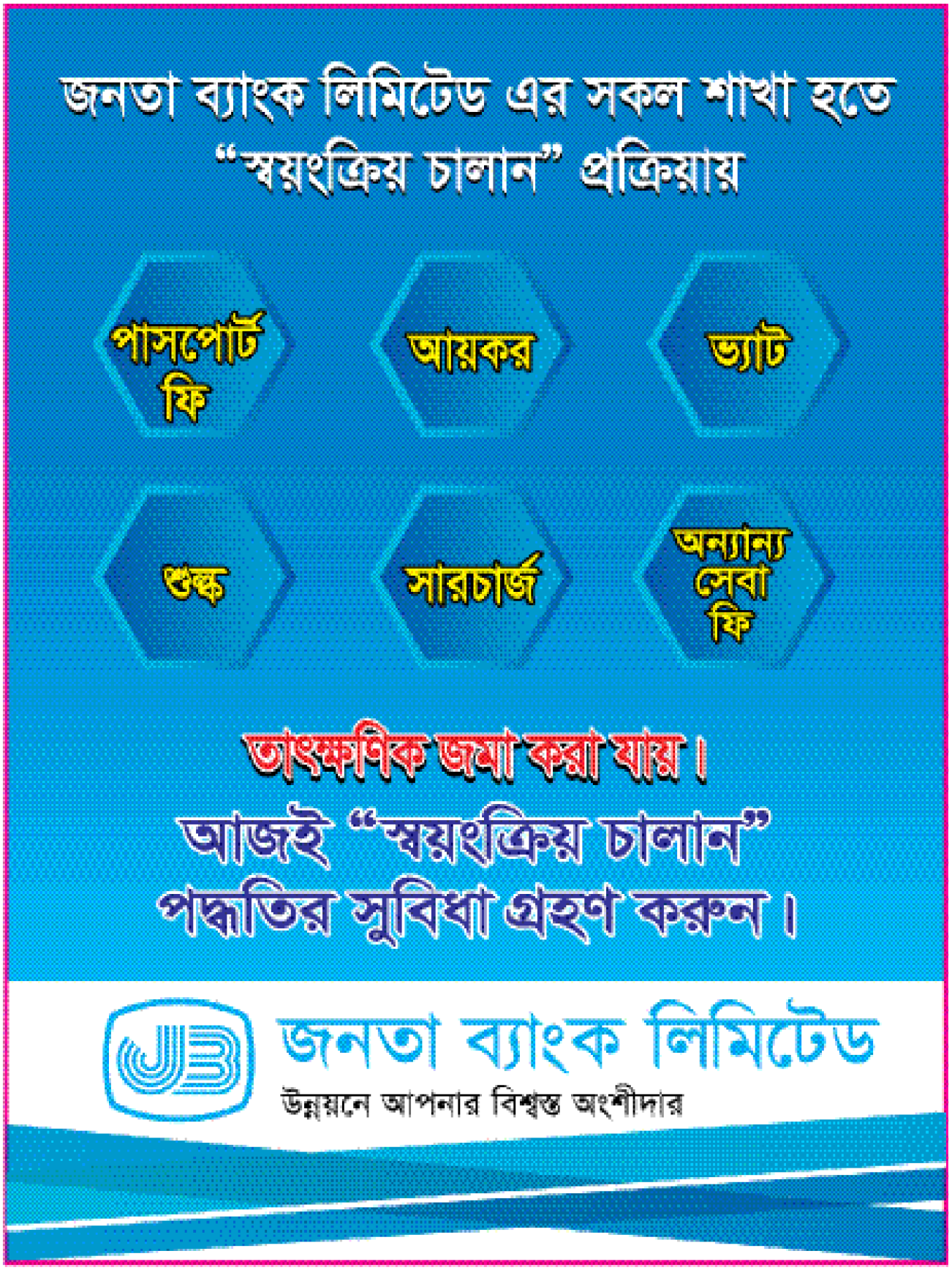
জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখা হতে
“স্বয়ংক্রিয় চালান” প্রক্রিয়ায়
পাসপোর্ট ফি
আয়কর
ভ্যাট
শুল্ক
সারচার্জ
অন্যান্য সেবা ফি
তাৎক্ষণিক জমা করা যায়।
আজই “স্বয়ংক্রিয় চালান” পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করুন।
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

এই মন্ত্রে ভুল ছিলো

মহাদেব সাহা

এই মন্ত্রে ভুল ছিলো তাই প্রতিষ্ঠা হয়নি,
ধরতে গেছি পালিয়ে গেছে দূরে;
ছিলো এই স্তোত্রে ছন্দপতন তাই শুধু ব্যঞ্জনা ফোটেনি
কোথাও না কোথাও ছিলো মাত্রাচ্যুতি তাই এই
হয়নি সংগীত,
এই পাঠে ছিলো, তাই এতো অসম্পূর্ণতা।
এতো ত্রুটি ঘুচবার নয়, এই আজ অব্যর্থ নিয়তি
তাই মাথায় নিয়েছি তুলে সবভুল, সবপরাজয়,
সকলের কাছে থেকে দূরে সরে গেছি,
ছিলো আমারই মন্ত্রে ভুল, আমারই বিদ্যায় যতো ফাঁকি
তাই কিছুই মেলে না আর,
তারাপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বল করে শুধু
ভুলগুলি সব।
ভুল ছিলো ধ্যানে, দিব্যদৃষ্টি তাই তো পাইনি
ভুল মন্ত্রোচ্চারণে কোথা পাই পদ্মপলাশ?
ভুল ছিলো এই স্নেহে, সম্বোধনে, ভালোবাসাতেও
তাই সবআয়োজন পণ্ড হয়ে গেছে, শুধু
শূন্য ফল হাতে
এই মন্ত্রে ভুল ছিলো, অমৃতও তাই তো গরল।

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের মধ্যে
অনলাইন ব্যাংকিং এ ১ম
এজেন্ট ব্যাংকিং এ ১ম
রেমিট্যান্স আহরণে ১ম


অগ্রণী বৈদেশিক কর্মসংস্থান সহায়ক ঋণ

পরপর ৩ বছর আইসিএবি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী


অগ্রণী সঞ্চয় প্রকল্প (এবিএস ও এপিএস)


বিদ্যুৎ উন্নয়ন খাতে অর্থায়ন




এটিএম সার্ভিস


এসএমই লোন-নারী অগ্রণী

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ বিজয়ী

সারা দেশে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখায় "রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যাংকিং" এর আওতায় সব ধরণের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোন একক ব্যাংকের অনলাইন সেবাভুক্ত শাখার সংখ্যার বিচারে এটি সর্বোচ্চ।

সরকারী কোষাগারে স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতিতে (Automated Challan System) টাকা জমা দেয়ার সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

আমানত সেবাসমূহ
- সঞ্চয়ী হিসাব
- চলতি হিসাব
- স্বল্প মেয়াদী আমানত
- স্থায়ী আমানত
- অগ্রণী ব্যাংক পেনশন স্কীম (এপিএস)
- অগ্রণী ব্যাংক বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প (এবিএস)
- অগ্রণী এডুকেশন স্কীম
- অগ্রণী সুপার সেভিংস স্কীম

ঋণ সেবাসমূহ
- শিল্প বাণিজ্যে চলতি মূলধন ঋণ
- কৃষি/পল্লী ঋণ (৪%,৪.৫০% ৫% এবং ৮.৫% হারে)
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ঋণ
- মাইক্রো ক্রেডিট ঋণ
- শিল্প ঋণ/মেয়াদী ঋণ
- আমদানি/রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন
- এসএমই লোন, নারী অগ্রণী ঋণ
- অগ্রণী বিদেশ গমন ঋণ (৯% সুদ)
- পল্লী গৃহ নির্মাণ ঋণ (৯% সুদ)
- সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ
- Personal Loan

অন্যান্য সেবাসমূহ
- ১০টি শাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা
- সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ সুবিধা
- বিশ্বের সকল দেশ থেকে প্রেরিত প্রবাসীদের অর্থ তাৎক্ষনিক পরিশোধের ব্যবস্থা
- সকল ব্যাংকের ATM বুথের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন সুবিধা
- যে কোন সময়ে রেমিট্যান্সের অর্থ উত্তোলনের জন্য রয়েছে "প্রবাসী অগ্রণী রেমিট্যান্স কার্ড"
- ৪০০টি এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট আপনাদের দোর গোড়ায় এজেন্ট ব্যাংকিং এ আমরাই ১ম।
- সকল শাখার মাধ্যমে E-GP ই- টেন্ডারিং সুবিধা প্রদান
- BEFTN ও RTGS সেবা চালু আছে।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation
website : www.agranibank.org

বিছানা-বিশ্রাম

ফারুক মাহমুদ

ধন্যবাদ চিকিৎসক। আপাতত বাধ্যতামূলক
আমার এ বিছানা-বিশ্রাম। ঘুমের পেছনে ঘুম
জুড়ে দিই। জেগে থাকা ভরে রাখি চোখের পাতায়
কাজের মুখস্থ পৃষ্ঠা অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে
কোনো স্মৃতি বর্গাকার, বৃত্তাবদ্ধ, মুক্ত আয়তনে
কার হাতে জলস্থিতি, কার মনে মন ঝুঁকে থাকে--
ছিপি এঁটে বন্ধ রাখি। কেন নড়ে কবিতার ভিত
বিনয়ের জানা ছিল প্রিয় 'চাকা' কেন ফেরেনি
অসমাপ্ত কবিতার শরীরে থাকে কৌণিক ক্ষুধা
জীবনানন্দের চোখে কত রাত্রি নদী হয়ে ভাসে
গল্পটা কোথায় যাবে-- দেখেছেন লেভ তলস্তয়
রবীন্দ্রনাথ আছেন। তার কণ্ঠে, ঘুরে ঘুরে আসে
প্রেমের প্রখর প্রীতি, অভিমান, দেহের অতীত--
চোখর জলের দাগ রেখেছেন অশ্রুসিক্ত মনে
রক্তকরবীর ডাল উঁকি দেয় দেওয়ালের ভাঁজে
আলস্য বিদগ্ধ হলে-- তুচ্ছ হোক, কিছু প্রাপ্তি ঘটে!
না-পড়া বইয়ের সঙ্গে মুগ্ধপ্রেমে কাটাচ্ছি সময়

ডাস্টবিনে

ইদ্রিস সরকার

সোনালি ফসল জমি
নিড়ানিতে অবিলম্বে
অবাঞ্ছিত আগাছাসমূহ
কঠোর হস্তে উপড়ে
ধ্বংস করো ডাস্টবিনে
চেয়ে দেখো ফসলি জমিন
হাস্যোজ্জ্বল কুঁড়িগুলো
পূর্ণিমা এখন তাদের জীবনে
রাহুগ্রাস থেকে ওরা
বাঁচাতে চায় স্বদেশে
রক্ষা করো এ সোনালি কুঁড়ি
ডাস্টবিনে ধ্বংস করে
অবাঞ্ছিত আগাছাসমূহ।

যজ্ঞদণ্ডকাল

মামুন মুস্তাফা

তোমার স্ফীত বুকে সমুদ্র কাঁপে
পাশে অন্ধকার, মৃত স্তম্ভ,
বলিচূর্ণ সূর্যরেখা শব্দহীন
বহুদূর নেমে যায়-
অরণ্যের কাছাকাছি।
সেখানে বিগত অশ্বারোহীর রক্তক্ষরণ
ধ্যান ভাঙে পুরনো গাছপালা
পথে ও পাথরে অশ্বখুগাঁথা
খুলে নিয়ে গেছে যৌথ অতীত
যজ্ঞদণ্ডকালে এও এক বিস্তারচিত্র।

ই চালান

সরকারি বিভিন্ন ফি
এক্সিম ব্যাংকে
জমা দিন নিশ্চিন্তে, নিরাপদে



এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল শাখা ও উপশাখায় এখন থেকে অটোমেটেড চালান সিস্টেম এর মাধ্যমে ইনকাম ট্যাক্স, ভ্যাট, পাসপোর্ট ফিসহ সরকারি বিভিন্ন রাজস্ব ফি জমা প্রদান করা যায়।

আপনার নিকটস্থ এক্সিম ব্যাংকের শাখা বা উপশাখায় এসে সহজেই দ্রুত ও নিরাপদে সরকারি ফি জমা দিন।

EXIM BANK
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক
অব বাংলাদেশ লিমিটেড

www.eximbankbd.com

সহায়তার বাড়তি তথ্যের জন্য 16246

ঘণ্টাধ্বনি পতনের

হাসান হাফিজ

ভুল গাছ বেয়ে তুমি উঠতে চাইছো লতা
প্রকৃতি নিশ্চিত জানে পরিণাম
সেজন্যেই নিরাসক্তি
আঁকড়ে ধরে আছো নীরবতা
কবিতাও এরকম ভুল পথে যাবে?
রিমান্ডের নির্যাতন সইতে সইতে
একসময় সংজ্ঞাও হারাবে?
চরাচর জানে না এ প্রশ্নের উত্তর
জানতে চাইলে আড়ালের অক্টোপাস
আষ্টেপৃষ্ঠে বিষাক্ত লালায়
ভাঙচুর বিলুপ্তির সুরভি ছড়ায়
পতনের ঘণ্টাধ্বনি
ওই শোনা যায়
খাদে কিনারায়
সত্য হয়ে উঠতে থাকে দুর্ধর্ষ পতন
লতাগুল্ম তৃণ বৃক্ষ সাক্ষী থাকলো
অনিচ্ছায় দিলো তারা
যাবতীয় স্বস্তি বিসর্জন!

কুহক

সোহরাব পাশা

সময় আসলে জ্যোর্তিময় নির্বিকার অন্ধকার রসায়ন
আমার জন্যে কেবল তুলে রাখো অতীত কুহক
শুশ্রূষার কৌশলপত্র প্রাণময় প্রসংশনীয়
কী যে অদ্ভুত বিস্ময়,
শূন্যতায় মুখরিত
ময়লা দুঃখের নিচে কেউ কী বেশি দিন দাঁড়িয়ে
থাকে অন্য গল্প চোখে!
রংধনু দ্যুতির কারুকাজ দ্রুত ভাঁজ পড়ে হাওয়ার ডানায়
গহিনে লুকোনো থাকে নিঃসঙ্গতার নীল বিদ্রুপ,
স্বপ্নলোকের চাবি হারালে পথগুলো তার নাম ভুলে যায়
বিভ্রান্তিরা ভিড় করে পাশে;
করুণ আলোর ছায়াশিল্প জীবনের
নির্বাসিত বাসনাকুসুম গূঢ় রাত্রির আড়ালে
পেছনে পড়ে থাকে অজস্র রূপকথার মুগ্ধতা
দীর্ঘ অসমাপ্ত স্বপ্নময় গতকাল

ফেলে আসা এক সন্ধ্যা

নাহার আহমেদ

তোমার কাছে রেখে এসেছিলাম
একটা স্বর্ণালি মৌন সন্ধ্যা।
আবির রাঙা সূর্যটা সবে
ঘরে ফিরেছে।
তার বর্ণিল সোনালি আভায়
তোমাকে রাঙিয়ে দিয়ে।
ভালোবাসার এক বন্ধন যেন
তোমার সারাটা অবয়বজুড়ে।
আমার ছিলনা ঘরে ফেরার
কোন তাড়া বা ইচ্ছে।
খানিক বাদে জ্যোৎস্নামাখা চাঁদটা
স্বপ্নিল আলোর মুগ্ধতায়
হেসে উঠলো তোমার বুকের
ঠিক যেন মাঝখানে।
হারিয়ে গিয়েছিলাম এক
স্বপ্নের রাজ্যে।
বাস্তবতার কঠিন বেড়াজাল-
ডিঙিয়ে।
মনে হলো পৃথিবীর তাবৎ
যন্ত্রণারা একাকার হয়ে
মিশে গেছে।
অদৃশ্য তমিশ্রার চোখে।
দূর থেকে ভেসে আসে
ভাটিয়ালী সুর।
ফিনফিনে মসলিন বাতাসের
মুগ্ধতার সাথে তোমার
তরঙ্গায়িত আলিঙ্গন ,
শিরায় শিরায় বুলিয়েছিল
কাব্যিক এক শিহরণ।
স্মৃতির বুননে আজো গেঁথে-রেখেছি
সেই ফেলে আসা স্বর্ণালি
মৌন সন্ধ্যার বিমুগ্ধতাকে,
আর শিহরণের অনুরণনে তোমাকে।

cardstore BLOG


NRBC
PLANET
এনআরবিসি ব্যাংক
NRBC BANK
এবার পূরণ হবে
প্রতিটি মানুষের জন্য একটি ঘরের স্বপ্ন
নিজের একটি বাড়ি
এবার হবে তাড়াতাড়ি
স্বপ্ন
হোম লোন
৭৭৭
মিনিটে লোন এপ্লিকেশন
দিনে লোন প্রসেসিং
% ও এর নিচে
16413
09612316413

কর্মসংস্থান ব্যাংক

(রাষ্ট্রখাতভুক্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

website: www.kb.gov.bd

আপনি কি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত/বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেকার যুবক বা যুব মহিলা?
আপনি কি অর্থের অভাবে কর্মসংস্থান করতে পারছেন না?

আপনার বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থান ব্যাংক সর্বদা আপনার পাশে আছে।

টিকে থাকা সম্ভব এমন যে কোনো অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা/উদ্যোগ
নিয়ে আজই ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন।

৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য সহায়ক জামানতের প্রয়োজন হয় না।

যুব উন্নয়ন/মহিলা অধিদপ্তর / শিল্প/সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর/ সমমনা কর্তৃক মনোনীত যে কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।


পশু পালন


মৃৎ শিল্প


মুদির দোকান


হাঁসের খামার


কৃষি খামার


জরি ও কুটির শিল্প

ঋণের খাতসমূহ:

- গবাদি পশু/হাঁস-মুরগীর খামার
- ক্ষুদ্র মেরামতকারক প্রকল্প
- মৃৎ শিল্প/মিঠা পানির
- খেজুর গুড় পাম তৈরী
- ধান চাউলকরণ
- কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী
- সেলাই/ হস্ত-শৈল্পিক
- পার্লার/ সেলুন সাপ
- জরি ও কুটির শিল্প
- কেন্দুর/ পাটি
- ঔষধ/ কৃষি-ভিত্তিক ডেকোরেশন
- পাইট ইন্ডিস্ট্রিয়াল,
- প্রাচীন ফলদ ফল
- ফোটোস্ট/ ফোটোগ্রাফি
- ফোকোরেটিং
- কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ইত্যাদি।

- ৩৪টি বিভাগীয় কার্যালয়,
- ৩৪টি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়,
- ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়,
- ৩০টি শাখা অফিস মহানগরীতে,
- ৬৪টি জেলা সদরে
- ১৯২টি উপজেলা সদরে

সর্বমোট ২৬৩টি শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

"বেকার যুবদের বিশ্বস্ত বন্ধু"

প্রধান কার্যালয় : ১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২-৫১০২০৩৭৯।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED
www.pubalibangla.com
63 Years

"পূবালী ব্যাংকে সঞ্চয় করুন
নিরাপদে থাকুন"

সর্বাধিক শাখা । সর্বপ্রথম অনলাইন নেটওয়ার্ক
সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি । সর্বাধুনিক তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ফ্রি অনলাইন । ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাংকিং । ফ্রি ইজিপি



- অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, সমৃদ্ধ মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা প্রদান।
- প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের ভিত্তি হিসাবে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা আর সামাজিক দায়বদ্ধতার যথার্থ পরিপালন।
- ফলপ্রসু এ প্লাস (AA+) ক্রেডিট রেটিং।

হারানো কথার নুড়ি

ফরিদ আহমদ দুলাল

বৃষ্টিতে হাঁসেরা ভালো আছে জলে
যেখানে সড়ক ছিল সেখানে সাঁতার কাটে জলাশয় ফেলে,
টানা বর্ষণে নদী ও খাল দীঘি ও ধানের ক্ষেত একাকার
জলের প্লাবনে কোথায় সুতিয়া নদী
কাঁচামাটিয়া কোথায়-রাংসার প্রবল স্রোত
কাদাখোঁচা ও খঞ্জনা পাখিরা কোথায় ফেলেছিল পদচ্ছাপ?
মানচিত্র খুঁড়ে ক্লান্ত হলে আশ্রয় খুঁজেছি বাতাসের গাঙ্গে,
বাতাসে কোথাও তোমার সংলাপ ভেসেছিল
একদা রোদে ও শ্রাবণ ধারায়,
মুঠোফোন অবিরাম জাগিয়েছে শিহরণ;
এখনো ইথারে তোমার কথারা ভাসে
কে জানে কোথায় কার মুঠোফোনে হেঁটে যায়
বাতাসে কথার প্লাবন সড়ক এবং শূন্যতা একাকার।
বৃষ্টিতে হাঁসেরা ভালো আছে জলে
জলাবদ্ধ আমি অগত্যা হাঁসের জলকেলি পড়ি
বাতাসের গাঙ্গে হারানো শব্দসম্ভার খুঁজে মরি
হাত ভরে ওঠে ক্ষয়িষ্ণু মলিন নুড়ি।

জন্ম এবং ভালোবাসার ঋণ

আনোয়ার কামাল

যার ঠোঁটে প্রথম রেখেছি ঠোঁট
তার কাছে প্রেমের প্রথম ঋণ
যার পদচিহ্ন অনুসরণ করে রেখেছি পা
তার কাছে নিয়েছি বেড়ে ওঠার ঋণ
পিতার শুক্রকীটে- মায়ের উদর সাগরে
কেটেছি সাঁতার- বেড়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায়
জঠর যন্ত্রণার অবসান করে-
আকুল আকুতি নিয়ে উগরে বেরিয়েছি
মুক্তির অনুপম সৌকর্যে আলোর ভুবনে প্রবেশ
তার কাছে শোণিতে জন্মঋণ আকাশ সমান
তার স্তনে ঠোঁট রেখে পান করেছি বেঁচে থাকার
মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা- তার কাছে ঋণ আর ঋণ..
যার বুকে মাথা রেখে ঠোঁটে ঠোঁট ধরেছি চেপে
স্তনে আরেকবার ঠোঁট রেখে পেয়েছি অমৃত সুধা
জীবনী শক্তি বেড়েছে দ্বিগুণ- সে আমার প্রিয়তমা
তার কাছে যৌবন বন্ধক রাখার ঋণ..

পাপ

খালেদ রাহী

নয়নে পাপ এলে ঘরে বাইরে শুদ্ধতা উবেযায়।
শিক্ষকের জ্ঞান ছাত্রীর ধ্যান এ বাক্য অচল
হয়ে পড়ে মাদ্রাসা স্কুলে।
আমাদের স্কুলে শিক্ষক কানাই; ছাত্রীকে দেয় প্রণয় পাঠ
আমার মনে ফ্রয়েড নেই; জেগে আছে প্লেটো
ফলে কামুকের কাছে আমি নপুংসক।

কবিতার প্রথা ভাঙি

রনি অধিকারী

রাত্রি শুরু।- এই চোখে নীল নীল ক্ষত
অভিসারী নিশাজল অকারণ ছোঁয়।
শায়িত শরীর ক্লান্ত। ক্লান্তি, ঘুম, স্বপ্ন...
স্বপ্নের স্রোতেই লিখি হাজার কবিতা
অতিশয় অনুগত প্রথা ভাঙি প্রথা।
চিত্রকল্প নিমেষেই মিশে যায় দেহে
ইতিহাস খোঁড়াখুঁড়ি প্রেম-প্রবণতা
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা চলে স্বপ্নের আঁধার
অন্ধকারে জড়াজড়ি শোকার্ত সময়ে
মধ্যরাতে কবিতার প্রথা ভাঙি প্রথা।



৩ বছর মেয়াদি
মাসিক জমার পরিমাণ
২৪,৬৯৫/-

৫ বছর মেয়াদি
মাসিক জমার পরিমাণ
১৩,৬৩৮/-

৭ বছর মেয়াদি
মাসিক জমার পরিমাণ
৮,৯৮৫/-

১০ বছর মেয়াদি
মাসিক জমার পরিমাণ
৫,৫৫৮/-

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- নতুন হিসাবধারীর জন্য কমপ্লিমেন্টারি ডেবিট কার্ড।
- দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে ৫ লাখ টাকা এবং স্বাভাবিক মৃত্যুতে ৫০ হাজার টাকার ইনস্যুরেন্স কাভারেজ।
- ব্যাংকই পরিশোধ করবে আপনার ইনস্যুরেন্স এর প্রিমিয়াম।

88-02-9577207-11

SBAC BANK

www.sbacbank.com

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ

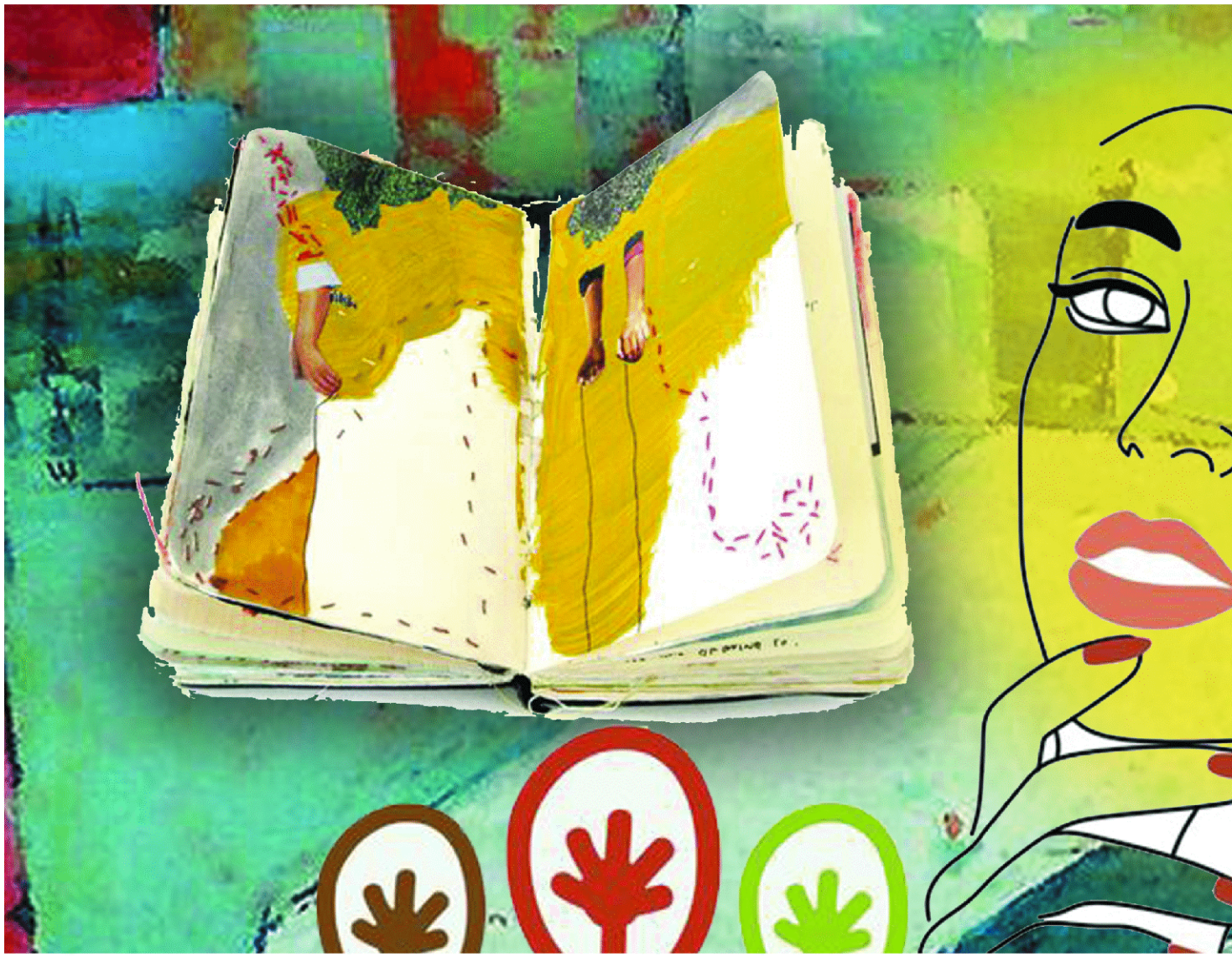

উপন্যাস

অবলা বোধন

আতা সরকার

ছিন্ন ডায়েরির কিছু পাতা

১. নারী লিখিতে পারিবে। কিংবা পড়িতে পারিবে। তাহা কেহ প্রত্যাশা করে না। যে নারী চুলায় হাঁড়ি ঠেলিবে, স্বামী জাতীয় পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য শাড়ি পরিয়া আয়নার সামনে সাজগোজ করিয়া চুল বাঁধিয়া মাথার খোঁপায় ফুল গুজিবে, তাহার পড়িয়াই বা কি হইবে, লিখিয়াই বা কি করিবে... সংসারের কোনো কাজেই বা সেইসব লাগিবে!

লাগিবে বৈকি। স্বামী প্রবর যদি দূরের শহরে বাস করে বা দূর-বিদেশে পরবাসী হইয়া থাকে, বাড়িতে রাখিয়া আসা বধূয়া নিজ হস্তে পত্র লিখিয়া তাহাকে বিরহ যাতনা জানাইতে পারে। ভাঙা ভাঙা গোটা গোটা হরফে লিখিলেও তাহা তো নিজেরই ভাব নিজেরই আবেগে প্রকাশ করে। কলমে তো এই আবেগ ফুটাইয়া তোলা সম্ভব নহে।

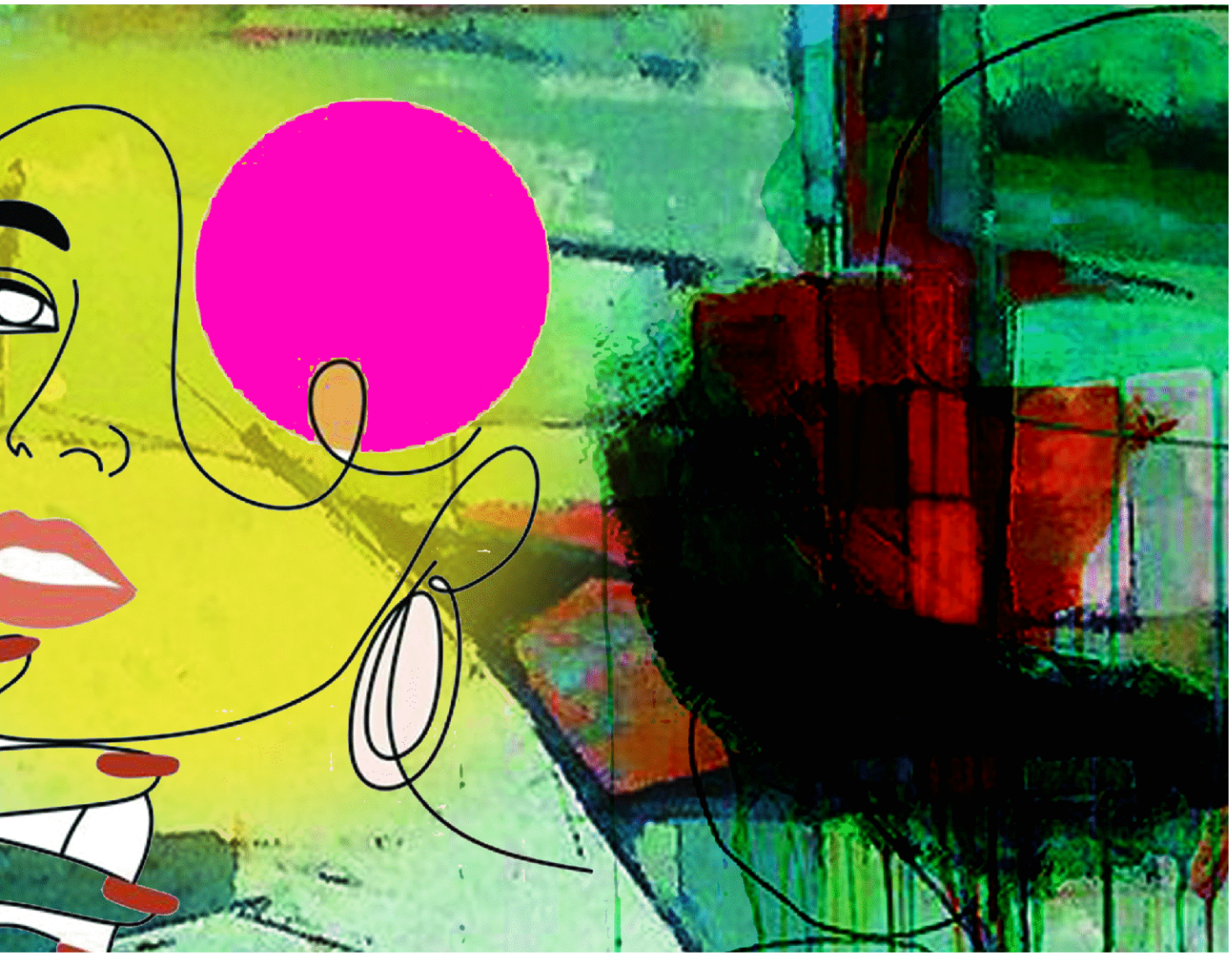

আবার স্বামী হুজুর চিঠির মসৃণ কাগজে যে ভাষা ব্যবহার করে, যে ভাবপ্রকাশ করে তাহাতে প্রেম যত থাকে তাহার চাইতে অধিক থাকে আদিরস... বহুদিনের ক্ষুৎপিপাসার অভিব্যক্তি। এমন ধারার চিঠি নিজে পাঠ করিতে না পারিলে অন্যকে দিয়া পড়াইলে লজ্জার এক শেষ। মেয়েদের লেখাপড়া শুধুই কি স্বামীকে পত্র লিখিবার আর তাহার পত্র পড়িবার জন্য? গ্রামের মেয়ে। পড়িতে চাহিলে কতখানিই বা আর পড়িতে পারে! বয়স পাকিবার আগেই তাহাকে নিজ বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে হয় পরের বাড়ি। পরের বাড়িকে কেহ বলে শ্বশুরবাড়ি কখনো হইতে পারে স্বামীর বাড়ি। লেখাপড়ার সেখানেই ইতি। পরের বাড়িতে ঢোকার পর দাউ দাউ জ্বলা খড়ির চুলার আগুনে কাঠ খড়ি তুষ শুকনা পাতার সাথে লেখাপড়ার বই-খাতা বিদ্যাবুদ্ধি পুড়িতে পুড়িতে সাফ হইয়া যাইতে দেখে। ইহা তো কেবল ফোর-ফাইভ পড়া মেয়ের বেলাতেই নহে, বিএ-এমএ পাস করিয়াই বা কি, কাজ তো ঐ একটাই... চুলায় খড়ি ঠ্যালা।

তবু মাথায় যখন বিদ্যা ও বুদ্ধি, তখন কখনো কখনো হাতে কলম উঠিয়া আসিতে দোষ কি! মনের গভীরে রহিয়াছে এক স্লেট আর চকখড়ি। তাহা অনেক দাগ ফেলিয়া যায়, আঁকিবুকি করে। ভালো-মন্দ কালো-ধলা অনেক স্মৃতি, বিরসমধুর হরেক ঘটনা, ভালো লাগা মন্দ লাগা কত শত অনুভূতি, দেখা না দেখা অদেখা কত যে নিঃসর্গের সৌন্দর্য, অপূর্ব অপরূপ কুৎসিত বীভৎস কত না দৃশ্যপট! চকখড়ির দাগ হইলেও সে দাগ এক ঘষা কেন বারবার ঘষিয়াও তুলিয়া ফেলা সম্ভবনহে।

কখনও কোনো অবসরে নির্জন বিজনে গভীর রাতে একান্ত নিজের মুহূর্ত গুলিতে নিবিষ্ট চিত্তে মোটা ডায়েরির পাতায় নারী একের পর এক শব্দ বুনিয়া পৃষ্ঠার পর যে পৃষ্ঠা সাজায়, তাহা যদি সরবহইয়া উঠিত, তাহা হইলে এক মহাবিস্ফোরণ ঘটিত যাহা সবকিছু সয়লাবকরিয়া লইয়া যাইত।

আবার অপরিসীম ভালোবাসায় দরদে মমতায় স্রোতস্বিনীর কল্লোলিত প্রবাহের ধারা সৃষ্টি করিতেও পারত, সৃজন করিত পাখপাখালি মুখরিত ফুলে ফুলে বিকশিত বাগ-বাগিচা। নারীর এক ডায়েরির পাতায় এতকিছু!

২. গাঁয়ের বড়বাড়ির বড় ঘরে এক ছোট আলমিরায় সাজানো-গুছানো ছিল কিছু বই-খাতা। ভারতবর্ষ ম্যাগাজিনের পুরনো বান্ডিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে কয়টা জিনিসই বা আর সরানো যায়। বইগুলোর প্রতি বিশেষ মায়ায় সেগুলো অন্যান্য জিনিসের সাথে খাঁচায় ভরে আমবাগানে পুঁতে রাখা হয়। আমবাগানটা ছিল মূল বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। শেষ পর্যন্ত বাড়িটাকে রক্ষা করা যায়নি। পাকবাহিনী দালালদের সহায়তায় পুরো ফাঁকা বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রক্ষা

রংপুর সিটি কর্পোরেশন
রংপুর



এক নজরে সিটি কর্পোরেশনের সেবাসমূহ

১ । জাতীয়তা সনদ প্রদান
২ । চারিত্রিক সনদ প্রদান
৩ । জন্ম-মৃত্যু সনদ প্রদান
৪ । ওয়ারিশান সনদ প্রদান
৫ । অবিবাহিত সনদ প্রদান
৬ । ট্রেড লাইসেন্স প্রদান
৭ । হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান
৮ । বিল্ডিং নকশা অনুমোদন
৯ । সড়ক বাতি রক্ষণাবেক্ষণ
১০ । রোড রোলার ভাড়া প্রদান
১১ । আবাসিক / বাণিজ্যিক পানি সরবরাহের সংযোগ স্থাপন
১২ । নর্দমা পরিষ্কার
১৩ । মা ও শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম
১৪ । ঠিকাদার তালিকাভুক্তি ও নবায়ন
১৫ । ভূমির সীমানা নির্ধারণ
১৬ । হোল্ডিং নম্বর প্রদান
১৭ । অন্যান্য সেবা প্রদান

সিটি কর্পোরেশনের জরুরি ফোন নম্বরসমূহ

অ্যাম্বুলেন্স :	৬৫৬৯৯
অ্যাম্বুলেন্স (মোবাইল) :	০১৭৩৫৬৭৯৪০১
বিদ্যুৎ শাখা :	৬৭১০৪
বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল :	৬৩৫২৪
পানি শাখা :	৬৪২৬৮

ঈদ মোবারক

সকলকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের

শুভেচ্ছা



* নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।
* যত্রতত্র ময়লা ও আবর্জনা ফেলিবেন না।
* আপনার ছেলে-মেয়েকে স্কুলে পাঠান।
* বৃক্ষরোপণ করুন, অন্যকে রোপণে উৎসাহিত করুন।
* ধূমপান থেকে বিরত থাকুন।

মো. মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

পায় মাটির নিচে পুঁতে রাখা ঐ কটা জিনিসই। কিন্তু বই-খাতাগুলো উঁইপোকায় কাটে।
এরপর সময় কেটে গেছে। পুরনো জিনিস ঘাটতে গিয়ে সেদিন একটা পোকা খাওয়া ডায়েরির কিছু পাতা পাওয়া গেলো। আমাদেরই পরিবারের একজনের। মুখচোরা মেয়েটি তার বোধ অনুভূতি জীবনাচার কি তুলে ধরতে চেয়েছিল পুরুষশাসিত সমাজের কাছে? নাকি নিজেরই জ্বালা-যন্ত্রণা আনন্দ-বেদনা লিখে লিখে নিজের সাথেই ভাগ করে নিয়েছে?
ছিন্ন ডায়েরির ঐ কয়টি পাতা একটা কাগজের প্যাকেটে যত্নের সাথে ঢুকিয়ে রাখলাম। নিয়ে নিলাম নিজের সাথে।
রাতে শোয়ার ব্যবস্থা পুবের নতুন দালান ঘরটায়। আমি তো আছিই। আমার সাথে দিপুও। দিপু আমার চাচাতো ভাই। বাড়িতে এলে সারাক্ষণ সেই আমাকে সময় দেয় এখানে ওখানে যেতে।
খাওয়া দাওয়া শেষে রাত্রিবাসের জন্য এ ঘরে এলাম। দীপু পশ্চিমের বড় ঘরটাতেই রয়ে গেল। কিছু কাজকর্ম সেরে আসবে।
পল্লী বিদ্যুতের কল্যাণে ঘরে ঘরে বিজলি বাতি জ্বলে। টিভি চলে। এমনকি ওয়াইফাইও যোগ হয়েছে। তবে এই বিজলির উপর ভরসা ও আস্থা কম। কখন যে তিনি আসবেন, আর কখন যে তিনি চলে যাবেন, তার উপর ভরসা নেই।
ভাবতে না ভাবতেই দুম করে কারেন্ট চলে গেল। গাঁয়ে সন্ধ্যাতেই রাত নামে। সে তুলনায় এখন গভীর রাত। বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে সেটাকেই আরও ঘনীভূত করে দিল। কিন্তু অন্ধকার প্রকাশ হতে পারল না। আকাশের কোল নয়, পুরো আকাশ জুড়ে হাসিতে হাসিতে পূর্ণিমার চাঁদ ভেসে যাচ্ছে।
ঘরের ভিতরেও জানালা ছাপিয়ে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে। সাথে সাথে মৃদু বাতাসও ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।
এমন পরিবেশে নিজেকে খুব একা মনে হতে লাগল। জ্যোৎস্নার আলো মানুষকে কি আরও নির্জন করে তুলছে?
হঠাৎ গুন গুন গানের কলি। জানালা থেকে আবছায়া কী এক ছায়া সরে গেল। ছায়া, নাকি আলোর ধোঁয়াশা ঝলক? এমন জ্যোৎস্না রাতে এমন গ্রামীণ নিরিবিলি পরিবেশে পরী টরী নামে বলে শোনা যায়।
হঠাৎ সুরেলা মিষ্টি কণ্ঠে কেউ গেয়ে উঠল: আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে/ বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
গান ভাসছে উঠোনময়। জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলানো আলোছায়ার সাথে তাল মিলিয়ে। চারপাশে গানেরই মায়াজাল।
জানালাই কোন্ এক মায়াবিআকর্ষণে টেনে নিয়ে এলো। জ্যোছস্নার আলোয় ভেসে উঠল কচি কোমল মুখখানি। সে তো পরী নয়। পরীরও অধিক। এক কিশোরী। বাসন্তী রং শাড়ি তার পরনে। মাথাভর্তি খোলা চুল। সাদামাটা সাজগোজ। এরপরও মেয়েটাকে লাগছে অসাধারণ। সেটা তার সজীব প্রাণবন্ততায়। গায়ের রং দুধ সাদায় হলদে বরণ। নাচের ছন্দে গানের বাণী। মেয়েটি মুহূর্তে পুরো মন জয় করে ফেলল।
ঘরের ভিতর নিজেকে আর স্থির রাখা যাচ্ছে না। মন হয়ে উঠছে অস্থির। চিত্তে দেখা যাচ্ছে চাঞ্চল্য।
এইতো মেয়েটি এদিকেই চোখে তুলছে চন্দ্রালোকের কটাক্ষ। মুখে তার মোহন হাসি। দুহাত মেলে আকাশের মেঘমালায় সাঁতরে আসছে।
নামতে হবে উঠোনে। যেতে হবে তার কাছে। কইতে হবে কথা। কি কথা? জানা তো নাই। যা আসে মনে ঠিক তখন বেলায়।
কে আবার পিছু টানে? ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি। বলো নাকো কথা ঐ যুবতীর সাথে। কি কথা তার সাথে? তাহার সাথে?
উঠোনে নামবো বলে দরজাটা খুলেছি মাত্র, অমনি দমকা হাওয়া ঝাপটা দিয়ে ঢুকে গেল ঘরে। পা বাড়িয়েছি বাইরে। হাওয়ার ধাক্কায় পুরো দেহ উঠল টলে। আলোর ঝলক ছুঁয়ে গেল আমায়। দু কদম সেঁধিয়ে গিয়েছি ঘরের ভিতর। দমকা ধাক্কায় দরজার কপাট বন্ধ হয়ে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ গেল। মেয়েটি নেই। পুরো উঠোনের কোথাও নেই। আর এদিকে ঘরের ভিতর জ্যোৎস্না রোদের নাচন।
মাথায় কেমন যেন এক ঘোর। স্থির থাকা যাচ্ছে না। বসে পড়লাম বিছানার উপর।
খুনখুনে হাসি পুরো ঘরটাকেই ঝন ঝন করে তুলছে। আমার পাশে বিছানার উপরই বসেছে সে। দাদি।
মাথাভর্তি শনের মতো সাদা পাকা চুল। পান-জর্দা খাওয়া লাল-কালচে দাঁত। শরীরের চামড়া বয়সের ছাপ জড়িয়ে কুঁচকানো। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। এরপরও গায়ের রং তেমনি দুধে-আলতা ফরসা।
কতদিন বাদে আমার সুন্দরী দাদীকে দেখতে পাচ্ছি। জ্যান্ত। তেমনি অন্তরঙ্গ। নাতির প্রতি অপার স্নেহ ঝরে পড়ছে। সাথে সাথে মিটমিটে দুষ্টুমিও।
মাথায় ঠিক চাট্টি বসিয়ে বুড়ি রসিয়ে রসিয়ে বলল: কিগো আমার রসের নাগর নাতিপতি, উঠানে সুন্দরী কচি মাগীটাকে নাচতে দেখে দিলের ভিতর চক্কর দিল, নাকি মাথা ঘুরে গেল?
দাদির শীর্ণকায় হাত দুটো আঁকড়ে ধরলাম।
কণ্ঠস্বরে আকুতি: কে এই মেয়ে? ভর চাঁদনী রাতে আমাদের বাড়ির উঠোনে গান গেয়ে যায়, সাথে নাচের দোলা!
দাদির সারা মুখে শয়তানি খেলা করে। বুড়ি হলে কি হবে, এখনো ভুরু ভঙ্গি করতে জানে ঠিকই।
বলল: মনে ধরেছে বুঝি?
মন জানে মনের খবর। সে খবর সবসময় বুঝা যায় না। এখন মন খোঁজে তার সন্ধান। জানতে চায় তার পরিচয়। মন যে ব্যাকুল হয়ে চায় তাকে আবার দেখতে। বার বার দেখতে।
এবার দাদি ছুড়ে মারল তার আরেকটা শর: কিগো নাগর, মনটা এতো উতালা কেন?
বুড়ি যেন মনকে আরও উস্কে দিতে চায়। তার দিকে তাকাই। পড়ার চেষ্টা করি তার মুখের ভাষা। চোখের ভাষা।
দাদি তার নাতির বিপন্ন অবস্থা দেখে খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে। ধাক্কা দিয়ে বলে: নাতি আমার পুরুষ একখান। ডুবেছে তো একেবারেই ডুবেছে!
বিড় বিড় করে বলি: ঐ মেয়েটা এমনই টলটলে যে ওর মধ্যে ডুবেনা গিয়ে গতি নেই।
দাদি ফুটফুটে জ্যোৎস্না চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে এক ধ্যানে। আলতো বিস্ময়ে বলে: এতোটাই!
স্বীকারোক্তি: হ্যাঁ।
ধ্যানের গভীর থেকেই তার কণ্ঠস্বর: তোর দাদারও তোর মতোই দশা হয়েছিল।
আমার পূর্বপুরুষেরও একই দশা, স্বীকার করে নিতে আমার এতোটুকুও আপত্তি নেই: হবেই তো। তোমার সাগরে ডুবেছিল না!
দাদি বলল চিবিয়ে চিবিয়ে: পুরুষ মানুষ! কার উদ্দেশে বলা? দাদার? না আমার?
প্রবল কৌতূহলে জানতে চাই। জানতেই চাই: কে মেয়েটা?
বুড়ির ভাঙা গলা। সে গলায় খিল খিল স্বর ওঠে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।
পড়তে পড়তে সোজা হয়ে বসে। মুখ থেকে মুছে ফেলে হাসি। স্থির কণ্ঠে বলে: চিনতে পারিস নাই? এততো চেনা! তবু চিনলি না তাকে?
এবার বিস্ময়ের পালা: চেনা! আমার! কবে কোথায় দেখেছি তারে?
আবার বুড়ি হাসিতে গড়িয়ে যায়। হাসতে হাসতেই বলে: ওরে, ওটা যে আমি! আমিই। আমার পয়লা যৌবনের আমি!
হাসতে হাসতেই বুড়ি আমার গায়ে ঢলে পড়ে। আমি আমার দাদির গায়ের উষ্ণতা পাই। তার অবয়বআলো আলো ছায়া ছায়া হয়ে আসতে থাকে।
আর তখনই জ্যোৎস্না নিভে যায়। চারপাশ অন্ধকার। জানালা গলে উঠোন দেখা যায় না। ঘরের ভেতরটাও নিকষ কালো।
এদিকে আমার গায়ে সেঁটে আছে এক নবযৌবনা। তার গায়ের ওম আমাকে আবিষ্ট করে রাখছে। কতক্ষণ কে জানে!
আমার চোখ কি আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসছে? মায়াময় ঘুম-ঘুম তন্দ্রাচ্ছন্নতায়?
ঘরের দরজা খোলার ক্যাচক্যাচ আওয়াজ পাচ্ছি। খুলে গিয়েছে দরজা। হ্যারিকেন হাতে ঘরে ঢুকল চাচাতো ভাই দিপু।
আমি জেগে আছি। বসে আছি বিছানার উপর। দিপু তো অবাক। ধরেই নিয়েছিল আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।
বলল: ভাইজান, আপনি ঘুমোননি? যে ঘুঁটঘুঁট্টি অন্ধকার। আজ বোধহয় অমাবশ্যা।
অমাবস্যা! আমি যে আকাশে মেঘের সাথে পাল্লা দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ ভাসতে দেখলাম! উঠোন জুড়ে যে চলেছে জ্যোৎস্নার নাচন!
কিছুই বললাম না দিপুকে।
দিপু বলে যাচ্ছে: ঘরে টেবিলের উপর কেরোসিনের কুপি, মোম, ম্যাচবাতি সবই ছিল। জ্বালালেন না কেন? অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইলেন।
আমি শুধু বললাম: অন্ধকারেই ভালো লাগছিল।
দিপু মুচকি হাসল। বলল: আলো ঝলমল শহর থেকে অনেকদিন পর গ্রামে এলেন তো। তাই গ্রামের অন্ধকারও ভালো লাগছে।

সে হ্যারিকেনটা টেবিলের উপর রাখল। রাখতে না রাখতেই কারেন্ট চলে এলো।
দিপু হ্যারিকেন নিভিয়ে ওয়াস রুমে গিয়ে ঢুকল। এতোক্ষণ ডায়েরির প্যাকেটটা আমার হাতেই ছিল। রাখতে গিয়ে দেখলাম টেবিলের উপর ভাঁজ করে রাখা একটা কাগজ। তার উপর গোটা গোটা হরফে লেখা আমারই নাম।
কৌতূহলে কাগজটা তুলে নিলাম। একটা চিঠি। নাতিকে লেখা দাদির চিঠি। আমাকে লেখা বুড়ির।

৩. প্রিয় পুত্রের পুত্র! নাতি বলিতে পারিতাম। বংশানুক্রমিকতা বুঝাইতে এমন সম্বোধনই করিলাম। আমি মরিবার পর বহুকাল বাদে এই মর্তধামে আসিলাম। আমারই লেখা ডায়েরির ছেঁড়া পাতাগুলি একটি বড় খামের ভিতরে রাখা অবস্থায় দেখিয়া মনটা অতিশয় উতালা হইয়া উঠিল।
ইহা সত্য, আমি ডায়েরি লিখিয়াছি। লিখিয়াছি আমার নিজেরই জন্য। নিজেই লিখিতাম। আবার নিজেই পড়িতাম। ইহা নিজের সাথেই একাকী নিজেরই কথা বলা।
কেন বলিতাম? তাহা আমি নিজেও আজ পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বুঝিতে চাহি না ইহাই শেষ কথা। একেকবার ডায়েরি লেখা সারিবার পর নিজেকে ভারমুক্ত মনে হইত।
তবেআমার লেখা এই কথাগুলি আর কেহ পাঠ করিবে, তাহা আমি কখনই আশা করি নাই। কেহ পড়ুক, তাহা আমি কখনই চাইও নাই।
আজ কাগজগুলো তোমার হাতে দেখিতে পাইয়া বুক ধক করিয়া উঠিল। তোমাকে দেখিতে বড়ই সাধ হইল। তাই মাটির পৃথিবী ঘুরিয়া যাওয়া।
একটি কথা। আমার এই ডায়েরি পড়িতে চাও তো তুমি পড়। যে কথা আগে শুধুই আমার ছিল, এখন তাহা আমার আর তোমার শুধুই দুইজনার। তৃতীয় কেহ যেন ইহার মধ্যে কোনোভাবেই ঢুকিতে না পারে।
?? বেড়ে ওঠো বালিকা,
যৌবনবতী হও

৪. কে একজন কপালে হাত রাখল। প্রশান্তির স্পর্শ পাচ্ছি। মাথার চুলে বিলি কাটছে। মাথাটা যে ভার হয়ে ছিল, এতক্ষণ টের পাইনি। এখন হাল্কা লাগছে, নেমে গিয়েছে ভার। কেউ তো গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে। এ যেন মমতার পরশ। বাহ! আবার থুঁতনিও নেড়ে দিল।
এততো সোহাগ! কে গো?
ঝট করে চোখ খুলে গেল। সকালের কোমল রোদের ছটকা লাগলো।
এক বালিকা। হাসি হাসি মুখ। বসে আছে আমার শিয়রে। মুখে হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করছে।
কে গো মেয়েটা? কোন্ বাড়ির? দরজা তো বন্ধ। ঘরে এলো কীভাবে?
পাশেই শুয়েছিল দিপু। এখন নেই। ওর আবার সকাল সকাল ঘুম ভাঙে। আমাকে ঘুমে রেখে দিপু বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছে। আর এই ফাঁকতালে ঘরে ঢুকে পড়েছে মেয়েটি।
আমাকে চোখ খুলতে দেখে মেয়েটির সারা মুখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়লো।
বলল: কিগো, ঘুম বুঝি ভাঙে না! কতো বেলা হলো দেখো তো!
বিছানায় উঠে বসলাম। তাকালাম মেয়েটার দিকে। কেমন একটু চেনা চেনা লাগছে। কার যেন মুখের আদল।
জানতে চাইলাম: তুমি কোন্ বাড়ির মেয়েগো?
মেয়েটা অবাক হয়ে বলল: আমি আবার কোন্ বাড়ির হবো? এই বাড়িরই। কেন? আমাকে চিনতে পারছো না?
মাথা নাড়িয়ে জানালাম, না, চিনতে পারছি না
মেয়েটি বলল: আমি দিদুগো। থাক। আর চিনতে হবে না।
আমাকে ঠেলে দিল। বলল: যাও। ওঠো। হাত-মুখ ধুয়ে এসো। তাড়াতাড়ি করো। তোমাকে বিল পাড়ে নিয়ে যাবো। বিলের সকাল দেখাতে। খুব ভালো লাগবে তোমার।
কথাটা ঠিক। বাড়িতে এলেই আমি সকালবেলায় বিল দেখতে যাই। আমার প্রিয় একটা জায়গা। ওখানে গেলেই বিষণ্ন মনও ভালো হয়ে যায়।
আমি ওয়াসরুমে ঢুকলাম।
দিদু আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো বিল পাড়ে। ঠিক আমার প্রিয় জায়গাটাতেই। সামনে অথই জল। হাওয়ায় তির তির কাঁপছে। আশপাশে ধান ক্ষেত। বেরিয়ে আসছে সবুজ জালি। তারাও এ বেলায় হাওয়ার দলে। মনটা জুড়িয়ে গেল। বিল পাড়ের সবুজ ঘাসের উপর বসলাম। মেয়েটাও বসল আমার পাশ ঘেঁষে।
এতক্ষণ মেয়েটার বকবক চলছিল। এখন একদম চুপ। তাকিয়ে দেখি সে মুগ্ধ হয়ে ডুবে গেছে বিলের রূপমায়ায়। তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো মায়াময়। বিলের কয়েক ফোঁটা জল যেন ওরই চোখ দুটোয় টলমল করছে।
দিদু টের পেল, আমি দেখছি ওকেই। ওর ফরসা টকটকে মুখটা লালাভ হয়ে উঠল। মেয়েটা আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরল। ওর দিকেই তাকিয়ে বললাম: ধন্যবাদ।
দিদু অবাক হয়ে জানতে চাইল: কেন?
বললাম: এই যে আজ আমাকে একটা সুন্দর সকাল দেখালে। খুব ভালো লাগলো।
মেয়েটা আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। মৃদু কণ্ঠে বলল: কই, তুমি তো আমাকে আদর করলে না?
তার কণ্ঠে কি অভিমানের সুর? কই, তার মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। চোখে চোখে তার দীপ্তিমান চঞ্চলতা।
আমি বিলের দিকে তাকালাম। নরম গলায় বললাম: আদরটা এমনি এমনি আসে না। আর যখন আসে, তা অনুভবের বিষয়। এই যে তুমি আমাকে আজ এতো সুন্দর একটা সকাল উপহার দিলে, মনটা ভালো হয়ে গেল। তোমার উপর আমি খুব খুশি। এজন্য ধন্যবাদও তো জানালাম। আদরটা বোঝোনি?
চঞ্চল মেয়ে একবার এদিক তাকায় আরেকবার ওদিক তাকায়। বুঝতে পারছি, তার নিজেরও ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। ওভাবেই বলল: এভাবেই বুঝি আদর হয়? জানো, আমাকে কত কত লোক কত কতভাবে আদর করে?
বললাম: আদুরে মেয়ে তো আদর পাবেই।
এবার তার চেহারায় বিরক্তি ফুটে উঠল। নাক কুঁচকে বলল: কিন্তু আমার ভালো লাগে না। একদম না।
অবাক হয়ে জানতে চাইলাম: কেন?
দিদু ফিস ফিস করে বলল: তোমাকেই বলি, তুমি কাউকে বলে দিও না। সবাই আমাকেই দুষবে। বলবে, উঠতি বয়স আমার, তাই মনটাও ছোট। নিজে হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে পারে না!
বললাম: কে বলেছে তোমার মন ছোট?
দিদু বলে: ওসব থাক। আদরের কথা বলি তোমায়। ওরা কথায় কথায় জড়িয়ে ধরে। আমার গায়ে হাত দেয়।
: কারা? তোমার খেলার সাথীরা? সমবয়সি বন্ধুরা। ওরাই উৎপাত করে?
: সেটাই তো মুশকিল। আমার চাইতে বড়। বেশ বড়। কেউ চাচাতো ভাই। কেউ মামা। কেউ দুলাভাই।
কৌতূহল হলো। জিজ্ঞেস করলাম: কি করে ওরা?
: আদর।
: কেমন আদর?
: কেউ গাল টিপে। কেউ জড়িয়ে পিঠ খামচায়। ওটাও নাকি আদর। কিন্তু কেউ যখন একটা হাত মাথায় রেখে দোয়া জানাতে গিয়ে সবার আগোচরে আরেকটা হাত পিঠের ঠিক উল্টোদিকে এনে ঠেকায়, ওটাকে কি বলবে? কেমন আদর?। কেউ আবার ঠাট্টার সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে কোমরে হাত ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে পেছনটাও টিপে দেয়। এই হলো আদরের নমুনা।
: ঠাট্টার সম্পর্ক মানে কারা?
: দুলাভাইরা আছে। তাদের ভাইরা যত বড় সড় হোক, আমাদেরই তো বেয়াই। বিয়ানের সাথে নাকি মশকরা করতেই পারে!
: তা পারে।
: আমি আগে এসবআদরের মর্ম বুঝিনি। বোকা তো। বয়সও কম। আদর করা ময়-মুরুব্বি আর ঠাট্টার দুলাভাই বেয়াইরাই আমাকে বুঝদার সোমত্ত বানিয়ে দিল। এখন কারো চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি মতলবখান কি।
এরপর দিদু আরও একটা ঘটনার কথা বলল, এমনটা কখনো ভাবাই যায় না। ঐটুকু বয়সে তার নিজেরই অভিজ্ঞতা।
গরমকাল। বাড়িতে প্রচুর গাছপালা থাকলেও সেকালে বিজলি বাতি হাওয়ার নামগন্ধও নেই। বাড়িতে এসেছে দুলাভাই। দুলাভাই মানেই আদর আপ্যায়ন হৈ হল্লার ঢল। সবার ব্যস্ততা দুলাভাইকেই কেন্দ্র করে।
মা রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। বুজান সাহায্য করছে তাকেই। দুলাভাই খাটের উপর বসে আছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে দিদু তালপাতার পাখা দিয়ে প্রাণপণে বাতাস করে যাচ্ছে। দিদুর প্রায় সমবয়সি বড় ভাই দুদু। এক হাতে একটা কাঁসার থালায় মিষ্টান্ন আরেক হাতে পানিভর্তি কাঁসার গ্লাস নিয়ে এলো।
গরম খুব বেশি। তাই দুদু খালি গায়ে। পরনে ইংলিশ হাফ প্যান্ট। সে টেবিলের উপর থালা গ্লাস রেখে চলে যাচ্ছিল। দুলাভাইয়ের ডাকে

ফিরে এলো।
দুদুর কাঁধ ধরে দুলাভাই বলল: দুদু, তুই তো বড়ো হয়ে উঠছিস। ব্যাটা হয়ে যাচ্ছিস।
বুকে হাত রেখে বলল: কিন্তু এখানে তো দুটো গোটা গোটা হয়ে উঠেছে। এ দুটো বাড়লে যে মেয়েদের মতো বুক হয়ে যাবে। গোটা দুটো ভেঙে দিতে হবে। খানিক ব্যথা পাবি। কিন্তু ভাঙতেই হবে।
বলতে না বলতেই জোরে চাপ দিল। কঁকিয়ে উঠল দুদু। পরপরই আরেকটা। দুদু পড়ি-মরি করে সরে গেল ওখান থেকেড়ণ্ডধু ব্যথায় নয়, খানিকটা লজ্জা পেয়েও।
দুলাভাই হেসে বলল: যাহ! তোকে ব্যাটামানুষ বানিয়ে দিলাম।
দুদুর সাথে দুলাভাইয়ের এমন আচরণে অস্বস্তি হচ্ছিল দিদুর। সে আরো জোরে পাখা নাড়তে শুরু করে। দুলাভাই বলল: পাখাটাই ভেঙে ফেলবি দেখতে পাচ্ছি। থাক। বাতাস আর করতে হবে না। তুই আমার সামনে আয়।
দুলাভাই দিদুর হাত থেকে পাখাটা নিয়ে বিছানায় রেখে দিল। দিদুকে সামনে টেনে আনল। ওর দুই কাঁধেই হাত। গভীর দৃষ্টিতে জরিপ করে নিচ্ছে দিদুকে।
দিদুর পরনে নিমা আর সুতি প্যান্ট। দুলাভাইয়ের দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে যেন। ভয় ভয় লাগছে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কাঁধ আঁকড়ে আছে দুলাভাই। তাই নড়তে পারছে না।
দুলাভাই হেসে বলল: কিরে পাথরের মতো হয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? হাসি খুশি থাকবি। তাহলে না ভালো লাগবে।
দিদু থতমত খেয়ে বলল: বাতাস করি।
দুলাভাই বলল: বাতাস লাগবে না। তোর বুবু নাই। তার বদলে তোর সাথেই কথা বলি। বৌয়ের বদলে শালীর সাথে।
দিদু তোতলাতে তোতলাতে বলল: আমার সাথে কি কথা?
দুলাভাই বলল: দুদুর গুটি হয়েছে। তোর হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছে তো। নিমার উপর দিয়েই তো দেখা যাচ্ছে। দেখি দেখি কতটুকু হয়েছে?
দিদু আঁতকে উঠে বলল: না।
দুলাভাই ভরসা দিয়ে বলল: ভয় পাসনে। তোর গুটি ভাঙবো না। মেয়েদেরটা ভাঙতে হয় না, বাড়তে দিতে হয়। বড় হতে হয়। যতো বড় ততো সৌন্দর্য।
অইটুকু দিদু, এসবের কি ছাই বোঝে। তার ভয় করতেই লাগল। শরীর কাঁপছে।
দুলাভাই সোৎসাহে বকবক করেই যাচ্ছে: শরম পাস কেন? মেয়েদের তো এটাই সম্পদ। যতো মধু এখানেই জমে। আর তার টানে ভোমরা ওড়ে।
দিদু নিজেকে ছাড়াতে গা মোচড়ায়। বলে: ছাড়েন দুলাভাই, পাকঘরে কাজ আছে।
দুলাভাই বলল: কাজ নাই। এখানে কাজ। আমার সাথে।
কোমর জড়িয়ে দিদুকে টেনে নিল আরো কাছে। বুঝা যাচ্ছে না তার মতলবটা কি। ঝট করে এক টানে নিমা গলার দিকে তুলে ফেলল। এক হাত কোমর জড়িয়ে, আরেক হাত বুকে।
ফিসফিস করে বলল: বাহ! বড়-সড়ই তো হয়ে উঠছে। তুলতুলেও। মধু জমতে শুরু করেছে। কোনোকিছু বুঝার আগেই দুলাভাই দুহাতে জড়িয়ে ধরল দিদুকে। মুখ নেমে এলো বুকে। দিদু কেমন এক ধরনের দোলা অনুভব করল। শিহরণ।
ওদিকে দুলাভাইয়ের একটি অবাধ্য হাত দিদুর তলপেট ছাড়িয়ে আরেকটু নিচে নেমে আসছে। দিদুর সারা শরীর রি রি করে উঠল। প্রবল বিতৃষ্ণা তার গায়ে যেন অনেক শক্তি এনে দিল। দুলাভাইকে সে জোর ধাক্কায় বিছানায় ফেলে দিল। এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।
দিদু এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।
বলল: তুমি তো ওদের মতো অমন করে আদর করলে না?
তারপর খিলখিল হাসি। হাসতে হাসতেই সে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই তার হাসির স্বর পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে তো দিদুও। কোমর বেঁকিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। কাল জ্যোৎস্না রাতেই তো এই তরুণী নেচেছিল উঠোনে।
আমার মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো: তু মি! মেয়েটির দেহে মুহূর্তে ফুটে উঠল নাচের ভঙ্গিমা। থুঁতনিতে একটি আঙুল। চোখে কটাক্ষ তুলে বলল: আদরের ভাষা বুঝে না তো নাগর।
বিস্ময়ে আমার সারা দেহ স্থির। বিলপাড়ে আমি বসেই আছি। মুগ্ধতায় তাকিয়ে আছি তরুণীর দিকে।
তরুণী আমার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলল: বেলা হয়েছে। যাই গো, নাইতে হবে।
তরুণী অবলীলাক্রমে নেমে গেল বিলের পানিতে। সে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। হাঁটু পানি থেকে কোমর পানিতে। তারপর গলা পানি। ছাপিয়ে গেল মাথায়। মাথার চুল। তবু বুঝা যাচ্ছে সে এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাওয়ার পথে পানির বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে। মেয়েটা তো মরে যাবে। পানিতে ডুবে। আশপাশে তাকালাম। কোথাও কেউ নেই। চিৎকার করে ডাকব। গলায় স্বর বসে গিয়েছে। এসময়ই মনে হলো, এর সবকিছুই আমার কল্পনা নয় তো?
হঠাৎ বাতাসের ঘূর্ণি। ঘূর্ণিতে পানির ধোঁয়াশা উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। সেখান থেকে খুনখুনে হাসি। আবছায়ায় এক বৃদ্ধার মুখের প্রতিচ্ছবি। আমার মুখ থেকে বিড়বিড় করে বেরিয়ে এলো: দাদী!
দিপু এসে পেছনে কখন যে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। তার ডাকে চমকে উঠলাম। ঠিক পেছনেই সে। তার দিকে ফিরে তাকালাম।
দিপু বলছে : ভাইজান, আপনি এখানে? ঠিক জানতাম। ঐ দিকে আম্মা নাস্তা সাজিয়ে বসে আছেন। সেই কখন থেকে খুঁজছি আপনাকে। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন। কোথাও না পেয়ে মনে পড়ল, বিলপাড় আপনার প্রিয় জায়গা। পেলে ওখানেই পাবো।
বললাম : হ্যাঁ। সকালটায় বিলের হাওয়া গায়ে লাগাতে ইচ্ছা করল।
দিপু অভিমানী গলায় বলল : আসবেন তো আমাকেও বললে পারতেন। সাথে আসতাম।
দিপুকে আর দিদুর কথা জানালাম না। পুরো ব্যাপারটার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারি নাই। কে জানে, দিদু নামে আসলেই কোনো বালিকা এই গাঁয়ে আছে কিনা!
বললাম: ঘুম থেকে উঠে তোকে দেখিনি। এখানে আসার সময়ও তোকে পাইনি।
দিপু বলল: এখন বাড়িতে চলেন। নাস্তা করবেন।
বাড়িতে ফিরে যেতে যেতে দিপুকে বললাম: আমাদের দাদির বাড়ি তো কাছেই। ওয়াহেদ চাচাকে অনেকদিন দেখি না। নাস্তা সেরে একবার ওদিকে যাবো। আবার দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসবো।
দিপু সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল।
বাড়িতে ফিরে নাস্তা সেরে কাগজের প্যাকেট থেকে ডায়েরিটা বের করলাম।
৫. নারী নারী হিসাবেই জন্মিয়া আঁতুড়ঘর হইতেই জানিতে বুঝিতে হয় শিখিতেও হয়, সে নারীই মাত্র। এই যে জগতে সে আসিয়াছে, এইখানে সকল ক্ষেত্রে তাহাকে পদে পদে ঝামেলা পোহাইতে হইবে, নিজেকে মানুষ ভাবিবার অবকাশ তাহার হইবে না।
একজন বাচ্চা ছেলের জন্ম হইলে জন্মকাল হইতেই পুরুষ। তাহার জন্মে আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। চারিপাশে সকলের মাঝে উৎসবের বান ডাকিয়া যায়। আমার একটি ব্যাটা হইয়াছে ভাবিয়া মায়ের বুকও অহংকারে ফুলিয়া ওঠে। ছেলের বদলে মেয়ে হইল না কেন ইহার জন্য আফশোসের লেশমাত্র না রাখিয়া ছেলে হইয়াছে বলিয়া বড়ি-ঘরের পরিবেশটাই আলোকময় হইয়া ওঠে। বংশের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে গো। বংশের ধারা রক্ষা হইল।
মেয়ে হইয়াছে শুনিয়াই কিন্তু মায়ের মনে দুরু দুরু, আশঙ্কার ড্রাম পিটাইতে থাকে। এই বুঝি কে আসিয়া আকথা-কুকথা বলিয়া যায়। মেয়ে হইয়াছে বলিয়া ইহার সকল দায় যেন মায়ের উপরই আসিয়া বর্তায়।
সকল ক্ষেত্রেই যে এমনটি ঘটে তাহা নহে। মেয়ের জন্মেও বহু পরিবারে হাসি ফুটিয়া ওঠে। স্বামী-স্ত্রী দুইজনই গর্ভ সঞ্চারের পর হইতে কন্যা সন্তানের প্রত্যাশায় স্বপ্ন বুনিতে থাকে।
তবে কন্যার জন্য নিরঙ্কুশ আনন্দ নাই। সংসারের কেহ কেহ এমনকি নারী হইয়াও ছেলে কামনা করে, না হইলেই বেজায় ব্যাজার হইয়া পড়ে। বাড়িতে নিরানন্দের পরিবেশ তৈরি হয়। এই নিরানন্দ গর্ভধারিণী জন্মদায়িনী মাকেও স্পর্শ করে। কাতর করে। যত দায় যেন তাহারই। মায়েরই।
কেহ কেহ বংশের প্রদীপ জ্বলিল না বলিয়া আক্ষেপ করে। নারী কি বংশধর নহে, নহে কো বংশের প্রদীপ? যদি তাহাই না হয়, একমাত্র পুরুষই যদি তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেখা যাইবে, নারীর আগুন ছাড়া একমাত্র পুরুষ আপনার প্রদীপ কিভাবে জ্বালাইতে পারে! নারী গর্ভে ধারণ না করিলে বংশধর কোথায় অংকুরিত হইবে, বিকশিত হইবে, অতঃপর ভূমিষ্ঠ হইবে? এইভাবে একজন মেয়েকে জন্মের সময়েই বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে সে নারী। ইহাই তাহার মূল পরিচয়। এই পরিচয়ই সারা জীবন তাহাকে বহন করিয়া জগতের সকল ঝুট ঝামেলা অবজ্ঞা

বহন করিতে হইবে।
আঁতুড়ঘর হইতে মায়ের কোলে করিয়া মেয়ে বাচ্চাটি বাহির হইয়া আসিয়া কঠিন সংসারে প্রবেশ করে। মেয়ে হওয়ার কারণে তাহার জন্য কঠিনই বটে।
দিন যত যায় ততই সে নারী হইয়া ওঠে। তাহাকে ধর্ম শিখানো হয়, তাহাকে কর্তব্য-কর্ম জানানো হয়, তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় সে নারী।
মেয়েদের বাড়িয়া ওঠা যেন দ্রুতই ঘটে। তাহাকে বড় করিয়া তুলিতে সকলেই উদগ্রিব। সেই ছোটটি কাল হইতেই ছেলেরা পুরুষরা তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া ছানিয়া বড় করিয়া তুলিতে উৎসাহী। ছেলেরা তাহাদের দেহাবয়ব সম্পর্কে যাহা জানে না, মেয়েরা তাহা আগেভাগেই জানিয়া ফেলে। যাহাদেরকে সন্দেহ করা যায় না এমন ময়-মুরব্বিরাই এই জানানোর কাজটি শুরু করিয়া দেয়। আদর-সোহাগ করিবার ছল করিয়া তাহারা স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো স্পর্শ করিয়া নিজেরা মনে মনে শিহরিত হয় এবং লাজ-নম্র মেয়েটিকে সুড়সুড়ি যোগায়।
ইহার পর পাড়া-প্রতিবেশী খেলার বন্ধু সহপাঠী পাড়ার বখাটে পোলাপানরা তো রহিয়াছেই। এতো সবতীক্ষ্ণ দৃষ্টির বেষ্টনির মধ্যে একটি মেয়ে সোমত্তা হইয়া ওঠে।
৬. ডায়েরির পাতা উল্টাতে না উল্টাতেই দিপু এসে হাজির। প্যান্ট শার্ট পরনে। আমাকে আয়েশে বসে থাকতে দেখে হৈ হৈ করে উঠল: ভাইজান, এটা কি হচ্ছে? বললেন, দাদির বাড়ি যাবেন। কাপড়-চোপড় পরে আমি রেডি। আর আপনি এখনো বসেই আছেন?
বললাম: কাছেই তো বাড়ি। এতো তাড়াহুড়োর কি আছে? যাবো, সবার সাথে দেখা করে চলে আসব। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র।
দিপু বলল: ভাইজান, ব্যাপারটা অতো সোজা না। এতোদিন পর যাবেন, দাদি নাই তো কি হয়েছে, তার ভাই আর ভাইয়ের পোলাপানরা কি আপনাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?
বললাম: তা যতক্ষণ সময় লাগবে, ততক্ষণ থাকলাম না হয়।
দিপু বলল: দুপুরের আগেই আমাদেরকে ফিরতে হবে। ঐ বাড়িতে কিছুই খাওয়া চলবে না। মা পই পই করে বলে দিয়েছেন। তিনি আপনার পছন্দের কী কী সব রান্নার আয়োজনে নেমেছেন সেই সকাল থেকেই।
বললাম: তার স্যাম্পল পেলাম তো সকালবেলার নাস্তাতেই।
দিপু রঙ্গ করে বলল: দুপুরে যা আয়োজন দেখলাম, হাঁটাহাঁটি করে পেট খালি করে নিন। নইলে ঠকবেন।
আঁৎকে ওঠার ভান করে বললাম : তাহলে এখনই পদযুগল রেডি করতে হয়। তা দাদির বাড়ি যাওয়ার পথে ঐ জঙ্গলটা এখনো আছে নাকি রে?
দিপু বলল: জঙ্গল, মানে আমরা বলি আড়া। এখনো আছে। ঐ পথেই যেতে হবে। তবে আগের মতো ঘন গা ছম ছম ভাব নেই।
গাছপালা কেটে কেটে পাতলা করে ফেলেছে। পায়জামা পাঞ্জাবি পরে চটজলদি রেডি হয়ে গেলাম। আমরা দুজন রওয়ানা করলাম দাদির বাড়ির উদ্দেশে।
মাথার উপর সূর্য উঠে আসছে। ধা ধা রোদ। আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছি। দিপুর মা দিপুর ঘাড়ে নিজেদের ক্ষেতের তরিতরকারি ফলমূল চাপিয়ে দিল। দিপুর মা আমার চাচি।
ঢাকায় থেকে থেকে তো হাঁটার অভ্যাস কমেই গিয়েছে। দিপুর হাতেও ভারি বস্তা। মাথার উপর চাঁদি ফাটা রোদ। খানিক হাঁটতে দুজনই দরদর ঘামতে লাগলাম।
ওভাবেই ঢুকে গেলাম আড়ার ভিতর। একটা বড়সড় গাছের নিচে দিপু ধপাস করে রেখে দিল তার হাতের ব্যাগ। আমার দিকে তাকিয়ে বলল: ভাইজান, ঘামতে ঘামতে গোছল করে ফেলেছেন। এই রোদের মধ্যে হেঁটে আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। এখানেই একটু বসেন। জিরিয়ে নেন।
আমি ওর বলার অপেক্ষায় নেই। গাছের ছায়ায় শুকনো পাতার উপর এর মধ্যেই বসে পড়েছি। দিপু কিন্তু বসল না।
বলল: ভাইজান, আপনার নিশ্চয়ই খুব পিপাসা পেয়েছে?
জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বললাম: পেয়েছে কি? পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।
দিপু আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বলল: আপনি বসে জিরান। আমি দেখি দুটা ডাব পাড়াতে পারি কিনা।
দিপু ডাবের খোঁজে গেল। আমি গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে বসে গাছেরই কাণ্ডে হেলান দিলাম। মায়াময় ছায়া। ঝিরিঝিরি বাতাস। সুমসাম নিরিবিলি পরিবেশ। ধীরে ধীরে গায়ের ঘাম শুকোতে শুরু করেছে। বেশ আরাম লাগছে। চোখ জোড়া আপনাআপনি ঢুলু ঢুলু হয়ে আসছে।
এভাবে কতক্ষণ কাটিল? কিছুক্ষণ! নাকি আরো! কেউ এসে আমার পাশে বসল। শুকনো পাতা মাড়িয়ে খস খস আওয়াজ তুলে তার আসাটা টের পেয়েছি।
এইতো বসল। দিপু কি? ডাব নিয়ে ফিরেছে? নাতো। স্পর্শটা অন্যরকম। দিপুর না।
চোখ খুলে গেল ঝটিতে। দিপু না।
আরে! দাদি বসে আছে আমার গা ঘেঁষে। আমার দিকেই এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে। চোখ খুলে যেতে তার ফোকলা দাঁতে তোবড়ানো মুখে অনাবিল হাসি খেলে গেল।
তাকে এমন পরিবেশে পাশে দেখে আমার বিস্ময়।
ঘোর কাটিয়ে আমিও অপ্রস্তুত হাসলাম। বললাম: আরে দাদী! তুমি এখানে কি করছো? আমরা তো তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি।
দাদি বুড়ি হলে কি হবে, রংঢংয়ের শেষ নেই। ভুরু ভঙ্গি করে বলল: মেয়েদের বিয়ের পর বুঝি বাপের বাড়ি আর নিজের বাড়ি থাকে? তিন জনমের বুড়ি আমি। সেই যে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকলাম, আর কি বেরুতে পেরেছি? মরে তেভূতা হয়েও পড়ে আছি তোদের বাড়িতে।
বললাম: সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের পিছু নিয়েছ কেন?
বুড়ির সারা মুখে আবার হাসি। বলল: বাহরে! তোরা যাচ্ছিস আমার বাপের বাড়ি। তামাশাটা আমি না দেখেই ছাড়ব? বাড়িতে কানাঘুষোয় শুনলাম তোরা যাচ্ছিস। আমিও তোদের পিছে পিছে হাঁটা দিলাম।
বললাম: বেশ করেছ। এই জংলায় এখন বিশ্রাম নাও।
বুড়ি বলল: অনেকদিন পর এই জঙ্গলে ঢুকলাম। এইটা এখন আর জঙ্গল কিরে, ক্ষেতজমি হয়ে উঠছে। চারপাশের গাছপালা কেটে কেটে লোকরা জমি বের করে দখল নিচ্ছে আর হাল আবাদ শুরু করেছে।
: এই জঙ্গলে চড়ে বেড়িয়েছ তুমি?
: তা না হলে বলছি কি? এখানে কতো খেলাধুলো করেছি। এখানে কেউ লুকোলে তাকে খুঁজে পেতেও মুশকিল ছিল, যদি না সে নিজে থেকে ধরা দিত। এখানে নাকি গারো পাহাড় থেকে হাতি নেমে আসত। বাঘও ডাকত।
: আমরাও ডাক শুনেছি। তবে শিয়ালের।
: পুরুষ মানুষ তো শিয়ালই। শিয়ালের ডাক না শুনে আর কিসের ডাক শুনতে পাবে?
: বেশ। তুমিই বলো, এ জঙ্গলে কয়টা বাঘ তুমি দেখতে পেয়েছ?
: বাঘ-টাঘ আর দেখবো কিরে, একটা ঘটনার পর এ জঙ্গলে আসাই তো বন্ধ করে দিয়েছিলাম।
: ঘটনা! কি এমন ঘটনা যে জঙ্গলের উপরেই রাগ করে বসলে?
: জঙ্গল নয় রে, মানুষের উপর রাগ। পুরুষ মানুষের উপর।
: ঘটনাটা আমাকে বলবে?
: আচ্ছা বলি। তুই আমার ডায়েরি পড়ছিস। তাই এই ঘটনাও জানতে পারিস। তবে আর কাউকে বলবি না।
প্রতিশ্রুতি দিলাম, কাউকে বলব না।
দাদি বলল সে ঘটনা। এটাও দিদুরই আখ্যান। ওরা বাড়ির উঠোনে খেলে। খেলা হয় বারবাড়িতে। ধানকাটা ক্ষেতখামারে ক্ষুলমাঠেও। একই বয়সের ছেলেমেয়ে ওরা। কেউ কেউ হয়তো এক দুই বছরের ছোট-বড় হতে পারে। কখনো এই আড়া-জঙ্গলেও খেলা হয়। এর মাঝেই জড়াজড়ি, টানাটানি, খামচাখামচি এমনকি ওড়না ধরে টানাটানিও চলে। এগুলো খেলার মধ্যেই। কেউ অত গুরুত্ব দেয় না, আমলও না।
দিদুর চাচাতো ভাই, ওকে গোদা বলেই ডাকে সবাই, দিদুর থেকে তিন চার বছরের বড়ই হবে। জোর করে এসে ওদের দলে মিশে, ওদের সাথে খেলে। দিদুকে জ্বালাতন উৎপাত গোদাই করে। আবার গাছপাকা আম, কলা, আতা, শরিফা এনে ওকেই দেয়। গোদার দোসর ছানা ওর থেকে বছর খানেক ছোট। খেলাধূলোয় এসে জোটে। সেই ছানাই একদিন খবর নিয়ে এলো, গারো পাহাড় থেকে বাঘের তাড়া খেয়ে একটা হরিণ ছুটতে ছুটতে সাত গাঁ পেরিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানকার এই আড়া-জঙ্গলে।
শুনেই দিদুর প্রবল আগ্রহ। কিন্তু একা তো আর জঙ্গলে ঢোকা যাবে না। দল বেঁধে গেলে হরিণ যদি আবার ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়!
গোদাই এসে প্রস্তাব দিল, চল, আমরা কজন মিলে দেখে আসি। কে কে যাবে? সেটাও ঠিক হলো। গোদা। দিদু। ছানা। আর পানু। পানু দিদুর সখী, বয়সে একটু বড়ই।

সেদিনও ছিল এমন খরখরে দুপুর। প্রচণ্ড রোদ। তেমনি গরম। চুপিসারে ওরা ঢুকল বনে। চারজনই। হরিণের খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে একেবারে জঙ্গলের মাঝামাঝি চলে এলো। হরিণের দেখা নেই। এর মধ্যে ছানা এক কাজ করেছে। সে তরতরিয়ে গাছে চড়তে পারে। সে চারটে ডাব পেরে আনল। সাথে ছিল চাকু। তাই দিয়ে একটু একটু করে ছাল কেটে দুটো দুটো করে ডাবের জোড়া বানালো। এক জোড়া গোদার হাতে। আরেক জোড়া ছানার হাতে। বাইরে বেরিয়ে দা যোগাড় করে পরে ডাবের পানি খাওয়া যাবে।

হরিণ তো দেখা হলো না। আরেকটু খুঁজে দেখা যাক। এগুতে যাবে, এই সময়েই পানু দিদুর কানে কানে বলল: আমার পেশাব পেয়েছে রে। বলল কানে কানে, কিন্তু শুনতে পেল সবাই।

গোদা বলল: বেশ তো। আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে আছি। ওখানে ঝোপ আছে। ওর আড়ালে গিয়ে তুই কাজ সার।

পানু তাই করল। ঝোপের আড়ালে চলে গেল। একটু পরেই ছানা বলল: আরে! ও যে ওখানে গিয়ে বসল, পানি তো নেই ঐ জায়গায়। গোদা, তুই ডাবটা ধর, আমি পানি নিয়ে আসছি।

ছানা ডাব জোড়া গোদার আরেক হাতে গছিয়ে দিয়ে পানুর উদ্দেশে হেঁকে বলল: পানু, তুই ওখানেই থাক। আমি পানি নিয়ে আসছি।

ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। গোদাও দুই হাতে দুই জোড়া ডাব নিয়ে ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সময় হয়তো খুব বেশি যায়নি, কিন্তু দিদুর কাছে মনে হলো অনেকক্ষণ।

এদিকে গোদাও ছটফট শুরু করেছে। বিড় বিড় করে বলছে: ইস! এখনো আসছে না।

দিদু বলল: তোমার আবার কি হলো।

গোদা অস্থিরতা প্রকাশ করে বলল: আর কতক্ষণ?

দিদু বলল: কি হয়েছে?

গোদা ফিসফিস করে বলল: আমারও তো পেয়েছে।

দিদু জানতে চাইল: কি?

গোদা একইভাবে বলল: হিসু।

দিদু বলল: ডাবগুলো আমাকে দিয়ে কাজ সারো।

গোদা প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল: মাথা খারাপ! কতো ভারি! এগুলো তুমি ধরে রাখতে পারবেনা। হাত ব্যথা করবে।

গোদা ডাবগুলো কিছুতেই দেবেনা দিদুকে।

দিদু বলল: তাহলে ওগুলো নিচে রেখে কাজ সারো।

এতেও গোদার আপত্তি: না না। খাওয়ার জিনিস নিচে রেখে অসম্মান করব না।

দিদু এ যুক্তিটা মানতে পারল না। কিন্তু এ নিয়ে আর তর্কও করল না। গোদা আরও অস্থির হয়ে উঠছে। একবার এদিক যায় তো, আরেকবার ওদিকে। আবার দেখছে ছানা পানু ফিরছে কিনা। ওদের এখনো কোনো খবর নেই।

গোদার সমস্যা দেখে দিদুও অস্বস্তি বোধ করছে।

গোদা বলল: তুই একটু সাহায্য করবি?

দিদু সাগ্রহে বলল: হ্যাঁ। বলো বলো।

গোদা ইতস্তত করে বলল: তুই কিছু মনে করবি নাতো?

দিদু বলল: না না। তুমি বলো।

গোদা বলল: তুই শুধু আমার প্যান্টের চেইনটা খুলে দে। আমি ওদিকে ফিরে কাজ সারছি।

খুব সংকোচ হলো দিদুর। গোদার পরনে ইংলিশ হাফ প্যান্ট। মুখ ফিরিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে চেইন খুলে দিল। ভাবল, কাজ সারতে গোদা উল্টোদিকে ঘুরে গিয়েছে। ঘাড় সোজা করে আড়চোখে দেখে, গোদা তেমনি দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

দিদুকে নড়তে চড়তে দেখে বলল: এভাবে কি কাজ সারা যায়? জিনিসটা তো ভিতরেই রয়ে গেল। কাজ করতে গেলেই পুরো প্যান্ট ভিজে যাবে। প্যান্টের ভিতর থেকে জিনিসটা বের করে দে।

দিদু লাল হয়ে উঠল। গোদা বলল: শরমের কিছু নাইরে। আমি তো তোর বড় ভাই। আর এখানে এখন কেউ নেই। ছানা পানুও নেই। আমার কাজটা তাহলে হয়ে যায়।

দিদুর ভেতরেও কেমন জানি এক ধরনের কৌতূহল জেগে উঠছে। আবার লজ্জাও।

লজ্জা হলেও এবার সে চোখ বন্ধ করল না। ছোট করল। জিপারের ফাঁক গলে তর্জনি ঢুকাল। আঙুল ঠেকতেই ফাঁক গলে তড়াক করে বেরিয়ে এলো উত্তেজিত শিশ্ন। দিদু সাথে সাথেই হাত সরিয়ে নিয়ে সেখান থেকে দুহাত সরে গিয়েছে। স্পর্শে কাঁপছে গোদাও। তার হাত থেকে মাটিতে খসে পড়েছে সবগুলো ডাব।

ওদিকে আরো একটা ঘটনা। ঝোপ ভেঙে চিৎ হয়ে পড়েছে পানু। তার উপর ছানা। দুজনই দুজনকে আঁকড়ে আছে। নগ্ন দুজনই।

দিদুর প্রাণটা ধক করে উঠল। ভয় গ্রাস করল তাকে। পড়িমরি করে সে ছুটতে লাগল। বেরিয়ে এলো জঙ্গল থেকে।

ঘটনা শেষ। বুড়িও আর পাশে নেই। এসে দাঁড়িয়েছে দিপু। তার সাথে এক কিশোর। কিশোরের হাতে দুটো ডাব। কেটে আনা। ডাবের পানিতে আরও স্বস্তি। আমরা জঙ্গল পেরিয়ে বেরিয়ে এলাম। কিশোরও আমাদের সাথে। সে ফলমূল তরিতরকারির বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছে।

?? কে আপন কে পর
কেহ কি কাহারো রয়

৭. কোনো মেয়ে যখন স্বামীগৃহে ঢোকে, তখন তাহাকে সবকিছু ছাড়িয়া নিঃস্ব হইয়াই এই ঘরে ঢুকিতে হয়। কিন্তু এই ঘরে ঢুকিলেই ঘরটি তাহার হয় না, কখনোই হয় না। সে নিজের বাবাকে ছাড়িয়া স্বামীর বাবাকে বাবা হিসেবে গ্রহণ করে, নিজের মাকে ভুলিয়া স্বামীর মাকে মা ডাকে; কিন্তু তাহারা কেহই তাহাকে তাহাদের মেয়ে হিসাবে গণ্য করিতে পারে না। দেবর ননদ ননাশ সকলের ব্যাপারেই তাহা প্রযোজ্য।

আর স্বামীপ্রবর? স্ত্রীকে পাইয়া তাহার প্রবল ক্ষুধা সুবিপুল চাহিদা। তাহার ক্ষুধা উদরের। মনের। হৃদয়ের। মগজের। দেহের। সকল চাহিদা মেটানোর দায় স্ত্রীর। স্ত্রীকে সে নানারূপে দেখিতে চাহে। স্ত্রী নানা বেশ ধারণ করিয়া স্বামীর চাহিদার সম্মুখে হাজির হয়।

স্বামীর কাছে একজন মেয়েকে হইতে হয় স্ত্রী, শয্যাসঙ্গিনী, বেশ্যা, বউ, বন্ধু, মা, বাবুর্চি, কেয়ারটেকার, গভর্নেস, হিসাবরক্ষক, আরও অনেক কিছু।

স্ত্রী হিসেবে সে যখন ঢোকে, পুরো সংসারটাই তাহার কাঁধে আসিয়া চাপে। চুলা হইতে শুরু করিয়া বিছানা পর্যন্ত। রান্নাবান্না বাজার-সওদা গোছগাছসহ সংসারের সব চাহিদা মিটাইয়া এদিকে স্বামীজীর হাত-পা টিপিয়া, গা-গতর দলাই-মথাই করিয়া, মাথার চুল টানিয়া দিয়া ঠোঁটে পরমাদরে চুম্বন ঠেকাইয়া পাশে শুইতে হয়।

তখন প্রয়োজন পড়িলে স্ত্রীকে বেশ্যার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হয়। চব্যচোষ্যলেহ্যপেয় যাবতীয় আসনচর্চার মাধ্যমে পুরুষপ্রবরের ক্ষুধা উদ্রেক করিয়া নিজেকে উজাড় করিয়া তাহার চাহিদা মিটাইতে হয়। ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে হয়। তৃপ্ত রাখিতে হয়। নিজের দিকে খেয়াল রাখিবার সময় নাই- নিজের ক্ষুধা মিটিল কিনা, অতৃপ্তি রহিল কিনা তাহা আর কে দেখিবে! পুরুষের হইয়া গেলে নারী তখন উচ্ছিষ্ট, বিছানার একপাশে চিৎ হইয়া শুইয়া সিলিং-এ টিকটিকির ওতপাতা দেখে। পাশে পুরুষ মহাসুখে নাক ডাকিতে থাকে।

নারীর রজঃকালে বা সন্তানপ্রসবে ছিন্ন বন্ধীপেও পুরুষ তাহার ক্ষুধার ধৈর্য সংবরণ করিতে পারে না। নারীর অন্যান্য অঙ্গ এমনকি পশ্চাদ্দেশও ব্যবহার করিতে দ্বিধা করে না।

পুরুষ বৌ হিসেবে তাহাকে কামনা করে লাজনম্রতায়। আহ্লাদিপনায়। মান অভিমানে। লাজুক লাজুক রাঙা রাঙা ভূমিকায়।

আপদে বিপদে ঝড়-ঝঞ্ঝায় নারী পুরুষের পাশে দাঁড়ায় বন্ধু হিসেবে। সুখে-দুঃখে স্ত্রী তাহার পাশে। তাহার বল। ভরসা। প্রত্যাশা।

পরামর্শদাতা। স্ত্রীর চাইতে বড় বন্ধু আর কেহ হইতে পারে না।

অসুখ-বিসুখে দিন-রাত শিয়রে হাজির স্ত্রী। এখানে সে মায়ের ভূমিকায়। পরম আদরে মমতায় যত্নে ভালোবাসায় সারাক্ষণ সেবা শুশ্রূষা করিয়া যায়।

স্বামীর টাকা-পয়সার সংরক্ষক ও হিসাবরক্ষক স্ত্রী যদিও টাকা খরচের অধিকার তার নাই। বাড়ির কেয়ারটেকার স্ত্রী, যদিও বাড়ির অধিকার তাহার নাই, এমনকি কাগজে-কলমে বাড়ির মালিকানা স্ত্রীর হইলেও।

এমন বহু ভূমিকায় স্ত্রী।

স্ত্রীকে পুরুষ দেয় কি? বীর্য আর সন্তান ছাড়া আর কিছু না। ইহাই নিয়া পুরুষের যত পৌরুষ।

৮. বাইরে সন্ধ্যা নামছে। ঘরে আলো জ্বলেনি। বাড়ির আন্যান্য ঘরগুলোতে বাতি জ্বলে উঠছে। গ্রামের রাস্তা। ল্যাম্পপোস্টে আলো নেই। তাই বাইরে সন্ধ্যার আলো-আঁধারি।

খাটের পাটাতনে হেলান দিয়ে আধশোয়ায় বসে আছি। পাশেই খোলা জানালা। তাই দিয়ে বাইরের সন্ধ্যা নামা দেখছি।

কখন যে বুড়ি নিঃশব্দে পাশে এসে বসেছে টের পাইনি। বসেছে একদম আমার পাশ ঘেঁষে। তাও

বুঝতে পারিনি। টের পেলাম যখন সে কথা বলে উঠল। বোধহয় সে কিছুক্ষণ আগেই এসেছে। চুপচাপ বসে ছিল আমার পাশেই। আমার সাড়া-শব্দ না পেয়ে মনে মনে হয়তো অস্থির বোধ করছে।

থাকতে না পেরে বলে উঠল : কি হয়েছে রে তোর? বৌ মরেছে? ওহো, বিয়েই তো করিস নাই এখনো। একলা একলা লাগছে?

মুখ না খুললে এ ধারার সংলাপ চলতেই থাকবে। বুড়ির দিকে চোখ ফেরালাম। মৃদু হেসে বললাম: কখন এসেছ?

: সেই কখন! পুরুষ আমার! তার ধ্যানই ভাঙে না। ঘর সংসারের সবকাজ সেরে এখন একটু ফুরসত পেলাম, তাই আমার মানুষটার পাশে এসে বসলাম।

: কে তোমার মানুষ? কোথায় সে? সে ব্যাটা তো মাটির সাথে মিশে মাটিই হয়ে গিয়েছে।

খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ল বুড়ি। বলল: উনাকে শান্তিতে ঘুমাতে দে। তার চাইতে আয়, আমরা দুজনে এই সাঁঝবেলায় পীরিত রতন পীরিত যতন জমিয়ে বসি।

বিছানার উপরই সোজা হয়ে বসলাম। বললাম: বলো তবে তোমার পীরিতের গপ্পো। তোমার সেই আদ্দিকালের বদ্দিনাথের সাথে লটরপটর কিচ্ছা।

: সে আর সুযোগ হলো কই রে? প্রেমের বয়স বুঝ-বুদ্ধি হওয়ার আগেই তো মনের ভিতর ভয় ঢুকে গেল। মেয়েদের পীরিত মানেই বুঝিবা চিৎ হয়ে পড়া। আর ছেলেদের জ্বালাতন।

: সেই আড়া-জঙ্গলের ঘটনা মনে করে তো বলছো?

: হ্যাঁ। কোথায় হরিণ কোথায় কি! গোদা ওটা একটা ফন্দি এঁটেছিল আমাকে পটকানোর জন্য। আর তার দোসর তো ছানা। আর ওদের দলে ভিড়েছিল পানু। বেঈমান একটা। না হলে সখীর সাথে এমন করে!

অবাক হয়ে বললাম: তুমি আগে-ভাগে কিছু টের পাও নাই?

: এসবজানি নাকি আমি? বুঝি নাই তো কিছুই। ঘটনার পরও কিছু বুঝি নাই। পরে পানুই তো সব খুলে বলে। ছানার সাথে ওর আগ থেকেই ভাব-ভালোবাসা ছিল। পাটের ক্ষেতে আমবাগানে ওদের নাকি ওসব কাজ-কর্মও নাকি হয়েছে। পরের দিকে পানুর নাকি মজাই লাগতো।

: ওটা তো পানু ছানার ব্যাপার। এর মধ্যে গোদা এসে জুটলো কি করে?

: গোদা এসে নাকি ছানার পায়ে পড়ে। ওর সারারাত ঘুম হয় না আমা বিহনে। একবার যদি পায় সারা জীবন গোলাম হয়ে থাকবে আমার।

: গোদা এরপর আর জ্বালাতন করে নাই?

: গোদা আর ছানাকে দেখলেই আমার ঘেন্না হতো। বিশেষ করে গোদাকে। ওদেরকে আর কাছেই ঘেঁষতে দিই নাই। ওদেরকে খেলাতেও নিতাম না। আর পানুর সাথে চিরজনমের আড়ি। তবে সেদিনের ঘটনায় আমার কিন্তু কয়েকটা ভালো শিক্ষা হয়ে গেল। আর প্রেম বিয়ে এসবের ব্যাপারে ভয় ঢুকে গেল।

দাদী আমার খুলে দিচ্ছে তার জীবনের পরতে পরতে ঘটে যাওয়া টুকরো টুকরো কিছু কথা। আটপৌরে সাধারণ কিছু ঘটনা, কিন্তু দাদীর মনের উপর সেগুলো কম দাগ কাটেনি।

দাদী তখনও দিদু। সময় পেরিয়ে এসেছে বয়ঃসন্ধিকালে। এসময়ই প্রথম রজঃপাত। রক্ত দেখেই ভয় পেয়ে যায়। অন্যদের মতো সেও বিষয়টাকে লজ্জার মনে করে। কাউকে জানায়ওনি ভয়ে। প্রথমে মনে করেছিল, তার কি পেটে বাচ্চা এসেছে? এটা কি তারই লক্ষণ? ছেলে মানুষের সাথে কিছু একটা না করলে যে এমন কিছু হয় না, সেটা তার জানা। ভয়টা ওখানেই। দুলাভাই তো তার বুকে মুখ রেখেছিল, চুষেছিলও। এতেই কি এই অবস্থা? শুকনো মুখে সে ভয়ে ভয়ে থাকে।

মা-ই প্রথমে ব্যাপারটা ধরে ফেলে। প্যান্টে রক্তের দাগ থেকে। মা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে কোনো জবাবই দিতে চায় না। এক সময় ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে। পরে তাকে উদ্ধার করে বড় বোনই। মায়ের কবল থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। ধীরে সুস্থে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে বলে। সব মেয়েরই একটা বয়সে এমন হয়। এটাই নিয়ম। প্রতি মাসেই এখন থেকে এমনটা হবে। যখন হবে তখন যে কাজগুলো করতে হবে, তাও বুঝিয়ে দেয়।

দিদু রাতারাতি বড় হয়ে গেল। নিজের কাছে। মা-বাবা বড় বোনের কাছেও।

মা ঐদিনই বিছানায় শুয়ে ফিসফিস করে বাবাকে জানায়। দিদুর তখনও ঘুম পায়নি। মার মুখে নিজের নাম শুনে কান খাড়া হয়ে যায়। শুনতে পায় মা প্যান্টের দাগের কথা বলে। শুনে বাবা আলহামদুলিল্লাহ বলল মেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে বলে।

মা এবার তার উদ্বেগের কথা বলল: মেয়ে তো এখন বড় হয়ে গেল। আর ঘরে রাখা যাবে না। এখন ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাবা আমতা আমতা করতে থাকে। মা জোর দিয়েই বলে, সোমত্ত মেয়ে ঘরে রেখে দেয়া ঠিক না। আপদ বিদায় কর।

আপদ আর বিদায় কথা দুটো শুনে দিদুর খুব কান্না পেল।

এই শোয়ার ঘরটা বেশ বড়। এখানে দুটো খাট একসাথে জোড়া লাগিয়ে লম্বা বিছানা পাতা হয়। এখানে মা-বাবার সাথে দিদু আর তার ছোট এক ভাই আর এক বোন শোয়। ওরা মার পাশে থাকে। দিদু এখনো বাবার গলা ধরে ঘুমোয়।

এক রাতে আচমকাই দিদুর ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় ভূমিকম্প হচ্ছে। খাট নড়ছে। ভয় পায় দিদু। বাবাকে ডাকবে বলে সে হাত বাড়ায়। বাবা তার জায়গায় নেই। চোখ খুলে আবছা আলো,-আঁধারিতে দেখে বালিশের জায়গায় বালিশ পড়ে আছে। বাবা নেই। তার ভয় আরও বেড়ে যায়। ওদিকে জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসছে। কে যেন কাতরাচ্ছে। কাতরানিটা মার গলার আওয়াজ বলে মনে হলো।

দিদুর চোখ ওদিকেই গেল। আবছায়ায় যতখানি বুঝা গেল, বাবা মার উপর চড়াও হয়ে কিছু একটা করছে। ঠিক যেমন জঙ্গলের ঝোপে পানুর উপর চড়াও হয়ে ছানা যা করেছিল। অন্য সময় হলে সে ভয় পেয়ে চিৎকার দিয়ে উঠত। এখন সে ব্যাপারটা খানিক বুঝতে পারছে। তাই কিছু না করে ঘুমের ভান দেখিয়ে মটকা মেরে শুয়ে রইলো।

খানিক পর বাবা কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে বাথরুম সেরে দিদুর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। দিদুর উল্টো পাশে। কেন জানি তার হু-হু কান্না পাচ্ছে। আপনাআপনি চোখ থেকে জল গড়িয়ে নামছে। কেন, তার নিজেরও এর উত্তর জানা নেই।

এরপর থেকে রাতে দিদুর চোখে ঘুম কমই নামে। ঘুমিয়ে পড়লেও মাঝখানে ঘুম ভেঙে যায়। অসভ্যের মতো সে কান পেতে থাকে। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকায়।

প্রথম দিনে তার ভেতর যে ভয়টা কাজ করছিল, যেভাবে কান্না পাচ্ছিল, এখন আর তা নেই। এক ধরনের ভালো লাগার অনুভূতিই তার ভেতর কাজ করছে।

এই গভীর নৈশপ্রহরে সে ধীরে ধীরে মা ও বাবার ভিতর শুধুই জৈবিক ভূমিকা সেভাবে আর দেখতে পাচ্ছে না, তাদের ভেতরকার ভালোবাসাটাও আবিষ্কার করতে পারছে।

সারাদিনের ব্যস্ততা ও কর্মক্লান্তির পর এই তাদের নিরিবিলিতে দেখা মিলন, কথা বলা, ভাববি-নময়। শুধু শরীরী চাহিদা মিটানো নয়, মনেরও সংযোগ। দিদুর ভালো লাগাটা এখানেই।

দিদুর নতুন কয়েকটা অভ্যাস তৈরি হলো।

ড্রেসিং টেবিল বা আলমিরার লম্বা আয়নার সামনে নানা ভঙ্গিমায় মাঝেমাঝেই দাঁড়ানো। ঘন ঘন শাড়ি পরার ইচ্ছা। গুণ গুণ করে অস্ফুটে গান গাওয়া। মাথার চুলে ফুল গোজা।

গোদা কাণ্ডে ছেলেদের বা পুরুষদের নিয়ে যে বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে। তাহলে সব পুরুষই গোদা নয়, ভালেবাসার মানুষও আছে।

মা আজকাল কথায় কথায় বিয়ে বিয়ে করে। মনের গভীরে তারও রং বুঝিবা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

৯. বিয়েটা হয়ে গেল দুম করেই। বর পাশের গাঁয়ের। বড় বাড়ির বড় ছেলে। সবাই বলে রাজপুত্তুর। আমিও ভাবলাম তাই। মন কখনো পুলকিত হয়ে ওঠে। কখনো ভয়ে শরীর কাঁটা কাঁটা দেয়।

সবাই রাজপুত্র রাজপুত্র করছে। কিন্তু রাজার পুত্রটি যে আসলে কেমন তা কেউ আর বলছে না।

বিশাল দলবেঁধে ওরা মেয়ে দেখতে এলো। কাছাকাছি পাড়া। পায়ে হেঁটেই এলো। কেউ কেউ সাইকেলে চেপে। সাইকেল বহরও কম না। বড় বাড়ির বড় কারবার।

সাজুগুজু করে দিদুকে হাজির করা হলো বর পক্ষের মুরুব্বিদের সামনে। এতক্ষণ গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর নানা কথা চলছিল। দিদুর দিকে এক পলক তাকিয়েই সবার মুখ বন্ধ। কোনো শব্দ নেই। ছেলে পেলেরা পাত্রী দেখতে এসে যারা বাইরে বিড়ি ফুকতে ফুকতে গুলতানি মারছিল, তাদের মাঝেও খবর চাউর হয়ে গেল। তারাও দুদ্দাড় করে এসে ভিড় জমিয়ে ঘরে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল। পাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই লা-জবাব। কারো মুখে কোনো কথা ফুটছে না। শুনেছিল, মেয়ে সোন্দর-মোন্দর। কিন্তু দুধে আলতা মিশেল দেয়া ডানাকাটা পরীকেও হার মানিয়ে দেয় এমন কেউ

ভাবেনি। তার মধ্যে পরনে বাহারি শাড়ির সাথে সাজ-গোজ সব সুন্দরকেই ছাড়িয়ে গিয়েছে। বরপক্ষ এতই মুগ্ধ যে কনেকে কোনো সওয়াল-জবাবও করল না। বয়স কম হলে কি হবে, বাড়-বাড়ন্ত মেয়ে, বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই সংসারের ভার নিতে পারবে।

তেমন বেশি কিছু না দেখে মেয়েকে পাঠিয়ে দেয়া হলো অন্দরে। দিদু খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল। অন্দরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

যাওয়ার আগে ভেবে রেখেছিল, চোরাই চোখে পাত্রটাকে এক ঝলকে দেখে নেবে। কেমন রাজপুত্তুর, বুঝা যাবে তখন। কিন্তু পাত্র দেখবে কি, ভরা মজলিসে গিয়ে সে তো চোখ তুলেই তাকাতে পারে নাই। মাথা সব সময় নিচু করেই ছিল। কখনো কখনো চোখের পাতা আপনাআপনি বন্ধও হয়ে আসছিল।

তবে অন্যদের কাছে বিবরণ পেয়ে দিদু যা বুঝল, পাত্র আহামরি কিছু না। এমনিতে ছেলে তাগড়া জোয়ান আছে। শরীর স্বাস্থ্যও ভালো। মাথাভর্তি চুল। ঠোঁটের উপর পাতলা গোঁফও আছে। তবে গায়ের রংটা খানিক ময়লা। দিদুর পাশে দাঁড়ালে তাকে কালোই লাগবে।

দুলাভাই আরেক কাঠি উপরে। পাত্র দেখে এসেই সে হৈ হৈ শুরু করে দিল। দিদুকে সরাসরিই বলল: দিদুরে, তোর কপাল মন্দ। শেষ পর্যন্ত তোর বিয়ে হচ্ছে একটা কেলোভূতের সাথে। দিদুর জন্য পাত্রের যদি এতোই অভাব থাকে, তাহলে বললেই হতো, পাগড়ি পরে চলে আসতাম।

এসব কথায় দিদু মরমেই মরে যেতে লাগল। একটু কি মন খারাপ হলো পাত্র কালো শুনে? বড় বোন এসে দুলাভাইকে ধমক লাগিয়ে হটিয়ে দিল। গায়ের রং খানিক ময়লা হলো তো কি হলো? ছেলের গায়ের রং ধুয়ে কি কেউ পানি খাবে? ছেলে এন্ট্রাস পাস। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারির চাকরি করে। প্রেসিডেন্ট বদলায়, কিন্তু সেক্রেটারি তার চেয়ারেই বসা থাকে। বোর্ডের কাজকর্ম তো সেই দেখাশোনা করে। তার উপর এতো বড় বাড়ি। এতে ক্ষেতজমি হালআবাদ। দিদু তো রাজরানীর মতো হেসে-খেলে সারাটা জীবন কাটিয়ে যেতে পারবে।

মুরুব্বিরা কথাবার্তা সব সেরে মোহম্মদী পঞ্জিকা ঘেঁটে বিয়ের তারিখও ঠিক করে ফেলল। শুভস্য শীঘ্রম।

১০. বিয়ে বিয়ে কথা সরগোল শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে কটা দিন তরতরিয়ে পেরিয়ে গেল। দিদুর জন্য বিয়ে এক রহস্যপর্দা। চোখের সামনে থাকছে। চোখের পর্দায় ভাসছে। দুলে দুলে উঠছে। কিন্তু রহস্যের গুমোরটা ভাঙছে না। কখনো এই নিয়ে শিহরণ খেলে যাচ্ছে। কখনো শংকা-ভয় আচ্ছন্ন করে রাখছে। কখনো ভাবনায় রোমাঞ্চ জাগছে।

বিয়ে নিয়ে যতখানি না, যত শঙ্কা বাসর রাত নিয়ে। তখন নাকি বর শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক থেকে দানবে বদলে যায়। পারলে বৌকে কামড়ে আঁচড়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে।

দিদুর নিজের ভাবী তো আছেই, পাড়ার যত ভাবীরা এসে নিত্য তালিম দিয়ে যায়। সব তালিমের এক বয়ান, বাসরঘর কীভাবে সামাল দিতে হবে। বিবাহিত জীবনে ওটাই কিয়ামত। দিদুর মাথায় কিছুটা ঢোকে, বাকি সবই মাথার উপর দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

আসে বিয়ের দিন। বরযাত্রীর অপেক্ষায় সবাই। যাত্রীরা আসবে যেমন তেমন, হয়তো বেশিরভাগই পায়ে হেঁটে। তবে বর আসবে ঘোড়ায় চেপে। কেউ কেউ বলল, ঘোড়া নয়, বর আসবে আট বেহারার পাল্কিতে চেপে। ঐ পাল্কিতেই বৌকে নিয়ে ফিরবে। আবার কেউ কেউ নাকি বড় বাড়ির দিকে হাতি যেতে দেখেছে। হাতিটা যদিও সার্কাসের, বর-কনের জন্য ওটাকেই ভাড়া করে আনা হয়েছে। এখন হয়তো সাজানো চলছে।

কিন্তু একজন ছুটতে ছুটতে এসে খবর জানাল: বর আসছে। বর আসছে।

বিয়েবাড়িতে সাজ সাজ পড়ে গেল। বর আর বরযাত্রীদের সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাড়ির সাজানো তোরণের দিকে এগিয়ে গেল। অনেকের কৌতূহল বর কোন্ বাহনে আসছে তা জানার জন্য।

কেউ একজন ভিতরে গিয়ে খবর দিল: বর আসছে মোষের পিঠে চড়ে। যারা এই চমকপ্রদ খবর পেল, তারাই তাজ্জব বনে গেল। বরের এমন অভিনব বাহনের কথা এর আগে কখনো শোনা যায়নি। এমন একটা খবরে দিদুরও কান গরম হয়ে উঠল।

বর এলো সাইকেল চালিয়ে। বরের সাজে থেকেও সে সাইকেলের প্যাডেল মারতে মারতে। সাথে তার সাঙ্গপাঙ্গ দলও সাইকেলের উপরেই। বিয়ের পর কনেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মোষের গাড়ি। গাড়িটাকেও বেশ করে সাজানো হয়েছে টাটকা ফুল আর রঙিন কাগজ দিয়ে।

এইটুকু তো পথ। মাঝখানে অবশ্য জঙ্গলটা আছে। জঙ্গলের পাশ দিয়ে রাস্তা আছে। এতে অনেকখানি পথ ঘুরে যেতে হয়।

ওবাড়িতে গিয়ে দিদু টের পেল শ্বশুরবাড়ি কাকে বলে।

বর সাইকেল হাঁকিয়ে এলেও ফেরার সময় চড়ে বসল মোষের গাড়িতেই। তার সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলল আরেকজন।

মোষের গাড়ির ছৈ-এর দুটি খোলা মুখই ঢেকে দেয়া হয়েছে বিছানার রঙিন ফুলতোলা চাদর দিয়ে। ছৈ-এর ভেতরে শাড়ি-গয়নার টোপলায় নতুন বৌ দিদু। ঘামছে। তার পাশেই লোকটা। তার বর। সবাই ডাকাডাকি করছে শাহনেওয়াজ বলে। গাড়িতে উঠেই সে মাথার পাগড়িটা খুলে একপাশে সরিয়ে রাখল। পট পট করে আচকানের উপরের দিকে দুটো বোতামও খুলে ফেলল।

দুপুরে বিয়ে। ভোজ হতেই লেগে গেল এতো বেলা। সন্ধ্যা লাগে লাগে সময়ে জোড়া মোষ বর-কনের গাড়ি নিয়ে চলতে শুরু করল। আর অমনি ঢোলে পড়ল বাড়ি। বরের সাথে আসা ব্যান্ড পার্টিও চলতে শুরু করেছে বাদ্য-বাজনা বাজাতে বাজাতে। গাড়ির দুপাশে সার দিয়ে যেতে যেতে। গাড়ির চালক গাড়িয়াল ছোকরারও গানের মুড পেয়ে বসল। গাড়ি চালাতে চালাতে সেও চড়া গলায় গান ধরল।

দিদু তার হাতের উপর আরেকটি হাতের স্পর্শ পেল। ফকফকে ফরসা হাতের উপর আরেকটা কালো হাত। শরীরটা কেঁপে উঠল। রোমাঞ্চে নয়, খানিকটা শঙ্কায়।

কোমল কণ্ঠ সহানুভূতি জানাচ্ছে: গরম লাগছে? চিন্তা করো না। এইটুকুই তো পথ। চট করে পৌঁছে যাবো।

লোকটার নরম কণ্ঠের দরদ পেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হলো। ভালো আছে। কিন্তু এরপরেই দুম করে জড়িয়ে ধরল দিদুকে। এই চলন্ত গাড়িতেই। গালে চুমো খেল। চুমুর যে এতো জোর তা জানা ছিল না। ভারি সংকোচ হলো। লজ্জাও করতে লাগলো খুব।

এর মধ্যেই গাড়ি পৌঁছে গিয়েছে। গাড়ি থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে মোষ। বাড়ির মেয়েরা এসে ভিড় জমিয়েছে গাড়ির মুখের সামনে। তারা গাড়ির মুখের চাদরটা সরিয়ে নিয়ে বৌকে দেখতে লাগল। এর মধ্যেই শাহনেওয়াজ গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। দিদু কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। নেমে পড়বে কিনা ভাবার আগেই মুরুব্বি মতো কে একজন নিষেধ করে গেল: বৌ, তুমি নামবে না। গাড়িতেই বসে থাকো। তোমাকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

বাড়ির মেয়েরা গাড়িতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে নতুন বৌ দেখছে। বৌ দেখার আনন্দে হল্লা করছে। আবার টিপ্পনি কাটতেও ছাড়ছে না।

: আরে, এই মেয়ে আন্ধার ঘরে ঢুকলে তো কুপপি জ্বালানো লাগবে না। এমনিতেই ঘর আলো হয়ে যাবে।

: পাড়ার পোলাপানগুলো তো এখন উচ্ছন্নে যাবে। সবাই তো এই বৌয়ের পিছনেই ঘুর ঘুর করবে।

: যতো রূপ ততো অকম্মা।

: আরে! এ তো পিচ্চি। এতোটুকুন। এক রত্তি। আমাদের শাহের ভার তো সইতেই পারবে না।

মুরুব্বি স্থানীয়া এক মহিলা এসে ধমক দিয়ে সবাইকে সরিয়ে দিল। তারপর ডাকল শাহনেওয়াজকে। বলল: নয়া বৌকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ঘরে তোল।

শাহনেওয়াজ এগিয়ে এসে গাড়ির দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল: এসো। ধীরে ধীরে এসো।

এই বাড়িতে এখন আপন বলতে তো এই লোকটাই। আর কাউকে তেমনভাবে চেনাশোনাও নাই। সে লোকটার হাত ধরে গাড়ির ছৈ-এর বাইরে বেরিয়ে এলো। স্যান্ডেল জোড়া তো গাড়ির ভেতরেই কোথায় যে রেখেছে। কি করবে ভাবছিল। স্যান্ডেল ছাড়াই খালি পায়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়বে কিনা!

তাকে উদ্ধার করল মুরুব্বি মহিলাই।

শাহনেওয়াজকে উদ্দেশ করে বলল: নয়া বৌ পায়ে হেঁটে পয়লা বাড়িতে ঢুকবে না। তার একটা সম্মান আছে না?

নিয়মটা বাড়ির মেয়েরা জানে। তাই সবাই ঘাড় নাড়তে লাগল।

মুরুব্বি বলল: বৌকে কোলে করে নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হবে। কে কোলে নেবে? যার বৌ তাকেই

নিতে হবে। শাহ, বৌকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে আয়।
আকাশ থেকে পড়ল শাহনেওয়াজ। বলল: আমি! আমার সাজগোজ সবই যাবে।
: সাজগোজ এখন আর লাগবেনা। যাওয়ারই সময়। বৌকে গাড়ির গরমে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি? তাড়াতাড়ি বের করে ঠাণ্ডা বাতাসে নিয়ে যা।
শাহনেওয়াজ অগত্যা পাঁজাকোলা করে বৌকে তুলে নিল। পাশেই ছিল তার বন্ধু সিধু। বলে উঠল: ভাবী চিকনচাকন পিচ্চি হলে কি হবে, এমনিতে ভারি আছে। শাহু তুই একা পারবিনা। আমিও এসে সাহায্য করছি।
বলতে বলতে এসেই শাহনেওয়াজের হাতে হাত রেখে বৌয়ের নিতম্বে চিমটি কাটল। আচমকা চিমটিতে তাল সামলাতে না পেরে দিদু উফ বলে উঠল।
দিদু আড়চোখে বন্ধুটাকে দেখে নিল। এই লোক? ঐ বাড়িতে দিদু ও শাহনেওয়াজ যখন জোড়ে বসে আয়নায় মুখ দেখাদেখি আর রঙ্গ-তামাশা করছিল, তখন এই লোকটা বন্ধুর দাবি নিয়ে ওদের পিছনে বসেছিল আর সারাক্ষণ তার পেছনে চিমটি কাটছিল।
এখানেও সে? জ্বালাতে এসেছে?
ব্যাপারটা মুরুব্বি কিন্তু ঠিকই টের পেয়ে গেল। সে শক্ত মুখে বলল: উঁহুম। দুজনে চলবেনা। যার বৌ শুধুই সে কোলে তুলে নিবে। এই ছেলে, তুমি সরে যাও।
অগত্যা সিধুকে সরে আসতে হলো।
শাহনেওয়াজ তার বৌকে পাঁজাকোলায় নিয়ে অনায়াসেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। সারা পথেই সে তার বৌয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর দিদু লজ্জায় শরমে গরমে মরে যায়। সে তার বড় বড় ডাগর ডাগর চোখ দুটো বন্ধ করেই ছিল। হাঁটতে হাঁটতে এ নিয়েও কম রঙ্গ-তামাশা হলো না!
ঘরের বারান্দায় পাতা হয়েছে আল্পনা আঁকা শীতল পাটি। তার উপর বিছানো হয়েছে ফুলতোলা চাদর। রাখা হয়েছে আয়েশের জন্য দুটো কোলবালিশ।
দুই কোলবালিশের মাঝখানে বসানো হলো বৌকে। তার পাশে বসতে হলো বরকে। শুরু হলো বরণ, পরিচয়, কদমবুচি সালাম, সেলামি দোয়ার পর্ব।
পাশাপাশি চলল রঙ্গ-তামাশা টীকা-টিপ্পনির পালা। আবার কেউ কেউ বৌয়ের শাড়ি, গায়ের গয়নাগাটি পরখ করে দেখছে। সেসব নিয়েও কম কথা হচ্ছে না। সবকথায় ঠাট্টায় বৌ আর তার বাড়িকে খাটো করে দেখার চেষ্টা। দিদু যতো শুনছে, তার মুখ ততো কালো হয়ে আসছে। চোখ গড়িয়ে পানি নামি নামি করছে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রাখছে।
: ওমা! এই বুঝি শাড়ির নমুনা! এই শাড়ি তো আমাদের বাড়ির ঝি-চাকররাও পরে না।
: এসবকি গয়না দিয়েছে? এতো পাতলা! এর মধ্যে সোনা আছে তো? নাকি সবই খাদ?
এমন শতেক খুঁত। এমন ধারার কথার ফাঁদে পড়ে দিদু কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারে ভেবে কনের সাথে এসেছে তার বড় বোন। ওকে শ্বশুরবাড়িতে ঠিকঠাক গুছিয়ে দিয়ে দিনে দিনেই সে চলে যাবে।
সবার কথা শুনে সে বিনয়ের সাথে বলল: আপনাদের পছন্দ হয়নি বুঝি?
: এমন শাড়ি কি ঝিয়েরাও পরে নাকি?
: জ্বি। না পরারই কথা।
: দেখুন তো, আপনারা কেমন গয়না দিয়ে কনেকে পাঠিয়েছেন? বড় বাড়ির ইজ্জত কোথায় থাকল?
বড় বোন চিন্তিত। এমন একটু ভাব নিয়ে ধীরে সুস্থে বলল: বড়বাড়ির ইজ্জত। ভাববারই কথা। এমন শাড়ি কাজের মেয়েরা পরে না।
এক মহিলা মেজাজ খারাপ করে বলল: আপনি বলুন, পরা কি যায়?
বড় বোন তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানিয়ে বলল: না। পরা যায় না। কাজের মেয়েদের পরা যায় না। তবে বাড়ির বৌরা নিশ্চয়ই পরতে পারে।
মহিলারা জোর দিয়ে বলল: অসম্ভব। বৌরা এমন শাড়ি পরতেই পারে না।
এবার বড় বোনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল: যে শাড়ি বৌরা পরতেই পারে না, তেমন শাড়ি নতুন বৌকে পরানোর জন্য পাঠালেন কেন? নতুন বৌয়ের পরনে যা শাড়ি ব্লাউজ কাপড়-চোপড় গয়নাগাটি সবই এই বাড়ি থেকে গিয়েছে। আপনারাই বলছেন, গয়নাগুলো পাতলা, খাদ দেয়া। তাহলে আপনারাই বিবেচনা করুন, কনেকে সাজানোর জন্য আপনারা কেমন জিনিস পাঠিয়েছেন। আপনারাই বলে পাঠিয়েছেন, আপনাদের বৌকে বিয়ের সাজে সাজাতে হবে আপনাদেরই সব জিনিস দিয়ে। আমরা আলাদা ট্রাঙ্কও নিয়ে এসেছি। ওতে আমাদের দেওয়া বর-কনের কাপড় চোপড় গয়নাগাটি জুতা মোজা সব আছে। মিলিয়ে নিয়েন।
পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে দেখে মুরুব্বি নাক গলালো। বলল: এসব নিয়ে কথা কেন? আমাদের বৌ কি কম সুন্দর। যা পরে, তাতেই আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। সবতাকে মানায়।
বড় বোন মনে মনে মুচকি হাসল। দিদুও স্বস্তি পেল।

শুরু হলো উল্টো গান। ভারি শাড়ি ভারি গয়নার ভার এই পিচ্চি বৌটা পরে থাকতেই পারতো না। ভারের চোটে তার কষ্ট হতো। এখনকার সবকিছু ঠিকঠাক আছে। সবকিছুই ফিট।
খানিক বাদেই আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। শাহনেওয়াজ হিরের টুকরো ছেলে। হোক না একটু ময়লা, দেখতে শুনতে তো ভালো। শিক্ষিত ছেলে। ঘরেই খেয়ে ভালো একটা চাকরি করে। আয় রোজগার উপরি ভালো। এদিকে ক্ষেতজমি হাল চাষও আছে বিস্তর। ভালো জাত নামকরা বংশ। জামাই হিসেবে সে কি পেল? শুধুই এই একরত্তি মেয়ে? নগদ কিছু জোটেনি? লেনদেনের হিসাব-নিকাশ করে কিছু দিতে হবে তাতো নয়, মেয়ের বাবা খুশি হয়েই তো নগদ কিছু দিয়ে দিতে পারত।
এখানেও বড় বোনকেই ময়দানে নেমে মুখ খরচ করতে হলো: কথায় কথায় শুনি, ছেলেরা এতো বিশাল অবস্থা সহায় সম্পদ জোতজমির মালিক। তাদের যে নগদের এতো অভাব, হাত পেতে পরের কাছ থেকে নেয়া-খোয়ার অভ্যাস আছে, তারা যে ছেলেকে জামাই বানিয়ে বেচা-বিক্রিও করতে পারে, তা আমাদের বাপ-চাচাদের জানা ছিল না। ঠিক আছে, ফিরে গিয়ে তাদেরকে জানাবো।
এবারও মুরুব্বিকেই নাক গলাতে হলো। বলল: এগুলো মজলিশের কথা মজলিশেই থাক। বাইরে নাড়াচাড়া করার কোনো দরকার নেই।
বড় বোন মুখ ফিরিয়ে হাসলো মাত্র।
১১. এদিকেও হাসি। এই সন্ধ্যা ঘরে। বিছানায় আমার ঠিক পাশেই। অন্ধকারই যেন খুনখুনিয়ে উঠল। আরও গাঢ় কালো রং মেখে। বুড়ি হাসছে ফোকলা দাঁতে। বলল: ঐটুকু দিদু ঐদিনই বুঝে গেল, বড়বাড়ির লোকদের, বিশেষ করে মেয়েদের ত্যাড়াব্যাকা কথার জবাব দিতে হয় কীভাবে। বুজানও বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেল, আশা করি মেয়েগুলো তোকে আর ঘাঁটাবেনা। কিছু যদি বলেও, শরম পেয়ে চুপ করে থাকিস না। তুই তো আমারই বোন। মনে রাখিস, পয়লা রাতেই বিড়াল মারতে হয়।
এ কথাটা ভাবীরাও পই পই করে বলে দিয়েছিল। কিন্তু কীভাবে যে বিড়াল মারতে হয় তাই তো জানি না।
কৌতূহল হলো। জিজ্ঞেস করলাম, বিড়াল কী মারতে পেরেছিলে? নাকি আমাদের দাদা মেরেছিল?
দাদি যেন মহাউদাস। বলল: কে জানে! বিড়ালটা যে কেমন ছিল!
বললাম : ঠিক আছে। বিয়ে দিনের সব গল্পই তো শুনালে। এবার রাতের গল্প শুনাও।
চিমটি খেয়ে ওফ করে উঠলাম। মনে হয় বুড়িটাই দিয়েছে। বলল: রাতের গল্পে এতো ঝোঁক কেন? তোর বাপকে বলতে হবে, তাড়াতাড়ি তোকে বিয়ে দিয়ে দিতে। নইলে বখে যাবি দাদাদের মতো।
: শাহু মিয়া বুঝি বখে গিয়েছিল?
: নইলে ঐটুকু মেয়েকে রাতে একলা পেয়ে অতো টেপাটেপি খামচাখামচি করে?
: খুব খিদে পেয়েছিল বোধহয়।
: কি বলিস? সেদিন রাতে অতোগুলো মানুষের সামনে আমার পাশে বসে গপ গপ করে অতোগুলো পোলাও কোরমা গোশত মুরগির রোস্ট গিলল, তারপরও খিদে!
: তুমি বুঝি বসে বসে শুধুই দেখেছ?
: আমি আর কি করব? কত কত লোক সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে হা করে দেখছে, ওদের সামনে আমি খাই কি করে? প্লেটে আমাকে তো খাবার দিয়েছিলই। পোলাও কোরমা সবই দিয়েছিল। আমি শুধু নাড়াচাড়া করেছি।
পরিবেশনকারীদের চাপাচাপিতে দুই চার লোকমা মুখে দিয়েছি মাত্র।
: আহা! তাহলে তো তোমার খুব খিদে ছিল।
: তা ছিল।
: তবে তো ঘরে ঢুকে দাদার উপর তোমারই ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা।
: ওরে! তুই কোন্ খিদের কথা বুঝাতে চাইছিস? হাজার হলেও তো পুরুষ মানুষ।
ঘুরেফিরে এক গল্পেই ঢুকে পড়তে চাস। তাহলে

শোন, আমাদের প্রথম রাতের গল্প।
খাওয়া-দাওয়া নিয়ম-কানুন আচার-অনুষ্ঠান সব সেরে ফুল আর রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো বাসর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অনেক রাত। ঘরেও অনেক লোক। রঙ্গরস তামাশা মশকরা সেরে তারাও বেরিয়ে যেতে যেতে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। সবাই বেরিয়ে গেলে দরজায় খিল দিল শাহনেওয়াজ। কিন্তু বুঝাই যাচ্ছে, ঘরের চারপাশে ওত পেতে আছে উৎসাহীরা। ভেতরে কি ঘটে কি কথাবার্তা হয় জানতে উৎসুক তারা। কোনো কিছুতে তর সইছে না শাহনেওয়াজের। দরজা বন্ধ করেই সে দ্রুত পায়ে চলে এলো দিদুর কাছে। তাকে কোনোকিছু বুঝার সুযোগ না দিয়েই ঝটিতে জড়িয়ে ধরল। সাথে সাথে ঠোঁট চেপে ধরল ঠোঁটকে। আর ওদিকে হাত ছুটে বেড়াচ্ছে দিদুর সারা শরীরে। দিদু বাহুবেষ্টনে পড়ে অস্থির হয়ে পড়ল। অতি কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এই অস্থির নিষ্পেষণ থেকে। শাহনেওয়াজ অপ্রস্তুত হলো। বিরক্তও।
বলল: তুমি এখন আমার বৌ। আমি তোমার স্বামী। তোমার উপর আমার সমস্ত অধিকার। বাধা দিচ্ছ কেন?
দিদু কাঁপছে। তাই দেখে বলল: তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? এখানে তুমি আর আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই। তাই ভয় শরম পাওয়ারও কিছু নেই।
দিদু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। তার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। সেটাও সামলে নিল। মনে মনে ভেবে নিল, এমন যে ঘটবে সেটা তো ভাবী-রা তাকে আগেই জানিয়েছিল। বিয়ের একটা বড় কাজই হলো পুরুষ মানুষের শারীরিক চাহিদা মেটানো।
কিন্তু কেন জানি মন মানে না। কিন্তু ঐদিকে পুরুষটাও তো মনে হয় রাগ করে আছে।
দিদু সাহস করে শাহনেওয়াজের হাতের উপর হাত রাখল। বলল: আপনি রাগ করবেন না। আমি তো এখন থেকে আপনারই। আজ সারাদিন আপনার উপর অনেক পরিশ্রম গিয়েছে। আগে কাপড় ছাড়ুন। আমিও গয়নাগুলো খুলে রাখি। তারপর আপনি যা চান তাই হবে।
শাহনেওয়াজ দেখল মেয়েটা ছোট হলেও বুদ্ধিমতি আছে। সে তার কথা মেনে নিল।
দিদু ট্রাংক থেকে শাহনেওয়াজের জন্য ঘরে পরার কাপড় বের করে দিল। শাহনেওয়াজ কাপড় বদলে নিল। দিদু কাপড় তেমন একটা বদলালো না। শুধু গায়ের ভারি গয়নাগুলো খুলে ট্রাংকে রেখে দিল।
দিদু খেয়াল করেছে, টেবিলের উপর এক গ্লাস দুধ আর এক জগ পানি খালি গ্লাস রাখা আছে। সে দুধের গ্লাসটা নিয়ে এসে শাহনেওয়াজের হাতে দিল। শাহনেওয়াজ অর্ধেক দুধ খেল, বাকি অর্ধেক জোর করে দিদুকে খাইয়ে দিল। পানি পানের পর দিদু শাড়ির আঁচল দিয়ে স্বামীর মুখ মুছে দিল।
পুরো ব্যাপারটা শাহনেওয়াজের ভালো লাগল। এরপর মেয়েটা যা যা বলল, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেল শাহনেওয়াজ।
তারা দুজন এখন থেকে চিরস্থায়ী বন্ধনে। কারো থেকে কারোর আগলা হওয়ার সুযোগ নেই। এখন থেকে তারা একজন আরেকজনকে চিনবে জানবে বুঝবে। এই চেনা জানা বুঝার মধ্য দিয়েই একজন আরেকজনকে ভালোবাসবে মন ও হৃদয় দিয়ে। মন হৃদয়ই একজনকে আরেকজনের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। একজন আরেকজনকে সবকিছুই উজাড় করে দেবে।
ওরা হ্যারিকেনের সলতে কমিয়ে ঘরটাকে আলো-আঁধারি করে রাখল। দুজন দুই বালিশে মাথা রেখে মুখোমুখি গল্প শুরু করল। ফিসফি-সিয়ে। গল্পে গল্পে কখন যেন দুই মাথা এসে আশ্রয় নিয়েছে এক বালিশে।
যখন ভোর হয় হয়, মোরগ দিনের প্রথম বাক দিয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় দিদু তার দুই হাতের কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে শাহনেওয়াজের ঠোঁটে জীবনের প্রথম চুমো খায়। শাহনেওয়াজও পরম মমতায় দিদুকে বুকে টেনে নেয়।
আমার মনে প্রশ্ন: বিড়াল কি মরেছে? কে মারল?
বুড়ির খিলখিল হাসি সারা অন্ধকার ঘরে।
আর তখন বাতি জ্বলে উঠল। সুইচ টিপেছে দিপু। সে ঘরের চারপাশ তাকাচ্ছে। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল: কারো আওয়াজ পেলাম মনে হয়! কেউ কি ঘরে এসেছিল?
একটা বিড়াল হেঁটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওটিকে দেখিয়ে বললাম: বোধহয় বিড়ালটা।

১২. নারীর আপনার ঘর কোনটি?

দীর্ঘকাল যে ঘরে বসবাস করে, যে ঘরে সারাটা জীবন কাটিয়া যায়, যে ঘর নিজের মতো করিয়া তিলে তিলে সাজায়, তাহাই কি তাহার নিজের ঘর? গর্ব করিয়া বুক ফুলাইয়া যখন বলিবার, নারী তখন জোরের সহিত বলে, এই আমার ঘর। এই জোর করিয়া বলিবার মাঝে কোথায় যেন ফাঁক থাকিয়া যায়। মনের দ্বিধাকে গলা ফাটাইয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে চায়।
এই ঘরটি কি কখনোই তাহার আপন হইয়াছে? তাহার মেয়ে যেভাবে এই ঘরে বসবাস করে, ছুটাছুটি করে, গলা উঁচাইয়া কথা বলিতে পারে, সাধ আহ্লাদ করিতে পারে, সেই রকম কি সে করিতে পারে?

যেদিন সে এই ঘরে বৌ হইয়া ঢুকিয়াছে, সেইদিন হইতে তাহার গলার আওয়াজ নিচু হইয়া গিয়াছে। কাহারো সহিত বিনয়ে, কাহারো সহিত প্রেমে, কাহারো সহিত বিগলিত হইয়া, কাহারো সহিত কৃত্রিম কোপে মুখে মৃদু হাসি রাখিয়া বাতচিত চালাইতে হইবে। খিলখিল হাসি আর চড়া আওয়াজ মহাপাপ। মহাকষ্টে ও দুঃখেও জোরে কান্না তো চলিবেই না, এমনকি চোখের পানিও যেন দেখিতে না পারে। কান্না সকলের অলক্ষেই শুকাইয়া যায়।
পান হইতে চুন খসিলেই মা-বাবার অপরাধ। তাহারা আদব-কায়দা লাজ-শরম কাজ-কর্মের কোনো যথাযথ শিক্ষা দিতে পারেন নাই। আরও একটু বাড়াবাড়ি হইলে পিতৃকুলের জাতবংশ ঘরকুল লইয়া টানাটানি শুরু হয়। কিন্তু মা-বাবার কাছে যতদিন তাহার চাইতে অনেক বেশিদিন থাকা হইলেও এই বাড়ির শিক্ষার কোনো দোষ নাই। যত দোষ বাপের বাড়ির। বুড়িকালেও।
তাই এই ঘরকে আপন করিতে চাহিলেও ঘর আপন হয় নাই।
অন্যদিকে বাপের বাড়িতে কাটিয়াছে তো মাত্র কিছুদিন। বিবাহের আগে পর্যন্ত। সেই বাপের বাড়ি এখন-তখন সবসময় আপন হইয়া ওঠে। এইখানে এখনো সে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারে। গলা ছাড়িয়া বত্রিশ দাঁত মেলিয়া হাসিতে পারে। চোখ রাঙাইয়া ধমক দিতে পারে। অনবরত বকবক করিতে পারে। বিনা খবরদারিতে এ বাড়ি ও বাড়ি ছুটাছুটি করিতে পারে।
সবকিছু জড়াইয়া ধরিয়া এই বাড়িটাকেই তাহার আপন মনে হয়।

?? স্বপ্ন পুরাণ

১৩. কেহ একদিন নারীর অন্তরের গহিন হইতে বলিয়া উঠিল: আমি আসিতেছি।
নারীও গভীর মগ্ন। দোলাচলে। তাহার ভিতর সংশয়ও। দ্বিধান্বিত চিত্তে জানিতে চাহে: কে তুমি?
বোধি সাড়া দেয়: আমি তোমারই সত্তা। তোমাতেই আমার বসবাস।
তাহার স্পন্দন নারীকে শিহরিত করিয়া তোলে। নারী বলিয়া ওঠে: তুই যদি আমারই সত্তা হোস, তাহলে তুই আমারই উত্থান। আমার পুনর্জন্ম। নবজন্ম।
সুপ্তি ও নিমগ্নতা হইতে সে জাগিয়া ওঠে। সে যে সপ্রাণ হইয়া উঠিতেছে তাহার সাড়া দেয়। আনন্দও কি প্রকাশ করে?
তাহার সকল প্রকাশে নারীর সমগ্র শরীরে তোলপাড় হইয়া যায়। কোনো রকমেই তাহা চাপিয়া রাখা সম্ভব হয় না। আর তাহাতেই বাড়িময় সংসার জুড়িয়া রাষ্ট্র হইয়া পড়ে, বৌ গর্ভবতী হইয়াছে। ইহাতে কি পুরুষের পৌরুষ বাড়িয়া যায়? নিজেকে প্রজনন সক্ষম ভাবিয়া? সেই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি তাহার চালচলনে প্রকাশ হয়।
তবে নারীর যে গর্ব হয় তাহাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই গর্বের সহিত কোনো অহংকার মিশিয়া নাই। মাতৃত্বের গর্বের স্বরূপ বুঝিতে পুরুষদের হাজার হাজার বৎসর কাটিয়া যাইবে।
বৌ সন্তানসম্ভবা বলিয়া বাড়ির সবাই আনন্দিত। কিন্তু তাই বলিয়া বৌয়ের দিকে তাকাইবার ফুরসত কাহারো নাই। ছেলে হইবে না মেয়ে হইবে, যমজ হইবে না একটিই হইবে এইসব লইয়া জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। কিন্তু গর্ভে তাহাদের জল্পনা-কল্পনা ধারণ করিয়া মহিলাটি কি খাইল, কেমন রহিল- তাহা কে খেয়াল করিবে? নিজের খেয়াল নিজেই রাখো হে নারী!
এইদিকে সংসারের সকল কাজ তাহাকে নিত্য করিতে হইতেছে। এমনকি ভরা পেট লইয়াও। রান্নাবান্না, ঘর-গেরস্থালি, ঘর উঠান ঝাড়পোছ লেপাপোছা সারিয়া শাশুড়ির কোমরে বাত ব্যথার মলম মাখাইয়া পা টিপার কোনো কাজেই বিরতি নাই। এমনকি রাত্রি নিশিতে এই অবস্থাতেও স্বামী পুরুষটিকে তৃপ্ত করিতে হইবে।
যাহা করিবার করিয়া লও। সম্মুখে আমারই দিন আসিতেছে। মেয়ে হোক ছেলে হোক। সন্তান তো আমারই। আমারই গর্ভজাত। তখন তাহাদের সাথে লইয়া এই জগত আমার হইবে।



নিবন্ধ

বীমা শিক্ষা সচেতনতায় করণীয়

মীর নাজিম উদ্দিন আহ্মেদ

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। সরকার বিভিন্নভাবে শিক্ষিত জনশক্তি গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন। একটা লেভেল পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ শ্রীলঙ্কার প্রাথমিক শিক্ষার হার প্রায় ১০০% যা আমাদের অনুসরণযোগ্য। আবার আমরা যদি বীমা শিক্ষা ও সচেতনতা নিয়ে কথা বলতে চাই ভারত এই ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত করেছে যা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের বীমা শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে।

বীমার প্রচার ও প্রসার প্রক্রিয়া কি হবে তা সুনির্দিষ্ট করার সময় এসেছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বীমাকে আধুনিকীরণ করার বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন যেমন- ব্যাংকার অ্যাসিউরেন্স, ব্রোকারেজ হাউস, সিইওদের মধ্য থেকে বীমা কোম্পানির উপদেষ্টা নিয়োগ, সব কোম্পানির জন্য ump-এর মাধ্যমে ডেটাবেজ তৈরি, বাজারে অতিরিক্ত কমিশন ও অন্যান্য অনিয়ম রোধে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্ম দ্বারা সব কোম্পানির অডিট করিয়ে যথাযথ জরিমানা আরোপ করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোম্পানি পরিচালনার এবং কোম্পানির পাঁচ স্তর বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের চাকরির সুরক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। যা প্রশংসার দাবিদার।

এই বছরে বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "বীমা সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে" খুবই চমৎকার ও যুথোপযোগী কথা। এই কথার বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের বীমার মৌলিক বিষয়গুলো নিজেদের জানতে হবে এবং বীমা গ্রহীতা বা সেবা গ্রহণকারীদের জানাতে ও বোঝাতে হবে।

সে জন্য দরকার শিক্ষা ও জানার আগ্রহ এবং প্রচার ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। বীমার শিক্ষার অবস্থা আমাদের দেশে যা তা বিবেচনায় নিয়ে নেপোলিয়নের মতো বলতে হয় "আমাকে শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো"। এই কথার সূত্র ধরেই বলতে হয় আমরা কতজন বীমা শিক্ষায় শিক্ষিত? দেশে ৮১টি বীমা কোম্পানি কাজ করছে তাদের তদারকি করতে কি

পরিমাণ বীমা পেশায় শিক্ষিত পেশাজীবী দরকার, তা ভেবে দেখতে হবে, তা-না হলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। সুন্দর স্লোগানটি "বীমা সুরক্ষিত থাকলে এগিয়ে যাব সবাই মিলে" তা কেবল প্রবাদবাক্য হিসাবেই থাকবে। তা কখনো কাম্য হতে পারে না। বীমা কেন আমাদের সমাজে উপেক্ষিত, অবহেলিত তার কারণ খুঁজে বের করার উদ্যোগ নিতে হবে।

আমরা বীমা শিক্ষার জন্য তেমন কোনো ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে পারিনি বরং একটি মাত্র সরকারি ইন্স্যুরেন্স একাডেমি তাও আঁতুড় ঘরে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। যেখানে বিআইএ থেকে বীমা ডিপ্লোমাধারীরা খোদ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নয় সেখানে বীমা পেশার অগ্রগতি কীভাবে আশা করা যায়?

আমাদের বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ই একমাত্র বীমা শিক্ষায় শিক্ষিত ও বীমা কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন অন্যান্য সবাই প্রেষণে আছেন। তারাও যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী যারযার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন। তাই সম্মিলিতভাবে তাদের সবাইকে দেশের একমাত্র বীমা একাডেমিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং সেখানকার বীমা ডিগ্রিধারীদের স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

বীমায় কর্মরত সবার প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বীমা ডিপ্লোমাধারী না হলে উচ্চতর পদে পদোন্নতি না দেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে বীমায় কর্মরতদের মধ্যে বীমা শিক্ষার ও প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রশিক্ষিত পেশাজীবীই পারে পেশার প্রতি সম্মান দেখাতে। পেশার সম্মান বাড়লে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষিত জনশক্তি এই শিল্পে কাজ করতে আগ্রহী হবে। বর্তমান বীমা শিল্পের অধিকাংশ কর্মীই অন্য কোনো পেশায় সম্পৃক্ত না হতে পেরে এই পেশায় যোগদান করেছেন। কেউ কেউ অন্য পেশার পাশাপাশি এই পেশায় কাজ করছেন অর্থাৎ বীমা পেশাটা অপশনাল হিসেবে বেছে নিয়েছেন, এদের দিয়ে আর যাই হোক পেশার উন্নতি হবে না। পেশার মানোন্নয়নে পেশাজীবীদের এগিয়ে আসতে হবে আর অন্যদিকে পেশাজীবীদের জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে আপসহীন ভূমিকা পালন করতে হবে।

অন্যান্য পেশাজীবীদের মতো আমাদের পেশার লোকজনকেও নিজ পেশায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যারা নিজের পেশার প্রতি সম্মান দেখায় না অন্যেরা কেন তাদের সম্মান দেখাবে। আমাদের নেতিবাচক মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে, অন্যেরা বীমার প্রতি নেতিবাচক কথা বললে তা প্রতিহত করতে হবে। আর এই জন্য আমাদের নিজেদের বীমা সম্পর্কে প্রচুর জানতে হবে এবং অন্যদের জানাতে হবে।

আমাদের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অফিসারদের, বিভিন্ন বীমা কোম্পানির কর্মকর্তাদের বীমা কি, এর প্রয়োজনীয়তা কি, বীমার সুবিধা-অসুবিধা ও বীমা পলিসির কাজ কী? বীমা পলিসি দ্বারা কি কি সুরক্ষিত থাকে তা জানা ও বোঝার জন্য ইনসার্ভিস ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

আশ্চর্যের বিষয় আমরা অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে বীমা পেশায় নিয়োজিত আছি কিন্তু বীমা সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা নেই। এটা একটা পেশার জন্য লজ্জাষ্কর বিষয়ও বটে!

বীমা শিক্ষাটা আগে নিজেদের মধ্যে রপ্ত করে সাধারণ জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। বীমা ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান সব ক্ষেত্রেই কার্যকর। বীমা পেশায় নিয়োজিত থেকে আমরাই আমাদের ব্যক্তিগত বীমা, পারিবারিক বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, গাড়ির বীমা, প্রতিষ্ঠানের বীমার প্রতি উদাসীন। তাহলে আমরা অন্যদের কীভাবে বীমার প্রতি আকৃষ্ট করব। তাই বীমা সচেতনতা সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যেই শুরু করতে হবে। আমরা সচেতন হলে আমাদের পারিপার্শ্বিক সবাই সচেতন হবে বা আমরা আমাদের শ্রম ও মেধা দিয়ে সবাইকে সচেতন করতে পারব। বীমা একটি সার্বজনীন বিষয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমরা বীমা শিল্পের উন্নতির স্বার্থে অ্যাকচুয়ারিয়াল সাইন্স লেখাপড়ার জন্য সরকারিভাবে অনুদানের মাধ্যমে বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানোর পরিকল্পনা করছি অথচ বীমার অ ক খ শিক্ষার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিচ্ছি না। দেশীয় বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল না করে বরং নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে সবাইকে প্রাথমিক জ্ঞান দিয়ে ৮১টি বীমা কোম্পানির জন্য সাপোর্টিং স্টাফ তৈরির পরিকল্পনা কেন করছি না তা বোধগম্য নয়? বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে বিভিন্ন স্তরে নতুন কর্মী নিয়োগ অপেক্ষমাণ। বীমা শিক্ষায় শিক্ষিত ও বীমা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের মধ্য থেকে কর্মী নিয়োগ করা হলে এই শিল্পের জন্য ভালো উদ্যোগ হবে।

শিল্পের স্থায়িত্বের জন্য আমাদের শিল্পের উন্নয়ন প্রেক্ষিত কর্মী তৈরি করতে হবে। এই জন্য বিষয়ভিত্তিক ব্যাচ তৈরি করে দ্রুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি, বীমা শিক্ষা একাডেমি গঠন ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে ও বীমা কোম্পানিগুলোকে প্রশিক্ষণ ও বীমা শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে। প্রশিক্ষিত কর্মী ছাড়া বীমা শিল্প রুগ্‌ণ থেকে রুগ্‌ণতর হতে থাকবে। শিল্পে যারা কর্মরত আছি তারা কেউ তা মেনে নিতে পারি না। তাই সকলেরই এই ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট রয়েছে কিন্তু সেখানে বীমার ব্যাপারে খুব বিস্তারিত সিলেবাস নেই। কমপ্রিহেনসিভ বীমার সিলেবাস অন্তর্ভুক্তির জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ দরকার আরও দরকার প্রাথমিক পর্যায় থেকে বীমা শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক অবস্থা থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত বীমা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে ও পরবর্তীতে বীমা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বীমা শিল্পের উন্নয়নে নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগাতে পারে।

আমাদের জনগণকে বীমা সম্পর্কে সচেতন করার আরও একটি সহজতম উপায় হলো মিডিয়াকে কাজে লাগানো। মিডিয়া এখন অনেকটা আমাদের দোরগোড়ায়। প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে আমরা কাজে লাগিয়ে বীমার প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে বীমার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে পারি। যাতে আপামর জনগণ বীমার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়।

সাধারণ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং বীমা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা বলে বা লিখে বোঝাবার মতো নয়। আমরা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাবে প্রতিটি বীমা কোম্পানির জন্য দক্ষ ও যোগ্য মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে পারি না বা অসৎ ও অদক্ষ লোকের ভিড়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোককে কাজে লাগাতে পারছি না। বহু অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোক বর্তমানে বীমা শিল্পে কর্মরত আছেন, তাদের খুঁজে বের করে সঠিক মূল্যায়নের দায়িত্ব বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।

এই ব্যাপারে ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বও কম নয়। তাদের মালিকদের অনৈতিক আবদারও বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে এবং যোগ্য লোক নিয়োগের চর্চা তাদের মধ্যেও থাকতে হবে। অদক্ষ, অনভিজ্ঞ, অর্ধশিক্ষিত লোকই বীমা শিল্পের ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের অব্যবস্থাপনায় কয়েকটি লাইফ বীমার চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইদানিং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সত্ত্বেও একটি লাইফ বীমা অবৈধভাবে প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়োগ বহাল রাখাতে টাঃ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশনা দেওয়ার পরও ওই কোম্পানি তা প্রতিপালন করেনি। এমনকি প্রশাসক নিয়োগের কথা বললেও তাতে কর্ণপাত করেনি। এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ থেকে বের হওয়ার জন্য কঠোর ব্যবস্থা খোদ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বীমা শিল্পে কাজ করে ছয় দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন। আজ তার উত্তরসূরি হিসাবে বীমা কোম্পানির মালিক ও কর্মী হিসাবে সে শিল্পেরই আমরা বারোটা বাজাচ্ছি। তা উপরোক্ত ঘটনাই প্রমাণ করে আর এজন্য আমাদের একটু দুঃখবোধও নেই।

তাই আমাদের বঙ্গবন্ধুর পেশার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বীমা শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরিকরত হারিয়ে যাওয়া বীমার প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গাটা পুনরুদ্ধার করতে হবে। এটা শুধু এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে নয় বরং শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়নের সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমেই সম্ভব।

সময় এখন মুখের ফুলঝুরি নয় কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণের। আমাদের দেশে সোনার ছেলে কবে হবে যারা কথায় বড় না হয়ে কাজে বড় হবে। নিশ্চয় বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি হিসাবে আমাদের কাউকে না কাউকে এই মহান দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতে হবে।

নাটক

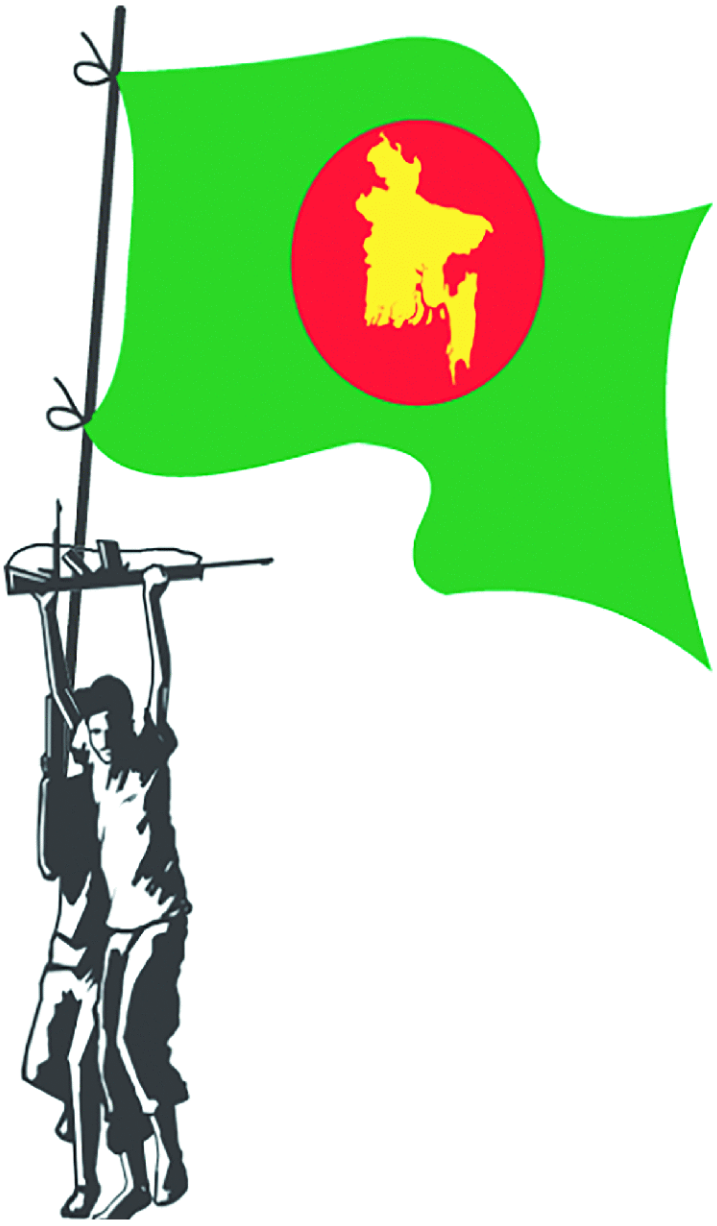

গোলপোস্ট

(ফেনী কলেজ মাঠ গণকবর নিয়ে রচিত নাটক)

আসাদুল ইসলাম

(ফেনী কলেজ মাঠ। ইউওটিসির সহযোগিতায় শহরের ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ চলছে। প্রশিক্ষণরত অবস্থায় কাঠের বন্দুক হাতে বেরিয়ে আসে বদরুদ্দোজা)

বদরুদ্দোজা : ফেনী খুবই শান্তিপ্রিয় একটা অঞ্চল। সেই শান্তিপূর্ণ অঞ্চল আজ অশান্ত হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ হাতে তুলে নিয়েছে রাইফেল। আমরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছি যুদ্ধের। ইউওটিসি'র ডামি বন্দুক, বাঁশের লাঠি, পোড়া মাটির তৈরি ডামি গ্রেনেড নিয়ে আমরা দিন-রাত ঘাম ঝরাচ্ছি, নিশানা ভেদের চেষ্টা চালাচ্ছি। যে কোনো সময় আমাদের মোকাবিলা করতে হবে শত্রুর আক্রমণ। সমগ্র দেশ আজ জ্বলছে। পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করেছে পাকিস্তানিরা। সবকিছু পুড়িয়ে ধ্বংস করে হলেও মাটির ওপর দখল বজায় রাখার কৌশলে, তারা শুরু করেছে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা। সেই গণহত্যার শিকার ফেনী-বাসী যে কোনো দিন থেকে পারে। ফেনীসহ দেশের মানুষকে গণহত্যার অভিশাপ থেকে বাঁচাতে আমরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি, শামিল হয়েছি প্রতিরোধ যুদ্ধে। সারাদেশের মতো ফেনীও আজ অগ্নিগর্ভ। অথচ শান্ত জনপদ হিসেবে ফেনীর ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন।

দূর অতীতে এ অঞ্চল ছিল সাগরের অংশ, উত্তর-পূর্বদিক ছিল পাহাড়িয়া অঞ্চলের পাদদেশ। ফেনীর পূর্বদিকের রঘুনন্দন পাহাড় থেকে কাজীরবাগ অঞ্চলে হয়তো আদিকালে শিকারি মানুষের প্রথম পদচিহ্ন পড়েছিল।

'ফেনীর দক্ষিণে এক ষর উপাম, হাজীগাঁও করিছিল সেই দেশের নাম'।

ফেনী নদীর নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম রাখা হয় ফেনী। বঙ্গোপসাগরের নোনা হাওয়া, ফেনী-মুহুরী-কহুয়া-ছিলোনিয়া নদীর গতিপ্রকৃতি, ছোট ফেনী-কালিদাস-পাহালিয়া খালের খরস্রোতা আর পীর-ফকিরের প্রভাব সমৃদ্ধ, পত্রে পুষ্পে পল্লবিত ফেনী।

'ফনী নদীতে বেষ্টিত চারিধার, পূর্বে মহাগিরি পার নাই তার'।

নদী ছাড়াও ফেনীতে আছে অনেক দীঘি। রাজাঝির দীঘি, শমসের গাজী দীঘি, বিজয় সিং দীঘি, পাল দীঘি। কুমিল্লা, নোয়াখালী

আর চট্টগ্রাম বেষ্টিত ছোট মহাকুমা আমাদের এই ফেনী। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি মিলিয়ে এক সমৃদ্ধ জনপদ।

ফেনীর ওপর দিয়ে চলে গেছে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। ফেনীর তিন দিকে ভারতীয় সীমান্ত হওয়ায় ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়ে আমাদের এলাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। গত বছর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ফেনী জেলার সবকটি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয় লাভ করেছেন। নির্বাচনের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এ বছর, ১৯৭১ সালের তেসরা মার্চ, ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। ফেনীর সংসদ সদস্যরা অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় চলেও গেলেন। কিন্তু মার্চের ১ তারিখে কোনো রকম আলাপ-আলোচনা ছাড়াই ইয়াহিয়া খান, তেসরা মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। বলা যায় বন্দুকের নলের জোরেই ইয়াহিয়া খান এই ঘোষণা দেওয়ার সাহস পেয়েছে। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশের মতো ফেনীও ফুঁসে উঠল।

(চারদিক থেকে মানুষ গর্জে ওঠে। তারা স্লোগান দেয়, মিছিল করে)

কোরাস : 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'। 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা'।

বদরুদ্দোজা : সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে, গগনবিদারী স্লোগান দেয়। সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে দেখা দেয় চরম অসন্তোষ। ফেনীর গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, মাইজদী সড়ক, চিটাগাং সড়ক- স্বাধীনতাকামী ছাত্রজনতা মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত করে তোলে। 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর ফেনী শাখাও গঠিত হয়েছে ফেনী কলেজছাত্র সংসদের ভিপি এবং মহাকুমা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে। তেসরা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সমগ্র বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। মূলত সেদিন থেকে ফেনীতেও পাকিস্তান সরকারের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, ফেনীর সব প্রশাসনিক কার্যক্রম এখন অচল।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন। তার ওই ভাষণ শোনার জন্য সারাদেশের মতো ফেনীর জনগণও রেডিওতে কান পেতে রইল। কিন্তু রেডিওতে সে ভাষণ প্রচার হলো না। ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ফেনীর বিক্ষুব্ধ মানুষ।

কোরাস : 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব'।

বদরুদ্দোজা : ৮ মার্চ পাকিস্তান সরকার বাধ্য হলো বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেডিওতে প্রচার করতে।

(৭ই মার্চের ভাষণ বেজে ওঠে, জনগণ সে ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শোনে। ভাষণ শেষে আবার শুরু হয় মিছিল)

কোরাস : 'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। 'জিন্না মিয়ার পাকিস্তান, আজিমপুরের গোরস্তান'।

বদরুদ্দোজা : ৭ মার্চের ভাষণের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী চূড়ান্তভাবে অনুভব করা শুরু করল যে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে চলেছে। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস। এদিন সমগ্র ফেনীতে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হলো।

(মিছিলের সবাই বাংলাদেশের মানচিত্রযুক্ত পতাকা উড়াতে থাকে)

কোরাস : 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'। 'তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি'।

বদরুদ্দোজা : ১৬ মার্চ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একদিকে আলোচনার নামে প্রহসন চালাচ্ছিল, আরেকদিকে ঢাকা আর চট্টগ্রামে জড়ো করছিল সৈন্য, ভারী অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ। ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়, সেই রাতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শুরু করে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা। হানাদার বাহিনীর আক্রমণে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পড়ে থাকে শুধু লাশ আর লাশ। ধানমণ্ডির ৩২নং বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা ইপিআর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়। নোয়াখালীতে সে বার্তা গ্রহণ করেন জেলা প্রশাসক মঞ্জুরুল করিম। ওয়ারলেস বার্তা তিনি ফেনী মহাকুমা সংগ্রাম পরিষদকে জানিয়ে দিলেন। ফেনী মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও আওয়ামী লীগ নেতা খাজা আহমদ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জানতে পেরে ফেনীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। ফেনী কলেজ, পিটিআই, ফেনী পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, ঈদগাহ মাঠে শুরু হলো আমাদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ।

(একদল নবীন মুক্তিযোদ্ধা ডামি অস্ত্র নিয়ে শারীরিক কসরত ও প্রশিক্ষণ শুরু করে)

ফেনীর কলেজ মাঠে বালির বস্তা ফেলে আমরা বাঙ্কার তৈরি করেছি। আমরা এখন শিখছি কী করে রাইফেল চালাতে হয়, টার্গেট প্র্যাকটিস করতে হয়, ক্রলিং করে এগুতে হয়, গ্রেনেড ছুড়তে হয়। একরাতে আমরা ফেনী থানার মালখানায় রাখা সবঅস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ লুট করে ফেললাম। আমাদের সহযোগিতা করলেন থানার ওসি মোহাম্মদ আলী।

(থানা লুটের দৃশ্য দেখা যাবে)

সেসব অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ রাখা হয়েছে খাজা আহমেদ সাহেবের জিম্মায়। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা কাঠের রাইফেল ফেলে আসল অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে পারব। এখন আমরা ডামি গ্রেনেড হাতে নিয়ে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করি। পাকিস্তানি সৈন্যরা আসলেই, আসল গ্রেনেড ছুড়ে দেব।

(মুক্তিযোদ্ধারা একসঙ্গে গ্রেনেড ছোড়ে)

১৪ই এপ্রিল থেকে খবর আসতে শুরু করল, লাকসাম হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপকভাবে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফেনীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যে কোনো সময় ফেনী আক্রান্ত হবে। পাকিস্তানি সৈন্যরা হলো প্রশিক্ষিত, পাকিস্তান সেনাবাহিনী পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী। সেখানে আমরা কলেজপড়ুয়া নবীন যোদ্ধারা থ্রি নট থ্রি আর রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কতক্ষণ টিকে থাকব? ফেনী রাজনৈতিক নেতারা বুঝলেন যে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে নামতে হলে আমাদের আরও প্রশিক্ষণ দরকার। রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে খাজা আহমেদের নেতৃত্বে আমরা ফেনী থেকে চলে যাচ্ছি ভারতের দেরাদুন ও চোত্তাখোলায়, উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে। ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি, ভারতের অন্য ক্যাম্পেও ফেনীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছে। মুক্তিযুদ্ধে ফেনী ২নং সেক্টরের অধীন। সেক্টর কমান্ডার হলেন খালেদ মোশাররফ এবং সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম।

(ফেনী কলেজ থেকে বদরুদ্দোজাসহ মুক্তিযোদ্ধারা বেরিয়ে যায়)

(খদ্দর ও একরামুল ফেনী কলেজে ঢুকে মাঠের গোলপোস্টে পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে দেয়)

একরামুল : আজ ২৩শে এপ্রিল, সাল ১৯৭১। এখন ঘড়িতে সকাল ১০টা। ফেনীবাসীর জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। পাকিস্তানি সৈন্যরা ফেনীর তিনদিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করছে।

(পাকিস্তানি সৈন্যদের তিনটি গ্রুপ তিনদিক থেকে অস্ত্র উঁচিয়ে ফেনী কলেজ মাঠে প্রবেশ করে। তাদের মাঝখান দিয়ে পাকিস্তানি পতাকা হাতে প্রবেশ করে রাজাকারদের একটি দল। রাজাকাররা ফুল দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে বরণ করে নেয়। খদ্দর চিৎকার করে পাকিস্তানি বাহিনীকে স্বাগত জানায়)

খদ্দর : পাকিস্তান, পিয়ারা পাকিস্তান। আহলান ওয়া সাহালান। ফেনীর জমিনে জানাই মোবারকবাদ, হে আল্লাহর পিয়ারা বান্দা। ফেনীর ইসলামী প্রিয় তৌহিদী জনতার পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। ফেনী কলেজের পক্ষ থেকে হাজার সালাম।

(ব্রিগেডিয়ার আসলাম কয়েকজন অফিসারসহ কলেজ মাঠে প্রবেশ করে। রাজাকার নেতা বেলাল আহমেদ খান ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কাছে এগিয়ে যায়)

বেলাল : মাহতারাম, আমি বেলাল আহমেদ খান, সাব ডিভিশনাল অফিসার, পাকিস্তানের একজন নগণ্য খাদেম এবং আপনাদের সেবক। ফেনীবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি, আহলান ওয়া সাহালান।

ব্রি. আসলাম : দিস ইজ ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজি, ফিফটি থার্ড ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড, আন্ডার নাইনথ ইনফ্যানট্রি ডিভিশন। আই অ্যাম ফ্রম নাইনটিন বেলুচ রেজিমেন্ট। অ্যান্ড অল আর মাই কলিগস।

(বেলাল ব্রি. আসলামের হস্ত চুম্বন করে)

বেলাল : খোশ আমদেদ, খোশ আমদেদ।

কোরাস : খায়ের মোকাদ্দমা কর না।
বেলাল : মাহতারাম, আপনাদের স্বাগত জানাতে এই মজলিশে শরিক হয়েছেন ফেনীর মাশহুর শাকস, নোটাবেল পারসন অব ফেনী, বিশিষ্ট নাগরিকরা। তারা প্রত্যেকেই পাকিস্তানের খাদেম এবং অলওয়েজ অ্যাট ইউর সার্ভিস স্যার।

(রাজাকাররা একজন একজন করে এগিয়ে আসে, বেলাল তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। ব্রি. আসলামের হাতে কেউ চুম্বন দেয়, কেউ ফুল তুলে দেয়)

বেলাল : ইনি জনাব শামছুদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরী, সভাপতি ফেনী মহাকুমা কনভেনশন মুসলিম লীগ।

ইনি জনাব নূর মোহাম্মদ চৌধুরী, সভাপতি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ।

ইনি জনাব রুহুল আমিন, ইনি আব্দুল গোফরান। এনারা দুজনই রাজাপুর ইউনিয়ন, দাগনভূইয়ার কৃতী সন্তান।

ইনি জনাবমিজানুর রহমান, ফাজিল ঘাট, দাগনভূইয়া।

ইনি খায়েজ আহম্মদ, ফেনী মহকুমা মুসলিম লীগ নেতা ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান।

ব্রি. আসলাম : নাইস টু মিট ইউ অল।
কোরাস : শোকর আলহামদুলিল্লাহ।
বেলাল : আমরা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে আপনারা ফেনী শহরে ইন্তেজাম নেবার সময় দেওয়ানগঞ্জ, আমতলী ও শহরতলীতে বিধর্মী দেশদ্রোহী গণশত্রুদের অনেক বাড়িঘর ধ্বংস করেছেন, অগ্নিসংযোগ করেছেন, হিন্দু মন্দির লুট করেছেন। আপনাদের এহেন কার্যকলাপে আমরা যারপরনাই উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত, উত্তেজিত। আমাদের দিলখুশ। আপনাদের আগমন ফেনীর মানুষের জন্য খাস রহমত।

(গোলপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দুই তরুণের দিকে চোখ পড়ে ব্রি. আসলামের)

ব্রি. আসলাম : এরা কারা?
বেলাল : এরা দু'জন ফেনী কলেজেরই ছাত্র, সায়েন্স ডিভিশন। ইয়ং ব্লাড, ভেরি মেরিটোরিয়াস অ্যান্ড পাকিস্তান লাভারস। মাশাল্লাহ। একজন একরামুল হক, আরেকজন আব্দুল জব্বার খদ্দর।

(একরামুল ও খদ্দর দৌড়ে এসে ব্রি. আসলামকে কদমবুসি করে)

বেলাল : হীরার টুকরা ছেলে স্যার, লাখে একটা।

(একরামুল বেলালের কানে কানে ভুল সংশোধন করে দেয়)

বেলাল :
লাখে দুইটা স্যার। বাই মিসটেক।
ব্রি. আসলাম : এখানে কাছাকাছি হিন্দু এলাকা কোথায় আছে?
বেলাল : দুইটা গ্রাম আছে হিন্দুতে ভরা। গ্রামভর্তি হিন্দু মেয়েছেলে শুধু কিলবিল করে, কিলবিল করে।
ব্রি. আসলাম : গ্রামের নাম তো বলছেন না।
বেলাল : মজলিশপুর আর মটুয়া, ধর্মপুর ইউনিয়ন। ফেনী রেললাইনের উত্তর-পশ্চিম দিক গেলেই ধর্মপুর ইউনিয়ন। লাখে লাখে হিন্দু।
ব্রি. আসলাম : মজলিশপুর, মটুয়া। সেখানে আগামীকালই অপারেশন, আপনার টিম রেডি রাখবেন।
বেলাল : আমার টিম সবসময় সব ধরনের অপারেশনের জন্য প্রস্তুত।
কোরাস : হামেশা তৈয়ার রাহো।
বেলাল :
দুশমন দূর হবে, আহা বহুত আচ্ছা সৌচ হয়। স্যার আপনারা যদি আর ১০টা দিন আগে আসতেন, ইশ।
ব্রি. আসলাম : আগে আসলে কী হতো?
বেলাল :
আর পালিয়ে চলে যেতে পারত না। দুশমনগুলো কাঠের বন্দুক নিয়ে এই করে, সেই করে। তাদের লম্ফঝম্ফ দেখলে মনে হয়, এই বুঝি তারা পাকিস্তানরে জবেহ করে ফেলল। নাউজুবিল্লাহ। পথভ্রষ্ট যুবসমাজ, তাদের মনে কোনো ইমান নাই, ইনসাফ নাই, পাকিস্তানের প্রতি দরদ নাই। এই দুশমনগুলোরে জনমের তরে একটা শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল।
ব্রি. আসলাম : দুশমনগুলো কোথায় পালিয়ে গেল?
বেলাল :
তাদের রিজিক চলে গেছে, তারা আর কোনো দিন পাকিস্তানে ফিরতে পারবেনা। ফিরলে রক্তের নহর বয়ে যাবে, একটা কারবালা হয়ে যাবে।
ব্রি. আসলাম : তারা সবাই যে হিন্দুস্তান চলে গেছে তেমন নাও হতে পারে, তারা হয়তো পাকিস্তানেই আছে, কোনো গোপন আস্তানায়।
বেলাল : সেটাও হইতে পারে।
ব্রি. আসলাম : হয়তো কেউ এই ফেনীতেই লুকিয়ে আছে।
বেলাল : তাহলে আমাদের কাজ হবে...
ব্রি. আসলাম : ওকে, ইটস এনাফ, জাস্ট আউট।

(ব্রি. আসলাম হাতের ইশারা করে সবাইকে বিদায় নিতে বলে। সবাই সালাম দিয়ে চলে যায়)

ব্রি. আসলাম : মিস্টার বিল্লাল।
বেলাল :
ইয়েস স্যার।
ব্রি. আসলাম : ইউ স্টে হেয়ার। আপনি এখানে অবস্থান করুন।
বেলাল :
আপনার মেহেরবানি স্যার।
ব্রি. আসলাম : দিস ইজ ফেনী কলেজ?
বেলাল : ইয়েস স্যার। অ্যান আইডিয়াল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে বছর প্রতিষ্ঠিত হয় তার পরের বছর, মানে ১৯২২ সনে, ফেনী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজরী ১৩৪২। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন, খান বাহাদুর বজলুল হক। এই কলেজে আরবি ফারসিসহ নানা বিষয়ে পাঠদান করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের একটি ঐতিহ্যবাহী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের এই ফেনী কলেজে। আমাদের ফেনীর গর্ব।
ব্রি. আসলাম : যেখানে দেশের শত্রুরা ট্রেনিং নেয়, সেটা গর্ব হয় কী করে?
বেলাল : এইটা ফেনীর জন্য খুবই লজ্জার, দুঃখের, হতাশার, অপমানের। আজ আপনাদের আগমনে ফেনীর সব কলঙ্ক দূর হয়েছে। আপনার ফেনীকে আলোকিত করেছেন।
ব্রি. আসলাম : আপনাদের মতো শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক থাকতে ফেনীতে কেন এত বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশদ্রোহীর জন্ম হলো?
বেলাল :
তবু আমরা ভেতরে ভেতরে সংগঠিত হয়েছি, নিজেদের মতো করে পরিকল্পনা করেছি, কিভাবে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও ভূখণ্ড অটুট রাখা যায়।
ব্রি. আসলাম : কিভাবে?
বেলাল : দেশদ্রোহী যারা আছে তাদের ধরে ধরে ফায়ারিং স্কোয়াডে দিতে হবে, প্রকাশ্যে গুলি করে মারতে হবে। দেশদ্রোহীদের খুঁজে পাওয়া না গেলে তাদের গোটা পরিবারকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে, যাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেউ আর দুশমনি করার সাহস না পায়।
ব্রি. আসলাম : খুব ভালো বলেছেন, আপনি একজন সাচ্চা পাকিস্তানি মরদ আছেন।
বেলাল : শুকরিয়া জনাব।
ব্রি. আসলাম : ফেনীর ঘরে ঘরে তল্লাশি হবে। কোনো বাড়ি যাতে বাদ না যায়। শত্রুর কোনো চিহ্ন যেন ফেনীতে না থাকে।
বেলাল : তাই হবে জনাব।
ব্রি. আসলাম : আমার পুরো ব্যাটেলিয়ান থাকবে আপনার সাথে।
বেলাল :
পাকিস্তান, জিন্দাবাদ।
ব্রি. আসলাম : যাদের ধরে আনা হবে, তাদের এই কলেজ কম্পাউন্ডেই ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেয়া হবে।

(গোলপোস্টের দিকে তাকিয়ে থাকে)

ব্রি. আসলাম : এই স্ট্রাকচারটা কিসের?
বেলাল :
গোলপোস্ট। আপনারা স্যার সময় অসময়ে এই মাঠে ফুটবলও খেলতে পারবেন। চাইলে আমি সে ব্যবস্থা করতে পারি।
ব্রি. আসলাম : যুদ্ধের পর বিজয়ী স্যাক্সনরা পরাজিত নিহত যোদ্ধাদের কাটা মুণ্ডুতে পদাঘাত করত, আর সেখান থেকেই ফুটবল খেলার আবির্ভাব, এটা কি আপনি জানেন?
বেলাল : না স্যার, জানি না। স্যার আপনিও যদি পরাজিত হিন্দুদের, দেশদ্রোহীদের কাটা মুণ্ডু দিয়ে ফুটবল খেলতে চান সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।

(ব্রি. আসলাম একটা দড়ি নিয়ে ফাঁসির রজ্জুর মতো গোলপোস্টে ঝুলিয়ে দেয়)

ব্রি. আসলাম : পরাজিত হিন্দুদের, দেশদ্রোহীদের জীবন্ত মুণ্ডুটা আমি এখানে ঝুলিয়ে দিতে চাই। দেশদ্রোহীদের সবসময় গুলি করে মারাটা খুবই বোরিং, কাউকে কাউকে ফাঁসিতেও ঝুলানো হবে। এই চিন্তাটা আপনার কেমন লাগল?
বেলাল : খুবই সৃজনশীল চিন্তা স্যার, ভেরি মাচ এক্সাইটিং। আমার তো স্যার এখনই মনে হচ্ছে

কিছু হিন্দুকে ধরে এনে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিই।
ব্রি. আসলাম : তাহলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, যান ধরে নিয়ে আসুন।
বেলাল : স্যার, এখনই যাব?
ব্রি. আসলাম : জাস্ট নাও।

(ঘণ্টা বাজতে থাকবে। সৈন্যরা মার্চ করে শহরে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে। সাধারণ জনগণকে পায়ের বুট দিয়ে, রাইফেলের বাট দিয়ে, কোমরের বেল্ট খুলে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে। যাদের মারা হচ্ছে বেলাল ও তার সঙ্গীরা তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। দড়ির এক প্রান্ত ধরে লম্বা লাইনে নির্যাতিতদের ফেনী কলেজের মাঠে ঢোকানো হয়।)

বেলাল : স্যার কতিপয় দুষ্কৃতকারী, দেশের শত্রু, ইসলামের শত্রু। তারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, জনগণের মনে সন্দেহের বীজ রোপণ করেছে, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে কোমলমতি যুবসমাজকে বিপথগামী করেছে, পাকিস্তানের মাটিতে হিন্দুস্তানের ঝাণ্ডা উড়ানোর স্বপ্ন দেখছে, আপনি তাদের বিচার করেন, ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেন। এমন শাস্তি প্রদান করেন যেন তাদের ফরটিন জেনারেশন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার সাহস না পায়।
ব্রি. আসলাম : এরা কি মাটিতে কোপাতে পারে?
বেলাল : কী বলেন স্যার, এদের কাজই তো মাটি কোপানো। সবশালা চাষার বাচ্চা। গায়ের মধ্যে শুধু মাটি মাটি গন্ধ, এখনো পুরোপুরি মানুষ হইতে পারে নাই, পাকিস্তানের খাদেম হইতে পারে নাই। স্যার, ফেনী কলেজের মাঠে কি আবাদ করবেন যে সারা মাঠ কোপানো লাগবে?
ব্রি. আসলাম : এদের দিয়ে গর্ত খোঁড়ান।
বেলাল : কত বড় গর্ত স্যার, সাইজ কী? গাছ লাগবেন নাকি?

(বি. আসলাম বেলালকে ইশারা করে কাছে ডাকে এবং কানে কানে কথা বলে)
বেলাল : ভেরি ক্লিয়ার স্যার, পানির চেয়ে ক্লিয়ার।

(বেলালের নির্দেশে সৈন্যরা সবাইকে দিয়ে জোর করে গর্ত খোঁড়ায়)
ব্রি. আসলাম : কতজনকে ধরে আনা হয়েছে এখানে?
বেলাল : কতজন আছে সঠিক পরিসংখ্যান স্যার আমার কাছে নেই, তবে এখনই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। (বেলাল আব্দুল জব্বার খদ্দরকে কাছে ডাকে) খদ্দর, ইধার আও। ইধার সে।
খদ্দর :
চাচাজি মুঝে বুলায়া?
বেলাল :
হ্যাঁ বাবাজি। স্যার জানতে চাচ্ছিলেন, এখানে আমরা কতজনকে ধরে এনেছি?

(খদ্দর পকেট থেকে ডায়েরি বের করে)
খদ্দর : স্যার, আমরা ধরে এনেছি মোট সাঁইত্রিশ জনকে। এর মধ্যে ৭৮ দশমিক সাত শূন্য শতাংশ মুসলিম, ২১ দশমিক দুই-চার শতাংশ হিন্দু এবং শূন্য দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ...

আগেই ব্রি. আসলাম খদ্দরকে থাপ্পড় মারে, খদ্দর মাটিতে শুয়ে পড়ে। ব্রি. আসলাম অস্ত্র দিয়ে মারতে উদ্যত হয়)
বেলাল :
হলে মাফ করে দিবেন। দুধের বাচ্চা, সবকুচ সেহি তরপার কেহনা নেহি শিখা। জারা মেহেরবানি কারকে উসকো কতল মাত কার না।

(ব্রি. আসলাম খদ্দরকে মাটি থেকে তুলে লাথি দেয়)
ব্রি. আসলাম :
জাস্ট, গেট লস্ট।

(খদ্দর টলতে টলতে ক্যাম্পের বাইরে চলে যায়)
বেলাল :
স্যার ইউ আর গ্রেট। আপনার দিল ফুলের মতো নরম আর সাগরের মতো বিশাল।
ব্রি. আসলাম :
মিস্টার বিল্লাল, বেশি কথা বলা আমার পছন্দ না।
বেলাল : অবশ্যই স্যার।
ব্রি. আসলাম :
আমার মনে হয় যথেষ্ট খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। এখন সবাইকে চোখ বেঁধে গর্তের পাশে দাঁড় করান।

সবাইকে চোখ বেঁধে গর্তের পাশে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। সৈন্যরা ফায়ারিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নেয়।)
ব্রি. আসলাম :
ফায়ার।

(সৈন্যরা ফায়ার করে, সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে)
ব্রি. আসলাম :
লাশগুলো গর্তে ফেলে মাটিচাপা দিয়ে দাও, যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়।
(সৈন্যরা লাশগুলো মাটিচাপা দিতে থাকে)
বেলাল :
ফেনী কলেজে প্রথম বাঙালি নিধন। আনন্দে আমার চোখ ভিজে যাচ্ছে স্যার। এত খুশি কোথায় রাখি?
ব্রি. আসলাম :
মিস্টার বিল্লাল।
বেলাল :
ইয়েস স্যার।
ব্রি. আসলাম :
কোনো বাঙালিকেই আমরা ছাড় দেবনা।
বেলাল :
অবশ্যই স্যার, বাঙালি মানেই তো হিন্দু, হিন্দুরা কিভাবে ছাড় পাবে? আমরা সবাই পাকিস্তানি। পাকিস্তান..
কোরাস :
জিন্দাবাদ।
ব্রি. আসলাম :
বাঙালিদের আমরা এভাবে গুলি করে কুকুরের মতো মারতে চাই। উই ওয়ান্ট ল্যান্ড, নট দ্য পিপল।

(ব্রি. আসলাম চলে যায়)
একরামুল :
চাচাজি, ব্রিগেডিয়ার স্যার ইংরেজি কী জানি বলে গেল?
বেলাল : আমরা মাটি চাই, মানুষ চাই না।
একরামুল :
আমরা তো মানুষ।
বেলাল : চুপ। আমরা হইলাম পাকিস্তানি। পাকিস্তান...
কোরাস :
জিন্দাবাদ

(রাজাকারের দল মিছিল করতে করতে বেরিয়ে যায়)

(ফেনী কলেজের মাঠে একরামুল খদ্দরকে সেবা শুশ্রূষা করে)

একরামুল : ভাই খদ্দর, ব্রিগেডিয়ার সাহেবের লাথিটা কেমন ছিল?
খদ্দর : লাথি খেয়ে মনে হচ্ছিল কলিজাটা বের হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা হচ্ছে ইমানি পরীক্ষা। আমার ইমান কতটা মজবুত তার একটা পরীক্ষা হয়ে গেল।
একরামুল : ব্রিগেডিয়ার সাহেব তোমাকে লাথি দিলেন কেন?
খদ্দর : মিলিটারি মানুষ, তার মেজাজ-মর্জির কি কোনো মা-বাপ আছে। আজ আমাকে লাথি দিয়েছে হয়তো কালকেই দেখা যাবে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মোলাকাত করছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাহিনী। তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারার সুযোগ আল্লাহপাকের খাস রহমত। এই বাহিনীর হাতে লাথি চড় কিল ঘুষি খাইতে পারাও লাইফের একটা বড় কিসমত।
একরামুল : আহা ব্রিগেডিয়ার সাহেবের একটা লাথি যদি খাইতে পারতাম, তাহলে জীবনটা ধন্য হয়ে যাইত।
খদ্দর : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যারে তারে লাথি দেয় না একরামুল। ভাই একরামুল, আমার মুখে একটু পানি দাও, চোখ দুইটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক।
একরামুল : ইয়া খোদা, ইয়া খোদা। তুমি খদ্দরের হায়াত দারাজ করো, জান ভিক্ষা দাও।

(একরামুল খদ্দরের মুখে পানি তুলে খাওয়ানোর চেষ্টা করে)

(পাকিস্তান-জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়ে রাজকারদের নিয়ে বেলাল ফেনী কলেজের ক্যাম্পে প্রবেশ করে)

ব্রি. আসলাম : এই কলেজের স্টুডেন্টের সংখ্যা কত?
বেলাল : সঠিক পরিসংখ্যান আমার কাছে নেই স্যার, তবে..
ব্রি. আসলাম :
নো, খদ্দরকে ডাকার দরকার নেই। আপনিই বলুন, আনুমানিক কত স্টুডেন্ট আছে?
বেলাল : আনুমানিক, তিন হাজার।

ব্রি. আসলাম :
কলেজে কি কোনো লাইব্রেরি আছে?
বেলাল : জি স্যার, লাইব্রেরি আছে, বেশ বড় লাইব্রেরি। দেশ-বিদেশের নানা পুস্তকের সমাহার সেখানে। আপনি চাইলে অবসর সময় বিদেশি কিতাব পড়ে কাটিয়ে দিতে পারবেন।
ব্রি. আসলাম : আমি চাই, ফেনী কলেজের লাইব্রেরিতে একটা বইও যেন না থাকে।
বেলাল : সববই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হবেজনাব, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। স্যার, আমাদের জন্য একটা খুশির খবর আছে।
ব্রি. আসলাম :
কী খুশির খবর?
বেলাল : আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী মজলিশপুর ও মুটিয়া গ্রামে সফল অভিযান শেষ করে ক্যাম্পে ফিরে খাসির রেজালা দিয়ে পরোটা খাচ্ছে। আমার বিবি নিজে হাতে খাসির রেজালা পাক করেছেন। আপনি যদি তকলিফ করে একটু তসরিফ নিতেন।
ব্রি. আসলাম :
কিসের তসরিফ?
বেলাল : এক পিস খাসির রেজালা যদি মুখে তুলে টেস্ট দিতেন তাহলে আমার বিবির কষ্টটা কামিয়াব হতো। স্যার আনি একপিস খাসির রেজালা?
ব্রি. আসলাম :
হেল ইউর খাসির রেজালা।
বেলাল : সরি স্যার।
ব্রি. আসলাম :
রেজাল্ট বলেন।
বেলাল : কিসের রেজাল্ট স্যার?
ব্রি. আসলাম :
মজলিশপুর-মুটিয়া অপারেশনের রেজাল্ট।
বেলাল : আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী সেখানে পঞ্চাশটা লাশ ফেলতে সার্থক হয়েছে।
ব্রি. আসলাম :
আমাদের কেউ কি হতাহত হয়েছে?
বেলাল : আস্তাগফিরুল্লাহ। আমাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে কেউ রুখে দাঁড়াবে এমন সাহস কারও নেই। মজলিশপুর মুটিয়ায় আমরা বিনা বাধায়, বিনা প্রতিরোধে, চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে অর্ধশত নারী পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছি। আমাদের বীরত্বগাথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হবে। স্যার জেনে খুশি হবেন, মজলিশপুর মুটিয়া অপারেশন থেকে আমরা কিছু আওরাত ধরে এনেছি আপনার মনোরঞ্জনে।
ব্রি. আসলাম :
কতজন ধরে এনেছেন?
বেলাল : তিনজন স্যার। থ্রি আওরাত। থ্রি ফর টক্সিক প্লেজার। যদি অনুমতি করেন তাহলে আপনার সেবায় তাদের নিযুক্ত করি।
ব্রি. আসলাম : মিস্টার বিল্লাল আপনার শহরে মসজিদের সংখ্যা এত কম কেন? আমি কোনো আজানের আওয়াজ পাই না।
বেলাল : স্যার শহরে মসজিদের সংখ্যা যথেষ্ট আছে, কিন্তু মোয়াজ্জিনরা আমাদের সঙ্গে শরিক হওয়ায় আজান দেওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।
ব্রি. আসলাম :
আপনি আজান দিতে পারেন?
বেলাল : পারি স্যার।
ব্রি. আসলাম :
আজ থেকে ক্যাম্পে আপনি আজান দেবেন। পারবেন না?
বেলাল : অবশ্যই পারব স্যার।
ব্রি. আসলাম :
আপনার থ্রি আওরাতকে আসতে বলুন। দেখি, তারা দেখতে কেমন?
বেলাল : তারা দেখতে, সিতারা।

(বেলাল একরামকে ইশারা করে। একরাম ভীত-সন্ত্রস্ত তিনজন নারীকে মঞ্চে নিয়ে আসে। বেলাল নারীদের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে)

বেলাল : ইটস অনলি ফর ইউ স্যার। ফেনীবাসীর তরফ থেকে আপনার জন্য সামান্য তোফা। আপনি এই জেনানাদের গ্রহণ করে ফেনীবাসীকে গৌরবান্বিত করুন।

ভিতরে নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করেন। একরাম নারীদের ভেতরে নিয়ে যায়)
ব্রি. আসলাম :
এবং কালো। আমি করুণা করে বড় জোর তাদের গুলি করতে পারি।
বেলাল : স্যার তাই করুন। এই কে আছ, স্যারকে একটা বন্দুক দাও।
ব্রি. আসলাম :
ডন্ট ট্রাই টু বিটু স্মার্ট।

চলে যায়। রাজকারদের দল শ্লোগান দিতে থাকে, পাকিস্তান-জিন্দাবাদ)

(একদল মিলিটারি ট্রুপ নিয়ে একরামুল ও খদ্দর ফেনী শহরের রাস্তায় টহল দেয়)

খদ্দর : ফেনীতে ঢুকে দেশপ্রেমিক পাকিস্তানি বাহিনী শুধু যে ফেনী কলেজ দখল নিয়েছেন তা কিন্তু না।
একরামুল : তাহারা ফেনী টাউনের আর কোথায় কোথায় অবস্থান নিয়েছেন?
খদ্দর : তাহারা ফেনী পাইলট স্কুল, ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, দোস্ত টেক্সটাইল মিলস, ফেনী স্টেডিয়াম, ফেনী রেলওয়ে স্টেশন, মোহাম্মদ আলী বাজার, পাঁচগাছিয়া কৃষি খামার, মহিপাল বিদ্যুৎ অফিস রেস্ট হাউস, দেওয়ানগঞ্জ মোক্তার বাড়ি, রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ধুমঘাট, সিও অফিস, ফেনী ট্রাংক রোড, গোলকানন্দ ঔষধালয় বিল্ডিং এবং ধলিয়া হাইস্কুলে অবস্থান নিয়ে, যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখন হবেআসল অপারেশন।

(খদ্দর হাসতে থাকে। একরামুলের নজর পড়ে ফজলুল হকের উপর)

একরামুল : খদ্দর, চিনতে পারছ?
খদ্দর : কার কথা বলছ?
একরামুল : ওই যে নজির মিয়ার হোটেল থেকে মাত্র খেয়ে বের হলো।
খদ্দর : কে ওটা?
একরামুল : আরে চিনলে না, আমাদের কলেজের।
খদ্দর : নাম কী, কী পরিচয়?
একরামুল : বোটানির ফজলুল হক। মহম্মদ তোয়াহার মেয়ের জামাই।
খদ্দর : তার শ্বশুর তো একটা কমুনিস্ট।
একরামুল : তার শ্বশুরও কমুনিস্ট, সেও কমুনিস্ট। তারা ইসলামের শত্রু, পাকিস্তানের শত্রু।
খদ্দর : ফেনীতে কোনো পাকিস্তানের শত্রু থাকতে পারে না।

(একরামুল ও খদ্দর এগিয়ে গিয়ে ফজলুল হকের সামনে দাঁড়ায়)

খদ্দর : স্যার, আসসালামু আলাইকুম।
ফজলুল হক : কী ব্যাপার, কাকে চাচ্ছেন?
একরামুল : স্যার, আমরা আপনার ছাত্র।
ফজলুল হক : মুখ ঢাকা থাকলে তো চেনার কোনো উপায় নেই যে তোমরা আমার ছাত্র।
খদ্দর : স্যার আপনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষক, আপনি আমাদের শিখিয়েছেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উদ্ভিদ কোনটি।
ফজলুল হক : হ্যাঁ, শিখিয়েছি তো। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উদ্ভিদ বৈলাম।
খদ্দর : কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা কি জানেন স্যার, আপনি আমাদের ভুল শিখিয়েছেন।
ফজলুল হক : কী ভুল শিখিয়েছি বাবা?
খদ্দর : আপনি ভুলটা ধরতে পারছেন না স্যার?
ফজলুল হক : না তো।
খদ্দর : আপনার উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জ্ঞান আছে কিন্তু ভূগোলের

জ্ঞান অতি নগণ্য। আপনি শিখিয়েছেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উদ্ভিদের নাম, অথচ বাংলাদেশ নামের কোনো দেশই নেই পৃথিবীতে।

ফজলুল হক : কেন, আমাদের দেশের নামই তো বাংলাদেশ।

খদ্দর : না, আমাদের দেশের নাম পাকিস্তান। বাংলাদেশ হলো কতিপয় হিন্দুদের কাল্পনিক ভূখণ্ড যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

ফজলুল হক : বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চলছে, তোমরা জানো না?

খদ্দর : এটাকে যুদ্ধ বলে না স্যার, এটা হলো বিশৃঙ্খলা। বিশৃঙ্খলাকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী দিবারাত্রি মেহনত করে যাচ্ছে। স্যার এখন চলুন।

ফজলুল হক : কোথায় যাব?

একরামুল : কোনো ভয় নেই স্যার। আপনি আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারেন।

খদ্দর : আমাদের মেহমানদারিতে দু'এক ঘন্টা থাকবেন।

ফজলুল হক : আমি বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে আসি।

খদ্দর : কোনো দরকার নেই। আমরাই আপনাকে কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাব।

ফজলুল হক : আমার স্ত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

খদ্দর : মাত্র ঘন্টা খানেকের মামলা। তারপর তো চলেই যাবেন স্ত্রীর কাছে।

ফজলুল হক : কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছ, জানতে পারি কি?

খদ্দর : না, পারেন না। চলুন।

(মিলিটারিরা এসে ফজলুল হকের চোখ বেঁধে ফেলে)

ফজলুল হক : বাবারা, তোমরা আমার বাড়িতে একটা খবর দিয়ে দিয়ো যে আমি ভালো আছি।

খদ্দর : খবর পৌঁছে যাবে স্যার।

ফজলুল হক : আমার বাড়ি তাকিয়া রোড।

খদ্দর : আমরা খুব ভালো চিনি।

ফজলুল হক : আমার স্ত্রীকে বলো যে..

(কথা শেষ করার আগেই মিলিটারিরা ফজলুল হককে ধরে নিয়ে যায়)

(মিলিটারিরা ক্যাম্পে গোলপোস্টের সঙ্গে ফজলুল হককে বাঁধা হয়। একজন রাজাকার কলেজ লাইব্রেরি থেকে আনা এক ব্যান্ডেল বই ছুড়ে ফেলে। সেখানে বাঁশের সঙ্গে কেটলি বেঁধে চা গরমের ব্যবস্থা আছে। একরামুল বইয়ের পাতা ছিড়ে আগুন জ্বালায়। দাউ দাউ আগুনে একটা একটা করে বই ফেলে, সে আগুনে চা গরম হয়)

ফজলুল হক : বইগুলো দেখে মনে হচ্ছে সবকলেজ লাইব্রেরি থেকে আনা।

খদ্দর : আপনি একেবারে ঠিক ধরেছেন স্যার, সবকিতাবকলেজ লাইব্রেরির।

ফজলুল হক : বইগুলো অকারণে পোড়াচ্ছ কেন তোমরা?

একরামুল : অকারণে কোথায় দেখলেন স্যার? চা গরমের জন্য পোড়ানো হচ্ছে।

ফজলুল হক : বই কী দোষ করেছে যে ওগুলো পোড়াতে হবে?

খদ্দর : আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ফেনী কলেজের সব বই পুড়িয়ে ফেলা হবে।

ফজলুল হক : কী সর্বনাশ, কেন?

খদ্দর : যে বই পড়ে মানুষের দিলে পাকিস্তানের জন্য মহব্বত জন্মে না, যে বই পড়ে মানুষ পাকিস্তানকে ভালোবাসতে শেখে না, সেসব বই কেন থাকবে ফেনী কলেজে?

(রাজকাররা পাকিস্তান-জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতে থাকে। ব্রি. আসলাম ক্যাম্পে প্রবেশ করে। একরামুল ব্রি. আসলামের হাতে চায়ের কাপ তুলে দেয়)

ব্রি. আসলাম : (ফজলুল হককে উদ্দেশ্য করে) উনাকেও এককাপ চা দাও। হাজার হোক উনি তো এই কলেজের একজন প্রফেসর এবং আমার সম্মানিত অতিথি। উনার হাতের বাঁধন খুলে দাও।

(ফজলুল হকের হাতে বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। ব্রি. আসলাম তাঁকে একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়)

ব্রি. আসলাম : প্লিজ, সিট হেয়ার।

(ফজলুল হক চেয়ারে বসেন। একরামুল তাঁর হাতে চায়ের কাপ তুলে দেয়)

ফজলুল হক : আমি তো এই চা খেতে পারবনা।

ব্রি. আসলাম : বই পুড়িয়ে চা গরম করা হয়েছে বলে?

ফজলুল হক : জি।

ব্রি. আসলাম : বিষয়টা আসলেই দুঃখজনক, একজন শিক্ষক কী করে বইয়ের প্রতি অসম্মান সহ্য করে! যাই হোক, তুমি বোটানির প্রফেসর?

ফজলুল হক : জি।

ব্রি. আসলাম : বোটানির জনক কে?

ফজলুল হক : গ্রিক দার্শনিক থিফাস্টাস। তিনি অ্যারিস্টটলের ছাত্র ছিলেন।

ব্রি. আসলাম : বাহ, চমৎকার। পাকিস্তানের জনক কে?

ফজলুল হক : (নিশ্চুপ)

ব্রি. আসলাম : কী চুপ করে আছ কেন, জানো না?

ফজলুল হক : জি, জানি।

ব্রি. আসলাম : বলছ না কেন? বলো, পাকিস্তানের জনক কে?

ফজলুল হক : জিন্না।

ব্রি. আসলাম : (চিৎকার দিয়ে ওঠে। হাতের চায়ের কাপ ছুড়ে মারে) কী সাহস তোমার! আরও তমিজের সাথে, শ্রদ্ধার সঙ্গে বলো। বলো, কায়েদী আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

ফজলুল হক : (নিশ্চুপ)

ব্রি. আসলাম : তোমার দেশের নাম কী?

ফজলুল হক : বাংলাদেশ।

কোরাস : তওবা, তওবা।

ব্রি. আসলাম : তাহলে পাকিস্তান কার দেশ?

ফজলুল হক : তোমার দেশ।

ব্রি. আসলাম : আমার দেশ তো তোমারও দেশ।

ফজলুল হক : না, তোমার দেশের নাম পাকিস্তান। আমার দেশ বাংলাদেশ।

(ব্রি. আসলাম ফজলুল হকের চেয়ারে লাথি মারে)

ব্রি. আসলাম : তোমরা কি বুঝতে পারছ যে তোমরা সবাই মিলে পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছ, অন্যায় করছ?

ফজলুল হক : শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিরোধ স্বতঃস্ফূর্ত। আমাদের লড়াই ন্যায় সঙ্গত।

(ব্রি. আসলাম ফজলুল হককে গলা চেপে ধরে)

ফজলুল হক : আমাদের লড়াই মুক্তিকামী মানুষের লড়াই, স্বাধীনতার লড়াই।

ব্রি. আসলাম : ইস নাপাক বাঙালিকো বাহার লে যাও, আওর উসকো গুল্লি মারো।

(ব্রি. আসলাম চলে যায়)

খদ্দর : এই অধম বাঙালিকে বাহিরে নিয়ে গুলি করো।

একরাম : স্যার, আপনি এমনই হতভাগ্য যে ফেনী কলেজের শিক্ষক হয়েও ফেনী কলেজের বাউন্ডারিতে মরতে পারলেন না। আপনার মওত ক্যাম্পাসের বাইরে। এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে?

খদ্দর : স্যার, আপনারে আমরা প্রচুর সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। সেই সম্মান শ্রদ্ধা থেকেই বলছি, আপনি শুধু একবার মুখ ফুটে বলেন, আপনি কোথায় মরতে চান? আমরা আপনাকে সেখানেই গুলি করে মারার ব্যবস্থা করছি।

একরাম : স্যার বলেন, কোথায় মরতে চান? রাজাপুর? পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট? রেলওয়ে স্টেশন? দাউদপুর ব্রিজ? কালিদহ-পাহ-লিয়া ব্রিজ? ফুলগাজী জামুড়া? পরশুরামের মালিপাথর? সলিয়া? দাগনভূইয়া সেতু? কুটিরহাট সেতু? স্যার, মুখটা খোলেন একবার। বলেন, বলেন।

খদ্দর : স্যার যেহেতু কিছু বলতেছেন না, তাহলে আমরাই ঠিক করি। আমার মনে হয় দাউদপুর ব্রিজই স্যারের সম্মানের জন্য উপযুক্ত হবে।

একরাম : ঠিক, দাউদপুর ব্রিজ, এইটা আমার খুব প্রিয় জায়গা। গুলি করার সঙ্গে সাথে লাশটা টুক করে পানিতে পড়ে যায়, পানিটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে ওঠে, আর স্রোতের টানে লাশ ভেসে যায় নীল দরিয়ায়। লাশ নিয়ে কুকুর বিড়ালে আর টানাটানি হয় না। কী চমৎকার ব্যবস্থা।

(দু'জন মিলিটারি ফজলুল হককে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায়)

(যুদ্ধক্ষেত্র। পাকিস্তানিদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করছে। দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ও গুলি বিনিময় চলছে। রাইফেল হাতে বদরুদ্দোজা যুদ্ধের মধ্য থেকে কথা বলে)

বদরুদ্দোজা : একদিন কাঠের বন্দুক নিয়ে প্রশিক্ষণ নিতাম, আজ সতিক্যারের বন্দুক হাতে যুদ্ধ করছি। মাত্র গুলি ছুড়েছি, বন্দুকের মাথা

দিয়ে এখনো ধোঁয়া উড়ছে। পাক বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ চলছে। আমরা আছি ভারত সীমান্তের কাছে চিয়ারা গ্রামে, এখানেই যুদ্ধ করছি। জগন্নাথ দিঘিতে পাকসেনার শক্তিশালী ঘাঁটি করেছে, এই সংবাদ পেয়ে আমরা ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে তাদের প্রতিহত করতে আসি। চিয়ারা গ্রামে এসে আমরা ওদের মুখোমুখি হয়েছি এবং তাদের সঙ্গে এখন আমাদের প্রচণ্ড গুলি বিনিময় চলছে। আমাদের সৈন্যরা জানবাজি লড়ছে। আমরা জানি ওরা সংখ্যাই বেশি, ওরা প্রশিক্ষিত বাহিনী, ওদের ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র। সেই তুলনায় আমাদের অবস্থা নিতান্তই করুণ। আমাদের হাতে থ্রি নট থ্রি, রিকয়েললেস রাইফেল। আমাদের সৈনিকরা যুদ্ধ করছে খালি পায়ে, একজোড়া বুটজুতাও জোটেনি। পায়ে পরার জন্য অবশ্য আমরা অনেক প্লাস্টিকের স্যান্ডেল পেয়েছি। কিন্তু সেগুলো বাথরুমের জন্য উপযুক্ত, যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য না। তবু আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছি। কারণ আমরা তো জেনেই গেছি, আমাদের যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

(বদরুদ্দোজা যুদ্ধে ফিরে যায়। যুদ্ধে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি অব্যহত থাকে। যুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধারা চিৎকার করে ওঠে। পাকবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে পালায়)

বদরুদ্দোজা : শত্রুসেনারা চিয়ারা গ্রাম থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। জগন্নাথ দিঘির চারটি বাঙ্কার আমাদের মুক্তিবাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের খালি পায়ের যোদ্ধারা কম্ব্যাট বুট পরা পাকিস্তানিদের হটিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের জন্য এই যুদ্ধ নিছক জয় কিম্বা পরাজয়ের। কিন্তু আমাদের জন্য এই যুদ্ধ জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার মরণপণ সংগ্রাম। এ যুদ্ধে জয় ছাড়া আমাদের ভিন্ন কোনো বিকল্প নেই।

(ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ব্রিফ করেন)

বদরুদ্দোজা : আমাদের কমান্ডার ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, তিনি যেমন একজন বীর যোদ্ধা, তেমনি একজন দক্ষ এবং সাহসী নেতা।

জাফর : ডিয়ার ফাইটার, তোমরা দারুন লড়ছে। তোমাদের জন্য সত্যি আমার গর্ব হয়। তোমাদের সাহসিকতার কারণে আমরা শত্রুদের এই চিয়ারা গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছি। আমরা যদি এভাবে পরিকল্পনা মাফিক এগুতে পারি তবে শত্রুরা একদিন বাংলার মাটি ছেড়ে পালিয়ে যাবে, সেদিন আর বেশি দূরে নয়। জয়ী আমরা হবই।

কোরাস : জয় বাংলা।

(মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে এবং বিজয় উদযাপন করে)

বদরুদ্দোজা : স্যার, এর পরের অপারেশন কোথায় হবে?

জাফর : আমরা ফেনী শহরের কাছাকাছি আছি। এখান থেকে একটা গেরিলা দল যাবে ফতেপুর অপারেশনে। সেখানকার রেলসেতু ডিমোলিশন দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। আরেকটা দল যাবে ফেনী শহরে। সেখানে পাকবাহিনীর উপর অপারেশন হবে, আমি হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করে দিন তারিখ ফাইনাল করে ফেলব।

বদরুদ্দোজা : স্যার, ফেনী শহরের গেরিলা অপারেশনে চাইলে আমাকে পাঠাতে পারেন। আমি তো শহরের ছেলে, রাস্তাঘাট আমার সব চেনা। টিমের জন্য সুবিধা হবে।

জাফর : শহরে কোথায় তোমার বাড়ি?

বদরুদ্দোজা : পশ্চিম উকিল পাড়া, গ্রান্ড ট্রাংক রোডের কাছেই।

জাফর : বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?

বদরুদ্দোজা : বাড়িতে বাবা মা আছেন। আমার স্ত্রী আছে। আমার স্ত্রী এখন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

জাফর : তোমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী তোমাকে যুদ্ধে আসতে বাধা দেয়নি?

বদরুদ্দোজা : আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছি যে তার সন্তান স্বাধীন দেশে জন্ম নেবে।

জাফর : তোমার বাবা, মা?

বদরুদ্দোজা : বাবা অমত করেননি, তবে মাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

জাফর : পাকিস্তানি শত্রুসংখ্যা আমাদের চাইতে অনেক বেশি তবু আমরা এই যুদ্ধে জিতব কারণ তোমার মতো সন্তানেরা এই দেশের জন্য লড়ছে। ফেনী শহরের অপারেশনে তুমি যাচ্ছ।

বদরুদ্দোজা : থ্যাংক ইউ স্যার।

জাফর : বাবা, মা, স্ত্রী, ওদের সঙ্গে দেখা করে আসতে আবার ভুলো না।

(ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম চলে যান)

বদরুদ্দোজা : মা, তোমাকে বলে আসেনি বলে আমার উপর রাগ করো না। আমি তো দেশের জন্য যুদ্ধ করতে এসেছি। তুমি দেখো মা, এই যুদ্ধে আমাদের জয় হবেই। দোয়া করো মা, আমাদের যেন খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হয়।

(বদরুদ্দোজা অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিশে যায়)

(ফেনী কলেজের ক্যাম্পে খদ্দর ও একরামুল শ্লোগান দেয়। তারা পাকিস্তানি পতাকা উড়ায়। ব্রি. আসলাম ক্যাম্পে ঢোকে। খদ্দর ব্রি. আসলামের কাছে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়)

ব্রি. আসলাম : হোয়ার ইজ মিস্টার বিল্লাল?

খদ্দর : স্যার, চাচাজি জোয়ার কাছাড় অপারেশনে আছেন।

ব্রি. আসলাম : তোমরা যাওনি কেন?

খদ্দর : আমরা স্যার দাউদপুর ব্রিজ অপারেশনে ছিলাম।

ব্রি. আসলাম : সাউন্ডস গুড।

খদ্দর : আলহামদুলিল্লাহ স্যার।

ব্রি. আসলাম : বিলোনিয়া, ফেনী শহর থেকে কত দূর?

খদ্দর : দূর আছে স্যার, বর্ডার অঞ্চল। এখান থেকে হাঁটা পথে তিন চার ঘন্টা লাগবে।

ব্রি. আসলাম : রাস্তা চেন?

খদ্দর : রাস্তা চিনব না, কী কন স্যার। এই যে নাক বরাবর ফলেশ্বর, বান্দুয়া দৌলতপুর, আনন্দপুর, উত্তর শ্রীপুর, ফুলগাজী, পরশুরাম, বিলোনিয়া। তবে রাস্তাঘাট বড় বেয়াড়া।

ব্রি. আসলাম : বেয়াড়া মানে কী?

খদ্দর : একে তো নদী অঞ্চল তার উপরে রাস্তাঘাট খানা খন্দে ভরা। যাইতে কষ্ট হবে। আরও সমস্যা আছে?

ব্রি. আসলাম : কী সমস্যা?

খদ্দর : বন্দুয়া ব্রিজ তো ভাঙা। দুশমনরা ব্রিজ ভাইঙা ফেলছে যাতে তাদের ঠান্ডা করার জন্য আপনারা যাইতে না পারেন।

ব্রি. আসলাম : নদী পার হওয়ার উপায়?

খদ্দর : নৌকা দিয়ে পার হইতে হবে। আর বাঁশের সাঁকো বানাইতে কতক্ষণ?

ব্রি. আসলাম : নদীতে পানি কী রকম আছে?

খদ্দর : পানি আছে স্যার। মেলা গভীর, তল পাওয়া যায় না। তার উপর পানিতে স্রোতও আছে। পানিতে নামলেই টান দিয়া নিয়া যায়।

ব্রি. আসলাম : নদীর নাম কী?

খদ্দর : ছিলোনিয়া। স্যার, সাঁতার পারেন?

ব্রি. আসলাম : না। কোনো দিন পানিতে নামিনি।

খদ্দর : কোনো সমস্যা নাই স্যার। সাঁতার শিখাইয়া নিব। সাঁতার শিখতে কতক্ষণ।

ব্রি. আসলাম : কতজনকে সাঁতার শিখাবে?

খদ্দর : স্যার আপনার ব্যাটেলিয়ানের কেউ সাঁতার জানে না?

ব্রি. আসলাম : না।

খদ্দর : ইয়া মাবুদ। কোনো সমস্যা নাই স্যার। নৌকায় করে পার করে দিব।

ব্রি. আসলাম : নৌকায় কি ট্যাংক পার করা যাবে?

খদ্দর : আল্লাহ ভরসা স্যার।

(ব্রি. আসলাম খদ্দরের গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয়। খদ্দর মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যায়)

খদ্দর : ইয়া গাফুরুর রহিম।

ব্রি. আসলাম : গার্ড, এই আদমিকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখো।

(দু'জন গার্ড আসে। পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে কপিকলের মাধ্যমে খদ্দরকে গোলপোস্টে ঝুলিয়ে রাখা হয়)

(পাকিস্তানি সৈন্যদের ভ্রাম্যমাণ একটি ট্রুপ রাস্তায় টহল দিচ্ছে। সৈন্যরা একটু সরে যেতেই বদরুদ্দোজার নেতৃত্বে চাদরে আবৃত একদল গেরিলা অনেক গোপনে শহরে প্রবেশ করে। তারা নিজেদের মধ্যে নিঃশব্দে চাহনি বিনিময় করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সৈন্যদের দলটি ফেরত আসতেই তাদের উপর গ্রেনেড হামলা হয়। সৈন্যরা আহত হয়। শহরের বিভিন্ন অংশে গেরিলা হামলা হতে থাকে। সৈন্যরা দৌড়ায়)

(বোমা ও গুলির আওয়াজের মধ্যে বেলাল দৌড়াতে দৌড়াতে ফেনী কলেজের মিলিটারি ক্যাম্পে এসে ঢোকে। সে

হাঁপায়)

বেলাল : স্যার, ফেনী টাউনে কী জানি কী হয়ে গেল, এই ফোটে, সেই ফোটে, মনে হচ্ছিল খোদার গজব নেমে এসেছে জমিনে। এত ভয় পেয়েছি, বুকের কাঁপন এখনো থামেনি। একি কেয়ামতের আলামত নাকি?

ব্রি. আসলাম : কেয়ামতই বটে। ওরা আমাদের সৈন্যদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা করেছে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে গ্রেনেড চার্জ করেছে, সেনাবাহিনীর ট্রাক জ্বালিয়ে দিয়েছে। এটা ভাবাই যায় না। অকল্পনীয়। এত সাহস তারা কোথায় পায়?

বেলাল : স্যার, আমার মনে হয় এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এর সঙ্গে দেশ স্বাধীনের কোনো সম্পর্ক নেই। মুক্তিদের বুকে এত সাহস নেই যে ফেনী শহরে ঢুকে কোনো গণ্ডগোল করবে। তাদেরও তো মউতের ভয় আছে।

ব্রি. আসলাম : তাহলে ওরা কারা?

বেলাল : মনে হয় এলাকার লোকাল সন্ত্রাসী। কাজকর্ম নাই, খালি পটকা ফুটায়।

ব্রি. আসলাম : ওগুলো পটকা নয় ইন্ডিয়ান গ্রেনেড।

বেলাল : এই ইন্ডিয়াই হলো ইসলামের প্রধান শত্রু, মুসলমানের দুশমন। তবে কোনো চিন্তা করবেন না স্যার, আমরা যখন আছি।

ব্রি. আসলাম : অযথা বেশি কথা বলবেন না। এখন যান।

বেলাল : কোথায় যাব স্যার?

ব্রি. আসলাম : ঘরে ঘরে তল্লাশি করেন, একটা সন্ত্রাসীও যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

বেলাল : একটাও পালাতে পারবেনা স্যার। এই ফেনী কলেজের গ্রাউন্ডেই তাদের কবর রচিত হবে।

(সৈন্যরা ক্যাম্প থেকে বের হয়ে শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষকে মারতে থাকে। শহরজুড়ে চিৎকার, চেঁচামেচি, ছোটাছুটি চলতে থাকে)

(শহরের উকিল পাড়া। বদরুদ্দোজা তার বাড়িতে যায়, বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে)

মা : তোরে আমি আর ছাড়ব না বাপ, তোরে আমি বাড়িতে লুকায়ে রেখে দিব।

বদরুদ্দোজা : মা, আর দশ মিনিটের মধ্যেই আমি চলে যাব। শহরের অবস্থা খুব খারাপ, আমি থাকলে তোমরা বিপদে পড়তে পার।

মা : নতুন করে আর কী বিপদে পড়ব, বিপদের মধ্যেই তো আছি। খানসেনারা সারাক্ষণ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন যারে মনে হচ্ছে, তারে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, গুম করে দিচ্ছে।

(তার স্ত্রী শরিফা ভাতের থালা নিয়ে আসে)

শরিফা : ভাত খাও। তোমার জন্য ভাত নিয়ে এসেছি।

বদরুদ্দোজা : এখন কিছু খেতে পারব না শরিফা।

বাবা : দুইটা ভাত মুখে দিতে কতক্ষণ লাগবে বাবা, বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর।

বদরুদ্দোজা : শরিফা এক গ্লাস পানি দাও, পানি খাই।

(মায়ের হাতে ভাতের থালা দিয়ে শরিফা পানি আনতে যায়)

মা : বাপধন, তাড়াতাড়ি দেশটা স্বাধীন করে ফেল। খানসেনাদের খুন খারাবি আর দেখতে পারি না। সারাক্ষণ শুধু রক্ত আর রক্ত। একটা দেশ স্বাধীন করতে আর কত রক্ত লাগে?

(শরিফা পানি আনে, বদরুদ্দোজা পানি খায়)

বদরুদ্দোজা : দেশের স্বাধীনতা এমনি এমনি আসে না মা, এর জন্য এক সাগর রক্ত লাগে। আমি এখন যাই, তোমরা সাবধানে থাকো। বাবা, কাজ ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবে না। শরিফা, নিজের দিকে খেয়াল রেখো।

মা : বাপধান ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করিস। সুস্থ থাকিস। দেশটা স্বাধীন করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।

(বদরুদ্দোজা বেরিয়ে যায়)

মা : আমি তোর জন্য ভাতের থালা হাতে রোজ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব।

(মা কাঁদতে থাকে। বাইরে গুলির আওয়াজ শোনা যায়)

মা : এত গুলি, আর কত মায়ের বুক খালি করবে ওরা?

(শরিফা ও বাবা মিলে মাকে সান্ত্বনা দেয়)

(ফেনী শহরের রাস্তায় মিলিটারি টহল দিচ্ছে। বদরুদ্দোজা নিজেকে লুকিয়ে এগুতে থাকে। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক দেয় আব্দুল জব্বার খদ্দর, চমকে ওঠে বদরুদ্দোজা। খদ্দরের সঙ্গে একরামুলকেও দেখা যায়)

খদ্দর : বদরু! কই যাইতেছ? টাউনে আইসা খুব ফুটাইলা মনে হইল!

বদরুদ্দোজা : কী ফুটানোর কথা বলছিস, আমি তো কিছু বুঝছি না।

খদ্দর : বুঝবা না কেন, তুমি তো অবুঝ ছেলে না। খুব বুঝ কইরা যুদ্ধে গেছ। দেশ স্বাধীন করবা। দুইটা ফুট ফাট ফুটাইলেই দেশ স্বাধীন হয়ে গেল?

বদরুদ্দোজা : আমাকে যেতে দে।

খদ্দর : এত ব্যস্ততা কিসের, কোথায় যাবা তুমি?

বদরুদ্দোজা : ওষুধ আনতে যাচ্ছি।

খদ্দর : ঘরে তো তোমার আবার পোয়াতি বৌ। পোয়াতি বৌ থুইয়া ট্রেনিংয়ে চইলা গেলা হিন্দুস্তান? বৌয়ের জন্য একটুও মনটা পুড়ল না?

বদরুদ্দোজা : দেখ, তোর সঙ্গে এত কথা বলার আমার সময় নেই।

খদ্দর : বাড়িতে কখন আসলা বদরু?

বদরুদ্দোজা : আমার বাড়িতে আমি যখন খুশি আসব, যাব। তোর তো এত কিছু জানার দরকার নেই।

খদ্দর : খানাপিনা কিছু কি করতে পেরেছ বাড়িতে? কেমন শুকায়া গেছ? তোমাদের ক্যাম্পে খাওয়া খাদ্যের কি খুব অভাব? হিন্দুস্তান থেকে খাদ্যের চালান টাইমলি আসে না?

বদরুদ্দোজা : আমার সময় নষ্ট হচ্ছে?

(বদরুদ্দোজা চলে যেতে চায়, খদ্দর ও একরামুল তাকে বাধা দেয়)

খদ্দর : নতুন অপারেশনে যাইতে কি খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে? সবাই তোমার জন্য ওয়েট করতেছে, তুমি গেলেই আবার নতুন ফুট ফাট শুরু হয়ে যাবে, ঠিক না বদরু? মুক্তিফৌজ হইছ? দেশরে শত্রু মুক্ত করবা? দেশের শত্রু কারা, এইটাই তো চিনলা না। দেশের প্রধান শত্রু হইল হিন্দু। হিন্দুদের কতল করতে পারলেই শুধু পাকিস্তান শত্রু মুক্ত হবে। সেই হিন্দুদের সঙ্গে তুমি হিন্দুস্তান গিয়া হাত মিলাইলা। সোনার পাকিস্তানকে আজ হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে চাও। ফেনী টাউনে ঢুকে পাকিস্তানের গর্বিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বোমা মারো! কত দুঃসাহস তোমার, কত বড় স্পর্ধা! তুমি নিজেই নিজের মরণ ডেকে আনছ বদরু। আজ আর কেউ তোমারে বাঁচাতে পারবেনা।

(খদ্দর পাকিস্তানি সেনাদের হাত দিয়ে ইশারা করে)

ওরে ধরো।

(বদরুদ্দোজা দৌড় দেয়, পাকিস্তানি সেনারা তাকে ধরে চোখ বেঁধে ফেলে)

খদ্দর : তোমারে আজ নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দিতে শরমিন্দা হচ্ছে। তোমার চরিত্রের এতটাই অধোপতন ঘটেছে যে তোমার সঙ্গে একজন বিধর্মীর কোনো তফাত নেই।

বদরুদ্দোজা : কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?

একরামুল : তোমারে নিয়ে একটু হাওয়া খাইতে যাব, দাউদপুর ব্রিজ। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, উপরে খোলা আকাশ, নিচে স্বচ্ছ পানি। ব্রিজের রেলিংয়ের উপর দাঁড়ালে মনে হবে বেহেস্তের দোলনায় দোল খাচ্ছি। চলো বন্ধু দোল খেয়ে আসি, দাউদপুর ব্রিজ, মাই ফেবারিট প্লেস।

(পাকিস্তানি সৈন্যরা বদরুদ্দোজাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়)

(ফেনী কলেজের ক্যাম্পাসে মিলিটারিরা সাধারণ মানুষকে ধরে এনে লাইন দিয়ে গুলি করে। লাশগুলোকে মাটি চাপা দেওয়া হয়। রাজাকারদের একটি দল বদরুদ্দোজার বাবা, মা ও স্ত্রীকে মিলিটারি ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আসে। বেলাল ব্রি. আসলামকে কানেকানে ঘটনা ব্রিফ করে)

ব্রি. আসলাম : ম্যাডাম, আমরা খুবই দুঃখিত যে আপনাকে এখানে ধরে আনা হয়েছে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অনেক সময় অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকেও আমাদের মেনে নিতে হয়। বাই দ্য ওয়ে, আপনার নাম?

শরিফা : শরিফা খাতুন।

ব্রি. আসলাম : স্বামীর নাম মো. বদরুদ্দোজা?

শরিফা : জি।
ব্রি. আসলাম : উনি কী করেন?
শরিফা : উনি ছাত্র।
ব্রি. আসলাম : উনি কি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত?
শরিফা : জি।
ব্রি. আসলাম : কিসের রাজনীতি?
শরিফা : ছাত্রলীগের রাজনীতি।
ব্রি. আসলাম : আপনাদের বিয়ে হয়েছে কবে?
শরিফা : যুদ্ধ শুরুর আগে।
ব্রি. আসলাম : আপনি কি বলবেন আপনার স্বামী এতদিন কোথায় ছিলেন?
শরিফা : উনি কোথায় ছিলেন আমি বলতে পারবনা।
ব্রি. আলাম : উনার সঙ্গীদের কি আপনি নাম বলতে পারবেন?
শরিফা : উনার সঙ্গীদের আমি চিনি না।
ব্রি. আসলাম : আজ ফেনী শহরের গেরিলা অপারেশনে উনার ভূমিকা কী ছিল?
শরিফা : আমি বলতে পারবনা।
ব্রি. আসলাম : ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে চিনেন?
শরিফা : না।
ব্রি. আসলাম : কুমিল্লা ফেনী রেললাইনের পাশে টেলিফোনের তার কারা বিচ্ছিন্ন করেছে আপনি জানেন?
শরিফা : না।
ব্রি. আসলাম : নাওতি স্টেশনের রেললাইন কারা ধ্বংস করেছে বলতে পারবেন?
শরিফা : না।
ব্রি. আসলাম : আপনার স্বামী সম্পর্কে কী জানেন সেটা বলেন।
শরিফা : মানুষটা ঘর থেকে বের হয়ে গেল, দুইটা ভাতও মুখে দেয় নাই। সে রাতে কিছু খেতে পারল কিনা সেজন্য দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে।
ব্রি. আসলাম : উনি কোথায় বেরিয়ে গেছেন?
শরিফা : আমি বলতে পারবনা।
ব্রি. আসলাম : উনি কবে ফিরবে বলে গেছেন কিছু?
শরিফা : না, শুধু বলে গেছেন দেশ স্বাধীন করে তবে ফিরবেন।
ব্রি. আসলাম : আপনার কি ধারণা এদেশ স্বাধীন হবে?
শরিফা : হবে।
ব্রি. আসলাম : আপনার স্বামী যে একজন দুষ্কৃতকারী, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, এটা কি জানেন?
শরিফা : দেশের জন্য যুদ্ধে যাওয়া কোনো অপরাধ না।
ব্রি. আসলাম : তার কি কোনো মৃত্যু ভয় নেই?
শরিফা : মৃত্যু ভয় থাকলে যুদ্ধে যাওয়া যায় না।
ব্রি. আসলাম : আপনি কি মনে করেন আপনার গর্ভের সন্তান তার পিতার মুখ দেখতে পারবে?
শরিফা : ভাগ্যে থাকলে পারবে।
ব্রি. আসলাম : আপনার স্বামী যদি আর ফিরে না আসেন..
শরিফা : আমি বিধবা হব, আমার অনাগত সন্তান পিতৃহারা হবে। তাই বলে স্বাধীনতা আটকে থাকবে না। আমার স্বামী জানে দেশের স্বাধীনতার জন্য এক সাগর রক্ত লাগে।
ব্রি. আসলাম : আপনার স্বামীর দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকেও অপরাধী সাব্যস্ত করা হলো। আপনার শাস্তি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড, যেটি এখনই কার্যকর করা হবে।

(গোলপোস্টের ফাঁসির দড়িতে শরীফাকে ঝোলানোর ব্যবস্থা করা হয়)

ব্রি. আসলাম : মৃত্যুর আগে আপনার কোনো শেষ ইচ্ছা আছে?
শরিফা : আমার স্বামী কি পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েছে, নাকি পড়েনি?
ব্রি. আসলাম : উনি ধরা পড়েছেন এবং উনার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(শরীফাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। রাজাকাররা শ্লোগান দেয়, পাকিস্তান-জিন্দাবাদ)

(একদল রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ফেনীর দিকে অগ্রসর হয়)

জাফর ইমাম : ফেনী অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবেআমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অভিযান পরিচালনা করে আসছি। শীতের এক বর্ষণমুখর রাতে আমরা চিতলিয়া, গতুমা, সলিয়া, ধনিকুণ্ডা, চন্দনা এলাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিস্ময়কর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলি। প্রচলিত যুদ্ধরীতির বাইরে গিয়ে সাজানো হয় রণকৌশল। ইনফিলট্রেশন, ডিফেন্স আর অ্যাসল্ট- এই ছিল রণপরিকল্পনা। তুমুল এক যুদ্ধ শেষে ১০ নভেম্বর ভোর রাতে বিলোনিয়া শত্রু মুক্ত হয়। বিলোনিয়া জয়ে আমাদের মনোবল বেড়ে গেল। আমরা পরশুরাম, মুন্সিরহাট, বন্দুয়া, ফুলগাজী হয়ে যুদ্ধ করতে করতে সামনে এগিয়েছি। পাকসেনাদের এখন ঘিরে ফেলেছি ফেনীতে। আজ ৬ই ডিসেম্বর, সোমবার। আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণে পাকবাহিনী দিশেহারা। উপায়ান্তর না দেখে পাকসেনারা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ফেলে ফেনী থেকে পালাতে শুরু করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা চতুর্দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

(দলে দলে মুক্তিযোদ্ধারা এসে ফেনী কলেজের পাকিস্তানি ক্যাম্প দখল করে নেয়। ফেনী কলেজে তারা বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেয়।)

জাফর ইমাম : আমরা দুপুরের মধ্যে ফেনীকে শত্রুমুক্ত করলাম।
কোরাস : জয়বাংলা..

(মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় উল্লাস করতে থাকে। হঠাৎ লক্ষ্য করে যে গোলপোস্টে শরীফার লাশ বাতাসে দুলছে। মুক্তিযোদ্ধাদের উল্লাস থেমে যায়, তারা হতভম্ব)

জাফর ইমাম : গোলপোস্টে ঝুলে আছে নারীর লাশ। কত দুঃখ পেয়ে, অপমান সয়ে, কষ্টে ভুগে এই গৃহবধূ অন্তঃসত্ত্বা নারীকে তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে দেশের জন্য। ভাবতে গেলে আমাদের লজ্জা হয়, বুক ফেটে কান্না আসে।

(মুক্তিযোদ্ধারা সবাই মিলে শরিফার লাশটি নামায়। তারা লাশের চারিদিকে হাঁটু মুড়ে বসে)

জাফর ইমাম : একটা সাধারণ গোলপোস্ট, পাকিস্তানিদের হাতে পড়ে হয়ে গেল মৃত্যুর জলজ্যান্ত বিভীষিকা, হত্যার পটভূমি। গোলপোস্ট হয়ে উঠল ফাঁসির মঞ্চ।

(কোরাস গান গাইবে)

কোরাস : ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

জাফর ইমাম : কত নৃশংস, ঘৃণ্য, জঘন্য পাকিস্তানি সৈন্যরা আর তার দোসররা। তারা আমার দেশের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। তারা আমার বোনকে, আমার কন্যাকে, আমার মাকে শ্লীলতাহানী করেছে, খুন করেছে। তাদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই, ইজ্জতের কোনো সুরক্ষা নেই, তার চায় শুধু মাটি। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী তাদের পরাজয়ের ক্ষোভ মেটাতে আমাদের মানুষের উপর গণহত্যা চালিয়েছে, পুরো দেশটাকে তারা বধ্যভূমি বানিয়েছে। সাধারণ মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে, গণকবরে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে, লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে নদীতে।

আজ ফেনী জয়ের মুহূর্তে আমি শুনতে পাচ্ছি শুধু শত শহীদের চিৎকার। হাবিলদার নূরুল ইসলাম, এয়ার আহাম্মেদ, হারুন, মোসলেউদ্দিন কচি, সামাদ, বদরুদ্দোজা, এদের কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজছে, যারা আমারা ভাই, স্বজন, আত্মার আত্মীয়, যাদের সঙ্গে মিলে আমি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছি। তাঁরা আমাকে বলছে, শহীদের আত্মত্যাগ যেন বৃথা না যায়।

(ফেনীর সাধারণ মানুষ পতাকা হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেয়)

জাফর ইমাম : হায়, ফেনীর মুক্তির জন্য, দেশের মুক্তির জন্য ফেনীবাসীর কত প্রাণ যে বলি হলো, কত মানুষকে হত্যা করা হলো, তাদের আমরা কোনো দিন ভুলবনা। এই ফেনী কলেজের গণকবরে যে শহীদেরা শুয়ে আছেন তাদের প্রতি রইল প্রাণের অর্ঘ্য। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাত কোটি মানুষের জীবনের সন্ধান আনলে যারা, সে দানের মহিমা কোনো দিন ম্লান হবে না। এই গণহত্যার বদলা নিতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বহন করে নিয়ে যাব। পাকিস্তানিদের নির্মিত মৃত্যুর বিভীষিকা প্রতিটি গোলপোস্ট আমরা গুঁড়িয়ে দেব।

(কোরাস গান গাইবে)

কোরাস : তোমাদের এই ঋণ কোনো দিন শোধ হবেনা..

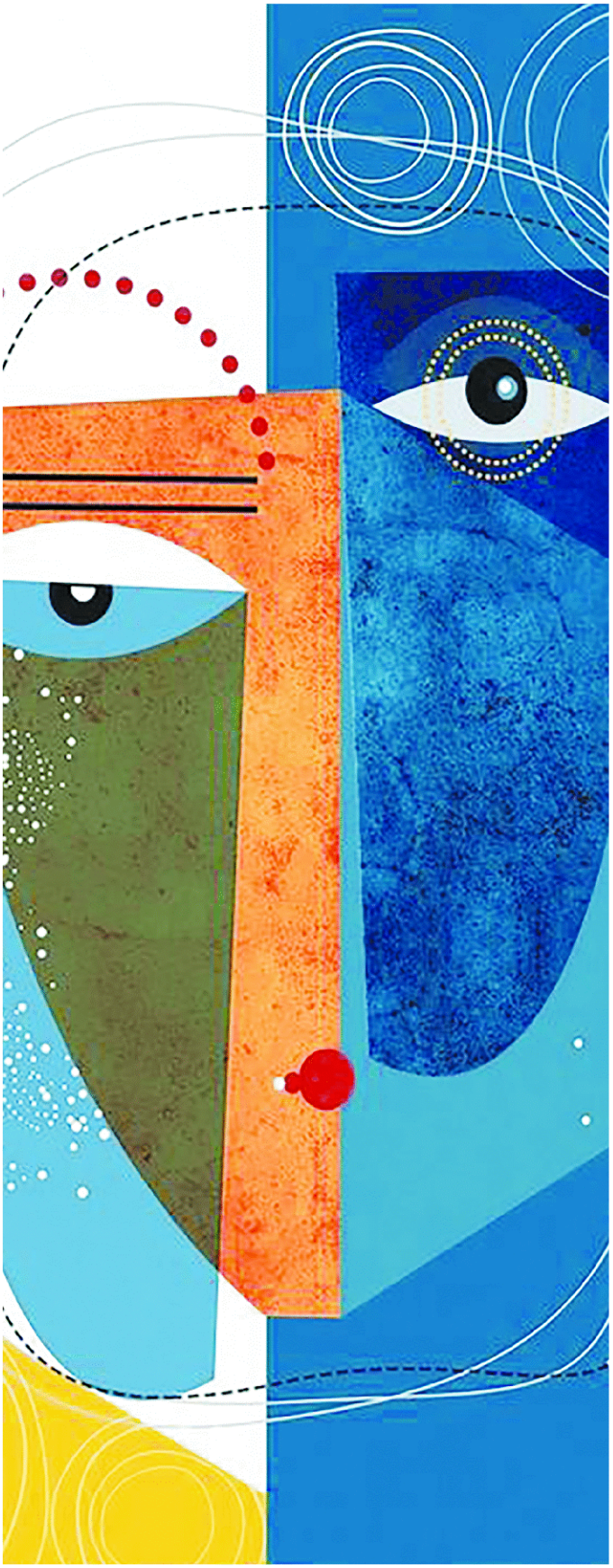

গল্প

অন্ধকার সময়

রেজাউল করিম খোকন

হঠাৎ মোবাইল ফোনের রিং টোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় রুমানার। ধড়মড় করে উঠে বসে। এতক্ষণ সে সোফায় ঘুমিয়েছিল, ভাবতেই অবাক হয়।

তখনও মোবাইলটা বেজেই চলেছে। ওটা হাতে নিতেই দেখতে পায় শফিক ফোন করেছে।

কল রিসিভ করতেই স্বামীর উদ্বিগ্ন গলা শোনা যায়, 'কী ব্যাপার, কী হয়েছে তোমাদের। তোমাকে ফোন করছি, রুহিকে ফোন করছি। কেউ ধরছো না। রুহি কোথায়? ওকে দাওতো। একটু বকুনি দেই। মেয়েটাকে মোবাইল কিনে দিলাম কেন? ফোন করলে যদি ওকে পাওয়া না যায়, ফোন বন্ধ করে রাখে, তাহলে দুশ্চিন্তা হয় না? আচ্ছা, রুহি কি ফিরেছে বাসায়? তুমি কী করছিলে? এতক্ষণ বাজলো ফোনটা, তুমি ধরতে এতো দেরি করলা কেন, ব্যাপার কী?'

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে শফিক।

শফিকের কথা শুনে রুমানার এতক্ষণে খেয়াল হয়, মাথা ব্যথা এবং জ্বরের কারণে সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই সাড়ে দশটা বাজে দেখতে পায়। এতো রাত হয়ে গেছে! এতক্ষণ একদম টের পায়নি, সেই বিকাল থেকে একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে।

এখনও রুহি বাসায় ফেরেনি, খেয়াল হতেই ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে যায় শিরদাঁড়া বেয়ে। রহমান স্যারের কাছে রাত নটায় পড়া শেষ হলে এতক্ষণে তো রুহির বাসায় ফিরে আসার কথা। দৌড়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে রুমানা দেখে, মেয়েটি ফিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কিনা। মোবাইল ফোনটা কানে ধরা এখনও।

ও প্রান্তে শফিক উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইছে, 'কী ব্যাপার রুহি কোথায়? সে কী এখনও বাসায় ফেরেনি? তুমি কোথায় এখন?'

'আমি তো বাসায়। শরীরটা খারাপ লাগছিল। জ্বর এবং মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রুহি একাই গেছে পড়তে। আমি তো যাইনি ওর সঙ্গে। এখনও বাসায় ফেরেনি মেয়েটি,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলে রুমানা। নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয় এই মুহূর্তে।

'কী বলছো তুমি? রুহি একা গেছে প্রাইভেট পড়তে? তুমি সঙ্গে যাওনি? এখন রাত বাজে পৌনে এগারোটা। এখনও মেয়েটা বাসায় ফিরে আসেনি! ওহ গড! আমি আর ভাবতে পারছি না। কী হবে এখন? কোথায় গেল রুহি, ওকে খুঁজতে কোথায় যাবআমরা? আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।' অস্থির গলায় শফিক বলে।

'তুমি এখন কোথায়?' কাঁদতে কাঁদতে রুমানা বলে।

'আমি তো গাজীপুরের কোনাবাড়ি অফিস থেকে ফিরছি। পথে বাইকটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ওটা সারাতে এতক্ষণ ওয়ার্কশপে ছিলাম। তুমি এখন কী করবেরুমা- ?' শফিক প্রশ্ন করে।

'আমি রহমান স্যারের বাসায় যাচ্ছি, দেখি ওখানে গিয়ে।'

বলে লাইনটা কেটে দেয় রুমানা। অস্থিরভাবেবাসা থেকে বাইরে বেরোয় সে। রাস্তায় নেমে বুঝতে পারে সিরিয়াস একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। এখন বাজে রাত এগারটা। রাস্তায় রিকশা কিংবা অন্যান্য গাড়ি চলাচল অনেকটা কমে এসেছে। কিছুটা পথ হাঁটার পর একটা রিকশা পায় রুমানা।

এতো রাতে রহমান স্যার রুমানাকে দেখে অবাক হন। তিনি জানান, নয়টায় ক্লাস শেষ করে সব মেয়ে যে যার বাসায় চলে গেছে। মা তাকে নিতে আসেনি দেখে রুহিকে সাথের একটা মেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন বলে জানান তিনি। কার সঙ্গে মেয়েটা যেতে পারে, হঠাৎ ভেবেঠিক করতে পারে না রুমানা। হঠাৎ অনুমান করে, বীথির সঙ্গে হয়তো গেছে সে। বীথির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা রুহির। তবে লুবনার সঙ্গে চলে আসবেক্লাস শেষে, বলেছিল সে যাওয়ার সময়।

বীথির বাসাটা চেনে রুমানা। লুবনার বাসায় কোনো সময় যাওয়া হয়নি। আশপাশে কোথায় যেন ওদের বাসাটা বলেছিল রুহি। রাস্তায় এসে রুমানা একটা সিএনজি নেয়। রামপুরা উলন রোডে যেতে বলে ড্রাইভারকে।

বীথির বাসার সামনে পৌঁছার পর দেখে, রাত বেশি হওয়ায় গেট বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোবাইলের ফ্লাশলাইট জ্বেলে ওদের বাসার কলিংবেলটা খুঁজে পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ টেপার পর ওপর থেকে বীথি ওর মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে নেমে আসে।

'আন্টি, রুহি তো আমার সঙ্গে আসেনি। ওকে লুব-নার সঙ্গে এক রিকশায় যেতে দেখেছি। কী বলছেন? এখনও বাসায় ফেরেনি ও? তাহলে কোথায় গেল?'

বীথির গলায় আতঙ্কভাব দেখে নিজের অজান্তে রুমানার সারা শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অনুভব করে তার সারা শরীর কাঁপছে। কোনোভাবে নিজেকে সামলায় সে।

'লুবনার বাসাটা কোনদিকে বলতে পারো?' রুমানা জানতে চায়।

বীথি মাথা নাড়ে।

'নাহ, আন্টি আমি তো লুবনার বাসা চিনি না। আপনাদের বাসার কাছাকাছি কোথায় যেন একদিন বলেছিল ও।'

এখানে অহেতুক কথা বলে সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। রাত বাড়ছে। এখন কী করবে সে, তার কী করা উচিত ভেবেপায় না রুমানা। তখনই আবার মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। মেয়ের খবর জানতে শফিক ফোন করেছে। সে উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চায়, 'কী রুমা, রুহির কোনো খোঁজ পেলে? এখন তুমি কোথায়?

'না গো। এখনও মেয়েটার কোনো খোঁজ পেলাম না। আমি এখন রামপুরা উলন-এ রুহির বান্ধবী বীথির বাসার সামনে। এখানেও পেলাম না মেয়েটাকে। হায় আল্লাহ, কী হবেএখন? কোথায় যাবো এতো রাতে? প্রাইভেট পড়া শেষে রুহিকে বান্ধবী লুবনার সঙ্গে এক রিকশায় যেতে দেখেছে, বীথি জানালো। কিন্তু লুবনার বাসাটা কোথায় জানিনা, ওর কোনো ফোন নম্বরও দিতে পারলো না কেউ। আমার কারণে মেয়েটা কোথায় হারিয়ে গেল। আমি যদি ওভাবেঘুমিয়ে না পড়তাম তাহলে তো রহমান স্যারের ওখানে রুহিকে আনতে যেতাম। আমি গেলে তো এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না। সব দোষ আমারই। আমিই দায়ি এজন্য', বলতে বলতে আর্তনাদ করতে থাকে রুমানা।

'আহা, তুমি এমন করছো কেন, এতোটা ভেঙে পড়ো না, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো, নিশ্চয়ই তিনি সববিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তুমি মৌচাক মার্কেটের সামনে চলে আসো, আমি আসছি ওদিকে।' শফিক জানায় ফোনে।

এর মধ্যে বেশ কয়েকবার রুহিকে মোবাইলে ফোন দিয়েছে রুমানা। কিন্তু প্রতিবারই রুহির ফোন বন্ধ পেয়েছে। ফলে মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ও ভয়টা আরও অনেক বেড়ে গেছে তার।

রাস্তায় লোকজনের চলাচল একদম কমে গেছে। গাড়িও নেই তেমন। মৌচাক যেতে হবেএক্ষুণি। পথে একটাও রিকশা দেখা যায় না। এতো রাতে একাকী কোনো সময়ে বাইরে বেরোয়নি রুমানা। উলন রোড ধরে হাঁটতে থাকে। কোন পথে এগোলে রামপুরা রোডে যেতে পারবেজানেনা সে। কাকে জিজ্ঞেস করবে। এতো রাতে অপরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলাটাও বিপজ্জনক। কী থেকে কী হয়ে যায় আবার?

সামনে রাস্তার পাশে দু'জন তরুণ বয়সি ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। উপায় না দেখে তাদের কাছে গিয়ে রুমানা জানতে চায়, 'ভাই, কোন রাস্তায় গেলে আমি রামপুরা রোডে উঠতে পারব, একটু বলবেন প্লিজ।'

রুমানার কথা শুনে দুই তরুণ কিছুটা অবাক হয়।

'আপা, এই তো সামনেই রামপুরা রোড। ডানের গলি ধরে একটু আগাইলেই রামপুরা মেইন রোড পাইয়া যাইবেন,' একজন বলে।

দ্রুত হাঁটতে থাকে রুমানা। রুহির চিন্তায় অস্থির হয়ে এতো রাতে একাকী অচেনা রাস্তা ধরে হাঁটছে সে। এখানেও তো তার মারাত্মক বিপদ ঘটতে পারে। ব্যাপারটা মাথায় থাকলেও এখন তার করার কিছুই নেই।

রামপুরা রোডে আসার পর মৌচাক যাবার জন্য গাড়ি খুঁজতে থাকে সে। আশ্চর্য, কোনো গাড়ি নেই এখানে। একটা রিকশা কিংবা সিএনজিও দেখা যায় না আশপাশে। এর মধ্যে কয়েকটা মোটরবাইক আশেপাশে চক্কর দিয়ে গেছে। বাইকের আরোহীদের মতিগতি ভালো লাগেনি রুমানার। লোকগুলো তাকে দেখে কী ভাবছে কে জানে। রাত বারোটার পর রাস্তায় একজন মেয়ে মানুষ একাকী দাঁড়িয়ে থাকলে নানাজনে নানারকম চিন্তা করতে পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হঠাৎ সামনে একটা কালো রঙের মাইক্রোবাস এসে থামে। গাড়ির ভেতর থেকে কেউ একজন জানতে চায়, 'ম্যাডাম কোথায় যাবেন?

অন্ধকারে তার চেহারা ঠিক স্পষ্টভাবে দেখা যায় না।

'আমি. . . আমি মৌচাক মার্কেটের সামনে যেতে চাই,' বিপর্যস্ত গলায় জবাবদিতে গিয়ে রুমানা একবারও ভাবেনা কার সঙ্গে কথা বলছে সে। মেয়ে রুহির জন্য দুশ্চিন্তায় তার সব চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। এর বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারছে না সে।

শফিক তাকে মৌচাক মার্কেটের সামনে যেতে বলেছিল কিছুক্ষণ আগে, সেটাই মাথায় রয়েছে। এখন মৌচাক যাওয়াটাই তার একমাত্র চিন্তা।

'ওহ, মৌচাক মার্কেটের দিকেই তো যাচ্ছি আমরা, চাইলে আমাদের গাড়িতে যেতে পারেন, এতো রাতে এখানে কোনো গাড়ি পাবেন না আপনি। রাস্তায় এভাবেকতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন?' গাড়ির ভেতর থেকে অন্ধকারে না দেখা মানুষটির কথা শোনা যায় শুধু।

রুমানা এই মুহূর্তে কিছু ভাবতে পারে না। অনেকটা দম দেওয়া পুতুলের মতো হয়ে যায়। তার মাথায় কেবলই একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, মৌচাক মার্কেটের সামনে যেতে হবেতাকে যে কোনোভাবেই হোক। ওখানে শফিক অপেক্ষা করছে তার জন্য।

মাইক্রোবাসে চড়ার পর সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে একজনকে দেখতে পায় রুমানা। সে-ই এতক্ষণ গাড়িতে চড়ার জন্য ডাকছিল তাকে। এখনও তার চেহারাটা দেখতে পারছে না সে। ততক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ির পেছনের সিটে আরও দু'জন মানুষকে আবিষ্কার করে রুমানা। ওরা চুপচাপ বসে আছে বলে এতক্ষণ নজরে আসেনি। রামপুরা থেকে মৌচাক যেতে বেশি সময় লাগার কথা তো নয়- হঠাৎ ব্যাপারটা মাথায় আসতেই তার খেয়াল হয়, মাইক্রোবাসটা অচেনা ভিন্ন এক পথ ধরে ছুটছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৌচাক মার্কেটের সামনে পৌঁছানো দরকার, ওখানে শফিক হয়তো এতক্ষণে চলে এসেছেও। ড্রাইভারের মনোযোগ আকর্ষণ করে রুমানা বলে, 'এই ভাই, মৌচাকের দিকে যাচ্ছেন তো? এই পথটা তো অচেনা মনে হচ্ছে। আপনারা কোন দিকে যাচ্ছেন, ঠিক করে বলেন তো, আমার তো একটু তাড়া আছে, জরুরি ব্যাপার।'

তখন পেছনের সিটে বসা একজন বলতে শুরু করে, 'আপা, আপনে অচেনা মানুষের গাড়িতে চড়ছেন। গাড়িতো অচেনা পথেই যাইবো। আমাগোও তাড়া আছে। বেশি সময় লাগবো না। জরুরি কাজ তো, তাড়াতাড়ি শেষ করমু কাজ।'

বলতে বলতে লোকটা পেছনের সিট থেকে সামনের সিটে রুমানার পাশে চলে আসে। একেবারে গাঁ ঘেঁষে বসে দু'হাতে শক্তভাবেজড়িয়ে ধরে তাকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যায় রুমানা। এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবেকল্পনাও করেনি সে। তার মাথায় রুহির চিন্তা এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। মেয়েটাকে খুঁজে না পেলে কী হবে- ভাবতে ভাবতে তার সবচিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। সে নিজে মেয়েকে খুঁজতে নেমে ভয়ঙ্কর এক বিপদে পড়ে গেছে- এটা উপলব্ধি করতে কিছুটা সময় লেগে যায়।

'কী করছো তোমরা? আমি আগে জানলে তোমাদের গাড়িতে চড়তাম না! প্লিজ, আমাকে নামিয়ে দাও। তোমাদের পায়ে পড়ি। আমার কোনো সর্বনাশ করো না। আমার ব্যাগে টাকা-পয়সা যা আছে, নিয়ে যাও। কানের দুল, গলার চেইন, আংটি সবনিয়ে নাও। তবুও আমার কিছু করো না। আমাকে দয়া করে নামিয়ে দাও গাড়ি থেকে। আমি আমার মেয়েটাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। মেয়েটা ক্লাস টেনে পড়ে। ওকে পাচ্ছি না। অনেক বড় বিপদে আছি আমি। তোমরা আমার ভাই। এই বোনটাকে ছেড়ে দাও, প্লিজ।' অনুনয় ঝরে পড়ে রুমানার কণ্ঠে।

ততক্ষণে পেছনের সিটের অন্যজনও চলে এসেছে রুমানার সিটে। প্রথমজনের সঙ্গে সেও অসভ্যতায় যোগ দিয়েছে। দু'জনই উন্মত্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

'একদম চুপ! কইতাছি। একটু চিল্লাচিল্লি করবা না। আমাগো কাজে বাধা দিবা না। যারা আমাগো কাজে বাধা দিছে, তারা বাঁচতে পারে নাই। তোমার ব্যাগের টাকা, পয়সা, মোবাইল, কানের দুল, গলার চেইন এইসবনিতে তোমাকে গাড়িতে তুলি নাই আমরা। এই সবেআমাগো কোনো লোভ নাই। আমরা শুধু তোমারে নিয়া একটুখানি মজা করমু কিছু সময়। তারপর নামাইয়া দিমু তোমারে গাড়ির থিকা। তখন তুমি তোমার মাইয়ারে খুঁইজ্যা লইয়োা গিয়া।'

সিনেমা, নাটকে দেখা গুণ্ডা বদমাশ ভিলেনের ভঙ্গিতে কথা বলে লোক দুটো রুমানাকে নিয়ে মেতে ওঠে। প্রচণ্ড শক্তিতে বাধা দিতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয় সে। লোক দুটোর শরীরে অসুরের শক্তি যেন। ওদের মুখ থেকে মদের উৎকট দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর এক পর্যায়ে রুমানা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার সবকিছু অন্ধকারে তলিয়ে যায়। সময় স্থির হয়ে থেমে থাকে না। আপন নিয়মে ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে থাকে। এভাবে বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়।

কালো মাইক্রোবাসটা কয়েকবার ফ্লাইওভারে উঠে চক্কর দিয়ে এক সময় মৌচাক মার্কেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। রাতের বয়স তখন আরো বেড়েছে। রাস্তাঘাট আরো সুনসান আরো নীরবহয়েছে। জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। কি মনে করে মৌচাক মার্কেট পেরিয়ে একটু অন্ধকার জায়গায় গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। মুহূর্তে দরজা খুলে যায় গাড়ির। খুবদ্রুত রুমানাকে ভ্যানিটি ব্যাগসহ নামিয়ে দিয়ে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে যায় কালো মাইক্রোবাস।

জনমানবশূন্য পরিবেশে রাস্তার পাশে মাটিতে কতক্ষণ পড়েছিল সে, খেয়াল করতে পারেনা রুমানা।

জ্ঞান ফিরতেই পাশেই রাস্তায় পড়ে থাকা ব্যাগের মধ্যে মোবাইলের শব্দ শুনতে পায়। ওটা বাজছে একটানা বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ব্যাগ খুলে মোবাইল ফোনটা নেওয়া দরকার, কে ফোন করেছে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু নিজের হাত-পা শরীর নাড়ানোর কোনো শক্তি পাচ্ছে না সে। গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরে তার শরীরের ওপর দিয়ে ভয়ঙ্কর ঝড় বয়ে গেছে। ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার শরীর, মন, পুরো অস্তিত্ব। যার ধকলে শরীরের সবশক্তি, উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি শরীরের নড়াচড়ার শক্তিও লোপ পেয়েছে।

কিছুক্ষণ আগে মাইক্রোবাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে করতে চেষ্টা করে রুমানা। ধীরে ধীরে সবমনে পড়ে যায়। সর্বস্ব হারানোর বেদনা গ্রাস করে তাকে। বুক ফেটে কান্না আসে, কিন্তু কাঁদতে পারে না সে। গলার মধ্যে আটকে থাকে, তীব্র এক যন্ত্রণা অনুভবকরে বুকের গভীরে। গায়ের অবিন্যস্ত সালোয়ার, কামিজটা ঠিক করতে চেষ্টা করে সে।

মোবাইল ফোনটা এখনও বাজছে। ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে রাস্তায় উঠে বসে রুমানা। ব্যাগ খুলে কোনোভাবে মোবাইলটা বের করে আনে। রুহি ফোন করেছে। মেয়েটাকে গত কয়েকঘণ্টা ফোন করে সে এবং শফিক কেবলই বন্ধ পেয়েছে। দ্রুত কল রিসিভ করে কানে লাগায় ফোনটা।

'আম্মু তুমি কোথায়? কতোক্ষণ ধরে ফোন করছি, তুমি ধরছো না। আমি বাসায় ফিরে দেখি তুমি, আব্বু কেউ নেই। আমি কোচিং থেকে লুবনার সঙ্গে ওদের বাসায় গিয়েছিলাম। আজ ওর ছোট ভাই আরমানের জন্মদিন ছিল। জোর করে ওদের বাসায় নিয়ে গেল। মোবাইলের চার্জ না থাকায় তোমাকে ফোন দিয়ে জানাতে পারিনি। স্যরি, আম্মু। আব্বুর সাথে কিছুক্ষণ আগে কথা হয়েছে। আমি বাসায় ফিরেছি, বলেছি আব্বুকে। আচ্ছা, তুমি এতো রাতে কোথায় গেছ আমাকে খুঁজতে। আমার জন্য একটুও চিন্তা করো না প্লিজ। এই তো আমি বাসায় বসে তোমাদের জন্য ওয়েট করছি। জলদি বাসায় ফিরে আসো তোমরা-' বলতে বলতে ফোনের লাইনটা কেটে যায়।

রুহির সঙ্গে কথা বলার পর রুমানার কী যেন হয়ে যায়। বুক ফেটে যে কান্নাটা আসছিল কিছুক্ষণ ধরে, কিন্তু কাঁদতে পারছিল না, গলার কাছে আটকে ছিল, এখন তা বেরিয়ে আসে। ঝর ঝর করে কাঁদতে থাকে সে। নিজের সবকিছু হারানোর কষ্ট কান্না হয়ে বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ দূর থেকে একটা মোটরবাইককে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। হেলমেট পরার কারণে চালকের মুখটা দেখা যায় না। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আছে দৃষ্টি।

খুবকাছে আসার পর মোটরবাইকে বসে থাকা শফিককে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রুমানার চোখ-মুখ।

রাস্তায় এলোমেলো পোশাকে বিধ্বস্ত ক্ষত-বিক্ষত শরীরে নিজের বউকে পড়ে থাকতে দেখে বাইক থামিয়ে দ্রুত নেমে আসে শফিক। এসেই রাস্তায় হাত-পা ছড়িয়ে অসহায়ভাবেবসে থাকা রুমানার পাশে এসে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তাকে। শফিকের বুকের মধ্যে নিজের মুখটা গুঁজে ডুকরে কেঁদে ওঠে রুমানা। তার অবিন্যস্ত জামা-কাপড়, ক্ষত-বিক্ষত, বিধ্বস্ত শরীর দেখে শফিক বুঝে নেয় অনেক কিছু।

কাঁদতে কাঁদতে রুমানা বলতে থাকে 'জানো, ওরা আমাকে-'।

শফিক বউয়ের মুখে হাত রাখে আলতোভাবে। 'চুপ করো রুমা। প্লিজ, চুপ করো। তোমার কিছু বলতে হবেনা। আমি কিছু শুনতে চাই না। তুমি বেঁচে আছো। আমার বুকের মধ্যে রয়েছো, কথা বলছো, কান্না করছো, তাতেই আমি খুশি। আমার আর কিছু চাই না। আর কিছুর দরকার নেই আমার।'

শফিকের গলাটা আবেগে জড়িয়ে আসে।

'চলো, আমরা থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জানাই, ফোন করে কমপ্লেইন জানাই', কিছুটা সুস্থির হয়ে রুমানা বলে।

'নাহ, রুমা। আমরা থানায় যাবো না। একবার ভেবে দেখো, আমাদের একটা মেয়ে রয়েছে ঘরে। রুহির ভবিষ্যতের কথা একবার ভাবো। এখন যদি তোমার এই ব্যাপারটা জানাজানি হয় মেয়েটার কী হবে। ওর বিয়ে-শাদিতে সমস্যা হবে। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাই বাঁকা চোখে দেখবে আমাদের। থানা পুলিশ আদালত পর্যন্ত গড়ালে এ নিয়ে অনেক রং ছড়ানো সংবাদ ছাপা হবে পত্রিকায়, রিপোর্টার আসবেবাসায়, আজেবাজে প্রশ্ন করে বিব্রত করবেআমাদের সবাইকে। জীবনটা দুর্বিষহ হবেতখন। তুমি আমার জীবনে আগে যেমন ছিলে এখনও তেমন আছো। আজকের এই ঘটনাটা আমাদের জীবন থেকে একদম ডিলিট করে দাও। কিছুই হয়নি তোমার। সবকিছু ভুলে যাও তুমি। জীবনে পথ চলতে গেলে কত দুর্ঘটনায় পড়তে হয় আমাদের। মনে করো, এটাও তেমনি এক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় কারো হাত থাকে না। আজকের যে ঘটনাটা ঘটেছে তাতে তোমার কোনো হাত ছিল না, তুমি অনেক চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারোনি পশুগুলোকে। এখানে তোমার কোনো দোষ নেই। এ নিয়ে তোমার মনে সামান্যতম অপরাধবোধ কিংবা হীনম্মন্যতাবোধ যেন না থাকে?

একটানা অনেকক্ষণ কথাগুলো বলে থামে শফিক।

'চলো, সামনেই একটা হাসপাতাল আছে, তোমার হাত-পায়ের ক্ষতগুলো থেকে রক্ত ঝরছে, ওগুলোতে সামান্য ওষুধপত্র দিয়ে ড্রেসিং করিয়ে নিলেই সেরে যাবে। তারপর বাসায় ফিরতে হবে। রুহি অনেকক্ষণ ধরে একা বাসায় রয়েছে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মেয়েটা,' বলেই শফিক রুমানাকে শক্ত করে ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। স্বামীর শরীরের ওপর ভর করে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ায় রুমানা। তার কোমর এবং তলপেটটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে।

কাছেই শফিকের মোটরবাইকটা দাঁড়ানো আছে। স্বামীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে রুমানা। কয়েকদিন আগে তার নিজের লেখা কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ে যায় তখন-

চুপচাপ নীরবে সবঘটে যায়
অন্ধকার সময়গুলো হয়ে ওঠে দুর্বিষহ
বিভীষিকাময়।
কেউ জানেনা, কেউ বুঝতে পারে না, কেউ অনুভব করে না
সময় নিজস্ব নিয়মে শুধু বয়ে যায়।



অনুবাদ গল্প

বায়ালের আর্তনাদিগণ

মূল: গোলাম হোসাইন সায়েদি
ফারসি থেকে অনুবাদ: শাকির সবুর

মাতাব্বর সাহেব ঘর থেকে বের হতেই পোষা কুকুর পাপাখ বাগানের দেয়ালের উপর থেকে ঘেউ ঘেউ শুরু করে গলির ভেতর লাফিয়ে পড়ল। বায়ালের ছোট ছোট ছাদের উপর অন্য যে সব কুকুর ঘুমিয়ে ছিল তারাও মাথা উঁচু করে গোঙানি দিয়ে উঠে দেখে দীর্ঘদেহী মাতাব্বর সাহেব চাঁদের আলোয় হাঁটছেন; দু'পায়ের ওপর মাথা গুঁজে দিয়ে আবারো ঘুমিয়ে পড়ে তারা।

মাতাব্বর সাহেব দাঁড়িয়ে কান খাড়া করেন। গ্রামের বাইরে থেকে আসা একটা ঝুনঝুনির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ক্ষীণ-অস্থির শব্দটা দূরে চলে যাচ্ছিল আবার নিকটে আসছিল আর গ্রামের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। সবগুলো জানালা ছিল অন্ধকার। বায়ালবাসীরা ঘুমিয়ে ছিল। আর যারাও বা জেগে ছিল তারাও অন্ধকারে বসে জোসনা দেখছিল।

পাপাখ এসে মাতাব্বর সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকলো। মাতাব্বর সাহেব দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। ঝুনঝুনির শব্দটা দূরে চলে গেছে। মাতাব্বর সাহেব পুকুরের দিকে এলে পাপাখও তার পেছন পেছন এলো। পুকুরের কিনারে আসতেই ছোট্ট একটা জানালা খুলে গেল, একটা পুরুষ-মাথা বাইরে বেরিয়ে এলো।

মাথাটা অন্ধকারে নড়ে উঠে বলল: 'রমজানের মায়ের অবস্থা খারাপ, তারে শহরে নিয়া যাইতে হইবো।'

আরও একটা জানালা খুলে গেল। আরও একজন লোকের মাথা বেরিয়ে এসে বলল: 'বিকালে তো তার অবস্থা ভালোই আছিল, না-কি?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'বিকালে অবস্থা ভালো আছিল, কিন্তু এখন ভালো না। সত্যি সত্যিই বুড়িডা মইরা যাইবো। কী করমু? অ্যা? আসলাম, কী করমু? পোলাডার কী করমু?'

আসলাম বলল: 'অহন কী অবস্থা?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'ফিরা গেছে, কেবলার দিকে মুখ কইরা ঘুমাইছে।'

প্রথম লোকটা উবু হয়ে আসলামকে বলল: 'তারে শহরে নিয়া যাইবার চাইতাছে।'

তারপর মাতাব্বর সাহেবের দিকে মুখ করে বলল: 'বিহান পর্যন্ত দেখলে ভালো অইতো না?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'ডরাইতাছি বিহান পর্যন্ত টিকে কি-না। রমজানরে নিয়াই আমার বেশি চিন্তা। বুড়িডাতো শেষই অইছে। ডরাইতাছি পোলাডা দুঃখে কিছু কইরা না বহে, ওর কী করণ যায়? অ্যা? মায়ের পাশেই বইসা আছে আর যার যার কইরা কানতাছে।'

আসলাম জিজ্ঞেস করলো: 'কেমনে নিয়া যাইবেন শহরে?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'তোর গাড়ি দিয়া বড় রাস্তার মাথা পর্যন্ত নিয়া যামু তার পরে একটা ট্যাক্সি পামুনি।'

পাপাখ যখন দেখলো মাতাব্বর সাহেব কথা বলায় ব্যস্ত তখন সে পুকুর পাড়ে বসে দু'পায়ের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজলো। মাতাব্বর সাহেব একবার ঘুরে পেছনে দেখলেন। পাপাখও মাথা তুলে অন্ধকার দেখলো।

আসলাম বললো: 'কী অইছে?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'হুনতাছ? ঝুনঝুনির শব্দ আইতাছে; আইতাছে না?'

আসলাম এবং প্রথম লোকটা কান খাড়া করলো, কিন্তু তারা ঝুনঝুনির শব্দ শুনতে পেল না। আসলাম বললো: 'মাদবর সাব, আমিও আপনের লগে আহি গাড়ি নিয়া আহুমনি।'

মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে হারিকেনটা জ্বালিয়ে টুপিটা মাথায় দিয়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো সে। প্রথম লোকটা জানালাটা বন্ধ করলো। তার স্ত্রী এলে দুজনই জানালার পেছনে দাঁড়িয়ে হারিকেনের আলোয় মাতাব্বর সাহেব, আসলাম এবং পাপাখের পাগুলো দেখতে লাগলো।

আসলাম বললো: 'আপনের কাজকামের কী অইবো?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'তোমার আতে দিয়া যামু, আমার যত চিন্তা রমজানরে নিয়া। ডরাইতাছি মাওডা মইরা গেলে পোলাডা না আবার কিছু কইরা বহে।'

তারা পুকুরের ওই পারে যেতেই হারিকেনের আলো পুকুরের পানিতে গিয়ে পড়ল। মাছগুলো কিনারে এসে লোকদের দেখলো। মাছগুলো দেখার জন্য পাপাখ উবু হলো, তবে মাছগুলোর ওপর চোখ পড়তেই ভয় পেয়ে ফিরে এলো সে এবং লোকদের পেছনে দৌড়তে লাগলো।

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'রমজানরেও আমার সাথে নিয়া যামু, যদি না নিয়া যাই...'

তাদের পায়ের আওয়াজ গলির ভেতর ঘুরপাক খেলো। বায়ালবাসীরা হারিকেন দেখেই ভাবলো রমজানের মা মারা গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো তারা। যেসব বৃদ্ধ বাড়ি থেকে বের হতে পারছিল না তারা ছাদের ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে মাথা বের করলো।

গাড়ি তৈরি হতেই গলির মুখে নিয়ে এলো। সবাই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল। আসলাম, মাশাদি জাব্বার, আব্বাস আর মুসারখে রমজানের মাকে লেপে মুড়িয়ে নিয়ে এসে গাড়িতে তুলে অপেক্ষা করতে লাগলো। রমজানকে ফতুয়ার বোতাম লাগাতে লাগাতে হাসিখুশি দেখা গেল। দৌড়াতে দৌড়াতে এসে গাড়িতে উঠে মায়ের পাশে বসলো। খানোমের মা আর ফাতেমার মা মাজারের পানি নিয়ে গাড়ির পাশে এলো। খানোমের মা রমজানের মার মুখ হা করালো আর ফাতেমার মা এক চামচ মাজারের পানি বৃদ্ধার গলায় ঢেলে দিল আর গাড়ির অপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বড় পাগড়িওয়ালা লোকটা দ্রুত দোয়া পড়তে লাগলো।

আসলাম আর মাতাব্বর সাহেব কোচোয়ানের জায়গায় বসে হুকা সাজলো। বায়ালবাসীরা পুকুরের পাড় পর্যন্ত গাড়ির সাথে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

রমজান পেছন ফিরে তাদের দেখলো। বায়ালবাসীরা নীরবে বিড় বিড় করে তাদের জন্য দোয়া করলো।

গ্রাম থেকে বের হতেই বড় রাস্তাটা ছিল আলোকিত। পাপাখ তাদের সাথে একশ কদম দৌড়ে এসেছিল, হঠাৎই ফিরে গিয়ে একটা গাছের নিচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো সে। দূর থেকে ঝুনঝুনির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিছুদূর যেতেই চাঁদ খানিকটা নিচে নেমে এলো, আরও নিচে নেমে এসে বড় হয়ে গেল। রমজান ঘুরে পেছনে দেখলো; বায়াল তার আঙুলগুলো উঁচিয়ে ওদের দোয়া করছিল।

আসলাম আর মাতাব্বর সাহেব বসে ছিল আর ঘোড়াটাকে নিজে নিজে পথ চলতে দিচ্ছিল। রমজান তার মায়ের পাশে শুয়ে পড়েছিল আর হাতটা মায়ের মাথার নিচে রেখেছিল। কয়েক মিনিট পর পরই উবু হয়ে তাকে নাড়া দিচ্ছিল আর বলছিল: 'মা, মা, ভালো লাগতাছে?'

বুকের ভেতর ঘুরপাক খাওয়া অস্পষ্ট যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বৃদ্ধ মহিলা আস্তে আস্তে বলছিল: 'ভালো।' আর রমজান খুশি হচ্ছিল।

মাতাব্বর সাহেব আশান্বিত ছিলেন, আশ্বস্ত ছিলেন আর ভাবছিলেন রাত আর বেশি বাকি নেই। একবার রমজানের মায়ের গলা উচ্চ হলো, বলছিল: 'আমার মাতাডা তুইল্যা ধর, আমার মাতাডা তুইল্যা ধর।'

রমজান মার মাথাটা তুলে ধরলো। রমজানের মা খোলা চোখে মরুপ্রান্তর আর অন্ধকার দেখলো। রমজান বললো: 'কী চাও মা? মা কী চাও?

রমজানের মা বললো: 'জানবার চাইতাছি এইডা আবার কী?'

রমজান বললো: 'কোনডা?'

আসলাম আর মাতাব্বর সাহেব ফিরে দেখলো।

রমজানের মা বললো: 'এইজে আওয়াজডা আইতাছে।'

গাড়ি থামালো। দূর থেকে ঝুনঝুনির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মাতাব্বর সাহেব কনুই দিয়ে ইসলামের পার্শ্বদেশে আঘাত করে জিজ্ঞেস করলেন: 'শুনতাছ?'

আসলাম বললো: 'ঝুনঝুনির আওয়াজ। পাহাড়ের ওই পাড় দিয়া বাইদ্যারা যাইতাছে। তাগোরে পায়ের ঘুঙ্ঘুরের শব্দ এইরহম ঝুমঝুম আওয়াজ করতাছে।'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'না, বাইদ্যারা না। এহনো তাগোরে দেহা যাওনের অনেক দেরি আছে।'

আসলাম বললো: 'উঁহু। পুরুসিরা, হুনেন। উপত্যকার নিচ দিয়া যাইতাছে আর যে ভেড়াগুলান চুরি করছে হেইগুলা সাথে কইরা নিয়া যাইতাছে।'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'পুরুসিরা কোনো সময়ই হৈচৈ কইরা যায় না। ছায়ার মতন আহে ছায়ার মতন চইলা যায়।'

রমজান বললো: 'আমি জানি, পাপাখ আইতাছে, ওইডা।'

সে আঙুল দিয়ে অন্ধকার দেখালো। রমজানের মা থেমে থেমে বললো: 'পাপাখ না.. পাপাখের... ঘণ্টি নাই।'

শব্দটা দূরে গিয়ে ছিন্ন হয়ে গেল। মাতাব্বর সাহেব চাবুক উঁচুতে তুলে ধরলেন। ঘোড়া আবার চলতে লাগলো।

আবারো বেশ কিছু দূর গেল তারা। আসলাম কথা বলতে চাচ্ছিল তাই বললো: 'আমি এই আওয়াজ অনেক হুনি। আমি একা না। রাইতে ছাদের ওফরে যাইয়া বইয়া বইয়া হুনি। তহন এই আওয়াজ অনেক হুনি।

রমজান তার হাতগুলো দিয়ে মার গলা পেঁচিয়ে ধরে বললো: মা ডরাইও না। মাশাদি আসলাম এই আওয়াজ অনেক হুনছে। অহন আর বেশি পথ নাই আমরা পৌঁছাইয়া যামু আর তুমি ভালো অইয়া যাইবা।'

বৃদ্ধা আর্তনাদ করে উঠলো: 'মইরা যাইতাছি।'

রমজান কেঁদে ওঠে মাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো: 'তোমারে মরতে দিমু না। দিমু না মা।'

আসলাম পেছন ফিরে বললো: 'হৈচৈ করিস না। এহনই বড় রাস্তায় পৌঁছাইয়া যামু আর ট্যাক্সিও পাইয়া যামু।'

তারপর ঘুরে মাতাব্বর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো: 'মাদবর সাব, আফনের রমজানের যানি কয় বছর?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'অর বারো বছর পুরা অইছে।'

আসলাম বললো: 'মাশা আল্লাহ্, এত বড় ডাঙ্গর পোলা দেহ কানতাছে। অহনো কিছু হয় নাই, কানতাছস ক্যান?'

রমজান বললো: 'ডর লাগতাছে মা যদি মইরা যায়।'

আসলাম বললো: 'তোর মা মরবো না, ডরাইস না। কিন্তু শ্যাষকালে তো একদিন মরতেই হইবো, তহন তুই কী করবি? সবার মা-ই তো মারা যায়। আমার মা, মাদবর সাবের মা। তাই না মাদবর সাব? তাই না রমজানের মা?'

কেউই জবাব দিল না।

আসলাম বললো: 'মাদবর সাব, শহর থিকা ফিরা অবশ্যই ওর জন্য একটা বৌ আনবেন। গেরামে তো মাইয়া বুঝাই। মাশাদি বাবার মাইয়া,

মোটাশোটা বুদ্ধিমান, লাল সাদা...'

তার কথা শেষ করলো না। ঝুনঝুনির শব্দ আবারো নিকট থেকে নিকটতর হলো। চারজনই মনোযোগ দিয়ে শুনলো। মাতাব্বর সাহেব গাড়ি থামালেন। আসলাম বললো: 'আব্বাসের বাপের ওপর লানত পড়ুক, ঝুনঝুনি আইনা গাড়ির নিচে লাগাইয়া দিছে।'

নেমে গাড়ির নিচে গিয়ে চারপাশে হাত বুলালো। কিন্তু ঝুনঝুনি পেল না।

চলতে শুরু করতেই আসলাম বললো: 'মন খারাপ কইরেন না। চাইরদিক ফর্সা হইয়া আইলেই বোঝা যাইবোনি ঝুনঝুনির শব্দ কোনহানে হয়।'

অনেকক্ষণ চললো তারা । চারদিক ফর্সা হয়ে গেলে ঝুনঝুনির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, দূর থেকে বড় রাস্তা দেখা গেল।

আসলাম যাত্রীবাহী ট্যাক্সি না পাওয়া পর্যন্ত বড় রাস্তার পাশে গাড়ির ওপর বসে রইল। তারপর চাবুক উঁচিয়ে ঝড়ের মতো বায়ালের দিকে চলে গেল।

মাতাব্বর সাহেব আর রমজান মাকে ট্যাক্সিতে তুলে চালের বস্তাগুলোর ওপর শুইয়ে দিল। রমজানের মায়ের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার চোখের কালোগুলো দেখা যাচ্ছিল না। থেমে থেমে নিশ্বাস নিচ্ছিল। মাতাব্বর সাহেব ভয় পাচ্ছিলেন বৃদ্ধা ট্যাক্সিতেই না শেষ হয়ে যায়। চাচ্ছিলেন যেভাবেই হোক রমজানকে মায়ের পাশ থেকে সরাতে হবে। কিন্তু রমজান তার মায়ের অসার শিথিল হাতগুলো তার হাতে ধরে রেখেছিল। সরছিল না। তার ক্লান্ত চোখগুলো ঘুমে ভরে গিয়েছিল, কানগুলো খুব কষ্টে শুনতে পাচ্ছিল; না মাকে দেখতে পাচ্ছিল, না পথের ধূলিকণা আর না দূর থেকে ট্যাক্সির ভেতর শোনা যাওয়া ঝুনঝুনির শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল।

দুপুরে বড় রাস্তার বাঁকে ট্যাক্সি থামালো। একটা পাহাড়ের খাঁজে সৃষ্টি হওয়া এক বিঘত ছায়ার ভেতর বস্তার ওপর মাতাব্বর সাহেব দস্তরখান বিছালেন। রমজান এক টুকরা রুটি ছিঁড়ে তরকারি ভরালো তাতে। জোর করে মায়ের মুখটা হাঁ করিয়ে রুটির টুকরাটা ভেতরে পুরে দিল।

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'খাইতে পারবো না, দরকার নাই।'

ড্রাইভার এসে ট্রাকের কোণা থেকে ফোলা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো: 'কী অইছে তার?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'অসুখ।'

ড্রাইভার বললো: 'কই নিয়া যাইবেন? হাসপাতালে?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'হ, কী করমু কন।'

ড্রাইভার বললো: 'হাসপাতালে তো দেখাশোনা করে না। গেরামেই রাইখা দিতেন, শান্তিতে শ্যাষ অইতো।'

রমজান এবং মাতাব্বর সাহেব পরস্পরের দিকে তাকালো। মায়ের নিশ্বাস ছোট হয়ে আসছিল। তার চোখগুলো ধুলোবালুতে ভরে গিয়েছিল। ঠোঁটের চারপাশে একদল সবুজ রঙের মাছি বসেছিল।

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'ইশ একটা কোরআন শরিফ নিয়া আইতাম যদি।'

রমজান কাঁদতে কাঁদতে বললো: 'না, না, মরবো না।'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'জানি, জানি।'

ড্রাইভার বললো: 'হ্যার পোলা?'

মাতাব্বর সাহেব দস্তরখান তুলতে তুলতে বললেন: 'হ, হ্যার পোলা, আমারও পোলা।'

ড্রাইভার মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো: 'আইজকাইল পোলারা মায়ের মরণে কমই কষ্ট পায়। আমিও এই পোলার মতন আছিলাম। মায় মরছে দশ বছরেরও বেশি অয়। কিন্তুক তারে ভুলতে পারি নাই।'

তারপর রমজানের দিকে মুখ করে বললো: 'ডরাইও না, কিছুই অইবো না। মরবো না, তোমাগো ভালো একটা হাসপাতালে নিয়া যামু। ওইখানে তারে চিকিস্‌সা করবো। উইঠা হাঁটা শুরু করবো।'

রমজান উঠে বসে কাঁদতে লাগলো। নতুন সূর্য কাত হয়ে ছিল আর তাদের নিচে কালো কালো পাথরের চাঁইসহ বড় একটা উপত্যকা মুখ হাঁ করে ছিল। রমজান বললো: 'বাবা দেহ, হুনতাছ? ওই হানে!'

মাতাব্বর সাহেব ঝুনঝুনির শব্দ শুনতে পেলেন। ড্রাইভার বললো: 'কিয়ের কতা কও?'

রমজান বলল: 'তুমি হুনতাছ না? ঝুনঝুনির আওয়াজ হুনতাছ না?'

ড্রাইভার বললো: 'ঝুনঝুনির আওয়াজ। কোনো সুময়ই এই দিকে হুনা যায় না। কোনো কোনো সুময় বড় রাস্তায় ঝিঁঝি পোকা জমা হয়, তাও রাইতে, অহন তো দুফর হয় হয়।'

গাড়ি চলতে শুরু করতেই ঝিঁঝি পোকার শব্দ থেমে গেল।

আসলাম গ্রামে ঢুকতেই লোকজন পুকুরের পাড়ে জড়ো হয়েছিল। আসলাম গাড়ি থেকে নেমে লোকজনের দিকে গিয়ে বললো: 'চইলা গেছে।'

উইলো গাছের নিচে বসে থাকা মাশাদি বাবা বললো: 'বুড়িডা তো মরবো, আমাগো মাদবর সাবের তো চামড়া মোটা, কিছু অইবো না গেরামে ফিরা আইবো। কিন্তু ওই পোলাডা, খোদাই জানে তার কী অইবো।'

লোকজনের মাঝখান থেকে বাবা আলি বললো: 'তার জন্য দোয়া করো ভালো অইয়া যাইবো।'

মাশাদি সফরের ছেলে মাশাদি জাফর বললো: 'এই রহম অইবো না, হে তো বিয়ার জন্য উতলা হইয়া গেছে, চোখের পলকে মারে ভুইলা যাইয়া অন্য চিন্তায় পড়বো।'

আসলাম বললো: 'না মাশাদি বাবা, আমরা ব্যাবাকতেই জানি যে রমজানের মা মইরা যাইবো। তারপরে মাদবর সাব পোলার হাত ধইরা গেরামে ফিরা আইবো। রমজান মায়ের জন্য অস্থির অইয়া যাইবো। তহন আমি আর মাদবর সাব তোমার মাইয়ার বিয়ার প্রস্তাব নিয়া তোমার বাইত্তে আইমু। তার জন্য বউ আনলে তহন আর মায়ের জন্য কষ্ট পাইবো না।

মহিলারা পুকুরের ওই পাশে জড়ো হয়ে ফিস ফিস করে কথাবার্তা বলছিল। সদ্য নবীআগার মাজার জিয়ারত থেকে ফেরা মাশাদি বাবার মেয়ে অন্যদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

মাশাদি বাবা জিজ্ঞেস করলো: 'মাদবর সাবে নিজে কইছে?'

আসলাম বললো: 'না, আমি কইছিলাম। হেও মাইনা নিছে। গেরামে ফিরা আইলেই আমি আর মাদবর সাবে তোমার বাইত্তে আইমু।'

মাশাদি বাবা বললো: 'সবকিছু খোদার আতে।'

আসলাম গাড়িতে উঠে ঘোড়া খেদিয়ে গ্রাম থেকে বাইরে চলে গেল। মহিলারা গোল হয়ে বসলো। মাশাদি বাবা হুক্কা সাজিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল আর তার মেয়েটা দেয়ালের পাশ থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি পৌঁছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে সুরমা লাগালো।

হাসপাতালের দারোয়ান দরজা খুললো। মাতাব্বর সাহেব তার স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে বসেছিল। হাসপাতালের গেটে হেলান দিয়ে থাকা রমজান দরজা খুলতেই ভেতরে ঢুকলো।

দারোয়ান রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো: 'কোথায়?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'আমার স্ত্রী, এই পোলাডার মায় মইরা যাইতাছে।'

রমজান কেঁদে উঠলো। তার আপাদমস্তক ছিল ধুলোবালিতে ঢাকা। দারোয়ান চার ভাঁজ করে দরজা খুললো। তারা রিসিপশনে ঢুকলো, যেটি ছিল অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে। চোখ খোলা মৃতপ্রায় বৃদ্ধাকে বেঞ্চের উপর শুইয়ে দিল তারা।

দারোয়ান বললো: 'অন্য কোনোখানে নিয়া গেলেই তো ভালো আছিল। হাসপাতালে এই রকম রোগী রাখে না।'

রমজানের কান্না আরও উচ্চ হলো। মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'অন্য কোনো হানে, কনে?'

দারোয়ান বললো: 'জানেন তো আমাগো হাসপাতালে লাশ টানার গাড়ি, ট্যাক্সি এইসব কিছুই নাই। সাকুল্যে কয়ডা কামরা আর একজন ডাক্তার। যদি অবস্থা ভালো না হয়, তহন কী করবেন? ওইহানে কেমনে নিয়া যাইবেন?

মাতাব্বর সাহেব আর রমজান দুজনেই কাকুতি-মিনতি করলো।

দারোয়ান বললো: 'ঠিক আছে।'

রমজানের মাকে তুলে নিয়ে রিসিপশন থেকে বড় একটা উঠানে ঢুকলো তারা। তারপর দ্বিতীয় রিসিপশনে পৌঁছে দ্বিতীয় রিসিপশন থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো। সিঁড়ির উপর সাদা কাপড়, রক্তমাখা তুলা আর লাল লাল ওষুধ পড়ে ছিল।

সাদা জামা গায়ে ক্ষীণকায় এক মহিলা, দুটি বাচ্চাসহ সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, একটা বাচ্চা ছিল তার কোলে। ওদের দেখেই বললো: 'এই মরাটারে কেন উপরে আনতাছেন?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'হ্যারে আনবার দেন, অহনো জান আছে।'

রমজান জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো। মাহিলা সামনে গিয়ে বৃদ্ধার চোখগুলো দেখে বললো: 'শ্যাষ অইয়া গেছে।'

রমজানের মা দীর্ঘ একটা নিশ্বাস নিল। মহিলা বললো: 'ঠিক আছে, হ্যারে উপরে নিয়া আসেন। সবসময় রোগীদের এমন সময় নিয়া আহেন যহন আমাগো আর কিছুই করার থাকে না।'

দরজা খুললো। একটা কামরা দেখা গেল, যাতে সিলিং থেকে ঝুলন্ত একটা প্রদীপদানে ছোট্ট একটা প্রদীপ জ্বলছিল। কম আলোর একটা বাতিও তাকের উপর রাখা ছিল। কামরার ভেতরে তিন কোণে তিনটি খালি শয্যা পাতা ছিল, যেগুলোর ওপর পাতলা চাদর আর নোংরা তুলো স্তূপীকৃত ছিল। দারোয়ান নার্সকে বললো: 'আবারো বাত্তি জ্বালাইছ?'

নার্স বললো: 'ডরাইতাছিলাম তেল শেষ অইয়া গেলে না আবার আন্ধারে থাকন লাগে।'

রমজানের মাকে খাটের উপর রাখলো তারা। রমজান আর মাতাব্বর সাহেব ফিরে গিয়ে দরজার কাছে বসলো। দারোয়ান বললো: 'বইলা ক্যান? ওঠ ডাক্তারের কাছে যাইয়া হ্যারে খবর দেই?'

মাতাব্বর সাহেব উঠে দারোয়ানের সাথে বাইরে চলে গেলেন। রমজান উঠে মায়ের কাছে গিয়ে প্রদীপদানে নিবদ্ধ হয়ে থাকা তার চোখগুলোর দিকে তাকালো। মনে মনে বললো: 'অহন আস্তে আস্তে ভালো অইতাছে, বাত্তি দ্যাখতাছে।'

নার্স জিজ্ঞেস করলো: 'কতদিন থিকা অসুখ?'

রমজান বললো: 'জানি না, ইসলামের গাড়িতে কইরা বড় রাস্তার কিনারে আনছি, ওহান থিকা ট্যাক্সিতে কইরা এহানে নিয়া আইছি।'

নার্সের বাচ্চারা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা আর তার সন্তানকে দেখছিল আর বৃদ্ধার হাতগুলোকে, যেগুলো ধীরে ধীরে খাট থেকে ঝুলে পড়ছিল।

মাতাব্বর সাহেব আর দারোয়ান প্রথম রিসিপশনে ঢুকলো। রিসিপশনের অপর কোণের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একটা চৌকুণো করিডোরে পৌঁছে, যার দেয়ালের মাঝখানে বড় মাঠের দিকে খোলা একটা গোলাকার জানালা, দারোয়ান দরজায় টোকা দিল।

কাশতে কাশতে একটা লোক জিজ্ঞেস করলো: 'কে? আবার কে?'

দারোয়ান বললো: 'একটা লোক রোগী নিয়া আইছে।'

ছেঁড়া কাপড়ের জোতা পায়ে সাদা জামা পরা একটা শীর্ণ লোক বেরিয়ে এলো। স্টেথোটা মুচড়িয়ে জামার পকেটে ঠেসে ভরেছিল আর বিচি ভাংছিল সে। বাইরে এসেই মাতাব্বর সাহেবের দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে বললো: 'এটাতো রোগী না।'

দারোয়ান বললো: 'রোগী নিচে, আযারের রুমে।'

ডাক্তার তার বিরক্তি চেপে রেখে বললো: 'কেন ওখানে নিয়ে গেছ? সবসময় ওই নোংরা কবর-ঘরে যেতে আমার রুচি হয় না।'

তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে এলো সে। মাতাব্বর সাহেব আর দারোয়ানও তার পেছন পেছন। রিসিপশন, প্রাঙ্গণ এবং দ্বিতীয় রিসিপশন পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো তারা। বাচ্চা কোলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আযার পাশে সরে গেল। রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা হাড় চুষতে থাকা অন্য দুই বাচ্চা ঘুরে তাদের দিকে তাকালো। রমজান ভয় পেয়ে জানালার সামনে গেল।

ডাক্তার আযারকে বললো: 'আবারও এই কুকুরছানাগুলো হাসপাতালে নিয়ে এসেছ? ওদের বাইরে নিয়ে যাও!'

আযার ইশারা করলো, বাচ্চারা হাড়টাকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে করিডোরে চলে গেল। আযার নিজেও চলে গিয়ে দরজার পেছন থেকে ফাঁক দিয়ে রুমের ভেতরে তাকালো। ডাক্তার সামনে গিয়ে রমজানের মায়ের ওপর থেকে লেপটা পাশে সরালো। পরিচিত মাছিগুলোকে দেখতে পেল, রোগীর মুখের ওপর যেগুলোর লাইন লেগে গিয়েছিল। শুষ্ক, ঘোলাটে চোখগুলো শেষ সময়ে বৃদ্ধা মহিলার চোখের তারায় টলটলায়মান হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার মাতাব্বর সাহেব এবং তার ছেলেকে বললো: 'আপনারা দুজন বাইরে যান।'

রমজান, মাতাব্বর সাহেব এবং দারোয়ান বাইরে গেল। দারোয়ান বললো: 'তার অবস্থা খুব খারাপ।'

মাতাব্বর সাহেব দারোয়ানকে পাশে টেনে নিয়ে বললো: 'যদি বৃদ্ধ মহিলাটা মারা যায় তাইলে আমার পোলাডাও নিজেরে মাইরা ফেলবো। এইডা আমি জানি, হ্যার কী করণ যায়?'

দারোয়ান বললো: 'তোমার বিশ্বাস অয়?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'হ, রাইত দিন মার পাশ থিকা নড়ে নাই। আমি তো জানি বুড়ি শ্যাষ হইয়া গেছে। তোমার আতে ধরি। কিছু একটা করো যাতে পোলাডা বুঝবার না পারে।'

দারোয়ান বললো: 'ঠিক আছে।'

রুম খালি হতেই ডাক্তার রোগীর বুক খুললো। বৃদ্ধ মহিলার উষ্ণ শরীর শীতল হয়ে আসছিল।

ডাক্তার রোগীর হৃৎপিণ্ডের ওপর স্টেথো রাখলো। হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবে একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ডাক্তার রাগান্বিত হয়ে ফিরে এসে দরজা খুলে আযারকে বললো: 'কতবার বলবো যখন আমি রোগী দেখি তখন বাচ্চাদের হাতে খেলনা দেবেনা।'

আযার বাচ্চাদের দিকে দেখালো, যারা চুপচাপ সিঁড়ির ওপর বসেছিল। ডাক্তার আবারো ফিরে গিয়ে হৃৎপিণ্ডের ওপর স্টেথো রাখলো।

ঝুনঝুনির শব্দটা ধীরে ধীরে দূরে চলে যেতে যেতে মাঠের শেষ প্রান্তে গিয়ে থেমে গেল। মাশাদি বাবার মেয়েটা কাশতে কাশতে ছাদের উপর এসে বসলো। বায়ালবাসীদের কেউই বাইরে ছিল না। পাপাখ মাতাব্বর সাহেবের ঘরের দেয়ালের ওপর বসে পাগুলোর ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিল।

মাশাদি বাবা, ঘরের ভেতর শুয়ে ছিল, মেহেদি দেয়া দাড়িগুলোর সাথে খেলছিল আর সিলিঙের ছিদ্র দিয়ে, মেয়ের লাল ঝালড়ওয়ালা ঘাগরাটা দেখছিল।

আসলাম গাড়িতে করে গ্রামে ঢুকে পুকুরের কিনারে গেল। বালতিটা ভরে ঘোড়ার মুখের সামনে ধরলো। ঘোড়া পানি খেলো। ইসলামের কালো ছাগলটা জানালা দিয়ে বাইরে এসে গাড়ির পাশে গিয়ে গাড়ির চাকার সাথে লেপ্টে থাকা দলিত ঘাসগুলো চাটতে লাগলো। রাত হয়ে আসছিল। সবাই অপেক্ষা করছিল। সবাই জানালা দিয়ে মাথা বের করে শুনছিল।

বড় রাস্তাটা ছিল নীরব। মাশাদি বাবার মেয়েটা ব্যথিত, ছাদের ইটের নকশার প্রান্তে বসে ছিল।

রমজান খুশি মনে দারোয়ানের কক্ষে রুটি আর দই খাচ্ছিল। তার মা নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল, বিলাপ করছিল না। তার মুখের ওপর একটা সাদা চাদর টেনে দেয়া হয়েছিল। দারোয়ান বলেছিল তাকে অপারেশন করতে হবে তাহলে হাঁটতে পারবে আর সে জন্য পরদিন সকালে তাকে অন্য হাসপাতালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তারা তিনজনই দারোয়ানের কক্ষে ছিল। রমজান রাতের খাবার খেয়েই শুয়ে পড়েছিল এবং ঘুমিয়ে পড়েছিল। তবে দারোয়ান এবং মাতাব্বর সাহেব মধ্যরাত পর্যন্ত, আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলছিল। দারোয়ান মাতাব্বর সাহেবকে কাজের কলাকৌশল শেখাচ্ছিল।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লো তারা। বাইরে ঝড়ো বাতাস আসছিল আর বাদামগাছের ডালকে জানালার কাচের উপর ঘষছিল।

সকাল হতেই দারোয়ান আর মাতাব্বর সাহেব উঠে পড়লো। পা টিপে টিপে রুম থেকে বের হয়ে আযারের রুম থেকে রমজানের মাকে নিচে এনে রিসিপশনের বেঞ্চের উপর রাখলো তারা। দরজা খুলে বড় রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সির অপেক্ষা করতে লাগলো লাশ কবরস্থানে নেওয়ার জন্য। এর মধ্যে রমজান উঠে বাইরে এলো।

দারোয়ান বললো: 'তোমার মাকে অন্য হাসপাতালে পাঠাতে চাচ্ছি, অপারেশন করবে।'

রমজান বললো: 'আমিও তার সাথে যামু।'

দারোয়ান বললো: 'ওখানে তোমারে ঢুকতে দিবো না।'

রমজান বললো: 'যদি ঢুকবার না দেয় তাইলে ফিরা এইহানে আইমু।'

কালো রঙের একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দারোয়ান ইশারা দিলে মাতাব্বর সাহেব রমজানের মাকে কোলে করে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে বসলো। রমজানও মাতাব্বর সাহেবের পাশে বসলো।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো। দারোয়ান তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বড় রাস্তার মাথায় যেতেই সূর্য উঠলো, ড্রাইভার পেছন ফিরে বললো: 'রোগীরে এই রকম মোড়াইয়া লইছেন ক্যান? কী অয়?... কী অয় কওয়ন যায়?...

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'আমরা গলির মুখেই নাইমা যামু। বানাফশে যার গলির মুখে।'

ড্রাইভার কিছুই বললো না। যেতে যেতে নির্জন ছোট একটা মাঠে গিয়ে থামলো। তারা নেমে গেল। তাদের সামনে ধুলোকাদায় ভরা একটা প্রশস্ত গলি দেখা গেল। গলির কোনায় কালো একটা পাথরের তক্তিও পড়ে ছিল। তামার পাঞ্জাওয়ালা ছোট একটা পতাকাও পাথরের মাথার ওপর পোতা ছিল।

মাতাব্বর সাহেব রমজানকে বললেন: 'তুই এইহানে থাক, আমি তোর মারে রাইখা আইতাছি।'

রমজান বললো: 'আমিও তোমার লগে আহি, আমি আমার মায়রে দেখমু।'

লেপের ভাঁজের ভেতর দিয়ে মৃতের হাতটা ধরার জন্য তার হাত বাড়ালো। মাতাব্বর সাহেব বললেন: হাত দিস না। যদি জাইগা যায় তাইলে

ভালো অইবো না। তুই এইহানেই থাক। যদি আহস তাইলে আমাগো ঢুকবার দিবো না। তহন কী করমু?'

রমজান পাথরের তক্তির ওপর বসে রইল। রুটি আর দইয়ের ঝোলাটা হাঁটুর ওপর রাখলো। মাতাব্বর সাহেব রমজানের মাকে পিঠের ওপর নিয়ে গলিতে ঢুকলো। মার কালো হয়ে যাওয়া পাগুলো, লেপের ভাঁজের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে ছিল, খোলা লম্বা আঙুলগুলো গলির নরম মাটিগুলোতে হাল দিয়ে যাচ্ছিল।

রমজান ফাঁক হয়ে যাওয়া মাটির হালগুলোর দিকে দেখছিল, তার বাবা যতই সামনে যাচ্ছিল ততই সেগুলো লম্বা হচ্ছিল। রোদ উষ্ণ আর জ্বালাময়ী হয়ে উঠছিল। দুর্গন্ধময় বাতাস বইছিল আর রমজানের মাথার উপরের নিশানটাকে দোলাচ্ছিল। গলির ভেতর চাকা আর ঝুনঝুনির শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছিল। রমজান পাশে সরে গেল। একটা কালো লাশটানার গাড়ি দেখা গেল, মোটাসোটা দুটা ঘোড়া যেটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। লাশ টানার গাড়ির এক প্রান্তের তারগুলোতে ঝুনঝুনিগুলো ঝুলানো ছিল। লাশটানার গাড়িটা ছোট্ট মাঠটাতে ঢুকে থামলো। ঘোড়াগুলো নতুন দম নিয়ে বড় রাস্তার দিকে লম্বা পা ফেললে ঝুনঝুনিগুলো বাজতে শুরু করল।

লাশটানা গাড়িটা মাঠ থেকে যখন বাইরে যাচ্ছিল তখন তার পর্দার নিচ থেকে সবুজ রঙের বড় একটা প্রদীপ মাটিতে পড়ে গেল। চাকাগুলো তার পাশদিয়ে চলে গেল।

আসলাম এবং মাশাদির বাবা গাড়িতে চড়া ছিল। মাশাদি বাবার মেয়ে সুরমা পরা চোখে গাড়ির ভেতর বসেছিল। সবাই বড় রাস্তার প্রান্তে কে আসছে তার অপেক্ষা করছিল।

আসলাম বললো: 'মুনে অয় না দেরি করবো। বুড়ির অবস্থা খুবই খারাপ আছিল। গাড়িতে যহন তুলতাছিল তহনই তো যায়যায়। যাই হোক খবর পাওয়া যাইবো।'

মাশাদির বাবা বললো: 'মাতাব্বর সাব ব্যাডা কম না। মরারে দাফন-কাফন না কইরা ফিরবো না।'

বড় রাস্তা ছিল লোকজন শূন্য। মাশাদি বাবার মেয়ে প্রত্যাশার চোখে শহরের দিকে দেখছিল। আসলাম একবার ফিরে এসে বড় রাস্তার ওপর বিস্মিত হয়ে তাকালো। বড়সড় দুইটা ইঁদুর ধীরেসুস্থে সামনে আসছিল। আসলাম গাড়ি থেকে নামলো। ইঁদুরগুলো তাদের পথ বদলে আপথে বেইলের দিকে চলতে লাগল। আসলাম চাবুক হাতে ইঁদুরগুলোর দিকে গেল। সামনে যে ইঁদুরটা ছিল, তার মুখে ছিল বড় একটা সবুজ রঙের মোমবাতি। আসলাম হেসে মাশাদি বাবাকে ডাকলো। মাশাদি বাবা আসলামের পাশে গেল। দুজনই উবু হয়ে তাকালো। আসলাম বললো: 'হারামজাদারা, বায়ালে মোমবাতি নিয়া যাইতাছে।'

মাশাদি বাবা বললো: 'একা মোমবাতি নিয়া যাইতাছে তার বদলে দুই বোঝা গম খাইবো।'

আসলাম ইঁদুরগুলোকে পা দিয়ে আঘাত করলো। প্রথম ইঁদুরটা মোমবাতি ফেলে পালিয়ে গেল আর দ্বিতীয় ইঁদুরটা আসলামের পায়ের নিচে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

মাশাদি বাবা মোমবাতিটা তুলে ভালো করে দেখলো। তারপর গন্ধ শুঁকে বললো: 'এইডা কী করমু?'

আসলাম বললো: 'নিয়া তোমার ম্যায়ারে দিমু, তার বিয়ার রাইতের জন্য রাইখা দিবো। কেমুন?'

মাশাদি বাবা বললো: 'খুব ভালো।'

ফিরে এসে মোমবাতিটা মেয়ের হাতে দিয়ে হুকা সেজে বসে ভাবতে লাগলো তারা।

মাতাব্বর সাহেব যত কিছুই করলো কিন্তু রমজান গ্রামে ফিরতে রাজি হলো না। পাথরের ওপর বসে রইলো আর বলতে লাগলো: খাড়ও মায় আহুক, তার পরে যাই।'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'তোর মায় এহনি আইবো না। দশদিন পরে আইবো।'

রমজান বললো: 'দশদিন পরে রওনা অইমু।'

মাতাব্বর সাহেব বললো: 'গেরামে যে কাম কাইজ আছে হেগুলানের কী অইবো?'

রমজান বললো: 'তুমি চাইলে যাওগা, আমি তার জন্য বার চাইমু।'

মাতাব্বর সাহেব বসে ঘাম মুছলেন। বৃদ্ধা মহিলার কাপড়গুলো তার বগল তলা ছিল। একবার উঠে বললেন: 'হুন, এহেনে বইয়া থাকন যাইবো না। চল হাসপাতালে দারোয়ানের কাছে যাই। ওইহানে গিয়া অপেক্ষা করমু।'

তারা উঠে দারোয়ানের কাছে গেল। দারোয়ান হাসপাতালের গেটের সামনে ঝাড়ামুছা করে দরজার সামনে চেয়ারে বসে লেটুস খাচ্ছিল।

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'তারে হাসপাতালে দিয়া আইছি।'

চোখ টিপ দিয়ে বললেন: 'কইছে দশদিন পরে বাইরে আইবো। কিন্তুক রমজান গেরামে ফিরা যাইবার চাইতাছে না।'

রমজান বললো: 'তুমি যাও, আমি মার লগে যামু।'

দারোয়ান বললেন: 'ঠিক আছে মাদবর সাব। আপনে যান, রমজান এহেনে থাউক। আমারে সাহায্য করবো। এক সপ্তা পরে ওরে পাঠাইয়া দিমুনি।'

মাতাব্বর সাহেব বৃদ্ধার কাপড়গুলো তুলে নিয়ে দারোয়ানকে রমজানের গাড়িভাড়া দিয়ে প্রতিশ্রুতি নিলেন, সাতদিনের মাথায় রমজানকে বায়ালে পাঠাবে।

রমজান এবং দারোয়ান ভেতরে চলে গেল। দারোয়ান বললো: 'তুমি এইহানে, এই রুমে আমার কাছে থাকবা, যদ্দিন তোমার মায় না আহে।'

রমজান রুটি আর দইয়ের ঝোলাটা দারোয়ানের তাকের নিচে রাখলো। জানালার কাছে গিয়ে বসলো। দারোয়ান রমজানের গাড়ি ভাড়ার টাকাটা প্রদীপের নিচে রেখে নিজের খাটে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রমজান বাইরে এসে দরজার সামনের চেয়ারে বসে লেটুস খেতে শুরু করল।

মাতাব্বর সাহেব যখন গ্রামে ঢুকলেন আসলাম তখন পুকুর পাড়ে গাড়ি ধুচ্ছিল। পাপাখ দেয়ালের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে ঘেউ ঘেউ করতে করতে মাতাব্বর সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাতে দৌড়ে এসে তাকে শুঁকতে লাগলো।

মাশাদি বাবার মেয়ে ছাদের ওপর গিয়ে দেখলো মাতাব্বর সাহেব এসে আসলামের সাথে কথা বলছে। ফিরে এসে হাঁড়ি-পাতিলগুলো নিয়ে দ্রুত গলি পার হয়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে হাঁড়িপাতিলগুলো ধোয়ামাজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। আসলাম বললো: 'রমজান আহেনাই ক্যান?'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'কয় যে পর্যন্ত আমার মায় না আইবো আমি যামু না।'

আসলাম দাঁড়িয়ে গেল। বিস্মিত ভঙ্গিতে মাছগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো: 'শ্যাষম্যাশ কবেআইবো।'

মাতাব্বর সাহেব বললেন: 'দারোয়ান কইছে এক হপ্তা বাদে পাঠাইয়া দিমুনি আইয়া পড়বো।'

মাশাদি বাবার মেয়ে হিসাব করলো: 'এক হপ্তা মানে কয়দিন?'

আর তার চোখগুলো অশ্রুতে ভরে গেলো। আসলাম বললো: 'আহারে হ্যারে যদি নিয়া আইতা। জান তো অনেকেই হ্যার লিগা বার চাইয়া রইছে।'

আর মাশাদি বাবার মেয়ের দিকে ইশারা করলো। দুজনই ঘুরে তাকালো। মাশাদি বাবার মেয়ে উঠে হাঁড়িপাতিলগুলো তুলে নিয়ে চলে গেলো। গলিতে ঢুকতেই দেখে পাপাখ আর আসলামের কালো ছাগলটা দাঁড়িয়ে আছে আর তাকে বিস্মিত ভঙ্গিতে দেখছে।

দারোয়ান রাতের বেলায় ঘুমাতো আর যখনই রোগী এসে দরজায় কড়া নাড়তো রমজান উঠে দরজা খুলে দিত। দারোয়ান মাতাব্বর সাহেবকে কথা দিয়েছিল এক সপ্তাহের মাথায় রমজানকে বায়ালে পাঠিয়ে দেবে তাই ষষ্ঠদিনে রমজানকে বললো: 'হাসপাতালে গেছিলাম, তোর মায়রে এত তাড়াতাড়ি ছাইড়া দিবো না। তোর বাপেও তো ট্যাকাপয়সা খরচাপাতি দিয়া যায় নাই। তুই যা কাইল গেরামে যাইয়া ট্যাকা নিয়া আয় গা।'

রমজান রাজি হলো। ঠিক হলো ভোরে সূর্য ওঠার আগেই রওনা হবে সে। সেদিন অন্য সময়ের চেয়ে দ্রুত রাত হলো। দারোয়ান আর রমজানও দ্রুত রুমে গিয়ে ঘুমানোর জন্য দরজা বন্ধ করলো। বাতাস আসছিল। তারা আযারের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, যে জানালায় উবু হয়ে বাচ্চাদের বলছিল: 'জান বাতাস কী কাম করবার পারে?'

বাতাস উঠানের ময়লা-আবর্জনা আর নোংরা তুলাগুলো বাইরে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। দারোয়ান রাতের খাবার না খেয়েই কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রমজান দেয়ালের পাশে বসেছিল আর জানালার কাচে আছড়ে পড়া বাদামগাছের ডালের তামাশা দেখছিল।

মিশ্রিত শব্দ ছিল আর প্রতি মুহূর্তে, উপরের তলা থেকে ডাক্তারের শব্দ আসছিল, যে দরজা খুলছিল আর করিডোরে কাশছিল আর গালি দিচ্ছিল। রমজান সেই শব্দ শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়লো।

মধ্যরাতে সে জেগে উঠলো। শব্দ আসছিল, একটা পরিচিত শব্দ আসছিল। বাতাসের ভেতর থেকে একটা ঝুনঝুনির শব্দ আসছিল। কান পেতে শুনলো। শব্দটা কাছে থেকে আরও কাছে এলো। বাইরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। তারপর খানিক থেমে দরজার খিলের ওপর পড়লো আর

আস্তে করে দরজায় শব্দ হলো। রমজান তাকিয়ে দেখলো। ডাক্তারের শব্দ শুনতে পেল, যে তার বিছানার উপর কাশছিল।

রমজান সামনে গেল, দরজার পেছন থেকে কারও শাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসছিল। দরজা খুলতেই তার মাকে দেখতে পেল নতুন পোশাক পরে আছে। রমজান খুশিতে বাইরে গিয়ে মার হাত ধরলো।

দুজনই দ্রুত দূরে চলে গেল। প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছিল আর তাদের দুজনকে সামনে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। দূর প্রান্তর থেকে আবারো ঝুনঝুনির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রমজান বললো: 'আমরা কনে যাইতাছি মা? বায়াল যাইতাছি?'

মা বললেন: 'বায়াল যামু না। বানাফশে যার যামু।'

পরের দিন সকালে মাতাব্বর সাহেব এবং আসলাম গাড়িতে চড়ে বড় রাস্তার পাশে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

পাপাখ আর আসলামের কালো ছাগলটাও গিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়ালো।

বায়ালবাসীরা কয়েক ঘণ্টা পর পর একবার করে বাইরে আসছিল, পুকুরপাড় থেকে বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আবার ফিরে যাচ্ছিল। সন্ধ্যার দিকে, মাশাদি বাবা বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করলো: 'আইবো না নাকি। কইছিলা না যে আইবো?'

মাতাব্বর সাহেব উদ্বিগ্ন স্বরে জবাব দিলেন: 'কইছিল তো যে হ্যারে পাঠাইয়া দিমুনি। এহনো তো কোনো খবর অইলো না।'

রাত হতেই মাশাদি বাবার মেয়ে ছাদের ওপর থেকে নিচে গিয়ে বড় সবুজ প্রদীপটা নিয়ে বাইরে এলো। টিলার দিকে চলে গেল সে, দুজনের দেখা করার নির্ধারিত স্থানে সংকেত দেওয়ার জন্য।

[সমকালীন ইরানের খ্যাতিমান লেখক, নাট্যকার, অনুবাদক ও মনোচিকিৎসক ড. গোলাম হোসাইন সায়েদি (গওহার মোরাদ) ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তাব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন। 'আজাদারানে বায়াল' (বায়ালের আর্তনাদিগণ), 'ভাহমেহায়ে বিনাম ভা নেশান' (নাম ঠিকানাহীন ভীতিসমূহ), 'শাব নেশিনিয়ে বা শোকূহ' (জমকালো নৈশ আড্ডা), 'দানদিল' (দানদিল), 'তাতার খান্দান' (তাতার বংশ), 'গুয়ি ভা গাহভারে' (গোলক ও দোলনা) তার উল্লখযোগ্য ছোটগল্প। সায়েদী তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বীয় গল্পের চরিত্রগুলোকেও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তার গল্পগুলো জাদু-বাস্তবতাধর্মী। তার গল্পে বিষাদ, ভয়, মানসিক আঘাত এবং আতঙ্ক দৃশ্যমান। দারিদ্র্যের বেদনা, কুসংস্কার, উন্মাদনা, উৎকণ্ঠা, মৃত্যু প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সায়েদীর গল্পের ভুবন গড়ে উঠেছে। দারিদ্র্যকে তিনি অশুভ ও অসুন্দর বলে মনে করেন। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক দারিদ্র্যকে তার গল্প ও নাটকের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ঠাঁই দিয়ে কঠোরভাবে এর মোকাবেলা করেছেন তিনি।

সায়েদি তার সমকালীন ইরানের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গ্রামীণ মানুষের জীবন চিত্রায়নে যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ কারণে তাকে ইরানের 'গ্রামীণ সাহিত্যের পথিকৃৎ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তার অধিকাংশ গল্পই গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত। 'আজাদারানে বায়াল'ও এ ধারারই গল্প। এই শিরোনামেই ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ৮টি গল্পের ধারক এ গ্রন্থের গল্পগুলোর পটভূমি বায়াল নামের একটি গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন। গল্পগুলোর উপস্থাপনায় তার যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় তা ফারসি সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। শুধু জীবনায়নেই নয়, এ গল্পগুলোর উপস্থাপনভঙ্গিও সম্পূর্ণ নতুন। প্রতিটি গল্প পৃথক পৃথক গল্প হলেও সবগুলো গল্পের প্লট একই গ্রাম এবং কোনো গল্পেরই পৃথক শিরোনাম নেই। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে এই লেখকের মৃত্যু হয়।]





গল্প

ইন্সপেকশন

হাফিজ উদ্দীন আহমদ

মোবাইলটা বেজে উঠল। অফিস থেকে ফেরত এসে নিজের বাসস্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিল আরিফ। ঢাকা থেকে বহুদূরে মফস্বলের একটা বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সে। বাসস্থান মানে একটা বহুতল বিল্ডিংয়ে এক রুমের একটা কক্ষ। সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ। ভিতরে একটা বিছানা পাতা। পাশে একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার। কার্পেট, টিভি দূরের কথা, অন্য কোনো আসবাব মায় বসার একটি অতিরিক্ত চেয়ারও নেই। চাকরিতে ঢোকার আগে বলা হয়েছিল ফ্রি ফার্নিশড কোয়ার্টার। কেমন ফ্রি ফার্নিশড তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন। আবার রিংটোন বাজতেই সেটটা হাতে তুলে নিলো সে।

: স্যার, আমি কাশেম বলছি। কাশেম মানে তার সেক্রেটারি। সেক্রেটারি হলেও আরিফ ঢাকায় ডিন অফিসের মিটিং বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো কাজে অথবা এক্সটার্নাল পরীক্ষক হয়ে অন্য কোথাও চলে গেলে কিংবা ছুটিছাটায় অনুপস্থিত থাকলে সেই সাময়িক অনুপস্থিতে তখন অঘোষিত প্রিন্সিপাল সেজে জুনিয়র ডাক্তার আর নার্সদের উপর অযৌক্তিক দাপট দেখিয়ে চলে। যাকে-তাকে লেট-অবসেন্ট করে, যারা তার চামচাগিরি করে তাদের কাউকে কাউকে বিনা অনুমতিতে ছুটি দেয়। মনে হয় সেই এখানকার সর্বেসর্বা। ভাইস প্রিন্সিপাল না থাকায় এ সুযোগটা সে পুরোদমে গ্রহণ করে। পরে ওদের দরখাস্ত এনে মিথ্যা বানিয়ে আরিফকে বলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বা বাড়িতে কেউ মারাত্মক অসুস্থ ছিল তাই তাকে যেতে দিয়েছে। কর্মচারীদের উপর প্রাধান্য রাখার জন্য তার এ চালাকি বুঝতে পেরেও মুখে কিছু বলে না। নীরবে ব্যাক ডেট দিয়ে সই করে দেয়। কারণ ছাত্রদের বেতন- ডেভেলপমেন্ট ফি ইত্যাদি টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে বলে সে কর্তৃপক্ষের প্রিয় লোক।

: কী ব্যাপার?

: স্যার, ঢাকা থেকে ইন্সপেকশন টিম আসবে সামনের মঙ্গলবার।

: মানে আর চার দিন পরে?

: জি স্যার।

মাথাটা বো বো করে ঘুরে উঠল আরিফের। কি করবে সে এখন? নতুন কলেজ। তেমন কিছুই নেই বলতে গেলে বিল্ডিং, আসবাবপত্র ও কিছু স্টাফ ছাড়া। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক হিসাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জোগাড় করা সবচেয়ে কঠিন। ভালো বেতন সেধেও তাদের আনা যায় না। ঢাকার রমরমা প্রাকটিস ছেড়ে মফস্বলে কেউ আসতে চায় না। কাগজে-কলমে দুইশ' বেডের হাসপাতাল এটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শয্যা রয়েছে মাত্র একশো দশটা।

রোগী ভর্তি আছে মাত্র পাঁচ জন। হাসপাতালে চার্জ দিয়ে আসলে এই মফস্বলে লোকজিন স্বাস্থ্যসেবা নিতে চায় না যদিও চার্জ সামান্য। তারা অল্প পয়সায় ঝাড়-ফুঁক ও টোটকা চিকিৎসা নেয়। স্বল্প শিক্ষিত লোকজনরা ওষুধের দোকানদারকেই ডাক্তার জ্ঞান করে, তার কাছ থেকে অসুখ-বিসুখের বর্ণনা দিয়ে ওষুধ কিনে ঘরে ফেরে। যারা শিক্ষিত ও পয়সা আছে তারা সরাসরি ঢাকা ও বড় বড় হাসপাতাল বা নাম করা বিশেষজ্ঞের কাছে চলে যায়। ছাত্রছাত্রী সরকারি নিয়মে হাসপাতালের প্রতি পাঁচটি শয্যায় একজন হিসাবে ১১০টি শয্যায় মাত্র ২২ জন ভর্তি হওয়ার কথা কিন্তু ২০০ শয্যা প্রদর্শন করায় মোট ৪০ জন ভর্তি হয়েছে কাগজে-কলমে। অর্থাৎ কোটা হিসেবে একটা সিটও খালি নেই। সবাই ১৫ লাখ টাকা করে ডেভেলপমেন্ট ফি দিয়েছে। আরিফ বহু কম ফিতে সরকারি কলেজে পড়েছিল। মাঝেমধ্যে ভাবে এই ছেলেমেয়েরা এত টাকা পায় কোথায়? কিন্তু ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী মালিক তাতেও সন্তুষ্ট নন। আরও পাঁচটি অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী নিয়েছেন। প্রিন্সিপাল আরিফ একটু গাইগুঁই করেছিল।

: স্যার, অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী নিলে উপর মহল থেকে আপত্তি উঠবে। কলেজের রিকগনিশন উঠিয়ে নেবে।

: আপনি চুপ করেন। পাঁচটা স্টুডেন্ট বেআইনি পথে আসায় পনেরো লাখের সাথে আরও পাঁচ লাখ কইরা মোট এক কোটি টাকা ডেভেলপমেন্ট ফি দিয়েছে ভর্তির সময়। এই টাকা কি আমি ছাইড়া দিমু? ছাইড়া দিলে আপনি দিবেন এই টাকা?

ধমক খেয়ে আরিফ চুপ করে থাকে। ওকে চুপ থাকতে দেখে আরও উগ্র হয়ে ওঠে মালিক।

: প্রিন্সিপালের বেতন খাননা মাসে মাসে? মাথায় বুদ্ধি রাখেন না কেন কি করতে হইব?

তারপর আবার শুরু হয়-

: এই ছাত্রগুলা সরকারিভাবে ডেন্টালে সিলেক্ট হইলেও ডেন্টালের ছাত্র সাধারণ মেডিকেলে নেওয়ার নিয়ম নাই কিন্তু তারা যে কোনোভাবে মেডিকেলে এমবিবিএস পড়তে চায় এইটাই ওদের উইক পয়েন্ট। ওদের দিয়া রিস্ক বন্ড নিয়ে রাখেন যে আমরা ওদের রেগুলার ছাত্র হিসেবে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করমু, তারপরেও সরকার যদি অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করায় বা ডেন্টালের ছাত্র এমবিবিএসে নেওয়ায় কর্তৃপক্ষ কোনো স্টেপ নেয় বা ওদের তাড়াইয়া দেয় তা হলে কলেজ বা মালিক পক্ষ দায়ী থাকবেনা আর ডেভেলপমেন্ট ফিও ফেরত দেওয়া হবেনা। একবার টাকা জমা দিলে ফেরত দেওয়ার নিয়ম নাই। স্পষ্ট লিখাইয়া রাখবেন: আমরা নিজ দায়িত্বে তথ্য গোপন কইরা ভর্তি হইছি।

: যদি লিখে না দেয়?

: লেইখ্যা দিতে বাধ্য হইব। এখন দেরি হইয়া গেছে। অন্য কোনো কলেজে তারা চান্স পাইবনা। সিট সবখানে ভর্তি। ওদের ঠেকা বেশি।

রাতেই প্রথমে হাসপাতালে এবং পরে কলেজে পা রাখল আরিফ। দেখল নাইট গার্ডটা ঝিমুচ্ছে। তাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট দিল।

: সেক্রেটারি সাহেব কোথায়?

: উনিতো বাড়িতে এখন।

: বাড়িতে কেন? আমি তো তাকে আস্তে বলেছিলাম। তারপর নিজেই ফোন দিল-

: আমি কলেজে, তাড়াতাড়ি আসুন।

একটু পর তিনি কৈফিয়তের সুরে কাচুমাচু করতে করতে বললেন-

: আপনি যে রাতেই আসবেন ভাবতে পারিনি। ভেবেছি এমনিতেই ফোন দিয়েছেন।

পরদিন সকাল আটটায় অফিস গিয়ে দেখে এক দারোয়ান আর দুই ঝাড়ুদারনী ছাড়া কেউ আসেনি। দশ থেকে পনেরো মিনিটের মাঝে একে একে আসতে থাকল সবাই। অ্যানাটমির দুজন লেকচারারের মাঝে ইশরাত আসলো আধ ঘণ্টারও পরে। না, এভাবে চলে না। সবাইকে লাল কালি দিয়ে লেট লিখতে হবে। মালিকের কড়া নিয়ম তিন দিন কেউ লেট করলে তাকে একদিন অ্যাবসেন্ট দেখিয়ে সেদিনের বেতন কাটতে হবে। আর আধঘণ্টা বা বেশি দেরি করলে তাকে সেদিন অ্যাবসেন্ট লিখতে হবে। অফিস থেকে অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার আনালো সে। তারপর লাল কালি দিয়ে গটগট করে দেরিতে আসাদের নামের পাশে ইংরজি 'এল' মানে লেট আর আধ ঘণ্টার বেশি দেরি করে আসা ইশরাত জাহানের নামের পাশে 'এ' অর্থাৎ অ্যাবসেন্ট লিখল। একটু পরেই দৌড়ে আসল সেক্রেটারি।

: স্যার, আপনি এ কি করেছেন?

: কি করেছি মানে? ওরা লেট, ওদের লেট লিখতে পারবনা? আধ ঘণ্টার পর যে আসে তাকে নিয়মমাফিক অ্যাবসেন্ট লিখতে পারবনা?

: স্যার, এবারের জন্য ওদের মাফ করে দেওয়া যায় না?

: ও, বুঝেছি। আপনাকেও তো আমি সকালে এসে পাইনি। আপনি নিজেও লেট সে জন্য এ কথা বলছেন। শুধু আপনি আমার সেক্রেটারি তাই দয়া করে 'এল' অর্থাৎ লেট লিখিনি।

: স্যার, আপনি হলেন বটবৃক্ষ। আমরা তার ছায়ায় আছি। আপনি যদি এ রকম করেন তাহলে আমরা যাবো কোথায়?

কিন্তু তোষামোদে গলে না আরিফ।

: স্যার, দুদিন পরে ইন্সপেকশন। সবাই মিলে ঘোট পাকাবে শেষে। সবাই মিলে যদি হরতাল করে তা হলে কেমন হবে?

: আরিফ থমকে যায়। উত্তর দেয় না এ কথার। তাকে একটু কাত করতে পেরে সেক্রেটারি একটা কাগজ এগিয়ে দেয়।

: এটা কী?

: ছুটির দরখাস্ত স্যার।

: আপনি ছুটিতে যাচ্ছেন?

: না, স্যার। আতশীর। তিন দিনের ছুটি চেয়েছে। ইন্সপেকশনের আগের দিন এসে যাবে।

: ওর কোনো ছুটি হবে না। দরখাস্ত রেখে গ্রান্ট হওয়ার অপেক্ষা না করেই কেন চলে গেল না বলে?

সেক্রেটারি মুখ কালো করে দরখাস্তটা রেখে দিয়ে যায়।

আতশী এখানকার স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ। ডিজিও করা। ছয় মাস আগে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যোগ দিয়েছে। ইন্সপেকশন টিম এসে সব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মানে সব বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও প্রফেসরদের দেখতে চায়। বিশেষত গাইনি ডিপার্টমেন্ট নতুন খুলেছে। তার বিশেষজ্ঞকে দেখতে চাইবেই। এদিকে ইন্সপেকশনের আগের দিন কোনো রাতেও সে আসলো না। উদ্বিগ্ন আরিফ তার পরিচিত বিএসএমএমইউর এককালীন অধ্যাপিকা ফরিদা ইয়াসমিনকে ফোন করল। কথায় কথায় একদিন সে বলেছিল আতশীকে সে চিনে। তার ছাত্রী। তার কাছাকাছিই কোথায় নাকি থাকে। আরিফ তাকে ফোন করে সম্ভাষণ জানবার পর বললো -

: প্রফেসর ফরিদা ইয়াসমিন, আতশীকে একটা খবর দিতে পারবেন? কালকে এখানে ইন্সপেকশন অথচ এখনো সে আসছে না। ও আমাদের গাইনোকোলজিস্ট।

: গাইনোকোলজিস্ট? ও আবার গাইনোকোলজিস্ট হলো কবে থেকে?

বিস্ময় প্রকাশ করল ফরিদা। তারপর যোগ করল-

: গত পরীক্ষায় সে তো ফেল করেছে।

: কিন্তু আপনি তাকে চেনেন বলেছিলেন।

: হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি স্টুডেন্ট হিসেবে। সে তো গাইনোকোলোজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্সের ডিপ্লোমা পাস করেনি।

আরিফ আকাশ থেকে পড়ল। তার মানে সে এখানে ফলস সার্টিফিকেট দিয়েছিল। আজকাল কিছু অসৎ কম্পিউটার দোকান থেকে নাকি মোটা অংকের বিনিময়ে নকল সার্টিফিকেট বানিয়ে নেওয়া যায়। একদম আসলের মতো। কারও বোঝার উপায় থাকে না। ইন্টারভিউয়ের সময় বলেছিল : এটা স্যার, প্রভিশনাল সার্টিফিকেট। আসলটা কয়েকদিন পরে পাবো।

আরিফের কাছে এখন ওর হঠাৎ ছুটি নেওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ইন্সপেকশনের সময় ওরা চেক করতে গেলে হঠাৎ ধরা পড়ে যেতে পারে এই ভয়ে চলে গেছে। আরিফ কিছুক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখভাব দেখে কাশেম বলল-

: চিন্তা করবেন না স্যার। উপজেলা হাসপাতালে আমার জানা একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ আছে। কাল খুব সকালেই তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে পটিয়ে নিয়ে আসব কয়েক ঘণ্টার জন্য। যারা ভিজিট করতে আসবে তারা কেউ বুঝতে পারবেনা তিনি আমাদের কিনা।

দেখতে দেখতে পরদিন ইন্সপেকশন দল এসে গেল। প্রায় আধা রাত জেগে আয়া এবং বুয়ারা কলেজ ও হাসপাতাল পরিষ্কার করেছে। লনে ঘাস কেটে কোথা থেকে কয়েকটি ফুল সমেত টব এনে সাজিয়েছে। ঝকমক করছে চারদিক। ফার্স্ট ইয়ারের কিছু সুন্দরী মেয়েদের আগে থেকেই কিছু ফুলের মালা হাতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কাশেম। তাদের সবার গলায় মালা পরিয়ে দিল ওরা। দশ সদস্যের একটা জাঁদরেল টিম এসেছে। যাদের তিন জন অচিকিৎসক তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোমরা চোমরা কেউ। মন্ত্রণালয়ের লোকও আছে।

বেলা এগারোটায় মিটিং বসল অধ্যক্ষের কক্ষে। একদিকে অধ্যক্ষ আরিফ বসা। অন্যদিকে আবার

সেই দশ জনের সাথে যোগ দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবসায়িক পার্টনার আকরাম খান ও মালিকের ভাই ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইরফান চৌধুরী। মিটিং শুরু হতে না হতেই নানা রকম ফলমূলে ভরে গেল টেবিল। আঙ্গুর, আপেল, নাশপাতি, বেদানা, কলা, কেক, বিস্কুট, কয়েক রকমের কোমল পানীয়, ডাবইত্যাদি। খেতে খেতেই ওরা কলেজ এবং হাসপাতালের বিভিন্ন কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আলাপ-আলোচনা করতে থাকলেন। বেলা গড়িয়ে চলল। কিছুক্ষণ পর একজন কর্মচারী নিচু স্বরে ফিস ফিস করে চেয়ারম্যান সাহেবকে জানালো খাবারের আয়োজন সমাপ্ত। চেয়ারম্যান সাহেবসহাস্য মুখে এবার অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে অভ্যাগতদের আহ্বান করলেন-

: ভাই, আপনারা অনেক দূর থাইক্যা আইছেন কষ্ট কইরা। এখন দুপুর হইয়া গেছে। আপনারা সবাই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। আমাদেরও খিদা লাগছে। দয়া কইরা আগে দুইটা ডাইল-ভাত খাইয়া নেন।

কথাটা শেষ করেই ডান হাত দিয়ে পাশের সেমিনার কক্ষের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আরিফ তার ইশারা অনুসরণ করে কক্ষটির খোলা দরজা দিয়ে ডাল-ভাতের আয়োজন দেখে প্রায় ভিরমি খাবার অবস্থা হলো। তাকে উৎসুক্য প্রকাশ করতে দেখে কর্মচারীটি এবার সবার অলক্ষ্যে টেবিলের তলা দিয়ে একটা চিরকুটে লেখা আইটেমের লিস্ট মেলে ধরল। এক পলকের জন্য দ্রুত তাতে চোখ বুলালো সে : ইলিশ, রুই, মুরগি, খাসি, বিরিয়ানি, বোরহানি, জর্দা, দই, নামকরা বালিশ মিষ্টি, রসগোল্লা, রসমালাই, মিষ্টি পান কিছুই বাদ যায়নি।

: আমরা এখন খাবো না। আগে প্রতিষ্ঠান দেখব। দলনেতা বললেন। তারপর আরিফের দিকে চোখ রেখে জানতে চাইলেন-

: আপনার হাসপাতালে কতজন রোগী ভর্তি আছে?

আরিফ দু'বার ঢোক গিলল। কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। মাত্র পাঁচ জন রোগী আছে বললে প্রতিষ্ঠান অনুমোদন পাবে না। আবার মিথ্যা উত্তর দিলেও একটু পরে ধরা খেয়ে যাবে। সব দোষ তার হবে তখন। এর চেয়ে মিটিংয়ে বসা মালিকের ভাই ও এ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইরফান সাহেব যদি উত্তর দেন তাহলে সে বেঁচে যায়। আরিফ উত্তরের আশায় অসহায়ভাবে তার মুখের পানে তাকিয়ে থাকল। ইরফান সে ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বিরক্ত হয়ে ধমকের সুরে বললেন-

: আপনি প্রিন্সিপাল, আপনি উত্তর দেন।

আরিফ একটু নড়েচড়ে সাহস সঞ্চয় করে দলনেতার দিকে তাকালো-

: স্যার, ব্যাপার হচ্ছে কি আউটডোরে বেশ রোগী হয় তবে ইনডোরে.....

একটু থামল আরিফ। প্রকৃতপক্ষে আউটডোরে বড়জোর পনেরো-বিশটার কেশি রোগী হয় না তবে সে কথা বলা যাবে না তাই বেশ শব্দটা ব্যবহার করে তাকে ধামাচাপা দিতে চাইল সে।

: ইনডোরে ভর্তি আছে কয়টা?

এবার প্রমাদ গণলো আরিফ। সরাসরি উত্তর না দিয়ে বিপদ এড়াতে বলল-

: স্যার, এটা মফস্বল এলাকা। অধিকাংশ লোক ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ, পানি পড়ায় বিশ্বাস করে। হেপাটাইটিসে জন্ডিস হলে মাথা ধুইয়ে চিকিৎসা করায়। হাসপাতালে আসে না, থাকতেও চায় না।

: রোগী না থাকলে এর আগে যে সাময়িক পারমিশন দেওয়া হয়েছে তা তুলে দেবো।

কড়া কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন দলনেতা।

: না স্যার, আছে। পাঁচটা রোগী আছে ভর্তি। কাচুমাচু করে বলল সে। তারপরই একটা গর্জন শুনল-

: এই প্রিন্সিপাল সাব, কিসের প্রিন্সিপালগিরি করেন? হাসপাতালে কয়টা রোগী খবর রাখেন? তারপর একটু থেমে অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে সুরটা নামিয়ে বললেন-

: আমাদের সব বেড ভরা। রোগী রাখার জায়গা নেই।

খুব বিব্রত হলো আরিফ। গত রাত এগারোটার সময়ও সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিভিন্ন বিভাগের যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কিনা, ওটি, ফার্মেসি, আউটডোর এ সবের রেজিস্টার যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কিনা বা অন্য কোনো ত্রুটি আছে কিনা এগুলো নিজে শেষবারের মতো চেক করেছে সে। তখনো হাসপাতালে টেনেটুনে মাত্র পাঁচটা রোগী ভর্তি দেখেছে। অনেক রাত পর্যন্ত হাসপাতালে থাকায় মেসে ডাইনিং হলের খাবারটাও জোটেনি। বেলা আটটায় কলেজ শুরু হয়। আটটার আগেই সে কলেজে চলে এসেছে। বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকের তালিকা, বিভিন্ন প্রফ পরীক্ষার ফলাফল কলেজ ও হাসপাতালের জমির দলিল ইত্যকার নানা ধরনের পেপার্স রেডি করা এবং পরিদর্শন টিমের আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে। হাসপাতালে আর সকালে পা দিতে সময় হয়নি। মনে মনে প্রার্থনা করল ওরা যেন আর হাসপাতালে পা না দেয়। চেয়ারম্যানের কথা বিশ্বাস করে যেন পরিদর্শন সমাপ্ত করে। তা না হলে ভীষণ বিপদ। কিন্তু ওরা বলল : হাসপাতালটা দেখতে চাই।

আরিফের গায়ে যেন হুল ফুটালো বোলতা! ইস! এবার ধরা খেয়ে যাবে। চেয়ারম্যান সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেকশন টিমের সবাইকে নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে হাসপাতালে পা রাখলেন। তাদের সাথে চোরের মতো পা মিলিয়ে চলল আরিফ। অবাক চোখে দেখল আউটডোর গিজগিজ করছে রোগীতে। প্রতিটি বেডেই রোগী ভর্তি। চোখে কি ধা-ধা লেগেছে? ভালো করে তাকালো সে। ওদের অনেকের মুখই তার চেনা। কলেজের অদূরে মালিকের কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক চলছে। গ্রিন ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট অ্যান্ড মার্কেট কমপ্লেক্স। ছাত্রদের হোস্টেলও নির্মাণাধীন। সে সব জায়গায় কাজ বন্ধ রেখে সব শ্রমিকের রোগী সাজিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে। রাত বারোটায় নাকি চেয়ারম্যান সাহেব সাইট ইঞ্জিনিয়ারকে জরুরি ফোন দিয়ে এ ব্যবস্থা করতে আদেশ দিয়েছেন। আরিফ এ ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারেনি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আবার এক কাঠি সরস। তিনি মালিককে খুশি করতে পাশের স্কুলের হেড মাস্টার সাহেবকে বলে খেলনা ও চকোলেট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নিচু ক্লাসে কিছু ছাত্রছাত্রীকে সাধারণ পোশাকে শিশু বিভাগের বিছানায় এক দুপুরের জন্য ধরে রেখেছেন। এ ছাড়া হাসপাতাল ও কলেজের কিছু কর্মচারী, আয়া-বুয়া ও তাদের আত্মীয়-স্বজনকেও দিনভর এভাবে বেডে থাকতে বলা হয়েছে। আজ তাদের কোনো কাজ করতে হবে না। কিন্তু বিনা কাজে মজুরি বা বেতন পাবে। সেই সাথে উপরি বক্শিশ এবং দুপুরে লোভনীয় খাওয়া-দাওয়া। ও কি? পিওন কদম আলীর পা ভাঙলো কবে? দেখে সার্জারি ওয়ার্ডে সে শুয়ে আছে। তার পায়ে প্লাস্টার করা। সে জিজ্ঞাসা করতে যেতে চোখে পড়ল আরও কিছু পরিচিত মুখের হাতে পায়ে বা শরীরে ব্যান্ডেজ বাঁধা অথবা প্লাস্টার করা। মেডিসিন ওয়ার্ডে তিন-চারজনের ড্রিপ চলছে। পোস্ট অপারেটিভে কয়েকজন মুখচেনা শ্রমিকের পেটে বাইন্ডার বাঁধা যা উদরের অস্ত্রোপচারের পর লাগানো হয়। মনে হবে পেটে গুরুতর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে অথচ কালকে বিকেলেও তাদের ক্যাম্পাসে কাজ করতে দেখেছে। পুরা ব্যাপারটা যে সাজানো নাটক তা বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় না তার। ইন্সপেকশন টিমের সম্মানিত সদস্যদের মুখ দেখে বোঝা গেল তারা খুশি যদিও একজন তরুণ সদস্যের ভ্রু একটু কুঁচকে উঠেছিল কিন্তু অন্যরা তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। দুপুরে খাবার-দাবার পর মালিক পক্ষের তরফ থেকে তাদের সবাইকে একটি করে মাঝারি আকারের বড় নীল খাম দেওয়া হলো। বলা হলো এতে প্রতিষ্ঠানের ছবিসংবলিত ডায়েরি আছে। বন্ধ খাম সবার সামনে খুলে দেখা অভদ্রতা তাই তারা খুললেন না। তবে হাতের আঙুল দিয়ে টিপে টিপে অনুভব করার চেষ্টা করলেন। বেশ কিছু কাগজ খণ্ড একসাথে রাখলে যেমন খসখস আওয়াজ করে তেমনি একটা শব্দ এলো। অনুমানে বুঝে নিলেন তারা ব্যাপারটা। পরিদর্শকরা আর সময় ব্যয় না করে তৃপ্ত মুখে এবার তারা আন্তরিক অতিথেয়তা এবং জনসেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত এ মহতী উদ্যোগের জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রশংসা করে অচিরেই স্বীকৃতি ও সার্বিক সাহায্য দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

পরদিন সকাল থেকে ঝুম বৃষ্টি। এ রকম বৃষ্টি থাকলে অন্যদিন হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স এসে তাকে নিয়ে যায়। জামা-কাপড় পরে অনেকক্ষণ সে অপেক্ষা করল। কিন্তু কোনো গাড়ি এলো না। আরও পরে অফিসের একটা পিয়ন ছাতা মাথায় এসে কলেজের মোহরযুক্ত একটা বন্ধ খাম দিয়ে গেল হাতে। খামটা খুলতেই বের হলো একটা চিঠি। মাননীয় চেয়ারম্যানের নামাঙ্কিত প্যাডে লেখা : ইয়োর সার্ভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার্ড। কালকে বিকালেই শুনেছিল কানাঘুষা। এমন প্রিন্সিপালের কি দরকার যে পরিদর্শনের সময় রোগী না থাকলে কর্মচারী-শ্রমিকদের রোগী সাজিয়ে রাখার সামান্য বুদ্ধি রাখে না, শেষ পর্যন্ত মাননীয় চেয়ারম্যানকে সেই দায়িত্ব নিতে হয়! একটু হলেই ভেস্তে গিয়েছিল ইন্সপেকশন। খামে জন প্রতি পঞ্চাশ হাজার দিয়েও রক্ষা হতো কিনা সন্দেহ।

*এই গল্প সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তবের এর সাথে কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা প্রতিষ্ঠানের মিল পাওয়া গেলে তা হবে নেহাত কাকতালীয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত

২য় সেরা বীমা সম্মাননা–২০২১

অগ্রসরমান সেরা নন–লাইফ ইন্স্যুরেন্স ক্যাটাগরিতে সম্মাননা পদক পাওয়ায়

প্রভাতী পরিবার গর্বিত ও আনন্দিত



BSEC চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতের নিকট হতে উন্নিমানের শ্রেষ্ঠ সাধারণ বীমা কোম্পানীর ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ – এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবেদুল ইসলাম।

বীমা শিল্পের বিকাশ ও দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স। প্রত্যাশীর এই অর্জনে সকল বীমাগ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের সাথে থাকার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

eBima

ISO 9001 : 2015 & AA+ Rated

প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

PROVATI INSURANCE COMPANY LIMITED

A Company of Your Trust

বাউন্ডুলে বিষাদ

বাবুল আনোয়ার

বুনোরাত্রির নির্জন পথ ধরে হেঁটে যাই
আমাদের পথে আমরাই দু'জন
শুনশান নীরবতায় শব্দের চেয়ে গভীর
বিস্ময়ে ব্যথিত বাতাসের শব্দ শুনি
একটি পাখির আর্তনাদ শুনতে পাই
হয়তো দুটি বাচ্চাই খোয়া গেছে তার
হয়তো সে সঙ্গীহীন একা
অলিখিত এসব ছোট্ট কাহিনী
অজ্ঞাত এরকম শত উপাখ্যান
মিশে যায় নিঃশব্দ রাত্রির আঁধারে
পথের মলিন ধুলোয় অকাতরে

বাউন্ডুলে বিষাদে থেমে যায় গান।

বহুগামী সিংহের সমান

দুখু বাঙাল

সাদা সব নোটে আমার মানিব্যাগ ভারী হয়ে আছে
সস্তাদরে বলা যায় বিরহ-বিষাদ
কত দিন কুসুমবিহীন
কত দিন সমুদ্রবিহীন
কত দিন সঙ্গমবিহীন
আমার চতুষ্পার্শ্বে পাহারা বসিয়ে হাসে
রবিঠাকুরের যত সংযম, যত অভিমান-
লঙ্কা ছাই হয় তবু চোখে পড়ে না আগুন।
তুমি তো ভালোই জানো
ডাক পেলে, একবার ডেকে বসলে তুমি
আমি ঠিক জেগে উঠি বহুগামী সিংহের সমান।

একজীবন না-ই হলো, বাকিটা তো দিয়েই দিলাম
কবিতা, তুই আমারে কত দিন বিবাদী রাখিবি!

অনিবার্য বান্ধব

মনসুর হেলাল

এখানে আমার কোনো প্রবেশাধিকার নেই
আমি অভ্যাগত।
কখন যে এসে গেছি কিছুই জানি না।
দায়বদ্ধতার সকল দুয়ারে খিল এঁটে বসে আছে
অলীক প্রহরী। এখন আর বেরোতে পারছি না।
বারবার ঘুরেফিরে দেখি
প্রবল তাড়িত সবমানুষের মুখ।
দেখি কার করতলে কতটুকু ছায়া আছে
আছে নির্ভীক উষ্ণতা।

গ্রহণ বর্জন শেষে ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ
আবারও পূর্ণতা পায়।
কিন্তু মানুষগুলো কেবলই পরাঙ্মুখ
পড়ে থাকে এখানে-ওখানে।

আমার দু'কাঁধে যেন সবরাজন্যের দায়
যাবটা কোথায়; কোথায় নিবাস?
অনির্ণয়ে ভাগ হয়ে গেছে পিতৃপুরুষের ভিটে
ভাগ হয়ে গেছে সবব্যাকুল প্রহর; কেউ আর কারো
প্রচ্ছায়ায় নেই, পথ চেয়েও নেই।
এক অদৃশ্য দেয়াল আচ্ছাদিত করে দিল
সমূহ প্রকৃতি।

বিভোর গন্তব্যহীন আমি কোন দিকে
কোন ঘাটে যাব?
জীবনের জলাদার মানুষকে আর টানে না তেমন
অনুকূলে নেই তার প্রার্থিত প্রবাহ।
বহুবিধ আগ্রাসনে হারিয়েছে স্রোতস্বিনী প্রমত্ত প্রতিভা
পালে ও বৈঠায় তিক্ত শ্যালোর দাপট। আর
অনিবার্য ভাঙনের দিকে ক্রমাগত মানুষের গতি

কে রুখবে কাকে, আর
কেনইবা রুখবে?

লোভ

কামরুল আহসান

এত লোভ এত লোভ
কুকুর ও যেন তুচ্ছ।
এত হিংস্র এত হিংস্র
নেকড়ে ও যেন শান্ত।
এত ঘৃণ্য এত ঘৃণ্য
শূকর ও যে লজ্জা পায়,
ভালোবাসা শুধু নামেই এখন
নাভি মূলে হিংস্রতা জন্মায়।
মাতৃ রস নিংড়ে খেয়ে ও দুগ্ধ বাট ছিঁড়ে!
কঙ্কাল দেহ চিৎকারে মরে,
নাহি দ্যাখে ফিরে।
শীৎকারে শীৎকারে মখমল ভিজায়
কুকুর জিহ্বা নড়ে,
খাওয়ার তরে অভুক্ত প্রাণ
লড়াই করে মরে।
বহু জন আছে দিনরাত শুধু
অর্থ লোভে ছোটে,
কেউবা লড়ে ক্ষমতার লাগি
হাজার প্রাণ মরে।
মরুক মানুষ মরুক পশু
কি-ই বা আসে যায়,
হাতের মুঠোয় রক্তে ভেজা
ক্ষমতা পেলেই হয়।
চেয়ে দ্যাখো আজ ইউক্রেন ভূয়ে
চেয়ে দ্যাখো রাশিয়ায়,
সাধারণ মানুষ মরছে কেবল
যুদ্ধ হাঙ্গামায়।
এমন মরেছে আগেও অনেক
মরছে যেমন আজ,
লাখো মানুষের রক্তের দামে
যুদ্ধ জয়ের তাজ।


HEAVEN FORBID
Mishaps & Misfortune
can strike
"ANY SECOND"
Protect against
the horror of
financial burden
that follows
Marine
Personal Accident
Travel
Hospitalisation Plan
Fire
Open the umbrella of a BGIC policy
1st Private Sector Non Life Insurance Company in Bangladesh
BGIC
বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
Bangladesh General Insurance Company Ltd.
Service is Our Strength
Client Service Station
+88-02-47113183
bgicinsurance@yahoo.com
bgicinsurance@gmail.com
www.bgicinsure.com

অমল রোদ্দুর হতে চায়নি

রেজাউদ্দিন স্টালিন

অমল রোদ্দুর হতে চায়নি
চেয়েছিল মানুষ হতে কিংবা বৃক্ষ
আমরা রোদ্দুর বানিয়েছি অমলকে
শীতে উষ্ণতার জন্য
স্যাঁত স্যাঁতে ঘরকে ধোপদুরস্ত করা
রাস্তাঘাটের মালিন্য মুছে দেয়া
টবের গাছগুলোর সালোকসংশ্লেষের স্বার্থে
আমরা চাই অমল মানুষ না হয়ে রোদ্দুর হোক
বৃক্ষ না হয়ে শুকনো পাতা
অমল স্বপ্ন দেখবে কেনো
ওর রোদ ঝলসানো চোখে ওসবকি
মানায়
ও দেখবে ধু ধু প্রান্তর
ফসফরাস দেয়া জলাভূমির ঠোঁট
শহরের গলিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা
ফেরি করবে রোদ
ওর ঘাম থেকে জন্ম নেয়া ফ্লাটে
আমরা ধবল হবো
কৃষ্ণ হবো
অমল রোদ্দুরের হলুদ ছাতু
এঁদো ডোবার জলে মেখে খাবে
ঘুম আসবে না কখন ভোর হবে
আর সাহেবদের জানালায়
পৌঁছে দেবে রোদ্দুর
দুপুরে মাথায় এক স্টেশন রোদের বোঝা
এতো কষ্ট তবু রা নেই
অমল রোদ্দুর হতে চায়নি
চেয়েছিলো মানুষ হতে

জয়ের গান

বাবুল তালুকদার

পবিত্রতা বজায় রেখে তরিকা পালন করো
ইমান নিয়ে রোজা-নামাজ শক্ত করে ধরো।
করতে হবে রোজা-নামাজ সঠিক নিয়ম মেনে
সৃষ্টিকর্তার হুকুম মেনে পথ পারি দাও জেনে।

জাকাত-ফেতরা দিতে হবে আত্মশুদ্ধির ধন্য
দান করে দাও অর্থ-সম্পদ মানব সেবার জন্য।
করোসরে রুজিরুটি হাল করে খাও
শ্রম দিয়ে, ঘাম ঝড়িয়ে জয়ের গান গাও।

সৃষ্টিকর্তা মহৎ কাজে সদা খুশি থাকে
কাজকর্মে সাড়া দেয় ইমানদারের ডাকে।
হালাল রিজিক দিয়ে তাদের দুনিয়াতে পাঠায়
হাহুদাসা নেইকো তাদের সুখে দিন যে কাটায়।

দূর পরবাসিনী

চঞ্চল শাহরিয়ার

হাস্নাহেনা আপনার নাম নয়। তবু হাস্নাহেনা গাছের নিচে দাঁড়ালে খুবকরে মনে পড়ে আপনার মুখ। আপনি আমার কৈশোর কাঁপানো প্রেম। আপনার কাছাকাছি থাকলে তখন ভাতের খিদে ভুলে যেতাম। স্কুল মাঠে ফুটবল খেলতে যেতে দেরি হলেও মন খারাপ করতো না। নানা অছিলায় আপনার মুখটা দেখার জন্য বারান্দায় ছুটে ছুটে আসতাম। এক ভরা জোছনায় তো আর একটু হলে আপনাকে বউ বলে ডেকে বসতাম।

আপনি আমাকে বীরবলের গল্প, আরব্যরজনী গল্প, ঈশপের গল্প শোনাবার চেষ্টা করতেন। আর আমি শুধু বুঁদ হয়ে দেখতাম আপনাকে আপনাকে। স্নান শেষে ড্রেসিং টিবিলে আপনার সাজগোজ, চুল বাঁধা, পাশ ফিরে লাল ফিতা, চুড়ি বা পারফিউম খোঁজার দুপুর আমি বুক পকেটে রেখে দিয়েছি। কমলা রঙের শাড়ি পরা আপনার জন্য আবেগ কখনো কমেনি আমার।

হাস্নাহেনা আপনার নাম নয়। তবু হাস্নাহেনা গাছের নিচের দাঁড়ালে এখনো খুঁজে পাই আপনার মায়াভরা মুখ। নারকেল আর সুপারির বনে পা বাড়াবার মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি ভালোবেসে আপনি আমাকে ডাকছেন। সত্যি সত্যি।

সুসংবাদ নেই

দালান জাহান

চোখ ভর্তি সমুদ্রে ভিজে ভিজে
শূন্যস্বর ঘর থেকে নেমে আসে রাস্তায়।
শর্করা কুয়াশা আগুন অজস্র যুদ্ধ
আফিমে গান গায় মানুষ পাখি
সেরিব্রামে রক্ত আদর ঘুম সংগীত
নিদ্রুতি পৃথিবী চায় নরম জোছনা।
গত জন্মে বৃষ্টির পর অন্তঃসত্ত্বা খবর
ছাপে না কোনো আঁধার আকাশ
রিসিপ্টারে কোনো সুসংবাদ নেই
আশ্চর্য নিস্তব্ধতায় ডোবে আছে সেল
সৌন্দর্যে উৎকর্ষে সাঁতার বোবা বৃক্ষ
কখনো নদীর কাছে আকাশ চিনে মন
নদীর সুগন্ধ পেলেই মনে পড়ে জন্মসদর
অনেক জীবন! অনেক জীবন।

সম্পদ আপনার ঝুঁকি আমাদের !



আপনার সম্পদের অগ্নি, নৌ, মটর বিবিধ ঝুঁকি বহন করে থাকে রাষ্ট্রীয় খাতের অগ্নি-লাইফ বীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিমান ও স্যাটেলাইট, তেল-গ্যাস উত্তোলন, জলযানসহ মেডিক্লেইম, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমাসহ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বীমার ঝুঁকিও বহন করে থাকে।

দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'।

রাষ্ট্রীয় খাতের অগ্নি-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
SADHARAN BIMA CORPORATION
(সার্বভৌমিক নিরাপত্তার প্রতীক)
৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

আত্ম দার্শনিক

বদরুল হায়দার

আমি ফুল কিংবা প্রিয়ার মুখ দেখে
তোমকে ভালোবাসিনি।
জোয়ার সাহারা বুকে তোমার উত্তরা
হাওয়ার দখলে নকলে মূল্যবোধে
বিবিধ কবির মনে সময়ের শত অভিযান।
স্বপ্ন হারানোর ভয়ে প্রতিরাতে
ঘর বিড়ালের মনের ইঁদুরে আমি
বেঁধে রাখি রাত ঘুম।
প্রভাতের অধিবেশনে তোমার
বৃক্ষমায়া জুড়ে ক্রমাগত অতিথিরা বুনে
পাইকারি ও খুচরা বুনিয়াদি।
আঁধারেরা বাড়তে থাকলে প্রহরী বাঁশির সুরে
দূর অশেষের গতিপথ ধরে
বেসুরে অচেনা দিন বলি হয় আপোষ নগরে।
হৃদয়ের দুঃখগুলোকে আত্মা থেকে
খুলে নিলে বাসনার হৃদভূমি জ্বেলে দিলে
জোনাকিরা কান্না ভুলে হয় স্বপ্নতারা।
আকাশের বাসরে আসন পেতে ছিলে বলে
মনের বাসনাগুলো প্রতিবেশী চোখে
অধিক স্বীকৃতি মুছে উড়াল বাতাসে রেখাটানে।

বেদনাদের কান্না

বিমল ভৌমিক

আমি তাই তোমাকেই দেখি হিমালয়!
তোমার মতো ভাবলেশহীন নির্লিপ্ত চোখে
স্থির দাঁড়িয়ে থাকা অপরূপা রূপসী
সোনালি রোদের দিগন্ত রেখায়
ও'তোমার দেহের অলঙ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা।

আমি তাই তোমাকেই দেখি মেঘনা।
তোমার মতো উদ্দাম যৌবনের ঢেউ তোলা বুকে
সাদা পালের নৌকার মাঝির গান
আমার মনের পাতা ছুঁয়ে যায়
অহর্নিশ মিশেছে সে ঘোরতর ঘূর্ণিজলে
নাম তার পদ্মা অনন্ত সলীল কন্যা।

আমি তাই তোমাকেই দেখি আকাশ।
তোমার উদার নীলের মাঝে হারিয়ে যাওয়া
এক বেদনার, বিরহ সংগীত
সুরের মূর্চ্ছনায় সিঞ্জিত নূপুর নিক্কনে
ঝরে পড়ে মেঘমাল্লার রাগিনীতে সে আবেগ।

আমি তাই তোমাকেই দেখি সাগর।
যেখানে ঝিনুক কুড়িয়ে তার বুকে মুক্তো মেলে
অশরীরী আত্মার শঙ্খ-নিনাদে আমার
হতচ্ছাড়া জীবনে ছন্দপতন আসে
তবুও সুন্দর তোমার সৈকত আর সে
মোহনীয় মিলেছে যেখানে মনের গহিন অরণ্য।
ঘূর্ণিঝড় আইলা লণ্ডভণ্ড করে সে জীবন
প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় ঘর-নদী-বন
আমার বেদনারা কাঁদে শুধু নিঃস্ফলা শূন্য মাঠে।

বুদ্ধ হতে চাইনি

খান চমন-ই-এলাহি

বুদ্ধ হতে চাইনি, চেয়েছি তোমায়
দিনের সূর্য কিংবা রাত্রির চাদোয়ায়
যেখানে ভালোবাসা আর বিরহ ছায়া
প্রেমাস্পদ বুকে হয় বাইবেল মায়া

তুমি বুঝ, বা না বুঝ এই মোহ মায়া
কাল-কালান্তরে হয়ে যায় ভায়া
স্মৃতির দহন শেষে ছাই চাপা বুকে
স্বসুখ রুখো অবিরত দহন লিখে

আমি তো অমন কিছু চাইনি কখনো
শুধু তোমাকেই জেনেছি সখের সাঁকো
তাই স্বপ্ন শুরুর মতো আজও বলি-
বুদ্ধ হতে চাইনি, তোমাকেই চেয়েছি খালি

অনন্ত পথে

হাসান মোস্তফা

আমার অতীত দূরে কোথাও পাথর হয়ে পড়ে আছে
সেখানে ভুলগুলো শুধরানোর জন্য যাওয়া প্রয়োজন যেতে পারি না।
আমার দুঃখগুলো বেহাগ সুরে গান করে আনমনে
আমার স্বপ্নগুলো দুঃস্বপ্নের পথে হেঁটে যায়
আমার কষ্টগুলো প্রতিদিন ফিরে ফিরে আসে আমার কাছে
আমার বর্তমান বলে কিছু নেই
শুধুমাত্র কম্পিত পাঁয়ে হেঁটে চলা।
এভাবে হেঁটে হেঁটেই অনন্ত পথে একদিন আমি চলে যাবো।

‘ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড
শরীয়াহ্ ভিত্তিক নন লাইফ বীমার জগতে এক অনন্য নাম’

সেবা সমূহ

অগ্নি বীমা
নৌ বীমা
মোটর বীমা
ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবিধ বীমা



সারা দেশে আমাদের ৪৪টি শাখার মাধ্যমে
সর্বোত্তম সেবা প্রদান করা হচ্ছে ।

Islami Insurance Bangladesh Limited
ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড
(সহযোগিতা ও কল্যাণের প্রতীক)
প্রধান কার্যালয়
ডিআর টাওয়ার (১২ তলা), ৬৫/২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৫৫১১২৮৩১, ৫৫১১২৮৩২, ৫৫১১২৮৩৩, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৫৫১১২৭০৪
ওয়েব ঃ www. islamiinsurance.com, ই-মেইল ঃ islamiinsurance@gmail.com



ভ্রমণ

ভোলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর প্রাচীন স্থাপত্যের হাতছানি

মোবাশ্বির হাসান শিপন

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে নদীবেষ্টিত গাঙ্গেয় দ্বীপজেলা ভোলা। এর আয়তন ৩ হাজার ৪০৩ বর্গ কিলোমিটার। রুপালি ইলিশ, ধান আর সুপারির জন্য এ জেলা সুপরিচিত। সুদীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবেনান্দনিক প্রাচীন স্থাপত্য এ জেলাকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। যা অনেকটা লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে আছে। সরকারের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ বিভাগ এদিকে নজর দিলে অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসতে বাধ্য। অন্যদিকে ভোলার সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে অনেকগুলো বিস্তৃত চরে ম্যানগ্রোভ বন আর সাগরের বিচ মিলে অপরূপ সৌন্দর্যের আধার হিসেবেপ্রকৃতিপ্রেমীদের নজর কাড়ছে। একপাশে বিচ আরেক পাশে বন; সঙ্গে শো শো শব্দ। সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মায়াবী দৃশ্য যে কারো মনে অদ্ভুত দোলা দেবে। এখানে না এলে প্রকৃতির অবারিত সাজের পসরা বর্ণনায় বোঝানো কঠিন।

তাড়ুয়া দ্বীপ:

ভোলা জেলা সদর থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণে চরফ্যাশন উপজেলা। উপজেলার সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় প্রায় দেড়শ বছর আগে জেগে ওঠা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ঢালচর। এই চরের তাড়ুয়া সমুদ্র সৈকতটি অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বিচ্ছিন্ন এই ঢালচর থেকে তাড়ুয়া ট্রলারে প্রায় দেড় ঘণ্টার নদীপথ। স্পিডবোটে মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিট। বঙ্গোপসাগরের একেবারে দক্ষিণের মোহনায় মনোরম ম্যানগ্রোভ বনসমৃদ্ধ তাড়ুয়া চর সগর্বে দাঁড়িয়ে। চারপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন সারি সারি কেওড়া গাছ। অন্য প্রজাতির গাছও নেহায়েত কম নয়।

তাড়ুয়ার সৈকতে দেখা মিলবে চকচকে সাদা বালি আর লাল কাঁকড়ার


বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
জীবন বীমা কর্পোরেশনের
পলিসিসমূহ হতে আপনার পছন্দনীয় পলিসিটি বেছে নিন
বহু কিস্তি বিমা
ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ও বিবাহ বিমা
ওয়ারসিজ মেডিক্লেইম পলিসি
নিশ্চিত বোনাস জেয়াদি বিমা
গ্রুপ বিমা
ব্যক্তিক পেনশন বিমা পলিসি
আপনি আপনার বীমা পলিসির প্রিমিয়াম অগ্রণী ব্যাংক, ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের সকল শাখায়, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (রকেট, নগদ, বিকাশ) এর মাধ্যমে সহজেই জমা দিতে পারেন।
জীবন বীমা কর্পোরেশন
একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয় ঃ ২৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
Email : info@jbc.gov.bd, Web : www.jbc.gov.bd
১৯৭৩ সন থেকে

মিছিল। মাথার উপর কিংবা বেলাভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির হাজারো পাখির কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। তবে শীতের সময় অতিথি পাখির বিচরণে এক অতি-প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণিল আলোকচ্ছটা মোহিত করবে যেকাউকে। নাগরিক ব্যস্ততার বন্দি জীবনে অবকাশ যাপনের জন্য প্রকৃতিপ্রেমীরা একটু সময় করে এখানে আসলে প্রকৃতি তাদের নিরাশ করবে না।

তাড়ুয়া ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল:
ঢালচরের ৩১.৩১ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ২৮.২০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে সুবিশাল বনাঞ্চল। এর মধ্যে তাড়ুয়ার বন অন্যতম। এই তাড়ুয়া বনে রয়েছে গেওয়া, গড়ান, কেওড়া, বাইন, রেইনট্রিসহ বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান গাছ। শীত এলেই এখানে আস্তানা গড়ে বিভিন্ন প্রজাতির হাজার হাজার অতিথি পাখি।

এখানে পরিকল্পিতভাবে বনাঞ্চল শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। এখানে কোনো হিংস্র পশুর ভয় না থাকলেও বনে রয়েছে শিয়াল, বন বিড়াল, হরিণ, সাপসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। এই বাগানের মধ্যদিয়ে বয়ে যাওয়া সরু ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটু ভেতরে গেলেই মনে হবে, এ যেন আরেক ভুবন। সেখানে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বিশাল একটি শীতল ছায়াবিশিষ্ট মাঠ। স্থানীয়ভাবে জায়গাটা বরইতলা নামে পরিচিত।

তাড়ুয়া সমুদ্র সৈকত:
বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান। সেই বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা তাড়ুয়ার সাদা বালির বিশাল সমুদ্র সৈকতে নোনা পানির ঢেউ শো শো শব্দে আছড়ে পড়ে। সাদা বালিতে নোনা পানির উঁচু ঢেউ, কাছাকাছি সবুজ বনভূমি কক্সবাজার অথবা কুয়াকাটা সৈকতের চেয়ে কারও কাছে অন্যরকম মনে হতে পারে। সৈকতে লাল কাঁকড়ার বিচরণ। বালির ওপর ছোট ছোট পা দিয়ে দৌড়ে চলে এসব লাল কাঁকড়ার দল। মানুষের অবস্থান টের পেলে এরা চোখের নিমিষেই লুকিয়ে পড়ে বালির গর্তে।

এ চরে চিত্রা হরিণ, বানর, উদবিড়াল, পাতিশিয়াল, বন্য মহিষ-গরু, বন বিড়াল, বন মোরগসহ নানা প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। বক, শঙ্খচিল, মথুরা, কাঠময়ূর, কোয়েল, গুঁইসাপ, বেজি, কচ্ছপ নানা ধরনের সাপও আছে এ চরে।

চর কুকরি-মুকরি:
চর কুকরি-মুকরি আরেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। ট্রলার বা স্পিডবোটে মাঝারি খালের মধ্যদিয়ে যাওয়ার সময় দুই পাশের ম্যানগ্রোভ বন দেখে সুন্দরবনের অবয়ব ভেসে ওঠে। পায়ে হেঁটে বনের মধ্যদিয়ে যাওয়ার সময় মনে হবে যেন সুন্দরবনের কোনো অংশ। সুন্দরী, গেওয়া, গরান গাছ এবং শ্বাসমূলীয় গাছের বন এটি। এছাড়া গোলপাতার সমাহারও চোখে পড়ার মতো। কুকরির পূর্ব অংশে নারিকেল বাগান। নামে নারিকেল বাগান হলেও নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজির আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে সূর্য। বনের ভিতরে যাওয়ার জন্য গামবুট অথবা কেডস উপযুক্ত। অন্যথায় শ্বাসমূলে পা রক্তাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। নদীর পাড় আরও মুগ্ধতার। নদীর পাড় যেন শুভ্রতায় মোড়ানো। কারণ সাদা বকের সমারোহ থাকে সেখানে। শীতের সময় অতিথি পাখি এ এলাকাকে দেয় ভিন্নমাত্রা। এ চরে বেড়ানোর জন্য শীতই যথোপযুক্ত। কুকরি-মুকরির শীতকালের চিত্র মুগ্ধ হওয়ার মতো। বিভিন্ন প্রজাতির অতিথি পাখির কলতানে মুখরিত হয়ে ওঠে এসব অঞ্চলের চারপাশ। অতিথি পাখিদের আগমনে চরাঞ্চলগুলো যেন নতুন রূপ ধারণ করে। এছাড়া এখানকার সমুদ্র সৈকতটিও বেশ পরিচ্ছন্ন ও নিরিবিলি। দেশের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোর তুলনায় কুকরি-মুকরির চিত্র কিছুটা ভিন্ন। মাইলের পর মাইল বৃক্ষরাজির বিশাল বনভূমি কুকরি-মুকরিকে সাজিয়েছে অদ্ভুত সবুজের চাদরে।

চর কুকরি মুকরির ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে একটি খাল। খালটির নাম ভাড়ানি খাল। মেঘনার বিশাল বুক থেকে বয়ে গিয়ে খালটি পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। এখানকার ধূ-ধূ বালিয়াড়ির ওপর দাঁড়ালে সাগরের শো শো শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাবে না। স্থানীয় মানুষ এ স্পটটিকে বালুর ধুম নামে ডাকে। একটু সামনে এগোলেই ঢালচর। এরপরই বঙ্গোপসাগর। এখানে উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়া দেখলেই মনে পড়ে যাবে কক্সবাজার কিংবা কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের কথা।

এখানে বসেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। তবে কুকরি-মুকরির প্রধান আকর্ষণ সাগরপাড়। এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত কিংবা সূর্য ডোবার দৃশ্য ভ্রমণপিপাসুদের মুগ্ধ করবে। চর কুকরি-মুকরিতে ডুবন্ত সূর্যের লাল, হলুদ, কমলা আভা সবুজরঙা চর কুকরি-মুকরির বনে ছড়িয়ে পড়ে বনটিকে আরও মায়াবী করে তোলে।

যাওয়ার পথ:
ঢাকা থেকে লঞ্চে সরাসরি যেতে পারবেন ভোলা জেলার চরফ্যাশনে। সেখান থেকে মোটর সাইকেল কিংবা সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাড়া করে চর দক্ষিণ আইচা এলাকার চর কচ্ছপিয়া ঘাটে। এরপর চর কচ্ছপিয়া ট্রলার ঘাট হয়ে ইঞ্জিনচালিত নৌকা অথবা বেশ খানিকটা জলপথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছানো যাবে চর কুকরি-মুকরি অথবা তাড়ুয়া দ্বীপে। লক্ষ্মীপুর থেকে যেতে হলে মজু চৌধুরী লঞ্চঘাট ও ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ/ট্রলার/স্পিডবোটে ভোলার ইলিশা ঘাট, সেখান থেকে অটোরিকশায় ভোলা শহরে। শহরের বাসস্ট্যান্ড থেকে চরফ্যাশনের বাসে করে চরফ্যাশন গিয়ে পূর্ব নির্দেশিত পথে।

থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা:
এ চরে থাকার ব্যবস্থার মধ্যে চর কুকরি-মুকরি বাজারের পাশে বন বিভাগের একটি রিসোর্ট রয়েছে। সেখানে থাকতে হলে যোগাযোগ করতে পারেন সেখানকার কেয়ারটেকার করিমের সঙ্গে। মোবাইল ফোন নম্বর- ০১৭৪৯-৭১৭৫৮১। বাজারে হানিফ নামে একটি হোটেল রয়েছে। রিসোর্ট আর ইউনিয়ন পরিষদে খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলেও এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এজন্য যোগাযোগ করতে হবে ০১৯৭৫-৯১১৩৬ নম্বরে।

এছাড়া ব্যক্তি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি স্টে হোম সার্ভিস চালু আছে। সেখানে স্বল্প খরচে থাকা যায়। যোগাযোগ করতে পারেন ০১৭৪৫-৪৩২২৩৭ নম্বরে।

তাড়ুয়ায় যেতে হলে স্পিডবোট অথবা ট্রলারে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে কুকরি-মুকরি থেকে ওই পরিবহণ ভাড়া করে বা রিজার্ভ নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসতে হবে।

মনপুরা:
ভোলা সদর থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে মেঘনার বুকে জেগে ওঠা দ্বীপ উপজেলা মনপুরার অবস্থান। প্রমত্তা মেঘনার উত্তাল ঢেউয়ের পলি জমে এ দ্বীপটির জন্ম হয়। সাগরের কোল ঘেঁষে জন্ম নেওয়ায় স্থানীয়দের কাছে মনপুরা 'সাগরকন্যা' হিসেবে পরিচিত।

এখানে ভোরে সূর্যের আগমনী বার্তা আর বিকালের পশ্চিম আকাশের সিঁড়ি বেয়ে এক পা, দু পা করে মেঘের বুকে হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সত্যিই অতুলনীয়। আবার রাতের নতুন শাড়িতে ঘোমটা জড়ানো বধূর মতো নিস্তব্ধতায় ছেয়ে যায় পুরো দ্বীপ।
প্রায় ৮শ' বছরের পুরনো মনপুরা উপজেলা বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চল তথা দেশজুড়ে পরিচিত একটি নাম। এখানকার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। ৭শ' বছর আগে এখানে পর্তুগিজ জলদস্যুদের আস্তানা ছিল। যার প্রমাণ মেলে মনপুরায় আজও সে সময়ের লোমশ কুকুরের বিচরণ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি মনপুরায় রয়েছে পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানকার হাজার হাজার একর জায়গাজুড়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। এছাড়াও রয়েছে বাহারি প্রজাতির বৃক্ষ, তরুলতার সমাহার। বনে আছে হরিণ, বানর, ভাল্লুকসহ নানা বৈচিত্র্যময় প্রাণী। এর গহিন জঙ্গলে ভয়ঙ্কর কিছু মাংসাশী প্রাণী রয়েছে বলেও জনশ্রুতি আছে।

মনপুরায় রয়েছে ৮ থেকে ১০টি বিচ্ছিন্ন চর। এগুলো হচ্ছে চর তাজাম্মল, চর জামশেদ, চর পাতিলা, চর পিয়াল, চর নিজাম, লালচর, বালুয়ারচর, চর গোয়ালিয়া ও সাকুচিয়ারচর। আর চরগুলো দেখলে মনে হবে কিশোরীর গলায় মুক্তার মালা। এসব চরাঞ্চলে বন বিভাগের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সবুজ বিপ্লব। চোখ ধাঁধানো রূপ নিয়েই যেন এসব চরগুলোর জন্ম। চরগুলোতে রয়েছে মানুষের বসতি। তাদের পেশা অনেকটা নদীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল।



The Smart Way to Retire

পেনশন বীমা পলিসি :

অবসর জীবন যখন নিয়মিত আয়ের কোন নিশ্চয়তা থাকে না, পেনশন বীমা পলিসি ঠিক তখনই নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। অবসর জীবনের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে ডেল্টা লাইফের রয়েছে পেনশন বীমা পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আজীবন পেনশন সুবিধা পেয়ে থাকেন। যে কোন পেশায় নিয়োজিত মানুষ এই পলিসি নিতে পারেন।

এই পলিসি আপনাকে দিচ্ছে:

- নিশ্চিত আয়।
  অবসরকালীন সময় থেকে আমৃত্যু নির্দিষ্ট হারে পেনশন পাওয়ার নিশ্চয়তা।
- প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপর আকর্ষণীয় রেয়াত।
- অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ অক্ষমতায় প্রিমিয়াম মওকুফ ও নির্দিষ্ট সময় পর নিয়ম অনুযায়ী পেনশন প্রদান।
- পেনশন শুরুর পূর্বে বীমা গ্রাহকের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় মনোনীতকে একককালীন বার্ষিক পেনশনের ১০ গুণ টাকা (বীমা অংকে) প্রদান।

Help Line : 01885 060000

ধরা যাক, আপনার বয়স ৩৫ বছর এবং আপনি ৫০ বছর বয়সের পর থেকে বার্ষিক ১,০০,০০০/- টাকা করে পেনশন নিতে আগ্রহী, তাহলে আপনার পলিসির মেয়াদ হবে ১৫ (৫০-৩৫) বছর এবং প্রতি বছর প্রিমিয়াম দিতে হবে ৪৫,৬৬০/- টাকা। একইভাবে-

বর্তমান বয়স	পলিসির মেয়াদ	পেনশন শুরুতে বয়স	বার্ষিক প্রিমিয়াম	ত্রৈমাসিক প্রিমিয়াম
৩৫	১৫	৫০	৳ ৪৫,৬৬০	৳ ১২,৫৫৭
৩৫	২০	৫৫	৳ ২৭,৯৩০	৳ ৭,৬৮১
৩৫	২৫	৬০	৳ ১৯,০৮০	৳ ৫,২৪৭

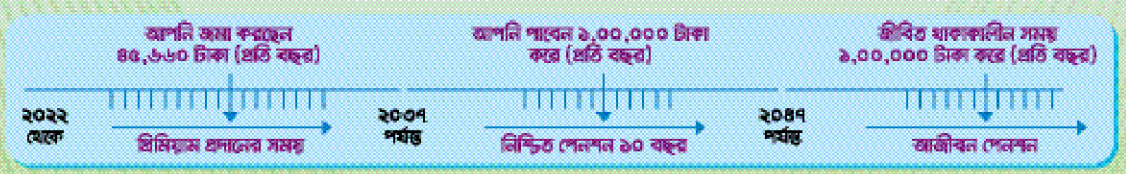

মনোনীতকের প্রাপ্য:

- পেনশন শুরুর পূর্বে বীমা গ্রাহকের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় মনোনীতকে একককালীন বার্ষিক পেনশনের ১০ গুণ অর্থ (বীমা অংক) অর্থাৎ ১০,০০,০০০ টাকা প্রদান।
- পেনশন শুরুর ১০ বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে বীমা গ্রাহকের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় মনোনীতকে ১০ বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য পেনশন প্রদান।

info@deltalife.org | www.deltalife.org | www.facebook.com/deltalife.org

জীবনযাত্রার মানও কিছুটা ভিন্ন ধরনের। তাই সবুজের সমারোহ আর পাখির কলকাকলিতে মুখরিত বিচ্ছিন্ন সাগরকন্যা মনপুরা পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বের দাবিদার।

ভ্রমণপিপাসু মানুষকে মুগ্ধতার বন্ধনে আটকে দেওয়ার অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে সাগরকন্যার। শীত মৌসুমে এর চিত্র ভিন্ন ধরনের। সুদূর সাইবেরিয়া থেকে ছুটে আসা অতিথি পাখিদের আগমনে চরাঞ্চলগুলো যেন নতুন রূপ ধারণ করে। শীত মৌসুমে বাংলাদেশে যেসব প্রজাতির অতিথি পাখি আসে এর মধ্যে সিংহভাগই ভোলায় অবস্থান করে। তখন মনপুরার চর অতিথি পাখিদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়। দেশের অন্যসব পর্যটন কেন্দ্রের তুলনায় মনপুরার চিত্র কিছুটা ভিন্ন। মাইলের পর মাইল বৃক্ষের সবুজ সমাহার যেন ক্যানভাসে আঁকা শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়া। যেখানে আছে নানা প্রজাতির গাছ, সংখ্যায় প্রায় পাঁচ কোটিরও বেশি। রয়েছে একটি ল্যান্ডিং স্টেশন। সেখান থেকে সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। দেখা যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য।
এছাড়া সম্প্রতি মনপুরার সাগর মোহনায় জেগে ওঠা প্রায় এক কিলোমিটার বালির বিচকে ঘিরে তৈরি হয়েছে দক্ষিণা হাওয়া সি-বিচ। এই বিচকে ঘিরে নতুন সম্ভাবনা। মনপুরার অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, ভালোমানের হোটেল, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসহ বিভিন্ন সুবিধা বাড়াতে পারলে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে মনপুরায়। তবে সরকারি, বেসরকারি কিংবা এনজিও সংস্থাগুলো যদি গুরুত্বের সঙ্গে দৃষ্টি দেয় তাহলে শিগগিরই এখানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: ঢাকা থেকে সরাসরি লঞ্চযোগে মনপুরা আসা যায়। সন্ধ্যায় লঞ্চে উঠে সকাল ৬টায় পৌঁছানো যায় মনপুরায়। এছাড়াও ভোলা ইলিশা থেকে রাতে লঞ্চে ও সি-ট্রাকে তজুমদ্দিন অথবা ইঞ্জিনচালিত ট্রলারে করে যাতায়াত করা যায়।

প্রাচীন স্থাপত্য:
ভোলা জেলা সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে বোরহানউদ্দিন উপজেলা। এখানে রয়েছে বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য প্রাচীন নান্দনিক স্থাপনা। এগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে অনেক প্রকৌশলী নির্মাণশৈলী দেখলে বিস্ময়ে 'থ' হয়ে যাবেন। এরকমই স্থাপনার সন্ধান মিলে বোরহানউদ্দিন উপজেলা সদর থেকে ৫-৬ কিলোমিটার দক্ষিণে সাঁচড়া ইউনিয়নের গুড়িন্দা বাড়িতে। প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর আগে তৎকালীন চন্দ্রদ্বীপের রাজা জয়দেবের ছোট মেয়ে বিদ্যা সুন্দরীকে বিয়ে দিয়ে তাদের জন্য ওই রাজবাড়ি নির্মাণ করেন। কিছু যায়গার পলেস্তারা খসে পড়লেও এর নির্মাণশৈলী অবাক করার মতো। স্থানীয়রা এর ইতিহাস বলতে পারে না। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজার জামাতা রাজার গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতেন। এ কারণে ওই বাড়ির নাম একসময় গোয়েন্দা বাড়ি ডাকা হতো। ধারণা করা হয় রাজ শাসনের পর কালক্রমে মানুষের মুখে মুখে ওই বাড়ির নাম গুড়িন্দা বাড়ি হয়ে যায়। এ পুরাকীর্তি সরকারি হেফাজতে নিয়ে সংরক্ষণ করা উচিত। পরিপূর্ণ গবেষণায় এ স্থান থেকে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হওয়া অসম্ভবনা।

এছাড়া রাজা জয়দেব এলাকায় পানীয়জলের জন্য তার দুই মেয়ের নামে কমলা সুন্দরী দীঘি ও বিদ্যা সুন্দরী দীঘি খনন করেন। ওই দুটি দীঘি কালক্রমে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তবে কমলা সুন্দরী দীঘির শুধু একটি পাড় ও বিদ্যা সুন্দরী দীঘির দুটি পাড় কালের সাক্ষ্য বহন করছে। স্থানীয়রা ওই পাড়গুলোকে পাহাড় নামে ডাকে। একই উপজেলায় দুইশ' বছর বয়সি আব্দুল জব্বার চৌধুরী জমিদারবাড়ি, বোরহানউদ্দিন চৌধুরী জমিদারবাড়ি, বোরহানউদ্দিন চৌধুরী জমিদারবাড়ির মসজিদ, হায়দার আলী মিয়াবাড়ি প্রাচীন স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে যে কাউকে মোহিত করবে। এগুলোর নির্মাণশৈলী দেখলে নানা প্রশ্নের জন্ম দেবে। প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাকীর্তি যাদের আকৃষ্ট করে নিঃসন্দেহে এ স্থাপনা তাদের নিরাশ করবে না।



বিএইচবিএফসি'র সকল সম্মানিত গ্রাহক, স্টেকহোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর্ এর শুভেচ্ছা।

ঈদ মোবারক

সারাদেশে সরল সুদ ও মুনাফা ভিত্তিক বিএইচবিএফসি'র
গৃহঋণ ও বিনিয়োগ প্রোডাক্ট সমাহার:


ফ্ল্যাট ঋণ


নগরবন্ধু


প্রবাসবন্ধু


ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ


আবাসন উন্নয়ন ঋণ


আবাসন মেরামত ঋণ


কৃষক আবাসন ঋণ


পল্লীমা


জিরো ইক্যুইটি আবাসন ঋণ


সরকারি কর্মচারী ঋণ


হাউজিং ইকুইপমেন্ট ঋণ


মনজিল*

- সুদ হার সর্বনিম্ন ৭%
- সর্বোচ্চ মেয়াদ ২৫ বছর
- সর্বোচ্চ সিলিং ২ কোটি টাকা
- কোনও Hidden Charge নাই
- কিস্তির অতিরিক্ত জমা আসলে সমন্বয়
- Fee/Charge মুক্ত Early Settlement
- Online-এ আবেদন দাখিল ও তথ্য নেয়ার সুযোগ
- One-Stop সার্ভিস সুবিধা
- বিশেষ অবস্থায় NID'র বিকল্প ডকুমেন্ট গ্রহণ
- ডিজিটাল সুবিধাসম্পন্ন Mobile App
- Online Repayment সুবিধা
- * মুনাফাভিত্তিক বিনিয়োগ প্রোডাক্ট

সারাদেশে মোট ৮৬টি মাঠ কার্যালয় প্রয়োজনীয় সেবার জন্য নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন

বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
Bangladesh House Building Finance Corporation
গৃহায়ণের নিশ্চয়তে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার
E-mail: info@bhbfc.gov.bd, Website: www.bhbfc.gov.bd
ফোন : ০২-২২৩৩৮১৮২৬, হেল্প লাইন : ০২-২২৩৩৮১৩৮০, ০১৫৫০০৪৩৩০৫-৬



উপন্যাস

প্রতিনায়ক

সারোয়ার কবীর

আমি একজন সাংবাদিক। পেশার সূত্রে শরীফউদ্দিন তালুকাদরের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। একদিন তিনি আমাকে ধরলেন একটা সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করে দিতে। কাজটা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। ওয়ান-টুর ব্যাপার মাত্র। জাতীয় প্রেস ক্লাবআছে, তোপখানা রোডের উল্টাদিকে সেগুনবাগিচায় একটু ভেতরে রিপোর্টার্স ইউনিটির হলরুমে আছে। ইচ্ছে করলে আশপাশে ছড়িয়ে থাকা চাইনিজ রেস্তোরাঁ আর কোনো কোনো থ্রিস্টার হোটেলের লবিতেও সংবাদ সম্মেলন করা চলে। টাকা-পয়সা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। তালুকদারের অঢেল অর্থসম্পদ। আমার ধারণা, কয়েক পুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে বসে খেতে পারবে। আগে তারিখ ও সময়টা ঠিক করতে হবে। তারপর জায়গা বুঝে বুকিং দেওয়া আর সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো। বার্তা সম্পাদকদের কাছে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো ছাড়াও ফোনে কিংবা সাক্ষাতে একটু অনুরোধ করতে হবে, যাতে ঠিকমতো প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় সংবাদ সম্মেলনের কভারেজটা পাওয়া যায়। এতে একটু বাড়তি খরচ হতে পারে। কয়েক বোতল বিলেতি মদ কিনে ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারলেই কোনো চিন্তা নেই। আমি যা বলব, তালুকদার সাহেব সেটাই করবেন। অন্তত সংবাদ সম্মেলনের ব্যাপারে।

শরীফউদ্দীন তালুকদারকে সাংবাদিক মহলের অনেকেই চিনেন। কয়েকবার এফবিসিআই নির্বাচন করেছেন তিনি। এক সময় সেই পাকিস্তান আমলে কিছুদিন সরকারি চাকরি করার পর ব্যবসাতে নামেন। ব্যবসার স্বার্থেই চাকরিটা ছেড়ে দেন। বর্তমানে একাধিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মতিঝিলে একটা বহুতল ভবন আছে। সেখানেই



তার কর্পোরেট অফিস। ওই ভবন থেকেই প্রতি মাসে ভাড়া পাচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। একটা বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালকও এই তালুকদার। কাজেই অর্থ নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। ইচ্ছে করলে পাঁচতারা হোটেলও সংবাদ সম্মেলন করা যায়। কিন্তু সেটা অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে। আসলে যেখানেই আয়োজন করা হোক না কেন, বড় কথা হলো সংবাদ সম্মেলনের কভারেজটা গণমাধ্যমে যেন ঠিকঠাক হয়। এজন্য সাংবাদিকদের হাল্কা নাস্তা-পানি, বিরিয়ানির প্যাকেট অথবা চাইনিজ খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করতে হবে। তারপর তাদেরকে রাহা খরচ বাবদ একটা করে খাম হাতে ধরিয়ে দেওয়াটা আজকাল রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা তালুকদার সাহেবকে জানাতেই তিনি এক পায়ে রাজি। সাংবাদিকদের আপ্যায়ন করতে পারলেই কৃতার্থ হবেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সামনে একটা লিখিত বক্তব্য পাঠ করতে হয়। সেটার কপি আবার তাদের হাতে হাতে দিতে হবে। বক্তব্যের সূত্র ধরেই উঠবেনানা প্রশ্ন। প্রশ্নের জবাব শরীফউদ্দীন তালুকদারই দেবেন। কিন্তু সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যটা আমাকেই লিখতে হবে। তালুকদার সাহেবকী বলতে চান- সেটা জেনেই আমি লিখব। লেখার আগে বিষয় সম্পর্কে নোট নিতে হবে। তারপর বক্তব্যটা লিখে কম্পিউটারে কম্পোজ করে তালুকদারকে শোনাতে হবে। কোথাও কারেকশন বা অদল-বদলের দরকার পড়লে সেটা ফাইনাল করতে হবে। আমি জানতাম, তালুকদার সাহেবসংবাদ সম্মেলন করবেন। কিন্তু কেন বা কোন বিষয়ে করবেন সেটা জানা ছিল না। আমার ধারণা ছিল, হয়তো ব্যবসা সংক্রান্ত কোন সমস্যা নিয়েই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন। তালুকদার গণমাধ্যমের সাহায্যে এমন বক্তব্য দেশবাসী, সমাজ কিংবা সরকারের সামনে তুলে ধরতে চান, যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। সেই বক্তব্য আমাকেই লিখতে হবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, কোনো কঠিন কাজ নয়। তালুকদারের কথা শুনে নোট করব, পরে একটানা লিখে ফেলব। তবে সেই বক্তব্য লেখার আগেই টেলিফোনে তালুকাদরের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলাম, প্রেস ক্লাব বা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে নয়, পল্টন-বিজয়নগরের নর্থসাউথ রোড- হালে শহীদ তাজউদ্দীন সরণিতে এক চীনা রেস্তোরাঁয় সাংবাদিকদের আপ্যায়ন করা হবে। রেস্তোর্রাঁর মালিক তালুকদার সাহেবের ঘনিষ্ঠ লোক। আমরা সংবাদ সম্মেলনের দিন হিসেবে শনিবারকে ঠিক করলাম। তালুকদার সাহেব জানালেন, তিনি নিজে গিয়ে রেস্তোর্রা বুকিং করে আসবেন। টাকা-পয়সা যতই খরচ হোক, ডোন্টকেয়ার। শুধু কভারেজটা ঠিকঠাক হওয়া


জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
ঈদ মোবারক
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই ঈদের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
মিরাজুল ইসলাম মিরাজ
উপজেলা চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক
ভান্ডারিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ
ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।

মূলত এডিটিং আর কখনো কখনো স্লাগ দেখে অনুবাদ করার পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্রাউজ করে মনিটরিং হলো আমার কাজ। শিফট শুরু হয় বিকেল ৫টা থেকে। তালুকদার সাহেবকে ফোন করে জানালাম, আমি ১১টা-১২টার মধ্যে আপনার অফিসে আসছি।
- ওকে ভাইজান, আমি অন্য কোথাও যাচ্ছি না। আপনার জন্য অফিসে থাকবো।

দুই.
অফিসের কাজ শেষ করে বাসায় ফিরতে রাত প্রায় ১২টা বেজে যায়। খেয়েদেয়ে একটু টিভি দেখা। ঘুমাতে ঘুমাতে রাত দেড়টা। যে কারণে সকালে ঘুম ভায়ে দেরিতে। সকাল ৯টার দিকে বিছানায় চোখ মেলে দেখি, বাইরে সমানে বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারায়। মেজাজটাই যেন খিঁচড়ে গেল। যেহেতু ঘুম থেকে উঠে, হাত-মুখ ধুয়ে, নাস্তা সেরে বাজারের ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ি। বাজারে হেঁটে যাই। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা তাতে বাজারে যেতে মন চাইছে না। এই বৃষ্টি ছাতা মানে না। নাস্তা খাওয়ার সময় গিন্নি জানিয়ে দেয়- ফ্রিজে ইলিশ মাছ আছে, বাজারে না গেলেও চলবে। আমি তখন বেশ স্বস্তিতে ভাবতে থাকি, তালুকাদার সাহেব কোন বিষয়ে আমাকে ডিক্টেশন দিতে পারেন! নিশ্চয় দেশের অর্থনীতি বা ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা নিয়েই বলবেন। এমনও হতে পারে বিরোধী দলের ঘন ঘন হরতালে দেশের অর্থনীতির প্রায় বারোটা বাজা নিয়ে কোনো বক্তব্য রাখবেন। মোট কথা আমি তখনো ধারণা করতে পারিনি, এমন একটা বিষয়ে শরীফউদ্দীন তালুকদার সংবাদ সম্মেলন করতে চাইছেন যা কারও কাছে অবিশ্বাস্য আবার কারও কাছে চমকপ্রদ মনে হবে।
ঘণ্টাখানেক ধরে অবিরাম বর্ষণের পর বাইরের বৃষ্টি ধরে আসতে থাকে। বরাত ভালো যে যতই বৃষ্টি হোক, আমার বাসার সামনে রাস্তায় পানি জমে না। গোসল-টোসল সেরে তৈরি হয়ে নেই। সরাসরি রিকশা নিয়ে মতিঝিল। তালুকদার ম্যানসনের দারোয়ান থেকে লিফটম্যান সবাই আমাকে চেনে। যথারীতি সালাম দিতে ভুল করে না। লিফটের চারে গিয়ে নামলাম। রিসেপশন টেবিল আগলে বসা কিছুটা বয়স হলেও দারুণ সুন্দরী মহিলা আমাকে দেখেই বলল- স্যার, আপনাকে একটু বসতে বলেছেন, এখনই চলে আসবেন।
রিসেপশন রুমে পেতে রাখা নরম সোফায় গা এলিয়ে বসলাম। তালুকদার কাজের মানুষ। যখন বসতে বলেছেন, যে কোনো মুহূর্তে চলে আসবেন। আমি বসে ভাবছিলাম, তালুকদার যতই ডিক্টেশন দিক না কেন, সেটা ১২ পয়েন্টে কম্পোজ করে দুই পৃষ্ঠায় সীমিত রাখতে হবে। বড় করে লাভ নেই। লিখিত বক্তব্যেই একটু এদিক-ওদিক এবং কাটছাঁট করে সাংবাদিকরা তাদের রিপোর্ট হিসেবে ছেড়ে দিতে পারেন- সেদিকটা খেয়াল রাখা উচিত। একে তো চারদিক থাই গেলাস দিয়ে আটকানো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুম, তারপর সোফার সামনে কাচের টেবিল কোনো অ্যাস্ট্রে নেই। পুরোপুরি ধূমপানবিরোধী জোন। কিন্তু কারও প্রতীক্ষায় থাকলেই সিগারেট টানার ইচ্ছে আমার প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। রিসেপশন রুম থেকে বেরিয়ে, লিফটের সামনে করিডর মাড়িয়ে কাচের দেওয়ালের পাশে দাঁড়ালাম। একটা বালুভরা লাল বালতি আছে কাছেই। গ্যাস লাইটারে একশলা সিগারেট ধরিয়ে শার্সির ওপাশে নিচে মতিঝিলের ব্যস্তবহুল রাস্তার দিকে তাকিয়ে একগাল ধোঁয়া উগড়ে দিয়ে ভাবতে থাকি, তালুকদারের কী এমন জরুরি বিষয় আছে যে সংবাদ সম্মেলনের দরকারটা পড়ল। রাজনীতিতে নামছেন? তার প্রস্তুতিই বোধ হয়। আজকাল টাকা থাকলে লোকে একাধিকবার হজ করে শুধু আলহাজই হয় না, কেউ কেউ সাংসদও হতে চায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে এখন থেকেই মাঠে নামা দরকার...
আর তখনই ভিআইপিদের জন্য সংরক্ষিত লিফট থেকে ফ্লোরের টাইলসে পা রাখলেন শরীফউদ্দীন তালুকদার। গট্‌গট্‌ করে ঢুকে গেলেন নিজ অফিসে। আমাকে দেখেননি, দেখলে নিশ্চয় ডাকতেন। একটা টবে ক্যাকটাসের ঝাড়ের পাশেই বালু ভরা লালবালতি। আধাপুড়া সিগারেট সেটার ভেতরে ছুড়ে মেরে পা বাড়াই। তালুকদারের অফিসে ঢুকতেই রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বলল- স্যার এসে গেছেন, আপনি ভেতরে যান।
তাই করলাম। আমাকে দেখে তালুকদার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেন- সরি ভাই- একটা জরুরি ফোন পেয়ে বাইরে যেতে হয়েছিল। আপনার কোনো তাড়া নেই তো?
- না, তাড়া থাকবে কেন! আমি তো সময় নিয়েই এসেছি। কথাটা বললাম তালুকদারের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে। এরপর তার ইঙ্গিতেই সেক্রেটারিয়েট টেবিলের এপাশে চেয়ারটায় বসলাম।
- আমি বেশ থ্রিলিং সাবজেক্ট নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করতে চাই।
- তাই নাকি!
- হ্যাঁ, তাই। আমি ভেবে দেখেছি গিনেস অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস বুকে আমার নাম থাকা উচিত।
- কথাটা শুনে আমার প্রায় থ মারার দশা। শরীফউদ্দীন তালুকদার কী এমন কাণ্ড করেছেন যে গিনেস বুকে তার নাম থাকা চাই। কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে নিশ্চিত হলাম, আর যাই হোক বিষয়টা পলিটিক্যাল নয়। তার মানে তালুকদার সাহেব সাংসদ হওয়ার টার্গেট নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করতে যাচ্ছেন না। তাহলে ব্যাপারটা আসলে কী? আমার হতবাক হওয়াটা আমলে না নিয়েই তালুকদার বললেন- ভাগ্যিস, আপনার ভাবি বেঁচে নেই, সে বেঁচে থাকলে আমার ওই প্রেস কনফারেন্স নিয়ে হয়তো অবজেকশন দিতো। এখন আমি কাউকে পরোয়া করি না। পৃথিবীতে দৃষ্টান্তমূলক কিছু করতে হলে দুটি জিনিসের খুবই প্রয়োজন- আত্মবিশ্বাস আর সাহস। কী বলেন সাংবাদিক সাহেব, কোনোটার ঘাটতি কী আমার আছে?
প্রশ্নটা সত্যিই আমাকে এক জটিল ধাঁধার ভেতর ঠেলে দেয়। কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলাম না দেখে চুপচাপ থাকি।
জবাবের অপেক্ষায় না থেকে তালুকদার ফের বললেন- আপনি নিশ্চয় ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছেন। আমি তো সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশকে নয়, গোটা দুনিয়াটাকেই চমকে দিতে চাই। আমি নিশ্চিত হয়েই বলছি, এমন একটা রেকর্ড গড়েছি, অতীতে কেউ তো নয় ভবিষ্যতেও কেউ পারবে কিনা, সন্দেহ। এ কারণেই গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে আমার নাম থাকাটা উচিত।
চুপচাপ শুনলাম কথাগুলো। আমার সাংবাদিকতা জীবন এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আর হইনি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে রিভলিং চেয়ারে বসা তালুকদারকে সত্যিই এক রহস্যপুরুষ বলে মনে হচ্ছিল। এত অচেনা তাকে আর কখনো লাগেনি। আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসির সঙ্গে কী যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ সন্দেহ জাগে, টাকার গরমে উনি আমার সঙ্গে মস্কারা করছেন? সেটা মনে হতেই বললাম- ভাই, হেঁয়ালি না করে ঝটপট ব্যাপারটা খুলে বলুন।
- আরে ভাই, সেটাই তো বলতে যাচ্ছি। অধৈর্য হলে চলবে না।
- আমি কিন্তু আপনার ব্যাপারটার আগামাথা কিছুই বুঝছি না।
এমন কিছু শোনার অপেক্ষায় যেন ছিলেন শরীফউদ্দীন তালুকদার। হোঃ হোঃ হাসি একচোট ঝেড়ে বললেন- এটাই তো স্বাভাবিক। আগামাথা বুঝবেন কী করে? আমি এখনো ফাঁস করিনি। সাধে কী বলছি, দেশ কেন গোটা দুনিয়া কেঁপে যাবে। আবার সেই হেঁয়ালি! মনে মনে বিরক্ত না হয়ে পারলাম না।
- বলেন তো সাংবাদিক সাহেব, লোক হিসাবে আমি কেমন? বাজারে আমাকে নিয়ে নিশ্চয় কানাঘুষা আছে?
সাংঘাতিক প্রশ্ন। কী জবাব দিব! তখনই তালুকদার মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। রিসিভ করেই বললেন- হ্যাঁ ভাই, আমি এক্ষুণি চলে আসছি।
আমি হাফ ছাড়লাম। বুঝতে পারলাম, তালুকদারের প্রশ্নের জবাব এখন না দিলেও চলবে। ধারণা সঠিক। মোবাইল ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে তালুকদার আমার দিকে তাকালেন- সরি ভাই আমাকে ফেডারেশন ভবনে যেতে হবে। জরুরি একটা মিটিং আছে। আপনাকে আজ আর বসিয়ে রাখব না। পরশু শুক্রবার। আমি কোনো প্রোগ্রাম রাখছি না। আমরা গাজীপুরের দিকে যাব। আমার বাংলো বাড়িতে। আপনি তো কখনো যাননি। চালুন, ঘুরে আসবেন।
- ভাই প্রেস কনফারেন্সের তারিখ ফিক্সড হয়ে গেছে। হাতে সময় নেই।
- সেটা আমি জানি। আমার অবস্থা তো দেখছেন, ওই যে কুল রাখি না শ্যাম রাখি! বিজনেসম্যানদের এটাই একটা সমস্যা। তবে পরশু মিস হবে না। প্রয়োজনটা তো আমার। সরি ভাই, আজকে আর সময় দিতে পারলাম না।
আমি বললাম- আরে ভাই, এত বিনয়ের কী দরকার! যখন বলবেন তখনই চলে আসব।

তিন.
অফিসে আমার ডে-অফ বুধবার। ছুটি নিলাম শুক্রবারে। শরীফউদ্দীন তালুকদার যে ধাতের মানুষ, গাজীপুরে নিয়ে গেলে কখন ছাড়বেন তার ঠিক নেই। হয়তো বলে বসবে, গাড়ি তো আছে, চলুন আমার গেরামের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। টাকা-পয়সা হাতে থাকলে মানুষের মুড থাকে। কখন কী শখ চাপে বলা কঠিন। আমাদের মতো ছাপোষা লোকদেরই হিসাব-নিকাশ করে চলতে হয়।
শুক্রবার সকালে, আমি কল করার আগেই তালুকদারের ফোন- কী খবর সাংবাদিক সাহেব, রেডি তো?



- হ্যাঁ, আমি রেডি।
- ঠিক ৯টায় মগবাজার মোড়ে থাকবেন, আমি আপনাকে গাড়িতে তুলে নেব।
তালুকদারের ফোন পেয়ে আমি বাসা থেকে তাড়াহুড়া করে বের হওয়ার মুখেই লাভলির প্রশ্নের সামনে পড়লাম- আচ্ছা ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার কাজটা কী, এত সকাল সকাল বেরিয়ে যাচ্ছো?
প্রশ্নটা কিছুটা হলেও আমার জন্য অস্বস্তিকর। তালুকদারের সঙ্গে কাজটা আসলে কী স্ত্রীকে খোলসা করে বলিনি। পরে জেনে নিও- এই বলে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম।
হাজীপাড়া থেকে মগবাজার মোড়ের দূরত্ব বেশি নয়। গলি ছেড়ে মেইন রোডে পা দিয়ে একটা রিকশা ডাকলাম। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। কোথাও জ্যাম ছিল না। ৯টার আগেই পৌঁছে যাই মগবাজার মোড়ে।
আমরা গাজীপুরে যাব। সেই হিসাব মোতাবেক টঙ্গি ডাইভারশন রোডের মুখে দাঁড়ালাম। প্যান্টের বাঁ পকেটের ভেতর মোবাইল ফোন আছে। একবার ভাবলাম, পৌঁছে গেছি এটা তালুকদার সাহেবকে জানিয়ে দিলে ভালো হয়। পরক্ষণে মত পাল্টাই- ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। নোটবুক আর কলম সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি। যদিও শরীফউদ্দীন তালুকদারের ব্যস্ততা বা হাবভাব দেখে আমার মনে মৃদুমন্দ সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে, নির্ধারিত সময়ে সংবাদ সম্মেলন হওয়া নিয়ে। তার চেয়ে বড় বিব্রতকর হয়ে উঠেছে, কোন বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন হবে, সেটাই এখনো জানা হয়নি।
ফাঁকা রাস্তা বলেই ৯টা না বাজতেই তালুকদার গাড়ি নিয়ে হাজির। আমাকে ব্যাকসিটে তার বাঁ পাশে বসালেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাস্তা জ্যামশূন্য। দিনের আবহাওয়াটাও ভালো, সকাল থেকেই ঝরঝরে রোদ। নীল আকাশের ভাসমান দুই-একখণ্ড মেঘ শরতের আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটছে। দেখতে দেখতে তেজগাঁও শিল্প এলাকা পেছন ফেলে মহাখালী মোড় পেরিয়ে এলাম। কিছুটা অবাক হলাম, আমি গাড়িতে চড়ার পর তালুকদার সংবাদ সম্মেলনের ব্যাপারে কিছু বলছেন না। দেশের বিরাজমান অর্থনীতি বিশেষ মূল্যস্ফীতি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি নিয়ে একচোট বকবক করলেন। আমাকে একনিষ্ঠ শ্রোতা হিসেবে পেয়ে কথায় কথায় তিনি জানালেন, এতদিন যেটাকে টাউট-বাটপাড়ের কারবার বলে জানতেন, সেই হাউজিং ব্যবসার দিকে পা বাড়াবেন। গতকাল রূপগঞ্জ-সোনারগাঁওয়ের ওদিকে কয়েক স্থানে জমি দেখে এসেছেন। কমপক্ষে দশ-পনের একর জায়গা দরকার। তবে তার ইচ্ছা, ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের আশেপাশে তুলনামূলক উঁচু জমিতে স্যাটেলাইট টাউন গড়ার। হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, বাজার, চিলড্রেন পার্ক- সবকিছুই থাকবে সেখানে। নামও ঠিক- তালুকদার নগর। এসব শুনতে শুনতে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল- ভাই, আমি কিন্তু প্রেস কনফারেন্সের বিষয় সম্পর্কে এখনো কিছু জানতে পারিনি। হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।
- সাংবাদিকদের ইনভাইট করার কাজটা কী শুরু করেছেন?
-মুখেমুখে কয়েকজনকে বলেছি। তাছাড়া কোন বিষয়ে আপনি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন, সেটা না জানলে আমি তাদের কার্ড, মানে আমন্ত্রণপত্র পাঠাব কী করে?
- সাংবাদিকদের আমি চমকে দিব, বুঝেছেন!
- সে তো জানিই। আগে বিষয়টা তো বলবেন?
- বিষয়টা আর কী! এই ধরুন, কার্ডে লিখে দেবেন শিল্পপতি শরীফউদ্দীন তালুকদার গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখাতে চান বলে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন।
- কেন এবং কী কারণে গিনেস বুকে আপনার নাম উঠবে- সেটা তো জানতে হবে।
- সেজন্যই গাজীপুরের বাগানবাড়িতে যাচ্ছি। সেখানে রেস্টহাউস আছে। দুই ভাই মিলে আরামসে বসে ডিসকাস করব।
তালুকদারের কথা শুনে সন্তুষ্টি হয়েই বাইরের দিকে তাকাই; বাঁ দিকে রেললাইন ধরে ট্রেন ছুটছে। গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে আসে। সামনে ক্যান্টনমেন্ট স্টাফ রোড লেভেলক্রসিং। কানে এলো রেল ইঞ্জিনের লম্বা হুইসেল।

চার.

গাজীপুরের রেস্টহাউসে পৌঁছার আগেই, উত্তরা মডেল টাউনের মেইন রোড ধরে যখন টঙ্গি ব্রিজের দিকে এগোচ্ছিলাম, শরীফউদ্দীন তালুকদার আচমকা প্রশ্ন করলেন- সাংবাদিক সাহেব, রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে একটা জিনিস নিশ্চয় আপনার চোখে এড়ায়নি?
অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করি- সেটা আবার কী?
-নারী।
-মানে?
- হ্যাঁ নারী। যার অস্তিত্ব না থাকলে পুরুষের কাছে এই জগৎ বলেন, প্রকৃতি বলেন, আমাদের এই মহানগর বলেন- সবকিছুই নিরস লাগত। নারী আছে বলেই তো পৃথিবীটা এত সুন্দর। চারদিকে এত কবিতা, এত গান, শিল্প-সাহিত্য-এমনকি হানাহানি। ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল এক নারীর জন্যই।
কথাগুলো শুনে আমার মনে সন্দেহ উঁকি দেয়, শরীফউদ্দীন তালুকদার কী নারী বিষয়ক কোনো সমস্যা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করতে যাচ্ছেন! কৌতূহল দমন করতে পারলাম না- কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?
- নিশ্চয়।
- নারীকেন্দ্রিক কোনো বিষয় নিয়ে আপনি সংবাদ সম্মেলন করতে চাচ্ছেন?
- অনেকটা তাই।
- কিন্তু আপনার নারীর সঙ্গে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সম্পর্কটা কোথায়?
- আরে, রহস্যটা তো সেখানেই।
আবার ধাঁধার অতল গহ্বরে যেন পড়ে গেলাম। আগামাথা কিছুই বুঝছি না। মনে মনে বিরক্ত হলাম, তালুকদারের এমন হেঁয়ালিপনা ঠিক হচ্ছে না। অনেকটা ধৈর্য হারানোর দশা, বলেই ফেললাম- আমি কাগজ-কলম বের করছি। আপনি সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যটা শুরু করুন, আমি নোট করছি।
তালুকদার বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে আমার ডান হাতের কবজি ধরে বললেন- ব্রাদার এখন না, আগে জায়গা মতো যাই। তারপর দুই ভাই মিলে কাজটা শুরু করব। দেখবেন, কী সুন্দর বাগানবাড়ি আমি করেছি। অনেক হোমরা-চোমরা সেখানে রিল্যাক্স করতে যায়। বুঝলেন তো সাংবাদিক সাহেব, এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে অনেকের অনেক রকম খায়েশ মিটাতে হয়। একবার তো রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের এক ইঞ্জিনিয়ার ছুকড়ি নিয়ে ফুর্তি করতে এসে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল। তা নিয়ে আপনাদের কোনো কোনো পত্রিকা কত কেস্‌সা কাহিনী রটাল।
- সেটা আপনার রেস্ট হাউস ছিল?
- সে কি আপনি জানেন না! কিসের সাংবাদিক হলেন ভাই?
তালুকদারের কথায় রীতিমতো বেকুবের মতো দশা আমার। আসলে সেসময় তালুকদারের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তারপর আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নোয়াখালীর সেই সুধারামের চরাঞ্চলে আমার ছোটবোনের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। পত্র-পত্রিকায় সংবাদটা দেখলেও অত খুঁটিয়ে লক্ষ করিনি। সেকথা এখন তালুকদারকে বলে লাভ নেই। আমি বাইরে তাকাই- শুক্রবারের ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে প্রাইভেট কার। কোন ফাঁকে তুরাগ নদীর ওপর ব্রিজ অতিক্রম করে আমরা টঙ্গির শিল্প এলাকায় প্রবেশ করেছি খেয়াল করিনি।

পাঁচ

জয়দেবপুরে একসময় আমার এক খালা থাকতেন। মাকে নিয়ে দুই-একবার ঢাকা থেকে বাসে চড়ে এসেছি। অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির স্টাফ কোয়ার্টারে ছিল খালার বাসা। গজারি বনের ভেতর বেশ সুন্দর একটা পরিবেশ। অনেকদিন ধরে এদিকে আর আসা হয়নি। শেষবার এসেছিলাম সেই কবে, জয়দেবপুর চৌরাস্তা থেকে উত্তর দিকে চলে যাওয়া ময়মনসিংহ হাইওয়ের পাশে ন্যাশনাল পার্কে। সেই পিকনিকের সময় লেকের জলে স্টিলবডির নৌকায় ভ্রমণরত একটা ফটো আমার অ্যালবামে এখনো আছে। আমরা ন্যাশনাল পার্কে যাওয়ার রাস্তা ধরেই এগুতে থাকি। একটা রেলক্রসিং পড়লো। আমার মনে আছে, পিকনিকে আসার সময় এদিকে রেলপথ ছিলনা।
গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটছে। রাস্তার দুপাশে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগলেও ভাওয়ালগড়ের গাছ-গাছালি অনেক পাতলা হয়ে গেছে। অনেকটা যেন মাথায় টাক পড়ার দশা।
আমার ডানপাশে সেলফোন কানে ঠেকিয়ে তালুকদার কার সঙ্গে যেন ব্যবসায়িক আলোচনায় মত্ত। আমি সংবাদ সম্মেলনের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, নারীঘটিত কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে শরীফউদ্দিন তালুকদার গিনেস বুকে নাম লেখাতে চাইছেন! ব্যাপারটা আমার মাথায় ঠিক খেলছে না। যদ্দুর জানি, কোনো ক্ষেত্রে কেউ অনন্য নজির বা রেকর্ড গড়লে তার নাম গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে ছাপা হয়। কিন্তু তালুকদার কী এমন করেছেন- তাও আবার মেয়ে লোক নিয়ে? এই হেয়ালিপনার কোনো কুল-কিনারা পেলাম না। একে তো বিপত্নীক, উপরন্তু ধনাঢ্য ব্যবসায়ি। নারী ঘটিত দুর্বলতা বা দোষ থাকাটা তার জন্য অস্বাভবিক কিছু নয়। তালুকদারকে নিয়ে কখনো কখনো গুঞ্জন কানে এলেও কারো পার্সোনাল লাইফের পর্দার ফাঁকে উঁকি দেওয়ার বাতিক আমার কখনো ছিল না, এখনো নেই। তবে এটা জানি, ফুলের টবের মতোই তালুকদার সাহেব তার মতিঝিলের কর্পোরেট অফিস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিত্য নতুন সুন্দরী- স্মার্ট মেয়ে স্টাফ রাখতে পছন্দ করেন। তালুকদারের কাছে থেকে সংবাদ সম্মেলনের বিষয় সম্পর্কে যে ইঙ্গিত পেলাম, মনে হচ্ছে হয়তো নারী সম্ভোগের সংখ্যার দিক থেকে তিনি ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের দাবিদার হতে পারেন। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? এই যে আমার ডানপাশে বসা শরীফউদ্দীন তালুকদার বাংলাদেশের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি হতে পারেন, তার পক্ষে আর কত নারীকেই বা শয্যাসঙ্গিনী করা সম্ভব। বয়স ষাটের বেশি আর মাথায় টাক পড়লেও তালুকদার এখনো যথেষ্ট সবল ও স্মার্ট। মাঝে মধ্যে বিদেশ যান। বিশ্বে সেক্সট্রেডের জন্য বিখ্যাত রিসোর্টগুলোতে পা রাখার আর্থিক সামর্থ্য তার আছে। তবু বলবো, এ যাবত কতজনকেই বা আর বাহুলগ্ন করতে পেরেছেন! ধরা যাক সংখ্যাটা হবে এক হাজার কিংবা তার বেশি। সেজন্য গিনেস বুকের রেকর্ডে তার নাম উঠবে না- এটা নিশ্চিত করেই বলতে পারি। আমি ইতিহাসের ছাত্র না হলেও অতীতের নানা বিষয়ে খোঁজ খবর রাখি। বিশ্বে এমন অনেক রাজা-বাদশাহ ছিলেন যাদের অন্তঃপুরে হাজার হাজার পত্নী-উপপত্নী থাকতো। মোগল আমলের ইতিহাসবিদ আবুল ফজল লিখে গেছেন আকবরের হেরেমে পাঁচ হাজার রমনী পোষার ব্যবস্থা ছিল। এদিক থেকে শরীফউদ্দীন তালুকদারের এমন কোনো বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হওয়ার সুযোগ নেই যে গিনেস বুকে তার নাম উঠবে।
- এমন আনমনা হয়ে কী ভাবছেন, সাংবাদিক সাহেব?
- সম্বিত ফিরে পেলাম তালুকদারের প্রশ্নে। দেখলাম, হাইওয়ে ছেড়ে কোন ফাঁকে আমাদের গাড়ি ঢুকে পড়েছে সরু রাস্তায়। দুপাশে গজারি গাছ। বর্ষার বৃষ্টি-বাদলে আর মেঘ হটানো রোদে গাছ-গাছালির

পাতা বড় সতেজ, গাঢ় সবুজ।
আমার জবাবের অপেক্ষায় না থেকে তালুকদার বললেন- মোবাইল ফোনটা একদিকে থেকে বড় উপকারী, আরেকদিকে বড়ই বিরক্তিকর। দুদণ্ড নিভৃতে কাটাবো উপায় নেই। এবার অফ করে রাখলাম। দুনিয়া জাহান্নামে যাক পরোয়া নেই, কী বলেন সাংবাদিক সাহেব!
এবার জিজ্ঞেস করলাম- আর কদ্দুর আপনার রেস্ট হাউজ।
- এই তো এসে গেছি। বড়জোড় চার-পাঁচ মিনিট লাগবে।

ছয়
চারদিকে গজারি বন। শরীফউদ্দীনের রেস্টহাউসটা সত্যিই চমৎকার। উঁচু দেয়ালের ঘেরা। কেয়ারি করা নানা ফুলের গাছ। টিনশেড বাংলোর পেছনে আবার সুইমিং পুল। পিকনিকের জন্য এক আদর্শ স্থান। টাকা থাকলে যে মানুষের রুচি বেড়ে যায়, তালুকদারের এই রেস্ট হাউস তার সাক্ষী। ইলেকট্রিসিটি থাকলেও জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। আমাদের নিয়ে প্রাইভেট কার পৌঁছার আগেই তালুকদারের ওষুধ কোম্পানির একটা মাইক্রোবাস সেখানে হাজির। বুঝতে পারলাম, বস-এর জন্য স্টাফরা আগেভাগেই তৈরি ছিল।
তাদের মাঝে লালপেড়ে গরদের শাড়ি-লাল ব্লাউস পরা, যেন স্টেজে গান গাইতে উঠবে এমন সেজেগুজে থাকা এক দারুন ফর্সা, সুন্দরী ও স্মার্ট তরুণীর ওপর আমার নজর পড়লো। খোপায় বেলিফুলের মালা জড়ানো। আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কলকাতার এক লেখকের উপন্যাসে পড়েছিলাম, যেখানে কাঞ্চন সেখানেই কামিনী। বেশ কয়েক বছর আগে বিদেশি ম্যাগাজিন থেকে একটা ফিচার অনুবাদ করতে গিয়ে জানতে পারি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, মাত্র পাঁচ ডলারের বিনিময়ে কোনো সুন্দরীকে হাতের নাগালে- চাইলে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে জুটানো যায়। বাংলাদেশ তো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। আর সেদেশের নাগরিক শরীফউদ্দীন তালুকদার, একজন ক্রোড়পতি হিসেবে গিনেস বুকে নাম লেখাতে চাইলে বিস্মিত হওয়ার কীই বা থাকতে পারে!
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটা রুমে গিয়ে আমরা বসলাম। মনে হচ্ছিল, আমরা কোনো বিলাসবহুল হোটেলের সুইটে অবস্থান করছি। ঢাকা থেকে দূরে ভাওয়াল গড়ের গজারি বনের ভেতর এহেন সুন্দর ব্যবস্থা থাকতে পারে, যা ছিল সত্যিই কল্পনার বাইরে। আমার মনোভাবআঁচ করেই যেন তালুকদার বলে ওঠেন কেমন লাগছে?
- ভালোই।
- তাহলে এখন আমরা কাজ শুরু করতে পারি। তার আগে একটু হাল্কা নাস্তা করা যাক। কথাটা বলেই তালুকদার টেবিলের ওপর কলিংবেলের বোতাম না টিপে আশপাশের কারো উদ্দেশ্য গলা ছাড়ে- কে আছো?
সঙ্গে সঙ্গেই সুইংডোর ঠেলে গরদের শাড়ি ব্লাউসের সঙ্গে ম্যাচ করে ফর্সা কপালে লাল টিপ, গলা ও খোপায় জড়ানো বেলিফুলের সুবাস ছড়িয়ে রুমে পা রাখে সেই সুন্দরী ও স্মার্ট মেয়েটি। তালুকদারের ডাকের অপেক্ষাতেই যেন ছিল। সত্যিই, সহজে চোখ ফেরানো যায় না এমন রূপসী। তালুকদার পরিচয় করিয়ে দিলেন- এ হলো আমার ওষুধ কোম্পানির স্টাফ মীনা হোসেন। ওকে আমি অবশ্য স্নেহ করে ডাকি, মীনা কুমারী। আর ইনি হলেন, ঢাকার একজন বড় সাংবাদিক রিয়াজুল ইসলাম, আমার ছোটভাই আবার বন্ধুও বলতে পারো।
পরিচয় পেয়ে মীনা হোসেন হাত তুলে আমাকে সালাম দেওয়ার সময় খুব সুন্দর একটা শব্দহীন হাসি উপহার দেয়।
- তালুকদার বলে ওঠেন- মীনা, আমাদের নাস্তা-পানি খেতে দাও।
- ওকে স্যার, এক্ষুণি দিচ্ছি।
পাশের ঘরে চলে গেলেও মিনার শরীর থেকে বেলি ফুলের সঙ্গে দামি পারফিউমের সুবাসে মৌ- মৌ সারা রুম। তালুকদার বলে ওঠেন- নাস্তাটা সেরেই আমরা কাজে বসে যাবো, কী বলেন সাংবাদিক সাহেব?
- সুযোগ পেয়ে এবার বললাম- সাবজেক্টটা কিন্তু এখনো আমার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না।
- হবে, হবে। অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই। সারাদিন তো পড়েই আছে।

সাত.
ভেতরে ভেতরে আমি সত্যিই অস্থির হয়ে উঠেছি। এখনো বিষয়ের মূল রহস্যটা জানা হলো না। তালুকদারের হেয়ালিপনায় ভাওয়াল গড়ের গজারি বনে তার রেস্ট হাউজের মনোরম পরিবেশও ভালো ঠেকছে না।
নাস্তার পর্ব চুকানোর পর আমি যখন এ ফোর সাইজের প্যাকেট থেকে নোটবুক-কলম বের করে নোট নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি তখনই দেখলাম শরীফউদ্দীন তালুকদার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেট প্যাকেট আর লাইটার বের করে আনেন। আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। আমি জানি, তিনি ধূমপান বিরোধী একটা সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মাঝে-মধ্যে ধূমপান বিরোধী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বক্তৃতা দেন। আমার মনোভাবআঁচ করেই তালুকদার একটা মুচকি হাসি ঝেড়ে বললেন- চলবে না একশলা?
- আপনি...
- হ্যাঁ, আমি কদাচিৎ সিগারেট টানি। বিশেষ বিশেষ কোনো মুহূর্তে। একসময় বলতে পারেন চেইন স্মোকারই ছিলাম। অভ্যাস কী আর পুরাপুরি ঝেড়ে ফেলা যায়। তবে ধূমপান না করাটা সবদিক থেকেই বেটার।
কথাটা শেষ করেই আমার দিকে সিগারেটের খোলা প্যাকেট বের বাড়িয়ে দেন। অনেকক্ষণ ধরে বলতে গেলে তালুকদারের কারণেই আমি ধূমপান করছিলাম না। যদিও পকেটে রাখা প্যাকেটের ভেতর পাঁচশলা মজুত আছে। টি-টেবিলের তলা থেকে অ্যাস্ট্রে বের করতে দেখে বুঝতে বাকি থাকে না, মতিঝিলের অফিসের মতো ভাওয়ালগড়ের এই রেস্টহাউজকে তালুকদার ধূমপানমুক্ত জোনে পরিণত করেননি। নিজেরটা ধরাবার আগে, লাইটার জ্বেলে আমারটা ধরিয়ে দেন।
শরীফউদ্দীন তালুকদারকে সিগারেটের ধোঁয়া উগড়াতে দেখে আমার পক্ষে কিছুটা অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। ভদ্রলোককে কখনো সিগারেট টানতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আঁচ করলাম, নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর বিষয় নিয়ে তিনি সংবাদ সম্মেলন করতে যাচ্ছেন। নইলে গিনেস বুকে নাম উঠাতে যাবেনই বা কেন?
- একগাল ধোঁয়া উগড়ে তালুকদার বলে ওঠেন- সাংবাদিক সাহেব, আপনাকে আমি অনেকটা ভাইয়ের মতো জানি এবং বিশ্বাস করি। এ কারণেই সংবাদ সম্মেলনের ভারটা আপনার ওপর ছেড়ে দিতে চাইছি।
- সেটা আমি জানি।
- বুঝলেন ব্যাপারটা সেনসেটিভ এবং নারীঘটিত। সত্যি কথা বলতে কী, আপনার ভাবী বেঁচে থাকলে এ ধরণের সংবাদ সম্মেলন করাটা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না।
- তাহলে বাদ দেওয়া যায় না?
- না। সত্য গোপন করা উচিত নয়। ওটা কাপুরুষদের কাজ। আর যাই হোক, আমি নিজকে কাপুরুষ ভাবি না।
- ঠিক আছে, তাহলে আমরা কাজ শুরু করতে পারি। আপনি বলুন, আমি নোট করছি।
-একটু দাঁড়ান। কথাটা বলেই তালুকদার কর্ডলেস কলিংবেলের বোতাম টিপলেন। ফের বেলিফুলের ঘ্রান মিশ্রিত পারফিউমের সুবাস ছড়িয়ে মিনা হোসেনের প্রবেশ। তালুকদার বললেন- জানালাটা খুলে দাও। ডানদিকে জানালার ভারী পর্দা সরিয়ে থাই গ্লাসের পাল্লা ঠেলে দিতেই বাইরে ঝলমলে রোদ যেন স্বস্তির ভাব ছড়িয়ে দেয়। খানিকটা দূরে গজারি গাছের সারি, গাঢ় সবুজ পাতা।
তালুকদার জিজ্ঞেস করলেন- হাল্কা ড্রিঙ্ক চলবে? আমি মাথা নাড়াতেই ফের বললেন- ওহ্ হো, আপনার তো আবার এই অভ্যাস নেই। খুব ভালো। আমি অবশ্য মাঝে মাঝে করি।
বুঝলেন না, বিদেশি বায়ারদের সঙ্গে বসতে হয়, তারপর বিশেষ বিশেষ সময় আছে। এই যেমন আমার এই রেস্ট হাউজে এলে।
- এবার আমি নোট নিতে শুরু করি, আপনি বলুন।
তালুকদার কিছু বলার আগেই মিনা বলে ওঠেন- স্যার, আমি ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা করছি।
- হ্যাঁ, করো।
মিনা হোসেন রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে এসির সুইচ অফ করে দিয়ে রুমের এক কোনে থাকা টেবিল ফ্যানটা ছেড়ে দেয়।
আবার তাগাদা দেই- এবার বলুন।
- আচ্ছা সাংবাদিক সাহেব, বক্তব্য শুরু করার আগে বিষয়টা কী সেটা নিয়ে একবার ডিসকাস করলে ভালো হয় না?
তালুকদারের কথায় সায় দিলাম- নিশ্চয় ভালো হয়।

আট
রীতিমতো চমকে উঠলাম। নিজকেই প্রশ্ন করলাম, এটা কী সম্ভব? একই পরিবার- বিশেষত বংশ লতিকার চার পরিবারের নারীর শয্যাসঙ্গী হওয়া- এতো অবিশ্বাস্য শুধু নয়, সীমাহীন ব্যভিচারও বটে! সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ব্যাপারটা তুলে ধরলে চারদিকে টি-টি পড়ে যাবে। তখন শরীফউদ্দীন তালুকদারের পক্ষে সমাজে মুখ দেখানোটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। এমন কী আইনি ঝামেলারও মুখোমুখি হতে পারেন। আমাদের দেশে ব্যভিচার দন্ডনীয় অপরাধ। উপরন্তু যে পরিবারের নারীদের সঙ্গে কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন তারা নিশ্চয় ছেড়ে দেবে না। অস্বীকারের পাশাপাশি মানহানি কিংবা মোটা অংকের আর্থিক ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলাও ঠুকতে পারে। ভেতরে



ভেতরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লাম। এ ধরনের বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের সঙ্গে নিজকে জড়ানোটা কী ঠিক হবে?
শরীফউদ্দীন তালুকদার লাইট ড্রিঙ্কস পছন্দ করেন। হুইস্কির বদলে বিয়ারের অর্ডার দেন। বিয়ারের গেলাসে চুমুক মেরে বলে ওঠেন- আসলে এটা আমার জীবনের এমন একটা ব্যাপার যা ঘটানোর কোনো পরিকল্পনাই আমার ছিল না, যাকে বলে ঘটনাচক্রে ঘটে গেছে। এ নিয়ে কোনো অনুশোচনা বা পাপবোধ আমার ভেতরে নেই। সাংবাদিক সাহেব, আপনি তো ভালো করেই জানেন আমি একজন সংস্কারমুক্ত মানুষ। তবে কি-না মানুষ প্রবৃত্তির দাস, সভ্যতার স্বার্থে সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। আমি এমনিতে একটু সাহসী আর পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল বলেই সেটা নিয়ন্ত্রণের বেড়া ডিঙ্গিয়ে গেছি। আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না- ব্যাপারটা কিন্তু স্পর্শকাতর।
- সেটা আমি জানি। ভীষণ রিঅ্যাকশন হতে পারে। এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে আমাকে চিরদিনের মতো দেশত্যাগ করতে হতে পারে। ভাগ্য খারাপ হলে জেলখানায় ঢুকতে পারি।
- তবে ঝুঁকি নিচ্ছেন কেন?
তালুকদার হাতের গেলাসে অবশিষ্ট বিয়ার এক চুমুকে শেষ করে মাথা নাড়িয়ে জবাব দেয়- সাংবাদিক সাহেব, সেটাই হলো কথার কথা। আমি চাই না, এমন একটা ঘটনা ধামাচাপা পড়ুক, আর সেটা যতই ন্যক্কারজনক হোক না কেন। জানেন, হঠাৎ একদিন আমার মনে হলো, আমি যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছি, সেটা বোধহয় নজিরবিহীন। এই দুনিয়ার আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি সিঙ্গাপুর থেকে গিনেস রেকর্ডস বুকের লেটেস্ট সংস্করণ কিনে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও নজির খুঁজে পেলাম না।
- তখন থেকেই বোধ হয় আপনাকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস বইয়ের নাম লেখাবার বাসনা পেয়ে বসে?
- ঠিকই ধরেছেন।
শরীফউদ্দীন তালুকদারের সঙ্গে এসব কথাবার্তার মাঝে আমি টের পেলাম, বিষয়টি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের প্রতি যে অনীহা আমার ভেতর মাথাচাড়া দিয়েছিল সেটা শুধু থিতিয়ে পড়েনি, একটা কৌতূহলও আমাকে পেয়ে বসছে। এমন ইন্টারেস্টিং, বলা চলে অভিনব ঘটনা বিস্তারিত জানার সুযোগ কী সহজে হাতছাড়া করা যায়! আদ্যপান্ত না জানা পর্যন্ত যেন স্বস্তি নেই। সত্যিই কোনো কোনো মানুষের জীবনে এমন বাস্তবতা আছে যা গল্পকে হার মানায়। আমি না বলে পারলাম না- বস্, ঘটনার সূত্রপাত কখন থেকে ঘটেছিল সেটা বলতে থাকুন, আমি নোট করছি।
- তাই হোক সাংবাদিক সাহেব। আমি আমার মতো বলে যাচ্ছি। পরে আপনি গুছিয়ে লিখবেন।
কথাটা বলেই তালুকদার চোখজোড়া বুজে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। হয়তো স্মৃতি হাতড়ান।
খানিকক্ষণ পর বললেন- আপনি হয়তো শুনেছেন, আমি গেরামের হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করি, তারপর ভর্তি হই আমাদের জেলা শহরের সরকারি কলেজে। আমার এক খালা, মায়ের চাচাতো বোনের বাসায় জায়গির জুটে যায়। সাধারণত যা হয়, আমার বেলায় তাই ঘটলো। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে এক গন্ডা বাচ্চাকে পড়ানো। কোন দিন একবেলা, কোনদিন আবার দুইবেলা পড়াতে হতো। খালু ছিলেন শহরের নামকরা মোক্তার। তার চেম্বারের পাশেই আলাদা ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা। খালার বাসার সামনে রাস্তার ঠিক উল্টাদিকে চৌধুরী ভিলা। অনেক জায়গা ঘিরে ছিল পুরনো আমলের দোতলা একটা বিল্ডিং। এখন আর নেই। সেখানে এখন মাল্টিস্টোরেড কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। আর উঠবেই বা না কেন, কমসে কম এক একর জমি জুড়ে ছিল চৌধুরী ভিলা। দোতলা ভবনের সামনে নানারকম ফুলের বাগান আর পেছনে বিরাট পুষ্করিণী। সেই পুষ্করিণী ঘিরে আম লিচু, জাম আর নাকেল গাছের সারি। কলাগাছের ঝোপও ছিল। ওরা খানদানি জমিদার। এতটা প্রভাবশালী যে ব্রিটিশ আমলেও হিন্দুরাই ওদের সমীহ করে চলতো। গনি চৌধুরী ছিলেন জেলা মুসলিম লীগের নেতা। খাজা নাজিমউদ্দিনকে তেমন পাত্তা দিতেন না, আবার সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে খাতির। আমি তাঁকে জীবিত দেখিনি, তবে লোকের মুখে শুনেছি- নাজিমুদ্দিনকে গদ্দার বলতেন বলেই পাকিস্তান হওয়ার পর মিনিস্টার হতে পারেননি। নাজিমুদ্দিন তার বদলে ফরিদপুরে ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবকে বেছে নেন.... এসব কথা শুনে না আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেই- তালুকদার সাহেব, আপনি তো অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক ইতিহাস বলা শুরু করেছেন।
- আ-রে সাংবাদিক সাহেব, আপনি যে সব লিখবেন, তা তো বলছি না। আমি আপনাকে প্রেক্ষাপট বোঝানোর চেষ্টা করছি।
- ঠিক আছে, বলে যান।
তালুকদার বলতে থাকেন- । আমার দৃঢ় ধারণা,, গনি চৌধুরী বেঁচে থাকলে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত থাকতেন কিংবা শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগ দিতেন। নিঃসন্দেহে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হতেন। কিন্তু ভাগ্যের উপর কারো হাত নেই। পাকিস্তান হলো আগস্ট মাসে আর গনি চৌধুরী শীতকালে, ধরেন ডিসেম্বর মাসের দিকে গেলেন পদ্মার চরাঞ্চলে পাখি শিকার করতে। সেখানেই মারা গেলেন হঠাৎ করে, সম্ভবত স্ট্রোক অথবা হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মদ্যপানের অভ্যাস ছিল, ডায়াবেটিস থাকাটাও অস্বাভাবিক ছিল না। যা হোক, আমি আর ডিটেলসে যাবো না, এই গনি চৌধুরীর তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন জেবুন্নিসা চৌধুরী। সাংবাদিক সাহেব, জীবনে দেশে-বিদেশে কম নারী দেখিনি। ওরকম সুন্দরী খুবই কম দেখেছি।
- তাই নাকি!
- জ্বি, একদম হলফ করে বলছি। যদিও তিনি ছিলেন গনি চৌধুরীর তৃতীয় স্ত্রী, আর বয়সেও বড়। চৌধুরী সাহেব তৃতীয় স্ত্রীকেই আমাদের জেলা শহরের ওই বিশাল বাড়িটা লিখে দিয়ে যান। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রী থাকতেন গেরামের পৈত্রিক বাড়িতে- সেটাও বিরাট জমিদার বাড়ি। যা বলেছিলাম, মিসেস জেবুন্নিসা চৌধুরীকে আমি যখন প্রথম দেখি তিনি বয়সের দিক থেকে ষাটোর্ধ্ব। চেহারায় গায়ের বর্ণের কী আভিজাত্য! আমি সেটা ঠিকমতো বর্ণনা করতে পারবো না। সাংবাদিক সাহেব, আপনাদের মতো আমি লিখতে পারিনা, তবে বইপড়ার অভ্যাস আছে। একবার মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ওপর একটা বই পড়েছিলাম। সেই বইতে বাদশাহর বেগমদের কথাও লেখা ছিল। যোধপুরী বেগমের নাম নিশ্চয় শুনেছেন! আগে তিনি শাহজাদা দারাশিকোর স্ত্রী ছিলেন। আওরঙ্গজেব ভাইকে হত্যা করে শুধু ময়ূর সিংহাসনে বসার পথ নিষ্কণ্টক করেননি, অপরূপ সুন্দরী ওই ভ্রাতৃবধূকেও হস্তগত করেছিলেন। আওরঙ্গজেব অবশ্য তঁকে খুব ভালোবাসতেন, বাদশাহর মৃত্যুকালে যোধপুরী বেগমই শয্যাপাশে ছিলেন। এই যোধপুরী বেগমের কাছে নাকি বয়স হার মেনেছিল, আমৃত্যু চিরবসন্তর মতো যৌবন ছিল তাঁর অঙ্গে। জেবুন্নিসা চৌধুরীর ক্ষেত্রেও ওই একই বাক্য খাটে, এটা আমি আবার হলফ করেই বলছি।
একটানা কথাগুলো বলে তালুকদার থামলেন। চুমুক দেন বিয়ারের গেলাসে। ক্ষণেক কিছু একটা ভেবে ফের বললেন- আমার সুরাইয়া খালা প্রায় যেতেন চৌধুরী ভিলায়। জেবুন্নিসা তাকে বেশ স্নেহ করতেন। খালার সুবাদেই মহিলার সাথে আমার পরিচয়, সেটা বুঝতেই পারছেন। সত্যি বলতে কি, প্রথম দিন তার মুখোমুখি হয়ে আমি থমকে গিয়েছিলাম। নারী যে অত সুন্দরী হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। তখনো বুঝতে পারিনি, এই জেবুন্নিসাকে ঘিরেই আমার জীবনে এমন একটা অধ্যায় রচিত হবে, যার দরুন আমাকে একদিন সংবাদ সম্মেলন ডাকতে হবে।

নয়.
একই পরিবারের চার প্রজন্মের নারী শয্যাশঙ্গী হওয়াটা আর যাই হোক, সাধারন ঘটনা নয়। অবিশ্বস্য ব্যাপারও বটে। আমার জানা মতে পৃথিবীতে নজিরবিহীন। আমি এই চল্লিশোর্ধ বয়সে কত বই, পত্র-পত্রিকা ঘেঁটেছি সিনেমা-টিভি দেখেছি কিংবা লোকজন জনের মুখে গাল-গল্পও কম শুনিনি। কোথাও এই অদ্ভুত ঘটনার হদিস পাইনি।
শরীফউদ্দিন তালুকাদর সবে ঝাঁপি খুলতে শুরু করেছিলেন। যদিও ধর্মীয় বা সামাজিক অনুশাসনে নিষিদ্ধ এবং প্রচলিত আইনের চোখে অবৈধ বিষয়টির পুরো অবয়ব আমার পক্ষে আঁচ করতে কোনো অসুবিধা হলো না। তবু পুরো বৃত্তান্ত জানার একটা আগ্রহ আমার ভেতরে এতটাই প্রবল, শেষটা না জানা পর্যন্ত তা লোপ পাবে বলে মনে হচ্ছে না।
রুমের জানালাটা খোলা। অথচ ঘরের ভেতরে এসি চলছে। আবার একটি টেবিল ফ্যানও অবিরাম ঘুরছে। বাইরে উজ্জ্বল রোদে গজারি গাছের গাঢ় সবুজ পাতা দারুণ জেল্লা দিচ্ছে।
আরেকশলা সিগারেট ধরালেন তালুকদার সাহেব। একগাল ধোঁয়া উগড়ে দিয়ে বলে ওঠেন- জেবুন্নিসা চৌধুরী আমার সুরাইয়া খালাকে মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। তার ভাগিনা বলে আমাকেও স্নেহের চোখে দেখতেন। আমি নানী বলেই সম্বোধন করতাম। আমার তখন উঠতি বয়স, সবে কলেজে ঢুকেছি। বুঝলেন সাংবাদিক সাহেব, এখনকার মতো এমন টাক ছিল না আমার, মাথা ভরা ঝাকড়া চুল...
তালুকাদর কথা না ফুরাতেই বলে বসলাম- আপনি এখনো যথেষ্ট হ্যান্ডসাম। বড় কথা হলো, আপনার বয়স বোঝা যায় না।
- তবে নিশ্চয় উঠতি যৌবনকালের মতো নয়। তরুণ বয়সে আমি প্রায় একটা ব্যাপার লক্ষ করতাম, মেয়েরা আমার দিকে ড্যারড্যার করে তাকিয়ে আছে। যাক সে সব কথা। জেবুন্নিসার প্রতি আমার যে একটা দুর্বলতা জন্মেছিল সেটা বোধহয় তিনি টের পেতেন। চৌধূরী ভিলায় ঝি-চাকরের অভাব ছিল না। তবু স্বামীর মৃত্যুর পর জেবুন্নিসা অনেকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন না। তার একমাত্র মেয়ে তখন করাচিতে থাকে স্বামীর সংসারে। যদিও ওই মেয়ে গনি চৌধূরীর ঔরসজাত নয়। জেবুন্নিসার আগের ঘরের। বুঝতেই পারছেন, জেবুন্নিসা কি ধরণের সুন্দরী হলে ঘরে দুই বিবি থাকতেও গনি চৌধুরী শুধু তার প্রেমেই পড়েননি, বিয়েও করেছিলেন।
- গনি চৌধুরীর আগের দুই স্ত্রীকে আপনি দেখেছেন নিশ্চয়, তারাও সুন্দরী ছিলেন?
- জানি না ভাই, তাদের দেখার সুযোগ আমার হয়নি।
- তারপর কী হলো?
- ওই যে সুরাইয়া খালার সঙ্গে বেশ খাতির থাকার সুত্র ধরে আমি প্রায় চৌধুরী ভিলায় যেতাম। জেবুন্নিসাকে নানী বলে সম্বোধন করতাম। আমাকেও তিনি খুব স্নেহ করতেন। বাড়িতে চাকর-বাকর থাকলেও অনেক সময় তার ফুট-ফরমায়েশ খাটতাম। বলতে পারেন তার পরিবারের একজন হয়ে ওঠেছিলাম। আসলে জেবুন্নিসার প্রতি এমন একটা দুর্বলতা আমার ভেতর জন্মেছিল, কে কী বললো বা ভাবলো- সেটা কেয়ার করতাম না। আর এটা আমার স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য বলতে পারেন। আমি এখনো যেটা সঠিক বলে মনে করি, সেটা করেই থাকি- কে কি বললো ডোন্ট কেয়ার। এই যে সংবাদ সম্মেলন করতে যাচ্ছি। অনেকেই শুনে হয়তো বলতে পারেন ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু তাতে আমার কিছুই যায় আসেনা। কে কি বললো তা হিসাবে ধরলে আমার পক্ষে এতদূর উঠে আসা কী সম্ভব ছিল? যাকে একদিন নেহায়েত কলেজে পড়াশোনার জন্য খালার

বাড়িতে জায়গির থাকতে হয়েছে। আপনিই বলেন, সাংবাদিক সাহেব।
- আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমরা আসল প্রসঙ্গ বাইপাস করছি।
- আমার কথায় অনেকটা সম্বিত ফিরে পাওয়ার ভঙ্গিতে শরীফউদ্দীন তালুকদার বলে ওঠেন- তাই তো! এতো ডিটেলসে যাবনা। আপনার টুকে নিতেও কষ্ট হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা হলো এই যে অবস্থাটা বোঝানোর জন্য এত কথা বলছি। আপনাকে তো বলেইছি যেটুকু দরকার ততটুকুই নোট করবেন।
- ঠিক আছে, আপনি বলে যান।
- একদিন হলো কি, বিকেল বেলায় কাজের ঝি পাঠিয়ে জেবুন্নিসা আমাকে ডেকে নিলেন তার বাড়িতে। আমাকে বললেন রেলস্টেশনের বুক স্টল থেকে কলকাতার 'দেশ' আর ঢাকার 'বেগম' পত্রিকা এনে দিতে। আর ফেরার পথে স্টেশন রোডের লাইব্রেরি থেকে একটা বই পাল্টে আনতে হবে। যদ্দুর মনে পড়ে, তারাশংকরের উপন্যাস ছিল সেটা- নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। জেবুন্নিসা উচ্চ শিক্ষিতা না হলেও বই পত্রিকা খুব পড়তেন। অফুরান সময় ছিল তার হাতে। সেদিন গরম পড়েছিল খুব। রেল স্টেশনের দিকে পা বাড়ানোর সময় রোদ ছিল আশেপাশে। কিন্তু বই-পত্রিকা নিয়ে ফেরার পথে দেখি আকাশ মেঘের দখলে চলে গেছে। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। চৌধুরী ভিলায় পা রাখতেই রাজ্যের ধুলাবালি উড়িয়ে তুফান বইতে শুরু করে। বুঝলেন সাংবাদিক সাহেব, মাঝে-মাঝে আমি ভেবে দেখেছি সেদিন যদি অমন করে কালবৈশাখি ঝড় না বয়ে যেতো, তাহলে আমার জীবনে এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটানো হয়তো সম্ভব হতো না...
আমি বিস্ময়ের ভান করলাম- তাই নাকি!
- আমার বিস্ময়কে পাত্তা না দিয়ে শরীফউদ্দীন তালুকদার বলতে থাকেন- আমি ব্যবসা বাণিজ্য করলেও মাঝে মাঝে আমাকে দার্শনিকের মতো চিন্তায় পেয়ে বসে। আমি ভেবেচিন্তে দেখেছি, তুচ্ছ-অতিতুচ্ছ ঘটনা মানুষের ওপর এমন প্রভাব ফেলে যে জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এই ধরেন সেদিনকার কথা। চৈত্র-বৈশাখ মাসে কালবৈশাখি ঝড় বয়ে যাওয়াটা তো আমাদের দেশে স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ওই ঝড় আমাকে নিয়ে যায় আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় জেবুন্নিসার এত কাছাকাছি যে ফেরার আর উপায় ছিল না। ঝড়ের প্রথম ঝাপটায় শহরের বিদ্যুৎ চলে যায়। জেবুন্নিসা থাকতেন দোতলায়। কাঠের সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় গিয়ে ওর রুমের বন্ধ দরজায় গিয়ে কড়া নাড়াই। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে দরজা খুলে দিতেই রুমের ভেতর মিটিমিটি জ্বলা মোমবাতি বাতাসের ঝাপটায় নিভে যায়। অমনি জেবুন্নিসা আমার একটা হাত আঁকড়ে ধরেন। বাইরে তখন ভীষন তুফান। তিনি বললেন, আমার না খুব ভয় করছে। আমি বললাম, ম্যাচ আছে, আলোটা জ্বালিয়ে দেব? কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিলেন, দরকার নাই। বুঝলেন সাংবাদিক সাহেব, তখন কী করে কী যেন হয়ে গেল। সেদিনের কথা ভাবতে গেলে আমার শুধু মনে হয়, আমি একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছিলাম। ব্যাপারটা তাহলে বুঝতেই পারছেন? আমি অনেকটা হাফ ছাড়ার মতোই বলে উঠলাম- সেটাই বুঝি আপনার জীবনে কোনো নারী দেহের প্রথম স্বাদ নেওয়া?
- তা কেন হবে! তার আগেই বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আউট অব বন্ড, মানে নিষিদ্ধ পল্লীতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। এক সময় এদেশের প্রতিটি শহরে এমন কি গঞ্জেও বেশ্যালয় ছিল। আজকাল আর নেই, উঠে গেছে।
তালুকদারের কথা শেষ হতেই মিনা হোসেন রুমে ঢোকে। হাতে একটা খালি ট্রে। টি-টেবিল থেকে খালি গেলাস, ক্যান, পিরিচ তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করে- স্যার, লাঞ্চ কখন করবেন?
- তাড়াহুড়ার দরকার নেই। আগে একটা- দুইটা বাজতে দাও।

দশ.
লাঞ্চ করতে দেরি হবে দেখে মিনা হোসেন আমাদের জন্য সিরামিকের এক পাত্রে ফল পাঠিয়ে দেয়। আঙুরের সঙ্গে আপেল-নাসপাতি। তালুকদারের অনুরোধে আঙুর মুখে পুরতেই টের পেলাম বেশ ঠান্ডা, ফ্রিজে ছিল সন্দেহ নেই।
- নোট ঠিকমতো লিখতে পারছেন তো?
- তালুকদারের প্রশ্নের জবাবে বললাম-
- আমার যতটুকু দরকার সেটা ঠিকই টুকছি।
- হ্যাঁ ভাই, আপনারা সাংবাদিক, অনেক কিছুই পারেন। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সাংবাদিকরা যেমন গটকে গড বানাতে জানেন আবার গটকেও গড বানাতে পারেন। অনেক ক্ষমতা আপনাদের। তাই তো সমঝে চলি। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, এদেশে সাংবাদিকরাই নাকি একমাত্র বিচারের উর্ধ্বে।
- আমি কিন্তু এখন সে বিতর্কে যেতে চাই না।



- তালুকদার সায় দেন- তা তো বটেই। তবে ব্রাদার, কোথায় যেন শেষ করেছিলাম। হ্যাঁ, জেবুন্নিসা চৌধুরী আমাকে যেন আকাশের চাঁদ হিসাবে পেলেন। গনি চৌধুরীর মৃত্যুর পর মহিলা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন, আমি তার সেই শূন্যতা অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছিলাম। আমাকে কতটা ভালবাসতেন জানেন! একবার আমাকে নিয়ে এলেন ঢাকায়। নিজেই ব্যাংকে গিয়ে তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে আমার নামে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিলেন আর বললেন, বছর শেষে যে ইন্টারেস্ট পাবো তাতেই আমার পড়াশোনার খরচ অনেকটা চালিয়ে নেওয়া যাবে। বুঝতেই পারছেন, আমাকে এতটাই ভালবাসতেন জেবুন্নিসা চৌধুরী।
- আপনাদের সম্পর্ক নিয়ে কোনো রিঅ্যাকশন, মানে লোকে কিছু বলাবলি করতো না?
- আচ্ছা প্রশ্ন করলেন তো আপনি। আমরা কী প্রকাশ্যে এসব করে বেড়াতাম? তবে রিঅ্যাকশনটা যে একেবারে হয়নি তা নয়। আমি তো আপনাকে বহুবার বলেছি, আমি ডোন্ট কেয়ার টাইপের লোক। কে কী বললো সেটা পরোয়া করলে তালুকদার আজ এ পর্যন্ত আসতে পারতো না।
- রিঅ্যাকশনটা কেমন ছিল?
- তেমন কিছু না। তবে জেবুন্নিসা চৌধুরীর এক কাজের ঝিয়ের কথা বলতে পারেন। তার নামটা কী ছিল জানা নেই, সবাই রহিমার মা বলে ডাকতো। মাঝ বয়সী ওই মহিলা যে মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ধরে ফেলেছিল সেটা ওর চোখের ভাষা থেকেই আমি বুঝতে পারতাম। ব্যাপারটা ওর ভালো ঠেকেনি। আমার সুরাইয়া খালার কানভারী করেছিল। খালা তো আমাকে ডেকে নিয়ে শোনালো ছিছিছি এই তোর রুচি। এটা তো কবিরা গুনাহ! আমি গিয়ে জেবুন্নিসার কাছে রহিমার মার নামে নালিশ করতেই বেচারার চাকরি ফিনিস- মিসেস চৌধুরী টাকা-পয়সা দিয়ে ওকে সোজা গ্রামে পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে আমিও খালার বাসা ছেড়ে হোস্টেলে গিয়ে উঠলাম, ততদিনে কলেজে আমার সেকেন্ড ইয়ার প্রায় শেষ, আইকম পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।
- জেবুন্নিসার সঙ্গে আপনার ওই সম্পর্ক কতদিন পর্যন্ত ছিল?
- তার মেয়েকে দেখা পর্যন্ত।
- মানে?
আমার বিস্ময় দেখে হো: হো: হো: করে এক চোট হেসে নেন শরীফউদ্দীন তালুকদার। আরেকশলা সিগারেট তুলে নিয়ে খোলা প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন-
- চলবে নাকি?
আমি যেন তৈরিই ছিলাম। একশলা ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া উগড়ে দেই।
তালুকদার বলে ওঠেন- এই যে আমি সিগারেট টানছি, এতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে? সত্যিই, আমাকে এখন সিগারেট টানতে দেখে কেউ কী বিশ্বাস করবে, গত সপ্তাহেই আপনাদের প্রেসক্লাবের উল্টাদিকে বিএমএ ভবন অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে ধূমপান বিরোধী লেকচার ঝেড়ে এসেছি?
- সিগারেট টানা নিয়ে কেউ আপনার কাছে কৈফিয়ত চাচ্ছে?
- তারপরও সাংবাদিক সাহেব, বিবেক বলে কথা আছে। এই যে সিগারেট টানছি আবার ধূমপান বিরোধী লেকচার দিচ্ছি, এটা ভন্ডামি না? তবে আপনাকে একটা সাফ কথা বলবো, আমাদের সমাজে ভন্ডামি করতে না পারলে উপরে উঠা বেশ কঠিন, যদিও আমার সঙ্গে আপনি একমত হবেন কিনা সেটা আপনার ব্যাপার।
না বলে পারলাম না- তালুকদার সাহেব, এখন কী বিতর্কের সময়? আপনি কিন্তু মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছেন।
অনেকটা স্বগতোক্তির মতো তালুকদার বলে ওঠেন- হ্যাঁ, জেবুন্নিসা চৌধুরীর সাথেও আমি ভন্ডামি করেছি। তার মেয়ের দিকে আমার নজর গেছে সেটা কিন্তু ঘুনাক্ষরেও টের পেতে দেইনি। আমি তখন কী করতে পারি? মেয়ে তো রূপের দিক থেকে মায়ের চেয়ে এক ডিগ্রি সরেস। তারপর বয়সের ব্যাপারটাও আছে। এমন সুন্দরী বেচারির জন্য আমার কিন্তু দুঃখ হতো, বিয়ে হয়েছিল তার ডাবল বয়সী এক লোকের সঙ্গে। ভদ্রলোক অবশ্য খানদানি পরিবারের ছেলে, মুর্শিদাবাদের নবাবরা ওদের আত্মীয়। কী বলবো, পৃথিবীতে কিছু কিছু নারী আছে যাদের রূপ-যৌবন পুরুষকে শুধু মুগ্ধই করে না, প্রলুব্ধও করে। প্রাচীন গ্রিসের হেলেন ছিলেন সেরকম নারী, যার জন্য ট্রয় নগরী পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল - আপনি সেটা নিশ্চয় জানেন। আমার মতে লায়লা, মানে মিসেস চৌধুরীর মেয়ে তেমনটাই ছিলেন। মায়ের চেয়ে রূপসী, উপরন্তু যৌবনবতী। চেহারায় আভিজাত্যের ছোঁয়া। একমাথা কোকড়া চুল, চওড়া কপাল, একজোড়া কালো ডাগর চোখ, যেমন তার গায়ের রঙ তেমনি খাড়া নাক, টুকটাক পাতলা ঠোঁট, চিবুক-থুতুনি, গলা, বাহু- কোথাও এক রত্তি খুঁত নেই। ফিগারও মাপা। সাংবাদিক সাহেব, আমার কথা শুনে

অনুমান করতে পারছেন লায়লা কেমন সুন্দরী ছিলেন। আমি অবাক হই, কেন যে লায়লার জন্য একটা যুদ্ধ বাধেনি।

- আমার মনে হচ্ছে, আপনি সত্যিই ওর প্রেমে পড়েছিলেন।

- তা তো বটেই, বলতে পারেন ওর রূপে মজে গিয়েছিলাম।

- জেবুন্নিসা চৌধুরী কী ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন?

- আমি অবশ্য সে সুযোগ দেইনি। তিনি টের পেয়েছিলেন কিনা কখনো জিজ্ঞেস করিনি। বড় কথা হলো, লায়লার সঙ্গে পরিচয়ের আগেই আমি ডিস্ট্রিক টাউনের কলেজ ছেড়ে ঢাকায় চলে আসি। ভার্সিটিতে ভর্তি হই। থাকতাম এসএম হলে। লায়লার কোলে তখন দুই তিন বছরের ফুটফুটে চাঁদের মতো মেয়ে। নাম অ্যানি। ওরা করাচিতে থাকতো। ঢাকার বক্সিবাজারে লায়লার এক চাচার বাড়ি ছিল। জেবুন্নিসা চৌধুরী লায়লার চাচার বাড়িতে যেতেন না। সম্ভবত গনি চৌধুরীকে বিয়ে করার কারণে। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখেন, ভাবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই অথচ তার মেয়েকে খন্দকার সাহেব, মানে লায়লার চাচা আপন মেয়ের মতোই দেখতেন। মিসেস চৌধুরীর আপত্তি সত্ত্বেও চাচাই লায়লাকে বিয়ে দেন।

কথাগুলো বলে শরীফউদ্দীন তালুকদার যেন একটু দম নেন- সাংবাদিক সাহেব, আপনি বোধহয় ভাবছেন আমি আবার ডিটেলসে গিয়ে ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলেছি। আপনার নোট নিতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?

- না, না, আপনি বলে যান। যতটুকু দরকার আমি টুকে রাখছি।

তখনই সেলফোন হাতে নিয়ে রুমে পা রাখেন মিনা হোসেন। স্যার, টেক্সটাইল মিলের জিএম স্যার কী একটা জরুরি প্রয়োজনে আপনাকে খুঁজছেন। আপনার ফোন বন্ধ দেখে আমাকে ফোন করলেন।

মহাবিরক্ত হয়ে মিনার হাত থেকে সেল ফোন নিয়ে ডানকানে ঠেকিয়ে তালুকদার বলে ওঠেন- হ্যালো, মজনু সাহেব কী খবর বলেন! কী বললেন, কাঁচপুরের কারখানায় আগুন লেগেছিল? শর্ট সার্কিট থেকে। এখন কী অবস্থা? ভালো। তেমন একটা ক্ষতি হয়নি তাহলে! ঠিক আছে, পরে কথা হবে- আমি এখন বিশেষ কাজে ব্যস্ত। আমার ফোন অফ থাকলে মিনাকে কল করবেন। আমি এখন রাজেন্দ্রপুরের রেস্টহাউজে আছি।

সেল ফোন মিনার হাতে ফিরিয়ে দেন শরীফউদ্দীন তালুকদার। আমি প্রমাদ গুনলাম, ছন্দপতন বুঝি ঘটে গেছে। শত হলে কারখানায় আগুন লেগেছে। ব্যাপারটা সিরিয়াস। কয়েক বছর আগে তালুকদার আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন কাঁচপুরে তার কারখানায়। স্পিনিং মিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। বস্ত্রমন্ত্রী চিফ গেস্ট ছিলেন। তালুকদার না বললেও আমি বুঝতে পারি, ওই কারখানাতেই অগ্নিকান্ড ঘটেছে।

এগারো

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হলো। শরীফউদ্দিন তালুকদার ডিক্টেশন দেওয়ার মুড হারিয়ে ফেলেন। আমাকে একটু অপেক্ষা করার কথা বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। হয়তো খোঁজ খবর নিতে। ফ্যাক্টরির জিএমের কথায় আশ্বস্ত হতে পারছেন না। আমি অবশ্য তাকে দোষ দেব না। তালুকদার তো আর নিরো নন, রোম নগরী জ্বলবে তিনি বাঁশি বাজাবেন। তালুকদার বেরিয়ে যাওয়ার পর প্যাড আর কলম রেখে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। এসি চলছে দেখে গরমটা তেমন পাত্তা পাচ্ছে না। যদিও সিগারেটের ধোঁয়া নির্গমনের জন্য একটা জানালা খোলা। পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। রেস্ট হাউজের বাউন্ডারি দেয়ালের ওপাশে ভাওয়াল গড়ের সবুজ গাছ-গাছালি। বেশুমার। দিনটা সত্যিই চমৎকার। রোদে ঝলমল করছে। গাঢ় নীল আমাশে কয়েক পশলা মেঘের গাঢ় আঁচড়ল। সকালে ঢাকায় যে মেঘলা আর গুমোটভাব ছিল সেটা এখানে নেই। একটু আগেই সিগারেট টেনেছি। তবু চান্স পেয়ে ধূমপানের ইচ্ছেটা চাগাড় দেয়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, টি-টেবিলের ওপর তালুকদারের রেখে যাওয়া সিগারেটের সোনালী প্যাকেট, পাশেই গ্যাস লাইটারটা পড়ে আছে। সোফায় ফিরে গিয়ে একশলা সিগারেট ধরালাম। তালুকদার সত্যিই আজব লোক! নানাদিক সামলে চলার একটা অসাধারণ গুণ ওর ভেতর আছে। আমার পরিচিতদের মধ্যে যারা ওকে চেনে, তাদের কেউ কেউ আড়ালে আবডালে ওর সমালোচনা করে। বড় ধূর্ত বলে। এই তো মাস কয়েক আগে আমার এক সাংবাদিক বন্ধু, হয়তো কোনো স্বার্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ার পর প্রকাশ্যেই বলে বেড়ায়- তালুকদার আস্ত একটা টাউট। আমি কিন্তু সেভাবে মূল্যায়ন করবো না। আমার দৃষ্টিতে কেউ ফেরেশ্‌তা নন, দোষে-গুণে মানুষ। হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে আমি তারিফ করবো- সত্য প্রকাশের মতো সততা তালুকদারের আছে। যে বিষয়ে তিনি আজ আমর সঙ্গে সিটিং দিচ্ছেন, বাজি রেখেই বলতে পারি আমাদের এই সমাজে ওর জায়গায় অন্য কেউ হলে একাজটা কখনোই করতেন না।

আমার সিগারেট ফুরিয়ে আসার আগেই রুমে পা রাখলেন শরীফউদ্দীন তালুকদার। সোফায় গা একটু এলিয়ে দিয়ে বললেন- বুঝলেন সাংবাদিক সাহেব, আপনারা তো বলেন, ব্যবসায়িরা কত আরামে থাকে। এখন নিজেই দেখছেন, কত জামেলা। আপনাকে নিয়ে এখানে এসে একটু মনের কথা খুলে বলছি আর কিনা আজই ঘটলো দুর্ঘটনা। যাক, ফাড়াটা অল্পতেই কেটে গেছে। তা ভাই, লাঞ্চ সেরে না এখন থেকেই শুরু করবো?

- লায়লার প্রসঙ্গটা সেরে ফেলেই আমরা না হয় লাঞ্চে বসি।

- আপনি যখন বলছেন, তাই হবে, কোথায় যেন শেষ করেছিলাম?

একনজর প্যাডের নোট দেখে বললাম- ওই যে মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও চাচাই লায়লাকে বিয়ে দিয়েছিলেন।

- হ্যাঁ। তবে আমার সঙ্গে মিসেস চৌধুরীর পরিচয়ের আগেই লায়লার বিয়ে হয়েছিল, সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। এখানে আরেকটা কথা বলা দরকার, গনি চৌধুরীর সঙ্গে জেবুন্নিসার বিয়ে লায়লার চাচাসহ আত্মীয়-স্বজনরা সহজভাবে নিতে পারেননি। তারা মেয়েকে নিজেদের কাছে রেখে দেন। পরে খানদানি ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র পেয়ে বিয়ে দিয়ে দেন। যদিও পাত্র বেশ বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু তাঁর খানদান, উচ্চশিক্ষা ও কেরিয়ারের কাছে বয়সটা যেন কিছুই নয়। বুঝলেন, আইসিএস অফিসার ছিলেন- যাকে বলে অবিভক্ত ভারতের সরকারি আমলা। তবু আপত্তি করেছিলেন মিসেস চৌধুরী। কিন্তু লায়লার চাচারা তার আপত্তি কেয়ার করবেন কোন দুঃখে। বিয়ের পর লায়লা চলে যায় করাচিতে, স্বামীর কাছে।

- আপনি কখনো করাচিতে গিয়েছিলেন?

- সেটা তখন নয়, আরো পরে গেছি। যা হোক, বিয়ের বেশ কিছু বছর পর মেয়েকে নিয়ে লায়লা বেড়াতে আসে মায়ের কাছে। বুঝতেই পারছেন সাংবাদিক সাহেব, আমার তখন উঠতি বয়স। দেখতে-শুনতে মন্দ ছিলাম না। সেটা মেয়েদের ড্যাবড্যাবে করে আমার দিকে তাকানোর ভেতরই টের পেতাম।

- আপনি এখনো যথেষ্ট হ্যান্ডসাম।

আমার কথাটা শুনে তালুকদার একটা লাজুক হাসি ঝেড়ে বলেন- সত্যিই বলছেন তো না তেল মারছেন? জবাবটা না দিয়ে পারলাম না- তালুকদার সাহেব, আর যাই হোক, আমি কাউকে ওয়েলিং করার পাত্র নই।

- সেটা জানি বলেই তো আপনাকে পছন্দ করি। বাদ দেন ওসব, এবার আসল কথায় আসি। লায়লাকে প্রথম দেখে আমি থমকে গিয়েছিলাম। তার নজরও সরছিল না আমার ওপর থেকে। মিসেস চৌধুরী তার মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় বললেন, এ হলো শরীফ, খুব ভালো ছেলে। আমাকে নানী বলে। আপনাকে সত্যি করে বলছি, জেবুন্নিসার মুখে নানী শব্দটা শুনে আমি সেদিন বেশ লজ্জাই পেয়েছিলাম ভেতরে ভেতরে। সেটা হয়তো আমার মুখ থেকে আঁচ করতে পেরেই লায়লা যেন আমাকে উদ্ধার করলো, মাকে তুমি নানী বলো ভালো কথা, আমকে কিন্তু খালাম্মা বলবে না, বলবে আপা। আমি তোমার চেয়ে বয়েস খুব একটা বড় হবো না। প্রথম দিনের আলাপেই বুঝে নিয়েছিলাম লায়লা বেশ স্মার্ট মেয়ে। আর হবেই বা না কেন? কলকাতার লেডি ব্রাবোনের ছাত্রী ছিল। ওটা মেয়েদের খুব নামী দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নাম শুনেছেন?

- হ্যাঁ, শুনেছি। এই সুযোগে বলে ফেললাম- এত ডিটেলসে না গিয়ে শর্টকার্টে ব্যাপারটা সেরে ফেললে হয় না?

শরীফউদ্দীন তালুকদার জবাব দেন- সেটা তো আমিও চাই। কিন্তু হয়ে ওঠে না। কথার পিঠে কথা এসে যায়। আর ব্যাপারটা তো খুবই জটিল এবং আমি নিশ্চিত যে কারো জীবনে এমনটা আর ঘটেনি। সে কারণেই গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে আমার নাম থাকা চাই। কী বলেন?

- আপনার যুক্তি অবশ্য ফেলনা নয়।

- শুধু আপনি কেন, সবাই একথা বলবে। হ্যাঁ, লায়লা কিন্তু জানতো না তার মায়ের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। তার ধারণা ছিল, একই টাউনে মা প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকেন, আপনজন কেউ নেই- তাই আমকে পেয়ে খুব স্নেহ করেন। আমিও প্রকৃত ব্যাপারটা লায়লাকে বুঝতে দেইনি। মিসেস চৌধুরী একদিন আবেগঘন মুহূর্তে আমকে কি বলেছিলেন শুনবেন? তিনি যদি নানী না হতেন আর গনি চৌধুরীর সম্পত্তি ভোগ না করতেন, তাহলে আবার বিয়ে করতেন। পাত্র হতাম আমি। সমাজের কথা ভেবে তিনি দুজনের বয়সের ব্যবধানের দিকে তাকাতেন না।

তালুকদারের কথার ফাঁকে না বলে পরলাম না- বিয়ে করাটাই উত্তম ছিল। ধর্মীয় মতে সেটাই সঠিক ছিল। অনেকেই তো বয়স্কা নারীকে বিয়ে করে। লিজ টেলর শেষ বয়সে এসেও কত কম বয়সের পাত্রকে বিয়ে করেছিলেন।

- আ-রে সাংবাদিক সাহেব, আপনার আক্কেলটা কী! কোথায় আগরতলা আর কোথায় চৌকিরতলা! আর মিসেস চৌধুরীকে বিয়ে করলে আমার পক্ষে এই রেকর্ড গড়া সম্ভব হতো! আপনাকেই কী আমি ডাকতাম? তার চেয়েও বড় কথা হলো মায়ের স্বামী মানে সৎ পিতার কাছে লায়লা কখনোই ধরা দিতো না। সেটা আমিও নিশ্চিত করেই বলতে পারি।

- হ্যাঁ, তালুকদার সাহেব, আপনার কথাই ঠিক। এবার লায়লার পর্বটা শর্টকাটে সেরে ফেলুন। দুপুরের খাবারের সময় তো ঘনিয়ে এসেছে।

- আমিও সেটা চাই। লায়লা সেবার আমাদের ডিস্ট্রিক টাউনে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসে। আমিও তাকে ঢাকা পর্যন্ত এগিয়ে দেই। তখন তো বাই রোডে ঘন্টায় ঘন্টায় বাসের ব্যবস্থা ছিল না। ট্রেনে চড়েই ঢাকায় আসতে হতো। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। এক কুপে লায়লা, তার ছোট্ট মেয়ে আর আমি। বুঝতেই পারছেন, জেবুন্নিসা কতটা বিশ্বাস করলে আর ভালবাসলে তাঁর সেয়ানা-সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমাকে ঢাকায় পাঠাতে পারেন। যদিও ট্রেনে কোনো আপত্তিকর কিংবা শারীরিক ব্যাপার-স্যাপার যাই বলেন আমাদের মধ্যে ঘটেনি। শুধু আলাপ। ঘন্টার পর ঘন্টা। এক ফাঁকে আমার হলের ঠিকানা টুকে নেয় লায়লা। আমাকে করাচির ঠিকানা দিয়ে বললো- আমি আপনার চিঠির অপেক্ষায় থাকবো কিন্তু। জানেন সাংবাদিক সাহেব, আমার জীবনে সেটা ছিল সেরা মুহূর্তগুলো একটি। এখনো ভাবলে শরীরের

লোম দাঁড়িয়ে যায়।
কথাগুলো বলে শরীফউদ্দীন তালুকদার চুপ মেরে গেলেন। কী যেন ভাবতে থাকেন। আমি নিশ্চিত, ট্রেনের সেই মুহূর্তগুলোর কথাই ভাবছেন তিনি। মেইল ট্রেনের ইঞ্জিনের লম্বা হুইসেলও হয়তো শুনতে পাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর টি-টেবিলের ওপর থেকে প্রায় খালি হয়ে আসা বিয়ারে কাচের মগটটা হাতে তুলে নেন। এক চুমুকেই বাকিটা শেষ করলেন। আরেক শলা সিগারেট ধরালেন। আমর কাছে ক্যামেরা থাকলে তালুকদারের এই মুহূর্ত ঠিকই ধারণ করে রাখতাম। আর ওই ফটোর নিচে 'একজন ধূমপান বিরোধী ব্যক্তির একান্ত মুহূর্ত' শুধুমাত্র এই ক্যাপশনটুকু লিখে ছেড়ে দিলে রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে যেত। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার ঠোঁটের কোণে হাসি জাগান দিতেই তা তালুকদারের নজরে ধরা পড়ে-
কী সাংবাদিক সাহেব, মিটিমিটি হাসছেন যে?
- ভাবছি, আপনার এই ধূমপানের কথা। অনেক অনুষ্ঠানে আমি আপনার ধূমপান বিরোধী সুন্দর সুন্দর লেকচার শুনেছি কিন্তু!
- আ-রে ভাই, মানুষ তো আর মেশিন নয় যে নির্দিষ্ট ছকে চলবে। একটু স্ববিরোধিতা থাকবেই। আমি একবার এক বিখ্যাত মওলানা সাহেবকে রোজার দিনে ভোজদার দেখে তাকে ধরেছিলাম। তিনি উল্টা আমাকে হাদিস শোনালেন, মুর্খের সারারাতের এবাদতের চেয়ে আলেমের নিদ্রা উত্তম। আসলে মানুষের প্রকৃতি বড়ই জটিল। ওসব থাক এখন, আসল কথায় আসছি। ইচ্ছা থাকলেও আমি কিন্তু লায়লাকে প্রথমে চিঠি লিখি নাই। একে তো চিঠি লেখার অভ্যাস আমার ছিল না, তারপর সাহসও পাচ্ছিলাম না, বলতে পারেন জেবুন্নিসার মেয়ে ভেবে। মহিলা আমার পক্ষে ওই ধরণের চিঠি লেখার কথা জানতে পারলে নির্ঘাত আঘাত পেতেন। সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। একদিন ক্লাস শেষে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে হলে ফিরেছি। দেখলাম আমার নামে আসা চিঠি। হলুদ খামের ওপর মুক্তার মতো ঝকঝকে ইংরেজি অক্ষরে লেখা ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারলাম, ওটা লায়লার চিঠি। সে- কি উত্তেজনা আমার বুকের ভেতর। সাংবাদিক সাহেব, আপনার কাছে ভাষায় বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। অনুমানে নিশ্চয় আমার তখনকার অবস্থা বুঝতে পারছেন!
-হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ওই চিঠিতে লায়লা নিশ্চিয় আপনাকে প্রেম নিবেদন করেছিল?
আমার প্রশ্ন আমলে না নিয়েই তালুকদার বলতে থাকেন- লায়লা লিখেছিল আমার চিঠির অপেক্ষায় থাকতে থাকতে শেষে নিজেই লিখতে বাধ্য হলো। আমাকে বলেছিল, বাংলায় চিঠি লিখতে। তার স্বামী ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় দুই-একটা কথা বলতে পারলেও পড়তে জানেন না। তারা ঢাকার লোক হলেও মূলত উর্দুভাষী। যদিও ভদ্রলোক পড়াশোনা করেছেন ইংলিশ মিডিয়ামে। লায়লার অভয় পেয়ে আমি চিঠির জবাব দিলাম। চিঠি লিখতে গিয়ে সংকোচ একটাই ছিল মিসেস চৌধুরী যদি কখনো জানতে পারেন তাঁর মেয়েকে প্রেমপত্র লিখছি তাহলে ব্যাপারট কেমন দাঁড়াবে! আমাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক বলবেন। তবে লায়লাকে দ্বিতীয় চিঠি লেখার সময় সেই সংকোচ আর ছিল না। ওকে তখন সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছি। চিঠিতে একথাও লিখলাম, তোমাকে লেখার পর শুধু মনে হচ্ছে আমার জন্ম যেন কেবল তোমার জন্যই। আর লায়লার চিঠি পড়ে বুঝতে পারতাম, বিত্ত-বৈভবও প্রতিষ্ঠিত স্বামী পেলেও তার মনে শূন্যতা রয়ে গেছে। এই চিঠি আদান-প্রদানের মাঝেই একদিন মনে হলো, বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের ডিস্ট্রিক টাউনে যাওয়া হচ্ছে না। জেবুন্নিসাকে একবার দেখে আসা উচিত। মহিলা আমার জন্য যা করেছেন সেটা কোনো আত্মীয়ও করেনি। এমনকি বয়স আর সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নিজকে পর্যন্ত সমর্পণ করেছেন। জানি, আমাকে খুব বিশ্বাস করেন। তবু দেখা না করলে তিনি হয়তো ভাবতে পারেন, ছেলেটা অকৃতজ্ঞ। সাংবাদিক সাহেব, আমি যখনকার বলছি সেটা তথ্য প্রযুক্তির যুগ ছিল না যে যখন ইচ্ছা তখন মোবাইল ফোনে কিংবা ইন্টারনেটেচ মিসেস চৌধুরীর খোঁজ নেব। তখন জরুরি সংবাদ পাঠানো হতো টেলিগ্রাম করে।
- সেটা আমার জানা আছে। আমার বাবা তো টিএন্ডটিতে চাকরি করতেন, টেলিগ্রাফ অপারেটর ছিলেন।
- শুনুন সাংবাদিক সাহেব, বাস্তবে এমন কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে যা গল্প-উপন্যাসকেও হার মানায়। আমি যেদিন ডিস্ট্রিক টাউনে পা রাখলাম, সেদিন তাই ঘটেছিল। একেবারে কাকতালীয়। আর সেটা না ঘটলে আজকে হয়তো আপনাকে আমার মুখোমুখি বসতে হতো না। এই যে আমার জীবনে অদ্ভুত রেকর্ডের কথা বলছি, সেটাও ঘটতো না।
তালুকদারের বয়ান চারদিকে গাঢ় কুয়াশার মতো লুটানো হেঁয়ালির ভেতর যেন আমাকে ঠেলে দেয়। খানিকটা বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞেস করলাম- সেটা আবার কী ঘটেছিল?
আমার প্রশ্নের জবাব পাবার আগেই দরজার ওপাশে টোকার পর পরই মিনা হোসেনের গলা-মে কাম ইন স্যার?
তালুকদার সাড়া দেন- হ্যাঁ, আসো।
মিনা হোসেন রুমে প্রবেশ করেই বললো- স্যার, লাঞ্চ রেডি। ইচ্ছে করলেই খেতে পারেন।
আমার দিকে তাকিয়ে তালুকদার বলে ওঠেন- কী বলেন সাংবাদিক সাহেব, লাঞ্চটা সেরেই না হয় আমরা আবার বসি।
বেলা কম হয়নি। আমার ক্ষিদে তেমন একটা চাগাড় না দিলেও বুঝতে পারলাম, লাঞ্চের আগে লায়লার পর্ব শেষ হচ্ছে না। আপত্তি করলাম না- ঠিক আছে, তাই হোক।
আমার সম্মতি দেখে মিনা হোসেন খুব সুন্দর একটা হাসি উপহার দিতে ভুললো না।

বারো

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যা হয়, আলসেমি খানিকটা পেয়ে বসে। তবে কর্তব্যের কাছে সেটা সচরাচর পাত্তা পায় না। ভাওয়ালগড়ের ভেতর শরীফউদ্দীন তালুকদারের এই রেস্টহাউজে পিকনিক কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে আসিনি। এসেছি কাজে। যদিও এটা আমার পেশাগত কাজের অংশ কিনা সেদিকে নজর না দিয়ে বলতে পারি, সংবাদ সম্মেলনটা সফলভাবেই সম্পান্ন করতে পারলে তালুকদারের কাছ থেকে একটা খাম পাবো। খামের ভেতর চেক অথবা ক্যাশ থাকবে। টাকার অংকটা কত হবে- সেটা জানা নেই। এদিক থেকে অবশ্য তালুকদার লোক ভালো। পুষিয়ে দেবেন।
লাঞ্চ সেরে আমরা আগের রুমে ফিরে এলাম। একশলা সিগারেট ধরিয়ে তালুকদার আমাকে বললেন- সাংবাদিক সাহেব, কোত্থেকে শুরু করতে হবে এবার বলেন।
রাইটিং প্যাডে টুকে রাখা নোট একনজর দেখে বললাম- ওই যে আপনাদের ডিস্ট্রিক টাউনে যেদিন গেলেন, সেদিন যেন কী একটা ঘটনা ঘটেছিল?
- হ্যাঁ, মনে পড়ছে সেই ঘটনা। আমি রাতের ট্রেনে গিয়েছিলাম। তখন বর্ষাকাল, তারপর সেবার বন্যা হয়েছিল। ট্রেন খুব ভোরে পৌঁছার কথা। কিন্তু পৌঁছলো কয়েক ঘণ্টা লেটে। কোথাও কোথাও বন্যার পানি ধেয়ে আসছিল রেললাইনের উপর দিয়ে। ওখানে পা রেখেই শুনতে পেলাম, জেবুন্নিসাকে সাপে কেটেছে আগের রাতে। তিনি আর বেঁচে নেই। আমাদের দেশে সাধারণত বর্ষাকালেই সাপের উৎপাত বেড়ে যায়। আর সেবার তো বন্যা, নিচু এলাকা সবডুবে গিয়েছিল। তারপর চৌধুরী ভিলার বাগানের ঝোপ-ঝাড়ে সাপ থাকাটা বিচিত্র কিছু ছিল না। তবে মিসেস চৌধুরীকে সাপে কামড়েছিল বাড়ির দোতলায় তার বেডরুমে। বিছানায় তিনি শোয়া ছিলেন। মশারির বাইরে থেকে সাপ ছোবল দেয়। কী আশ্চর্য ঘটনা, তাই না সাংবাদিক সাহেব!
আপনার তো মনে হতে পারে, জেবুন্নিসার মেয়েকে পাওয়ার জন্য আমিও ঢাকা থেকে রওনা দেওয়ার আগে কাল কেউটে সাপটাকে চালান করে দিয়েছিলাম। মাঝে-মধ্যে ভাবি, এমন থিম নিয়ে চমৎকার একটা ম্যাজিক রিয়ালিজম নভেল লেখা হতে পারে। খানিকটা অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম- ম্যাজিক রিয়ালিজম সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে?
প্রশ্নটা শুনে হো: হো: করে হেসে ওঠেন তালুকদার- থাকবেনা কেন? গ্যাব্রিয়েল মারকুয়েজ তো আমার প্রিয় লেখক। শুনেন সাংবাদিক সাহেব, ব্যবসায়ী হলেও পাঠক হিসেবে এই বান্দাকে আন্ডারস্টিমেট করবেন না।
- আপনি তো দেখছি, ক্রিকেটে না হলেও বাস্তব জীবনে প্রকৃত অর্থেই একজন অল-রাউন্ডার।
-ধন্যবাদ আপনাকে এই মন্তব্যের জন্য। তবে সত্যিই অলরাউন্ডার কিনা হলফ করে বলতে পারবো না। একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে আমাকে সবব্যাপারেই খোঁজ-খবর রাখতে হয়। আর বই পড়াটা আমার একটা নেশা। যদিও আজকাল পড়ার সময়- সুযোগ তত একটা পাই না। যা হোক, মিসেস চৌধুরীর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে আমি সত্যিই শোকাভিভূত হয়েছিলাম। তিনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। একে তো বর্ষাকালের ভ্যাপসা গরমের দিন, তারপর মফঃস্বল শহরে লাশ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গনি চৌধুরীর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলে মিউনিসিপ্যালেটি গোরস্তানে মিসেস চৌধুরীর লাশ দাফন করেছিলাম। এক ফাঁকে ওখানকার টিএন্ডটি অফিসে গিয়ে লায়লাকে তার মায়ের মৃত্যুর খবর জানিয়ে টেলিগ্রাম করি। টেলিগ্রাম পেয়ে লায়লা দেরি করেনি। তিনদিনের মাথায় স্বামী মিস্টার কোরেশীকে নিয়ে চলে আসেন। কোরেশী সাহেব পদস্থ আমলা, বড় ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। দুদিন থেকে ফিরে যান করাচিতে। মেয়ে অ্যানিকে নিয়ে লায়লা মায়ের চল্লিশা পর্যন্ত ছিল। ঢাকায় বেশিরভাগ সময় থেকেছে। মায়ের

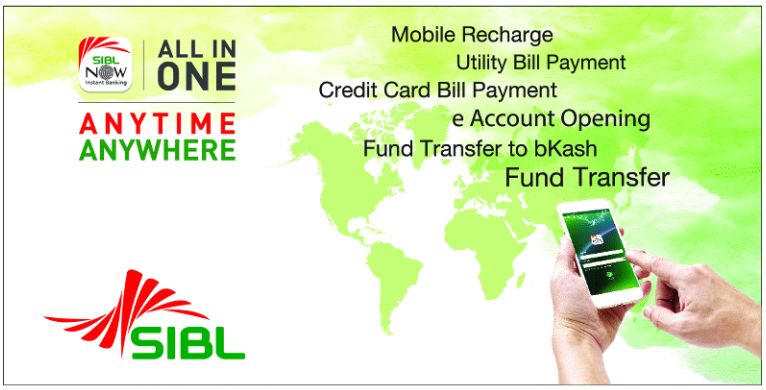

বাড়িতে গেলে আমাকেও তার সঙ্গে যেতে হতো। চৌধুরী ভিলাতেই আমার রাতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বুঝতেই পারছেন সাংবাদিক সাহেব ওখানে রাত কাটাবার অর্থটা কী হতে পারে? ফার্সিতে একটা কথা আছে না- ইশারায় কাফি আকল মন্দ! আমি অবশ্য অবাক হয়েছিলাম লায়লার একটা কথা শুনে। এক রাতে গভীর আশ্লেষের সময় সে আমাকে বলেছিল- জানো শরীফ, তুমি না থাকলে মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়েও আমি এতদূর আসতাম না। এসেছি শুধু তোমার টানে।

কথাটা শেষ করে তালুকদার বেশ তৃপ্তি সহকারে সুখটান দিয়ে সিগারেটের শেষাংশ টি-টেবিলের ওপর রাখা অ্যাস্ট্রেতে গুঁজে দেন। এই ফাঁকে আমিও একশলা ধরিয়ে নেই। এতক্ষণ তালুকদার যা বললেন, সেটাকে নিছক গল্প ভেবে নেওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল- যদি তাকে আমি ভালো করে না চিনতাম। আমি নিশ্চিত, মিথ্যা গাল-গল্প শোনার জন্য আমাকে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করে এই রেস্টহাউজে ডেকে আনেননি। আর ব্যাপারটা যদি সত্যিই গল্প হয়, তাতে আমার বিরক্ত হওয়ার কারণ নেই। একেবারে ফাও খাটছি না, উপরন্তু কৌতূহলও ক্রমেই বাড়ছে। সবে দুই প্রজন্মে ঠেকেছি, আরও দুই প্রজন্ম বাকি আছে। আমি তালুকদারকে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না- লায়লার পর নিশ্চয় অ্যানি আপনার হৃদয় কেড়েছিল।

- আ-রে সাংবাদিক সাহেব, আগে ভাগে এত অস্থির হচ্ছেন কেন? সময় হলেই সেটা জানাবো। আরো তো কথা আছে। সেগুলোনা বললে পুরো বিষয়টা আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে না। তা আমার কথাগুলো ঠিক মতন টুকে রাখছেন তো?

- আপনার কী সন্দেহ হচ্ছে?

- সেটা হবে কেন? আমি ভাই লোক চিনি, কাকে দিয়ে কী করাতে হয় সেটা ভালো কইে জানি।

আমি আর কথা বাড়ালাম না।

তালুকদার বলতে শুরু করেন- মিসেস চৌধুরীল বেলায় যেমন ঠিক তেমনি লায়লার কাছেও আমি বিশ্বস্ত একজন হয়ে উঠেছিলাম। ডিস্ট্রিক টাউনের ওই বাড়িটা মেয়ের নামে উইল করে রেখেছিলেন মিসেস চৌধুরী। সেটাই স্বাভাবিক। তিনি আসলেই বুদ্ধিমতী ছিলেন। আমাকে পেয়ে তার হৃত যৌবন যতই উথলে উঠুকনা কেন, তিনি জানতেন বয়স হয়েছে আর কখন কী ঘটে তার ঠিক নেই। যদিও আমি নিশ্চিত যে শেষ পর্যন্ত সাপে কামড়ে মারা যাবেন এটা তিনি কখনো স্বপ্নেও ভাবেননি। আগে ভাগেই বাড়িটা মেয়ের নামে উইল করে রেখেছিলেন বলে রক্ষা। নইলে গনি চৌধুরীর অপরপক্ষের সন্তান এবং জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা ওই বাড়ি দখল করে ছাড়তো। মিসেস চৌধূরীর মৃত্যুর পর সে চেষ্টাও হয়েছিল। আমার জন্য ওরা পারেনি। লায়লা আমাকে এতটা বিশ্বাস করতো যে পাওয়ার অবঅ্যাটর্নি দিয়েছিল। আমিও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। লায়লার এক ফুফা ছিলেন ব্যারিস্টার। তবে ভদ্রলোক কলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস করতেন। তিনি তার পরিচিত এক ল ইয়ার দিয়ে মামলা পরিচালনা এবং বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে অনেক সহযোগিতা করেছেন। গনি চৌধুরীর আগের পক্ষে সন্তানরা চৌধুরীর ভিলার জন্য যে মামলা ঠুকেছিল সেটা আদালতে দুই হিয়ারিং এর পর খারিজ হয়ে যায়। হাইকোর্টে গিয়েও ওরা সুবিধা করতে পারেনি। পরে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে লায়লাকে টাকা-পয়সা সব বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। শুনেছি এখন ওই বাড়িতে বিশাল হাউজিং কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। তিনতলা পর্যন্ত সুপার মল, বাকি পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট। ডিস্ট্রেক টাউন আর আগের মতো নেই, শুনেছি সিটি করপোরেশন হয়ে যাবে। বেশ কয়েক বছর ধরে আমার যাওয়া হয় না। শেষবার যখন গিয়েছিলাম তখন মিউনিসিপ্যালেটির কবরস্থানে যাই। আর কিছু না করি জেবুন্নিসার কবরে ফুলের তোড়া দিতে ভুল করিনি।

- তাই নাকি!

- এতে অবাক হওয়ার কী আছে ব্রাদার? আমি মিসেস চৌধুরীকে সবসময় শ্রদ্ধা করেছি, ভালবেসেছি। এখনো তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যদিও একটা দিক থেকে তার প্রতি বিশ্বস্ততা আমি রক্ষা করতে পারি নাই- এটা সত্য।

- লায়লার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ এখনো আছে?

- কী করে থাকে! আল্লাহ তো তাকে জান্নাতের ভিসা দিয়েছেন অনেক আগেই।

জবাব শুনে আমি হতবাক। ফের প্রশ্ন করার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না।

শরীফউদ্দিন তালুকদার বলে ওঠেন- সাংবাদিক সাহেব, আমার জীবনে মিসেস চৌধুরীর উপস্থিতি ছিল কালবৈশাখি ঝড়ের মতো। সবকিছু লন্ডভন্ড করে দিতে চাইতো। বয়সের ব্যবধান বলেন, সামাজিক সংস্কার বলেন- কোনো কিছুই মানতো না। লায়লাকে দেখার পর সে ঝড় থেমে গিয়েছিল। লায়লা যেন আষাঢ়ের বৃষ্টি। অবিরাম ধারায় আমার দেহমন ভরিয়ে দিচ্ছিল। মিসেস চৌধুরীর মৃত্যুর পর লায়লা তার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে আমার কাছে চলে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাতে রাজি হইনি। একে তো আমার ছাত্র জীবন শেষ হয়নি, অনার্স ফাইনাল দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তারপর ওর মেয়ে অ্যানির ভবিষ্যৎ আর মিস্টার কোরেশী, মানে লায়লার স্বামীর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা ভেবে লায়লাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত রেখেছি। সে মাঝে-মধ্যেই আক্ষেপ করে বলতো, বুড়োর ঘর আর ভালো লাগে না। কিন্তু আমার কীই বা ক্ষমতা ছিল তখন!

- আপানাদের দুজনের সম্পর্কের কথা মিস্টার কোরেশী কি জানতেন?

- মনে হয় ততটা না। জানতেন আমি তাদের দেশি ভাই। ভদ্রলোকের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। তার আচরণে কখনো মনে হয়নি যে আমাকে সন্দেহ করেন। বরং 'বাঙাল ব্রাদার' বলে সম্বোধন করতে। তবে কথাবার্তা খুব একটা হতো না। আমিও তখন উর্দু রপ্ত করতে পারিনি। আর কোরেশী সাহেবেরও বাংলা বলতে বেশ কষ্ট হতো। ভদ্রলোক আবার আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ঘরে অমন সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি তেমন একটা টান ছিল বলে মনে হয় না। নিজের কেরিয়ার, অফিস আর ক্লাবই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যে কারণে ভেতরে ভেতরে লায়লা অসুস্তষ্ট হতে হতে এক পর্যায়ে বিদ্রোহিনী হয়ে উঠতে চেয়েছিল। স্বামীকে নিয়ে তার আক্ষেপের শেষ ছিল না। একদিন তো বলেই ফেলে, বুড়োটা মদ গিলে ঘরে ফিরে এসেই বিছানায় টান হয়ে নাক ডাকতে শুরু করে- আমি যে একটা মেয়ে মানুষ সে খবরও নেই ওর।

- এসব কথা শুনে আপনি নিশ্চয় লায়লার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতেন।

- সে কথা কি আর বলতে হয় সাংবাদিক সাহেব। লায়লার দেহমনে যে শূন্যতা ছিল আমি যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি সেটা পূরণ করতে। আন্তরিকভাবে আর ওকে সত্যিই ভালবেসে। মাঝে মধ্যে মিসেস চৌধুরীর কথা মনে পড়লে একটা গ্লানি এসে আমার ওপর ভর করতো। কিন্তু লায়লার তীব্র আকর্ষণের কাছে সেটা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে তখনো ঘুনাক্ষরেও আঁচ করতে পারিনি, লায়লাদের ফ্যামেলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত এক নজির গড়বো। বুঝলেন, সবই নিয়তি। তালুকদারের শেষের কথাগুলো গায়ে না মেখেই প্রশ্ন করলাম- আপনাদের দেখাসাক্ষাৎ কী শুধু ঢাকাতেই হতো? করাচি বা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে আপনি কি কখনো যেতেন না?

-পাকিস্তান আমলে মাত্র একবার গিয়েছিলাম। তখন পিআইএ'র ফ্লাইটে ঢাকা থেকে করাচি- লাহোরে যেতে মাত্র আড়াইশ টাকা লাগতো। সপ্তাহ খানেকের মতো ছিলাম। লায়লা আমাকে করাচি শহর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। করাচিতে ব্যাম্বিনো নামে একটা সিনেমা হল আছে সেখানে বসে আমরা তখনকার জনপ্রিয় পাকিস্তানি জুটি মোহাম্মদ আলী- জেবা অভিনীত একটা উর্দু ছবি দেখেছিলাম। ক্লিফটন বিচে গিয়ে আরব সাগরের তীরে অনেক ছবিও তুলি। কয়েকটা ফটো ওয়াশ করে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই ফটোগুলো আজ আমার কাছে নেই। আপনার ভাবী একদিন সেগুলো আবিষ্কার করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার মতো রীতিমতো নাটকীয় কান্ড ঘটিয়েছিল। বুঝলেন সাংবাদিক সাহেব, নারীদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তার স্বামী অথবা প্রেমিকের জীবনে অন্য কোনো মেয়ের উপস্থিতি তো দূরের কথা, ছায়া পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। যদিও উপায়ন্ত থাকে না বলে তাদের অনেকেই সেটা মুখ বুজে সহ্য করে। দেখেছেন না, আমাদের দেশে অনেক মেয়েই এখনো সতীনের সঙ্গে ঘর-সংসার করছে। আমি বাজি রেখেই বলতে পারি, কোনো মেয়ের অন্য কোন গতি থাকলে, বিশেষত আর্থিকবাবেস্বাবলম্বী আর চাকরি থাকে- এমন কি সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় থাকলে, আর যাই হোক স্বামীর জীবনে আরেক মেয়ের উপস্থিতি মেনে নিয়ে ঘর করবে না। কেউ কেউ অবশ্য সন্তানের মুখ চেয়ে সেক্রিফাইস করে। তবে এ ধরণের নারীর সংখ্যা আজকাল যে কমে যাচ্ছে, সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন। তবে এ ধরণের মেয়েরা স্বামীর প্রতি আর আগের মতো বিশ্বস্ত থাকে না, সুযোগ পেলেই বদলা নেবে। অতএব ভাইজান, কখনো স্ত্রীর কাছে বাহাদুরি ফলাতে গিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের কথা জাহির করতে যাবেন না। তাহলে সংসারের বারোটা বাজতে বাকি থাকবে না।

- আপনি দেখছি, নারী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ।

কথাটা শুনে একচোট হেসে তালুকদার বলেন- তা বলতে পারেন। জীবনে তো কম নারী দেখার অভিজ্ঞতা হলো না। তাদের ঘটনা শুনে এত কিছু জেনেছি।

ফের প্রশ্ন করতে যাবো, এমন সময় মিনা হোসেন ঘরে প্রবেশ করে। হাতে ধরা মোবাইল ফোন তালুকদারের দিকে এগিয়ে ধরে বলে- স্যার, জিএম সাহেবের ফোন।

কপাল কুঁচকে তালুকদার ফোন রিসিভ করলেন- হ্যাঁ, বলেন- আমাকে আসতেই হবে? ... ঠিক আছে, আপনি থাকুন, আমি গাজীপুর থেকে রওনা দিচ্ছি। মিনা হোসেনের কাছে ফোনটা ফেরত দিয়ে আমার দিকে ফিরে তালুকদার বলে ওঠেন- সরি ব্রাদার, বিজনেসম্যানদের এই একটা সমস্যা- নিশ্চিন্তে থাকা যায় না। আপনাকে এখানে আজ সময় দেওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে ব্যাপারটা সত্যিই সিরিয়াস। চলেন, গাড়িতে বসে কথা হবে।

কোনো মন্তব্য করলাম না। টি-টেবিলের ওপর সিগারেটের খোলা প্যাকেট থেকে একশলা তুলে নিয়ে ধরালাম। এরপর আমার কাগজপত্র গুছিয়ে নিলাম।

তেরো

লম্বা বেলা ফুরাতে অনেকটা বাকি থাকতেই আমরা রেস্টহাউজ থেকে বিদায় নেই। পাতলা হয়ে পড়া গজারি বনের ভেতর সরু রাস্তা ধরে কখনো ডানে, কখনো বামে মোড় নিয়ে মিনিট পনের পর হাইওয়েতে এসে গাড়ি যেন হাফ ছাড়ে। এপর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে। এতক্ষণ শরীফউদ্দীন তালুকদার মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। আমার ধারণা, এনবিআর বা কাস্টমসের কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হচ্ছে। যদিও ব্যাপারটা নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই।

ভাওয়াল গড়ে আসার সময় রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা পেয়েছিলাম। ফেরার সময় গাজীপুর চৌরাস্তার আগেই জ্যামে পেয়ে বসে। সত্যিই, আজকাল রাস্তাঘাটে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে গেছে। দিন যতই যাচ্ছে

ততই বাড়ছে নানা সাইজ আর মডেলের গাড়ি আমদানি। তালুকদারের প্রাইভেট কারের পেছনের সিটে গা এলিয়ে বসে আছি। এসি কার, উইন্ডস্ক্রিন তুলে দেওয়ায় বাইরের গরমটা আঁচ করা যাচ্ছে না। বামপাশে বসা তালুকদার ফোনে কয়েকজনের সঙ্গে কথা সেরে আমার দিকে ফিরলেন- ভেবেছিলাম আজকেই স্টেটমেন্টটা সেরে ফেলবো। কিন্তু দেখছেন তো কত ঝামেলা। আপনারা তো লিখেই থাকেন, ব্যবসায়ীদের কাজ হলো আরামে বসে মাল গোনা। বাস্তবটা কিন্তু ভিন্ন। এদেশে শিল্প-কারখানা দেওয়া মানে নানা টেনশন মাথায় নেওয়া। ব্যাংকের ঋণ তো খড়্গের মতো গর্দানের ওপর ঝুলছে, তার পর মার্কেটিংয়ের সমস্যা, ট্যাক্স-ভ্যাটের ফ্যাকড়া, শ্রমিক অসন্তোষ আর নানা ঘটনা- দুর্ঘটনা। আপনি নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। আমি ইচ্ছে করলে শর্টকাটে ব্রিফ করতে পারতাম। কিন্তু আমি ডিটেলসে যাচ্ছি দুটি কারণে। প্রথমত বিষয়টি যাতে আপনি অনুধাবন করতে পারেন, দ্বিতীয়ত আমার অনেক কথা দীর্ঘদিন ধরে বুকের মধ্যে জমে আছে কাউকে বলিনি, শুধু আপনাকেই বলছি।

- এবার তাহলে আমি নোট নেওয়া শুরু করতে পারি?

- আমিও সেটা ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন মত পাল্টে ফেলেছি। আমি চাই না, আমার কোনো স্টাফের সামনে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে ডিসকাস করতে।

কথাটা শোনার পর আমার ঠিক সামনে বসা ড্রাইভারের চেহারা দেখলাম ভিউ মিররে। কালো গম্ভীর মুখটায় বয়সের ছাপ ফুটে ওঠেছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় অভিজ্ঞ গাড়ি চালক।

তালুকদার বলে ওঠেন- আগামীকাল আমার অফিসে চলে আসবেন। একসঙ্গে লাঞ্চ করবো আমরা।

- কিন্তু বস্, ঘণ্টা দুয়েকের বেশি সময় দিতে পারবনা। আমার অফিস আছে।

- সেটাই এনাফ। প্রেস কনফারেন্স তো আরো এক সপ্তাহ বাকি। এরপর তালুকদার ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলেন- সুলতান, মান্না দের সিডি ছাড়ো তো।

সিডি মানে গান। গাড়িতে চলার পথে গান কখনোই আমার অপ্রিয় নয় - তা বাংলা হোক আর হিন্দি কিংবা ইংলিশ হোক। বাণী বুঝি আর বুঝি, সুরটাই আসল।

চৌদ্দ

মতিঝিলে শরীফউদ্দীন তালুকদারের অফিসে পৌঁছে দেখি, তিনি আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন। অফিসের ভেতর ঝাপসা শার্সি ঘেরা একটা রুম আছে। সেখানে হাল মডেলের ডাইনিং টেবির ঘিরে ছয়টা চেয়ার। তালুকদারের আদেশ পেয়ে অফিস স্টাফরা টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই আমরা কাজে বসলাম। আমকে বিদায় দিয়ে তালুকদার আবার বেরোবেন।

তালুকদারের অফিস রুমে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে তার উল্টাদিকে ডানদিকের চেয়ারে বসে আমি প্যাড আর কলম নিয়ে প্রস্তুত হলাম। তালুকদার জিজ্ঞেস করে-কোত্থেকে শুরু করতে হবে?

- ওই যে লায়লার সঙ্গে আপনার ফটো ভাবী ছিঁড়ে ফেলেন...।

- হ্যাঁ ভাই, আপনার ভাবী কত কাণ্ডই না করে গেছেন। আমি অবশ্য ওর কথা কখনোই গায়ে মাখতাম না। এক কান দিয়ে শুনতাম আরেক কান দিয়ে বের করে দিতাম। আমার ওয়াইফকে তো আপনি দেখেছেন।

- মাত্র দুই-একবার। আপনি একবার আমাকে বনানীতে আপনার বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাবী আমার পরিচয় জেনে খুবআপ্যায়ন করেছিলেন। নিজ হাতে নাশতা বানিয়ে খাওয়ান।

- হ্যাঁ, সাংবাদিক সাহেব, বেসিকলি আমার ওয়াইফ ভালো মেয়েই ছিলেন। আমার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে তারও একটা ভূমিকা আছে। মুরুব্বিরা তো বলে গেছেন, বউ হলো ঘরের লক্ষ্মী, সে ঠিক না থাকলে কিছুই ঠিক থাকবেনা। সালমা, মানে আপনার ভাবীর ক্ষেত্রে কথাটা সেন্ট পারসেন্ট অ্যাকিউরেট।

- লায়লার সঙ্গে সম্পর্ক থাকা অবস্থাতেই তো আপনার বিয়ে হয়?

- অনেকটাই তাই। আমার বিয়ে হয় পাকিস্তান জমানার শেষ দিকে, নভেম্বর মাসে। আর মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তার আগেই লায়লার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেকটা ঝুলে যায়।

- সেটা আবার কী?

আমাকে বিস্মিত হতে দেখে তালুকদার মুচকি হেসে বলেন- সাংবাদিক সাহেব সেটাই ছিল স্বাভাবিক। আমি তখন চাকরিতে ঢুকেছি। আমার এক আত্মীয়ের সুবাদে বিদেশী ওষুধ কোম্পানিতে ঢুকেছিলাম। বেতন ভালো, সুযোগ-সুবিধা অনেক। চাকরি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। অন্যদিকে লায়লা থাকে করাচিতে। ওর প্রতি টানও আগের মতো ছিল না। চিঠিপত্রও কমে



আসছিল। রহিম নামে আমার এক কলিগ ছিলেন। হঠাৎ করে একদিন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। পাত্রী তার সম্পর্কে চাচাতো বোন। মতিঝিল এজিবি কলোনীতে বোনের বাসায় থাকে। লায়লার কারণেই আমি কিছুটা দোটানায় ছিলাম। রহিমের পীড়াপীড়িতে এক ছুটির দিনে পাত্রী দেখতে গেলাম। সালমার তখন উঠতি বয়স। লায়লার মতো অতটা ফর্সা না হলেও একটা চটক ছিল ওর চেহারায়। যা আমাকে মুগ্ধ করে।

- তার মানে পাত্রী দেখে আপনার পছন্দ হয়ে গেল! লায়লার কথা একবারও ভাবলেন না?

- এক্ষেত্রে যা হয়, আমার বেলাতেও সেটাই ঘটেছিল সাংবাদিক সাহেব। অবদি রেকর্ডে আপনাকে বলছি, আমি শুরু থেকেই বহুগামী ছিলাম। মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়ের আগেই নারীদেহের স্বাদ আমি পেয়েছিলাম। এদেশে এক সময় আউট অব বন্ড মানে নিষিদ্ধ পল্লীর ছড়াছড়ি ছিল। বেশিরভাগ শহর-গঞ্জে তা দেখা যেত। বড় শস্তায় মেয়েলোক পাওয়া যেত। এজন্য আমি নিজকে দোষ দিবনা কখনো না, ওটা ছিল বয়সের ধর্ম, মেয়েলোক ছাড়া চলে কেমনে? তালুকদারের কথায় সায় দিতে গিয়ে বললাম- আপনার কথাটা মোটেও ফেলনা নয়। আমি তো মনে করি, সাহস আর সামর্থ্য থাকলে এক নারীতে সন্তুষ্ট থাকে এমন পুরুষ খুবই কম আছে। অর্থের গন্ধে তো মেয়ে লোক এমনিতেই জুটে যায়। এই যে আমাদের এক সাবেক প্রেসিডেন্টের নারীঘটিত কেলেঙ্কারীর কথা আমরা পত্রিকায় কত না ছেপেছি। আমি কিন্তু বেচারাকে দোষ দেই না। ওই রকম পজিশনে থাকলে বহুবল্লভ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

- সাংবাদিক সাহেব, কার সঙ্গে আমার তুলনা করছেন! আর যাই হোক, কোনো মেয়ের জন্য আমি কখনো সজ্ঞানে কারো ক্ষতি করিনি। আর আপনি যার কথা বলছেন তিনি ক্ষমতায় থাকতে কতজনের সংসার তছনছ করেছেন সে খবর কী রেখেছেন? নারীর জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করার অভিযোগও আছে তার বিরুদ্ধে।

কথাগুলো শুনে আমি প্রমাদ গুনলাম, প্রসঙ্গ আরেকদিকে যাচ্ছে। আমার জানা ছিল, ওই রাষ্ট্রপতির আমলে শরীফউদ্দীন তালুকদার কিছুদিন জেলখানায় কাটিয়ে আসেন। তার বন্ধু স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বাক্ষী হতে রাজি হননি বলে হয়রানিমূলক মামলায় জড়ানো হয়েছিল। ভদ্রলোকের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি নাকি ওই রাষ্ট্রপতির নজর পড়েছিল। কাজেই তালুকদারের কথার পিঠে ব্যাপারটা নিয়ে কোনো মন্তব্য করলাম না। বরং প্রশ্ন করলাম- আপনার বিয়ের ঘটনাটা বলবেন?

- দ্বিধা নিয়েই রহিমের সঙ্গে পাত্রী দেখতে গিয়েছিলাম। সালমাকে দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে সব দ্বিধা কেটে যায়।

- বিয়েতে লায়লাকে দাওয়াত করেছিলেন?

- দাওয়াত না দেওয়ার মতোই বলতে পারেন। আসলে লায়লার এক চাচাতো ভাই আরিফ থাকতেন ইস্কাটনে। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল বলেই লায়লা আমার বিয়ের কথা জানতে পারবে ভেবেই নামকাওয়াস্তে দাওয়াত দিয়েছিলাম।

- তার মানে?

- সেটাও জানতে চান? তাহলে শুনেন ডাকযোগে এমন একটা সময়ে লায়লাকে বিয়ের কার্ড পাঠিয়েছিলাম যাতে অনুষ্ঠানের পর সেটা ওর হাতে পৌঁছে। বিয়ের দাওয়াত পেয়ে আরিফের মাধ্যমে লায়লা একটা চিঠি পাঠিয়েছিল। তাতে বিয়ের অনুষ্ঠানে আসতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে দাম্পত্য জবিনে আমি সুখী হতে পারি সেই কামনা করেছিল। লায়লা চিঠিতে আমার স্ত্রীকে দেখার আগ্রহ ব্যক্ত করে। তাছাড়া চিঠিতে আরো জানায়, তার আরেকটা মেয়ে হয়েছে। একেবারে বাবার চেহারা পেয়েছে। তবে লায়লার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না- সেকথাও লিখেছিল।

-পরে লায়লা কী আমাদের ভাবীকে দেখেছিলেন?

- না দেখার কোনো কারণ নেই। মাত্র একবারই দেখেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে বাচ্চা মেয়েকে নিয়েই লায়লা ঢাকায় আসে। এক সপ্তাহ ছিল। আমি তখনই দেখেছি, ওর স্বাস্থ্য কেমন ভেঙ্গে যাচ্ছে। লায়লা আমার স্ত্রীকে একটা সোনার চেইন লকেট গিফট করে এবং নিজ হাতেই সেটা সালমার গলায় পড়িয়ে দেয়। লকেটে ভারী সুন্দর কাজ করা ছিল, মাঝখানে আবার লাল চুন্নি ছিল। সেবারই লায়লাকে আমি শেষবার দেখি।

- তাই নাকি!

- লায়লা করাচিতে চলে যাওয়ার সপ্তাহ খানেকের ভেতর দেশের পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেল। সত্তরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান টালবাহানা শুরু করলে ঢাকায় আন্দোলন শুরু হলো। রেসকোর্স ময়দানে মিটিং ডেকে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টই ঘোষণা দেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। ২৩ মার্চ ধানমন্ডির বাসভবনে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলেন। তারপর ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যায় নেমে পড়ে আর গ্রেফতারের আগে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন বঙ্গবন্ধু। আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম, ২৫ মার্চের ঢাকায় সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে। তাই আগেভাগে স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাই বিক্রমপুরের শ্বশুরবাড়িতে। পরে সেখান থেকে গেলাম নিজেদের বাড়ি। আবার জুন মাসের দিকে চলে এলাম ঢাকায়।

- তাহলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি আপনি?

- যাবো কী করে ভাই, একে তো নতুন সংসার এবং গর্ভবতী হয়ে পড়া স্ত্রী, তারপর অনিশ্চিত অবস্থা। সাংবাদিক সাহেব, রণাঙ্গনে না গেলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আমার পুরো সমর্থন ছিল। আমার মতে কিছু আলবদর-রাজাকার আর দালাল ছাড়া সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই মুক্তিযোদ্ধা ছিল। খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া ঝিলপাড়ে আমার বাসায় আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শেল্টার নিয়েছিল। ওরা গেরিলা অপারেশন চালাতো ঢাকায়।

অনেকটা বিস্মিত হয়েই তালুকদারকে প্রশ্ন করলাম- তখন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ঘটেছিল কেমনে?

- আ-রে আমার আপন চাচাতো ভাই ছিল ওই দলে। মুক্তিযোদ্ধা জসিমউদ্দিন তালুকদারের নাম শোনেনি আপনি?

- শুনেছি। তিনি যে আপনার রিলেটিভ এটা জানতাম না।

তালুকদার এবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর বলে ওঠেন- আজকে আর সময় দেওয়া যাচ্ছে না। হোটেল শেরাটনে যেতে হবে। বিদেশি বায়ারদের সঙ্গে একটা মিটিং আছে। ওরা তো আবার সময়ের ব্যাপারে স্পর্শকাতর। তবে একটা ব্যাপারে আপনাকে বলা উচিত, মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ ঢাকায় থাকতে আমার অসুবিধা হয়নি। তবে ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে ঢাকায় মিত্রবাহিনীর এয়ার রেইড শুরু হলে আবার বিক্রমপুরে চলে যাই। দেখতে দেখতে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল, চাকরি ছেড়ে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। সেসময় দেশের যা পরিস্থিতি, ব্যবসা, সংসার ও নবজাতক সন্তান নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে লায়লার কথা মনে পড়তো না তেমন। পাকিস্তান তখন হয়ে গেছে শত্রুদেশ, করাচির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। তবে আরিফ সাহেব ছিলেন বলেই লায়লাদের পরিবারে সঙ্গে যোগসূত্র একোবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি। সেটা ঘটেনি বলেই আমার এই জীবনে অভাবনীয় কাণ্ড সম্ভব হয়েছিল।

পনের

একদিকে শরীফউদ্দীন তালুকদারের বিদেশি বায়ারদের কাছে যাওয়ার তাড়া, আরেকদিকে আমার অফিসের সময় ঘনিয়ে আসছিল দেখে কাগজ-কলম গুটাতে হলো। পরেরদিন আবার তালুকদারের সঙ্গে লাঞ্চ করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বিদায় নেই। মতিঝিল থেকে আমার অফিসের দূরত্ব বেশি নয়। একটা খালি রিকশা পেয়ে দরদাম না করেই চড়ে বসলাম। মাথা বরাবর আকাশে মেঘ থাকলেও আপাতত বৃষ্টির আশঙ্কা নেই বলেই মনে হলো। রিকশায় যেতে যেতে ভাবতে থাকি, তালুকদার এত ডিটেলসে যাচ্ছেন যে বিষয়টা জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার অবশ্য অসুবিধা নেই। মূল বিষয়টা সাংবাদিকদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরাটা আমার জন্য কঠিন নয়। সমস্যা হলো তালুকদারকে নিয়ে। ইচ্ছে করলে তিনি এক সিটিং- এমনকি এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিতে পারেন। সেটা না করে বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছেন। এতে আমার কোনো লোকসান হচ্ছে না। বরং ভালোই লাগছে। সাংবাদিকতা করলেও লেখালেখির তেমন একটা অভ্যাস নেই। নইলে দারুন একটা উপন্যাস ফেঁদে বসতাম। বিষয়টা সত্যিই অদ্ভুত। জায়গা মতো একটু রংচং মাখাতে পারলেই যাকে বলে হটকেক। ঠিক বন্ধু স্থানীয় না হলেও পরিচিত এক লেখক আছেন। মাঝে-মধ্যে প্রেসক্লাবেআড্ডা দেই আমরা। তাকে থিমটা বললে যে লুফে নেবেন সেটা বাজি রেখেই বলতে পারি। এসব ভাবতে গিয়ে খেয়াল করিনি, রিকশা ডানে পীরজঙ্গি মাজারের দিকে মোড় না নিয়ে সোজা ফকিরাপুল বাজারের সামনে চলে আসায় যা হওয়ার তাই হয়েছে। জ্যামে আটকে গেছে। হাতঘড়ি দেখলাম। এখনো অফিসের শিফট শুরু হতে প্রায় ঘণ্টা আধেক বাকি। পাঁচ-দশ মিনিট লেট হলে অসুবিধা নেই। পাঞ্জাবির ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনলাম। ম্যাচ আছে। ধরিয়ে নিলাম একশলা। তামাকের ধোঁয়া মস্তিষ্ক স্পর্শ করতেই সন্দেহটা ফের উঁকি মারে- তালুকদার সত্যিই গল্প ছাড়ছে না তো? এটা কী করে সম্ভব, একই পরিবারের চার প্রজন্মের নারীর সঙ্গে....

পরক্ষণে সন্দেহটা ঝেড়ে ফেললাম। তালুকদার সাহেবকে দশ-বারো বছর ধরে চিনি। বড্ড বৈষায়িক লোক। অভিনবকাণ্ড তার জীবনে না ঘটলে কেন সেধে সেধে সমাজের কাছে সম্মানহানী কিংবা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি নিতে যাবেন? আর যাই হোক, তালুকদার বটিপার নন। তাকে কখনো মিথ্যাবাদী মনে হয় না। সত্য উচ্চারণে সৎ সাহস তার মধ্যে দেখেছি। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম উঠানোটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু আমার জানা নেই, এ ধরনের কোন বিষয় গিনেস বুকে তালিকাভুক্ত করে কিনা। তালুকদারের নাম শেষ পর্যন্ত সেখানে ঠাঁই পাবে কি পাবেনা তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি শুধু একজন শুভানুধ্যায়ী হিসেবে তার সংবাদ সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিয়েছি। তাছাড়া এমন একটা আগ্রহ আমকে পেয়ে বসেছে, এখন গোটা বিষয় না জানা পর্যন্ত যেন স্বস্তি পাচ্ছি না। তালুকদার সবেমাত্র দুজনের কথা বলেছেন, আরো দুজন এখনো বাকি।

সিগারেটে শেষ টান মেরে দেখলাম, জ্যাম থেকে ছাড়া পেয়ে রিকশা ছুটছে। সামনে ডানপাশে জোনাকি হল। বিশাল হোডিংয়ে নায়িকার লাবন্য ভরা মুখ আর আটোসাটো পোশাকে ভারী বুক দেখে খেয়াল হলো, অনেকদিন ধরে কোনো প্রেক্ষাগৃহে ঢুকছি না। মনে মনে ঠিক করলাম, তালুকদারের ঝামেলা শেষ করেই একটা ছবি দেখবো- সেটা হলিউডের হোক আর ঢাকারই হোক।

অফিসে সময় মতো পৌঁছলাম। এন্ট্রি খাতায় সই করে কয়েক ধাপ সিড়ি ভেঙ্গে কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে পা রেখে দেখি, খলিল বসে আছে। এই বন্ধুই একদিন আমাকে শরীফউদ্দীন তালুকদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

ওকে দেখে বললাম- তুই হঠাৎ করে?

- হ্যাঁ দোস্ত, আমার আগের সেট পিকপকেট হয়ে গেছে। নতুন সেটে তোর নাম্বার স্টোর করা নেই, নইলে তোকে কল দিয়ে আসতাম। তারপর এদিকে এক কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দোস্তের সঙ্গে দেখা করে যাই।

- খুব জরুরি কোনো কথা আছে?

খলিল মাথা নাড়ে- আ-রে না না, সে রকম কিছু নেই।

- এসে ভালই করেছিস। অনেকদিন ধরে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তুই কী আগের কোম্পানিতেই আছিস?

- আর যাবো কই? তা তুই ফ্রি আছিস তো! কিছু কথা আছে তোর সঙ্গে।

রিসেপশন টেবিল থেকে কিছুটা দূরে ডাবল সাইজের সোফায় বসে আমরা কথা বলছিলাম। বললাম- এখানেই বলে ফ্যাল কী কথা?

- তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। মিনা হোসেনকে তো তুই চিনিস, তালুকদার গ্রুপ অব কোম্পানিতে আছে? তার কাছ থেকেই তোর খবর পেলাম।

- মিনাকে তুই চিনিস?

- আবার চিনবো না। বল ভালো করেই চিনি। এরপর গলাটা নামিয় খলিল বলে- দোস্ত, ওর শরীরে কোথায় কয়টা তিল আছে, সেটাও বলে দিতে পারি।

- বলিস কি!

আমার বিস্মিত হওয়াটাকে পাত্তা না দিয়ে খলিল বললো- তালুকদারের ওখানে আমিই ওকে ঢুকিয়েছি। কালকে ওর সঙ্গে ফোনে কথা হলো। সে বললো তুই শুক্রবার তালুকদারের গেস্টহাউজে গিয়েছিলি।

- হ্যাঁ, তালুকদার আমাকে একটা কাজ দিয়েছে। একটা সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

- মিনাও আমাকে সেরকম বলেছে।

সংবাদ সম্মেলনের প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যই বললাম- মিনা হোসেনের সাথে তোর পরিচয় কিভাবে হলো?

- সে বিরাট কাহিনী। তুই তো জানিস আমি তোর মতো সাধু পুরুষ নই। অজায়গায়-কুজায়গায় যাওয়ার অভ্যাস আছে। নিকেতন হাউজিং এলাকাটা তো চিনিস, গুলশান এক নম্বরের পাশে। ওখানকার এক ফ্ল্যাটে মিনার সঙ্গে পরিচয়। বাজের ছেলের প্রেমে পড়ে বাবার বাড়ি ছেড়ে আসার পর বিপাকে পড়ে গিয়েছিল। ওকে দেখে কথাবার্তা শুনে ঘাগু মাল হয়েও আমি ওর এক ধরণের মায়ায় জড়িয়ে গেলাম। তুই তো দেখেছিস ওকে, কি রকম সুন্দরী!

খলিলের কথায় সায় দেই- দেখলেই প্রেম করতে ইচ্ছে করবে অনেকের।

- ঠিকই বলেছিস দোস্ত! তবে মেয়েটা সত্যিই অসহায় ছিল। ছেলের মুখ চেয়ে রোজগারে নেমেছিল। তবে দুই নম্বরী কাজ করতে ভালো লাগছিল না ওর, ঝুঁকিপূর্ণ বলে।

- ওর ছেলে আছে?

-হ্যাঁ, ক্লাস টুতে পড়ে মোহম্মদপুরের এক স্কুলে। বুঝতেই পারছিস, ওর ইচ্ছার কথা জেনে ভাবলাম, উপকার করলে দোষ কী। কিন্তু ওর শিক্ষাগত যোগ্যতা মাত্র এসএসসি। কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই এক বান্ধবীর ফুফাতো ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে।

- সেই ছেলেটার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল?

- তা তো হবেই।

- এখন কোথায় সে?

- হয়তো কোনো জেলখানায় পচে মরছে, নয়তো কোথাও মার্ডার হয়েছে। কোনো খোঁজ বা যোগাযোগ নেই।

- ওদের হোম ডিস্ট্রিক কোনটা?

- ঝিনাইদহ।

- দোস্ত তুই একটা ভালো কাজই করেছিস।

- সেটা অবশ্য ঠিকই বলছিস। যা হোক, তালুকদারকে ওর কথা বললাম। পরে নিয়ে গেলে দেখেই পছন্দ হয়ে যায়। মিনার চাকরি হয়ে গেল।

- বেশ স্মার্ট মেয়ে। এখন তো তালুকদারের প্রায় পিএ-টিয়ে হয়ে গেছে। একদিন দেখেই বুঝে গেছি বড় সুনজরে আছে।

খলিল বললো- সেখানেই তো ভয়। তুই জানিস কিনা জানি না,

তালুকদারের তো আবার আলুর, মানে নারীঘটিত দোষ আছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে শেষে না মিনাকে বিয়ে করে বসেন।

- করলে দোষ কী, তোর আপত্তি আছে?

- আপত্তি মানে সালমা ভাবী আমাকে অভিশাপ দেবেন। তার সাথে নিমক হারামী হবে।

ওর কথায় অবাক না হয়ে পারলাম না- উনি তো মারা গেছেন? টের পাবেন কি করে?

- দোস্ত, ইহজীবনে যতই পাপ করি না কেন, আমি পরকালে বিশ্বাস করি। মিনার সঙ্গে তালুকাদরের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ঘটে গেলে সালমা ভাবীর আত্মা কবর থেকে কষ্ট পাবে। যেহেতু তার সন্তানরা পিতার অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হবে।

খলিলের যুক্তি মানা না মানার সুযোগই আমি পেলাম না। রিসেপশন টেবিল আগলে থাকা সিকিউরিটি চিফ

আমাকে বলেন- স্যার, নিউজ এডিটর সাহেব আপনাকে ডেকেছেন।
বুঝতে পারলাম সিসি টিভি ক্যামেরার সুবাদে অফিস ভবনে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছেন নিউজ এডিটর। এমনতেই পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছে, তারপর বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি খলিলকে বললাম- অনেকদিন পরে এলি, কিন্তু তোর সঙ্গে চা খাওয়ারও সময় নেই। নিউজ এডিটর তলব করেছেন।
- সেটা বুঝতে পারছি। তোর ভিজিটিং কার্ডটা আমাকে দে।
প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে একটা ভিজিটিং কার্ড ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম- ঠিক আছে, কার্ডে আমার ফোন নাম্বার আছে। পরে কথা হবে।
খলিলকে বিদায় করে আমি লিফটে চড়লাম। সাত তলায় আমার অফিস। লিফট থেকে বেরোবার আগেই সন্দেহ হলো, মিনা হোসেনের প্রতি খলিলের দুর্বলতা আছে না তো! এ কারণেই হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা করছে! সালমা ভাবীর আত্মা কষ্ট পাবে- এসব স্রেফ বোগাস। শরীফউদ্দীন তালুকদার ব্যারারটা শুনতে পেলে নিশ্চয় হোঃ হোঃ করে হাসবেন। যদিও আমার পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে তার কাছে টু শব্দটি করারও প্রশ্নই ওঠে না। খলিল আমার বহুদিনের ভুজন ফ্রেন্ড। ও আমাকে কত জায়গায় নিয়ে গেছে। আমার ওপর বিশ্বাস আছে বলেই কথাটা বলেছে।

ষোল

লাঞ্চ আওয়ারে শরীফউদ্দীন তালুকাদরকে তার অফিসে গিয়ে পেলাম। আমার অপেক্ষাতে থাকলেও তিনি প্রস্তাব দেন, সংবাদ সম্মেলন এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিলে কেমন হয়?
আমি বললাম- সে আপনার ইচ্ছা। কিন্তু হল তো বুকড করে ফেলেছেন।
- অসুবিধা নেই। চাইনিজ রেস্টুরেন্টের মালিক আমার পরিচিত। ফোন করে দিলেই হবে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে তালুকদার ফের বলেন- দুদিনের জন্য সিঙ্গাপুর যেতে হচ্ছে। বুঝলেন ব্যবসায়িক ধান্ধা। লেগে গেলেই অনেক প্রফিট।
- তাই নাকি!
তবে বিস্ময়টুকু ব্যক্ত করলেও তালুকদারের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি জানি, টাকা থাকলেই টাকা আসে। এখন আমার জরুরি বিষয় হলো তালুকদারের অভিনব কান্ডের বাকি অংশ জানা। সত্যিই, একটা কৌতুহল আমাকে পেয়ে বসেছে। সংবাদ সম্মেলন এক সপ্তাহ কেন, দুই সপ্তাহও পিছিয়ে গেলেও আমার আপত্তি নেই। যথারীতি তালুকদারের অফিসেই লাঞ্চ করলাম। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উল্টাদিকে এক চেয়ারে বসে নোটবুক আর কলম নিয়ে তৈরি হলাম। তালুকদার জিজ্ঞেস করেন- কোথায় যেন আমরা শেষ করেছি? প্রশ্নের জবাব তৈরিই ছিল- লায়লাকে শেষ দেখা এবং আরিফ সাহেব ছিলেন বলেই ওই পরিবারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগটা ...
- হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। বুঝলেন তো সাংবাদিক সাহেব, দেশের পুরো সিচুয়েশন বদলে গেল। ছিলাম এক রাষ্ট্র, হয়ে গেল আরেক রাষ্ট্র। আমি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক আর লায়লা রয়ে গেল পাকিস্তানি। আর অবস্থা এমন হয়ে গেল যে কে রাখে তার খোঁজ। আমি চাকরি ছেড়ে তখন ব্যবসাতে নেমে পড়েছি। সে একটা সময় গেছে, অবাঙালিরা নেই, তাদের ফেলে যাওয়া বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান সব জাতীয়করণ করেছে সরকার। তারপর কত কী ব্যবসা বাণিজ্যের দরজা খুলে গেছে। আর লাইসেন্স-পারমিট বাগাতে পারলেই টাকা আর টাকা। বলতে পারেন টাকার নেশাই তখন আমাকে পেয়ে বসেছিল। এত ব্যস্ত যে স্ত্রীটাকেও ঠিকমতো সময় দিতে পারতাম না। তারপর সালমা দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার আগেই কনসেপ্ট করে বসে। দেখতে দেখতে বাবা হয়ে গেলাম। ছেলের নামও রাখা হলো- স্বাধীন। যদিও ওটা ডাকনাম। দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সালমাই নামটা রেখেছিল। ওই রকম একটা পরিস্থিতিতে লায়লার কথা কী মনে থাকে! তারপর প্রায়ই ইন্ডিয়ায় যাচ্ছি। কখনো কলকাতা, কখনো বোম্বাই। ওদেশে সুন্দরী নারীর অভাব আছে! একদিকে পেট-পিঠের অনেকটা বের করে স্লিভলেস ব্লাউজ আর নাভির নিচে শাড়ি পরা অজন্তা স্টাইল চলছে, আরেক দিকে উরু বের করা মিনিস্কার্ট যত্রতত্র। বুঝতেই পারছেন অবস্থাটা। ভাই অব দি রেকর্ডে এসব কথা বলছি আপনাকে। আর আপনি তো জানেনই, একজন স্বামী হিসেবেস্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব, একজন পিতা হিসেবেসন্তানের প্রতি কর্তব্যের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার গাফিলতি না থাকলেও আমি কখনোই সাধু পুরুষ ছিলাম না। তারপরও সাংবাদিক সাহেব, নিয়তি বলে একটা কথা আছে।
- সেটা আছে বলেই তো আপনি গিনেস রেকর্ডসের মতো কাণ্ডটা ঘটাতে পেরেছেন।
বোঝা গেল আমার কথাটা তালুকদারের মনে ধরেছে- ঠিকই বলেছেন, একদম পারফেক্ট। তবে কী ভাই, তখন আমি অফিস নিয়েছি বিক্রমপুর হাউজে। জায়গাটা আপনি চিনবেন। বঙ্গভবনের পূর্বদিকে টয়েনবি সার্কুলার রোডে। ওখানে একটা হলুদ রঙের বিরাট একটা বিল্ডিং ছিল। এখন বোধ হয় ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ওই বিল্ডিংয়ে ছিল আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রথম অফিস। একদিন ঢাকা ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে আরিফের সঙ্গে দেখা। আমি তখন সাদা রঙের একটা সেকেন্ড হ্যান্ড টয়োটা গাড়ি কিনেছিলাম, তাতে চড়িয়ে একদিন আরিফকে আমার অফিস চেনাতে নিয়ে এলাম। সপ্তাহ কয়েক পর আরিফ আমার অফিসে গেল। তার মুখটা ভার। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, খবর পেয়েছেন? আমি বললাম, কী খবর? কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আরিফ জানান, লায়লা আপা আর নেই। আমি চমকে উঠেছিলাম, বলেন কি! আরিফের কাছ থেকে জানতে পারি, লায়লা অসুস্থ ছিল, তার কোলন ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসা চললেও আর সুস্থ হতে পারেনি। সম্ভবত হতাশায় ভুগছিল। শেষে একগাদা স্লিপিং পিল খেয়ে জীবনের সবহিসাব চুকিয়ে দেয়। দুঃসংবাদটা শোনার পর আমার খুবখারাপ লাগছিল। বলতে পারেন, দিনটাই মাটি হয়ে গেল। রাতেও ঘুমাতে পারলাম না। ব্যাপারটা আপনার ভাবীর চোখ এড়ায়নি। আমাকে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে দেখে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? আর যাই হোক, স্ত্রীকে সত্যটা বলে ঘরে অশান্তি ডেকে আনা যায় না! তাই বললাম,, একটা ব্যবসা নিয়ে বড় চিন্তায় আছি। তখন আপনার ভাবী বলে ওঠে, এ কারণেই তো চাকরি ছাড়তে নিষেধ করেছিলাম। চাকরিতে বেহুদা টেনশন নেই।
সুযোগ পেয়ে ফোড়ন কাটলাম- ভাবী ঠিকই বলেছেন, সময় মতো ভালো বেতন পেলে চাকরি কোনো তুলনা হয় না।
অমনি তালুকদার পাল্টা শোনালেন- আপনারা ছাপোষা মানুষেরা তাই বলবেন। আমি তাই কখনো ছাপোষা বা গোবেচারা টাইপের ছিলাম না। বড় কিছু করতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে। আমার কথায় আবার মাইন্ড করলেন না তো?
- এতে আবার মাইন্ড করার কী আছে?
শরীফউদ্দীন তালুকদার এবার হাত ঘড়ি দেখলেন- সাংবাদিক সাহেব, আজ এ পর্যন্তই থাক। আমার একজন ভিআইপি গেস্ট আসার সময় হয়ে গেছে। কাগজ-কলম গুটিয়ে বললাম- আমরা কিন্তু মিসেস চৌধুরী এবং তার মেয়ে লায়লা পর্যন্ত এসেছি। আপনার রেকর্ড কমপ্লিটের জন্য আরো দুজন বাকি আছে।
- আ-রে ভাই এ কারণেই তো প্রেস কনফারেন্স এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিলাম। সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেই আপনাকে কল করবো।
- ঠিক আছে।
- হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আপনার সঙ্গে এভাবে সিটিং দিতে গিয়ে নতুন একটা আইডিয়া আমার মাথায় খেলছে।
- সেটা আবার কী?
- এখন বলবো না। প্রেস কনফারেন্সটা আগে শেষ হোক। এখন শুধু জেনে নেন, লায়লার মৃত্যুতে আমি সত্যিই কষ্ট পেয়েছিলাম।

সতের

নির্ধারিত সময়ে সংবাদ সম্মেলনটা হয়ে গেলে আমি ঝামেলামুক্ত হয়ে যেতাম। কথায় আছে, যার মাথা তার ব্যথা। তালুকদারই ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রেখেছেন। ইচ্ছে করলে তিনি এক সিটিং-এ পুরো ব্রিফটা দিতে পারতেন। এতদিনে তার বক্তব্য ড্রাফট করে ফাইনাল করে ফেলতাম। কম্পিউটার কম্পোজ শেষে শখানেক ফটোকপি করলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কত আর সাংবাদিক আসবে! রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্যামেরাম্যান আর বন্ধু স্থানীয়দের মিলিয়ে বড়জোড় পঞ্চাশ-ষাটজন হবে। আমার পরামর্শে সেভাবেই অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হচ্ছে। সংখ্যাটা বাড়লেও সে ব্যবস্থাও করে রাখা হবে। তালুকদারের যে ব্যস্ততা দেখছি তাতে মনে খটকা লাগে শেষ অবধি সংবাদ সম্মেলন হবে তো! না হওয়ার কোনো কারণ আপাতত দেখা না গেলেও অনিশ্চয়তাকে একেবারে ঝেড়ে ফেলা যায় না। আবার কোন ফ্যাকড়া এসে দাঁড়ায়- কে জানে!
আমার অবশ্য ক্ষতি নেই। কাজের পারিশ্রমিক বাবদ হলুদ খাম ঠিকই পাব। তার চেয়েও বড় কথা হলো, বিষয়টা দারুণ ইন্টারেস্টিং।' একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে সকলকে। এখনো ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গে টু শব্দটিও করিনি। আর স্ত্রীকে বলার প্রশ্নই ওঠে না।
একটু আগে বাজার থেকে ফিরেছি। বারান্দায় চেয়ারে বসে বাতাস খাওয়ার অছিলায় সিগারেট ধরাতে যাব, এমন সময় পেছনে ঘরের ভেতর থেকে মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। আমাকে উঠতে হলো না। গিন্নিই ফোনটা নিয়ে হাজির- ধরো, তোমার কল এসছে। ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলাম খলিলের নাম। রিসিভ



করতেই পরিচিত গলাটা তেড়ে আসে- খবর কিছু রাখিস?
- কী খবর আবার?
- ওই যে ব্যাটা তালুকদার আস্ত লম্পট, মিনাকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে গেছে।
অবাক না হয়ে পারলাম না- বলিস কী দোস্ত! আমি তো জানতাম, তালুকদার একাই সিঙ্গাপুর যাবে। বিজনেসের কাজে।
- কেইসটা তো ওখানেই। বুঝলি দোস্ত, তোকে দিয়ে হবে না। তুই ভদ্র সাংবাদিক। তোর পরিচিতি ক্রাইম রিপোর্টার আছে না? আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দে। আমি শালার তালুকাদরের হাড়ি হাটে ভেঙ্গে ছাড়বো।
বুঝতে পারলাম তালুকদার ওপর বেশ চটে আছে খলিল। এটাই স্বাভাবিক। নারী ঘটিত ব্যাপারে খুন-খারাপিও ঘটে যায়। এ ধরণের খবর আজকাল প্রায় পত্রিকায় চোখে পড়ে। আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম- আরে দোস্ত, মাথা ঠান্ডা রাখ। সব ঠিক হয়ে যাবে।
- তুই তো সেকথাই বলবি। তালুকদারের দালালি করলে তোর লাভ আছে।
খোঁচাটা হজম করা আমার জন্য কঠিন। তবু ধৈর্য্য হারালাম না। একে তো খলিল আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। একটু মেজাজি হলেও মনটা ভালো। রাগের মাথায় কড়া কথা বললেও পরক্ষণে আবার ক্ষমা চাইতেও দ্বিধা করে না। তবে আমি ইচ্ছে করেই শুধু লাইনটা কেটে দিলাম না, ফোনটাও অফ করে রাখলাম। এসব নারীঘটিত কথাবার্তা গিন্নির কানে গেলে আরেক সমস্যা। হয়তো লাভলি মুখের ওপর শুনিয়ে দেবে- তোমরা বাইরে তাহলে লুচ্চামি করে বেড়াও! তার চেয়েও বড় ব্যাপার হলো, আমাকেও সন্দেহ করবে। এমনিতেই অফিস থেকে রাত করে বাসায় ফেরা নিয়ে কত কথা শুনতে হয় মাঝে-মধ্যে। এ কারণেই তালুকদারের সংবাদ সম্মেলন বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু জানাইনি। আসলে খলিলের ব্যাপারটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। যার যার ব্যক্তিগত সমস্যা। কিন্তু তালুকদারের কাজে এমন জড়িয়ে গেছি, ইচ্ছে করলেও উপড়ে ফেলা যায় না। এখন তাড়াতাড়ি সংবাদ সম্মেলনটা করতে পারলেই যেন বাঁচি। সেটা আগামী সপ্তাহে যে করেই হোক করতে হবে। মিনা হোসেনকে নিয়ে তালুকদার কোন জাহান্নামে গেল- সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। ওকে বিয়ে করলো না শেষতক খুন করে লাশ রাস্তায় ফেলে রাখলো তা নিয়েও আমার আগ্রহ নেই। বরং মিসেস চৌধুরী মেয়ে লায়লা এবং লায়লার মেয়ে অ্যানি না রানী- কার সাথে তালুকদারের অ্যাফেয়ার্স গড়ে উঠে কবে নাগাদ ও কদ্দুর গড়িয়েছিল সেটা জানা জরুরি। মনে মনে ঠিক করলাম তালুকদার দেশে ফিরলেই নোট নেওয়ার কাজে সিরিয়াস হতে হবে। প্রয়োজনে চাপ দিয়ে বাকি কাজটা সেরে ফেলবো।
ইচ্ছে করলেই খলিলের কথা ভুলতে পারছিলাম না। গলার বিঁধা মাছের কাটার মতো খচখচ করছিল। আমি কী, সত্যিই তালুকদারের দালাল? কথাটা সত্যিই আপত্তিকর। শরীফউদ্দীন তালুকদার আমার বড় ভাইয়ের মতো। বিভিন্ন দরকারে, বিশেষত গণমাধ্যম বিষয়ক কিছু থাকলে আমাকে ডাকেন। পরামর্শ নেন। মত বিনিময় করেন এবং মাঝে-মধ্যে কাজটাজ দেন। এই যেমন সংবাদ সম্মেলন। আবার মাঝে-মধ্যে সময় পেলে আমিও তালুকদারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু মোসাহেবি কিংবা দালালি ওসব আমার ধাতে নেই। সেটা থাকলে এ্যাদ্দিন কোন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক বনে যেতাম।
বেলা বারোটার দিকে প্রেসক্লাবের দিকে রওনা দেই। ওখানে খাওয়া-দাওয়া আর আড্ডা সেরে অফিসের দিকে পা বাড়াবো। বাসায় সেই যে মোবাইল ফোনটা অফ করেছিলাম আর চালু করার খেয়াল ছিল না। বাসা থেকে বেরিয়ে রিকশায় উঠার আগে ফোন অন করলাম। কড়া রোদের জন্য হুড টেনে ডিআইটি রোডের জ্যাম ঠেলে মালিবাগ রেলগেটের কাছে আসতেই কল এলো। রিসিভ করতেই খলিলের গলা- দোস্ত, তুই রাগ করেছিস আমার কথায়? এতক্ষণ তোর মোবাইল অফ দেখে আমি সেটা বুঝতে পারছি। আমি ক্ষমা চাচ্ছি দোস্ত, মাফ করে দে। আসলে আমার মাথা ঠিক নেই। জানিস, জীবনে কত মেয়েলোক দেখেছি, কিন্তু মিনার মতো কেউ আমাকে এতটা আচ্ছন্ন করেনি।
খানিকটা রুঢ় গলায় বললাম- দ্যাখ এসব শোনার সময় কিংবা রুচি আমার নেই।
- সেটা আমি জানি। তোকে আমি ফোন করলাম যে, আমার ওপর মাইন্ড করিস না, দোস্ত। আবারও বলছি, আমার মাথা ঠিক নাই। আজ সকালে তোর ভাবীর গায়ে হাতও তুলেছি।
কথাটা বলেই খলিল লাইন কেটে দেয়। ওর শেষের বাক্যে আমি বিস্মিত। এতটা নিচে নেমেছে খলিল! বুঝতে পারলাম ওর ব্যাপারটা আসলেই গুরুতর। মিনার প্রতি ও সত্যিই সিরিয়াস। তালুকদার ফিরে এলে এ প্রসঙ্গে কথা বলবো নাকি ওর সঙ্গে? পরক্ষণেই চিন্তাটা নাকচ করে দেই। ওসবের ভেতর নাক গলিয়ে লাভ নেই। তাতে সমস্যা জটিল হবে। এখন সংবাদ সম্মেলনটা করতে পারলেই আমার দায়িত্ব শেষ। তারপর প্রয়োজন হলে তালুকদারের দরজা দুই-একমাস মাড়াবো না।

আঠারো

যথাসময়ে সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এলেন শরীফউদ্দীন তালুকদার। নিজে ফোন না করলেও বেলা এগারোটার দিকে অফিসের টেলিফোন অপারেটর দিয়ে জানান, লাঞ্চ আওয়ারে আমার অপেক্ষায় থাকবেন। বুঝতে পারলাম, সংবাদ সম্মেলনের ব্যাপারে তালুকদার সত্যিই সিরিয়াস। আমি মনে মনে তৈরিই ছিলাম। ঠিক সোয়া একটার দিকে পা রাখলাম ওর মতিঝিলের অফিসে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বললো- স্যার, আপনার জন্য একটা গিফট আছে, যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন।
ফাইলপত্র সই করিয়ে এক স্টাফ ভেতর থেকে বেরিয়ে এলে আমি তালুকদারের রুমে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই রিভলিং চেয়ারে বসা তালুকদার বলে ওঠেন- সাংবাদিক সাহেব, আপনার প্রেস কনফারেন্সের জন্যই দেশে ফিরে এলাম। সিঙ্গাপুর থেকে থাইল্যান্ডে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, ওটা বড় সুন্দর দেশ, গেলে আর আসতে মন চায় না। কী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাস্তাঘাট এক ফোটা ময়লাও খুঁজে পাবেন না।
শ্যামদেশের এ প্রশস্তির পেছনে একটা কারণ যে মিনা হোসেন, সেটা আঁচ করলাম আমি। হয়তো মাইন্ড করতে পারেন- তাই আর এ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম না। সরাসরি কাজের কথায় গেলাম- আমরা কিন্তু পিছিয়ে পড়ছি, আপনার স্টেটমেন্ট লায়লা পর্যন্ত আটকে আছে।
- তা জানি বলেই তো আপনাকে ম্যাসেজ পাঠিয়েছি। জামকালো এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের এপাশে চেয়ারে বসে কাগজ-কলম বের করে আমি প্রস্তুত। তালুকদার প্রশ্ন করেন- কোত্থেকে আমাকে শুরু করতে হবে?
- লায়লার মৃত্যুতে আপনি কষ্ট পেয়েছেন।
- হ্যাঁ মনে পড়ছে। আসলে কী জানেন, মানুষের জীবনটা বড় বিচিত্র। ওই যে ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, স্ট্রেঞ্জ মোর দ্যান ফিকশন। নতুবা আমার জীবনে এমনটা ঘটবে কেন। মিসেস চৌধুরী নেই, তার মেয়েও মারা গেছেন সেই পাকিস্তানে, ব্যাপারটা তো সেখানেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাকে বলে ললাটের লিখন। কী বলেন সাংবাদিক সাহেব?
আমি নিশ্চুপ। জবাব দেওয়ার কোনো তাগিদ বোধ করলাম না।
ক্ষণেক কী যেন ভাবলেন শরীফউদ্দীন তালুকদার। আমি নিশ্চিত ওই অবস্থায় টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট আর অ্যাশট্রে থাকলে একশলা ধরিয়ে ফেলতেন। তালুকদার বলে ওঠেন- বঙ্গবন্ধু কিলিংয়ের পর জিয়া এলেন ক্ষমতায়। চট্টগ্রামে ট্যুরে গিয়ে সেখানকার সার্কিট হাউজে মার্ডার হলেন। এরশাদ সাহেবের জমানা শুরু হলো। সত্যি কথা বলতে কি, দেশের এই রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন নিয়ে আমার কখনও তেমন মাথা ব্যথা ছিল না। তবুও জেলখানা ঘুরে আসার মতো একটা ঘটনাও আমার জীবনে ঘটেছে, সেটা আপনি জানেন। বরাবর নিজের চরকায় তেল দিতেই ব্যস্ত ছিলাম। কী করে ব্যবসা বাগানো যায়- সেই ধান্ধায় থাকতে হতো। আর রাজনৈতিক মূল্যায়নে আমাকে একজন সুবিধাবাদীই বলতে পারেন। এক্ষেত্রে আমার কৌশলটা হলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মতোই। কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব। যদিও আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের গ্রেট লিডার হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করি, আবার জিয়া সাহেবের অবদানকেও অস্বীকার করি না। তবে তখনকার পরিস্থিতিতে উত্তরপাড়া, বুঝতেই পারছেন ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই হতো। কর্ণেল-ব্রিগেডিয়ারদের কানেকশন থাকলে ব্যবসা বাগানোটা সুবিধা ছিল। আমি যে তখন একটা প্রাইভেট ব্যাংকের পরিচালক হতে পেরেছিলাম সেটা এক ব্রিগেডিয়ারের সুবাদে। তিনি একটি বিশেষ সংস্থার চিফ ছিলেন, তাঁর তদবিরেই আমরা ব্যাংকের অনুমোদন পেয়েছিলাম। কথাটা বলেই তালুকদার যেন একটু দম নেন; সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন- অব দি রেকর্ডে এসব কথা বলছি। আপনি আবার কোথাও নিউজ করে বসবেন না যেন!
অনেকেই বলে, সাংবাদিকদের কাছে মুখ খোলাটাই বিপদজনক। তবে আমি আপনাকে আপন ভাইয়ের মতোই বিশ্বাস করি।
এবার নিশ্চুপ থাকলাম না, বলেই ফেললাম- স্যার, এত ইতিহাস শোনার ইচ্ছা আমার নেই। আসলে কথাটা বললেই তো ল্যাটা চুকে যায়।
- তা তো বলবোই। তার আগে চলেন ওদিকে খাবার পড়ে আছে। আগে খেয়ে নিই। কথায় আছে পেট ঠিক তো দুনিয়া ঠিক।
ক্ষিদে আমারও পেয়েছিল। আপত্তি করলাম না। পাশের রুমে ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজানো। ডাল-ভাত, সবজি আর মাছ মাংস। টক ও মিষ্টি-দুই প্রকার দইও আছে। খেতে বসে একটা অভাবই অনুভূত হচ্ছিল। সাদা শার্ট কালো টাই পরা অফিস স্টাফগুলোর বদলে মিনা হোসেন থাকলে ভালো হতো। যদিও সেটা ঘুনাক্ষরেও তালুকদারকে আঁচ করতে দিলাম না।
খাওয়া-দাওয়া সেরে আগের জায়গায় ফিরে এলাম। খানিকটা স্মৃতি হাতড়ে শরীফউদ্দীন তালুকদার বলা শুরু করেন- আমি তখন বিক্রমপুর হাউজ ছেড়ে মতিঝিলের আমিন কোর্টে অফিস নিয়েছি। একদিন সেখানে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন আরিফ সাহেব। চিনতে পারছেন তো, লায়লার কাজিন! ভদ্রলোক এসেই বললেন, তালুকদার বড় বিপদে পড়ে গেছি একমাত্র আপনিই পারেন উদ্ধার করতে। অ্যানি কী আপনাকে ট্রাঙ্ককল করেছিল? আমি জবাব দেই, না তো। আর করলেও লাভ নেই, আমার বাসার টেলিফোন লাইন কদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে। আরিফ জানান, লায়লার মেয়ে রানী নাকি বাংলাদেশে চলে এসেছে তাদের ড্রাইভারের সাথে। খবরটা শুনে অবাক হলাম। লায়লার দ্বিতীয় মেয়ে তাহলে সেয়ানা হয়ে গেছে! ইচ্ছা করলে ঝামেলাটা এড়াতে পারতাম। কিন্তু একে তো লায়লার মেয়ে, উপরন্তু মিসেস চৌধুরীর নাতনি। দায়িত্ব বলেও তো একটা কথা আছে! আরিফকে আশ্বাস দেই, যে করেই হোক ওকে খুঁজে বের করবো। বুঝলেন সাংবাদিক সাহেব, মানুষের জীবন কখন কোত্থেকে মোড় নেয়, বলা মুশকিল। সেদিন ব্যস্ততার অজুহাতে আরিফ সাহেবকে ফিরিয়ে দিলে আজ আপনাকে এভাবে ডাকতে হতো না।

- আমি তালুকদারের কথায় সায় দেই- ঠিকই বলেছেন, আপনি।
- লায়লার মেয়ে যে এমন একটা কান্ড ঘটাবে এটা সত্যিই আমার কল্পনার বাইরে ছিল। রানীর নাম শুনেছি শুধু, কখনো ওকে দেখিনি। অ্যানিকে দেখেছি। অ্যানিরও অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে। আরিফ বলেছেন, অ্যানি নিজেই ঢাকায় আসতো। কিন্তু প্রেগন্যান্ট, সাত-আট মাস চলছিল তখন। ডাক্তার তাকে রিস্ক নিতে বারণ করেছে । যা হোক, লায়লার মেয়ে, মিসেস চৌধুরীর নাতনি- ইচ্ছা করলেও ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মিসেস চৌধুরীর নুন আমার পেটে আছে। যদিও এক অর্থে আমি নিমকহারামও।

তালুকদারের শেষ বাক্যে না হেসে পারলাম না।
- হাসছেন যে?
- আপনি ভাই অদ্ভুত মানুষ। আমার দৃষ্টিতে তো অসাধারণ!
- তা মন্দ বলেননি। অসাধারণ দেখেই এই নজিরবিহীন ইন্সিডেন্ট ঘটাতে পেরেছি। তবে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, আমি পরিস্থিতির দাস মাত্র। কথায় আছে না, ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে। ব্যাপারটা ওই রকমই। এক পর্যায়ে অবশ্য একটা ইচ্ছা আমার মধ্যে কাজ করতে শুরু করে। এক্ষেত্রে কবির ভাষায় বলতে পারি, পটভূমি তৈরি হয়েছিল বলেই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল। কী যেন বলছিলাম, হ্যাঁ-অ্যানি ঢাকায় আসতে পারেনি প্রেগন্যান্ট হওয়ায়। আমার সঙ্গে কথা হয় আইএসডি টেলিফোনে আরিফের বাসায়। মেয়েটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল, আমাকে বললো, আংকেল আপনি আমাদের আপন লোক, যে করেই হোক রানীকে ফিরিয়ে দেবেন। এটা না করতে পারলে আমাদের মান-ইজ্জত তো যাবেই তারপর আমার বোনের লাইফটা স্পয়েলও হবে।

শরীফউদ্দীন তালুকদার হাতঘড়ি দেখালেন। আর সুযোগ বুঝেই যেন তার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। তবে নাম্বারটা দেখে রিসিভ করলেন না। মুখে খানিকটা বিরক্তের ভাব নিয়েই লাইনটা কেটে দেন। আমার মনে সন্দেহ উঁকি দেয়- খলিলের ফোন নয়তো? তবে তালুকদারকে সেটা জিজ্ঞেস করলাম না।
- আর বেশিক্ষণ সময় দেওয়া যাবে না। আমাকে ব্যাংকে যেতে হবে। সামনে আবার বোর্ড মিটিং আছে।

কথাটা শুনে কোনো মন্তব্য করলাম না।

তালুকদার বলে ওঠেন- আমি আরিফের কাছ থেকে জেনে নেই, করাচিতে সবাই জানে অ্যানি মায়ের দেশে বেড়াতে এসেছে। ও যে ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে সেটা পরিবারের মান-সম্মানের কথা ভেবে গোপন রাখা হয়েছিল। ড্রাইভারটা ছিল এক বাঙালি যুবক। আপনি শুনলে অবাক হবেন, পাকিস্তানে- বিশেষ করে করাচি সিটিতে কয়েক লাখ বাঙালি বসবাস করছে। কেউ কেউ পাকিস্তান জমানা থেকে আছে। বেশিরভাগই বাংরাদেশ থেকে চোরাই পথে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে সেখানে। ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি-বাকরির পাশাপাশি অনেক বাঙালি আরব সাগরে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত। একবার করাচির এক বাঙালি কলোনিতে গিয়ে আমি অবাক, মনেই হচ্ছিল না পাকিস্তানে গেছি। আরেকটা বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে সেখানে, চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। অথচ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানের ভূমিকার কথা ভাবলে আমরা এখনও ওদেরকে শত্রুদেশ ভাবি।

এবার নিশ্চুপ রাইলাম না- তা তো ভাববোই। ওরা এখন পর্যন্ত একাত্তরের মানবতা বিরোধী ভূমিকার জন্য ক্ষমা চায়নি। তারপর পাকিস্তান নামটার আষ্টেপৃষ্ঠে আছে সাম্প্রদায়িকতা। আমার দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতার কাজই হচ্ছে মানুষে মানুষে হানাহানি- যা মানবতার শত্রু।
- না ভাই, এখন রাজনৈতিক প্যাচাল নয়। হাতে তেমন সময়ই নেই যে ধান ভানতে শীবের গীত গাইবো। সোজা কথা হলো, আরিফ সাহেবের সহযোগিতায় এখানে-সেখানে খবর লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত রানীকে ট্রেসকরলাম নোয়াখালীর এক গ্রামে। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক ছিলেন তখন পুলিশের এআইজি। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ছিল তার পোস্টিং। তিনি ফোন করে দিয়েছিলেন নোয়াখালীর এসপিকে। গিয়ে দেখি আমাদের জন্য ভিআইপি ট্রিটমেন্ট। গ্রাম পর্যন্ত যেতে হলো না, পুলিশ রানী ও তার প্রেমিক, বলতে পারে স্বামীকে ধরে থানায় নিয়ে এলো। ওই ব্যাটাকে কিডন্যাপিং কেসে তো বটেই, স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টে জড়ানো হলো। তারপর চালান করে দেওয়া হয়। তখন স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এখনকার মতো ঢোড়াসাপ হয়ে যায়নি যে হাইকোর্টে গেলেই জামিন পাওয়া যাবে। আমরা নোয়াখালীতে যাওয়ার আগে এআইজি সাহেবের সহযোগিতায় এবং এক ল ইয়ারের পরামর্শে ঢাকায় রমনা থানায় একটা অপহরণ মামলা করি। বাদী হলেন আরিফ।
- রানী কী আপনাদের সঙ্গে ঢাকায় ফিরেছিল?



- সাংবাদিক সাহেব, একদম বাচ্চা ছেলের মতো একটা প্রশ্ন করলেন। আমরা কী রানীকে ফেলে আসব কিংবা সেফ কাস্টোডিতে রাখার জন্যই নোয়াখালীতে গিয়েছিলাম? অমন কাঁচা কাজ করার পাত্র আমি কখনও ছিলাম না। ল ইয়ার না হলেও আইন সম্পর্কে আমার যথেষ্ট ধারণা আছে। কোর্ট-কাছারিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও কম নয়। এই তো পরশু দিনও আমাকে হাইকোর্টে যেতে হবে। তা ভাই, আসেন বাকি কথা শর্টকাটেই সেরে ফেলি।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, শর্টকাটে সেরে ফেলার সুযোগ পেলেন না তালুকদার। তার এক স্টাফ এসে স্মরণ করিয়ে দেয়- স্যার, আপনার মোবাইল বন্ধ? ব্যাংক থেকে এমডি স্যার ফোন করেছিলেন।

ফুলপ্যান্টের ভেতর ইন করে পরা ফুলহাতা শার্ট পরা গলায় টাই ঝুলানো বেশ স্মার্ট তরুন স্টাফ বিদায় হতে না হতেই কদিন ধরে তালুকদারের পিএ হিসেবে কর্পোরেট অফিসে যোগ দেওয়া চশমা পরা ফর্সা মেয়েটি ভেতরে ঢুকে বলে- স্যার, কোহিনুর বেগম নামের এক মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মহিলার নামটা শোনামাত্রই তালুকদারের কপাল কুঁচকে গেল- মহিলাকে বলো স্যার এখন ব্যস্ত, আগামী সপ্তাহে আসতে বলেছেন।

এই ফাঁকে আমি কাগজ-কলম গুটিয়ে ফেলেছি। তালুকদার কিছুনা বললেও তখন বুঝতে অসুবিধা হয়নি, আজকের মতো তার ডিক্টেশন দেওয়া শেষ।

উনিশ

কথা ছিল, বুধবার শরীফউদ্দীন তালুকদারের অফিসে যাবলাঞ্চ আওয়ারে। ওই সময়টাতেই তিনি ফ্রি থাকেন। কিন্তু আগেরদিন আমার শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করতে থাকে। মাথা ভার। চোখ জোড়ায় জ্বালা জ্বালা ভাব। সন্ধ্যায় অফিসে ঢুকে খুলনা ব্যুরো থেকে পাঠানো এক এক্সক্লুসিভ নিউজ এডিট করতে গিয়ে টের পাই শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। প্যারাসিটামল আনিয়ে খেলাম। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লেও নিজকে বড় ক্লান্ত লাগে। কাজে উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। নিউজ এডিটর ব্যাপারটা ধরতে পেরেই ছুটি দিলেন। অফিসের স্কুটার পৌঁছে দেয় বাসায়।

বুধবার সকালে টের পেলাম শরীরটা সত্যিই কাহিল। তিনদিনের ক্যাজুয়াল লিভ নেব। জ্বর আসছে, ট্যাবলেট খেলেই আবার ঘাম দিয়ে ছাড়ছে। আমার এই ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার খবরটা সরাসরি তালুকদারের মোবাইল ফোনে কল করে জানিয়ে দিতেই জবাব পেলাম- কুছ পরোয়া নেহি সাংবাদিক সাহেব। রেস্টে থাকুন। মনে রাখবেন, আগে শরীর ঠিক তারপর দুনিয়া ঠিক।

তালুকদার ইনডেমনিটি দিলেও নিজের মনে স্বস্তি নেই। আগামী সপ্তাহে সংবাদ সম্মেলন করাটা সম্ভব কিনা সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জাগছে। তালুকদারের স্টেটমেন্ট এ পর্যন্ত আধাআধি অবস্থায় ঠেকে আছে। তবে ডেট ফিক্সড করে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে রক্ষা। নতুবা রীতিমতো বেইজ্জতি হতে হতো।

মুখে রুচি নেই, দুপুরের খাবার বড্ড বিস্বাদ লাগে। জানালার পাশেই ঘাট। বিকেলের দিকে শুয়ে আছি। গিন্নি গেছে পাশের ফ্লাটে। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটা পড়ে আছে আমার পাশে বিছানায়। কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরই যেন স্ট্যামিনা হারিয়ে ফেলি। বইয়ের বদলে আকাশ দেখি। আশেপাশের ধালানকোঠা বাগড়া দেওয়ায় এক চিলতে আকাশ। গাঢ় নীলের মাঝে একটা খন্ড মেঘ হামাগুড়ি দিচ্ছে। সিলিং ফ্যান সচল আছে বলে ভ্যাপসা গরমটা পাত্তা পাচ্ছে না। বইয়ের পাশে পড়ে থাকা মোবাইল ফোনটা হঠাৎ বেজে ওঠে। রিসিভ করতেই খলিলের গলা- দোস্ত, অফিসে না বাইরে?
- না বাসায়। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, জ্বর।
- তাই নাকি! ডাক্তার দেখিয়েছিস? জবাবের অপেক্ষা না করেই খলিল ফের বলে- দোস্ত, তোকে একটা খবর দেওয়ার জন্য ফোনটা করলাম। কদিন ধরে তালুকদার ব্যাটা আমার ফোন রিসিভ করছে না। ওদিকে মিনাও আগের বাসা ছেড়ে দিয়েছে।

বিরক্ত হয়েই বললাম- আচ্ছা, তুই এসব বাদ দিতে পারিস না! তোর তো ঘর-সংসার আছে!
- সেটা দোস্ত ঠিকই বলেছিস। কিন্তু আমি তালুকদারকে দেখে নিব। ওর ডার্ক প্রোফাইল আছে আমার কাছে। আরো তথ্য সংগ্রহ করছি। আমি হাটে ওর হাড়ি ভেঙে ছাড়বো। দোস্ত, মিনাকেও ছাড়বো না। আমার সাথে বেইমানির ফলটা ওকে ভোগ করতেই হবে। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। মাগী এখন তালুকদারের টাকা দেখে আমাকে চেনে না। আরে, বুঝবে, একদিন বুঝবে। তালুকদারকে তো চিনে না! যেদিন নাক মোছা টিসু পেপারের মতো ওয়েস্টেড বক্সে ছুঁড়ে ফেলবে সেদিন বুঝবে।

কতজনকে দেখলাম, রীনা চৌধুরী, জয়া, শাকিলা, সুইটি, কোহিনুর বেগম, টিনা- কত হাইফাই মেয়ে

ছিল ওর চেয়ে। তালুকদার এখন ওদের দিকে ফিরেও চায় না। আ-রে, খলিল অনেক কিছুর সাক্ষী। প্রায় বোকার মতোই প্রশ্ন করে বসলাম- আচ্ছা, কোহিনুর বেগমটা কে রে?
- তুই চিনিস?
- এবার সতর্ক হলাম। তালুকদারের অফিসে ওই মহিলার যাওয়ার ব্যাপারটা গোপন রেখেই বলি- নামটা কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।
- দোস্ত, তুই ঠিক চিনবি না। একসময় মহিলা ঢাকার টপ লেভেলের মক্ষীরাণী ছিল। তালুকদার ওকে শান্তিনগরের এক ফ্ল্যাট ভাড়া করে রেখেছিল। ওকে দিয়ে কত কী কাজ তখন উদ্ধার করেছে।
- মানে?
- এই যেমন ধর সোনালী ব্যাংকের এক এমডির পেছনে কোহিনুর বেগমকে লেলিয়ে দিয়ে মোটা অংকের লোন সেনসন করিয়েছিল তালুকদার। কয়েকটা ব্যবসায়ে মার খেয়ে তালুকদারের অবস্থা তখন কাহিল। ওই লোন না পেলে তালুকদারের ফুটানি এখন কোথায় যেত!
- এ তো অনেক আগের ঘটনা, তাই না?
- হ্যাঁ, আগের ঘটনা। তুই তো দোস্ত কোহিনুর বেগমকে দেখিস নাই। যেমন টল ফিগার, তেমনি গায়ের রঙ। চেহারাও কাটা কাটা। হিপ আর ব্রেস্টের কথা বাদই দিলাম। তবে দোস্ত, আমি একটা কথা বলে রাখছি, তালুকদারের হাড়ি হাটে ঠিকই ভেঙে ছাড়বো। ভদ্রবেশি এক বদমাইশের চেহারা সমাজের সামনে... ফোনের লাইন কেটে যায়। আমার সেটের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, চার্জ নেই।

জ্বর নিয়ে বাসায় ফেরার পর চার্জ দেওয়ার কথা মনে ছিল না। খলিলের ফোন রিসিভ করতে গিয়ে বিছানায় উঠে বসেছিলাম। ফের শুয়ে পড়ি। জানালা দিয়ে এক চিলতে গাঢ় নীল আকাশে খন্ড মেঘটা বুঝি আটকে গেছে। মিনা হোসেনের চেহারাটা ভেসে ওঠে। একমাথা ঝোকড়া চুল, গভীর কালো চোখজোড়া, খাড়া নাক, টুকটুকে পাতলা ঠোঁট- উজ্জ্বল ফরসা মুখটায় কোনো ত্রুটি নেই। মিনা কী জানে, খলিল তার জন্য কতটা ক্রেজি! ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হলো, খলিলকে ঘোড়া রোগে পেয়েছে। মিনার মতো সুন্দরী যুবতীকে পোষার ক্ষমতা কী ওর আছে? একে তো বয়স হয়েছে, তারপর ঘরে বউ-বাচ্চা আছে! আর তালুকদারকে টেক্কা দেওয়ার মতো অর্থকড়ি কোথায় পাবে? একবার ভাবলাম, খলিলকে হাতের কাছে পেলে ভালো করে বোঝাবো- পাগলামি করিস না। দরকার হলে শাসাবো- এই ভিমরতি তোকে মানায় না। পরক্ষণে মত পাল্টে ফেলি। কী ঠেকা পড়েছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার। কথায় আছে, যার মাথা তার ব্যথা। খলিল বোকা নয়। পাকা ধান্ধাবাজ। সেগুনবাগিচার মতো জায়গায় ফ্ল্যাট কিনেছে। আর তা নিয়ে নিজের গিন্নির কাছ থেকে কত খোচাই না এ যাবত হজম করতে হয়েছে।
হঠাৎ টের পেলাম, তেষ্টা পেয়েছে। খোলা দরজার ওপাশেই ডাইনিং স্পেস। টেবিলের ওপর রাখা পানির জগ-গেলাস নজরে পড়ছে। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। জ্বর নেই, শরীর দুর্বল। পানি খেয়ে বিছানায় ফিরে গেলাম না। বারান্দায় গিয়ে চেয়ারটায় বসলাম। এভাবে শয্যাশায়ী হবো- মোটেই আঁচ করতে পারিনি। তালুকদারের সংবাদ সম্মেলনটা হয়ে গেলে আর চিন্তা ছিলনা। যদ্দিন ইচ্ছা বিছানায় পড়ে থাকতাম। অফিসে আমার অনেক ছুটি জমা আছে। সংবাদ সম্মেলন সময় মতো হতে না পারার পেছনে আমার গফিলতি নেই কোনো। তালুকদারই ঝুলিয়ে রেখেছে। এক্ষেত্রে আমার দোষ বলা যায়, তালুকদারের ট্রপিক্সের প্রতি দারুণ এক কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছে। শেষটুকু না শোনা পর্যন্ত যেন স্বস্তি নেই। জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর সিগারেট ধোঁয়া বিস্বাদ ঠেকলেও এখন আবার ধুমপানের ইচ্ছেটা চাগাড় দিচ্ছে। সিগারেটের প্যাকেট-গ্যাসলাইটার পড়ে আছে সেই বিছানায় সিথানের কাছে। ঘরে কেউ নেই যে ডাকবো। খেয়াল হলো, মোবাইল ফোনের সেটে চার্জ দিতে হবে। খলিলের হুমকি ফের মনে পড়তেই নিজে নিজে সতর্ক হলাম- ওর যা মুড, কোনো অবস্থায় ওকে তালুকাদরের সংবাদ সম্মেলনের ব্যাপারটা জানানো যাবে না। ভন্ডুল করতে না পারলেও একটা ঝামেলা বাধাতে পারে। শুনেছি, নারীর জন্য পুরুষের কখনো কখনো এমন ক্ষেপে যায় যে সব করতে পারে। ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছে কি খামাখা! ইতিহাস ঘাঁটলে কামিনীর তরে যুদ্ধ-বিগ্রহের নজির মিলবে ভুরি ভুরি। চালাক-চতুর হলেও খলিলকে আমি নিরীহ স্বভাবের মানুষ বলেই জানতাম। কোনো বিষয়ে এতটা ক্রেজি হতে ওকে দেখিনি। আমার তো মনে হচ্ছে, ক্ষমতা থাকলে মিনা হোসেনের জন্য তালুকদারকে খুনও করতে পারতো!

বিশ

ভেবেছিলাম, টেলিফোনে যোগাযোগ করে তালুকদারের অফিসে যাব। সিটামলের ধাক্কায় জ্বর হটে গেছে। এখন শরীর অনেকটাই স্বাভাবিক। ফোন করতেই শরীফউদ্দীন তালুকদার বলে ওঠেন- আজ দরকার নেই। আপনি বিশ্রাম নিন। আমি তো বলেছি, শরীর ঠিক তো দুনিয়া ঠিক।
- কিন্তু আমাদের প্রেস কনফারেন্স তো পিছিয়ে যাচ্ছে।
- আ-রে, আপনি এ নিয়ে ভাববেন না। ব্রাদার ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। প্রেস কনফারেন্স তো ওয়ান টু'র ব্যাপার। ক্ষণেক ভেবে তালুকদার ফের বলেন- ঠিক আছে, আগামীকাল আসুন, আমরা এক সঙ্গে লাঞ্চ করবো।
অফিস থেকে নেওয়া ছুটির শেষদিন। গেল দুদিনের মতো সারাদিন ঘরে আটকে থাকতে মন চাইলো না। তালুকদারের ওখানে যখন যাওয়া হচ্ছে না দেখে ঠিক করলাম, প্রেসক্লাবে যাব। কদিন ধরে ওদিকে পা পড়ছে না। বাইরে সকাল থেকেই মেঘলা ভাব। দুপুরেই বেরিয়ে পড়তাম। কিন্তু এক পশলা বৃষ্টি বাগড়া দেয়। জ্বরের ধকল কাটেনি পুরোপুরি। বৃষ্টিতে ভেজার ঝুঁকি নিলাম না। বিকেলে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার দেখে লাভলির আপত্তি গায়ে না মেখেই বেরিয়ে পড়লাম। গলির মুখে খালি রিকসা পেয়ে চড়া ভাড়াতেই রাজি হয়ে যাই। সরাসরি প্রেসক্লাব। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে ক্লাবের গেট পেরিয়ে কেবল ভেতরে ঢুকেছি পরিচিত সাংবাদিক রাশেদের মুখোমুখি। আমাকে দেখেই প্রশ্ন করে বসলো- বড় ভাই, একটা সংবাদ সম্মেলন করবেন বলে বলেছিলেন, সেটার খবর কী?
- হবে, হবে। তারিখ ফিক্সড হলেই আমি জানিয়ে দেব।
- আচ্ছা, আপনাদের সংবাদ সম্মেলনের বিষয়টা নিয়ে শেয়ার করতে পারি?
- এখন নয়। সময় হলে নিশ্চয় শেয়ার করবো।
- রাশেদ যেন নাছোড়বান্দা।
- আমাকে টিপস দিলে আমি একটা নিউজ করে দিতে পারি।
- আপনি এখন কোন বিটে আছেন?
- ফাইন্যান্স।
- সরি আমরা অর্থনীতি বা শিল্প-বাজার নিয়ে কোনো প্রেস কনফারেন্স করতে যাচ্ছি না।
জবাবটা শুনে রাশেদ খানিকটা বিস্মিত- মানে! শুনলাম তো শরীফউদ্দীন তালুকদার সংবাদ সম্মেলন করবেন। উনি একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি ব্যবসায়ী। তালুকদার গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজের চেয়ারম্যান। উনি আবার কোন বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন? রাজনীতিতে যোগদান করছেন?
- সেটাও নয়।
- তাহলে?
- সময় হলে জানবেন।
রাশেদ বিদায় নেওয়ার পরও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। সংবাদ সম্মেলন নিয়ে ঘনিষ্ঠ দুই-একজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাদের কাছ থেকেই ছড়িয়েছে। এখন সংবাদ সম্মেলনটা সম্পন্ন না করতে পারলে কেউ আমাকে ফালতু ভাবলে দোষ দেওয়া যাবে না। প্রেসক্লাব ভবনে ঢুকতে যাব-এমন সময় আমাকে দেখে আরেক সাংবাদিক ছুটে এলো- আ-রে কমরেড কী খবর! তোমাকেই তো খুঁজছি। লাক ভালো, পেয়ে গেলাম।
রহমান আমার বন্ধু স্থানীয়। আমরা এক সময় একই বাম ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। ওর কথায় অবাক হলাম। দেখা-সাক্ষাৎ নেই মাস ছয়েকের মতো। কী এমন দরকার থাকতে পারে যে আমাকে খুঁজছে। শুধু ছাত্র সংগঠন নয়, এক সময় আমরা একই পত্রিকায় চাকরিও করেছি। তবে বন্ধু হলেও হালে ওকে এড়িয়ে চলি। একদা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা রহমান এখন একে তো উড়নচন্ডী, তারপর পত্রিকায় ঢুকে ক্রাইম বিট করতে করতে ওর নৈতিক স্খলন ঘটেছে। মদ আর নারীবাজি তো ডালভাত, ওর সম্পর্কে চাঁদাবাজি- এমন কি ব্লাকমেইলিং করারও অভিযোগ শোনা যায়। যে কারণে রিপোর্ট লেখার দারুণ হাত আর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ভালো কোনো পত্রিকা বা প্রতিষ্ঠানে ঢুকতে পারছে না। এখন ওর অবস্থা ভাসমান। রহমানকে পাশ কাটাতে চেয়েও পারলাম না, অনেকটা চিনে ঝোঁকের মতো আমাকে ধরে বসে- কমরেড, তোমার সঙ্গে কথা আছে।
কোনো রকমে বিরক্তি চেপে রেখে বললাম- কী কথা?
- তোমার এক বন্ধু আছে না, নামটা যেন কী, শালার মেমোরি ডাল হয়ে গেছে, নামটা মনে পড়ছে না।
- আমার আবার কোন বন্ধু?
- ওই যে মুখে গোঁফ আছে চান্দি মাথা, হ্যাঁ, মনে পড়ছে খলিল সাহেব। ওর সঙ্গে দেখা হলো সেদিন সাকুরা বারে।
- ওর সঙ্গে আবার দোস্তি কবে থেকে?
- তা ধরো মাস পাঁচ-ছয় মাস তো হবেই।
সোনারগাঁও কাফে বাজারে ড্রিঙ্ক করতে গিয়ে প্রথম পরিচয়। তারপর এখানে-সেখানে দেখা। আমি সাংবাদিক জেনে প্রথমদিনই তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল, আমি তো বললাম- ও তো আমার পার্টির লোক ছিল। বুঝলে কমরেড, আমার একই লাইনের লোক। তোমার মতো নিরামিষ নই।
অন্য বিষয় হলে ঠিকই কোনো অজুহাতে সটকে পড়তাম রহমানের কাছ থেকে। কিন্তু খলিলের নাম উচ্চারণ করায় জিজ্ঞেস না করে পারলাম না- আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেছে?
- না। অন্য একটা কেইস।
- সেটা আবার কী?
- ওই যে বুর্জোয়াদের আলুর দোষ বলে না তাই! কোন এক তালুকদার আছে ব্যাটা নাকি শিল্পপতি। তবে আস্ত একটা লম্পট। আজিজ মোহাম্মদ ভাইকেও ছাড়িয়ে গেছে। খলিল বলেছেন, অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে। কোনো এক কোহিনুর বেগম আছে তার কাছে গেলে অনেক তথ্য মিলবে।

রহমানের কথা শুনে অবাক না হয়ে পারা গেল না। খলিল কোমরে গামছা বেঁধেই নামতে চাচ্ছে। তবে তালুকদারের সঙ্গে যে আমার পরিচয় আছে সেটা রহমানকে আঁচ করতে দিলাম না। এমন একটা ভাব দেখালাম ব্যাপারটা নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। ওর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে প্রেসক্লাবের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। কয়েকজন পরিচিত সাংবাদিকের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েও রহমানের কথাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। খলিল একা নয়, কোহিনুর বেগমকেও হাত করেছে। একবার ভাবলাম, ব্যাপারটা জানিয়ে তালুকদারকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত। পরে মত পাল্টে ফেলি- দরকার নেই ওই

ঝামেলায় জড়িয়ে। সংবাদ সম্মেলনটা করে দিয়ে খালাস হতে চাই। তবেআমার ধারণা, শরীফউদ্দীন তালুকদার কচি খোকা নন। বরং ঘাগু মাল। কখন কাকে কীভাবেম্যানেজ করতে হয়, সেটা ভালো করেই জানেন।

আমার সামনে, টেবিলের উল্টাদিকে আধা পরিচিত এক জুনিয়র সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করে- ভাই, আজ চুপচাপ কেন, শরীরটা খারাপ?

- হ্যাঁ, দুদিন ফ্লুতে ভুগেছি।
- আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।
- এখন অবশ্য জ্বর-টর নেই।

কথাটা শেষ করতেই পকেটের ভেতর মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। এই তথ্য-প্রযুক্তির যুগে আমার মতে একটা সমস্যা হলো, নিভৃতে থাকা যায় না। পকেট থেকে ফোনটা বের করে মনিটরে দেখি কল এসেছে আমার বাসার ল্যান্ডফোন থেকে। নিশ্চয় লাভলি করেছে। অবাক হলাম, ওর তো ফোন-টোন করার বড় একটা অভ্যাস নেই। কিছু ঘটলো নাকি আবার! কল রিসিভ করতেই গিন্নির গলা- কোথায় তুমি? তোমার বন্ধু খলিল ভাই এসেছে তোমাকে দেখতে। এই ধরো কথা বলো।

পর মুহূর্তেই খলিলের গলা- দোস্ত, তুই অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথায় গেলি! আমি তো জ্বরের খবর পেয়ে তোকে দেখতে এসেছি।

মহাবিরক্ত হলেও সেটা চেপে রাখলাম- ভালো হয়ে গেছি। জ্বর-টর নাই।

- তুই ফিরবি কখন?
- দেরি হবে।
- ঠিক আছে দোস্ত, আজ আর দেখা হচ্ছে না। কিছু জরুরি কথা ছিল, দেখা হলে বলবো। ফোনের লাইন কেটে যাওয়ায় স্বস্তি নয়, উল্টা অস্বস্তিই পেয়ে বসে। কে জানে, খলিল আবার তালুকদার বা মিনা হোসেন সম্পর্কে কিছু বলে গেল কিনা! আমার স্ত্রী জানে, শরীফউদ্দীন লাভলিকে তালুকদারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং একটা কাজে আজকাল ওর কাছে যাচ্ছি ঘন ঘন।

তালুকদারের নারীঘটিত ব্যাপারে লাভলির কাছে কিছু ফাঁস হলে আরেক ঝামেলা। আমার ফর্সা, দেখতে শুনতে মন্দ নয় আর স্বভাবচরিত্র ভালো সহধর্মিনী আর যাই হোক, নারীঘটিত বিষয়ে খুবকড়া। সেটা আমার হোক আর অন্য কারোরই হোক কখনও বরদাশত করে না। যে কারণে নিজে কষ্ট করে বাসার সবকাজ করবে, কিন্তু কাজের ছুকড়ি কিংবা জোয়ান মাতারি কখনও অ্যালাউ করবে না। যদিও আমার রমনী বিষয়ক কোনো স্খলন এযাবত লাভলির কাছে ধরা পড়েনি। তবু তার আগাম সতর্কতা। হয়তো তার মায়ের পরামর্শে এটা করেছে। গিন্নি নিজেই বলেছে, তার পিতৃদেবের চরিত্রটা নাকি সুবিধার ছিল না। যা নিয়ে আমার শাশুড়িকে বেশ ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবেআমি যে একেবারে ধোঁয়া তুলসি পাতা এমন দাবিকরি না। খলিলই আমাকে বহু জায়গায় নিয়ে গেছে। কমলাপুর রেল কলোনীতে মেসে থাকার সময় ওর সঙ্গে ট্রেনে চড়ে সেই নারায়ণগঞ্জের টানবাজার পর্যন্ত গিয়েছি। কে জানে, খলিল আজ লাভলিকে কিছু বলে আবার ঝামেলা পাকিয়ে গেল না তো!

- বড়ভাই ফোন পাবার পর মুড অফ কেন? চা তো ঠান্ডা হয়ে যাবে।
- টেবিলের উল্টাদিকে বসা জুনিয়র সাংবাদিকের কথায় সম্বিত ফিরে পেতেই খানিকটা বিরক্তের ভাব দেখিয়ে বললাম- আর বলবেন না, আমার এক স্কুলফ্রেন্ডকে নিয়ে ঝামেলায় আছি।
- সেটা বুঝতে পেরেছি ফোনে আপনার কথা শুনে। নিশ্চয় টাকা ধার চাচ্ছে?
- অনেকটা তাই। জবাবটা দিয়েই চায়ের কাপে চুমুক দেই।

প্রেসক্লাবের আড্ডায় স্বস্তি পাচ্ছিলাম না দেখে সন্ধ্যার আগেই বাসার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। ক্লাব থেকে বেরিয়ে দেখি, বাস স্টপেজে প্যাসেঞ্জারের বিরাট জটলা। যেন সমাবেশ হচ্ছে। শেষ বেলায় অফিসে ভাঙ্গা ভিড়ের প্রভাবরাস্তা-ফুটপাতে। এ সময় চলাচল করাটা বেশ অসুবিধার। না উঠা যায় গেটে বাদুরঝোলা যাত্রী ঠেলে কোনো বাসে, না পাওয়া যায় রিকশা- সিএনজি অটো। পল্টন মোড়ের দিকে না গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে সেগুনবাগিচার ভেতর ঢুকে পড়া রোডের দিকে গেলাম। ভাগ্য ভালো যে কিছুটা হাঁটার পর খালি রিকশা পেয়ে যাই। সরাসরি বাসায় যাব। খলিল ওদিকে কোন কাণ্ড ঘটিয়ে গেল কিনা কে বলবে! লাভলির সঙ্গে কথা না বলা তক স্বস্তি নেই। রিকশা এগুচ্ছে। একশলা সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া উড়াতেই রহমানের মুখটা উঁকি দেয়। খলিলের মতিগতি সুবিধার নয়। শেষমেষ একটা কেলেঙ্কারী বোধহয় ঘটিয়ে ছাড়বে। ব্যাপারটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, যা হওয়ার তাই হবে। তবু মনে হতে থাকে, তালুকদারের সংবাদ সম্মেলনের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু আমি কী করবো? তালুকদারই তো দেরি করছে! এমন অদ্ভুত মানুষ জীবনে আরেকটা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হঠাৎ মেঘের ডাক। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, এক খন্ড কালো মেঘ আমাদের পিছু নিয়েছে। বৃষ্টি নামতে পারে। রিকশা শিল্পকলা একাডেমি, দুদক ভবন পেরিয়ে কাকরাইল পাইনিওর রোডে ঢুকলো ১২ তলা জোড়া ভবন ডানপাশে রেখে। রিকশাচালককে বললাম- পর্দা আছে তো?

- জ্বে স্যার, সিটের নিচে।



একুশ

সংবাদ সম্মেলন পিছিয়ে যাচ্ছে। কবে নাগাদ হবে সেটাও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে আমার কোনো গাফিলতি নেই জোর গলায় বলতে পারি। শরীফউদ্দিন তালুকদারের জন্যই ঝুলে আছে। কথায় বলে যার মাথা তার ব্যথা! আমার কাজটা হলো তালুকদারের নোট যত্ন করে রাখা, যাতে যথাসময়ে কম্পিউটারে টাইপ করে এ ফোর সাইজ কাগজের দুই-তিন পৃষ্ঠার একটা বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারি। যা পড়ে সাংবাদিকরা বিষয়টা জানবেন অথবা তাতে নজর বুলিয়ে প্রশ্ন করবেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানোর রেওয়াজ আছে। সেটা তালুকদার নিজেই করতে পারবেন।

আসলে সংবাদ সম্মেলন নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত না। তালুকদারের পক্ষে সেটা সত্যিই ওয়ান-টু'র ব্যাপার। আমার চিন্তা অন্যখানে, খলিলকে নিয়ে। মীনা হোসেনকে নিয়ে সে তালুকদারের ওপর যেরকম ক্ষেপে আছে, তাতে কোহিনুর বেগমের সঙ্গে জোট পাকানো অসম্ভব কিছু নয়। সেদিন প্রেসক্লাবে ক্রাইম রিপোর্টার রহমানের দেখা পাওয়ার পর থেকেই এমন একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে আমার মনে। সে ধরণের কিছু করলে খলিলের জন্য বোধহয় ভালো হবে না। তালুকদার বসে থাকার পাত্র নন। লোকে বলে, ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। চলন্ত রিকশায় বসে সিগারেটে শেষ টান মেরে ভাবলাম, খলিলকে সাবধান করবো নাকি! পর মুহূর্তেই মত পাল্টে ফেলি- কী দরকার বেহুদা ঝামেলায় জড়ানো! তার চেয়ে ভালো যে যার ধান্ধা নিয়েই থাকুক। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। শত হলেও খলিল আমার বন্ধু। তালুকদারের সাথে সেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। যদিও দশ-বারো বছর আগে। পরিচয়ের পর তালুকদারের সঙ্গে আজকের সম্পর্ক পর্যন্ত আসার পেছনে ওর কোনো অবদান নেই। সেটা নিজের কৃতিত্বেই হয়েছে। ভেবে দেখলাম, আগ বাড়িয়ে কিছু করা উচিত হবে না। আগে দেখা যাক, পানি কোনদিকে গড়ায়। পরিস্থিতি দেখে না হয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

আরামবাগের আল-হেলাল হোটেল ছাড়িয়ে ডানে মোড় নিয়ে রিকশা যখন পীরজঙ্গি মাজারের দিকে এগোচ্ছে আমার বুক পকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। হাতে নিয়ে অবাক হলাম, তাহলে টেলিপ্যাথি বলে কিছু আছে! খলিলের কল। রিসিভ করা মাত্রই শোনা গেল- কিরে দোস্ত তোর শরীর এখন কেমন? রাস্তায় নাকি গাড়ির হর্ণ শোনা যাচ্ছে!

- হ্যাঁ, বাসায় যাচ্ছি।
- প্রেসক্লাব থেকে ফিরছিস বুঝি?

জবাব দিলাম না। তালুকদারের সঙ্গে আজকের সিটিংয়ের কথা ওকে বলবো না বলে ঠিক করলাম।

খলিল বলে- দোস্ত, রহমান নামের এক সাংবাদিক তো তোর পরিচিত! তোর সাথে ওর দেখা হয়েছিল প্রেসক্লাবে।

- হ্যাঁ, অনেকেরই সাথে তো দেখা হয়।
- শালাকে দিয়ে একটা কাজ করাতে চেয়েছিলাম। পরশুও আমার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে গেল। আজ শুনলাম, কোন হোটেলে গিয়ে মাতলামি করায় পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা চালান করে দিয়েছে। আমি মোটেই অবাক হলাম না। রহমানের স্বভাব-চরিত্র জানা আছে। যে কারণে পারতপক্ষে ওকে এড়িয়ে চলি। রহমানকে আজকাল কেউ কেউ সাংবাদিক না বলে সাংঘাতিক বলে।

খলিল বলে- ওকে দিয়ে তালুকদার ব্যাটাকে সাইজ করতে চেয়েছিলাম।

কিছুই জানিনা এমন ভান করলাম- সে- কি?

- কেন রহমান তোর সাথে আলাপ করেনি?
- না তো!
- শালা দেখছি আস্ত লায়ার। তুই কী এখনও তালুকদারের ওখানে যাস?
- মাঝে-মধ্যে, ডাকলে যাই।
- আমাকে নিয়ে কিছু বলে?
- না, কিছু বলে না।
- আচ্ছা, তালুকদার তো তোকে দিয়ে একটা প্রেস কনফারেন্স করতে চেয়েছিল- তার খবর কী?

প্রশ্নটা শুনে সতর্ক হলাম, জবাব দেই- তালুকদারই ঝুলিয়ে রেখেছে।

- তুই জানিস, মীনা চট্টগ্রামের অফিসে বদলি করা হচ্ছে?

অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম- কার কাছে শুনলি?

- কে আর বলবে মীনাই বলেছে।

জবাবটা শোনার পর প্রায় থ মেরে গেলাম। তখনই কেন জানি ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলো। খলিল ইচ্ছে করেই লাইন কেটে দিলো! এমনও হতে পারে ওর ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে গেছে। আমারটার আছে পুরোপুরি। প্রতিদিনের মতো আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই চার্জ দিয়েছি। আবার নেটওয়ার্কের ঝামেলাও হতে পারে।

ফোনের লাইন কেটে গেলেও আমার অবাক হওয়ার রেশ কাটলো না। মীনা হোসেনের সঙ্গে খলিলের যোগাযোগ আছে। আর মহিলার কী আক্কেল- বদলির কথা কেন ওকে বলতে গেল: এ কারণেই কেউ কেউ বলে, সুন্দরী মেয়েরা অত চালাক নয়, একটু বোকা টাইপের হয়ে থাকে। ভাবলাম একবার মীনাকে ফোন করবো নাকি। ওর নাম্বারটা আমার সেটে স্টোর করা নেই। যোগাড় করে নিতে অসুবিধা হবে না। তালুকদারের অফিসের টেলিফোন অপারেটরের কাছে খোঁজ করলেই পেয়ে যাব। তবে মত পাল্টে ফেললাম- কী দরকার বেহুদা ঝামেলা বাড়িয়ে! তালুকদার আবার অন্য কিছু ভেবে বসতে পারেন। নারী কখনও কখনও বড় স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে তালুকদারের মুখ থেকে সবক শোনা ছাড়াও আমার জানা আছে। নিরীহ গৃহস্থ টাইপের মানুষ হলেও লাভলি আমার জীবনে একমাত্র নারী নয়। বন্ধুবর খলিল আমাকে অনেক পথঘাট চিনিয়েছে। বিয়ের পর থেকে অবশ্য সংযত ও সতর্ক। যদিও মাঝে-মধ্যে কেউ কেউ শুধু নজর নয়, মনও হরন করতে চাইলে লাগাম টেনে ধরেছি। এ ব্যাপারে লাভলি বড় সাংঘাতিক। টের পেলে রীতিমতো গন্ডগোল বাধিয়ে বসবে। তারপর পরনারীর মাঝে ঝুঁকি কম নয়। দাম্পত্য কলহ ছাড়াও স্বাস্থ্যগত দিকটাও বিবেচনায় রাখতে হয়। কার ভেতরে কী রোগ আছে বলা যায় না। আসলে আমি হিসেবি মানুষ। এজন্যই কখনও সফল প্রেমিক হতে পারিনি। উঠতি বয়সের প্রেম আবেগ থাকে, কিন্তু আমার মতো প্রায় মধ্য বয়সী লোকের পক্ষে প্রেম করতে হলে হয় তালুকদারের মতো অর্থ থাকতে হবে নয়তো খলিলের মতো বেপারোয়া হতে হবে। দুটো জিনিসেরই ঘাটতি আমার ভেতর। এক ফুফুর ঘটকালির সুবাদে লাভলির মতো ফর্সা, দেখতে-শুনতে মোটামুটি সুন্দরী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি- এটাই বা কম কিসে! রূপে-গুণে সবদিক থেকেই লাভলি ভালো। দোষ বলতে একটাই, আমার জীবনে অন্য কোনো মেয়ের ছায়া পর্যন্ত বরদাশত করতে পারে না। ওর সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেও সতর্ক থাকতে হয়। হঠাৎ কোনো মেয়ের দিকে নজর গেলে আর ব্যাপারটা ওর কাছে ধরা পড়লে রক্ষা নেই, ঘরে ফেরা মাত্রই পুরুষ জাতের চরিত্র দিয়ে একদফা বয়ান শুনিয়ে ছাড়বে।

মৌচাক মোড় পেরিয়ে রিকশা ঢুকে পড়েছে ডিআইটি রোডে। সামনের রেল ক্রসিংয়ের জ্যাম। মীনা হোসেনকে মনে পড়লো। গাজীপুর রেস্ট হাউজের পর আর দেখিনি। তালুকদারের মুখে ব্যাপারটা শোনার পর আমার মনে হয়েছিল, মীনা আমাকে ফোন করে খলিল সম্বন্ধে নালিশ করবে। হয়তো বলবে- আপনার বন্ধুকে সাবধান করে দিন। আমি যে খলিলের বন্ধু সেটা জানে সে। খলিল নিশ্চয় আমার কথা ওকে বলেছে। তালুকদারকে নিয়ে দুজনের মধ্যে কিঞ্চিৎ দূরত্ব তৈরি হলেও এটা অস্বীকার করার জো নেই, খলিল আমার ভুজনফ্রেন্ডদের একজন। আমাদের বন্ধুত্ব আজকের নয়, অনেক দিনের। দুজনকে ঘিরে কতো কী স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছি, আমার ধারণা ভুল। মীনা হোসেনের সঙ্গে খলিলের যোগাযোগ ঠিকই চলছে। অথচ আমি জানি না, খলিল জানে মীনাকে চট্টগ্রামে বদলি করতে চাচ্ছেন তালুকদার। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে তালুকদারের অফিস এবং ওখানকার ইপিজেডে রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস আর জুতা ফ্যাক্টরি আছে। আমি শুনেছি, কখনও গিয়ে দেখিনি। চট্টগ্রামে মীনা হোসেনকে বদলি করার তালুকদারের উদ্দেশ্যটা আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। মীনা হোসেনের হয়তো ইচ্ছা নেই ওখানে যাওয়ার। চট্টগ্রামে পাহাড় আছে, অদূরে সাগর- বিশেষ করে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত আছে। সমুদ্র বন্দরকে কেন্দ্র করে জমজমাট ব্যবসা-বাণিজ্য থাকলেও ঢাকার সঙ্গে তুলনা হয় না। ঢাকা শত হলে রাজধানী। এখানকার ব্যাপারটাই আলাদা। আর মেয়েদের পক্ষে এই মহানগরীর প্রতি মোহ থাকারও কারণ থাকতে পারে। প্রাকৃতিক শোভা সমৃদ্ধ চট্টগ্রামে দুই-একবার যাওয়া-আসার সুবাদে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ওটা একটা রক্ষণশীল নগর। ঢাকার মতো এতটা উদার নয়। একবার এক জাতীয় দৈনিকের পক্ষ থেকে আমাকে অফার দেওয়া হয়েছিল, চট্টগ্রাম ব্যুরো অফিসের দায়িত্ব নেওয়ার। আমার মন টানেনি। অথচ আমার আত্মীয়-স্বজন আছে চট্টগ্রামে। সেখানে গেলে হয়তো চাকরির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা পথও পেতাম। অনেক সাংবাদিক সেটাই করছে। এতে দোষের কিছু নেই। তবে আমি নিজকে যতটুকু জানি, তাতে নিশ্চিত যে আর যাই হোক, আমার পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। সবাই তো আর শরীফউদ্দীন তালুকদার হতে পারে না।

বাসার কাছাকাছি রিকশা চলে আসতেই মীনা হোসেনকে ফোন করার একটা ইচ্ছা জেগে ওঠে। ফোন করলে হয়তো জানা যেত, চট্টগ্রামে কেন সে যেতে ইচ্ছুক নয়। খলিলের সঙ্গে সম্পর্কের কথাটাও জিজ্ঞেস করা যেত। সে নিশ্চয় জানে খলিলের সংসার বা স্ত্রী-সন্তান আছে। খলিলকে ফোন করেই ওর ফোন নাম্বারটা নিতে পারি। পরক্ষণে আবার মনে হলো, নম্বর চাইতে গেলে আরেক ফ্যাকড়ায় জড়াতে হবে। তাছাড়া সেই প্রশ্নটাও উঁকি দেয়, মীনাকে ফোন করা কী ঠিক হবে? তালুকাদর জানতে পারলে হয়তো মাইন্ড করতে পারেন। এই মুহূর্তে মীনাকে ফোন করার ঝুঁকি নিলাম না। আগে সংবাদ সম্মেলনের ঝামেলা ঘাড় থেকে নামুক তারপর দেখা যাবে। কিন্তু সংবাদ সম্মেলন কবে হবে সেটাও নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। তালুকদারের মতিগতি বোঝা দায়। অযথা বিষয়টা জটিল করা হচ্ছে। কিন্তু আমার কী করার থাকতে পারে। কথায় আছে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

বাইশ

আমার অফিস বিকেলে। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ১১-১২টা বেজে যায়। ঘরে ফিরে ফ্রেস হয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে বসি টেলিভিশনের সামনে। অন্তত এক ঘণ্টা টিভি দেখাটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আজকাল বাংলা-হিন্দি-উর্দু-ইংরেজি ভাষার কত চ্যানেল। রিমোট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে ইচ্ছে মতন অনুষ্ঠান দেখা যায়। কখনও সংবাদ, কখনও আবার কোনো চ্যানেলের সিরিয়াল কিংবা মুভি। ডে অফের দিন আগেভাগে ফিরলে বা বাসায় থাকলে কোনো কোনো চ্যানেলের টকশো দেখি। মাঝে-মধ্যে আমার পরিচিত সাংবাদিকদের দেখি বিশেষজ্ঞ সেজে বুলি আউড়ে যেতে। কয়েকদিন লাভলি আমাকে বলেছে, তুমি যেতে পারো না এসবঅনুষ্ঠানে? বরাবরই আমার জবাব, ডাকলে তো যাব।

আসলে কেউ কাউকে সহজে ডাকে না। একটু তদবির আর লাইনবাজি করলে টিভি পর্দায় মুখ দেখানোটা অসম্ভব কিছু নয়। উপস্থাপক কিংবা বক্তা হিসেবে আমি মন্দ নই। কলেজ-ভার্সিটি-এমনকী সাংবাদিক ইউনিয়নের রাজনীতিতে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, ইচ্ছে করে না। নিজকে অমনভাবে জাহির করাটা রুচিতে বাঁধে। আমার স্বভাবটা এমনই যে নিজকে গুটিয়ে রাখি। নইলে এতদিনে এক বার্তা সংস্থার সিনিয়র সাব-এডিটর হয়ে আমাকে বসে থাকতে হতো না। স্বভাব ঝাড়তে পারলে, একটু তেল মেরে চললে কোনো পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ পদে যাওয়াটা আমার জন্য কখনও ব্যাপারই ছিল না। এখনও চেষ্টা করলে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারি। কিন্তু তার আগে যে দায়িত্বটা নিয়েছি, সেটা মানে তালুকদারের সংবাদ সম্মেলনের বোঝাটা ঘাড় থেকে নামাতে হবে। অনেক রাতে ঘুমাবার দরুন জরুরি কাজ না থাকলে সচরাচর সাড়ে আটটা-নয়টার আগে ঘুম থেকে উঠি না। লাভলি আর বাসার অন্য কেউ সকাল বেলায় আমার নিদ্রার ব্যাঘাত সাধারণত ঘটায় না। তবে সাতটা বাজতে না বাজতেই বিছানার পাশে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা মোবাইল ফোনটা বাজতে থাকে। একবার নয়, দুবার। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই মশারি তুলে হাত বাড়িয়ে মোবাইলটা চোখের সামনে আনতেই তালুকদারের নাম দেখে আর এড়াতে পারলাম না। কল রিসিভ করতেই তালুকদারের গলা- ঘুমাচ্ছিলেন নাকি সাংবাদিক সাহেব? সরি, ডিস্টার্ব করলাম!

- না, না, না, আপনি বলুন।
- দশটার মধ্যে আমার অফিসে আসতে পারবেন?
- অবশ্যই পারবো।
- চলে আসুন, আমি বারোটা পর্যন্ত ফ্রি থাকবো। তারপর যাবো হোটেল শেরাটনে লাঞ্চ পার্টিতে।

শরীফউদ্দীন তালুকদারের ফোন পেয়ে যেন আমার শরীরের যাবতীয় জড়তা কেটে গেল। লাভলি আগেই উঠেছে। আটটার ভেতর ওকে বাচ্চা পৌঁছে দিতে হয় কিন্ডারগার্টেনে। বেশিদূরে নয়, পাশের গলিতে মেইন রোড ঘুরে যেতে হয়। বিছানা ছেড়ে মেঝেতে পা রাখতেই গিন্নির গলা শুনতে পেলাম- কে ফোন করেছিল?

- তালুকদার।
- ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার কাজ শেষ হয়নি এখনও?
- না, ঝুলে আছে।
- আমাকে বলো তো তোমাদের কাজটা কী?
- লাভলির এমন প্রশ্ন আমার কাছে অপ্রত্যাশিত না হলেও অস্বস্তিকর। কথায় কথায় যদি থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে, তাহলে ঝামেলার আশঙ্কা ষোলআনা। তাই সতর্ক হয়েই জবাবটা দিলাম- তালুকদার একটা বই লেখাতে চাচ্ছেন আমাকে দিয়ে, এই ধরো তার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে। কিন্তু সমস্যা হলো ভদ্রলোক বড়ই ব্যস্ত। সময় দিতে পারছেন না ঠিকমতন।

আর কথা বাড়ালো না লাভলি। মেয়েকে নিয়ে কিন্ডারগার্টেনের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় বললো- তুমি তো জেগেই গেছো। দরজা আর লক করলাম না।

দশটা পাঁচ মিনিটে আমি পৌঁছে গেলাম মতিঝিলে তালুকদার গ্রুপের কর্পোরেট অফিসে। রিকশায় বসে যাওয়ার সময় একশলা সিগারেটের ধোঁয়া উগড়াবার ফাঁকে একবার ভেবেছিলাম, তালুকদারের কাছে মীনা হোসেনের ব্যাপারটা উত্থাপন করবো নাকি। কেন ওকে চট্টগ্রামে বদলি করতে চাইছেন। তবে দ্বিধায় জড়িয়ে গেলাম। আমার এই কৌতূহল দেখে তালুকদার আবার অন্য কিছু ভেবে বসতে পারেন- এমনকি মাইন্ডও করতে পারেন। মনে মনে ঠিক করলাম, দরকার নেই কারো ক্ষেতের বেড়া ভাঙতে যাওয়ার।

তালুকদারের অফিসে পা রাখতেই চলতি মাসে চাকরিতে জয়েন করা দারুন ফরশা দেখলে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করে এমন প্রাণবন্ত চেহারার রিপেসশনিস্ট মেয়েটি বললো- স্যার, আপনার অপেক্ষায় আছেন।

আমার জানা আছে, শরীফউদ্দীন তালুকদারের সময় জ্ঞান খুব টনটনে। এ কারণেই এতদূর উঠতে পেরেছেন। যতই নারীঘটিত দোষ থাকুক, নিজ কাজের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ফাঁকি নেই। পরিশ্রমও করতে জানেন। তালুকদারকে কখনও পরিশ্রান্ত দেখিনি। বরাবরই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। কেউ কেউ বলে, ব্যক্তিগত বা ব্যবসার ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের মুখেও লোকটা মিটিমিটি হাসে- যেন কিছুই হয়নি।

যদিও এ বিষয়ে যাচাই করার আমার ইচ্ছে জাগেনি কখনও। রুমে পা রেখে দেখি তালুকদার ছাড়া আর কেউ নেই। আমাকে দেখেই বলে ওঠেন- হঠাৎ ডেকে পাঠালাম বলে কোনো অসুবিধা হয়নি তো সাংবাদিক সাহেব?

- না, না। সকালে আমার তেমন কাজ থাকে না।

-জ রুরি এক কাজ আমাকে হংকং যেতে হচ্ছে, সেখান থেকে চীনে, মানে সাংহাই যেতে পারি। বুঝতেই পারছেন সপ্তাহ খানেকের ধাক্কা। কাজেই ভাবলাম যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে এক দফা সিটিং হয়ে যাক।

- আমাদের প্রেস কনফারেন্স কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে।

- আ-রে আপনাকে বলেছি না এ নিয়ে ভাববেন না। প্রেস কনফারেন্স যখন হওয়ার হবে। আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যান। আমার বয়ানের নোটগুলো যত্ন করে রাখবেন। দরকার হলে আপনাকে দিয়ে আমার বায়োগ্রাফি লেখাবো, ইংরেজিতে ট্রান্সলেশনও করাবো। কী বলেন, আইডিয়াটা কী মন্দ?

- না, আপনি যেটা মনে করবেন সেটাই হবে।

- তাহলে শুরু করা যাক। কথাটা বলেই তালুকদার বাঁ-হাতের রিস্টওয়াচে একবার নজর বুলিয়ে বলেন- ১২টা পর্যন্ত ফ্রি আছি।

কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি হওয়ার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনার ফ্লাইট কয়টায়?

- আজ সন্ধ্যা ছয়টায়।

- তাহলে শুরু করতে পারেন, আরিফ সাহেবের বাসা থেকে রানীকে নিয়ে আপনার বেড়াতে যাওয়ার কথা।

- হ্যাঁ, আমার মনে আছে। রানী আমার অপেক্ষায় আছে দেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, ওকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে। আমার তখন বিশ্বস্ত ড্রাইভার ছিল মনু মিয়া। এখন তো চাকরি-বাকরি ছেড়ে একেবারে হাজীসাহেব হয়ে গেছে। ডেমরার ওদিকে আমুলিয়া বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে বাড়ি করেছে, ছেলেরা বিদেশে থাকে। তবে হ্যাঁ, মনু মিয়া আমার জীবনের অনেক ঘটনার সাক্ষী। এমন বিশ্বস্ত লোক সচরাচর আপনি পাবেন না। এখনও মাঝে মাঝে এসে আমাকে সালাম জানিয়ে যাই। ওর ছেলেরা বুড়ো বাবাকে আর চাকরি করতে দিতে রাজী নয়। নইলে মনু মিয়া এখনও আমার কাছেই থাকতো। যা হোক, ওকে ডেকে রানীকে জায়গা মতো পৌঁছে দেওয়ার ভার দিলাম। মেঘনা ব্রিজ পেরিয়ে আমার যে কম্পোজিট নিটিং কমপ্লেক্স আছে, তখন সেটা ছিল উঁচু দেয়ালে ঘেরা এক বাংলো বাড়ি। কারখানা করবো বলেই বিশ্বরোডের পাশে দেড় একর জমি কিনে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছিলাম। একটা টিনশেডের বাংলো করেছিলাম আমার কিংবা পরিচিত ভিআইপিদের রিক্রেশনের জন্য। শীতের সিজনে অনেকেই দলবল নিয়ে পিকনিক করতে যেত। এখন যেমন আমার গাজীপুরের রেস্ট হাউজে যায়। তখন গাজীপুরের রেস্টহাওজ থাকলে রানীকে সেখানেই পাঠাতাম। মনু মিয়াকে পাঠিয়ে ইস্কাটনে ফোন করলাম। আরিফ বাসায় ছিলেন না। ওর স্ত্রী ফোন রিসিভ করলেন। আমি অনুরোধ করলাম- ভাবী, রানীকে একটু ডেকে দিন। রানী ফোন রিসিভ করতেই বুঝতে পারি, ও ব্যাকুল হয়েছিল এতক্ষণ। আমি বললাম- গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি তুমি চলে আসো। আর মনে আছে তো কাউকে কিছু বলবে না। রানী লক্ষ্মী মেয়ের মতোই জবাব দেয়- জ্বি হ্যাঁ, উসকো লি ওরি আংকেল। মনু মিয়াকে তো বলাই ছিল কোথায় নিয়ে যেতে হবে। আর এসব কাজে আমার বিশ্বস্ত ড্রাইভারটি ছিল খুবই পাকা। বুঝতেই পারছেন সাংবাদিক সাহেব, শুধু রানীকেই নয়, বছরের পর বছর মনু মিয়া আমার কথা মতো আরো অনেক মেয়েকেই পৌঁছে দিয়েছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। তাদের মাঝে কেউ কেউ রানীর মতো টিনএজার ছিল। আবার সুন্দরী মধ্য বয়স্কা- এমনকি হাইফাই লেডি পর্যন্তও বাদ যায়নি। তারপর মনু মিয়ার আচরণ এমন অমায়িক যে মেয়েরা তাতে মুগ্ধ হয়ে ওকে বেশ বিশ্বাস করতো। এক্ষেত্রে আমার বর্তমান ড্রাইভার রমজান আবার উল্টা। মেয়েদের সঙ্গে খুব দরকার না পড়লে কথা বলে না। তবে আমার বিশ্বস্ত। পেটে বোমা মারলেও ওর মুখ থেকে কিছু ফাঁস হবে না। যা হোক, ঘণ্টা আধেক পর আরিফের বাসায় আবার ফোন করলাম। জানতে পারলাম, একটু আগেই ড্রাইভারের সঙ্গে রানী রওয়ানা হয়ে গেছে। তালুকদার সাহেব থামলেন এবার। ক্ষণেক কী যেন ভাবলেন চুপচাপ। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন- সাংবাদিক সাহেব, নিজের ফাঁদে নিজেই আটকে গেছি।

প্রায় চমকে উঠলাম আমি- মানে?

- এই যে, এই মুহূর্তে খুব ইচ্ছে করছে সিগারেট টানতে। কিন্তু আমার অফিসকে ধূমপানমুক্ত জোন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি।

- এটা তো গুরুতর কোনো ব্যাপার নয়। আপনি অফিসের মালিক, ইচ্ছে করলেই সিগারেট ধরাতে পারেন।

তবে তালুকদার কথাটা কানে তুললেন না বুঝা গেল- রানীকে জায়গা মতো নিয়ে গিয়ে মনু মিয়া সেদিন ফোন করে আমাকে জানায়, ওদের পৌঁছতে কোনো অসুবিধা হয়নি। রানী বার বার ওর কাছে জানতে চেয়েছিল, রামগঞ্জ সে চেনে কিনা। বুঝতে পারছেন তো, ওই রামগঞ্জেই রানীর শ্বশুরবাড়ি।

না বলে পরলাম না- রানী তার স্বামীকে সত্যিই খুব ভালবাসতো।

- এটা এতক্ষণে বুঝলেন সাংবাদিক সাহেব! প্রকৃত ভালবাসা না থাকলে কী সেই করাচি থেকে প্রেমিকের হাত ধরে এতদূর ছুটে আসতো। তারপরও রানীকে আমি ম্যানেজ করতে পেরেছিলাম। সেটাও কিন্তু ওদের প্রেমের চেয়ে কম কথা নয়।

- আমি সায় দেই- তা তো বটেই। আর এটা আপনার পক্ষেই সম্ভব।

- সাংবাদিক সাহেব, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য দেখেছেন?

হঠাৎ তালুকদারের মুখে এ ধরনের প্রশ্নে অবাক হলাম রীতিমতো। জবাব দিলাম- নৃত্যনাট্য দেখেনি। আমার এক ভাইয়ের বাসায় লংপ্লেতে গীতিনাট্য শুনেছি।

- তাহলে আপনার পক্ষে জানা আছে, প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর বাহ্যিক রূপটাই সব নয়, তার অন্তর আর অবস্থানটাই আসল।

সত্যি বলতে কী, তালুকদারের কথা প্রায় ধাঁধার মতো লাগে। তার মুখে বাংলা সাহিত্যের পন্ডিতদের মতো উক্তি আমার কাছে বেমানানই নয়, বিস্ময়কর বলে ঠেকে। তবে হ্যাঁ, তালুকদার শত ব্যস্ততার মাঝেও বইপত্র পড়েন সেটা আমার জানা। সন্দেহ জাগে তিনি কমার্সের নয়, আর্টসের ছাত্র ছিলেন। যদিও এ নিয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন করিনি।

আমি কী ভাবছি সেটা পাত্তা না দিয়েই তালুকদার বলতে থাকেন- চিত্রাঙ্গদা প্রথমে কুরূপা ছিল পরে প্রেমের দেবতা মদনের বরপ্রাপ্ত হয়ে অনিন্দ্য সুন্দরী হয়ে ওঠে। আগের চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন পাত্তা দেয়নি। কিন্তু সুন্দরীকে দেখে আর নজর ফেরাত পারেনি। তাকে পাওয়ার জন্য যাকে বলে কামোন্মত্ত হয়ে পড়ে। বুঝলেন তো সাংবাদিক সাহেব, রানীকে দেখে আমার ঠিক ওই অবস্থা হয়েছিল। আর আমি কিছু করতে চাইলে কখনও কখনও বেপরোয়া হয়ে উঠি, সেটা নিশ্চয় আমাকে দেখে এ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছেন। শুধু আপনার মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলন করার ক্ষেত্রেই একটু ব্যতিক্রম হচ্ছে। বলতে পারেন, এটা আমার ইচ্ছাতেই হচ্ছে। এই যে আমি আপনাকে এতকিছু বলেছি, এই ব্যাপারটা নিয়ে অন্য কারো কাছে মুখ খুলিনি কখনও। সংবাদ সম্মেলনের ডিসিশন নেওয়ার পর আমার মনে হলো, পুরো ব্যাপারটাই আপনাকে খুলে বলবো। আপনি ঠিকঠাক নোট করে রাখছেন তো? সংবাদ সম্মেলনের পর এই বিষয়ে আপনি একটা বই লিখে ফেলতে পারবেন। পাবলিশার আমিই জুটিয়ে দেব।

আমি জানি, শরীফউদ্দীন তালুকদারের হাতে অর্থের অভাব নেই। আমাদের সমাজে যার টাকা আছে তার ক্ষমতা অনেক। পাবলিশার, মানে বইয়ের প্রকাশক তালুকদারের পক্ষে জুটানো ওয়ান-টু'র ব্যাপার মাত্র। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে বই আদৌ বেরোবে কিনা আমি নিশ্চিত নই। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তালুকদারের জীবনে অনালোকিত অধ্যায়ের প্রতি আমার আগ্রহ ভাটা পড়ছেনা, বরং দিন দিন বাড়ছে। এর শেষটা কোথায় সেটা না জানা পর্যন্ত যেন স্বস্তি নেই।

তেইশ

- তাড়া নেই তো আপনার? ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে শেরাটনে লাঞ্চ করতে যেতে পারেন। কথাটা বলেই শরীফউদ্দীন তালুকদার টেবিলের ওপাশে নিচ থেকে একটা ব্যাগ তুলে আনেন। সেটা টেবিলে রেখে ভেতর থেকে একটা ল্যাপটপ বের করে বলেন- একটু সবুর করেন। মেইলটা চেক করে নেই।

- কিছু বললাম না। তালুকদারের ব্যাপারটাই এরকম। আমার মতে ওর একটা নয়, একই সঙ্গে কয়েকটা মাথা কাজ করে। এতে আমি অভ্যস্ত।

মিনিট কয়েক পর ল্যাপটপ নজর রেখেই বলতে থাকেন- সেদিন কাজটাজ সেরে সন্ধ্যার দিকে পৌঁছলাম রানীর কাছে। মেঘনা ব্রিজ পেরিয়ে ভবেরচরের ওদিকে আমার কম্পোজিট নিট কারখানায় কখনও গিয়েছেন? তখন অবশ্য ফ্যাক্টরি হয়নি। হাইওয়ের পাশে নিচু এলাকা কিনে বালু দিয়ে ভরাট করে চারদিকে উঁচু বাউন্ডারি দেয়াল তুলে শুধু একটা টিনশেডের বাংলো করেছিলাম। মেঘনা ব্রিজ তখনো চালু হয়নি। সেদিন ভাগ্য ভালো যে, ফেরিঘাটে জ্যাম ছিল না। সম্ভবত জুলাই মাস। সূর্য ডুবতে ডুবতে প্রায় সাতটা। যদিও বিকেল থেকে মেঘের ঘনঘটা। মাঝে-মধ্যে বৃষ্টি নামছিল। আর রানীর কাছে যখন গেলাম তখন তো রীতিমতো মুষলধারা চলছিল। লক্ষ্মী মেয়ের মতোই রানী আমার অপেক্ষায় ছিল। আমাকে দেখেই বলে ওঠে- আঙ্কেল, কিসিলে আপ কো এতনা লেট হুয়া? জবাবে বললাম- কুছু পরোয়া নেহি হামারা দিল কা রানী। কথাটার সঙ্গে আদরের অছিলায় ওর টুকটুকে ফর্সা আপেলের মতো সতেজ গালে ডানহাত বাড়িয়ে দুই আঙ্গুলে আলতো চাপ দেই। আমার আচরণে রানী একটু অবাকই হলো। হয়তো বাজে কিছুর ইঙ্গিত পেল। আমি কিন্তু ডোন্ট কেয়ার। এ ব্যাপারে বলতে পারেন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। ওই মুহূর্তে রেগে গিয়ে রানী যদি আমাকে কটুকথা বলতো, গায়ে মাখতাম না। সাংবাদিক সাহেব, একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। প্লেবয় হিসেবে আমি কখনও মন্দ ছিলাম না। কখন কীভাবে টোপ ফেলে বড়শিতে মাছ তুলে আনতে হবে ভালো করেই জানি। আর রানীর ব্যাপারটা তো অন্যরকম। সে ছিল আমার কাছে মিসেস চৌধুরীর আরেক রূপ। আমার বয়সের অনুপাতে তিনি আমাকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে পারেননি। রানীকে দেখে তখন মনে হয়েছিল, সেই অভাব পূরণ করতেই যেন মিসেস চৌধুরী আমার মর্ত্যলোকে ফিরে এসেছেন। কাজেই বুঝতে পারছেন, রানীর জন্য আমি কতটা ডিটারমাইন্ড ছিলাম। ওর সামনে যেন আমাকে কোন প্রকার দুর্বলতা পেয়ে না বসে সেজন্য গাড়িতে বসেই কয়েক পেগ স্কচ হুইস্কি গিলে নিজকে চাঙ্গা করে রেখেছিলাম।

শরীফউদ্দীন তালুকদার যেন একটু দম নিলেন। ফের বলেন- সাংবাদিক সাহেব, এই কদিনে আমার বয়ান থেকে নিশ্চয় জেনে নিয়েছেন, রমনীমোহন, যাকে ইংলিশে বলে লেডিকিলার, সেটা দৈহিক সৌন্দর্যের দিক থেকে না হলেও মেয়েদের কীভাবে বাগে আনা যায় সেটা আমি রপ্ত করতে পেরেছি ভালোভাবে। কাকে কোন ডোজ দিতে হবে সেটা ভালোই জানি। আর রানী তো এইটুকুন মেয়ে! ওকে ম্যানেজ করাটা

ছিল আমার কাছে নস্যি মাত্র। আর সেদিনকার প্রকৃতিও ছিল অনুকূলে। মুষলধারায় বৃষ্টি, মনে হচ্ছিল আকাশ যেন ফেটে পড়েছে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। বাংলোর টিনের চালে প্রচণ্ড শব্দ। যেন মেইল ট্রেন ছুটে চলেছে। ওই আওয়াজে রানীর টুকটুকে ফর্সা মুখে ভয়ের একটা ছাপ আমার নজরে ধরা দেয়। ঢাকার একটা ফিল্মি গান আছে না, বৃষ্টি ঝরা এই রাতে... জানেন কোথাও গানের ওই কলি কানে এলে আজও আমার মনে সেদিনকার কথাই বেশি মনে পড়ে। বৃষ্টি ঝরা রাতে...

বাক্যটা শেষ না করে তালুকদার আবার থামলেন। আমার মনে হলো, সেই বৃষ্টিস্নাত রাতের স্মৃতিই অবলোকন করছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে ওঠেন- ব্রাদার, মিসেস চৌধুরী কিংবা তার নাতনি রানীকে আপনি দেখেননি। রানী তো শুধু নামে নয়, রূপের দিক থেকেও বলতে পারেন প্রকৃত অর্থে রানী। লায়লার সঙ্গে আমার যদি কখনও আবার দেখা হতো, ওকে আমি ধন্যবাদ জানাতাম মেয়ের নামকরনের জন্য। জিজ্ঞেসও করতাম এমন পারফেক্ট নাম কে রেখেছে, তুমি না অন্য কেউ?

এবার না বলে পারলাম না- রানী তো দেখছি, আপনার মনের ওপর সাংগাতিক ভর করেছিল।

আমার কথায় কান না দিয়ে তালুকদার স্বগতোক্তির মতোই বলতে থাকেন- সত্যিই ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। টিনের চালে ভীষণ আওয়াজ। সেই আওয়াজ শুনে রানীর মুখা শুকনো শুকনো। কে জানে করাচিতে অমন বৃষ্টি সে দেখেছিল কিনা। দেখলেও নিশ্চয় টিনশেডের ঘরের ভেতর থেকে নয়। একসময় তো হতাশ হয়েই বলে ফেলে, এতনা বারিষ! অমনিই আমি বলে উঠলাম, ডোন্ট ওরি ডার্লিং। আমার মুখে ডার্লিং শব্দ শুনে ও কিছুটা হলেও অবাক হয়।

অমনিই আমি তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, আ-রে তুম তো হামারা আপনা আদমি। আপনা আদমি কো হামলোগ ডার্লিং বলতা। ওর কোমল তনু স্পর্শ করতেই টের পেলাম এক ধরণের জড়তা ওর দেহ জুড়ে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে ভীতির ছায়া দেখতে পেয়েই অভয় দেই, ডোন্ট ওরি ডার্লিং, তোমার হাজবেন্ডকে পেতে হলে তোমাকে একটু সেক্রিফাইস করতে হবে। কথাটার মানে কি বুঝলো সেই জানে, চেঁচিয়ে ওঠে- নেহি। কিন্তু আমি তো অভিজ্ঞ শিকারি। ওরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হয় সেটা ভালো করেই জানা ছিল।

- তার মানে, আপনি রানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সেদিন....

- আমার কথা শেষ হওয়ার সুযোগ না দিয়ে তালুকদার বলেন- সেটাই স্বাভাবিক।

- ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের প্রচলিত আইনে ধর্ষণের পর্যায়ে পড়ে।

- তা হয়তো হবে। রানী অবশ্য এ নিয়ে কোথাও নালিশ করেনি। এরকম ঘটনা অহরহই ঘটছে। জানেন তো স্ত্রীর অমতে তার সঙ্গে ইন্টারফোর্স করলে সেটা এখন ধর্ষণের পর্যায়ে পড়ে। এ বিষয়ে তাসলিমা নাসরিনের একটা উপন্যাসও পড়ে ছিলাম কয়েক বছর আগে।

আমার দৃঢ় ধারণা, শরীফউদ্দীন তালুকাদর শুধু রানীকেই নয়, আরো অনেক মেয়েকেই বাগে পেয়ে তার কামনার বড়শিতে গেঁথেছেন। তবে ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার ইচ্ছা আমার নেই। সমাজে যাদের অর্থকড়ি আছে তাদের ভেতর ধোয়া তুলসি পাতা আর কজনই! আমার বন্ধু খলিলের কাছে অনেক তথ্য আছে। তালুকদারের মতো অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির হাড়ির খবর ওর নখদর্পনে।

এবার সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে তালুকদার বলে ওঠেন- কী ভাবছেন সাংবাদিক সাহেব? ভাবছেন, কাজটা আমি ঠিক করিনি, তাইতো!

- না, না, আমি সেরকম কিছু ভাবছিনা।

- ডান হাত তুলে তালুকদার রিস্টওয়াচ দেখে তালুকদার বলেন- এনি ওয়ে, আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। আমাকে আবার শেরাটনে যেতে হবে।

- হাতে সময় থাকলে আপনি বলে যান, আমি তো তৈরি।

- সেদিন রাতভর বৃষ্টি নেমেছে। কখনও মুষলধারায় কখনও আবার থেমে থেমে। আমার জমির পশ্চিম পাশের বাউন্ডারি দেয়ালের বাইরে একটু পুকুর ছিল। পরদিন দেখলাম, পুকুরটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে। যাক সে সব কথা, প্রথমবার একটু কুণ্ঠিত থাকলেও পরে রানী কিন্তু যাকে বলে নিয়তির কাছে সারেন্ডার করে বসেছিল। আর আমি যেন সেদিন আষাঢ়ের নদীর মতোই নবযৌবন ফিরে পেয়েছিলাম। আসলে কী জানেন, রানী আমার কাছে তখন আর রানী ছিল না। মিসেস চৌধুরীই পুনর্জন্ম নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। উনার পড়ন্ত বেলায় যে ঘাটতি ছিল সেটা পুষিয়ে দিতেই আবার ধরা দেন আমার কাছে।

কথাটা বলে তালুকদার কয়েক মুহূর্তে কি যেন ভাবতে থাকেন। হয়তো রানী কিংবা মিসেস চৌধুরীকে দেখেছিলেন মানস পর্দায়।

আমি তখন কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম- এত কিছু ঘটলো, রানীর রিঅ্যাকশনটা কী ছিল?

প্রশ্নটা শুনে তালুকদার সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকান- একটু আগে কী বললাম। রানী নিয়তির কাছে সারেন্ডার করেছিল। ও আসলে বোকা মেয়ে। আমার ধারণা, ড্রাইভার ব্যাটা ওকে ফাঁদে ফেলেই পাকিস্তান থেকে ভাগিয়ে এনেছিল। যদিও সে রাতে রানী আমার মতলব ধরতে পেরে বেশ ঘৃণার সঙ্গে বলেছিল, আপ আচ্ছা আদমি নেহি, স্রেফ বদমাইশ.... কিন্তু আমি জানতাম মেয়েরা এরকমই বলে, কামিয়াবি হতে হলে ওসব গায়ে মাখতে নেই। শুনুন সাংবাদিক সাহেব, পরদিন রানী কিন্তু শান্ত আর স্বাভাবিক। আর সেটা হবেনা কেন! তখনও এতটা বুড়িয়ে যাইনি। রানীর সঙ্গে বয়সের ব্যবধান ঠিকই ছিল, কিন্তু মেয়েদের কীভাবে তুষ্ট করতে হয় সে ব্যাপারে আমি বরাবরই ঝানু খেলোয়াড়। তাই পরেরদিন রানী মর্জি-মেজাজ বুঝে বললাম, মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যা সে চায় না। গতরাতে তোমার জীবনের ঘটনাটাও তাই। এটা গোপন রাখাই ভালো। কাউকে বললে তোমারই ক্ষতি হবে। এমনকি তোমার স্বামীও তোমাকে অবিশ্বাস করবে। ওই মুহূর্তে উড়না দিয়ে চোখের পানি মুছলেও রানী আমার পরামর্শ ঠিকই মেনে নিয়েছিল।

- তারপর নোয়াখালীতে গেলেন?

- যেতেই হলো। যদিও আগে থেকেই খবর পেয়েছিলাম রানীর স্বামী ওখানে নেই, তাকে পাঠানো হয়েছে চট্টগ্রাম সেন্ট্রাল জেলে। তারপরও মাইজদী কোর্ট ঘুরিয়ে আনলাম ওকে। রানী বায়না ধরেছিল চট্টগ্রাম যাওয়ার। কিন্তু বাংলাদেশের জিওগ্রাফি, মানে চট্টগ্রামের অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই ছিলনা। সুযোগটা নিলাম আমি। ওকে বললাম আগে ঢাকায় চলো সেখান থেকে চট্টগ্রামে যেতে হবে। রানী আমার কথার অবাধ্য হয়নি। ফেরার পথে দেখি দাউদকান্দি ফেরিঘাটের আগে বিরাট জ্যাম, একটা ট্রাক নাকি উল্টে গিয়েছিল। তবে আগের দিনের মতো বৃষ্টি-বাদল ছিলনা। বাউসিয়া ঘাটে ফেরি থেকে গাড়ি নামতেই চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার। একবার ভেবেছিলাম, গজারিয়ার বাংলোতে রানীকে নিয়ে আরেক রাত কাটিয়ে যাই। একে তো ঢাকায় কাজ ছিল, তারপর ভাবলাম আর ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবেনা। তবে ঢাকায় ফেরার পথে রানীকে একটা টোপ দেই, তুমি এত সুন্দরী- তোমার মতো মেয়ে কেন একটা ড্রাইভারকে বিয়ে করে লাইফটা হেল করছে! তুমি চাইলে আমি তোমাকে নিয়ে বোম্বাই যেতে পারি। সেখানে আমার এক বন্ধু ফিল্ম ডিরেক্টর। তুমি ইচ্ছে করলে বলিউডের হিরোইন হতে পারো। আমার কথা শুনে রানীর চোখজোড়া সত্যিই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বুঝলেন, সাংবাদিক সাহেব, ও আমার কথা বিশ্বাস করেছিল। তবে যাকে বলে বিধি-বাম, ঢাকায় ফিরে দেখি আরেক কাণ্ড।

- মানে?

- আরিফের বাসায় অ্যানি। তার সঙ্গে পাকিস্তানি দূতাবাস আর ঢাকার পররাষ্ট্র দফতরের কয়েকজন কর্মকর্তা। দুই বোন একে অপরকে জড়িয়ে যেভাবে কাঁদছিল, তাতে ভেতরে ভেতরে একটু ঘাবড়ে যাই। রানী আবার গত রাতের ঘটনা ফাঁস করে না দেয়! নারীঘটিত ব্যাপারে আমার নার্ভাস হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। কিন্তু সেদিন ঠিকই নার্ভাস ফিল করছিলাম। পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে জলদি কথাবার্তা সেরে আমি ইস্কাটনের ওই বাড়ি থেকে সটকে পড়ি। বিদায় নেওয়ার আগে আরিফকে জানাই জরুরি কাজ আছে। অ্যানি আর রানীকে বললাম, আবার দেখা হবে।

যদিও রানী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল। গভীর রাতের ফ্লাইটে দুই বোনকে করাচিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রানী যে গজারিয়ার বাংলোবাড়ির বৃষ্টি সিক্ত রাতের ঘটনা ফাঁস করেনি, সেটা পরে আরিফের সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছিলাম। সে রকম কিছু ঘটলে আরিফ নিশ্চয় আমাকে জানাতেন।

কথাটা শেষ করে তালুকদার ঘড়ি দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান- আজ আর সময় দেওয়া যাবেনা। হংকং থেকে ফেরার পর আমি আপনার সঙ্গে আবার সিটিং দিব।

চব্বিশ

শরীফ উদ্দীন তালুকাদর বলে গেছেন, চলতি মাসের ১০ তারিখ দিবাগত রাতে দেশে ফিরে আসবেন। বিশ্রাম নেবেন মাঝখানের একটি দিন। ব্যবসায়িদের একটা সম্মেলন আছে ১২ তারিখে সেই ক্যান্টনমেন্ট রেলস্টেশন সংরগ্ন পাঁচ তারকা হোটেল রেডিসনে। দুপুরে খেয়েদেয়ে খানিকটা বিশ্রাম শেষে অফিসের উদ্দেশে পা বাড়াবার মুখে তাকালাম ক্যালেন্ডারের দিকে। তালুকদার ফিরতে এখনও বাকি চারদিন। দেশে ফিরে রেডিসনের অনুষ্ঠানের পর যদি চট্টগ্রামে উড়াল না দেন, তাহলে ১৩ বা ১৪ তারিখে আমাকে কল করতে পারেন। ওর বক্তব্য শেষ হলে আমি নোট দেখে একট সার-সংক্ষেপ লিখবো। কম্পিউটার কম্পোজ করে সেটা দেখাতে হবে তালুকদারকে। শেষ পর্যন্ত সংবাদ সম্মেলনটা হয় কি-না তা নিয়ে একটা সন্দেহ আমাকে পেয়ে বসেছে ইদানিং। না হলে আমার কীই বা করার আছে! আমি তো কাজ করে যাচ্ছি। অর্থও পাচ্ছি। তার চেয়েও বড় কথা, বিষয়টি বেশ ইন্টারেস্টিং। কেন যে গল্প-উপন্যাস লেখার অভ্যাস করিনি- এখন বেশ আফসোস হচ্ছে। তালুকদারের এই ঘটনা নিয়ে একটু রংচং মাখিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে পারলে আর সেটা বই হয়ে বেরোলে বাজারে যে মাত করতো বাজি রেখেই বলতে পারি। কলেজ ম্যাগাজিনের জন্য একবার একটা কবিতা লিখেছিলাম। আমাদের মফস্বল শহরের একটি মেয়েকে নিয়ে। চোখাচোখি হলেও বেশিদূর এগুতে পারিনি। এদিক থেকে খলিলকে হিংসা হয়। আগাগোড়া ও মেয়েদের পটাতে ওস্তাদ। কত সহজে ভাবজমিয়ে ফেলে। আর আমি, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই কেমন জড়তা পেয়ে বসে। বিয়ের আগে দুই-একজনকে ভালো লেগেছে কিংবা তাদের প্রেমে পড়লে আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারি-নি। আচরণে আর কথা বলে কখনও ব্যক্ত করতে সক্ষম হইনি- তোমাকে ভালবাসি। এজন্য কোনো মেয়ে যদি আমাকে কাপুরুষ বলতো তাহলে তাকে দোষ দেওয়ার কিছুই থাকতো না।

সত্যি আমার তুলনায় শরীফউদ্দীন তালুকদার আর খলিল- দুজনেই দুর্দান্ত পুরুষ। তালুকদারের অর্থ আছে। তার চেয়ে বড় জিনিস তার সাহস আছে। শুধু অর্থ থাকলেই চলবেনা, মেয়েদের কাছে টানতে হলে হিম্মত থাকা চাই, কৌশল জানতে হবে। এই দুটো গুণের কোনোটিই আমার মধ্যে কস্মিনকালে ছিলনা। এক খালার আগ্রহে লাভলির মতো ফর্সা, দেখতে

মোটামুটি সুশ্রী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি। প্রেম করে কাউকে ঘরে তোলার সাহস কোনোকালেই আমার ছিল না। যদিও খলিলের বদৌলতে বিয়ের আগে এবং পরেও পরনারী সম্ভোগের সুযোগ আমার ঘটেছে। সেটা আলাদা ব্যাপার এবং টপ সিক্রেট। ঘুনাক্ষরেও খলিল ছাড়া এসব নিয়ে কারো কাছে টু শব্দটি করিনি কখনও। আর লাভলির কানে গেলে তো সর্বনাশের বাকি থাকবে না। আমাদের সাজানো গোছানো সংসারটাই লন্ডভন্ড হতে পারে। পরনারী বিষয়ে লাভলির বড্ড অ্যালার্জি। ও পাশে থাকলে কখনও কোনো মেয়ের দিকে তাকাই অমনি ওর চোখ দেখে মনে হয় বাঘিনীর মতো বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছকড়ি বা জোয়ান মেয়েলোককে বাসায় কাজের ঝি হিসেবে রাখবে না। যদিও গৃহপরিচারিকাদের প্রতি নজর দেওয়াটা আমার রুচিতে নেই। কিন্তু সেটা কানে তুলতে লাভলি নারাজ। তার যুক্তি একটাই, পুরুসদের বিশ্বাস করতে নেই। প্রয়োজনে নিজে খেটে মরবে। তবু বাসায় জোয়ান কাজের মেয়ে নয়। ওর এক মামার সংসার ভেঙে গেছে এই কাজের মেয়েলোক নিয়েই। মধ্যরাতে মামীকে বিছানায় রেখে মামা চলে যেতো ওই মেয়েলোকের কাছে। ব্যাপারটা হাতেনাতে ধরা পড়ার পর মামী আর স্বামীর ঘর করেনি, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে চলে গেছে সোজা বাবার বাড়ি। মামার এই কীর্তি শুনিয়ে লাভলি আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে, এরকম কিছু আমাদের বেলায় ঘটলে এর হেরফের হবে না।

সন্ধ্যার আগেই অফিসে ঢুকি। লেট হলে কারো কাছে জবাবদিহিতার বালাই নেই। তবু দায়িত্ববোধ বলে কথা। কাজে ফাঁকি দেওয়ার পক্ষে আমি কোনোকালেই ছিলাম না। যে কারণে পেশাগত গন্ডিতে একটা সুনাম আছে। বাসা থেকে বেরোবার সময় ভাবলাম অফিসে যাওয়ার আগে প্রেসক্লাবে গিয়ে একট আড্ডা মেরে এলে মন্দ হয় না। গলি শেষে বড় রাস্তায় পা রেখে একটা রিকশা ডাকলাম। রিকশায় চড়ার পর ধূমপান না করলে যেন স্বস্তি পাই না। জিন্স্ প্যান্টের উপর পাঞ্জাবি পরেছি আজ। প্যান্টের ডান পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর গ্যাসলাইটার বের করি। একশলা ধরিয়ে ডানপাশে তাকাতেই প্রায় চমকে উঠি। আইল্যান্ডের ওপাশে রাস্তার ওপারে ফুটপাতে দাঁড়ানো নীল সিল্কের শাড়ি-ব্লাউস পরা ফর্সা এক মহিলা। প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি মিনা হোসেন। পরে দেখলাম আরেকজন। তবে বেশ মিল আছে। মিনা হোসেনকে মাত্র একদিন দেখেছি। তারপরও মনের ভেতর গেঁথে আছে। হয়তো খলিলের কারণে। মিনার নাম্বার আমার মোবাইল ফোনে স্টোর করা আছে। ইচ্ছে করলেই ফোন করতে পারি। দুই-একবার যে ইচ্ছে জাগেনি তা নয়। কিন্তু তালুকদারের কথা ভেবেআর করিনি। ভদ্রলোক জানতে পারলে হয়তো মাইন্ড করতে পারেন। ওদিকে লাভলির কানে গেলে লংকাকান্ডের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এসব ভেবেইচ্ছার মুখে লাগাম টেনেছি। তবু নাম্বারটা রেখে দিয়েছি। বলা যায় না, হঠাৎ জরুরি দরকারও পড়তে পারে। আবুল হোটেল মোড় পেরোবার পর দেখলাম, আইল্যান্ডের ওপাশে জ্যাম থাকলেও এদিকটা ফাঁকা। মেঘ দেখে মনে হচ্ছে দম নিচ্ছে। বর্ষাকাল চলছে। বৃষ্টি না হওয়াটাই এখন অস্বাভাবিক। মিনা হোসেনের বদলে শেষ পর্যন্ত খলিলকে কল করলাম। হাজার হলে দোস্ত মানুষ, একটু খোঁজ-খবর নিতে হয়। কিন্তু ওর ফোন বিজি। যা স্বভাব, হয়তো কোনো মহিলার সঙ্গে লম্বা প্যাঁচাল জুড়ে দিয়েছে। আবার এমনও হতে পারে মিনা হোসেনের সঙ্গে এখন কথা বলছে। মৌচাক মোড়ে এসে রিকশা বাঁ-দিকে টার্ন নিতেই জ্যামের কবলে। এই ফাঁকে খলিলকে ফের ফোন করলাম। ও রিসিভ করতেই বলে উঠলাম- কি রে দোস্ত। কয়েবার ট্রাই করে লাইন পাচ্ছিলাম না। ইজি কাকে বিজি ছিলি নাকি?

আমার খোঁচাটা বুঝতে পেরে খলিল এমন হো: হো: হাসি ঝাড়তে থাকে যে মনে হলো, ফোন উপছে সেটা বোধহয় সামনে রিকশাওয়ালার কানে গিয়েও ঠেকছে। হাসি থামিয়ে খলিল বলে- দোস্ত, তোর মুখে আমার বুলি শুনে বেশ ভালো লাগলো। তালুকদারের সঙ্গে থেকে দেখছি তোর ভালোই উন্নতি হয়েছে!

- মানে?

- বুঝতে পারিস নাই! আমি তো বলছিলাম, তালুকদার তোর সঙ্গে শেয়ার করে কিনা?

- কী শেয়ার করবে?

- বাহ্, কচি খোকা বনে গেছিস! তোকে কোথাও নিয়ে যায় না, মানে কোনো মহিলার কাছে?

খলিলের হেঁয়ালি খোলাসা হতেই জবাব দেই- দ্যাখ দোস্ত, তালুকদারের সঙ্গে আমার ওই ধরণের সম্পর্ক নেই, সেটা তুই ভালো করেই জানিস।

-রেগে যাচ্ছিস ক্যান! ইয়ার্কি করছি। তবে দোস্ত তালুকদার তোকে খুব বিশ্বাস করে। এটা আমি বিভিন্ন সোর্স থেকে জেনেছি। তা ও ব্যাটা এখনও কোথায়?

-বিদেশে।

-শালা পারেও বটে! দম আর ফুরায় না। এখনও শালা ছকড়ি পটাতে ওস্তাদ।

-তুইও কম যাস নাকি?

জবাবটা না দিয়েই খলিল বলে ওঠে- দোস্ত জরুরি একটা কল এসেছে পরে কথা হবে।

ফোনের লাইন কেটে যেতেই নিজকে অনেকটা বেকুবের মতো লাগে। আসল কথাটাই বলা হলো না। খলিলকে ফোন করেছিলাম, মিনা হোসেনের কথা জানতে! যানজট আলগা হওয়ায় রিকশা আবার চলছে। আকাশ মেঘে ভার। অনেক দিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়লো, যা খলিল জানে না। দশ-বারো বছর আগের কথা। শরীফউদ্দীন তালুকদারের সঙ্গে পরিচয়টা তখন মাত্র দুই-এক বছরের। তখন থেকেই তালুকদারের বেশ আস্থা আমার প্রতি। বন্ধুস্থানীয় এক সম্পাদককে বলে তার অর্থ-বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিনে এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারসহ তালুকদারের ওপর একটা কভার স্টোরি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার- দুটোই ছিল আমার লেখা। তা প্রকাশিত হওয়ার পর তালুকদার তো আহ্লাদে আটখান। বার বার শোনাতে থাকেন, অনেকেই তার সাক্ষাৎকারটা অ্যাপ্রোসিয়েট করেছে। এমন কি বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যন্ত ফোন করে প্রশংসা করেছেন। শরীফউদ্দীন তালুকদারের সঙ্গে পরিচয়টা হয়েছিল খলিলের মাধ্যমে। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তালুকদারের দেওয়া তথ্য মোতাবেক কিছু রিপোর্ট পত্রপত্রিকায় ছাপানোর জন্য। কাজটা আমি বিশ্বস্ততার সাথে করেছি। কেউ কখনও জানতে পারেনি, ওই রিপোর্টগুলোর পেছনে ছিল তালুকদারের হাত। বলতে গেলে, টুকটাক কাজের ভেতর দিয়েই আমি তার অঘোষিত মিডিয়া কনসালটেন্ট হয়ে উঠি। যা এখনও অক্ষুন্ন। আমাকে বিশ্বাস করেন বলেই তালুকদার নিজ জীবনের গোপন ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলো আজ বলতে দ্বিধা করছেন না। অর্থ-বাণিজ্য বিষয়ক ম্যাগাজিনে কভার স্টোরি প্রকাশিত হওয়ার পর শরীফউদ্দীন তালুকদার হলুদ খাম ধরিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি, তার পাজেরো জিপে আমাকে বসিয়ে রওনা হলেন। আমি কাকরাইল মোড়ে নেমে যেতে চাইলে তালুকদার বলে ওঠেন- সাংবাদিক সাহেব, আপনাকে আজ একটা সারপ্রাইজ দিব। কথাটা শুনে সেদিন সত্যিই ধাঁধার মধ্যে পড়েছিলাম। হলুদ খামে ধরিয়ে দেওয়ার পর আর কী সারপ্রাইজ থাকতে পারে কিছুতেই আঁচ করতে পারছিলাম না। পাজেরো জিপে উঠার পর তালুকদার ড্রাইভারকে বলেছিলেন, গুলশান এক নম্বরে চলো। সেই সূত্রে আমি শুধু জানতাম, আপাতত গুলশানে যাচ্ছি, সারপ্রাইজটা কোথায় এবং কী রকম সেটা জানা ছিলনা। তখন শীতকাল। দেখতে দেখতে বেলা ফুরিয়ে যায়। গাউসুল আজম মসজিদের সামনে দিয়ে মহাখালী ও গুলশানের মাঝখানে লেকের ব্রিজ অতিক্রম করছিলাম তখন আশেপাশে অন্ধকার ঠেকাতে আলো জ্বলে উঠেছে। এক নম্বরের মোড় পর্যন্ত না গিয়ে বাঁ পাশের একটা রাস্তায় গাড়ি ঢুকে পড়ে। কিছুদূর এগিয়ে একতলা বাড়ির গেটের সামনে থেমে হর্ণ বাজায়। ভেতর থেকে দারোয়ান খুলে দেয় গেট। বেশ কয়েক বছর পর অন্য একটা কাজে ওদিকে যাওয়ার সুযোগ হেয়েছিল আমার। তখন দেখেছি ওই একতলা বাড়িটা আর নেই, সেটা ভেঙ্গে বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ চলছে। একতলা বিল্ডিংটার সামনে ছিল বিরাট লন। কেয়ারি করা বাগানে নানা রকম আর রঙের ফুল সন্ধ্যার আলোতে ঝলমল করছিল। পাজেরো থেকে নেমে আমরা ড্রইং রুমে পা রাখলাম। যেন হলরুম, তিনসেট সোফা দিয়ে সাজানো। সিলিংয়ে ঝুলছে ঝাড়বাতি। ডবল সাইজের সোফায় ঠান্ডার ভেতর স্লিভলেস ব্রাউস-সিল্কের শাড়ি পরা বেশ ফর্সা ও আকর্ষণীয় এক মহিলা এবং হাইফাই পোশাকে এক তরুণী বসা ছিল। তালুকদারকে দেখেই দুজনে উঠে দাঁড়ায়। আমি তখন বুঝতে পারলাম মহাখালী বাস টার্মিনালের ওদিকে জ্যামে আটকে পড়া অবস্থায় এই মহিলার ফোনেই তালুকদার রিসিভ করে বলেছিল- তোমরা এসে গেছো! একটু ওয়েট করো, আমি চলে আসছি। মহিলার বয়স হলেও ফিগার খুব ধারালো। মেদের বাহুল্য নেই একরত্তি। সাথের মেয়েটাও অত ফর্সা না হলেও আকর্ষণীয়। টাইট জিনস্ প্যান্টের ওপর টি-শার্ট, হেয়ার স্টাইল আর মুখের মেকাপে মিশে আছে উঠতি বয়সের চটক। তালুকাদারের মতলবটা কী বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যেহেতু তখনও তার নারীঘটিত দোষ বা দুর্বলতা আমার জানা ছিল না। হয়তো আমার মনোভাব ধরতে পেরেই বলেছিলেন- কি হে ব্রাদার, অবাক হচ্ছেন! বেঁচে থাকতে হলে এক-টাখটু ইনজয় করতে হয়, এতে অ্যানার্জি মেলে। সালসার মতো কাজ হয়। কী ঠিক বললাম না? আমার জবাবের অপেক্ষায় না থেকে তখন সোফা থেকে উঠে দাঁড়ানো মেয়ে দুটিকে বললেন- আ-রে, তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন! বসো, বসো। আমি কী হেডস্যার না-কি!

ওরা বসলো। আমরাও বসলাম আলাদা সোফায়। শাড়ি পরা মহিলাকে তালুকদার বললেন- মনিকা, এ হলো আমার খুব ভালো বন্ধু। আজকে একে এমন সার্ভিস দেবে এই সন্ধ্যা যেন ওর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। কথাটা শোনার পর মনিকা হাসিমুখে আমার দিকে তাকায়। এমন লাস্যময়ী যে ওকে ফেরানোর ক্ষমতা হয়তো সাধুসন্তদের থাকতে পারে, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। খলিলে মতো বন্ধু থাকায় বিয়ের আগে সতীত্বের বিপরীত লিঙ্গ কৌমার্য হলে সেটা আমার ছিল না। ওর পাল্লায় পড়ে ওল্ড টাউনের নিষিদ্ধ পল্লী থেকে আবাসিক হোটেল কিংবা ফ্ল্যাট বাড়ি- অনেক জায়গায় আমার পা পড়েছে। বিয়ের পর কয়েকবছর পরনারী থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছিলাম। একদিন খলিল আমাকে কলাবাগান লেক সার্কাস রোডে এক ডাকসাইটের মক্ষীরাণীর ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলে বিবাহোত্তর সততা সেখানেই খসিয়ে এসেছিলাম। তারপরও সহধর্মিনীর কড়া মনোভাবআঁচ করে নারীঘটিত ব্যাপারে আমি সতর্ক এবং সংযত থাকার চেষ্টা করেছি। তবে তালুকদার মাত্রই একদিনই সারপ্রাইজ দেওয়ার নামে মনিকার মতো হাইফাই কলগার্লের চরম সান্নিধ্যের দিকে ঠেলে দিলেও পরবর্তীতে তার পুনরাবৃত্তি কখনও ঘটাননি। লোকটা ধুরন্ধর বটে। তবে মানুষের মন পড়তে জানেন। সেদিন গুলশান থেকে ফেরার সময় আমি কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। লাভলির কথা ভেবে বড্ড অনুশোচনা হচ্ছিল। সেটা অনুমান করতে পেরেই তালুকদার বলেছিলেন- সাংবাদিক সাহেব, আপনি ভাবীকে খুব ভালোবাসেন। আবার ভয়ও করেন। কী ঠিক বলেছি তো? জবাব দেওয়ার আগেই তালুকদার ফের বলেন- সরি ভাই, আগে জানলে আপনাকে এই জায়গায় নিয়ে আসতাম না। আমি তো

ভেবেছিলাম আপনি খলিলের বন্ধু, তাই.....
কথাটা আর শেষ করেননি তালুকদার। তবে কী বলতে চেয়েছিলেন সেটা বুঝতে পারি ঠিকই। ধানমন্ডিতে এক বিয়ের নিমন্ত্রণে যাওয়ার পথে সেদিন আমাকে বিজয় সরণীর উল্টাদিকে, র‍্যাংগস্ ভবনের সামনে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন। ফার্মগেট পর্যন্ত হেঁটে এসে ছয় নম্বর বাস ধরে শান্তিনগর মোড়। তখন আমার অফিস ছিল ওদিকেই। অফিসে গিয়ে বলেছিলাম, আমার এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে গিয়েছিলাম। কর্মক্ষেত্রে মিথ্যা বলার নজির আমার ছিল না। তাই পত্রিকার নিউজ এডিটর আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। লেট নাইট শিফটে কাজ সেরে গভীর রাতে ফিরেছিলাম বাসায়। রামপুরায় নয়, তখন থাকতাম শান্তিবাগের এক গলির ভেতর চারতলায় এক ছোট্ট ফ্ল্যাটে। গভীর রাতে ফিরতে হতো বলে নীচতলার কলাপসিবল গেটের তালা এবং চারতলার ফ্ল্যাটের দরজার লকের ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে থাকতো। অনেক রাতে ফিরে দেখি লাভলি ঘুমিয়ে আছে। ওকে জাগায়নি। টেবিলে রাখা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। না, লাভলি টের পাইনি। পাবেই বা কী করে। গুলশানের ওই বাড়ি ত্যাগ করার আগে গরম পানিতে গোসল সেরে পুরোপুরি ফ্রেস হয়ে বেরোই। সেদিন তালুকদারও ওই উঠতি বয়সের মেয়েকে নিয়ে ঢুকেছিলেন আরেক বেডরুমে।
শরীফউদ্দীন তালুকদার সত্যিই তার কমিটমেন্ট রেখেছেন। আমাকে আর কখনও কোনো নারীর কাছে নিয়ে যাননি। লোকটাকে মাঝে-মধ্যে অদ্ভুত মনে হয়। অদ্ভুত না হলে কেউ কী এভাবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস বুকে লেখাতে চায়। কত বড় ঝুঁকির ব্যাপার-কখনও ভেবে দেখেছেন। এতে তার সুনাম ও ভাবমূর্তি এমনকি ব্যবসায়িক গুডউইল পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তালুকদারকে বোঝাবে কে? আমার পক্ষে তো সম্ভবনয়। হয়তো খলিলকে বললে কাজ হতো। কিন্তু তালুকদারের অনুমতি ছাড়া ওকে বলা উচিত হবে না, তারপর ব্যাপারটা নিয়ে ওর পক্ষে উল্টা জট পাকানোর আশংকাও আছে। এ কারণেই তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তালুকদারের সঙ্গে আমার গুলশানের ওই অভিসারে যাওয়ার কথা ওকে বলিনি।

পঁচিশ

শরীফউদ্দীন তালুকদারের দেশে ফেরার নির্ধারিত তারিখের পর দুদিন পেরিয়ে গেছে। কোনো খোঁজ-খবর নেই। ভেবেছিলাম একবার ওর মোবাইল ফোনে কল দেব। সেটা না করে মতিঝিলের কর্পোরেট অফিসেও ফোন করে খোঁজ নিতে পারি। তবে এমন গরজ ছিল না যে ফোন করতেই হবে। এদিকে আবার সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচন নিয়ে কদিন বেহুদা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। কিছু পরিচিত সাংবাদিকের পীড়াপীড়িতে ঠিক করেছিলাম- নির্বাচনে প্রার্থী হবো। যেহেতু সাংবাদিক ইউনিয়ন এখন টাউট-বাটপাড় আর অপেশাদার সাংবাদিকদের দখলে চলে গেছে। সাংবাদিক ইউনিয়নের রাজনৈতিক বিভক্তিকরণে এটা ঘটেছে। এর ফলে সাংবাদিকদের চাকরির ক্ষেত্রে এখন অনিশ্চয়তা, যখন-তখন ছাপাই। ইউনিয়ন কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে পারছে না। এসব চিন্তা করেই এক উৎসাহী কলিগের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র সংগ্রহও করি। শেষে পিছিয়ে এলাম। ভোট চাইতে হলে এক হাউজ থেকে আরেক হাউজে ছুটতে হবে। যাকে অপছন্দ করি তাকেও তেল মারার বিকল্প নেই। ভাবলাম, কী দরকার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার! আমার সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্তে সাংবাদিক বন্ধুদের অনেকেই হতাশ হলো, কেউ কেউ রীতিমতো অসন্তুষ্ট। নির্বাচনের ব্যাপারে আমার যে সহকর্মী সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল সে তো বলেই বসলো- কাজটা আপনি ঠিক করলেন না। আসলেই কাজটা ঠিক না বেঠিক করেছি সে ব্যাখ্যা তাকে যখন অফিসে বসে দিচ্ছি তখনই আমার মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। নাম্বার না দেখে রিসিভ করতেই তালুকদারের গলা- কী সাংবাদিক সাহেব, আপনার তো কোনো খবর নাই। অসুস্থ নাকি?
- না, না, অসুস্থ নই, ঠিক আছি।
-কাল ফ্রি আছেন তো। আমার অফিসে লাঞ্চ করবেন। বলেই ফোনের লাইন কেটে দেন তালুকদার।
পরদিন, দুপুরের দিকে হাজির হলাম মতিঝিলে তালুকদার গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজের কর্পোরেট অফিসে। সেখানে পা রাখতেই রিসিপশনিষ্ট মেয়েটি আমাকে বলে- স্যার, আপনাকে একটু বসতে বলেছেন। বিদেশি বায়ার এসেছে। তাদের সাথে মিটিং শেষ হলেই আপনাকে ডাকবেন।
এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। বরং রাস্তাঘাটের জ্যাম ঠেলে সময় মতো পৌঁছতে পেরেছি- এই তৃপ্তি নিয়েই ওয়েটিং রুমের নরম সোফায় গা এলিয়ে বসলাম। সামনে টি-টেবিলে দেশি-বিদেশি একগাদা ম্যাগাজিন। আরো কয়েকজন রয়েছে ওয়েটিং রুমে। ওরা কী একটা বিষয়ে নিচু গলায় আলাপ করছে। সেদিকে কান দিয়ে লাভ নেই। একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন হাতে তুলে নেই। সুন্দরবনের ওপর কভার স্টোরি। প্রচ্ছদে একটা ছোট্ট নদীর দুপাশে ঝোপ-জঙ্গল। গোলপাতার ঝাড়। ছৈওয়ালা এক ডিঙ্গি নৌকার দুই গুলাইয়ে দুটো লোক বৈঠা ঠেলছে। প্রচ্ছদে সুন্দরবনের দৃশ্য দেখে আফসোস উঁকি দেয়, এত বয়স হলো এখনও সুন্দরবনে যাওয়া হলো না। একবার চান্স পেয়েছিলাম। যেতে পারলাম না লাভলির কারণে। নদীকে বেশ ভয় পায়, তারপর সাঁতার জানে না। সুন্দরবনের নাম শুনেই বাঘ-কুমিরের ওজর তোলে। নিজে তো গেল না, আমাকেও যেতে দিলো না। দোতলা লঞ্চে সরাসরি সুন্দর বনে যাওয়া পিকনিক পার্টিতে শুধু পুরুষই নয়, মেয়েরাও ছিল। অতএব লাভলি আমাকে একা ছাড়তে রাজি হয়নি। স্ত্রীর এই সন্দেহবাতিক আমাকে পীড়া দেয় কখনও কখনও। আমি যদি পরকীয়া প্রেম বা অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হই, সেটা তো ঢাকাতে বসেই করতে পারি। লাভলি কী টের পাবে?
তালুকদারের সঙ্গে গুলশানে গিয়েছিলাম সেটা কী ও টের পেয়েছে? খলিল আমাকে কত জায়গায় নিয়ে গেছে কোনোদিন জানতে পারবে! পারবে না কোনোদিনও। এক্ষেত্রে খলিলের একটা পরামর্শ মেনে চলি। আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে জেনে খলিল বলেছিল- দোস্ত, যতই সত্যবাদী হও না কেন, বউয়ের কাছে আবার সত্য কথা বলতে যেও না। তাহলে বারোটা বাজবে তোমার। মেয়েরা সব পারে, কিন্তু তার পরিধি বলো আর অধিকারের সীমানা বলো, সেখানে অন্য নারীর উপস্থিতি কখনও বরদাশ্‌ত করবে না। মাগীপাড়ার বেশ্যারা ভাউড়া পোষে, জানিস তো। সেই ভাউড়া যদি অন্য মেয়ের দিকে নজর দেয়, তাহলে বেশ্যা তাকেও ছাড়ে না, পয়লা তো চোখ তুলে নেওয়ার হুমকি দিবে। অথচ বেশ্যার বিছানায় অহরহ কত পুরুষ যাচ্ছে আর আসছে। বন্ধুর সদুপদেশ আজও ভুলিনি। আর লাভলির যা মানসিকতা, তাতে ওই পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা ছাড়া অন্য জো নেই।
হঠাৎ খেয়াল করলাম, রিসিপশনিষ্ট মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে স্বচ্ছ শার্সির পার্টিশনের ওপাশ থেকে। নতুন দুই-একবার দেখলেও আগের মেয়েটার মতো ঘনিষ্ঠতা, অর্থাৎ দেখা হলেই হাসিমুখে কুশল বিনিময়সহ দুই-একটা কথাবার্তা এখনও শুরু হয়নি। তবে আগেরটার চেয়ে এখনকার রিসিপশনিস্ট বেশি সুন্দরী। যেমন গায়ের রং, কাটা কাটা চেহারা। কোকড়া চুলের মতোই কালো দুটি চোখ। স্বীকার করতেই হবে, মেয়ে স্টাফ নিয়োগে তালুদারের রুচি আছে। খলিলের মুখে শুনেছি, পুরুষ স্টাফ নিয়োগে তালুকাদর তেমন একটা নাক গলান না। কিন্তু মেয়ে স্টাফ নিয়োগের ব্যাপারে তিনি কারো মতামত বা সুপারিশ আমলে নেন না। নিজেই দেখে শুনে সিলেক্ট করেন। যোগ্যতার পাশাপাশি সৌন্দর্য থাকা চাই। ঘরে যেমন ফুলদানিতে অনেকেই টাটকা ফুল সাজিয়ে রাখে তেমনি তালুকদার শুধু কর্পোরেট অফিসে নয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও সুন্দরী মেয়ে স্টাফ দিয়ে সাজিয়ে রাখেন- এমনকি তার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির নারী শ্রমিকেরাও নাকি দেখার মতো। খলিলের মুখেই এসব শুনেছি। কখনও খতিয়ে দেখার আগ্রহ দেখাতে যাইনি। আসলে মতিঝিলের কর্পোরেট অফিসেই আমার যা যাওয়া-আসা। এখানে এ যাবত যত মেয়ে স্টাফ নজরে পড়েছে তাদের সৌন্দর্যের সত্যিই তারিফ করতে হয়। খলিলের কথা শুনে কোনো প্রকার সন্দেহ বা প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে বলে মনে করি না। আমার এই বন্ধুটি ব্যক্তিগত জীবনে যেমন বহুগামী তেমনি কর্মজীবনেও বিচিত্রগামী। কখন কোন ধান্ধায় নিজকে জড়িয়ে ফেলে আগেভাগে বলা মুশকিল। তবে ধনী ধনী লোক আর হাইফাই মেয়েদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক বরাবরই আমাকে অবাক করেছে। একবার খলিল আমাকে বনানীতে এক ম্যানপাওয়ার ব্যবসায়ীর অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে দেখলাম, অফিসের নিচতলা-দোতলায় নজর কাড়ার মতো মেয়েরা কাজ করছে। সবাই কোট-প্যান্ট-টাই পরে ফিটফাট। খলিল জানায়, ওই ব্যবসায়ী নাকি প্রতি বছর অফিসের কার্পেট বদলানোর পাশাপাশি নারী স্টাফদের বদলে ফেলেন। মেয়েদের ব্যাপারে কতজনের কত বাতিক চাগাড় দেয়। এক সময় এদেশের জমিদাররা ঘরে যুবতী সুন্দরী স্ত্রী থাকতেও সুরা আর সাকি নিয়ে বাঈজিপাড়ায় পড়ে থাকতো। একবার কোন এক সাময়িকীতে পড়েছিলাম, ব্রিটিশ এবং তার আগে নবাবী আমলে ধনিক শ্রেণির লাম্পট্য এত বেড়ে গিয়েছিল যে একেকজনের হারেমে শত শত মেয়েলোক থাকতো। সমাজেও তার একটা প্রভাব পড়েছিল। সে সময় কোথাও কোন হাট বা গঞ্জ বসলেই বেশ্যালয়েও ব্যবস্থা করা হতো। আর বহু বিবাহের প্রচলণ তো ছিলই। তবে শরীফউদ্দীন তালুকদারের বিষয়টা সেই ধারাবাহিকতায় অংশ হলেও অনেকটা আলাদা আমার কাছে।
কয়েকজন ফরেনারকে তালুকদারের রুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে নরম গদি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ওরাই তালুকদারের বায়ার। ওদের মাঝে টলফিগার ও স্বর্ণকেশি এক মহিলাও আছেন।
বায়ারদের পেছনে পেছনে তালুকদারের বেরিয়ে আসা পিয়ন আমারদিকেই এগিয়ে এসে বললো- স্যার আপনারে যাইতে কইছেন।
রুমে প্রবেশ করে দেখলাম বিদেশ ফেরত তালুকদার সুটেড-বুটেড অবস্থায় বেশ চকচক করছেন। মাথার টাক তো রীতিমতো জেল্লা দিচ্ছে। আমাদের এক সাংবাদিক একবার প্রেসক্লাবের আড্ডায় বলেছিলেন, অর্থ থাকলে মানুষের পোশাক-আশাকে শুধু নয়, চেহারাতেও গ্লেস দেয়। তালুকাদরকে দেখে কথাটা ফের মনে পড়লো। তিনি ব্যস্ত ছিলেন সেক্রেটারিয়েট টেবিলে মেলে ধরা ল্যাবটপ নিয়ে। আমাকে ঢুকতে দেখে ঠিকই বলেন- ভালো আছেন তো সাংবাদিক সাহেব, প্লিজ একটু বসেন।
দরজার কাছেই সোফায় বসতেই তালুকদার তা দেখে বলে ওঠেন- ওখানে কেন, সামনে আসেন। সোফা ছেড়ে তালুকদারের সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উল্টাদিকে বসলাম। ল্যাবটপে মগ্ন লোকটাকে দেখে অবাক হতে হয়, বিদেশ যেন ওর কাছে ডাল-ভাত। আজ যাচ্ছেন তো কাল ফিরছেন। কোনো ক্লান্তি নেই। আর আমি, বিদেশ তো দূরের কথা, আজ কাল ঢাকার বাইরে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না। চাকরি-বাকরি আর সংসারের নানা ঝামেলা তো আছেই, তারপর কোথাও যেতে চাইলে স্ত্রীর হাজার প্রশ্ন। লাভলির যা সন্দেহ তাতে মনে হবে, আমি যেন অন্য মেয়েলোক নিয়ে ঢাকার বাইরে মধুচন্দ্রিমায় যাচ্ছি। আবার স্ত্রীকে নিয়ে কোথাও

বেড়াতে যাব, সে সুযোগ কম। ওর এক রকম অ্যালার্জি আছে, দূরপাল্লার ধকল সহ্য হয়না। গাড়িতে বসে বমি আর বমি। একবার রাজশাহীতে লাভলির মামার বাসায় বেড়াতে গিয়ে বেশ শিক্ষা হয়েছে আমার। এদিক থেকে বিচার করলে তালুকদারকে সত্যিই সৌভাগ্যবান মনে হয়। বলগা ছাড়া ঘোড়ার মতো তিনি শুধু স্বাধীনই নন, সামর্থ্যবানও বটে। যেদিকে ইচ্ছে ছুটতে পারেন। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে মনে মনে হাসি পেল। একটা প্রবাদ আছে না কোথায় আগরতলা আর কোথায় শালার চৌকিরতলা! এমন সময় কানে গোত্তা খেলো তালুকদারের প্রশ্ন- আপনার বন্ধুর খবর রাখেন সাংবাদিক সাহেব?

- খলিলের কথা বলছেন? ওর সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ নেই। মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হয়।

- ও কী কাণ্ড করেছে সেটা শোনেননি?

অবাক হলাম। খলিল আবার কী কাণ্ড ঘটালো! অনুমান করলাম, হয়তো মিনা হোসেনকে...

তালুকদার ফের বলে ওঠেন- সাংবাদিক সাহেব, আমি মানুষ চড়িয়ে এতদূর এসেছি। আপনি আসলেই একজন ভদ্রলোক। কিন্তু আপনার বন্ধুকে এই সার্টিফিকেট দিবনা। ও ব্যাটা বেসিকলি একটা পিম্প। তা বাবা তোর যা ইচ্ছা তাই কর, আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু তালুকদারের বাড়া ভাতে ছাই দিতে আসবি ক্যান! ঠিক আছে, আমিও দেখে নিব।

ব্যাপারটা কেমন ঘোলাটে মনে হওয়ায় না বলে পারলাম না- আসলে কী হয়েছে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!

- মিনা হোসেনকে বিয়ে করেছে আপনার বন্ধু!

কথাটা শোনার পর মনে হলো, আকাশ থেকে পড়লাম আমি। খলিলের স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে! খানিকটা আফসোসের ভঙ্গিতে তালুকদার বলতে থাকেন- আমি ভাবছি মেয়েটার কথা, খলিলকে বিয়ে করে নিজের পায়েই কুড়াল মারলো! সাংবাদিক সাহেব, সুন্দরী মেয়েরা বেশিরভাগই বোকা টাইপের হয়ে থাকে। আপনি একটু তোষামোদ করুন রূপের প্রশংসা করুন, অমনিই দেখবেন মোমের মতো গলে গেছে। আর মিনা হোসেনের ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি জানেন কিনা জানি না, একেবারে সাধারণ পরিবারের মেয়ে। বাবা পোস্ট অফিসের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। আমি সত্যিই ওর ভালো চেয়েছি, চট্টগ্রামের অফিসে ওকে ভালো পোস্টিং দিয়েছি- যদিও ওর কোয়ালিফিকেশন তা কভার করে না। তারপরও নিজের ভালো বুঝলো না। কথায় আছে, শুকুরে চিনে কচু। ওর অবস্থা তাই হয়েছে।

শরীফউদ্দীন তালুকদারের কথাগুলো আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ঠেলে দেয়। শত হলে খলিল আমার বন্ধু। ওর মাধ্যমেই দেশের এই নামকরা শিল্প উদ্যোক্তার সঙ্গে আমার পরিচয়। না বলে পারলাম না- খলিল এমন একটা কাজ করলো, অথচ আমাকে কিছুই জানায়নি।

-জানাবে কেন, আপনার সাথে যে আপনার কানেকশন আছে, সেটা ও জানে। শুনে রাখুন সাংবাদিক সাহেব, খলিলকে আমি ছাড়বো না। এর আগেও ফাউল করেছে। কোহিনুর নামে এক কলগার্লের সঙ্গে মিলে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল। আপনাদের এক সাংবাদিক ব্যাপারটা আমাকে জানিয়ে গেলে আমি কোহিনুরকে সাইজ করে দিয়েছি। জীবনেও আমার নাম নিবেনা।

কথাটা শোনার পর একটু অবাক হওয়ার ভান করলাম- আপনি তো এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জানাননি!

তালুকদার বলেন- আপনি ভদ্রলোক, তাই জানাইনি। তালুকদার সাংবাদিকের নাম উচ্চারণ না করলেও আমি তাকে ঠিকই চিনি। ক্রাইম রিপোর্টার রহমান। ওই ঘটনার একটা আভাস আমি পেয়েছিলাম। এ নিয়ে তালুকদারের সামনে টু শব্দটি করলাম না। উনি আবার ভুল বুঝতে পারেন। তবে এটা ঠিক, তালুকদারকে ব্লাক মেইল করতে চাওয়াটা খলিলের যেমন উচিত হয়নি, তেমনি মিনা হোসেনকে বিয়ে করাটাও ঠিক হয়নি। এই মুহূর্তে আমি প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলাম। প্যাকেট থেকে কাগজ কলম বের করে বললাম- তাহলে আমরা আমাদের কাজ শুরু করতে পারি?

- আজ মুড নেই সাংবাদিক সাহেব। দুই একদিন খুব বিজি থাকবো। ফ্রি হলেই আপনাকে ফোন দিব।

- আমরা কিন্তু প্রেস কনফারেন্সের বিষয়ে বেশি সময় নিয়ে ফেলছি।

- সেটা আমিও বুঝি। কিন্তু আপনিই তো দেখছেন, কত ঝামেলা আমার ঘাড়ে।

কথা বাড়ালাম না। কাগজ-কলম গুটিয়ে ভরে রাখি প্যাকেটে। বুঝতে আমার বাকি নেই, খলিলের পক্ষে মিনা হোসেনকে বিয়ে করাটা তালুকদার কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

লাঞ্চের পর বিদায় নেওয়ার সময় শরীফউদ্দিন তালুকদার বলে ওঠেন- একটা কাজ করলে কেমন হয় সাংবাদিক সাহেব।

- কী কাজ?

- আমি তো আপনাকে ডিটেলস্ বলে যাচ্ছি। সব নোট নিশ্চয় আছে। আপনি শুধু সাজিয়ে আর একটু রংচং মেখে বইয়ের জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলেন। তারপর বই বেরোবে। বই প্রকাশের সময় প্রেস কনফারেন্স করলে কেমন হয়?

প্রস্তাবটা মন্দ নয়, সায় দিলাম- সেটা আপনি চাইলে করতে পারেন। আমার কাছে যে ম্যাটার আছে আর বাকিটুকু আপনি বললে মোটামুটি পাঁচ-ছয় ফর্মার একটা বই করা যবে। কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গে আমার সিটিংয়ের কাজটা সেরে ফেলতে চাই।

- তা অবশ্যই হবে। আসলে কী জানেন, মিসেস চৌধুরী এবং তার উত্তর প্রজন্মের নারীদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাকে আমি স্মরণীয় করে রাখতে চাই। মোগল সম্রাট শাহজাহানের মতো তাজমহল গড়ার সাধ্য আমার না থাকলেও আমি যে যাকে বলে অভূতপূর্ব কিছু একটা করে ফেলেছি- এটা দুনিয়ার সবাইকে জানাতে চাই। এতে আমার যতই বদনাম হোক ভয় করি না। আমি রিস্ক নিতে জানি। রিস্ক নেওয়া ছাড়া জীবনের কোনো সাফল্য আসে না। বুঝলেন সাংবাদিক সাহেব, আমি ভেবে রেখেছি প্রেস কনফারেন্সের দিন গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের একজন প্রতিনিধিকে ইনভাইট করে আনবো। তাতে যত খরচ লাগে, আমি দেব।

শরীফউদ্দীন তালুকদারের একথা শোনার পর আমার অবস্থা সত্যিই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

ছাব্বিশ

শরীফউদ্দীন তালুকদারের কাছ থেকে বিয়ের খবরটা শোনার পর অবাক না হয়ে পারিনি। তবে মিনা হোসেনের বিষয়ে খলিলকে যতটা সিরিয়াস দেখেছি, এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে তা আগে থেকেই আঁচ করা উচিত ছিল। খলিলের স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে। ওর তো আর্লি ম্যারেজ। মেয়েটা এইটে না নাইনে পড়ে। দেখতে দেখতে বিয়ের যুগ্যি হয়ে ওঠবে। এ অবস্থায় আরেকটা বিয়ে করা ওর পক্ষে কী ঠিক হলো! অন্তত ওর জায়গায় আমি থাকলে কখনোই করতাম না।

অফিসে ফিরে খলিলের ব্যাপারটা মাথা থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা সম্ভব হচ্ছিল না। তালুকদারের যে মন মেজাজ দেখে এলাম, তাতে অশংকা হচ্ছে খলিলের সামনে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা- সোজা কথায় বিপদ অপেক্ষা করছে। একবার মনে হলো, ওকে ফোন করে সতর্ক করে দেই। পরক্ষণে মত পাল্টাই এই ভেবে- দরকার নেই অযথা বিপদে জড়াবার। এক্ষেত্রে দেখা যাবে, খলিলকে বলেছি একথা পরে সেটা আরেক কথা হয়ে তালুকদারের কানে পৌঁছবে। এতে আমাদের সম্পর্ক বিনষ্ট হতে পারে। একবার সন্দেহ জাগলে তালুকদার আর আমাকে বিশ্বাস করবেন না আগের মতো। তবু দ্বিধায় জড়িয়ে গেলাম। শত হলে খলিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই স্কুল লাইফ থেকে। এ জীবনে কতজনের সঙ্গেই তো বন্ধুত্ব হয়েছে, কিন্তু খলিলের মতো সম্পর্কটা আর কারো সাথে নেই। আমরা এখনও পরস্পরের খোঁজ খবর রাখি। তাছাড়া খলিল আমার কম উপকার করেনি। প্রয়োজনে আমার সঙ্গে কত জায়গায় গেছে। এমন কী পত্রিকার প্রথম চাকরি নেওয়া বা সাংবাদিকতায় প্রবেশ করার পেছনে ওর অবদানও আছে। আর আমার স্ত্রী, লাভলি তো ওকে আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করে। আমার কত কী স্মৃতি খলিলকে জড়িয়ে। আর সেটা মনে করতে গিয়ে নিজেকে স্বার্থপর লাগলো। আমার উচিত ছিল, মিনা হোসেনের ব্যাপারে ওকে বাড়াবাড়ি না করার পরামর্শ দেওয়া। উপরে উপরে যত ভদ্রলোক হোক না কেন- লোক হিসেবে শরীফউদ্দীন তালুকদার সুবিধার নয়। এখন ওর যা মনোভাব, মনে হয় না খলিলকে সহজে ছেড়ে দেবে। নারীঘটিত দ্বন্দ্ব বড়ই বিশ্রি। এ নিয়ে প্রাণহানীও ঘটছে আকছার। নারীর জন্য ইউরোপে এক সময় ডুয়েল লড়াই প্রচলন ছিল। দুজনে তরবারি হাতে লড়াইতে অবতীর্ণ হতো- ডু অর ডাই, অর্থাৎ হয় মরো নয় বাঁচো। মাঝখানে কোন পথ ছিল না।

অফিস থেকে বেরোবার আগেই অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, তালুকদারের সঙ্গে আমার যা হওয়ার হবে। কিন্তু বন্ধু হিসেবে খলিলকে একবার ফোন করে সতর্ক করে দেওয়াটা আমার জন্য ফরজ। আমি কয়েকবার ওর মোবাইলে কল করলাম। ওর পাত্তা নেই। বার বার রেকর্ড করা মেয়েলি কণ্ঠ জানায়- নাম্বারটি আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। তার মানে খলিল কী সিম পাল্টে ফেলেছে! অসম্ভব কিছু নয়। ওর বাসায় ল্যান্ড ফোন আছে কি-না জানা নেই। হঠাৎ মনে হলো, ওর বাসায় একবার খোঁজ নিলে কেমন হয়? অনেকদিন ধরেই তো যাওয়া হচ্ছে না। কয়েক বারও ভেবেছি, ছুটির দিনে লাভলিকে নিয়ে একবার যাব। নানা ঝামেলায় সেটা আর হয়ে ওঠেনি। ছুটির দিনে একে তো আমাকে আলসেমিতে পেয়ে বসে, তারপর হাজির কোনো না কোনো হুজ্জত। আরেকটি কারণও আছে। আমি নিশ্চিত যে খলিলের ফ্লাট দেখে আসার পর লাভলি আমাকে একচোট নেবে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাকে আকামের ঢেঁকি বলে প্রতিপন্ন করবে। স্ত্রীর এহেন আচরণে আমার খুব খারাপ লাগে। লাভলির বুঝা উচিত, সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয়না। খলিল যে পথে হাঁটে, ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও সে পথে বাড়ানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এজন্যই কখনও স্ত্রীকে নিয়ে খলিলের বাসায় যাওয়ার গরজ দেখাই না। মাঝে মধ্যে খলিল এসে পীড়াপীড়ি করে। লাভলিও যেতে চায় । তবে যাওয়া হয়নি শেষতক। ঠিক করলাম, কালই যাব। ওখানে গেলেও খলিলের দেখা না পেলে একটা ক্লু পেতে পারি। পরদিন প্রেসক্লাব থেকে বেরিয়ে অফিসে যাওয়ার পথেই খলিলের বাসায় যাব বলে ফাইনাল করলাম। ক্লাব থেকে বেরোবার মুখে গেটের কাছে ক্রাইম রিপোর্টার রহমানের সঙ্গে দেখা। কিছুটা দূর হতে ওকে দেখতে পেয়ে ভেবেছিলাম এড়িয়ে যাব। ওর নজরে পড়ে যাওয়ায় সেটা সম্ভব হলো না। প্রায় দৌড়ে এসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে- ওস্তাদ, কদিন ধরে আপনাকেই খুঁজছি।

ভদ্রতার খাতিরে করমর্দন করেই জিজ্ঞেস করলাম- হঠাৎ কী দরকার পলো আমাকে খোঁজার?

- একজন আপনার খুব প্রশংসা করেছে।

- কে সে?

- শিল্পপতি তালুকদার। আপনাকে তিনি প্রায় ফেরেশতা বলেই মনে করে।

- রহমান সাহেব, মানুষ কখনও ফেরেশতা হয় না।

- সেটা আমাকে বলতে হবে ওস্তাদ! এই পেশায় ঢুকে আর কিছু না হোক, মানুষ চেনার সুযোগ পেয়েছি।

হঠাৎ কোহিনুর বেগমের ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। তবে সরাসরি ওই মহিলার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমার রুচিতে বাঁধে। তাই বললাম তালুকদার সাহেবের ওখানে গিয়েছিলেন কেন?
- একটা কাজ ছিল।
ওর কাজটা যে কী সেটা আঁচ করতে আমার অসুবিধা হলো না। এ ব্যাপারে কিছু জানতে না চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম- আমার বন্ধু খলিলের সঙ্গে দেখা হয়?
- কিছুদিন ধরে দেখা হচ্ছে না। ওস্তাদ, আপনার বন্ধু একটা ব্যাপারে আমার ওপর মাইন্ড করে আছে। কথাটা শোনার পরও তা নিয়ে আগ্রহ দেখালাম না। বরং এবার জিজ্ঞেস করলাম- কোহিনুর বেগমের খবর কী?
আমার এ প্রশ্ন যেন ক্রাইম রিপোর্টার রহমানকে উজ্জীবিত করে- ওস্তাদ, কোহিনুরকে আপনি চেনেন? জবাবের তোয়াক্কা না করে ফের বললো- দারুণ মাল। মহিলা নাকি সিক্সটি নাইনে এসএসসি পাস করেছে। ওকে দেখে কী, সেটা মনে হয়?
- আমার সঙ্গে পরিচয় নেই। খলিলের মুখে ওর কথা শুনেছি।
- ওর ফ্লালে যাবেন ওস্তাদ? কলাবাগানের লেক সার্কাসে থাকে। এই তো পরশু ইস্টার্ন প্লাজার সামনে হঠাৎ করে ওর দেখা পেলাম। আমাকে মোবাইল ফোনের নাম্বার দিয়েছে। ওর ওখানে গেলে ওকে কল করে যেতে হবে। তবে আপনার বন্ধুর ওপর মহিলা হেভি ক্ষ্যাপা।
বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞেস করলাম- ক্ষ্যাপা কেন?
- অতকিছু জানি না। তবে মনে হয় কোহিনুর বেগমের সাথে যে কমিটমেন্ট ছিল সেটা রাখা হয়নি। আপনার বন্ধুর তো আবার তালের ঠিক নাই। নিশ্চয় ওদের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে। জিজ্ঞেস করলাম- খলিল আপনার ওপর মাইন্ড করেছে কেন?
- ওই যে তালুকদারের অফিসে গিয়েছি দেখে। ওস্তাদ, আমি তো কারো বাড়া ভাতে ছাই দেই না। কার সাথে দেখা করবো কী করবো না সে ব্যাপারে আমার তো একটা স্বাধীনতা আছে, তাই না?
আমি ভালোমন্দ কিছু না বলে, হাত ঘড়িটা দেখে গেটের দিকে পা বাড়াবার সময় বললাম- চলি, পরে দেখা হবে।
তখনই বেজে ওঠে রহমানের মোবাইল ফোন। প্যান্টের পকেট থেকে সেট বের করে নম্বরটা দেখে সেও কিছুটা সরে দাঁড়ায়। নিশ্চয়, কনফেনডেনশিয়াল কিছু!
খলিলদের অ্যাপার্টমেন্ট হাউজ বেশি দূরে নয়, শান্তিনগর মোড়ের ডানদিকে কিছুটা এগিয়ে। রাস্তাটা পর হয়ে রিকশায় চড়ি। বিএমএ ভবনের সামনে থেকে রিকশা তোপখানা রোড ধরে না গিয়ে রং সাইড দিয়ে কিছুটা এগিয়ে ডানপাশের রাস্তায় ঢুকে শিল্পকলা একাডেমির দিকে এগোয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আকাশটা পরিষ্কার- গাঢ় নীলের ভেতর দুই এক খণ্ড হাল্কা সাদা মেঘ ভাসছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। খলিল এখন ঘরে আছে? থাকলে ভালো। যদিও, বেশিক্ষণ ওখানে থাকা যাবে না। অফিসে শিফট ইনচার্জ ছুটিতে গেছে। দুদিন ধরে পোহাতে হচ্ছে বাড়তি ধকল। প্রথম মেইল ছাড়তে হবে ঠিক ছয়টায়।
অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে ঢুকেই প্রথমে নিজের পরিচয় দিতে হলো। সিকিউরিটি গার্ডটা নতুন। আগের জন আমাকে চিনতো এবং সাংবাদিক জেনে খাতিরও করতো। ইন্টারকমে খলিলের ফ্লাটে যোগাযোগ করে সিকিউরিটি গার্ড বলে- সাহেবে নাই বেগম সাহেবে আপনারে যাবার কইছেন। লিফটের পাঁচে নাইমা ডানপাশে ফাইভ-সি নম্বর ফ্লাট।
ফ্লাটের নম্বর না বললেও চলতো। ফ্লাট যে আমার চেনা সেটা লোকটা জানে না। প্রথমবার খলিলের সাথে এসে বিশ্বাসই হতে চায়- এই ফ্লাট সে কিনেছে। আফশোস হচ্ছিল নিজের কথা ভেবে। অনেক সাংবাদিক মিরপুরে প্লট পেয়ে বাড়ি করেছে। কারো কারো প্লট রয়েছে উত্তরা-পূর্বাচলে। কেউ কেউ ফ্লাট কিনেছে। আমারও দোষ আছে, কখনও রাজউকে প্লটের মধ্যে আবেদন করিনি। অনেক টাকার ফ্যাকড়া। তবে শুনেছি, কোন কোন সাংবাদিক নিজের নামে প্লট নিয়ে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। বিরাট লাভ। কেউ কেউ তো একাধিকবার প্লট নিয়ে বিক্রি করেছে। কিন্তু দুই নম্বরী পথে আমার মন টানেনা। আসলে সাহস পাইনা। সাহস থাকলে কী সাব এডিটরের খাতায় নাম লেখাতাম। তাহলে তো রিপোর্টারই হতাম। ডাকসাইটের রিপোর্টারদের টাকা কামানোর অনেক উপায় আছে। শুধুমাত্র তদবির করেই লাল হয়ে গেছে অনেকেই। এসব ভাবতে গেলে খারাপ লাগে। কখনও কখনও ব্যর্থতার গ্লানি পেয়ে বসে। লাভলির কড়া কথাতো মাঝে-মধ্যেই হজম করতে হয়। খলিলও কম যায় না, সে তো বরাবরই বলে আমাকে- দোস্তা, নিজের দোষেই পেছনে পড়ে আছিস!
লিফটের পাঁচ মানে ছয়তলার মেঝেতে পা রাখলাম। করিডোর একেবারে নির্জন। ডানদিকে ফাইভ সি দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেলের সুইচ টিপতেই দরজাটি খুলে যায়। চৌদ্দ-পনের বছরের এক কিশোরী, খলিলের মেয়ে সুমি। আমাকে দেখে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করে- কেমন আছেন আঙ্কেল?
- ভালোই আছি, তোমরা ভালো তো?
প্রশ্নটা করেই লক্ষ করলাম, সুমির ফর্সা মুখে মুহূর্তের জন্য কেমন একটা ছায়া নেমে এলো। যদিও হাসি মুখে সে বললো- আপনার দোয়ায় ভালোই আছি। দরজা থেকে সুমি সরে দাঁড়াতেই পা রাখলাম ভেতরে। দামি কার্পেট- সোফাসেট-শোকেসে ফিটফাট ড্রইং রুম। সিলিং ফ্যানের পাশাপাশি একটা ঝাড়বাতিও ঝুলছে। খলিলের সত্যিই রুচি আছে। পোশাক-আশাকে বরাবরই স্মার্ট। ওকে কিংবা ওর বাসা দেখে কিছুতেই বুঝা যায় না, খলিলের কোনো স্বীকৃত বা নির্দিষ্ট পেশা নেই। ওর ভাষায়- ফ্লাইং বিজনেস আর আমার দৃষ্টিতে হলো স্রেফ ধান্ধাবাজি। তবে কীভাবে কাকে দিয়ে কাজ বাগানো যায়- সেটা আমার বন্ধু ভালো করেই জানে। নইলে মিনা হোসেনের মতো মেয়ে ওর পক্ষে বাগানো সম্ভব!
ফ্যানের সুইচ অন করে দিয়ে সুমি ভেতরে চলে যায়। পর্দা সরানো জানালা দিয়ে চোখে পড়ে, নীল আকাশে পলকা মেঘ ভাসছে। একটু পর নীলুফার, মানে খলিলের স্ত্রী রুমে পা রাখে। বয়স চল্লিশের কম হবে না, এখনও সালোয়ারকামিজ পরে যুবতী সেজে থাকে। চেহারায় একটু মলিন ভাব। সেটাই স্বাভাবিক। আমি বললাম- কেমন আছে ভাবী?
- আ-রে ভাই, ভালো থাকতে চাইলেই কী ভালো থাকা যায়!
যেন কিছুই জানি না এমন ভান কলাম- কেন, কিছু হয়েছে?
প্রশ্নের জবাবনা দিয়েই নীলুফার বলে- আপনি এসেছেন ভাই ভালোই হয়েছে। কয়েকদিন ধরে ভাবছি আপনার সঙ্গে দেখা করবো। আজ না হলেও কাল প্রেসক্লাবে গিয়ে আপনার অফিসের ঠিকানাটা আর ফোন নাম্বারটা যোগাড় করতাম।
- কেন খলিলের কাছেই তো আমার ফোন নাম্বার রয়েছে।
- তাকে পাব কোথায়?
- কোনো বিশেষ দরকার আছে আমার কাছে?
নিলুফার বললো- দরকার আর কী! সবাই আমার কপাল। আপনার বন্ধুকে তো ভালো করেই চিনেন। এ বয়সেও কী কাণ্ডটাই ঘটালো! মেয়ে বড় হয়ে উঠছে সেটাও একবারও ভাবলো না।
আমি বুঝতে পারছি, নীলুফার কী বলতে চাইছে। তবু কিছুই জানিনা ভাবটা বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলাম- কিছু হয়েছে না কি ভাবী?
- মিনা হোসেনকে আপনি চেনেন না? বেশ কড়া গলায় আচমকা এ প্রশ্নে আমার তো প্রায় ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার দশা। মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম বলেই স্বাভাবিক থাকলাম। অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়াতে কখনও কখনও লাভলিকে যে ধরনের মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত, এক্ষেত্রেও তাই করলাম- না, আমার সাথে পরিচয় নেই। মহিলা কিছু করেছে?
আমার কথায় নীলুফারের মুখটা কেমন চুপসে গেল। মনে হলো, জবাবশুনে হতাশ হয়েছে। তার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলাম- ভাবী কিছু বলবেন কী?
বুঝতে পারলাম, নীলুফার দ্বিধাগ্রস্থ। মিনা হোসেন কিংবা খলিলের কাণ্ডকীর্তি আমার কাছে ব্যক্ত করা নিয়ে দোটানায় পড়ে গেছে। নীলুফারের মুখে বয়সের একটা ছাপ স্পষ্টই ধরা পড়ে আমার নজরে। মনে পড়ে গেল, শান্তিবাগের সেই সরু গলির ভেতরে টিনশেড বাসাটার কথা। ওদের সঙ্গে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ছিলাম। বলতে গেলে পরিবারেরই একজন। তখন কী একটা অবস্থায় ছিল আমার! চাকরি করেও ঠিক মতন বেতন পেতাম না। খলিলই সেটা টের পেয়ে দশ-বিশ টাকা পকেটে গুঁজে দিতো।
নীলুফার বলে ওঠে- ভাই, ভাত-টাত খেয়েছেন?
প্রশ্নটা আমার কাছে দারুণ স্বস্তি বয়ে আনে। সাথে সাথেই জবাব দেই- এই মাত্র প্রেসক্লাব থেকে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছি। এদিক দিয়ে অফিসে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম অনেকদিন আসা হয় না একবার আপনাদের খোঁজ নিয়ে যাই। খলিলকে বলবেন আমার কথা। ওকে তো আজকাল ফোনেও পাওয়া যায় না।
কথা বলেই খেয়াল করি, নীলুফার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। চোখজোড়া কেমন ছলছল। অনেকটা স্বার্থপরের মতোই ভাবলাম, যত দ্রুত কেটে পড়া যায় ততই মঙ্গল। একটা থমথমে ভাব- যে কোনো মুহূর্তেই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। খলিলকে ছাড়া আসা উচিত হয়নি।
তবে যা আশংকা করেছিলাম, তার কিছুই ঘটলো না। বরাবরের মতোই নীলুফার আমাকে খালিমুখে ছাড়ালো না। আমাকে চা-বিস্কুট দেওয়ার সময় সতর্ক ছিলাম, ঘুণাক্ষরেও যেন জানতে না পারে- আমি মিনা হোসেনকে চিনি বা তাদের ব্যাপারটা জানি।

সাতাশ

সকাল থেকেই শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। বাজার সেরে বাসায় ফেরার পর দেখলাম, আকাশে মেঘ দেখে লাভলি ছাতা হাতে মেয়েকে আনতে কিন্ডারগার্টেনের দিকে পা বাড়ালো। মিনিট পনের যেতে না যেতেই শুরু হলো বৃষ্টি।
বেলা একটা পর্যন্ত নামে, একনাগাড়ে মুষলধারায়। মেয়েকে নিয়ে লাভলি প্রায় কাকা ভেজা হয়ে বাসায় ফিরে। এমন বৃষ্টিতে ছাতা কী মানে! মালিবাগ রেলগেটের ওপাশে মৌচাক মোড় অবধি রাস্তা যে এক হাঁটু পানির নিচে তলিয়ে গেছে- সেটা নিশ্চিত করেই বলতে পারি। একবার ভাবলাম অফিসে যাবনা আজ, ফোন করে জানিয়ে দেব। কিন্তু দুপুরের পর বৃষ্টি ধোয়া নীল আকাশ আর উজ্জ্বল রোদ এবং সিনিয়র কলিগ আশরাফের ডে অফ দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলি। বিকেলে রিকশায় চড়ে অফিসে যাওয়ার পথে দেখি, রেললাইনের পর রাস্তা ঠিকই সয়লাব- পানি সরার জন্য সুয়ারেজ লাইনের ঢাকনা খুলে রাখা হয়েছে। অফিসে পৌঁছে দেখলাম, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি এক এক্সক্লুসিভ নিউজ পাঠিয়েছে। আশরাফ নেই, আমি না এলে এটা অনুবাদ করতো কে! স্ল্যাগ টেনে নিয়ে কাজে যখন ডুবেআছি, তখন বেজে ওঠে মোবাইল ফোন।
নাম্বারটা অচেনা। কাজের ভেতরে বেহুদা হুজ্জতের কথা - ভেবে ফোন রিসিভ করলাম না। ফের কল আসতেই ভাবলাম হয়তো কারো জরুরি ফোন। রিসিভ করতেই খলিলের গলা কি- রে দোস্ত, তালুকদারের চামচামি তো ভালোই করছো!
- মানে?
- মানে আর কী, দোস্ত রে ভুইল্যা গিয়া এখন তালুকদারের অফিসে রেগুলার যাইতাছো।

- তোকে তো আমি খুঁজছিলাম। ফোনে পাচ্ছিলাম না, তোর বাসাতেও গেছি।
- সেটা আমি শুনেছি।
মিনা হোসেনের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও লাগাম টানলাম।
অদৃশ্য থেকেও খলিল যেন আমার মনোভাব ঠিক যেন আঁচ করতে পারে- কি রে দোস্ত, কিছু জিজ্ঞেস করবি?
- জিজ্ঞেস আর কী করবো? তোর আগের নাম্বারটার কী হয়েছে?
- বুঝলি তো নানা ঝামেলায় আছি। পাবলিক ঝামেলা করে। তাই নতুন সিম নিয়েছি। আগের নাম্বার আপাতত বন্ধ।
ওর কথা শেষ হতেই বললাম- ভালোই আছিস মনে হচ্ছে।
- তুই কী আমার খারাপ চাস?
- তোর কী মনে হয়?
আমার পাল্টা প্রশ্নে ক্ষণেক চুপ থেকে খলিল বললো- তুই নিশ্চয় খবর পেয়েছিস?
- কোন খবর?
- মিনা হোসেনকে চিনতি না! তাকে আমি বিয়ে করিছি।
বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত ঘটেছে, এমন ভান করে বললাম- কী বলছিস রে দোস্ত! ভাবী আর তোর মেয়ে আছে, তাঁদের কথা ভাবলিনা একবারও?
- দ্যাখ দোস্ত, তোকে তো কখনও প্রেমে পড়তে দেখিনাই। কাজেই প্রেমের মর্ম তুই বুঝবিনা। প্রেম কোনো বয়স আর বাঁধা মানে না এটা জেনে রাখ। তবে দোস্ত অবাক হচ্ছি তোর কথা শুনে। তালুকদার কিংবা আমার ওয়াইফ তোকে বিয়ের খবরটা জানায়নি, একথা কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।
- দোস্ত তুই ভাবীকে জিজ্ঞেস করে দেখিস আমাকে তোর বিয়ের কথা বলেছে কিনা। তোকে মোবাইলে পাচ্ছি না, দেখে সাক্ষাৎ নেই, তাই তোর বাসায় গেছি খোঁজ নিতে।
- আমি তো ভাবছি অন্যরকম! তালুকদারের হয়ে তুই নীলুফারের কান ভারী করতে গেছিলি।
- খলিল, তুই তো আমাকে চিনিস। আমার পক্ষে সেটা কখনও সম্ভব বলে তোর মনে হয়?
জবাব পাওয়ার আগেই ফোনের লাইন কেটে যায়। ভেবেছিলাম খলিল আবার কল করবে। সেটা হলো না দেখে আমিই ওর নতুন নম্বরে কলব্যাক করলাম। এনগেজ। আরও কয়েকবার চেষ্টা করেও লাইন পেলাম না। ফোনটা টেবিলের ওপর রেখেই অফিসের কাজ হাত লাগাই। কিছুক্ষনের মধ্যে রিং ফোন বাজতে থাকে। আমার ধারণা ছিল, খলিলই ফোন করেছে। কিন্তু রিসিভ করতেই তালুকদারের ভরাট কণ্ঠ- সাংবাদিক সাহেব, আছেন কেমন? আপনার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে নিশ্চয়!
কথাটা শুনে অবাক হলাম। তাহলে টেলিপ্যাথি বলে কিছু আছে! পরক্ষণেই ব্যাপারটা কাকতালীয় ভেবে উড়িয়ে দিয়ে তালুকদারকে বললাম-আমি ভালোই আছি, আপনার খবর কী?
- আল্লাহর মেহেরবানী, বলতে পারেন খুব ভালো আছি। আপনার বন্ধু তো আমার ওপর নাকি খুব ক্ষেপেছে। ক্ষেপে আর কী করবে? ওর মতো পাবলিক আমার একটা লোমও ছিড়তে পারবে না।
- ক্ষেপেছে কেন?
- আ-রে সাংবাদিক সাহেব, আপনি কী কোনো খবরই রাখেন না?
তালুকদারের প্রশ্নে থ মেরে গেলাম।
- না তাকালুকদার বলতে থাকে তার অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করার জন্যে খলিলের ওয়াইফ মামলা ঠুকছে স্বামীর বিরুদ্ধে। বুঝলেন ভাই, আপনার বন্ধুর স্ত্রীর মনে অনেক জ্বালা ছিল দীর্ঘদিন ধরে, এবার মহিলা সব জ্বালা মেটাবেন।
- বলছেন কী আপনি?
- যা বলছি, সব সত্যি, বলছি। আরও শুনে রাখুন, ওই মামলার খবর মিনা হোসেনের কানে গেছে। খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে। আমার কাছে মাফ চাইতেও রাজি। কথা বলে ঠেলার নাম বাবাজী! এবার আসল কথা বলি, কাল দুপুরে মতিঝিলে চলে আসাবেন, এক সঙ্গে লাঞ্চ করবো। শুক্রবার ডে অফ না থাকলে অফিস থেকে ছুটি নেবেন। আমরা গাজীপুর যাব। তালুকদার ফোনের লাইন কেটে দেওয়ার পর বিস্ময়ের একটা ঘোর যেন আমাকে পেয়ে বসে। এত কিছু ঘটে যাচ্ছে। আমি কিছুই জানিনা। নীলুফার-আমার ভুজন ফ্রেন্ড বলে জানি থাকে সেই খলিলও কিছু বলেনি। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, ওরা আর আমাকে আগের মতো আপন ভাবে না।
ঠিক করলাম, অফিসের কাজটাজ সেরে রাতে বাসায় ফেরার পথে খলিলকে ফোন করবো। ওর সঙ্গে খোলামেলা আলাপ করার ইচ্ছে আমার। প্রয়োজন হলে ওকে জানিয়ে দেব, মিনা হোসেনের ব্যাপারটা নিয়ে তার ওপর তালুকদার মহা চটে আছে। ক্রাইম রিপোর্টার রহমানের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথাও বলবো। কোহিনূর বেগম প্রসঙ্গে জানতে চাইবো। সাধারণত রাত এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা দিকে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ি। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে বলে সময় মতো বেরোতে পারলাম না। মাঝে-মধ্যে বিদ্যুৎ চমকানির সাথে মেঘের হুংকার। বৃষ্টি না থামলে অফিস থেকে বের হওয়াটা ঠিক হবে না। বাসায় সিঁড়িঘরের মুখে কোলাপসিবল গেটের তালার চাবি আমার কাছে আছে। আমি না ফেরা পর্যন্ত লাভলি ঘুমাবে না। মেয়েকে ঘুম পারিয়ে টিভি দেখবো। খলিলকে ফোন করার কথা মনে হতেই ভাবলাম কাল তালুকদারের অফিস থেকে ঘুরে আসার পরে ওকে কল দিলে বোধহয় ভালো হবে। তালুকদার নিশ্চয়ই নতুন কিছু জানাবে। এদিকে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে শরীফউদ্দীন তালুকদারের সংবাদ সম্মেলন নিয়ে। যেভাবে অহেতুক ঝুলিয়ে রেখেছেন- শেষমেষ হয় কি-না কে জানে। কী দরকার ছিল এত ডিটেল্‌সে যাওয়ার। শর্টকাটে বললেই পারতেন।
বৃষ্টি থামতে থামতে রাত বারোটা গড়িয়ে যায়। রাত গভীর হলে অফিস থেকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার মত গাড়ি আছে। গাড়ি মানে তিন চাকার প্রাইভেট স্কুটার। ভারী বর্ষণে অফিসের সামনের রাস্তায় হাঁটু পানি জমায় স্কুটার চলবেনা। বাস ধরতে হলে প্যান্ট গুটিয়ে পানি মাড়তে হবে। এত রাতে বাস আছে কি-না সন্দেহ। একমাত্র ভরসা দ্বিগুন ভাড়ায় রিকশা। সেটা বুঝেই অফিসের পিওনকে পাঠালাম। মিনিট পাঁচেক পর খবর দেয়- রিকসা হাজির।
আমার এক জুনিয়র কলিগ মালিবাগ লেবেল ক্রসিং পর্যন্ত এলো। রেললাইনের পর রাস্তায় ততটা পানি নেই, প্যান্ট গুটিয়ে নিলেই যথেষ্ট। রিকসা চলছে। তবে কিছুদূর এগুতেই জ্যাম। রাত দুপুরেও ডিআইটি রোডে রাজ্যের ট্রাক-লরি-কভার্ড ভ্যানের চলাচল। একশলা সিগারেট ধরালাম। শরীফউদ্দীন তালুকদার আমাকে শুক্রবার ফ্রি থাকতে বলেছেন। আবার গাজীপুর ওর রেস্ট হাউজে নিয়ে যাবেন। সেদিন যতই সময় লাগুক তালুকদারের স্টেটমেন্ট নেওয়া শেষ করবো। তারপর নোট দেখে গুছিয়ে লিখে কম্পিউটারে কম্পোজ। প্রিন্ট কপি তালুকদারকে ধরিয়ে দিয়েই আমি ফ্রি। সংবাদ সম্মেলন করুক নাই বা করুক, সেটা ওর ইচ্ছে। আমার মতে ব্যাপারটা আর ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়। এ কাজটা না নিলে খলিলের পক্ষে আমাকে সন্দেহ করার প্রশ্ন উঠতো না। বরং আমি ওর কোনো না কোনোভাবে উপকার লাগতাম। শত হলে দীর্ঘদিনের বন্ধু। ব্যক্তি হিসেবে খলিল যাই হোক না কেন, আমার কাছে কখনও মন্দ ছিল না। আমার ওয়েল উইশার। নানাভাবে সাহায্য করেছে।
চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেল মোড়ে জ্যাম যেন সিমেন্টের আস্তরের মতো জমাট বেঁধে গেছে। কোনো নড়চড় নেই। আবার বৃষ্টির কবলে পড়তেও পারি! রাস্তার হলদেটে সোডিয়াম লাইট আর আশপাশের আলোর দরুন আকাশটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আঁচ করলাম, মেঘে ভার হয়ে আছে। এতক্ষণে লাভলি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ বাসায় ফিরে একচোট কথা শোনার আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রিকশা ছেড়ে কী হেঁটে যাব? প্রশ্নটা মাথায় এলেও পাত্তা দিলাম না। ডবল - ভাড়া গুনতে হবে। ছাড় দেওয়া যায় না। সিগারেটে শেষ টান দিতেই তালুকদারের টাকমাথা মনের ভেতরে উঁকি দেয়। টাক হলে কী হবে, মাথাটা ঘিলুতে ভরা। ঘিলু ছাড়া ধুরন্ধর হওয়া যায় না। চারপাশটা ম্যানেজ করে কীভাবে এ তরতর করে উপরে উঠে গেছেন। এখনও উঠছেন। ওর অফিসে এক কর্মচারীর মুখে বছর খানেক আগে শুনেছিলাম তালুকদার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের বার্ষিক টার্ন ওভার তিনশো কোটি টাকার উপরে। আর এত বয়স হলো আমার, এখনও সব মিলিয়ে এক কোটি টাকা আয় করা তো দূরের কথা, সারা জিন্দেগিতে পারবো কিনা সন্দেহ। টাকা থাকলে এই সমাজে ধরাকে সরা জ্ঞান করা যায়। এই যেমন শরীফউদ্দীন তালুকদার রাতকে দিন আর দিনকে রাত বানাতে পারেন সহজে। খলিলের জন্য সত্যিই আফশোস হচ্ছে, তালুকদারের বাড়া ভাতে ছাই না দিলেই পারতো। তালুকদার সহজে ছাড়বেনা। ওর হাবভাবে মনে হচ্ছে, খলিলকে বিপদে ফেলতে পারে।
রিকশা চলতে শুরু করেছে। হঠাৎ উত্তর আকাশে বিদ্যুৎ চমকানি। মেঘের ডাক ভেসে আসে।

আটাশ

দুপুরে মতিঝিলের কর্পোরেট অফিসে গিয়ে এক সঙ্গে লাঞ্চ করার জন্য বলেছেন শরীফউদ্দীন তালুকদার। সকালে বাজার করলেও লাভলিকে জানিয়েছি- দুপুরে বাসায় খাবো না, দাওয়াত আছে।
লাভলি অবশ্য জানতে চায়নি কোথায় দাওয়াত। আসলে ছুটির দিন ছাড়া আমার পক্ষে বাসায় খাওয়ার সুযোগ কম। দাওয়াত ছাড়াও দুপুরে বাইরে কাজ থাকে, তারপর প্রেসক্লাব আছে। ব্যাপারটা লাভলির গা সওয়া। তাই কিছু জিজ্ঞেস করেনি। গোসল-টোসল সেরে বেরিয়ে পড়লাম বেলা বারোটার আগেই। ভোরের দিকে এক পশলা বৃষ্টি নামলেও এখন চারপাশে উজ্জ্বল রোদ। গতরাতে বাসায় ফেরার পর খলিলকে কল করি। কিন্তু ওর মোবাইল ফোনের সুইচ অফ। সকালে করবো বলে ঠিক করেছিলাম, নানা ঝামেলায় মনে ছিল না। বাসা থেকে বেরিয়ে গলির মুখ থেকে রিকশায় চড়ার পর পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে খলিলের নাম্বারে কল করলাম। বারবার রেকর্ড করা একই জবাব- এই মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কে জানে কোন হুজ্জতে জড়িয়েছে! আবার সিম পাল্টে ফেলা ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। বেগতিক অবস্থা যাচ্ছে। হয়তো কৌশলগত কারণে এটা করতে পারে। তালুকদার আমাকে লাঞ্চের দাওয়াত দিলেও কাগজ কলম নিতে ভুললাম না। ডিটেক্‌শনের কাজটা এক জায়গায় আটকে আছে। আজ একটু সচল করতে পারলে ফিনিশিং টাচটা সহজ হয়ে যাবে। চলন্ত রিকশায় রোদে ঝাঁজটা কড়া ঠেকতেই হুড টেনে দেই। রাস্তার মাঝ বরাবর আইল্যান্ডের ওপাশে যানজট চোখে পড়লেও এপাশ ফাঁকা। আবুল হোটেল মোড়ে এসে রিকশা বাঁ-দিকে চৌধুরী পাড়ার রাস্তায় ঢুকে পড়তেই জিজ্ঞেস করি- এদিক দিয়ে কেন?
-স্যার মালিবাগ-মৌচাকে জ্যাম, কাগো মিটিং অইতাছে। তাই খিলগাঁও রেলগেট পারাইয়া রেল কলোনির ভেতর দিয়া যামু।
অসুবিধা নেই। বরং খিলগাঁও রেলগেটে জ্যাম না থাকলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। মতিঝিল ব্যাংক মোড় মানে শাপলা চত্বরের কাছেই তালুকদার গ্রুপ ইন্ডাষ্ট্রিজের কর্পোরেট অফিস।
হঠাৎ আমার মনে কৌতুহল উঁকি দেয়, তালুকদার

তো মিসেস চৌধুরী থেকে তার নাতনি রানী পর্যন্ত এসে ঠেকেছেন। এরপর কার সঙ্গে? নিশ্চয় অ্যানি কিংবা রানীর মেয়ে। আমার হিসাবমতে অ্যানির মেয়ে হাওয়ার চান্সটাই বেশি। তবে এক পরিবারের কিংবা মায়ের তরফের বংশ লতিকায় চার প্রজন্মের শয্যাসঙ্গী হওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়, তা যতই বৈধ-অবৈধ কিংবা সংস্কারের প্রশ্ন আসুক না কেন? আবার সন্দেহ জাগে, তালুকদার গালগল্প ঝাড়ছে না তো? সন্দেহটা আমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলাম। তালুকদারের বয়ান শুনে নিশ্চিত যে অবশ্বিাস্য মনে হলেও ঘটনা সত্যিই ঘটেছে। তালুকদারকে আমি ভালো করেই চিনি। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার লোক নন তিনি। আমাকে পয়সা দিয়ে মূল্যবান সময় খরচ করে এভাবে ডিটেকশন দিতেন না।

যথাসময়ে তালুকদারের অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম। তালুকদারের রুমে কয়েকজন বিদেশি বায়ার। রিসেপশন থেকে তাকে আমার কথা জানানোর পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। রিসেপশন রুমের পাশেই থাই গেলাসে ঘেরা আলাদা একটা রুম। শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত। নরম সোফায় গা এলিয়ে পকেট থেকে সেলফোন বের করে দেখলাম- একটা বাজতে পনের মিনিট বাকি। লাঞ্চ আওয়ার শুরু হওয়ার পথে। কখন তালুকদার বায়ারমুক্ত হয়ে আমাকে ডাকবেন কে জানে! এই ফাঁকে ভাবলাম, খলিলকে একটা কল করে দেখি। ওর ফোনটা চালু হয়েছে কিনা। কল করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলি। এখন নয়, তালুকদারের অফিস থেকে বেরিয়ে কল দেব। এই মুহূর্তে ওর ফোন খোলা থাকলেও অহেতুক ঝামেলা দেখা দিতে পারে। আবার তালুকদারের কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়লে উনি আমায় সন্দেহ করবেন। ফোনে খলিল আমার কথা শোনার পর আবার তালুকদারকে আমার রেফারেন্সে ফোন করবেনা সে গ্যারান্টি কোথায়!

তালুকদারের কর্পোরেট অফিসে রিসেপশন কাউন্টারের পাশেই শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত রুমে নরম সোফায় গা এলিয়ে বসে থাকার সময় আমার জন্য চা-বিস্কুট এলো। দুপুরের খাবারের সময় ঘনিয়ে আসায় বিস্কুট নয় শুধু চায়ের কাপ হাতে তুলে নেই। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবেবরণ করার পর রং চা কিংবা দুধ চাপ যে পরিমাণে গিলেছি তাতে এই পানীয় আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। যখন তখন খেতে পারি। এমনকি রাতে চা পানের পর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার নজিরও আমার আছে। চা কাপে চুমুক দিয়ে ভাবতে থাকি, তালুকদারের এই কাজের বোঝা কবে নাগাদ ঘাড় থেকে নামবে। অথচ শুরুর সময় এমনটা হাওয়ার কথা ছিল না। তালুকদার প্রেস কনফারেন্সের প্রতি সত্যিকার অর্থে আন্তরিক থাকলে অনেক আগেই ব্যাপারটা চুকেবুকে যেত। কেন যে ঝুলিয়ে রাখছেন! এমন সময় শার্ট ইন করে পরা দারুণ স্মার্ট তালুকদার গ্রুপ অ্যান্ড কোম্পানির পিয়ন বা অফিস সহকারী এসে সালাম দিয়ে বলে- স্যার, খেতে চলেন।

- মানে!

- চেয়ারম্যান স্যারের দেরি হবে। তাই আপনাকে খেয়ে নিতে বলেছেন।

অবাক হলাম, মতিঝিলের এ অফিসে বরাবর শরীফউদ্দীন তালুকদারের সঙ্গে লাঞ্চ করেছি। আজ কেন এই ব্যতিক্রম। কারণটা বুঝতে পারলাম, বিদেশি বায়াররাই এই গড়মিল ঘটিয়েছে। একবার ইচ্ছে জাগে, ফোনে তালুকদারের কাছে বিদায় নিয়ে প্রেসক্লাবে চলে যাই- ওখানেই খেয়ে নেব। পরক্ষণে মনে হলো কাজটা ঠিক হবে না। তালুকদার নিশ্চয় জরুরি কাজে আটকে গেছেন। নইলে এমনটা হওয়ার কথা নয়। একটু ধৈর্য্য ধরে বাকি কাজটা শেষ করতে পারলেই ছুটি। কিন্তু নানা ঝামেলা যে হারে জড়ো হচ্ছে তাতে কাজের গতি যথেষ্ট ব্যাহতই শুধু হচ্ছে না, শেষতক গিনেস বুকে তালুকদারের নাম লেখাবার শখটা বাস্তবায়িত হবে কিনা তা নিয়ে একটা ইদানিং সংশয় উকি দিচ্ছে।

অফিস সহকারী আমাকে একতলা উপরে নিয়ে এলো। অফিসের ডাইনিং হল। স্টাফদের জন্য দুপুরে খাবারের এমন সুবন্দোবস্ত আছে আগে আমার ধারণা ছিল না। এখানে এসে আগে তালুকদারের সঙ্গে লাঞ্চ করেছি তার অফিস রুমের পাশে আরেকটা ডাইনিং রুমে। চেয়ারম্যানের গেস্ট বলে বেয়ারারা আমাকে বেশ খাতির করে ভাতের সাথে করল্লা ভাজি, বড় আইড় মাছ, গরুর গোশ্ত আর পাতলা ডাল খেতে দেয়। প্রতিটি পদই আমার বেশ পছন্দসই। কেন জানি আজ স্বাদ পাচ্ছিলাম না। কোনরকমে খেয়েদেয়ে উঠলাম। ওয়েটিং রুমে ফিরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তালুকদার সাহেবের তলব। তার রুমে পা দিতেই দেখি একা বসে টুথপিক দিয়ে দাঁত খুঁটছেন। বিদেশি বায়াররা নেই। আমাকে দেখেই বললেন- সরি, সাংবাদিক সাহেব, বায়াররা হুট করে চলে আসবে বুঝতে পারিনি। ব্যবসায় ঝক্কি-ঝামেলা একেই বলে। অর্ডারটা পেলে দারুণ ব্যবসা হবে। তালুকদারের বাণিজ্যিক কথায় আমার আগ্রহ নেই। জিজ্ঞেস করলাম- শুক্রবারের প্রোগ্রাম তো ঠিক থাকবে?

- আ-রে কী বলেন, সেদিন দুনিয়া উল্টে গেলেও আমরা রেস্টহাউজে যাব।

- তাহলে আজ কাজটা শুরু করে দেই। আমাকে অফিসে যাওয়ার আগে প্রেসক্লাবে যেতে হবে। সামনে ক্লাবের ইলেকশন।

- ইলেকশনে ক্যান্ডিডেট হবেন?

- না, না। আমার নেতা টেতা হবার ইচ্ছা নেই। ধান্ধাবাজিতে আমি কখনওই সুবিধা করতে পারবো না।

অমনিই তালুকদার মন্তব্য করেন- সাংবাদিক সাহেব, কথাটা আপনি সত্যি বলেছেন।

কথা বলার ফাঁকে কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি হলাম। বললাম-আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। অল্প জায়গায় আটকে আছি। রানী পর্ব শেষ, এখন পরবর্তী জন সম্পর্কে বলবেন। ওর সঙ্গে আপনার কবে কী করে কোথায় প্রথম দেখা এবং পরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল- এটা বলা শেষ হলেই আমরা খালাস।

- সেটা তো আমিও জানি। জানেন, সেদিন ফেসবুকে ফারাহর সন্ধান পেয়েছি। ও এখন মন্ট্রিলে থাকে। সামনের মাসে কানাডায় একটা বিজনেস ফেয়ার আছে, ভাবছি, ওখান থেকে একবার ঘুরে আসবো। রূপের দিক থেকে ফারাহ কিন্তু মা-নানীকেও ছাড়িয়ে গেছে। বড় কথা হলো, ওর মাঝেও মিসেস চৌধুরীর একটা ছায়া আছে। আর সেটা দেখেই বৈরুত এয়ারপোর্টে চমকে ওঠেছিলাম। আলাপ করে নিশ্চিত হই ফারাহ হলো অ্যানির মেয়ে।

-দারুণ ব্যাপার তো! আপনি বলে যান, আপনি নোট করছি।

- আজকের জন্য মাফ করলে হয়না সাংবাদিক সাহেব?

ওর কথায় কোনো মন্তব্য না করে অবাক হয়ে তাকালাম।

তালুকদার বললেন- আসলে কী সাংবাদিক সাহেব, এই মুহূর্তে আমার মাথা জুড়ে অন্য চিন্তা। যে কারণে মুড পাচ্ছি না। দুদিন পরেই তো নেক্সট ফ্রাইডে। আমরা তো গাজীপুরে যাচ্ছি। ভাবছি সেদিনই গিয়ে ল্যাটা চুকিয়ে দেব। আপনি প্লিজ, অ্যাকউন্ট সেকশনে দেখা করে যাবেন। আমি আবার বেরুবো। শেরাটনে এক সচিবআমার সঙ্গে দেখা করবেন।

কিছুই বলার নেই আমার। বাধ্য হয়েই কাগজ-কলম গুটিয়ে ফেলি। অ্যাকাউন্ট সেকশনে গিয়ে দেখা করার মানে হলুদ খাম হাতে পাওয়া। খামের ভেতর কম করে হলেও পাঁচশ টাকার দশটা নোট থাকবে। কিন্তু এভাবে খাম হাতে নিতে অস্বস্তি লাগে। অল্পের জন্য কাজটা ঝুলে আছে। না বলে পারলাম না- আরেকটা সিটিং ঠিকমতো দিতে পারলেই কিন্তু আমাদের কাজ শেষ। তাহলে আমি প্রেস কনফারেন্সর জন্য আপনার স্টেটমেন্টটা তৈরি করতে পারি।

- তাই তো বললাম, সামনের শুক্রবারেই ল্যাটা চুকিয়ে দেব। সেদিন আমি অন্য কোনো কাজই হাতে রাখছি না।

হলুদ খাম পকেটে ভরেই তালুকদারের অপিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম।প্রেস ক্লাবের উদ্দেশে রিকশায় চড়লাম। খলিলের সঙ্গে দেখা হওয়াটা দরকার। ও ব্যাটা আমাকে ভুল বুঝেছে। মিনা হোসেনকে একবার ফোন করলে তো পারি। মোবাইল ফোনের জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টালাম। দরকার নেই। ওই মহিলাকে ফোন করলে আবার উটকো ঝামেলা জুটতে পারে। তালুকদারের কানে গেলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারে। দৈনিক বাংলা মোড়ের আগে ট্রাফিক সিগনালে আটকে যাই। মোড়ের ওপাশে রাস্তাতেও জ্যাম। যা অবস্থা, হেঁটে গেলে প্রেসক্লাবে আগে যাওয়া যাবে। কিন্তু হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। আকাশটা মেঘে ভার। ঠান্ডা বাতাস বইছে। বৃষ্টি নামলেও নামতে পারে।

তাড়া নেই বলে রিকশাতেই বসে থাকি। তবে জ্যাম ঠেলে পল্টন মোড় পার হতেই রাস্তাটা ফাঁকা। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে প্রেস ক্লাবের গেটে পা রাখতেই দেখি ক্রাইম রিপোর্টার রহমান দুজন লোকের সঙ্গে ডানে টেনিস কোর্টের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। আমি সামনের আইল্যান্ডের বাঁ- পাশের রাস্তা ধরে প্রেসক্লাব ভবনের দিকে এগোই। এই মুহূর্তে রহমানের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। দেখতে পেলে নিশ্চয় কাছে এসে খলিল কিংবা কোহিনুর বেগমের প্রসঙ্গ তুলবে। তালুকদারকে নিয়েও প্যাচাল পারতে পারে। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। খলিল আমার বন্ধু ভালো কথা- তবে সে কোনো ভুল করলে তার খেসারত তো আমি নই, তাকেই দিতে হবে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। তবে হ্যাঁ, বন্ধু হিসেবে. .....

- আপনি কী শাহাদাত হোসেন?

- জ্বি।

মুখে চাপদাড়ি, মাথায় টুপি। জিনসের প্যান্টের ওপর ফতুয়া গায়ে। আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লোকটা সালাম দিয়ে জানায়, এতক্ষণ ক্লাবের রিসেপশন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। ওখানকার একজন স্টাফ আমাকে দেখিয়ে দেয় বলে এগিয়ে এসেছে। বসে বলে- স্যার, কাইলকাও আপনারে খুইজা গেছি। হ্যারা কইলো, এ সময় আইলে পাওন যাইত- তাই আসলাম। খলিল স্যার আমারে পাঠাইছে।

- খলিল! বিস্মিত হলাম কিছুটা। খলিল কেন লোক পাঠাবে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম

-ও এখন কোথায়?

- হেইডা স্যার কইবার পারতাম না। ফোন লাগাইয়া দেই, আপনে কতা কন।

লোকটা প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ডিজিট টিপে কল দেয়। ওপাশে রিসিভ করতেই বলে ওঠে- হ্যালো, আমি মকবুল। খলিল সাহেবকে ফোনটা দ্যান, সাংবাদিক স্যারে কতা কইত। সম্ভবত খলিল ধরতেই মকবুল ফোনটা আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়- ন্যান স্যার, কতা কন।

খলিলের গলা চিনতে অসুবিধা হলো না- দোস্ত কেমন আছো, আমি তো শালার মহা বিপদে আছি।

তালুকদার ব্যাটা নট অনলি লুচ্চা, শালা ভদ্রবেশি অস্ত্র এক ক্রিমিনাল আমাকে সাফার করাচ্ছে। দোস্ত, বিপদে আছি। তুমি আমারে কিছু টাকা দিয়া হেলপ করো। বাসা থেকে চেক বইটা এনে ব্যাংক থেকে টাকা তুলবো সেই পরিস্থিতিতে এখন নেই।

কথাটা শেষ হতেই ফোনের সংযোগ আপনা আপনি কেটে গেল না খলিল কেটে দেয়-বোঝা গেল না। উপলব্ধি করলাম, কত ধানে কত চাল সেটা আমার বন্ধু হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। মুহূর্তেই মিনা হোসেনের ফর্সা মুখ- দারুণ দেখতে উজ্জ্বল কালো চোখজোড়া আমার মনে উকি দেয়- এই মেয়েটির

জন্যই খলিলের আজ করুন দশা। আমার প্যান্টের ডান পকেটে হাত গেল। হলুদ খামের ভেতর পাঁচশ টাকার বিশখানা নোট। সংবাদ সম্মেলনের দায়িত্ব নেওয়ার পর তালুকদার কখনও আমাকে দশ হাজার টাকার নিচে দিচ্ছেন না। তবে সেখানে তালুকদারের ব্যবসা-বাণিজ্যে বার্ষিক টার্নওভার তিনশ কোটি টাকার ওপর সেখানে আমাকে দেওয়া এই অর্থ তো নস্যি মাত্র।

মকবুলকে নিয়ে আমি প্রেসক্লাবের বাগানের ভেতর অনেকটা নির্জন জায়গায় গেলাম। পকেট থেকে খাম বের করে তার ভেতর থেকে দশটা নোট গুণে লোকটার হাতে দেই। সেই সঙ্গে বললাম- টাকাটা দিয়ে দোস্তকে বলবেন একটা ফোন করতে।

- ঠিক আছে, স্যার।

- তাহলে আসেন।

লোকটা বিদায় হতেই ক্লাবের ভেতর সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত জায়গার দিকে পা বাড়াতেই আমার মনে হলো, এভাবে লোকটাকে টাকা দেওয়া কী ঠিক হলো! পরক্ষণে ভাবলাম, আমার কাজ আমি করেছি, খলিল টাকাটা পেল কিনা সেটা ওর ব্যাপার। টাকাটা কিন্তু তালুকদারের। খলিল জানতে পারলে নিশ্চয়ই একজোট দাওয়াই বাড়বেআমার ওপর। আবার তালুকদারের কানে গেলে তিনি মাইন্ড করতে পারেন। এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে মনে হাসলাম। আমি মুখ না খুললে ওরা কখনও জানতে পারবে না। আর টাকা তো যখন যার পকেটে থাকে তার কথাই বলে। কোত্থেকে এলো সেটা দেখার বিষয় নয়।

উনত্রিশ

টাকাটা পেয়ে খলিল ফোন করে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। আমি যে তার প্রকৃত বন্ধু সেটা বুঝতে পারছে। অযথা ভুল বুঝার জন্য দুঃখ প্রকাশও করে।

এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি মহাখালী রেলগেটের পাশে নিউ ডিওএইচএসে ঢোকার রাস্তার মুখে। ভাবছি তালুকদার এলেই মোবাইল ফোন অফ করে দিব। বাসা থেকে বেরোবার সময় বলে এসেছি, ফিরতে রাত হবে। খুব জরুরি দরকার না হলে লাভলি ফোন করবে না। আর ফোন করে যদি দেখে আমার মোবাইল বন্ধ, তাহলে বাসায় ফিরলে সন্দেহবশত কিছু বলতে পারে। তখন বলবো চার্জ বা নেটওয়ার্ক ছিল না। মোবাইল বন্ধ রাখতে চাইছি খলিলের কারণে। তালুকদারের সামনে ওর ফোন মোটেই স্বস্তিকর নয়। আর তালুকদার টের পেলে ব্যাপারটা হতে পারে অন্যরকম। আবার ফোন রিসিভ না করলে, খলিলের যা স্বভাব- হয়তো মরিয়া হয়ে বার বার কল করবে। সেটা আরও খারাপ। আরেকটা সমস্যা হলো, সে কোন নম্বর থেকে ফোন করবে সেটা জানা নেই। ট্রাকিংয়ের ভয়ে খলিল এখন নিজের নম্বর থেকে ফোন করে না। অতএব আগে ভাগে সাবধান থাকা ভালো।

হাত ঘড়িটা দেখলাম, নয়টা বাজে। তালুকদারের আসার সময় হয়ে গেছে। মহাখালী রেলগেটে পৌঁছেই ফোন করে ছিলাম তালুকদার তখন ধানমন্ডির বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। ভোর থেকেই আকাশ মেঘলা। অনেক উঁচুতে আকাশ জুড়ে থাকা ধূসর মেঘ দেখে মনে হলো- বৃষ্টির আশংকা নেই আপাতত। রাস্তায় জ্যাম না থাকলে তালুকদার এখনই এসে যাবে। মোবাইল ফোনটা পকেট থেকে বের করে সুইচ অফ করলাম। আজ এমন জরুরি কিছু নিশ্চয় ঘটবে না যে, আমার খোঁজ পড়বে। মঙ্গলবারের ডে অফের বদলে আজ ছুটি নিয়েছি অফিস থেকে। লাভলি জানে, আজ ফিরতে দেরি হবে। আমার ধারণাই ঠিক, তালুকদার পৌঁছে গেছেন। তার গাড়ি আমার সামনেই থামে। পেছনের সিটে তার বাঁ পাশে বসলাম। একে তো শুক্রবার, তারপর সকাল। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। ফ্লাইওভারের পাশ দিয়ে গাজীপুরের দিকে গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। তালুকদার বলে ওঠেন- সাংবাদিক সাহেব, দারুন একটা খবর আছে।

- কী খবর?

- মিনা হোসেনই এবার বাদী হয়ে আপনার বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এটাও নারী-শিশু নির্যাতন আইনে মামলা। ধরা খেলে তিন মাসের আগে বেল নাই। ওদিকে ওয়াইফ, এদিকে লাভার দুজনেই মামলা ঠুকেছে, এবার ব্যাটা ঠেলা সামলাও! তালুকদার কী চিজ, সেটা এবার বুঝবি।

মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। এতটা বাড়াবাড়ি তালুকদারের উচিত হচ্ছে! মিনা হোসেন কী এমন একজন মেয়ে- যার জন্য লড়াই চলবে! তাও একতরফা।

আমার মনের অবস্থা আঁচ করেই তালুকদার বলেন- সাংবাদিক সাহেব, খবরটা শুনে খারাপ লাগছে? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেই- না, না খারাপ লাগবে কেন? ফাউল করলে শাস্তি পেতে হয়, এটাই তো নিয়ম।

- এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছেন। আপনি আসলেই ভদ্রলোক। আর তাই খলিলের বন্ধু জেনেও আপনাকে লাইক করি। এতটাই বিশ্বাস করি যে, আমার জীবনের অতি গোপনীয় বিষয় আমি সরল মনে আপনার কাছে ব্যক্ত করে চলেছি। কথাটা বলেই তালুকদার বুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করেই বললেন- বঙ্গবন্ধু কিলিংয়ের ওপর অ্যান্থনি মাসক্যারেনহাসের বইটা পড়েছেন?

- অংশবিশেষ পড়েছি। পুরোটা পড়িনি। ওটা একপেশে লেখা। মাসক্যারেনহাস বঙ্গবন্ধুর কিলারদের সাফাই গেয়েছেন।

- সেটা সত্যি। তবে ওই বইয়ে একটা ঘটনা আমার খুব মনে ধরেছে। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সফরসঙ্গী হিসেবে বঙ্গবন্ধু আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। সেই দলে ছিলেন সাংবাদিক মাসক্যারেনহাস। এক হোটেলে তাস খেলা হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু দেখলেন মাসক্যারেনহাসের সঙ্গে কেউ তাস খেলায় পারছেন না। বঙ্গবন্ধু কারণটা ধরে ফেললেন, খেলায় চুরি করছিল মাসক্যারেনহাস। বঙ্গবন্ধু খেলতে বসলেন এবং মাসক্যারেনহাসকে হারিয়ে দেন। খেলার পর মাসক্যারেনহাস জানতে চাইলেন, কী করে তাকে হারানো হলো। বঙ্গবন্ধু কারণটা বলেই চুপ থাকলেন না, সেই সঙ্গে একথা শোনালেন, আমি সবসময় একজন ইমানদারের সঙ্গে ইমানদারের মতো আচরণ করি আর বেইমানের সঙ্গে বেইমানের মতোই করে থাকি। বুঝতে পারলেন তো সাংবাদিক সাহেব, আমি ঠিক বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী না হলেও তাঁর ওই নীতিটা অনুসরণ করি। আপনার বন্ধু খলিল আমার সঙ্গে বেইমানের মতো কাজ করেছে, আমিও তার জবাব দিচ্ছি।

তালুকদারের বক্তব্য শোনার পর কোনো মন্তব্য করলাম না। খলিলের জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। কে জানে শেষ পর্যন্ত ওর কপালে কী আছে! সংসারটাও বোধহয় ছারখার হয়ে যাবে।

মানুষের মনের কথাও যেন তালুকদার পড়তে পারে, বলে ওঠেন- বন্ধুর জন্য মন খারাপ করবেন না। কেউ দোজখে যেতে চাইলে তাকে যেতে দিন, আটকানোর দরকার নেই। মন খারাপ করবেন না। আপনার জন্য সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে।

সেটা আবার কী! যদিও মুখে কিছু বললাম না। গাড়ি ছুটছে দ্রুতবেগে। বনানী ছাড়িয়ে স্টাফ রোডের লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে খিলক্ষেতের দিকে। কুড়িল বিশ্বরোডের মাথায় আসার আগেই একটা আন্তঃনগর এক্সপ্রেস ট্রেন গাড়ির সঙ্গে পালা দিয়েই যেন ছুটতে থাকে। লম্বা হুইসেল বাজিয়ে। নিজের মনকে স্বাভাবিক করেই বললাম- আমি কী এখন নোট নিতে পারি?

- এখন থাক। রেস্ট হাউসে পৌঁছে না হয় শুরু করবো। কথাটা শেষ হতেই তালুকদারের মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। ফোন রিসিভ করেই তিনি ব্যবসায়িক আলাপে মেতে ওঠেন।

ওদিকে কান না দিয়ে আমি খলিলের কথা ভাবতে থাকি। আমার মোবাইল ফোন অফ। ফোন করলেও লাইন পাবে না। তালুকদারের সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা থাকুক, শত হলে খলিল আমার বন্ধু। বিপদের সময় ও যে বন্ধুর হেলপ চাইবে এটাই স্বাভাবিক। ভেতরে ভেতরে তালুকদারের ওপর বিরক্তই হলাম, কেন যে বিষয়টা ঝুলিয়ে রাখছেন। এটা তার খামখেয়ালিপনা। সেই যে মিসেস চৌধুরীর নাতনি রানী পর্যন্ত এসে ঠেকেছেন, এরপর এগুচ্ছেন না আর। মাত্র দুই-একটা সিটিং ঠিকমতো হলে ল্যাঠা চুকে যায়। তালুকদারের বয়ান শেষ হওয়ার পর আমি নোটগুলো থেকে এক রাইটআপ দাঁড় করবো, তার কম্পিউটার প্রিন্ট তালুকদারকে দেখাবো। কোনো কারেকশন থাকলে সেটা করবো। তারপর তালুকদার সাংবাদিক সম্মেলন করুক বা না করুক- সেটা ওর ব্যাপার। তাতে কিছু যায় আসে না। আমার মনে হচ্ছে, তালুকদারের কাজ থেকে ছুটি পেলেই বাঁচি। অত অর্থের দরকার নেই আমার। বার্তা সংস্থা থেকে নিয়মিত বেতন পাচ্ছি, তাতেই মোটামুটি সংসার চলে যায়। লাভলির মধ্যেও অত খাই খাই ভাব নেই। ওর একটাই চাওয়া, শুধু নিজস্ব একটা বাসা। যাতে মাসে মাসে ভাড়া টানতে না হয়। খলিলকে সত্যিই মন থেকে ঝাড়তে পারছি না। বন্ধু হিসেবে ওর পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল। একটা অলিখিত শর্তের শিকলে যেন আমার হাত-পা বাঁধা। মনটা বিষিয়ে ওঠে। গলা ছেড়ে বলতে ইচ্ছে করে, আমি কারো ক্রীতদাস নই। কিন্তু বলতে পারি না। তার বদলে মুখটা ফিরিয়ে রাখি বাঁ দিকে।

তালুকদার বড় ধুরন্ধর, মানুষের মুখ থেকে মনের ভাষাও পড়তে জানে। গাড়ি এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে উত্তরা মডেল টাউনের সীমানায় প্রবেশ করেছে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ছুটছে হাওয়ার বেগে। ফোনে তালুকদারের কথা শেষ হতেই বেখেয়ালে বলে ফেললাম- আমরা রানী পর্যন্ত এসেছি। এরপর কে?

- আ-রে সাংবাদিক সাহেব, অস্থির হচ্ছেন কেন? বললাম না, আগে রেস্ট হাউজে যাই। এরপর মুচকি হেসে তালুকদার বলেন- সেখানে তো আপনার জন্য সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে।

সারপ্রাইজ শব্দটা আরেকবার শুনে ভাবতে থাকি, ব্যাপারটা আসলে কী হতে পারে! ভেবে কোনো কুল-কিনারা পেলাম না। আবার সন্দেহ জাগে, তালুকদার আবার আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে না তো? টাকা-পয়সা থাকলে অনেকেই মানুষ নিয়ে খেলতে মজা পায়। এই যেমন তালুকদার এখন খলিলকে নিয়ে খেলছেন। খলিলের দুরাবস্থা দেখে নিশ্চয় মজা পাচ্ছেন।

- আ-রে, একটা কথা তো আপনাকে বলাই হয়নি। খানিকটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম- সেটা আবার কী?

তালুকদার বলেন- এবার হংকং এয়ারপোর্টে বুকস্টল থেকে ওই যে নোবেল লরিয়েট লেখক আছেন না - ভিএস নাইপল! তার একটা বই কিনেছি, গল্পের বই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, প্লেনে চড়লে বইপড়া আমার একটা অভ্যাস। নাইপলের এক গল্পে আছে এক মহিলার আটি সন্তান। ওদের বাবা সাতজন। লেখকের মতে মহিলা বিশ্ব রেকর্ডধারী। বাস্তবে এই রকম মহিলা থাকলে তার নাম নিশ্চয়ই গিনেস বুকস অব রেকর্ডে উঠা উচিত, কী বলেন সাংবাদিক সাহেব?

- তা তো বটেই।

- কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, গিনেস বুকে বোধহয় আমার নামটা আর উঠানো গেল না।

- মানে?

-আমি অন লাইনে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ওরা সাফ জানিয়ে দেয়, আমার কৃতিত্বের স্বীকৃতি তারা দেবে না।

- কী বলছেন আপনি?

- জ্বি ভাই, যা বলছি ঠিক, বলছি। আমি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের বর্তমান মালিক রিপলি এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে ই-মেইলে সরাসরি

যোগাযোগ করেছি। ওরা বলেছে, তাদের পলিসি চেঞ্জ হয়ে গেছে। তারা সাফ জানিয়েছে, কোনো অনৈতিক কাজের রেকর্ড তাদের বইতে তোলা হবে না। ওরা এখন মদ্যপান বিষয়ে কোনো দাবিকেও রেকর্ড হিসেবে গ্রহণ করতে নারাজ। ওতে নাকি মামলা মোকদ্দমার আশঙ্কা থাকে।

তালুকদারের কথা শুনে নিজেকে হঠাৎ লিক হওয়া বেলুনের মতো লাগলো। এত সিটিং, এত সময় দেওয়া- সবই পণ্ডশ্রম। কহরদরিয়ার সেতু পেরিয়ে গাড়ি টঙ্গী এলাকায় ঢুকছে। মেঘলা ভাব কেটে রোদের দেখা মিললেও কেমন ম্লান। মনে প্রশ্ন উঁকি দেয়, তালুকদার যে সারপ্রাইজ দেওয়ার কথা বলেছে, সেটা কী এটাই? তাহলে আর গাজীপুর চৌরাস্তা পেরিয়ে ভাওয়ালগড়ের রেস্ট হাউজে যাওয়ার দরকারটা কী? তালুকদার বলে ওঠেন- গিনেস বুকে নাম না উঠুক, একটা বই তো প্রকাশ করা যাবে, কী বলেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অপকীর্তি বলুন আর কৃতত্বই বলুন যে রেকর্ড আমি গড়েছি এটা পৃথিবীতে আর কেউ করতে পারেনি। একেক সময় মনে হয়, আমার সবশিল্প-কারখানা ব্যবসা বাণিজ্যের চেয়ে একই বংশলতিকার চার প্রজন্মের নারী শয্যাসঙ্গী হওয়ার মধ্যেই স্বার্থকতা বেশি। যদিও আমি নিশ্চিত, কেউ আমার এ কাজকে সমর্থন করবে না। তারা বলবে, এ মহাপাপ। আমার মতে পাপ শব্দ বা বিষয়টি একেবারে মনগড়া, মামুলি সংস্কার মাত্র। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, দুনিয়াতে এমন কোনো মহাপুরুষ নেই যার কোনো না কোনো কাজকে পাপ বলে শনাক্ত করা যাবে না। কিন্তু তাতে কী পৃথিবী থেমে আছে? আসলে সময়ের সাথেই বদলে যায় সবকিছু। আদিম সমাজের কথা ভাবুন, মধ্য যুগের দিকে ফিরে তাকান, আজকের সঙ্গে কতটা মিল আছে বলুন? যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাল্টে যাচ্ছে মানুষের মূল্যবোধ। আমি নিজকে একজন অগ্রসর মানুষ বলে মনে করি। ঘটনাচক্রে বা জেনেশুনে যাই করি না কেন, এজন্য আমি কখনো গ্লানিতে ভুগি না। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আলবেয়ার কামুর দ্য আউটসাইডার উপন্যাস পড়েছেন?

- উপন্যাসটার নাম শুনেছি, পড়া হয়নি।

- এই আপনাদের একটা দোষ। আমার তো মনে হয়, দুই একজন বাদে সাংবাদিকরা খুব একটা পড়াশোনা করে না। দোষ শুধু আপনার নয়, অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এটা আমি বুঝেছি। শুনুন সাংবাদিক সাহেব, পারলে উপন্যাসটা পড়বেন। পড়লে আপনার মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে যাবে- সোজা কোথায় আপনার মূল্যবোধ ধাক্কা খাবে। উপন্যাসের নায়ক ঘটনাচক্রে একজনকে খুন করে বসেছে, এই খুনের জন্য তার কোনো অনুশোচনা নেই। উপন্যাসটা পড়ার আগে আপনার যে মানসিক অবস্থা ছিল, উপন্যাস পড়ার পর দেখবেন সেটা অনেকটাই পাল্টে গেছে। আমি শুনে যাচ্ছিলাম চুপচাপ। কোনো মন্তব্য থেকে বিরত থাকি। শরীফউদ্দীন তালুকদারের টাকার জোর আছে। টাকার জোর থাকলে মানুষ অনেক কথাই বলে। তালুকদারও আরো কিছু বলতেন। হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। ফোন রিসিভ করে কয়েকটা কথা বলার পর সিটের পেছনে রাখা ল্যাপটপ হাত বাড়িয়ে টেনে এনে কোলে বসিয়ে অন করলেন। ই-মেইলে আসা কোনো ডকুমেন্ট দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমি বাইরে তাকিয়ে দেখি, মেঘলা ভাব আর নেই। রোদ ঝলমল করছে। এসি কার বলে আঁচ করা যাচ্ছে না বাইরের গরম। ভাবলাম, তালুকাদরের যে সারপ্রাইজের কথা বলেছিলেন সেটা হলো তিনি সংবাদ সম্মেলন আর করছেন না।

আমার ধারণা যে ভুল তা বুঝতে পারলাম গাজীপুর চৌরাস্তা পেরোবার পর পরই। ল্যাপটপ গুটিয়ে সিটের পেছনে আবার চালান করে এবং মোবাইল ফোনে কয়েকজনের সঙ্গে কথা শেষ করে আমার দিকে ফিরে তাকান তালুকদার। হয়তো আমার মনমরা ভাব দেখে বলে ওঠেন- সাংবাদিক সাহেব, মন খারাপ কেন? আপনার জন্য সাইপ্রাইজ কিন্তু অপেক্ষা করছে।

আবার সারপ্রাইজ! সেটা আসলে কী? যদিও আমি চুপচাপ, মুখ ঘুরিয়ে রাখলাম বাইরের দিকে। এমন ভান করলাম যেন তালুকদারের কথাটা কানেই ঢোকেনি। গাড়ি ছুটছে দ্রুতবেগে। রেললাইন পেরিয়ে ন্যাশনাল পার্কের দিকে। রাস্তার পাশে নানা স্থাপনার ফাঁকে ফাঁকে গজারি গাছের উপস্থিতি বলে দেয়, আমরা প্রবেশ করেছি ভাওয়াল গড়ের সীমানায়। তবে গড় আর আগের মতো নেই। লক্ষ করলাম, সামনে একটা কাভার্ড ভ্যান রাস্তা যেন আগলে রেখেছে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটছে ভ্যানটা। ড্রাইভার কয়েকবার হর্ন বাজায়। সাইড দিচ্ছিল না দেখে ওভারটেক করলো একটু ঝুঁকি নিয়ে। তালুকদার আবার মোবাইল ফোনে কথা বলায় ব্যস্ত। উল্টাদিক তেকে সাঁ সাঁ করে দুটি যাত্রীবাহী বাস বেরিয়ে গেল ডানপাশ দিয়ে। নিজকে ফের জিজ্ঞেস করলাম, সারপ্রাইজটা তাহলে কী?

ত্রিশ

ভেবেছিলাম রেস্ট হাউসে পৌঁছার আগে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলবেন না শরীফউদ্দীন তালুকদার। হাইওয়ে ছেড়ে ডানদিকে গজারি বনের ভেতর সরু রাস্তায় গাড়ি প্রবেশ করতেই তিনি জিজ্ঞেস করে বসেন- সাইপ্রাইজের ব্যাপারটা আপনার কেমন লাগে সাংবাদিক সাহেব?

- কেমন আর লাগবে, এই চমকে যাওয়া আর কী! আর এই চমকানো কখনও খুশির হয়, আবার কখনও আশাহতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- ঠিকই বলেছেন। একবার তো আমি একজনকে সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে এমন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলাম, বেচারির কাঁদবে না হাসবে বুঝে উঠতে পারছিল না। হ্যাঁ করে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

- তাই নাকি!

- হুঁ। আর সে ছিল অ্যানির মেয়ে ফারাহ।

- মানে?

- আমার শয্যাসঙ্গিনী হওয়া মিসেস চৌধুরীর শেষ প্রজন্ম। বাংলায় যেন কী বলে, নাতনির ঘরে পুতনি? তালুকদারের কথাটা শোনা মাত্রই প্যাকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে নোট নেওয়া শুরু করলাম- ঘটনাস্থল কোথায় ছিল?

- বৈরুত। ওখানকার এক ফাইভ স্টার হোটেলে বিলাসবহুল সুইটে।

- সেখানে গিয়েছিলেন কেন?

- আ-রে সাংবাদিক সাহেব, এই সরল অংক ধরতে পারছেন না! জানেন তো কাঙ্ক্ষিত নারী পেতে মানুষ শুধু যুদ্ধ নয়, সিংহাসনও ত্যাগ করে। আমাকে অবশ্য অত বড় কিছু করতে হয়নি। শুধুমাত্র নরকের আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার ঝুঁকিটা নিয়েছি। আমি তো ফারাহকে লন্ডন থেকে করাচিতে পৌঁছে দেওয়ার অছিলায় বৈরুতে নিয়ে যাই। কাজের কথা বলে কয়েকদিন যাত্রা বিরতি করেছি।

আমি এতদিনে বুঝে গেছি, তালুকদারের কথার পিঠে কোনো মন্তব্য করতে নেই, তাহলে এমন লেকচার শুরু করবেন, আসল প্রসঙ্গই চাপা পড়ে যাবে। শুধু জিজ্ঞেস করলাম- বৈরুতকে কেন বেছে নিলেন?

-ওর ইচ্ছায়। ফারাহ অক্সফোর্ডে পড়তো। অ্যানির কাছ থেকে ওর ঠিকানা নিয়েছিলাম করাচি থেকে। ওর সঙ্গে দেখা করি। মেয়েদের মন-মর্জি বুঝে টোপ ফেলতে হয়। ফারাহর বেলায় সেটাই করলাম। এটা-ওটা গিফট দেই। উইকএন্ডে এখানে- সেখানে ঘুরে বেড়াই। আমার প্রতি ওর বিশ্বাস অর্জনের জন্য যা যা করার সেটা করলাম। আমার আসল মতলব ওকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেইনি। ঢাকায় ফিরে এসে টেলিফোনে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। ওদের সামার ভোকেশনের ঠিক আগে পৌঁছে গেলাম লন্ডনে। সে সময় লন্ডনে আমার কোনো কাজ ছিল না। গিয়েছি স্রেফ ওকে হান্টিং করার জন্য, একটা অদ্বিতীয় নজির গড়ার নেশা আমাকে তখন পেয়ে বসেছিল। লন্ডনে গিয়ে শুনলাম, ফারাহ বৈরুত হয়ে করাচিতে যেতে চায়। ওখানে তার এক লেবাননি বান্ধবী আছে। তার সঙ্গে দেখা করবে। আমি বললাম- ঠিক আছে সুইট ডার্লিং, আমিও যাব তোমার সাথে। ফারাহ দ্বিমত করলো না। ও আমাকে গ্র্যান্ড আংকেল বলে সম্বোধন করতো। আমিই শিখিয়ে দিয়েছিলাম। যাতে আমাদের সম্পর্ক- বিশেষ করে আমার মতলব নিয়ে কারো মনে সন্দেহ না জাগে।

আমি বললাম- আচ্ছা, রানীর ব্যাপারটা কী হয়েছিল? ও তো পাকিস্তানে ফিরে গেল। তারপর কী হয়েছিল? রানীর সঙ্গে আপনার যে ডেটিং হয়েছিল, সেটা অ্যানি কী জানতে পেরেছিল?

তালুকদার কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়েই জবাব দেন- একেবারে মুখের মতো প্রশ্ন করলেন সাংবাদিক সাহেব। অ্যানি যদি জানতো ওর বোন কিংবা মায়ের সঙ্গে আমি শুয়েছি, তাহলে করাচি থেকে লন্ডনে যাব শুনে মেয়ের ঠিকানা কী আমাকে দিতো? আমাকে বিশ্বাস করতো বলেই ফ্লাইটে চড়ার আগে টেলিফোন করে মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেও ভুলেনি। আর রানীর ব্যাপারটা আপনাকে পুরোপুরি বলিনি?

- না। ওই যে ঢাকা থেকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, ওই পর্যন্তই জানি।

- তাহলে শুনেন। করাচিতে ফিরে গিয়ে রানী বোনের মুখ দেখতে চাইতো না, মন খুলে কথা বলা তো দূরের কথা। ও নাকি ঘরের দরজা আটকে শুধু কাঁদতো। এক পর্যায়ে স্বাভাবিক হলেও বোনের সঙ্গে কথা বলতো না। তারপর গোপনে ওর অ্যাবরশন করতে গিয়েই ঘটলো বিপত্তি। টিটেনাসে রানী মারা যায়। কথাটা শুনে না বলে পারলাম না- বলেন কী! আগেভাগে এটিএস ইনজেকশন দিলেই তো পারতো। শরীফউদ্দীন তালুকদার চুপচাপ। কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না। হয়তো রানীর কথাই ভাবছিলেন। হঠাৎ লক্ষ করলাম, আমরা গেস্ট হাউসের সামনে চলে এসেছি। তালুকদারের গাড়ি দেখতে পেয়ে সিকিউরিটি গার্ডরা দ্রুত গেট খুলে দেয়। এদিকে আকাশ পরিষ্কার। উজ্জ্বল রোদ জেল্লা দিচ্ছে আশেপাশের গজারি গাছের সবুজ পাতায়। পাখিদের কিচিরমিচির কানে এলো। অনেকদিন পর ঘুঘু ডাকও শুনতে পেলাম।

রেস্টহাউসে ঢুকলাম। বাউন্ডারি দেয়াল ঘেরা বিশাল এলাকা। মাঠের মতো জায়গার মাঝখান দিয়ে ইটের সোলিং করা রাস্তা দিয়ে সেই বাংলো প্যাটার্নের ঘরের সামনে গিয়ে নামলাম। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে শুধু আশপাশের স্টাফ নয়, ঘরের ভেতর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো মিনা হোসেন। সেই সফেদ শাড়ি-ব্লাউজ আজ পরেনি। কালো টাইট্‌সের ওপর অফ হোয়াইট টি-শার্ট। ঘন কালো লম্বা চুল স্ট্রেইট করা, মাঝ বরাবর সিঁথি থেকে কাধের ওপর দিয়ে লুটানো দুপাশে। চিনতে অসুবিধা না হলেও ওকে যেন অন্যরকম লাগছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভুবনমোহিনী হাসি খেলে যায় ওর মুখে। এ সময় মিনা এখানে! সত্যি, ঘুনাক্ষরেও আঁচ করতে পারিনি। এটাই কী তালুকদারের সারপ্রাইজ? পাশে দাঁড়ানো তালুকদার বলে ওঠেন- চলেন সাংবাদিক সাহেব, আমরা ভিতরে বসি।

শরীফউদ্দীন তালুকদারের সঙ্গে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রুমে প্রবেশ করি। আমাদের পেছনে হাইহিলের আওয়াজ তুলে এবং একরাশ পারফিউমের সুবাস ছড়িয়ে মিনা হোসেনও পা রাখে। ওর উপস্থিতিতে আমার মধ্যে মিনমিনে অস্বস্তি যেন চাগাড় দিচ্ছে। হয়তো খলিল আমার বন্ধু বলেই। এই মেয়েটির জন্য আজ তার কত দুর্দশা। নিজের ঘর থেকেও বিতাড়িত। এখন কোথায় কী অবস্থায় আছে কে জানে। এদিকে ওর কলের আশংকায় নিজের মোবাইল ফোনও অফ করে রেখেছি। কিন্তু আমাকে অবাক করে দেওয়ার জন্য ভাওয়াল গড়ের এই রেস্টহাউসে ওকে ডেকে আনার পেছনে তালুকদারের কী মতলব থাকতে পারে সেটা আমার মাথায় খেলছে না।

নরম গদিতে তালুকদার গা এলিয়ে দিতেই পেছন

দিক দিয়ে ঠিক ওর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো মিনা হোসেন। আমি বসলাম ওদের উল্টাদিকের সোফায়। টি-টেবিলের ওপর লেখার প্যাড ভরা বুক সাইজের প্যাকেটটা রাখলাম। তালুকদার বলে ওঠেন- মিনা, আমাদের জন্য একটু নাস্তা-কোল্ড ড্রিংকসের ব্যবস্থা করো।

- ওকে স্যার।

মিনা রুম থেকে বেরিয়ে যেতেই তালুকদার আমাকে জিজ্ঞেস করেন- কী বুঝলেন সাংবাদিক সাহেব! আপনার বন্ধুর জন্য কোনো দুঃখ বা আফসোসের ছিটাফোঁটা ওর মধ্যে দেখতে পেলেন? আমার জবাবের তোয়াক্কা না করেই তালুকদার ফের বলেন- এই হলো মেয়ের জাত। ওদেরকে বাগে রাখার কৌশলটা শুধু জানা চাই।

প্রসঙ্গ পাল্টাতেই বললাম- ফারাহর বিষয়টি আপনি শেষ করেননি। কীভাবে ওকে সারপ্রাইজ দিয়েছিলেন? প্রশ্নটা শুনে তালুকদার নড়েচড়ে বসলেন- হ্যাঁ, ভালো কথাই মনে করিয়েছেন। ওই যে বৈরুতে এক ফাইভস্টার হোটেলে উঠেছিলাম। ডাবল বেডের সুইট ভাড়া নিয়েছিলাম। আটতলায় ছিলাম আমরা। এক ব্যালকোনি ছিল। সেখানে দাঁড়ালে অদূর নীল সমুদ্র আর বন্দর এলাকা দেখা যেত। ওটা তো ভূমধ্যসাগর তাই না?

- মানচিত্রে তো তাই দেখি। ভূমধ্যসাগরের তীরেই লেবাননের রাজধানী বৈরুতের অবস্থান।

তালুকাদর বলতে থাকেন- সেদিন আমরা অনেক জায়গায় ঘুরেছি। ফারাহর বান্ধবী ছিল আমাদের সঙ্গে। ঘোরাঘুরির পর আমরা এক সঙ্গে হলিউডের একটা ছবিও দেখি সিনেমা হলে ঢুকে। তারপর এক রেস্টুরেন্টে ঢুকে ডিনার করি। ফারাহর বান্দবী তার গাড়িতে আমাদের হোটেলে নামিয়ে দেয়। সুইটে ফেরার আগে বারে ঢুকলাম। কয়েক পেগ হুইস্কি গিলে আমরা সুইটে ফিরলাম। লিফটে চড়ে আটতলা পৌঁছে টের পাই ফারাহকে নেশায় পেয়েছে। সুইটে ঢোকার পর পরই দেখলাম, বেসামাল হয়ে উঠছে। বুঝলেন তো সাংবাদিক সাহেব, অমন একটা মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলাম। শিকারি যেমন ওৎ পেতে থাকে শিকারের জন্য আমিও ঠিক তাই.....

- ফারাহ তো টিনএজার! ড্রিঙ্ক করতো সে?

- আরে ভাই, ও কী আপনার বাংলাদেশের গাঁ-গেরামের মেয়ে নাকি উঠতি বয়সেই বোরকা পরে ঘরের বাইরে পা রাখবে। করাচির হাই সোসাইটিতে বড় হয়েছে, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডের ছাত্রী। ড্রিংক তো ওদের কাছে নস্যি মাত্র। তবেআমি বিশেষ মতলবেএকটু কড়া ডোজের পানীয় অফার করি। আমার গালগল্পে মজে গিয়ে আসল ব্যাপারটা ধরতে পারেনি সে।

বললাম- বুঝতে পেরেছি। এবার বলুন, ওকে দেওয়া সারপ্রাইজটা কেমন ছিল?

প্রশ্নটা তালুকদারের কানে ঢুকলো কিনা বুঝতে পারলাম না। মনে হলো, বৈরুতে সেই রাতের স্মৃতিতে বিভোর হয়েই বলছেন- আমার জীবনে সত্যিই স্মরণীয় একটা রাত। নেশায় বুঁদ ফারাহ যখন আমার মতলবটা ধরে ফেলে তখন মিনমিনে আপত্তি করেছিল। কিন্তু আমি তখন ক্ষুধার্ত বাঘ, সেই সঙ্গে অভিজ্ঞও বটে, অমন পরিস্থিতিতে কী করতে হয় সেটা ভালো করেই জানা। ওকে তখন মনে হচ্ছিল, মেহেরুন্নিসা মানে মিসেস চৌধুরী আবার পুনর্জন্ম নিয়েই আমার জন্যই দুনিয়ায় ফিরে এসেছে। তিনি অকপটে আমার কাছে স্বীকার করেছেন, তার উঠতি যৌবনে গণি চৌধুরী পুরোপুরি তৃপ্তি দিতে পারেননি এবং তখনকার অতৃপ্তিকে কখনো মন থেকে মুছতে পারেননি। সে কারণেই আবার ফিরে এসেছেন। যদিও আমার বয়স হয়েছে। কিন্তু একজন তরুণীর কাছে একজন বয়স্ক পুরুষের পক্ষে কীভাবে তরুণের সমকক্ষ হয়ে উঠতে হয়- সেটা অভিজ্ঞতা থেকেই শিখেছি। তা হতেই সুড়সুড়ি লাগছিল দেখে ফারাহ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। সেই হাসি, আমাকে উস্কে দেয়, আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

তালুকদার থামলেন। আমিও চুপ-চাপ। এমন বয়ান শোনার পর কী প্রশ্ন করতে হবেতা সত্যিই আমার পেশাদারি অভিজ্ঞতাই নেই।

নিরবতা তালুকদারই ভাঙলেন- মিসেস চৌধুরীর কথা মনে পড়ছিল বলেই ওকে আমি সারপ্রাইজটা দিতে চাইলাম। সত্যিই সাংবাদিক সাহেব, আমার তখন মনে হচ্ছিল ফারাহর ভেতর দিয়েই মিসেস চৌধুরী যেন আমার কাছে আবার ফিরে এসেছে, একেবারে টাটকা হয়ে। তখনই আমি ওকে বলে বসলাম, তোমার এ্যান্ড আম্মীর মা ছিল, তাকে তো তুমি দেখো নি, ঠিক তোমার মতোই দেখতে ছিল। অমনি ফারাহর প্রশ্ন, আপনি জানলেন কী করে? বললাম, আমি তাকে দেখেছি। ঠিক তোমার মতোই তিনিও আমর সঙ্গে বেড়ে..... কথাটা শেষ করতে পারিনি। তাকিয়ে দেখি ফারাহ বিস্ময়ে হাঁ করে আছে। মুখে ভাষা নেই। কাঁদবে না হাসবে তখন বুঝে উঠতেই পারছিল না। দেখলেন তো, কেমন সারপ্রাইজ ওকে দিয়েছি? কোন মন্তব্য না করলেও আমার ঠোঁটের কোনে যে মুচকি হাসি ফুটে উঠেছে- সেটা টের পেলাম।

তালুকদার বলে ওঠেন- সাংবাদিক সাহেব, আজ আপনার জন্যও সারপ্রাইজ আছে। তবে সেটা অন্যরকম।

কেমন হেঁয়ালি তালুকদারের কথায়। মনে মনে ভাবলাম, সারপ্রাইজের আর কী বাকি আছে! এই রেস্টহাউজে মিনা হোসেনের উপস্থিতিই তো আমার জন্য বড় সারপ্রাইজ। তালুকদারের মতিগতি বোঝা ভার। মিনাকে আর আমাকে সেই গুলশানের ঘটনার মতো আবার এক রুমে পাঠাবেনা তো! এখন মনে হচ্ছে, লোকটার পক্ষে সবই সম্ভব। আর সেটা হবে মিনা হোসেনের চরম অপমানকর। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যে খলিলকে নিয়ে এত কিছু ঘটে গেছে- মিনাকে দেখে তা মোটেও বোঝা যাচ্ছে না। একেবারে স্বাভাবিক। তার হাবভাবে মনে হয় না, খলিল নামের কাউকে চেনে! আমার গিন্নি পরনারী বিষয়ে মাঝে-মধ্যেই আমাকে সতর্ক করে- তুমি কিন্তু মেয়েদের চেন না, ওরা সব পারে।

এমন সময় মিনা গেস্ট হাউসের একজন স্টাফকে নিয়ে তালুকদারের ফরমায়েশ অনুযায়ী আমাদের জন্য হাল্কা নাশতা, ফলমূল আর কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে এলো একটা ট্রলিতে চড়িয়ে। মিনার দিকে তাকাতেই মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ে ওর ফর্সা মুখে। কালো চোখজোড়ায় দুশ্চিন্তার কোনো ছাপ নেই। আমার ও তালুকদারের সোফার মাঝখানে টি-টেবিলটা থেকে আমি প্যাড-কলম সরাতেই ওরা সেখানে প্লেটে খাবার সাজিয়ে দিতে থাকে। ওদের উপস্থিতি তোয়াক্কা না করেই তালুকদার বলে ওঠেন- পরদিন দেখলাম। ফারাহর মনমরা। কথাবার্তা-আচরণে জড়তা। বুঝতে পারলাম, আগের রাতের ঘটনা সহজভাবে নিতে পারছে না। তবে সাংবাদিক সাহেবআমি বাজি রেখে বলতে পারি, ফারাহ কাগজ-কলমে কুমারী হলেও বাস্তবেতা ছিল না। ওদের সোসাইটিতে সেটাই অঘোষিত রেওয়াজ। আর ইংল্যান্ডের মতো দেশে ফ্রি মিক্সিং তো ডালভাত, কী বলেন? তবু ফারাহ সাব কন্টিনেন্টের মেয়ে তো, কিছুটে হলেও ওর ধমনীতে মায়ের তরফ থেকে বাঙালির রক্ত আছে। শরম-লজ্জা তো একটু থাকবেই। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ফারাহ কিন্তু রূপের দিকটা মায়ের কাছে থেকেই বেশি পেয়েছে, আর আমার তো মনে হয়েছিল, মিসেস চৌধুরীর পুনর্জন্ম ঘটেছে। আর অমন একটা ঘটনার পর ফারাহর পক্ষে কুণ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তারপর সেটা ঘটেছে, এমন একজনের সঙ্গে, যার বয়স তার দ্বিগুণের বেশি এবং যাকে ওর মা আঙ্কেল আঙ্কেল বলে সম্বোধন করে....

- দারুন, ইন্টারেস্টিং কেস তো স্যার।

প্যাডের ওপর কলম চালিয়ে নোট করায় ব্যস্ত ছিলাম। মিনার গলা কানে আসতেই তাকালাম। টেবিলে খাবার সাজিয়ে কোন ফাঁকে তালুকদারের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি। দুহাতে বসের দু'কাধ আলতো ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। তবেওর কথায় তালুকদারের কপালে বিরক্তের ভাজ- তুমি আবার ডাইলে বাঁ হাত দিচ্ছো ক্যান?

- সরি, স্যার।

মিনার ফরসা মুখটায় যেন ছায়া ঘনালো। তালুকদার ফের বলেন- ফারাহর মন খারাপ দেখে আমি প্রস্তাব দেই, চলো আজ জেইতা থেকে ঘুরে আসি। ও জেইতা চিনতো, আমার কথায় অমত করেনি। বৈরুতে আসবো দেখে লন্ডনে থাকতেই লেবাননের ট্যুরিজমের ওপর একটা বই কিনে ছিলাম। তাতে জেইতা নিয়ে এক চ্যাপ্টার ছিল। বৈরুত থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়। দারুণ দর্শনীয় স্থান। ওখানে পাহাড়ের গুহার ভেতর আশ্চার্য সবভাস্কর্য। জায়গাটা আবার বৈরতের ডক নদীর উৎস। নৌকায় চড়ে ভাস্কর্য দেখতে হয়। তবে ছবি তোলা নিষেধ। ক্যামেরা নিয়ে গুহার ভেতর কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। জেইতা থেকে আমরা গেলাম বিবলসে। সমুদ্র সৈকতে ছোট্ট শহর। ভ্রমণে ফারাহ বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠে। তবেআমরা বেশ আনন্দে সময় কাটালেও ফারাহ যেন আগের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারছিল না- সেটা আমার নজর এড়ায়নি। সন্দেহ হলো, আমার সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা কিংবা মনোভাবওর মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছে। আর সে কারণেই ওর সঙ্গে আর করাচি যাওয়ার ভরসা পেলাম না। হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ে গেছে- এই অজুহাতে ফারাহকে আমি করাচির ফ্লাইটে তুলে নিয়ে লন্ডনে ফিরে গেলাম। সেখান থেকে চলে এলাম দেশে।

- স্যার, এটা কত বছর আগের ঘটনা? পেছনে দাঁড়িয়ে ম্যাসেজ করে চলা মিনা হোসেনের প্রশ্ন

তালুকদার ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন- তুমি কেন কথা বলছো?

কাচুমাচু হয়ে মিনা বলে- সরি স্যার, আমার ভুল হয়েছে।

তখন তালুকদারের মুঠোফোন বেজে ওঠে। জলতরঙ্গের মতো মিষ্টি আওয়াজ। কল রিসিভ করে তালুকদার বলে ওঠেন- জ্বি, আমি শরীফউদ্দীন তালুকদার বলছি। ও আপনি ভোলার এসপি? বলেন, কী খবর? অ্যারেস্ট হয়েছে! গুড, বদমাইশটা এবার বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল।

তালুকদারের কথা শুনে বুকের ভেতরটা আমার ছ্যাত্ করে ওঠে। ভোলায় অ্যারেস্ট হলো কে? খলিল নয়তো! আমি তাকালাম, মিনা হোসেনের দিকে। তার কালো, দারুণ দেখতে পটলচেরা চোখ জোড়াতেও আশঙ্কার ছোঁয়া। যা ভেবেছি, তাই ঘটেছে। বেশ তৃপ্তির হাসি ঝেড়ে তালুকদার বলেন- সাংবাদিক সাহেব একটা গুড নিউজ আছে আপনার জন্য।

- গুড নিউজ, মানে?

- আপনার দোস্ত, পিম্প খইল্যা ধরা পড়েছে ভোলায়। আমার সোর্স লাগানো ছিল। ভোলা শহরের চকবাজারের এক হোটেল থেকে গ্রেফতার হয়েছে। তারপর তালুকদার তার পেছনে দাঁড়ানো মিনার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলেন- সুইট হার্ট, বল তো এখন তোমার কোর্টে। যা করার তোমাকেই করতে হবে। তোমার দেওয়া নারী নির্যাতন মামলায় পুলিশ ওকে গ্রেফতার করেছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। মেডিকেল সার্টিফিকেট থেকে সাক্ষী, সবআমি যোগাড় করে ফেলেছি। ব্যাটাকে এবার শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।

আমি তাকালাম মিনা হোসেনের দিকে। ও যেন স্টাচু বনে গেছে। তবেওর দুচোখে অশ্রুর ঝিলিক দেখতে পাই- এই বুঝি মেকাপ নেওয়া গালের উপর গড়িয়ে পড়বে! আমার মনটা বিষিয়ে ওঠে। শরীফউদ্দীন তালুকাদরকে ফিল্মি ভিলেনের মতো লাগছে। আস্ত লম্পট একটা। টাকাই কী মানুষের সব! ইচ্ছে হলো, হাতের কাগজ-কলম ওর চকচকে টাক বরাবর ছুঁড়ে মারতে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো সবকিছু করা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি বুঝতে হবে। তবে স্বস্তি পেলাম এই ভেবে তালুকদারের নাম আর যাই হোক, গিনেস রেকর্ড বুকে উঠেছে না।



গল্প

প্রতিদান

আরিফ মঈনুদ্দীন

মকবুল আহমেদ সাহেবের দুটো কিডনিই বিকল। ডায়ালাইসিস করিয়ে দিন যাচ্ছে। ছেলেরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে। রক্তের গ্রুপ 'ও' পজিটিভ এরকম একজনের একটি কিডনি ক্রয় করতে ইচ্ছুক। মোবাইল নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। অনেকে যোগাযোগ করেছে, যথারীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একজনের সবকিছু ম্যাচ করেছে। তিনি একজন মহিলা। বয়স পঁয়ত্রিশ বছর।

মকবুল সাহেবের বড় ছেলে শিপার আহমেদ একটি বেসরকারি ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি মহিলার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন। তিন লাখ টাকায় মহিলা রাজি হয়েছেন। আর বেশি কিছু শিপার সাহেব জানতে চাননি। মহিলাকে সময় দেওয়া হয়েছে। স্কয়ার হাসপাতালের কিডনি বিভাগে আসার জন্য।

মকবুল সাহেবকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হবে। কিডনিদাতা মহিলাও এসে অপেক্ষা করছেন। একসঙ্গে দুজনের ডাক পড়বে। মহিলার নাম পারভীন আক্তার। তিনি বসে বসে ভাবছেন, তিন লাখ টাকা হলে তার অনেক উপকার হবে। দুই লাখ স্বামীর দেনা শোধ করবেন। বাকি এক লাখ টাকা থেকে একটি সেলাই মেশিন কিনবেন। বিক্রির জন্য কিছু কাপড়চোপড় কিনবেন। যেখানে ভাড়া থাকেন সেই বাসায় বসেই কাপড় সেলাইয়ের কাজ করবেন। ছোট্ট একটি ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে কোনো রকমভাবে দিনযাপন করতে পারবেন। মেয়েটির বয়স তেরো বছর। সে ঘরের কাজে মাকে ভালোই সাহায্য করে। এই বয়সেই মেয়েটি রান্নাবান্নায় বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। রান্নাবান্না এবং আর সব ঘরের কাজে মেয়েটি সাহায্য করতে পারে বলেই পারভীনের সুবিধা। তিনি মনোযোগ দিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন। স্বামী মারা যাওয়ার সময় কিছুই দিয়ে যেতে পারেননি। উপরন্তু ধারদেনা করে গেছেন। পাওনাদাররা প্রায়ই এসে তাকে ধমকধামক দেয়। প্রথম প্রথম এই ধমকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন রীতিমতো বিভীষিকা, গালমন্দ করে পাড়া মাথায় তুলে ফেলে। এত টাকা তিনি কোথা থেকে দেবেন। বাবা-মাও নিতান্ত গরিবমানুষ। তার চেহারা সুন্দর দেখে বিনা যৌতুকে আজগর আলী তাকে বিয়ে করে তার বাবা-মাকে উদ্ধার করেছিল। আজগর রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আজগর আলী তার বাড়ির লোকদের অমতে বিয়ে করেছিল বলে পারভীনের শ্বশুর-শাশুড়ি এই বিয়ে মেনে নেননি। তখন থেকেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তারাও যে বড়লোক তা

না। তারা যদিও একসময়ের জমিদার ফ্যামিলির লোক। এরা ফুটানি করতে করতে জমিজমা সম্পদ যা ছিল, সব খুইয়েছে। এখন নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ হয়ে গেছে। কিন্তু দেমাগ বা অহংকারটাই শুধুমাত্র এখন পর্যন্ত আছে। অহংকার করতে তো আর পয়সা খরচ লাগে না। ছেঁড়া জামা-জুতা পরেও মনে মনে রাজা উজির সাজা যায়। তাদের হয়েছে এই অবস্থা; সুতরাং তার কিডনি বিক্রি করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। একটি সেলাই মেশিন কিনতে পারলে ভালোই ব্যবসা করা যাবে। সেলাইয়ের কাজে পারভীন আক্তার বেশ দক্ষ। গরিব বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়েই সে এই কাজ শিখেছে। ইন্দিরা রোডে একজন মহিলা টেইলার্স আছে। ওনার কাছ থেকে তার এ কাজ শেখা। তারা থাকত ঢালিবাড়ি বস্তিতে। এখনো তার বাবা- মা ওখানে আছে। বাবা রাজমিস্ত্রির হেলপারের কাজ করে। এভাবেই দুই বোন এক ভাই নিয়ে পারভীনের বাবার সংসার। তার স্বামী আজগর আলী একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করতেন। লেখাপড়া জানা মানুষ ছিলেন, ভালো বেতন পেতেন। মাত্র দুমাস চাকরি করেছেন। তারপর এই বিপত্তি। অফিস থেকে আসার পথে রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির নিচে চাপা পড়ে না-ফেরার দেশে চলে যান। প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি হওয়ার আগে তিনি টুকটাক ব্যবসা করতেন। মিটফোর্ড থেকে ওষুধ কিনে স্বউদ্যোগে বিভিন্ন ফার্মেসিতে সরবরাহ করতেন। এভাবে টেনে সংসার চালাচ্ছিলেন। পরে এই কাজে তার ক্লান্তি এসে যায়। মনও সাড়া দিত না একাজ করতে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন জীবিকার স্বার্থে এটা করতে হতো। পাড়ার কিছু লোকের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল। তাদের কাছ থেকে টাকাপয়সা হাওলাত করত। সময়মতো পরিশোধ করার কারণে তিনি হাওলাতও পেতেন। ওরাও ছিল উদার হস্ত। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর থেকে হাওলাতি টাকার জন্য পাওনাদাররা বেশ পীড়াপীড়ি করতে করতে একসময় একজন এসে তার দিকে কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাকে প্রস্তাব দেয়। এটা পারভীন মেনে নিতে পারেননি। তাই পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞাপন দেখেই কিডনি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিলেন। পেপারও তো কেনার সামর্থ্য নেই। ফার্মেসিতে প্যারাসিটামল টেবলেট কিনতে গিয়ে পত্রিকায় চোখ পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা টুকে নিয়ে এসে শিপার আহমেদ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ভাবতে ভাবতে পারভীন আক্তারের চোখ টলমল অবস্থা। একসময় ঝরঝর করে তার অশ্রু ঝরা শুরু করল। বুকফাটা কান্নাকে হজম করে চোখের পানিতে তা ভাসিয়ে দিচ্ছেন তিনি।

শিপার সাহেব হন্তদন্ত হয়ে পারভীন আক্তারের কাছে এলেন। পারভীন আক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি রেডি তো?

পারভীন মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিল।

শিপার সাহেব বুঝে ফেলেছেন পারভীন আক্তারের মন খারাপ। তিনি বললেন বোন আপনি মন খারাপ বা কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না, তাহলে ব্লাড প্রেসার যদি হেরফের থাকে তখন অপারেশন ব্যাহত হবে।

পারভীন আক্তার বললেন, না ভাই সাহেব, এমনি একটু ভাবনা এসেছে। তাই মনের এই অবস্থা। এমনিতে আমি ঠিক আছি। ঠিক আছে, আপনি অপেক্ষা করুন। আমরা আপনাকে ডাকব।

পারভীন যথারীতি মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল।

শিপার যেভাবে এলেন ঠিক সেভাবেই ব্যস্ত ভঙ্গিতে বাবার কেবিনের দিকে চলে গেলেন।

পারভীন ভাবছে, একটি কিডনিতে দিব্যি তার জীবন কেটে যাবে। আর যদি কোনো সমস্যা হয়-কী আর করবেন! একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আজকে যে তিনি কিডনি বিক্রি করতে এসেছেন। তাও আল্লাহর নির্দেশেই। কেননা এভাবে ফার্মেসিতে যাওয়া, বিজ্ঞাপনটা দেখা টুকে নিয়ে আসা, শিপার সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তারপর উদ্ধারের একটি পথ আবিষ্কার হওয়া, এগুলো সবই উপরের কারবার। আমরা তার হুকুম ছাড়া এককদমও যেতে পারি না। একজন ভিক্ষুককে টাকা দেওয়ার কথা যখন মনে আসে। কে মনে করিয়ে দেয়? তিনি মহান আল্লাহ। সেই তিনিই আজ এখানে পাঠিয়েছেন। তার মনে একটু আনন্দ হচ্ছে। তার মহা সমস্যা থেকে উদ্ধারের এই পথও তিনিই আবিষ্কার করে দিয়েছেন। কী চমৎকারভাবে চলছে জগৎসংসার কে চালাচ্ছেন এসব? তিনিই মহান আল্লাহ। তা নাহলে আমার মতো একটি বস্তির মেয়েকে আজগর আলী চৌধুরী বিয়েই বা করলেন কীভাবে? তাকে আজগর আলী চৌধুরীর বউ হতে হবে, এইজন্য কয়েক ক্লাস শিক্ষাও দিয়েছেন তিনিই। পরীবাগে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা একটি ওপেন স্কুল খুলেছিলেন। এই স্কুলটা সম্ভবত এখনো বিদ্যমান আছে। পারভীন আক্তার ওখানে ভর্তি হয়েছিলেন। দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালীন আজগর আলী চৌধুরী একদিন ওই পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি পারভীনকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন। পারভীনের পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত এদের লেখাপড়ার কায়কারবার দেখাচ্ছলে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। ছুটির পর তিনি পারভীনের সঙ্গে কথা বললেন এবং কথা বলতে বলতে ঢালিবাড়ি বস্তিতে এলেন। পারভীনের বাবা-মাকে রাজি করিয়ে আজগর আলী বিয়ে করে ফেললেন। এভাবে বিয়ে করার বিষয়টি ওনাদের বংশেরও একটা ধারা রক্তে মিশে আছে। যেমন জমিদাররা সুন্দরী কাউকে দেখলে খেয়ালখুশি মতো স্বউদ্যোগেই বিয়ে করে ফেলতেন। এসব কথা পারভীনকে আজগর আলীই বলেছিল।

পারভীন তৃতীয়বার ভাবছে। এভাবে-পরীবাগের স্কুল, আজগর আলীর সঙ্গে পরিচয়, তারপর বিয়ে, তারপর সংসার। এসবই মহান আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে বা হচ্ছে। আজগর বলত পবিত্র কুরআনে কোনো একটি সূরার একটি আয়াতে লেখা আছে। 'আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি' সুতরাং তার জোড়া পারভীন আক্তার। এই যে ঘটনা পরম্পরা এসবই হচ্ছে তাঁর নির্দেশে। প্রত্যেককেই তাঁর জোড়া খুঁজে বের করতে হয়। আজগর আলী খুঁজে বের করেছেন। এর ওপর কি আর কথা আছে!

ওদিকে মকবুল সাহেবকে অপারেশন করার জন্য প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। শিপার সাহেব যাচ্ছেন মহিলাকে ডাকতে মকবুল সাহেব বললেন, এখনই ডেকো না একটু অপেক্ষা করো। তার আগে আমি একটু ভেবে নিই। শিপার সাহেব কেবিনের সোফায় বসলেন। কয়েক মিনিট কাটার পর মকবুল সাহেব বললেন, আচ্ছা যে মহিলাটি আমাকে কিডনি দিতে রাজি হয়েছে, তাকে একটু ডাকো। আমি কথা বলব, কেন সে কিডনি বিক্রি করতে রাজি হলো।

শিপার কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, আচ্ছা আব্বু কেন আবার কী? আমরা টাকা দিয়ে এটা কিনেছি। এর ভেতর অন্য কোনো কিছু থাকার দরকারটা কী?

মকবুল সাহেব ঠান্ডা মাথায় বললেন, আচ্ছা তারপরও ডাকো।

পিতৃ আদেশ অলঙ্ঘনীয়। শিপার সাহেব ওয়েটিং রুমে গিয়ে পারভীনকে নিয়ে কেবিনে ঢুকলেন। পারভীন আক্তারকে দেখে তাঁর খুবমায়া হলো। মেয়েটার চোখে রাজ্যের মায়া। দেখতে চমৎকার লাগছে এরকম একটি মেয়ে তার যদি থাকত। আল্লাহর মেহেরবানিতে মেয়েরাই বাবা-মার বেশি যত্ন নেয়। এটা তাদের মজ্জাগত। সৃষ্টি রহস্যের লীলা। কয়েক সেকেন্ড তিনি তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আচ্ছা মা, তুমি কেন এই সিদ্ধান্ত নিলে? আমাকে কি একটু বলবে? আমার এত বড় একটা পুরস্কার তুমি দিচ্ছ। তোমাকে মা বলা ছাড়া আর কী বলব। একমাত্র মায়েরাই সন্তানের জন্য এরকম করে...

মকবুল সাহেব কথা শেষ করতে পারলেন না।

শিপার সাহেব বললেন, আব্বু এত কথা কীসের? আমরা টাকা দিয়ে কিডনিটা কিনেছি...

শিপার আরও কী যেন বলতে যাবেন তাকে থামিয়ে দিয়ে মকবুল সাহেব ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে বললেন, তুমি চুপ করো। আমি তার কথা শুনব।

শিপার সাহেব বেলুনের মতো চুপসে গেলেন।

আবারও তার মনে পড়ল পিতৃ আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তিনি চুপচাপ সোফায় বসে গেলেন।

মকবুল সাহেব অতীব আদরমাখা বাক্যে বললেন, মা তুমি কেন কিডনি বিক্রি করছ আমাকে কি একটু বলবে? আমি তোমার ছেলে হিসেবে আবদার করছি।

পারভীন আক্তার তার জীবনের গল্পটা বিস্তারিতভাবে বললেন...। মকুল সাহেবসহ কেবিনে বসা রোগীর অ্যাটেনডেন্টরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো পারভীনের জীবনের গল্পটা শুনল।

মকবুল সাহেবের চোখ দিয়ে বৃষ্টি ধারার মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। দুহাত দিয়ে পারভীনের হাত ধরে ওমাগো! বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

কিছুক্ষণ পরিবেশটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। পিনপতন নীরবতা সবাইকে গ্রাস করল। নীরবতা ভেঙে মকবুল সাহেব প্রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা শিপার তুমি ওর টাকা নিয়ে এসেছ?

শিপার সাহেব বললেন, জি আব্বু এখানেই আছে।

আচ্ছা টাকাগুলো আমাকে দাও।

শিপার সাহেব তিন লাখ টাকার তিনটি বান্ডিল বাবার হাতে দিলেন।

মকবুল সাহেব টাকাগুলো হাতে ধরে রেখে কয়েক সেকেন্ড পারভীনের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, মা আমি একটি আবদার করব। ছেলের আবদার হিসেবে তুমি কথাটা ফিরিয়ে দিবেনা।

জি আংকেল, আপনি বলুন।

মকবুল সাহেব আবার কেঁদে ফেললেন, কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, মা তুমি এই টাকাটা নিয়ে

যাও। আমাকে কিডনি দিতে হবেনা। আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আগে তোমার উপকারটা দেখে যেতে চাই। তুমি এই কথাটা রাখলে আমার একটা শান্তি মৃত্যু হবে।

পারভীন রীতিমতো চমকে উঠল, বলছেন কী এই ভদ্রলোক! এমনিই এমনিই টাকাটা দিবেন। তবে সে নিবে কেন? পারভীন ভেবেচিন্তে বলল, না বাবা আমি এটা এমনিই এমনিই নেবনা। আপনি কেন আমাকে টাকা দিবেন। আমি জানি একটি কিডনি নিয়েই অনেকেই দিব্যি বেঁচে আছে। আমার স্বামীর পরিচিত ন্যাশনাল ব্যাংকের একজন বড়সড় এক্সিকিউটিভ মোস্তাফিজুর রহমান স্যার একটি কিডনি নিয়ে চমৎকার সংসার করছেন। আমিও পারব আমার কোনো অসুবিধা হবেনা।

মকবুল সাহেব নীরবে থেকে ঠান্ডা মাথায় পারভীনের কথাগুলো শুনলেন। তিনি বললেন, আমি কিন্তু তোমাকে মা বলে আবদার করেছি। তুমি ছেলের আবদার ফিরিয়ে দিবেনা। তুমি যদি আমাকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করতে না পারো, তবে টাকাটা তোমার সামর্থ্য হলে ফিরিয়ে দিয়ো। ধার হিসাবে হলেও তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে আমি শান্তি পাবনা।

মকবুল সাহেবের আদর-স্নেহ আর মায়াভরা মুখের দিকে চেয়ে পারভীন আর অমত করতে পারে নি। টাকাটা হাতে নিয়ে বলল, ঠিক আছে বাবা, যদি সম্ভব হয় এই টাকাটা আমি ফেরত দিব।

মকবুল সাহেব দ্বিগুণ আদরমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, ছেলের হাত থেকে নেওয়া টাকা কখনো ধার হয় না। তুমি এসব আর ভেবো না। আমি তোমাকে বকশিশ হিসেবে দিলাম।

মকবুল সাহেবের কথায় পারভীনের চোখ ভিজে উঠল। এত মহৎ একটি মানুষ আজ তাকে উদ্ধার করেছে বিনিময় ছাড়াই। তার এখন করণীয় হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে এই মহান ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা পাঠানো।

বাবার কারবার দেখে শিপারের বাকরুদ্ধ অবস্থা, আব্বু এটা কী করল? আবার কিডনির জন্য বিজ্ঞাপন। আবার ঝামেলা। যাক আব্বুর কথার ওপর তো আর কথা চলে না।

মকবুল সাহেব মোলায়েম কণ্ঠে পারভীনকে বললেন, মা তুমি এবার যেতে পারো। তবে টাকা নিয়ে একলা যাবেনা, তোমাকে আমাদের ড্রাইভার গাড়ি করে বাসায় পৌঁছে দিবে। তুমি থাকো কোথায়?

জি বাবা আমি থাকি শুক্রবাদ।

ঠিক আছে। শিপার ব্যবস্থা করো। ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো। তারপর কথা বলছি।

পারভীনকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসে শিপার সাহেব বললেন, বাবা তুমি এটা কী করলে?

মকবুল সাহেব বললেন, আমি কিছুই করি নি। আদেশটা এসেছে উপর থেকে। তোমাদের অফিসিয়াল 'ওপর' না আকাশ থেকে। আল্লাহ্ আমাকে এটা করতে বলেছেন। আর আমি দায়িত্ব পালন করেছি। এখন আর একটি কথা শোনো। আমাকে বাসায় নিয়ে চলো। আমি অপারেশন করাব না।

শিপার বলল, তা তো বাসায় যাবেই। কিন্তু অপারেশন করাবেনা কেন? আমরা আবার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যবস্থা করব। আবার টাকা খরচ করব। সমস্যা কী?



মকবুল সাহেব মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, সমস্যা অন্য কিছু না। সমস্যা হলো আমি কিডনি লাগাবনা। তুমি একটু চিন্তা করো, কিডনি লাগালেও তো আমি মরব। আমি কি যুগ যুগ বেঁচে থাকব? আর বিশেষ করে আমার সবকিছু গোছানো। তোমাকে যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। এখন আমি খুব শান্তি অনুভব করছি। এই অনুভূতিই হয়তো আমার নিরাময়ের ওষুধ। তোমরা আমাকে বাসায় নিয়ে চলো। ডাক্তারদেরকে বলো আমরা অপারেশন করাচ্ছি না। ওদের সিডিউলে অন্য কাউকে ঢুকিয়ে নিক। আমি ডায়ালাইসিস করিয়ে যে কদিন পারি বাঁচব। তুমি ভালোই জানো সবকিছু হয়-আমার কথার নড়চড় হয় না। সচিবালয়ে বড়সাহেব ছিলাম। জীবনে এক পয়সা ঘুষ খাইনি। আল্লাহ্ রোগ দিয়ে তার প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করেন। আমাকে এই পরীক্ষায় পাস করতে হবে। শিপার সাহেব ভালোই জানেন আব্বু জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে রিটায়ার্ড করেছেন। চাকরি জীবনে আপস করেননি বলে আর প্রমোশন হয় নি। তাতেও তার কিছু যায় আসে না। তিনি বীরের মতো চাকরি শেষ করে বাসায় এসে উঠেছেন। ওনার কথা সচিবালয়ে কিংবদন্তি হয়ে আছে। সবাই একবাক্যে চেনে জয়েন্ট সেক্রেটারি মকবুল সাহেবকে। শিপার সাহেবের তৃতীয়বার মনে পড়ল। পিতৃআদেশ অলঙ্ঘনীয়।

শিপার সাহেব বাবাকে বাসায় নিয়ে এলেন।

বাসায় এসে মকবুল সাহেব বললেন, আজ আমার এত আনন্দ লাগছে কেন জানো? ভালো কাজ করলে আনন্দ এসে মন ভরিয়ে দেয়। আমারও সেই অবস্থা। তোমরা কে কোথায় আছ। আমার জন্য এককাপ চা করে নিয়ে এসো।

মকবুল সাহেব এরকম আনন্দ আর কখনো পেয়েছেন কি না ভাবছেন। সম্ভবত আনন্দ পাওয়ার সিরিয়ালে আজকেরটা অন্য সবগুলো ডিঙিয়ে এক নম্বরে চলে যাবে। তিনি সুস্থতা বোধ করছেন, স্বস্তিবোধ করছেন। আর শিপারকে বলে দিয়েছেন-আর কোনো বিজ্ঞাপন নয় কিডনি নয়। এভাবে ডায়ালাইসিস করিয়ে করিয়ে দিন যাচ্ছে। ছয়-সাত মাস পর একদিন সন্ধ্যাবেলায় মকবুল সাহেবের প্রচণ্ড পিপাসা পেল। তিনি ভুলে গেলেন কিডনি রোগীর পানি খাওয়ার একটি পরিমিতি আছে। ডাইনিং টেবিলে গিয়ে সবার অগোচরে চার গ্লাস পানি খেয়ে নিলেন। পানি খাওয়ার পর মনে হলো অনেক বড় ভুল করে ফেলেছেন। পানি তো শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। খেয়ে যখন ফেলেছে কী আর করা এবার অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন-কী হয়? কী হয়? দেখার জন্য। এর ঠিক দুই ঘণ্টা পরে ওনার প্রচণ্ড প্রস্রাবের বেগ হলো। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, এ্যাই আমার তো মনে হচ্ছে আমি প্রস্রাব করব। দেখি একটু বাথরুমে যাই। তিনি বাথরুমে গিয়ে অনেক্ষণ ধরে খুব আরাম করে প্রস্রাব করলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন, অ্যারে আমার কিডনি তো মনে হয় ভালো হয়ে গেছে! চল তো এখনই চেক করিয়ে নিয়ে আসি। আমি আর একমুহূর্ত ধৈর্য ধরতে পারছি না।

শিপার সাহেব বাবাকে নিয়ে শহরের একটি নামজাদা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গেলেন। পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা প্রদান করে বাসায় এলেন। বাসায় এসে কিছুক্ষণ পর সবার অগোচরে পরপর আবারও তিন গ্লাস পানি খেয়েনিলেন। তিনি নিজে নিজে একটি পরীক্ষা চালাচ্ছেন বলা যায়। পানি খাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে বাথরুমে গিয়ে আরাম করে প্রস্রাব করলেন, তিনি বুঝে ফেললেন, তার কিডনি কাজ করা শুরু করেছে।

পরদিন টেস্টের রেজাল্ট আনতে শিপার সাহেব গেলেন। রেজাল্ট দেখে তো তিনি আনন্দে আত্মহারা! আব্বুর কিডনি ভালো হয়ে গেছে। তিনি কালবিলম্ব না করে এক রকম দৌড়ে বাসায় এলেন। খুশিতে আনন্দ প্রকাশ করে উচ্ছ্বাসভাব কণ্ঠে বললেন, তোমরা কে কোথায় আছ শুনে যাও আব্বুর কিডনি ভালো হয়ে গেছে। কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে! বাসায় আনন্দের জোয়ার বইছে মিসেস মকবুল এবং মিসেস শিপার টেলিফোনে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে এই আনন্দ সংবাদ শেয়ার করতে লাগলেন।

মকবুল সাহেব জায়নামাজ নিয়ে লম্বা একটি সেজদায় পড়ে রইলেন-তিনি সেজদা থেকে ততক্ষণ উঠবেন না যতক্ষণ না সহ্য সীমার বাইরে যায়। সেজদায় থেকে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তার চোখের পানিতে জায়নামাজ ভিজে যাচ্ছে।



গল্প

ঝরাপাতা

নাহার ফরিদ খান

'ফলের' রঙিন পাতাঝরা দিন। লাবণ্যর খুব পছন্দ। পত্রহীন গাছগুলো অসহায়ের মতো ডাল-পালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এখনো ঝরছে বাকি পাতাগুলো। উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে ঝরে যাচ্ছে পাতারা। লাল, কমলা, হলুদ, খয়েরি লাল, বর্ণময় পাতাগুলো ঘাসের উপর স্তূপ হয়ে আছে। যেন পাতাদের ঘর-সংসার। খুবভালো লাগে। গাড়ি ড্রাইভ করে যেতে যেতে তাকিয়ে দেখছিল লাবণ্য। ওর গাড়িতে কলেজ জীবনের বন্ধু সুমিতা। পতিত পাতাদের সংসার দেখে সুমিতাও উচ্ছ্বসিত। বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে এসেছে আমেরিকায়। লাবণ্যের পীড়াপীড়িতে ওর বাড়িতেই উঠেছে। কয়েকদিন লাবণ্যের বাড়িতে থেকে, ঘুরে-বেড়িয়ে ডালাস বোনের বাড়িতে চলে যাবেসুমিতা। ওর মেয়ে এখানকার একটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে। তাই একই সঙ্গে মা-মেয়ে এসেছে। সুমিতা কিছুদিন থেকে চলে যাবেবাংলাদেশে। লাবণ্য বিয়ের পর থেকেই আমেরিকায় সেটেল্ড। এখানে এসে পড়াশোনা শেষ করে অধ্যাপনার কাজ করতো। গত বছর থেকে কাজ ছেড়ে দিয়ে লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেছে। অনেকদিন থেকেই লেখালেখি করছে। স্বীকৃতিও পেয়েছে বেশ। কিছু কিছু জনসেবামূলক কাজেও সম্পৃক্ত লাবণ্য। অনেক বছর কাজ করলো আর ভালো লাগছিলো না। তাই ছেড়ে দিল। তাছাড়া রাজীবমারা যাবার পর থেকে লাবণ্য একটু অস্থিরতা বোধ করছিল। প্রেমের বিয়ে ছিল না, সমঝোতার বিয়ে ও সংসার। তবেভালোই চলছিল। রাজীবমানুষ খুব ভালো ছিল। দাম্পত্য জীবন কতটা সুখের ছিল হিসাবকরে দেখেনি কখনো লাবণ্য। তবেস্বস্তির ছিল। খুবসুখের জোয়ারে না ভাসলেও, অসুখ ছিল না। তাই হঠাৎ রাজীবের অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু ঘটলে লাবণ্য একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল, স্বজনহীন প্রবাসে। ছেলে অমিয় মা'কে সামলে নিয়েছিল। দু'বন্ধু গল্প করতে করতে যাচ্ছিল



নিউইয়র্কের দিকে। নিউইয়র্কের একটা বাঙালি সংগঠন লাবণ্য হককে পুরস্কার প্রদান করবেতাই আমন্ত্রণ জানিয়েছে। লেখালেখিতে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ এবং আমেরিকায় তথা বাঙালিদের মাঝে সাড়া জাগানো বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখে জনপ্রিয়তা পেয়েছে লাবণ্য হক। কলেজ জীবনের মজার গল্পগুলো বলতে বলতে হেসে কুটিকুটি সুমিতা। ভীষণ প্রাণচঞ্চল, আমুদে স্বভাবের সুমিতা। ওদের প্রেমের বিয়ে। বোঝাপড়া চমৎকার। সুখী দম্পতি। লাবণ্য গল্প শুনতে শুনতে একটু আনমনা হয়ে যায়। মনে পড়ে কত শত অনলে জ্বলা কাঠ-কয়লার মতো আলোর টুকরো টুকরো স্মৃতি। আগুনের ফুলকি যেন স্মৃতিগুলো। ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলে স্মৃতির উনুন। এসে গেছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। অনুষ্ঠান মাত্র শুরু হলো। ঠিক সময়েই পৌঁছুতে পেরেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরেই এলেন প্রধান আলোচক, প্রধান অতিথি। ব্যক্তিগত কারণে দেরিতে এলেন তিনি। একটু পরেই ঘোষণা হলো, এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অভীক রহমান। নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকালো লাবণ্য। তার বক্তব্যের আগে তিনি সুন্দর করে ক্ষমা চাইলেন এবং চমৎকার বক্তব্য প্রদান করলেন। এতক্ষণ একটা বইয়ে চোখ রেখে অনুষ্ঠান শুনছিল লাবণ্য। নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বুকে হাতুড়ির ঘা পড়লো। এক সৌম্য কান্ত, টাকমাথা, দীর্ঘাঙ্গী ভদ্রলোক মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে। চমৎকার, পরিশীলিত বক্তব্য। এরপরই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। লাবণ্যর যেন চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। কে এই অভীক! এতো সুন্দর, স্মার্ট, সৌম্যকান্তি ভদ্রলোককে কিছুতেই মেলানো যায় না চল্লিশ বছর আগের অভীকের সাথে। লম্বা, শ্যামলা, জীর্ণশীর্ণ চেহারার, মাথাভরা অবিন্যস্ত চুলের অভীক আর আজকের ধোপদুরস্ত অভীকের সাথে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। শুধু চেনা যায় ওর প্রখরদীপ্ত চোখ আর মোহন হাসিটি। গরিব, মেধাবী এই অভীককে ভালোবেসেছিল সহপাঠী লাবণ্য। 'দুহু ক্রোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' এমনি প্রেম। সে ভালোবাসা শ্রাবণের মুষলধারার মতো অবিরাম কিন্তু সে ভালোবাসার ধারায় ভেসে যায়নি অভীক। ভোলেনি তার দারিদ্র্যতা, পরিবারের বড় ছেলে হবার কর্তব্য। তাই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল লাবণ্যকে। লাবণ্যের কোনো উপায় ছিল না। তিন বছর অপেক্ষা করার মতো পরিস্থিতি ছিল না। বাবা মারা যাবার পরে তিন বোন আর মায়ের দায়িত্ব বড় ভাইয়ের উপর পড়েছিল। ছোট বোন দুটোর বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক ছিল। শুধু লাবণ্যের জন্য কথা আগাতে পারছিল না। বাড়ি থেকে ভীষণ চাপ ছিল। তাই লাবণ্য চেয়েছিল একটা কোর্ট ম্যারেজ করে রাখতে। পরে বুঝিয়ে সব ঠিক করবে। যাতে বোনদের বিয়েতে কোনো অসুবিধা না হয়। সবাই জানবে বড় বোন বিবাহিত কিন্তু অনুষ্ঠান পড়াশোনা শেষ করে হবে। মা সবজানতো। লাবণ্যর জিদের কাছে মা তাতেই রাজি ছিল। অনেক বিয়ে ভেঙে দিয়েছে লাবণ্য বিভিন্ন অজুহাতে। এখন আর পারছে না। তাই রাজীবকে কোর্ট ম্যারেজ করার কথা বলেছিল কিন্তু রাজীব কিছুতেই রাজি নয়। বড় ভাই এবার অনড়। বিদেশে চাকরিরত পাত্র। চেনাশোনা পরিবার। ভালো ছেলে। সুতরাং এ পাত্র হাতছাড়া করা যাবেনা। অপছন্দের কোনো কারণ নেই। বড় ভাই পাকা কথা দিয়েছে। বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভীক লাবণ্যকে বিয়ে করতে বলেছিল। লাবণ্য রাগে, দুঃখে, জিদে অন্ধ হয়ে বিয়েতে মত দিয়েছিল। বিয়ে করে পাড়ি জমিয়েছিল আমেরিকায়। পাঁচ বছর দেশে ফেরেনি লাবণ্য। হঠাৎ লাবণ্য চমকে ওঠে ঘোষণা শুনে। 'এবার পুরস্কার নিতে আসছেন জনপ্রিয় কথাশিল্পী লাবণ্য হক।' সুমিতা ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে পিঠে হাত রাখে 'যা পুরস্কারটা নিয়ে আয়'। লাবণ্য ধীরপায়ে এগিয়ে যায়। অভীকের হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে ফটোশেসনের জন্য মুখ ঘুরিয়ে পোজ দেয়। হাত তালিতে ফেটে পড়ে হলরুম। অনুষ্ঠান শেষে হলরুম থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে পেছন থেকে অভীক ডাকে 'লাবণ্য দাঁড়াও'। লাবণ্য পেছন ফিরে তাকায়নি। দ্রুপায়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়ির লুকিংগ্লাসে দেখে অভীক দাঁড়িয়ে। লাবণ্য পেছনে ফিরে তাকায়নি একবারও। যে ভালোবাসা পেছনে ফেলে এসেছে চল্লিশ বছর আগে তা উড়ে যাক ঝরাপাতাদের দলে। প্রাণচঞ্চল সুমিতা একেবারে নিশ্চুপ। যেন ব্যথাটা ওর বুকেই বাজছে বেশি। কিছুদূর গিয়ে রাস্তার ধারে একপাশে পার্ক করলো লাবণ্য। যেন নিজেকে একটু প্রস্তুত করে নিচ্ছে। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার লক্ষ্যে বিজয়ী আজ অভীক। আজ শুধুমাত্র মেধার জোরে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত অভীক। শুধু জানতো না লাবণ্য। সুমিতা সবই জানতো। যোগাযোগ ছিল অভীকের সাথে কিন্তু লাবণ্য কখনো ভুলেও জানতে চায়নি অভীকের কথা। মিতা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে লাবণ্যকে। চোখে অশ্রু। মনতো আয়না নয়, সরে গেলেই মুছে যাবে।


Asian University of Bangladesh
ADMISSION OPEN
SUMMER 2022
(Offline/Online)
Apply Online
admission.aub.edu.bd
SPECIAL FEATURES
100% Scholarship for GPA-5.00 (Golden) in SSC and HSC.
50% Scholarship for GPA-5.00 (General) in SSC and HSC.
25% Scholarship for GPA 4+4 = 8 (without 4th Subject) in SSC and HSC.
100% Waiver for The Children of Freedom Fighters.
25% Waiver for Siblings, Husband and Wife.
Transport Facilities.
Hostel Facility.
www.aub.edu.bd
aub.edu.bd
Asian University of Bangladesh
Bangabandhu Road, Ashulia, Dhaka.
Contract :01678664433, 01678664417-19

চিত্রকলা, গতিবাদ

সেলিম মাহমুদ

পাটিসুদ্ধ পরিপাটি সাজালাম এই জনপদ
এখানে নাওয়ের গলুইয়ে বারোমাস সুখ থাকে
খালে-বিলে কিলবিল করে মলা, ঢেলা
আর বাঁশঝাড়ে দুলে ওঠে কৈশোরের আলাভোলা দিন
এই গাঁয়ে সুখে ওই গাঁয়ে পানসুপারি বিনিময় চলে
এখানে দাড়িয়াবান্ধা খেলায় শরীর-পুষ্টি পূর্ণতা পায়
ঘোষগাঁয়ে গবাদিপশুর সম্মিলনে হরিহর আত্মা প্রকাশিত হয়
লাজুক সময়ে একথালা বিন্নিখৈয়ে সৃষ্টির নির্বেদ ঢেলে দেয় সুধা
পারাবার সুখ নেয় ঘুঘু-দোয়েলের প্রভাতসংগীত।
একই ফ্রেমে বাঁধানো এ ছবিসালংকরা বৃষ্টির বুস্টার ফোঁটা
ঝিঁঝি ডাকা সময়ের মাঠ ফরাসের চিরায়ত চিত্রকলা।

বসন্ত রং মেয়ে

রহমান মুজিব

মেয়েটি এখনো বসন্ত রং, কুহু মনের কোকিল
নয়া শরীর তার নিষিদ্ধ সূর্যের ভোর- যেন পাপ
হতে বহুদূর ঢেউ তুলে সে ছড়িয়ে দেয় আলোর
কোলাহল; কোলাহল মৃতময় জীবনকে আরেক
অধ্যায়, চাঁদ-তারার সুরে বাঁধা নীড়ের অভিধান
ঘুমপাখি- আর কত! এবার ফিরে আস বৃক্ষনীড়ে
দেখ- অরণ্যবেষ্টিত সবুজ প্রশান্তির হিমশীতলতা
দেখ- বৃক্ষরা অরণ্যের পাহারাদার সৈনিক
অথচ মেয়েটি একদিন সৈনিকেরই পাহারায় লুট হয়
আর রক্তে আঁকা অভিধানে লেখা থাকে সে
বসন্ত রং মেয়ে...

সলিল মুখে তীর বন্দনা

তরিপা মেহরীন

আঁচড়ে পড়া কোনো ঢেউ বুক, এখানে অসুখী তীর
অস্থির কলরোলে ভাঙছে সারা নদী বুক
অস্থির কোনো আগ্রাসী ছুঁয়ে ছুঁয়ে সমুদ্র অধীর
এমনো কোনো জলের বিস্তারে চোখে সলিল মুখ?
খোলা হাওয়ার তানে পৌঁছে গেলে হৃদয় বিদারি এ সুর
রেখে যেও, শুধু এক বানভাসি সান্ত্বনা
ভেসে ভেসে এই ডুবজলে অনেক অনেকটা দূর
খুঁজেছি এই মিঠে রোদের কাছে কোনো তীর বন্দনা?
এসো, আমার আকুল প্রাণে সেজেছে অথৈ সমুদ্দুর
বর্ষার চোখে দেখি, তোমার হাসির ছড়ানো রোদ্দুর?
শোকের মতো যতটা মূর্ছনায় ঢাকছে এ ঘর-
খেদপসরায় সাজছে মৃত্যুর মতো এ সময়
যে দূরবর্তী আকাশে চেয়ে ভাবনা অতঃপর
সন্নিকট এনে নিঃশব্দ মুখ, কতটা হলে তন্ময়?

তেজগাঁও মহিলা কলেজ

৭৬, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা- ১২১৫

কলেজ ফোন: ৯১৩৭৮২৪

E-mail: tmcdhaka@gmail.com Web: www.tejgaonmohilacollege.edu.bd

উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান), বিবিএ (প্রফেশনাল) ও মাস্টার্স পাঠ দানকারী কলেজ



একনজরে তেজগাঁও মহিলা কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম

উচ্চ মাধ্যমিক
বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা

স্নাতক (পাস)
বিএ, বিএসএস, বিবিএস

বিবিএ (অনার্স)
হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং

বিএসএস (অনার্স)
অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান

বিএ (অনার্স) : ইংরেজি, বাংলা (প্রক্রিয়াধীন)

বিএসসি (অনার্স) : প্রাণিবিজ্ঞান, গণিত, উদ্ভিদবিজ্ঞান (প্রক্রিয়াধীন)

প্রফেশনাল প্রোগ্রাম : বিবিএ

এমবিএ:
হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা

বি.দ্র: দূরের ছাত্রীদের জন্য ১০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে।

সভাপতি
আবু আহমেদ

অধ্যক্ষ
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

অনর্থক জেগে থাকা

রকিবুল হাসান

তীরবিদ্ধ করুণ স্বপ্নরা নতুন করে বেঁচে ওঠে আবার-যখন তুমি
ভালোবাসার নামে বন্দি করে নাও সুগন্ধি চুলের অন্ধকারে
একমাঠ মায়াবী ফসলের চাষাবাদ
দুঃখে কাতরানো ডাহুক তখন প্রণয়ের সুঘ্রাণে নিজের করে নেয়
নীল-সাদার বুননে সদরপুরের কলমিলতা কুমারীমাঠ
তারপর একদিন মনে হবে রোদ্রে পোড়া বিরান মাঠের মতো
অনর্থক জেগে থাকা আমাদের-কী অদ্ভুতভাবে পোড়ায়
মহিমের ঘরের আগুন

অপেক্ষার চোখ শিল্পিত হোক

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

আমি চাই অপেক্ষার চোখ অপেক্ষাকৃত শিল্পিত হোক
মুদ্রিত হউক পৃথিবীর সকল প্ররোচিত শকুন চোখ
উঠতি কবির মতোন, সদ্য কৈশোর পেরোনো স্বপ্নবাজ
যুবকের মতোন. হাজার বেনারসি স্বপক্ষ স্বপ্ন আঁকুক!
সেই স্বপ্ন, যেই স্বপ্ন কোনো কালের ফ্রেমে বন্দি নয়
নন্দিনীর বাড়ন্ত বুকের পর্বত যুগালের গগনচুম্বী স্বপ্ন..
যে যুবকের উর্দির নিচে শেয়াল-কুকুর ঘুমিয়ে থাকে
সেই নরাধম, হতভাগা যুবকের ঘুম ভাঙানোর স্বপ্ন..!
সেই ঘুম যেই ঘুম পারমাণবিক বোমার তোয়াক্কা করেনা
তপতীর মতোন কোনো নারীর অপেক্ষায় থাকে না
বরং বসন্তের দখিনা মৃদু-মন্দ উড়নচণ্ডী বাতাসের মতো
ধান শালিকের সুললিত মায়ামি সুরের মোহের মতো
আপাদমস্তক পরাক্রমশালী ঝড় তুলতে পারে সেই ঘুম!
তবুও অপেক্ষারা অপেক্ষমাণ অপবাদ থেকে মুক্তিপাক
গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলার বিড়ম্বনা থেকে ওরা বাঁচুক....
আত্মহনন না করে চুমকির মতোন প্রতিবাদী হোক
আমি চাই অপেক্ষার চোখ অপেক্ষাকৃত শিল্পিত হোক!

মাইলস্টোন কলেজ

EIIN: 108572.

৩০ ও ৪৪ গরিব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১১, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
স্থায়ী ক্যাম্পাস : ডিয়াবাড়ি (মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন), তুরাগ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
www.milestonecollege.com, www.milestonecollege.edu.bd
facebook/Milestone College

- **শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি :** ২০০৮ সালে ঢাকা বোর্ড কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়তন দ্য নিউ ইয়র্ক একাডেমি অব সায়েন্সেস'র সদস্য স্কুল হিসেবে স্বীকৃত।
- মেধাতালিকা পদ্ধতি থাকাকালীন সারাদেশে এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মেধাতালিকায় মোট ১০বার স্থান লাভ।
- এইচএসসি, এসএসসি, জেএসসি এবং পিইসি পরীক্ষার সাম্প্রতিক ফলাফল (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম) :

এইচএসসি	২০২১ সালে পরীক্ষা দেয় ২৮৭৮ জন। পাসের হার ১০০% এবং জিপিএ-৫ অর্জন করে ১৮২৯ জন যা সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে শতভাগ পাসের এক অনন্য রেকর্ড।
এসএসসি	২০২১ সালে ১৬৩১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পাসের হার ১০০%। জিপিএ-৫ অর্জন করে ৯৯৮ জন পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ অর্জনের হার ৬১.১৮%।
জেএসসি	২০১৯ সালে পরীক্ষা দেয় ১০৭১ জন। পাসের হার ১০০% এবং জিপিএ-৫ অর্জন করে ৫৮৯ জন। জিপিএ-৫ অর্জনের হার ৫৫%।
পিইসি	২০১৯ সালে ১১৮১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পাসের হার ১০০%। জিপিএ-৫ অর্জন করে ১১৩৮ জন পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ অর্জনের হার ৯৬.৩৫%।

- *দেশসেরা কলেজগুলোর অন্যতম একটি মাইলস্টোন কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা কর্নেল নূরন্ নবী (অব.)। ফৌজদারহাট ও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্নেল নূরন্ নবী; যিনি রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ও মাইলস্টোন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে স্বপ্নকারিগর কর্নেল নূরন্ নবী স্যার বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন মাইলস্টোন কলেজের প্রকল্প পরিচালক ও উপদেষ্টা হিসেবে। মূলত: এই প্রাজ্ঞজনের হাত ধরেই মাইলস্টোন কলেজ এগিয়ে থাকছে সেরাদের সেরা হওয়ার পথে।*



- **ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা :** মাইলস্টোন কলেজের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ৪১৫ জন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ শিক্ষক-কর্মকর্তা [ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ২ জন অধ্যক্ষ, ১ জন উপাধ্যক্ষ, সরকারি কলেজের প্রাক্তন ৩ জন অধ্যক্ষ, ৩ জন কর্নেল (অব.), ৩ জন লে. কর্নেল (অব.), ৫ জন মেজর (অব.), ৯ জন সহযোগি অধ্যাপক, ৮৯ জন সহকারি অধ্যাপক এবং ৩০০ জন প্রভাষক ও সিনিয়র শিক্ষক] শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- **বিশেষ সুবিধা :** মফস্বল এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা হোস্টেল ও পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে।
- ছেলে ও মেয়েদের এবং বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের ক্লাস আলাদা আলাদা ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।
- এতিম, দরিদ্র কিন্তু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- কলেজটি এমএনআরএস ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত। মেইন ক্যাম্পাস ছাড়াও স্থায়ী ক্যাম্পাস ডিয়াবাড়িতে (উত্তরা) ৫০০০ ছাত্র-ছাত্রীর (১৫০০ আবাসিক শিক্ষার্থীসহ) সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

লে. কর্নেল মোস্তফা কামালউদ্দিন ভূঁইয়া (অব.)
অধ্যক্ষ।

প্রফেসর মো. সহিদুল ইসলাম
অধ্যক্ষ (একাডেমিকস)
প্রাক্তন অধ্যক্ষ-মির্জাপুর ও বরিশাল ক্যাডেট কলেজ।

মুহূর্তগুলো

মেহেদী ইকবাল

উপভোগ করছি সকাল
সকালের মিষ্টি রোদ
একজোড়া রুটি আর ডিম একটু আলুভাজি
উপভোগ করছি ভ্রমণ
তিন চাকার সিএনজি
পাখা নিয়ে উড়তে থাকা ধূলি
দৌড়ে ছুটে যাওয়া শহর
উপভোগ করছি সবুজ উড়ে যাওয়া বক
বালিতে মানুষের পদচিহ্ন ছোট জামথল ঘাট
উপভোগ করছি ট্রলার যমুনার ঢেউ
পট পট খাচ্ছি বাদাম দেখছি শুশুকের পিঠ
মধ্যপাড়া জেলে নৌকা অদূরে সারিয়াকান্দি ঘাট।
ছুটছি জুমারবাড়ি সোনাতলা চার মাথা তিন মাথা
ভালো লাগছে বোনারপাড়া হাতে ধোঁয়া ওঠা চা
উপভোগ করছি দিন এখন তিনটা বেজে পাঁচ
সামনে গাইবান্ধা হঠাৎ মেঘের দখলে আকাশ
দেখছি ঘূর্ণিবায়ু রাস্তায় ভেঙ্গে পড়া ডাল!
একটি দিনের স্মৃতি
অবিকল ফিরবে কি আর?
নিরন্তর ছুটছি আমি
উপভোগ করছি সবই
কখনো নীরবতা, অন্ধকার
মুহূর্তগুলো কত না মূল্যবান!
বিমুগ্ধ শুনছি এখন
ঝিঁঝিদের গান!

মরু ও গিরির আগুন

জেএম আজাদ হোসেন

কি নিবিড় দ্রোহ তোমার রক্তের ভেতরে!
কিন্তু চোখের ভেতরে?
অদ্ভুত নির্লিপ্ততা
যেন রাত পোড়ানো আগরের ছাই;
যেন শ্মশান ফেরত মানুষের কংকাল।
এভাবে নয় বন্ধু, এভাবে নয়
তাকাতে হবে তির্যক সমুখ সরণির দিকে
তেতে ওঠা পিচঢালা পথ থেকে পাঠ নিতে হবে, প্রতিক্রিয়ার
আহত পাখির ডানা থেকে শিখে নিতে হবে আর্তচিৎকার
চোখ দুটোকে দেখে যেন মনে হয়
প্রতিক্রিয়াময় মহাকাল
আর্যের অঙ্গুরীয় ত্যাগ করে
সহজেই যে-কিনা দাঁড়াতে পারে
গণ-মানুষের কাতারে।
কি নিবিড় শব্দ-সৌধ তোমার লেখনীর ভেতর
একটা মহাকাব্য লিখতে চেয়ে চয়ন করেছ
অশ্রুত সব শব্দরাজির;
ওখানে নেই কোনো বাজপাখির চোখ
রোদে পোড়া অরণ্যময় মরুবৃক্ষের থাবা
নেই দ্রোহের নখর, ইস্পাতে কাটা পাথরের চাঁই
নেই কোনো রাজদণ্ড পাওয়া দ্রোহীর পলায়ন।
মৌফুলের মক্ষিকাদের গান দিয়ে
ঝরে পড়া বকুলের রাত্রিগন্ধ দিয়ে
আর যাই হোক মহাকাব্য হয় না।
একটা মহাকাব্য লিখতে চাইলে
তোমার থাকতে হবে বিষপানে নীল হবার সাহস
হতে হবে হিলশৈল'র চূড়ার মতো ঋজু ও উদ্ধত
বুকের ভেতরে পুষতে হবে শেকল ভাঙ্গার গান
সেই তুমিই হবে দিগ্বিজয়ী
গহীন অন্ধকারের ভেতরে জেগে থাকা
আগুন রঙের তারা।
একটা মহাকাব্য লিখতে চেয়ে
বুকের ভেতরে আমার এখন
মরু ও গিরির আগুন।


মমতাজ
হারবাল প্রোডাক্টস
রাঙ্গা হাতের রূপকথায়, জীবন ভরু আজ আলতা রাঙ্গা পায়ে...
www.facebook.com/mumtazherbal
www.youtube.com/c/MumtazHerbalProducts
www.mumtazherbal.com



পবিত্র ঈদুল-ফিতর
উপলক্ষে
সবাইকে জানাই
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ঈদ মোবারক

Letter n Colour Ltd.
Adding life to paper

Head Office :
43, Shilpacharya Zainul Abedin Sarak
(Old 16, Shantinagar), Dhaka-1217
Phone : 9335826, Fax : 8318526
Web : www.lcl.com.bd



শেখ সিরাজ উদ্দিন
চেয়ারম্যান




এইচআরসি ক্লিভডন চা আসে সরাসরি ক্লিভডন চা বাগান থেকে। ক্লিভডন চা বাগান তার গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদনের জন্য বহু বছর ধরে চট্টগ্রাম নিলামে ১নং চা বাগান হিসেবে পুরস্কৃত হয়ে আসছে। তাই এইচআরসি ক্লিভডন চা মানে ১নং বাগানের ১নং চা। চুমুকেই যে চা আপনার মুহূর্তকে ভরিয়ে দেয় নতুন সজীবতায়।
১৯৯১ সাল থেকে
ক্লিভডন চা
800 গ্রাম
HRC
CLEVEDON
TEA
বাংলাদেশের
১ নং বাগানের ১নং চা
শ্রেষ্ঠ বাগানের শ্রেষ্ঠ চা

আমার শুধু হারিয়ে যায়

শিউলি মনজুর

আমি শুধু হারিয়ে ফেলি, আমার শুধু হারিয়ে যায়
আমি শুধু ধুলোবালি মেখে বাড়ি ফিরি আর শীত আসার আগেই
দীর্ঘশীতের দীর্ঘশ্বাস আমাকে ছুঁয়ে যায় যথারীতি।
এবং কোনোরূপ প্রসঙ্গ ছাড়াই আবাহনী-মোহামেডানের
খেলা দেখতে দেখতে হারিয়ে যায়
স্মৃতিমাখা মানিব্যাগ, শিউলী ফুলের সু-ঘ্রাণ
এবং কোনোরূপ নিম্নচাপ ছাড়াই যখন তখন হারিয়ে যায়
কৈশোরের সূচিপত্র, নদী মোহনার গল্প
অথচ দেখো, ছুটতে ছুটতে আজও পৌঁছুতে পারিনি
তোমার বাড়ির খুউব কাছাকাছি
অথচ দেখো, কোনোরূপ প্রতিভা ছাড়াই ওরা দিব্যি
হাত বদলের অনুশীলন করতে করতে
পৌঁছে গেল জাহাজঘাটের সীমানায় এবং এই আমি
দেখতে দেখতে কোনোরূপ ঈর্ষা ছাড়াই তোমাকে হারিয়ে ফেলি,
আমি শুধু হারিয়ে ফেলি, আমার শুধু হারিয়ে যায়
মনে হয়, মনে হয় ঋতু অভিধানে শুধুই শীত, দীর্ঘশীতের দীর্ঘশ্বাস

আত্মভ্রমণ

এমরান হাসান

দানীং খুব বেশি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মনে হয়
শস্যের সুঘ্রাণ।
নিজেকে বহুদিন প্রকৃতির সবুজের ভেতর
সঁপে দিতে দিতে আবিষ্কার করিনি দীর্ঘকায়
সত্যের পরিণামে। একসময় ঘুম এবং
রোদের ভেতর ডুবতে ডুবতে পৌঁছে
গিয়েছিলাম পুরনো রংচটা ধুলোর আঙিনায়।
সেখানে আমার মাতামহের অস্থি আর
পিতার শেষ দীর্ঘশ্বাস ঝুলে আছে। যেরকম
ঝুলে থাকে বহু পুরাতন দিনপঞ্জি কিংবা
আলোকোজ্জ্বল এক দৃশ্যের পরমায়ু।
নিজের আকাশকেই এই চুনখসা পুরনো
সাদাটে ছাদের মতোই স্যাঁতসেঁতে মনে
হয়, যেন সব গল্পই ছড়িয়েছে তার অনন্ত
অগন্তব্যে। একজন্ম আলোর বিপরীতে
জেগেই থাকে সমুদ্র-অন্ধকার...
নিজের ছায়া মাড়িয়ে নিজেই কেমন আটকে
গেছি দাসত্বের দাবা-ঘরে! শৈশব-মার্বেলের
মতোই কে যেন টুপ করে তলিয়ে যায়
ইসা'র পুকুরে। বৈষম্যের সুবর্ণরেখায় ছিঁড়ে
যাওয়া বিশ্বাসের পালকে লেগেছে যে
ক্ষয়িষ্ণু আয়ুর সংকেত। অনেক খুঁজেও
শেষাব্দি তার ছায়াটুকুই কুড়িয়েছি জলের
স্রোতে। সে বর্গফলেও নিঃশর্ত মুক্তি মেলে
না আমার।



পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে

TOYO INK & CHEMICALS BANGLADESH LTD

এর পক্ষ থেকে

জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

ঈদ মোবারক

TOYO INK & CHEMICALS BANGLADESH LTD.
Sheetfed & Web offset Printing Ink Manufacturer
83, Uttar Rajashan, Savar, Dhaka-1340
e-mail : ticb.ltd@gmail.com

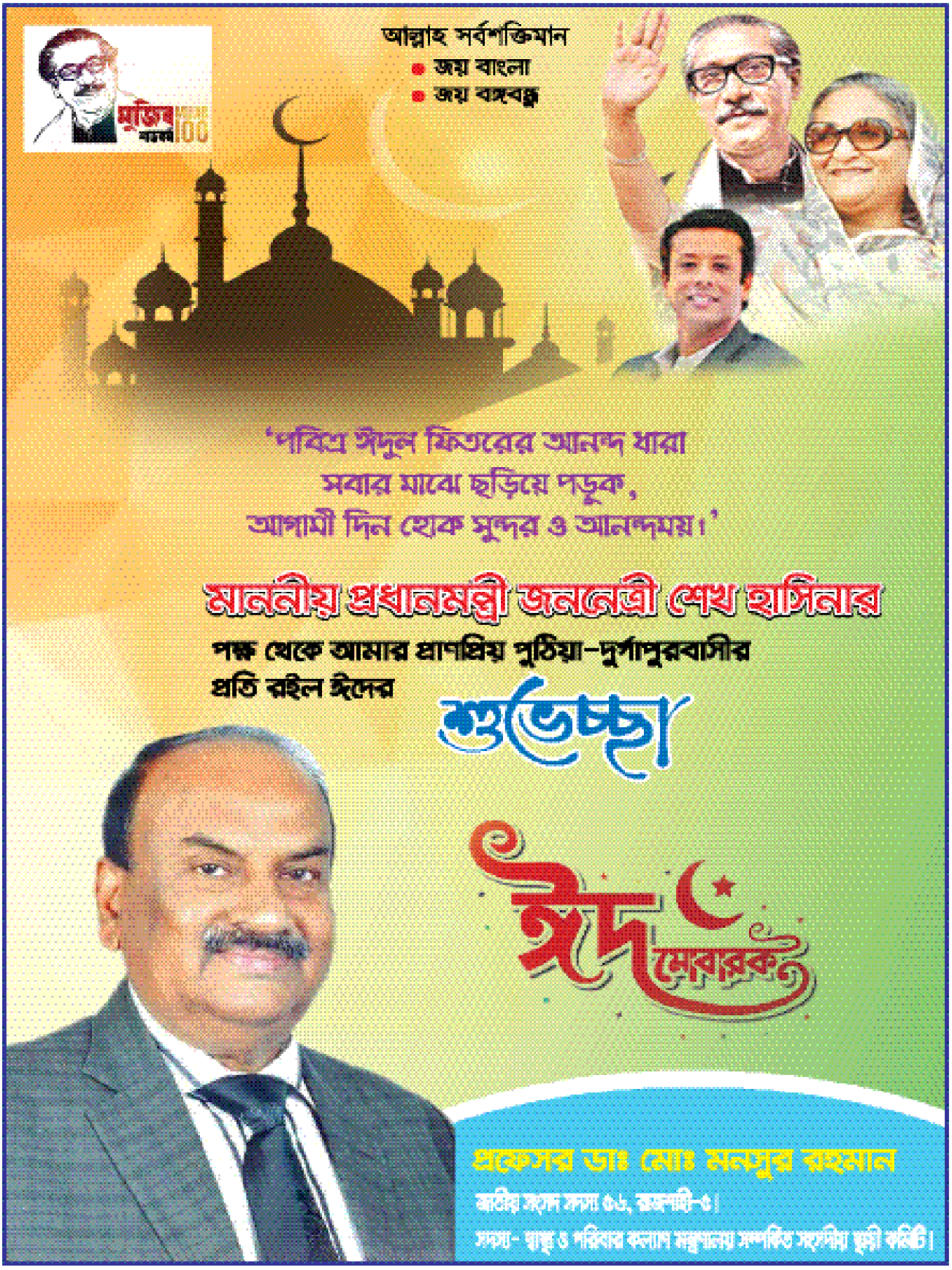
আল্লাহ সর্বশক্তিমান
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
‘পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দ যারা
সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক,
আগামী দিন হোক সুন্দর ও আনন্দময়।’
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার
পক্ষ থেকে আমার প্রাণপ্রিয় পুঠিয়া-দুর্গাপুরবাসীর
প্রতি রইল ঈদের
শুভেচ্ছা
ঈদ মোবারক
প্রফেসর ডাঃ মোঃ মনসুর রহমান
জাতীয় সংসদ সদস্য ৬৬, রাজশাহী-৬।
সদস্য- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।


আল্লাহ সর্বশক্তিমান
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
ঈদ মোবারক
সকলকে জানাই পবিত্র
ঈদ উল ফিতরের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
কিংবদন্তি রাজনীতিক সাবেক এমপি
আলহাব হোসেন গোলন্দাজ সাহেবের সুযোগ্য উত্তরসূরি
ফাহ্‌মী গোলন্দাজ বাবেল এমপি
সভাপতি
গফরগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগ



উপন্যাস

অনুবর্তন

আহমদ বশীর

॥ ১ ॥

অডিও স্টার্টস। না ভিডিও অংশ পাওয়া যাচ্ছে না। ফর সাম আনঅ্যাভয়েডেবল রিজন। এই কনফেশনের শুধু কথোপকথনের অংশই শোনা যাবে। যেহেতু এই অডিও ক্লিপসে ৩ জনের কথোপকথন, মাঝে মাঝে শুধু ২ জনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়- কখনো কখনো মোবাইলের রিং টোন শোনা যেতে পারে। এ ছাড়া বাইরের কোনো শব্দ এখানে আসেনি, কেননা সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিওটা একটা বদ্ধ প্রকোষ্ঠে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় রেকর্ড করা হয়েছিল।

এই মেয়ে এখানে বসো। ওই টুলটায় বসো। আর সালমা এবার শুরু করেন। ইভিডেন্সগুলো হাতের কাছে রাখেন। ধারা কত? পিসি ৩০২, আবার সেকশন ১২৪ ক হতে পারে। ১৮৭৮ বিস্ফোরক আইন..। এফ-আই-আরের কপি? ইয়েস- ঠিক আছে। সিজার লিস্ট?

স্যার এই যে সিজার লিস্ট।

হু । রেইড হইছিল কয়টায়?

শেষ রাত্রে স্যার। তিন দিন ব্লক ছিল। তিন দিন পরে শেষ রাত্রে অ্যাকশন শুরু করা হয়।

ও আচ্ছা। ইন্সপেক্টর সালমা প্লিজ হেল্প মি। কখনো কখনো পয়েন্ট টুকে নিয়েন। এখন আমাকে দেখানোর দরকার নেই। পরে একলগে ফলো-আপ করুম।...ক্যাজুয়ালটি? লাশ পাওয়া গেছে কয়টা?

বিস্ফোরণের পর ঘরের ভিতর লাশগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ওদের সুরতহাল রিপোর্ট পাওয়া কঠিন ছিল। তবু ৪টা লাশ আইডেন্টিফাই করা গেছে। কিন্তু ফোর্থ ওয়ান একজন মিসিং।

প্রশ্ন হলো ওই পলাতক লোকটা কে? সেই কি মাস্টারমাইন্ড? পালের গোদা বা মন্ত্রণাদাতা। সেই একমিসিং লোকটার জন্যই আজকে আমরা এই মেয়েটাকে ইন্টারোগেশন করব।

ঠিক আছে স্যার। শুরু করি?

করেন।

এই মেয়ে, তোমার নাম কী? চুপ করে আছো ক্যান? বলো।

আমার নাম আছিল হামেলা। হামেলা খাতুন।



স্ট্রেঞ্জ। এজাহারে তোমার নাম খাদিজা খাতুন। স্বামী মৃত- মারেফত হাওলাদার। সাং তেগুনবুনিয়া। আর তুমি বলছো হামেলা!
আপা, আমার আসল নাম হামেলা। বাবায় সেই নাম রাখছিল। কিন্তু বিয়ার পরে আমার স্বামী আমার নাম বদলাইয়া রাখছে খাদিজা। কইছে হামেলা নামটা খারাপ। ওই নামে মানুষ স্বর্গে যাইতে পারে না। হের লাইগ্যা উনি খাদিজা কইয়া ডাকতেন।
বাচ্চা কয়টা?
একটাই। ওই গেন্দা।
বাচ্চার বয়স কত?
প্রায় ১ বছর হইবো। আমি তো বিয়ার পর আর কোনো দিন মাসের হিসাব রাখতে পারি নাই। উনি আমারে কইছেন সৃষ্টিকর্তার দিনরাত সবসমান। দিন-তারিখের হিসাব রাখা ঠিক না।
ওখানে ওই বস্তিতে কত দিন হলো এসেছিলে বলতে পারো?
না স্যার- সঠিক কইরা বলতে পারি না। মনে হয় চার-পাঁচ মাস। স্বামী আমারে কিছুই কইতো না। শুধু বলত, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকবো। কেউ যেন ঘরের ভিতরে কিচ্ছু দেখতে না পারে।
এর আগে কোথায় ছিলে?
আগে- মনে করেন কয়েক জায়গায় থাকছি। বলতে গেলে দুই মাস তিন মাসের মধ্যে উনি বাড়ি পাল্টাইতেন।
এ্যাই চুতমারানী মাগি- একটা মিথ্যা কথাও কবি না কলম। আমি কিন্তু হাবিলদার-টাবিলদার না। আমি ইস্পিশালে কাজ করি । মিথ্যা কবি তো জিব্বা টাইনা ছিঁড়া ফালামু।
আমি মিথ্যা কই নাই। বিশ্বাস করেন। মিথ্যা কইনাই।
এই যে হান্টার দেখছস? একদম হান্টার মাইরা দিমু। এ্যাই আবার কী হইছে কথা কস না ক্যান?
সত্য কথা বলি। আমারে কুনদিন ঠিকানা দেয় নাই। আমি বাড়ির বাইরের কেউরের লগে কথা কই নাই। কইতে পারি নাই। আমি ঘরথে বাইর হইছি বোরখা পিন্দা।
বোরখার ভিতর থেইক্যা কিছু দেখিস নাই! কী

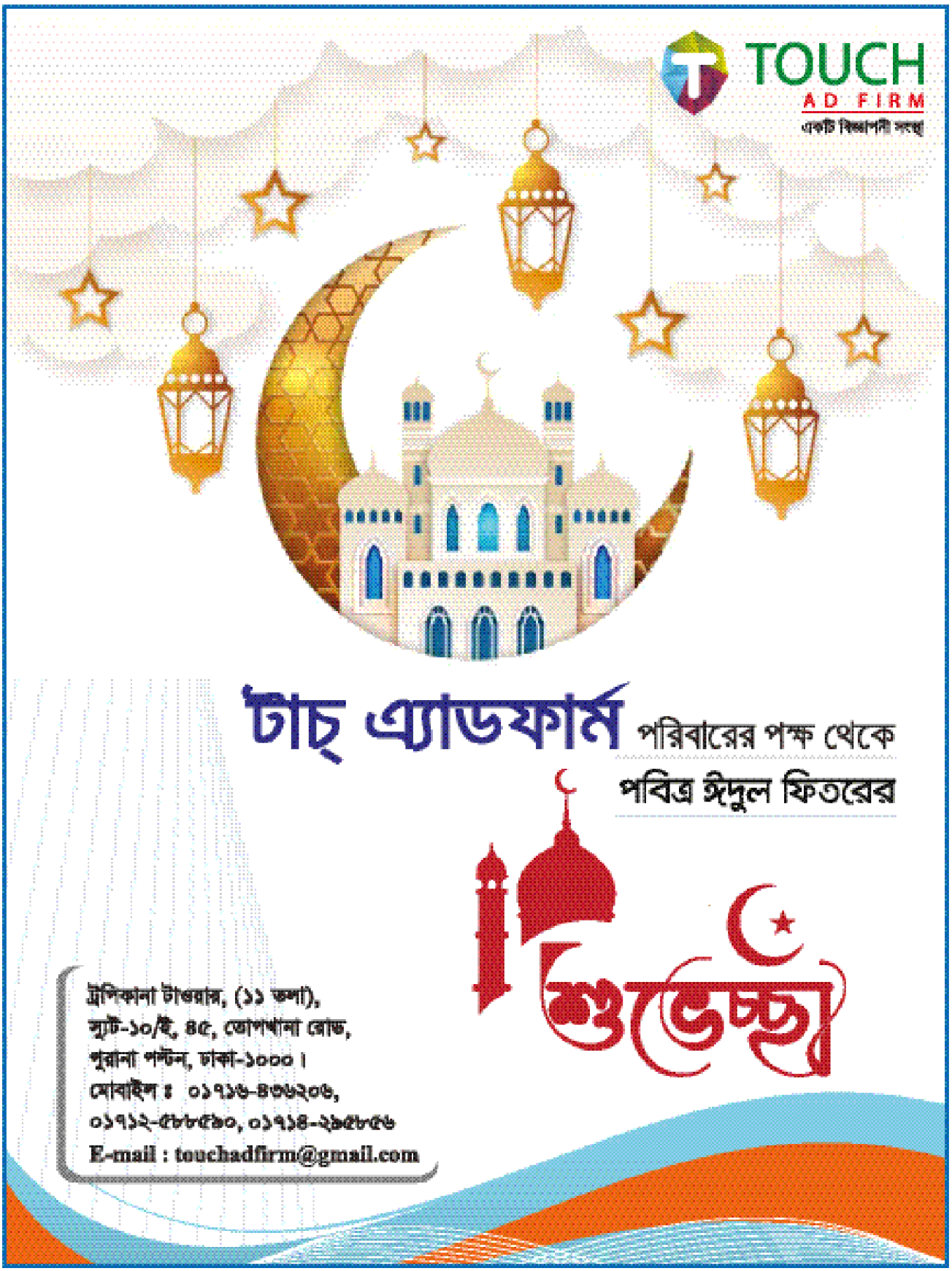
TOUCH
AD FIRM
একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা
টাচ্ এ্যাডফার্ম পরিবারের পক্ষ থেকে
পবিত্র ঈদুল ফিতরের
শুভেচ্ছা
ট্রপিকানা টাওয়ার, (১১ তলা),
স্যুট-১০/ই, ৪৫, তোপখানা রোড,
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৭১৬-৪৩৬২০৬,
০১৭১২-৫৮৮৫৯০, ০১৭১৪-২৯৫৮৫৬
E-mail : touchadfirm@gmail.com

হাবিজাবি বলছিস?
বোরখার ভিতরে থাইক্যা ফুটা দিয়া দেহা যায়- কিন্তুক বুঝা যায় না। আমি কিছু জিগাইলে আমার মরদ কইতো, চোপ তর এতো কতার কাম কী? তুই ভাত রাধবি- বাচ্চা রাখবি- সৃষ্টিকর্তার কাম করবি।
আর তোমাদের সঙ্গে যে আরেকজন ছিল...
ছোট সাহেব?
হ-সেই লোকটার নাম কী? তুমি জানতে?
না জানতাম না।
সত্য বলো। হান্টার দেখছো? গরম পানির নাম শুনছো? গরম পানির ছ্যাকা পাইলে ভ্যারভ্যারাইয়া সবকইয়া দিবা।
সত্যি বলি। আমার স্বামী তারে ছোট সাহেবকইরা বলতেন?
আচ্ছা তোমার গ্রামের বাড়ি কই?
আমার দ্যাশের বাড়ি জামালপুর। যমুনার চরে। আমাগো আসল বাড়ি নদী খাইয়া ফেলাইছে। জমি হারাইয়া বাবায় তারাকান্দির ঢালে যে ওয়াপদার বাঁধ দিছিল সেই বেড়ি বান্ধের ওপর বাঁশের চৌচালা ঘর বানাইয়া থাকতো।
ওয়াপদার বাঁধে? তার মানে তোমার কোনো অ্যাড্রেস নাই। ঠিকানা নাই? দাঁড়াও আমি একটা সিগারেট খেয়ে নেই। সালমা, আপনার সমস্যা হবেনাতো!
না স্যার! আপনি সিগারেট খান।
আচ্ছা, এ্যাই মাতারি বলো। কনটিনিউ।
আমরা ওই পোল্ডারের মধ্যে লাউ, শাক, ভেণ্ডি গাছ লাগাইতাম। পাইপ্যা.. আরও কত তরিতরকারি। একদিকে নদীর ঢেউ, অন্যদিকে ফসলের মাঠ। পোল্ডার...
পোল্ডার? পোল্ডার কী?
পোল্ডার চেনেন না? পোল্ডার ওয়াপদা পানি উন্নয়নের লোকেরা বানায়। চারদিকে বাঁধ দিয়া গোল কইরা রাখে- বানের পানি যেন ঢুকতে না পারে। বাঁধের মাঝে লোহার দরজা থাকে। পানি লাগলে লোহার দরজা দিয়া ঢুকায়, আবার সময়মতো দরজা বন্ধ কইরা দেয়।
ও আচ্ছা। বেড়িবাঁধ। তা তোমরা ওই পোল্ডারে কীভাবে জায়গা পাইলা?
কেউ দেয় নাই। আমরাই চরভাঙ্গা লোকজন ওহানে থাকছি। বাঁধতো পইরা আছিল। লোকজন থাকতো না.. ধু-ধু..বালু আর মাটি। সবুজ সবুজ ঘাস আর কাশবন। যমুনার গাঙ্গে ঘর হারাইয়া আমরা প্রথমে লঙ্গরখানায় থাকতাম। পরে আমরা পোল্ডারে আইসা থাকি। একজন দুইজন কইরা অনেক পরিবার..
তোমার বাবা কি করত?
আমার বাপে কিছু করত না। ঘরে শুইয়া থাকতো। তার মাজায় বিশ আছিল। কাম করবার পারত না। ঢোল্লা পানজাবী আর মাথায় টুপি দিয়া দেশের কুথায় কুথায় চইলা যাইতো... আবার অনেকদিন পরে ঘরে আইস্যা পইরা পইরা ঘুমাইতো। মায়ে বাড়িতে বাড়িতে কাম কাজ-কইরা ট্যাকা আইনা খাওয়াইছে। মায়ে একবার ওহানো গেরামিন ব্যাংক থেইক্যা ট্যাকা লইয়া মুদিমালের ব্যবসা করছে। বাবায় পরথমে এই কথা শুইন্যা মায়রে খুবকইরা পিটাইছে। মায়ের মুখে রক্ত বাইর হইছিল। মায়ের পিঠে খালি লাথি দিছে। কইছে এনজিও থেইক্যা ট্যাকা লওয়া হারাম। ওরা সুদ খায়- মাইনষেরে খ্রেস্টান বানায়। হ্যাশে মাইর খাইয়া মায়ে অন্য বাড়িত গিয়া লুকায়া থাকছে।
তারপর?
তারপর বাপে খবর পাইয়া একদিন তার চুল ধইরা মারতে মারতে আবার ঘরে টাইন্যা আনছে। পাড়ার লোকজন দেখছে- আর হাসছে।
ইন্সপেক্টর সালমা। নোট করছেন? ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু মৌলবাদ মনে হচ্ছে।
স্যার, কী যে বলেন! লোকটা অসুস্থ ছিল, গরিব ছিল..
আহ ওই হলো মৌলবাদ। খাদিজা তুমি বলো। চালায়া যাও।
কিছুদিন পরে বাবার অনেক বিমার হইলো। গলা দিয়া রক্তবমি হয়। প্যাটে কিছুই থাকে না- কিছু খাইতে পারে না। মা-বাবারে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে লইয়া গ্যাছে। ডাক্তার ট্যাকা চাইছে। মায়ে তখন আবার গেরামিন ব্যাংক থেইক্যা লোন নিছে। বাপের চিকিচ্ছা করাইছে হেই লোনের ট্যাকায়।
তারপর তোমার মা সেই লোনের ট্যাকা কেমনে শোধ করলো।
না পরথমে শোধ করে নাই। বানের কারণে প্রকল্প নষ্ট হইয়া গ্যাছে বইলা ট্যাকা মাপ করছে এনজিও। পরে আবার লোন নিয়া নতুন কইরা রাখিমালের ব্যবসা করছে।
তখন তোমার বাবা কিছু বলেনি?
বলছে, প্রত্যেকদিন মায়ের বাপ-মা তুইল্যা খারাপ গালি দিছে। হারামজাদি- খানকি- ওই এনজিওর ট্যাকার উপর আল্লার ঠাঠা পড়বো। তুই সব হারাইয়া রাস্তার ফকিন্নি হইবি। মরণের পর তর কবরে শয়তান আইস্যা এক হাজার বছর ধইরা মুতবো আর মুতবো।
আচ্ছা, এই মেয়ে, এবার একটু বিরতি নাও। এখন তোমার কাছ থেকে ওই ছোট সাহেবের আইডেনটিটি চেক করবো। এই যে এখানে চারটা ছবিআছে, বলতো কোনটা ছোট সাহেব? ভালো করে দেখো।... দেখেছো? কোনটা ছোট সাহেব?
একটাও না। ছোট সাহেবের ছবি এ্যাহানো নাই।
কী বলে মেয়েটা? একটাও ছোট সাহেবের ছবি না!
ছোট সাহেব দেখতে কেমন ছিল?
ছোট সাহেব দেখতে কালো আছিল। উনার দাড়ি আছিল থুতনিতে। উনার চুলের মধ্যে ঢেউ ঢেউ খেলা করতো।
উহ্- এসব তো কমন! মেয়েটা যে কী বলছে! আচ্ছা তোমার লেখাপড়া কী? কদ্দুর লেখাপড়া করেছো?
আমি আমাগো পোল্ডারে কাটাখালি কওমি মাদ্রাসায় লেহাপড়া শিখছি। কাটাখালি উম্মুল কোড়া কওমি মাদ্রাসা।
কী লেখাপড়া শিখছো?
আমসিপারা, নজেলা, তারপর হেফজো
বাংলা, ইংরেজি?
আরবি, উর্দু, বাংলা ইংরেজি পড়ছি। স্বরে-অ স্বরে-আ এবিসিডি শিখাইছে। তারপর তাযকেরাতুল আম্বিয়া। পর্দার উপকরিতা।.. .. ..
বাহ-বাহ- দারুণ কম্বিনেশন! বাপে মাথায় টুপি লাগায়া দ্যাশবিদেশ ঘোরে, মায়ে করে এনজিও, মাইয়ায় পড়ে মক্তবে তাযকেরাতুল আম্বিয়া। মাতারি কয় কী?
স্যার, প্লিজ ল্যাংগুয়েজ!
ওহ্ সালমা। আচ্ছা এবার একটু বিরতি নেই।

॥ ২ ॥

ওকে। দেন, আবার শুরু করতে পারি স্যার?
ওকে করো।
আচ্ছা খাদিজা, তোমাদের বাড়িটা রেইড করার সময়- তুমি কোথায় ছিলে?
রেইড কী বুঝলাম না আপা?
আমরা যখন তোমাদের বাড়ি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলি, আমাদের লোকজন যখন তোমাদের ঘরে ঢোকে।
তখন আমি গেন্দারে দুধ খাওয়াইতাছিলাম। আপনেগো বন্দুকের শব্দে আমার গেন্দা কাইন্দা ওঠে। গেন্দার বাপ হারিকেন লইয়া ওই লোহার আলমারিটা খুইলা কী যেন বাইর করে। আমি বুঝবার পারি নাই। তারপর উনি লাইট বন্ধ কইরা দেয়...
এ্যাই হারামজাদি- আবার মিথ্যা কথা! ডাণ্ডা দ্যাখছিস। এইডার একটা বাড়ি খাইলে বুঝবি মিথ্যা কথা কারে কয়।
স্যার, আমি মিথ্যা কই নাই। লাইট বন্ধ করলে আমি কিছু দেখি নাই।
এবার শোন, আমি ইন্সপেক্টর সালমা বলছি। আমি কিন্তু তোমাকে বুঝেছি। আমি বলছি- তুমি সত্যি কথা বলতে ভয় পেওনা। আমি তোমাকে সব ধরনের আশ্বাস দিচ্ছি। কাউকে ভয় পাইও না। ঠিক আছে?
সালমা আমাকে লাঠিটা দেন, আগে ঠিকমতন পিটায়া লই। তখন সব সত্য কথা বলবেমাগি।
ঘরের মধ্যে অস্ত্র পাওয়া গেছে, গ্রেনেড ছিল আলমারিতে। এখন বলে কিছু জানি না।
আল্লারে মারে... স্যার আমারে মাইরেন না স্যার। স্যার মাইরেন না আল্লার দোহাই... আমি কিছুই জানি না বাপজান আমারে সাদি দিছে। বাপজান... এ্যাই হারামজাদি তোর বাপ সাদি দিছে তো কী হইছে তুই সব জানিস। বলছিস না ক্যান!
আচ্ছা সত্য কথা এখন বলার দরকার নাই। তোমার ক্যামনে বিয়া হইলো কও খাদিজা, স্যার তোমাকে আর মারবেনা। স্যার প্লিজ ওকে আর মাইরেন না কিছু কইতে দ্যান।
আচ্ছা বলো...
আমি ওই পোল্ডারে কাটাখালি পাড়ার বাজারে কলসি পিঠা আর পুয়া পিঠা বিক্রি করতাম। আমার লগে আমার ছোট ভাই রাকিব থাকতো। আমি সেলোয়ার কামিজ পইড়া মায়ের একটা উড়না আছিল, হেইডা মাথায় দিয়া বাজারে যাইতাম। পিঠা বিক্রি করনের লাইগ্যা। মায়ে সব পিঠা বানায়া একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে দিত- আর আমি হেইগুলা হাটে নিতাম। আমার ছোট ভাই একটা থালা হাতে নিয়া রওনা হইতো, তো বাজারে আইসা আমরা একটা কোনায় হেই পিঠাগুলা বিক্রি করতাম। বিকাল বেলা আমারে মাও লইয়া যাইতো সাদেক ব্যাপারির বাড়িতে সেখানে কাপড়ে রং করার কাজ করতাম, দুই ঘণ্টা কাপড়ে রং মাখাইলে আমাদের ১০০ টাকা দিত, কাপড়গুলা সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে লইয়া বিক্রি করত সিরাজ মামা।

সিরাজ মামা কে?
সিরাজ মামা তো ওই মোটা মতন ব্যাডা। রং দেয়া কাপড়গুলা পিঠে লইয়া সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে বিক্রি করতে যাইতো..... তো সে হইলো গিয়া আমার পরম শত্রু।
পরম শত্রু?
হ- আমার জীবনের পরথম শত্রু। মায়ে আমারে কইছিল- ওই ব্যাডার লগে কুন কথা কবি না। ব্যাডার চোখে চোখ পড়তে দিবি না। আমি কিছুতেই চোখে চোখ পড়তে দিতাম না। কিন্তু একদিন তার চোখে চোখ পড়লো। একদিন বৃষ্টির মধ্যে আমি রং করা কাপড় লইয়া যাইতাছিলাম। এ্যাই মাইয়া, ছোট সাহেবের কথা বল। তোর এসব বানানি কথা শুনতে চাই না। কোথাকার সিরাজ মামা নাকি? ওর কথা বলে অনর্থক সময় নষ্ট।
স্যার, প্লিজ ওকে একটু বলতে দেন।
আহ। তুমি ইন্টারোগেশনের মেথডটা জানো না। ওর এখন ফার্স্ট ডিগ্রি মেথড দরকার। টাইম ইজ ভেরি শর্ট। ছোট সাহেব, ছোট সাহেব নামের লোকটা ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হেয়ার। টাইম ইজ ভেরি শর্ট। মিডিয়া অলরেডি অ্যানাউন্স করে ফেলেছে। মেইন কালপ্রিট ধরা পড়েছে। তো আমাদের জাস্টিফাই করতে হবে না!
স্যার প্লিজ একটু... সাইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স না আসলে ওর কনফেশনটা রিয়ালিস্টিক হবে না। আচ্ছা। এ্যাই সিক্স থ্রি নাইন এইট ফোর- ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। সাত নম্বরে এটা সিরিয়াল নেও। আমি ড়- নিয়ে আসছি।
সেদিন আমাগো কাটাখালি বাজারের সামনে পোল্ডার ভাইংগা গেছিল। ওখান দিয়া খালি নদীর পানি আইয়া ঢুকছে। পানি আর পানি, বন্যার পানি। পাম্প হাউসের জহুর আলী কাকা পানি দেইখ্যা শহরে ওয়াপদা অফিসে খবর দিবার জন্য গ্যাছে । এদিকে স্লুইস গেট খোলা- কেউ গেট তোলনের নাই। দুপুরের মধ্যে পানি আইয়া পোল্ডারের মইধ্যে ধানখেত সব ডুবাইয়া দিল। আমি আমার ছোটভাই পাম্প হাউসের দিকে দৌড়াতে থাকি। তখন সিরাজ মামা আহে আমাগো পিছ পিছ। আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি। আমার ছোটভাই আমার হাত ধইরা কাঁপতে থাকে। কয়েকটা ছাগল আইস্যা ওই পাম্প হাউসের ভিতরে ঢুকছিল, আমি আমার ছোট ভাইকে ওই ছাগলের বাচ্চার লগে মিল্যা থাকতে বলি। তখন সিরাজ মামা আহে, তার মাথায় গামছার ফেট্টি, সিরাজমামা আমার হাত ধইরা টান দেয়। আমি তার চোখে চোখ রাইখ্যা বলি, মামা, আপনে আমার মামা, আমারে ছাইড়া দ্যান- আমি আপনার মাইয়ার মতন। আপনে আমার বাপের মতন। সে কোনো কথা শোনে না। তার মুখ দিয়া লোল ঝরতাছিল। ব্যাডায় একটা আজদাহা সাপ। আমি চিৎকার দিই। আমারে বাঁচান, তখন বানের পানিতে একটা নাও যাইতেছিল- নতুন বানের পানিতে নাও চলছিল ভালো - তারা আমার চিৎকার শুইন্যা পাম্প হাউসের সামনে আহে। তারপর আমারে দেখে। আমি দেখি নাওয়ের ভিতরে আমাগো গেরামের কয়েকজন পুরুষপোলা। তারা আইস্যা আমাগো বাঁচায়। আমারে একটু পানি দেন আপা। আমার গলা শুকায়া গ্যাছে।
খাও পানি খাও।
আহ্ ছোট সাহেবের কথা বলো। এই যে পিকচার... তুমি এই লোকটাকে ছোট সাহেব বলছো?
ঠিক কি না!
নাহ স্যার। এইটা ছোট সাহেবের ছবি না।
ছোট সাহেবের আসল নাম কী?
আসল নাম জানি না। আমি উনারে ছোট সাহেব কইতাম। আমার স্বামী উনাকে ছোট সাহেব কইরা বুলাইতো। আপা আমি একটু পানি খাইয়া লই।
তুমি জানো, ছোট সাহেবের ঠিকানা কোথায় ছিল...অ্যাড্রেস?
স্যার, উনাগো কথা ঠিক ছিল না। এহেক জনের কাছে এহেক ঠিকানা কইতো। এক ঠিকানায় বেশিদিন থাকতো না।
তোমারে কী কইছে?
আমারে... আমারে...কিছুই কয় নাই।
তোমার সাথে কথা হয় নাই?
হইছে। তয়...
তয় কী? তুমি না ভাত রাইন্দা তাকে খাওয়াইতা? তুমিই তো বলছো।
স্যার, ভাত রাইন্দা দুপুর ১টার সময় ঘরের দরজা খুইল্যা দরজার বাইরে টিফিন কেরিয়ারে খানা রাইখ্যা, একটু লবণ আর কাঁচা মরিচ রাইখ্যা- আমি চিক্কুর দিতাম- খানা হইছে এ এ এ - খানা রান্দা শেষ এ এ এ ... অহন কেউ খাইলে খাইতে পারেন। এই বইলা আমি লাফ দিয়া ঘরে ঢুইকা দরজা বন্ধ কইরা দিতাম। কিছুক্ষণ পর একটা শব্দ শুনতাম- উনি হেই টিফিন কেরিয়ার লইয়া যাইতেছেন, অড়ড় উনার খাওন শ্যাষ হইলে উনি আবার খালি টিফিন কেরিয়ার রাইখ্যা দরজা একটা টুকা মাইরা চইলা যাইতেন। ব্যাস।
প্রতিদিন এইভাবে বলত?
হ- যেদিন আমার স্বামী ঘরে থাকত, সেদিন আমি রান্না ঘরে লুকায়া থাকতাম। আমার স্বামী ছোট সাহেবের লইয়া ভাত খাইতেন। ধর্মের কথাবার্তা কইতেন।
তো ছোট সাহেবের বাড়ির খবর পাইলা তুমি ক্যামনে? এ্যাই চুপ করে আছো ক্যান? খাদিজা- এ্যাই খাদিজা... এ্যাই খাদিজা। সালমা দেখেনতো মেয়েটার কী হলো শুয়ে পড়লো ক্যান?
স্যার আমার মনে হয় ও খুব ক্লান্ত। আজকে থাক কালকে আবার ইন্টারোগেশন করব।
আচ্ছা।

॥ ৩ ॥

আচ্ছা এবার বলো তোমার বিয়ে হলো কীভাবে?
হেই দিন যখন পাম্প ঘরে আমারে আমার ছোট ভাইরে আর সিরাজ মামাকে ওই নাওয়ের লোকগুলা পাইলো- তো তারা আমারে সিরাজমামার থেইক্যা লইয়া আমাগো গ্রামে পৌঁছায়া দিল। গ্রামে তখন বন্যার লাইগগ্যা সবাই জানপ্রাণ মছিবতের মধ্যে পড়ছিল। তো আমাকে লইয়া কেউ আর কিছু কয় নাই। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে বানের পানি যখন থৈ থৈ করে সবাই চুপচাপ ঘরের মধ্যে ঘুমায় আর নৌকা দিয়া নঙ্গরখানা থেইক্যা খিচুড়ি আইন্যা খায়। হেইসময় একদিন শুক্কুরবার আমার বাপে সাঁতার দিয়া মসজিদে জুম্মার নামাজ পইরা আইলো। তারপর ঘরে ঢুইক্যাই পরথম মায়ের চুল ধইর‍্যা টানতে টানতে আবার লাথি দিতে শুরু করলো। তারপর থাপ্পড় দেয়। তারপর লাথি দেয়। আবার থাপ্পড় দেয়। আমি চিক্কুর মাইরা তার পায়ে পরি- মায়ে কিছু বুঝে নাই। মায় মার খায় আর কয় কী হইল আমারে মারেন কেন? কী হইল? আমারে মারেন ক্যান? তখন আমি আমার বাপের পায়ে পরতেই বাপে আমার চুল ধইরা মাইর দিতে শুরু করলো। লাথি খাইয়া আমি মাটিতে শুইয়া পড়লাম। তখন বাপে চিৎকার দিয়া মায়েরে কইলো- হারামজাদি মাগি, আমার মাইয়ারে ওই কাপড়ের রং দেওনের দোকানে পাঠাইলি ক্যান? সেয়ানা মাইয়া রঙের কাজে গেল ক্যান? এ্যা হারামজাদি রঙের ব্যবসা তোর পুটকি দিয়া হান্দায়া দিমু। আইজকা মসজিদে জুম্মার নামাজ পইরা যখন বাইর হইছি, তখন কাটাখালির ওই নাওয়ের মাঝির লগে দেখা। মাঝি বেডায় আমারে কইছে বানের সময় আমার মাইয়ারে আর সিরাজ মিয়ারে নাকি ওয়াপদার পাম্প হাউসে একলগে দেখতে পাইছে। এই কথা হুইন্যা আমার মাথায় রক্ত উইঠ্যা গেছে। আমার মাইয়ার ইজ্জত লইয়া কথা! আমি আল্লার কাছে কী জবাব দিমু! আমি হাশরের ময়দানে কী কমু! আমার সমাজ আছে না? সমাজ কী কইবো! বাবায় এসব কয় আর আমারে লাথি দেয়। মা আইসা আমার উপর পড়ল। কইলো, আমার মাইয়ারে মাইরেন না। আমি তো তারে পাঠাইছি, মাইয়া ট্যাকা কামাই না করলে আমরা খামু কী? বাপে তখনো চিৎকার করে বলে ট্যাকা না থাকলে না খাইয়া মরবি। দুনিয়ায় আইছিস মরণের লাইগ্যা, মরবি। চুতমারানি গিরামিন ব্যাংক, খাইলো আমাগো...
উহ সালমা। ওকে এসব কথা বলতে মানা করেন। এগুলো শুনে আমাদের লাভ কী? এগুলো ইভিডেন্স না। উই ডোন্ট নিড দিস। আমাদের দরকার টেস্টিমনি- ওই ছোট সাহেব সম্পর্কে ও কী বলে? দুয়েকটা ডাণ্ডার বাড়ি দেন। সব বেরবে।
স্যার ও তো ধারাবাহিকভাবে বলতে পারছে না। আমরা রাইট ডিরেকশনেই আছি। একটু অপেক্ষা করেন। সবকথাই ওর পেট থেকে বের হবে।
আমরা যখন ওদের ঘরে রেইড করলাম- তখনি বুঝছি এই মেয়েটা ইন্টিলিজেন্ট গার্ল। সে আমাকে দেখেই বলেছে, আপা আমারে বাঁচান- আমি কোনো খারাপ কাজ করি নাই।
ও বললো, আর সাথে সাথে ও ইননোসেন্ট হয়ে গেল!
না স্যার, আমাদের ইভিডেন্স দরকার। ওকে ধরতে হলে ইভিডেন্স দরকার- ছাড়তে হলেও তাই। তারপর? তারপর বলো হামেলা বিবি- ওরফে খাদিজা।
কুনটা কইতাম আপা?
ওই যে তোমার বাপজান তোমারে আর তোমার মাকে মারলো।...
হ- তারপর বাপজান আমাগো ফেইল্যা পরের দিন কোথায় জানি চইল্যা গেল।
তোমাগো ফেইল্যা চইল্যা গেল! ওই বন্যায়!
হ। আমাগো ফেইল্যা চইলা গেল। বাপে তো এমুন অনেকবারই যাইতো। আমরা কিচ্ছু কইতে

পারতাম না। তো বাবা চইলা যাবার পর মা আবার গিরামিন ব্যাংকের লোন আনছে। আমরা একটা মুদি দোকান খুইল্যা ব্যবসা করতে শুরু করছি। বানের পানি নাইমা গেলে পোল্ডারের ভিতরে মা আর আমি মিল্যা ধান লাগাইছি। আমাগোতো জমি ছিল না। তো পোল্ডারের ভিতরে একজনের জমি আমরা চুক্তি লইয়া চাষ করছি। বিয়ান রাইতে মা আর আমি উইঠ্যা মাঠে ধানের চারা ছিটাইছি। সরকারের কৃষি বিভাগের মহিলা ব্লক সুপারভাইজার আইস্যা আমাগো শিখায়া দিয়া গেছে। আমাগো ব্লক সুপারভাইজার আপা আমাগো লইয়া কৃষি সমিতি বানাইছে। আমার মারে সেকরেটারি করছে। আমরা ধানের খেতে গিয়া ফটো তুলছি। কৃষি বিভাগের স্যারেরা আইস্যা আমাগোর ফটো লইয়া গেছে। কইছে এইটা সরকারের সাফল্যের কাহিনী। এই সরকারের আমলে মহিলা কৃষানিরা কত সুন্দর ধান ফলাইছে! লাউ, করল্লা, বেগুন...। হেই সময় মা একটা ছাগলের বাচ্চা কিনলো। কী সোন্দর আমি আর আমার ছোট ভাই ওইটা লইয়া সারাদিন খেলতাম।

তোমার বাপ?

হ- সেই কথাই কমু। তো বাবায় আমাগো ছাইড়া চইলা যাওনের পর এক বছরের মতন এমনে এমনে দিন কাটাইলাম। মায়ে পোল্ডারের কিছু মহিলাগো লইয়া সমিতি করলো। মায়েরে সবাই সেই সমিতির নেতা বানাইলো। সমিতির হিসাব-নিকাশ রাখনের লাইগ্যা মার কাছে সবাই ট্যাকা রাখতো। একবার মা কইলো, হামেলা অহন একবার একটা দুধের গাই রাখলে ক্যামন হয়। দুধ বেইচা দুইটা পয়সা হইবো। তোরে ইস্কুলে ভর্তি কইরা দিমু। পোলাডা বড় হইছে- সে বাড়ি বাড়ি গিয়া দুধ বিক্রি কইরা দিবো। মায়ের যেই কথা সেই কাজ। আমরা হাটে গেলাম গরু দেখতে- গরুর দাম হুইন্যা মায়ে উস্ট্রা খাইয়া পড়ে। আমি কইলাম মা, এইবার বাদ দেও- হাতে আরো কিছু ট্যাকা জমলে গরু কিনুম। গরু না কিন্যা আমরা বাড়িত ফিরা্যা আইলাম সেইদিন।

তারপর?

হ- সেইদিনই।

হ্যালো সালমা।

জ্বি স্যার।

ওই মাতারি কিছু বললো? মুখ খুলছে? ছোট সাহেব! ছোট সাহেবসম্পর্কে কিছু বলেছে? আজকে তো আমি আসতে পারলাম না। আপনি ভালো ক'রে ইন্টারভিউ করেন। কিন্তু মনে রাইখেন- আমাদের হাতে টাইম খুব শর্ট। খুবই কম। ছোট সাহেবসম্পর্কে ও যা বলেছে তাই হবেআমাদের রিপোর্ট। ছোট সাহেবকে আমরা ধরে ফেলেছি, আর সময় দিতে পারবোনানে। স্যার এখনো ছোট সাহেবের পার্ট আসেনি। আহ্ কী সব কেচ্ছা শুরু করেছে মেয়েটা! আচ্ছা যে ভাবেই হোক, আগান। ওভার।

ওহ। হ্যাঁ খাদিজা, তোমার কথা শুরু করো।

আপা, মোবাইলে স্যারে ছোট সাহেবের কথা কী কইলো? সময় নাই?

আহ- সেই প্রসঙ্গ পরে আসছি, তুমি বলো হাট থেকে তুমি আর তোমার মা এসে কী দেখলে!

আমরা আইস্যা দেখি আমাগো ঘরের সামনে বাপে বইসা রইছে। আর তারে তালের পাংখা দিয়া বাতাস করতেছে দাড়িওয়ালা এক মৌলবী সাব। বাবায় একটা গেঞ্জি পিন্দা রইছে- আর ব্যাডায় একটা পাঞ্জাবি। মায়ে তাগো দেইখ্যা মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের ভিতরে দৌড় দিল- আমিও তার পিছ পিছ দৌড়াইলাম। পিছন থেইক্যা শুধু শুনলাম নাউজুবিল্লাহ- নাউজুবিল্লাহ। কেডায় কইলো? দুইজনেই হইতে পারে। আমরা বাড়ির বাহির থেক্যা আইছি এইটা আসলে ভালো হয় নাই। পর্দার কথা আমরা পড়ছি, মক্তবে ভালো কইরা কইছে হুজুররা কিন্তু আমরা তাগো হুকুমমতো চলতে পারি নাই। হেই লাইগ্যা আইজ পর্যন্ত আমাগো বালা হইবো না। আমি গুনাহ করছি। মাইয়া হইয়া বেপর্দা ঘুরছি- আইজ বুঝতে পারি কী গুনাহর আছর আমাগো উপর হইছে। আচ্ছা বুঝলাম, তোমাদের গুনাহ হইছে। এখন প্রায়শ্চিত্ত করো। তা বলো নতুন মৌলভী লোকটা কে?

ঘরের ভিতরে বাপে আইলো। আইসা মায়ের কয় হামেলার মা, তুমি ভালো কইরা আইজ একটু রান্না করোতো একটা মোরগ পাকাও- লগে আলু দিও কয়েকখান আর কুইচ্চা মাছের চচ্চড়ি।

বাহ। আইটেমগুলো তো সুন্দর। কুইচ্চা মাছের চচ্চড়ি।

তো, মায়েরে সেদিন বাপে একটুও পিটায় নাই। রাতে খানাপিনার শ্যাষে হেই মৌলবী সাবরে আমাগো বাড়িতে শুইতে দেয়া হইল। আমি আর আমার মা পাশের বাড়িতে গিয়া শুইয়া রইলাম।

তোমাদের এই নতুন অতিথি কে? তোমার বাবার আত্মীয়?

না- আমরা তারে চিনি নাই। বাবায়ও কিছু কয় নাই। খালি কইছে উনি খুব কামেল লোক। সমাজের সবেনাকি তারে মান্যগণ্য করে। তার কথা শোনে। দুনিয়াবী পাপ থেইক্যা বাঁচা যায়। তার লম্বা জোব্বায় চারটা পকেট ছিল। সেদিন সকালে খুব ঝলমইল্যা রোদ উঠছিল। আমাগো বাড়িতে কৃষি বিভাগের ব্লক সুপারভাইজার আপা আইলেন। মায়ে কইলো- প্রদর্শনী খামারে যাইতে হইবো, মা আমারে পাঠাইলো। আমি সারাদিন প্রদর্শনী খামারে কথাবার্তা কইলাম। কেমনে আমরা উচ্চফলনশীল বেগুন লাগাইছি, কেমনে আমাদের সেই বেগুন বাজারে বিক্রি করছি- সেই বিবরণ শুইন্যা সবাই খুব হাততালি দিল। কৃষি বিভাগের অফিসার কইলেন বাংলাদেশের নারীদের কত উন্নতি হইছে, কৃষি ক্ষেত্রে তারা আগাইয়া আইছে। নারীদের স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিতে হবে। তারা দেশের কর্মক্ষেত্রে নানারকম সুযোগ পাইব। তারপর তিনি বললেন, যে পরের সপ্তাহে জেলার অনুষ্ঠানেও আমারে যাইতে হইব।

তার মানে তোমাকে কৃষি বিভাগ খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছিল? প্রশংসা করেছিল? বাহ...তারপর?

তারপর আপা- কী কমু- আমি বাড়িত আইসা দেখি আমার ছোট ভাই ঘরের সামনে বিরিং খেলতাছে। আমি তারে জিগাইলাম মা কই? সে খেলতে খেলতে কইলো ভিতরে। ভিতরে ঢুইকা দেখি মা মাথা নিচু কইরা কুলার ওপর চাল বাছতাছে। আমি কইলাম- মা আমারে কৃষি আপা কইছে প্রদর্শনী খামারের লাইগ্যা আমারে জেলা সদরে যাইতে হইবো। আমার কথা শুইনাও মা দেখি কোনো কথা কয় না। শেষে দেখি মা কাঁদতেছে। আমি জিগাই- মা কী হইলো? মায়ে কয়, হামেলা তরে এখনই পলাইতে হইবো, তুই এহনি কাপড়ের ব্যাগ লইয়া তোর খালার বাসায় পলায়া যাবি। তোর খালা তরে লুকায়া রাখবো, অহনই পালা। আমি কিছুই বুঝি না। কইলাম, ক্যা? আমি কেন পালামু? মা কইলো, তোর বাপে ওই নতুন অতিথির লগে তোরে বিয়া দিবো। আইজকা রাইতেই তোর বিয়া।

সেই রাতেই?

হ- সেই রাতেই আমারে বিয়া দিবো। বাপে সব ঠিকঠাক করছে। বাবায় হেই বেডারে লইয়া গেছে বাজারে শাড়ি ব্লাউজ কিনবো। কিছু মোরগ-মুরগি কিনবো। নাকফুল কিনবো- আর আগরবাতি। মায়ে কইলো হামেলা আর সময় নাই- তুই অক্ষণই চইলা যা। যা থাকে কপালে হইবো- তুই অখনই পালা।

তারপর তুমি পালাইতে পারলা?

আমি বইয়া বইয়া চিন্তা করলাম- আমি পলাইলে আমার মারে মাইরাই ফালাইবো। আর আমি কই পালামু। বাপে আমারে খুঁইজাই আনবো। আমি চুপচাপ বইয়া রইছি দেইখ্যা মায়ে খুব চ্যাতা চেতলো। কইলো হারামজাদি পলাইবি না? এহ্যানো বইস্যা ওই অচেনা-অজানা বুইড়া ব্যাডার লগে বিয়া বইবি? তর জীবনে কী হইবো! হায় হায় আমার সুন্দর পাখিটারে ওরা মাইরা ফালাইবো। হায় হায়। মায়ের কান্দন শুনি আর চুপ কইরা ভাবী। একটু আগে আমারে কত সম্মান দিল কৃষি আপা। ব্লক সুপারভাইজার আমারে ডিস্ট্রিকে পাঠাইবার জন্য মত দিল। আর অহন আমি অচেনা-অজানা এক ব্যাডার লগে ঘর বাইন্দ্যা চইলা যামু।

॥ ৪ ॥

বিস্ফোরণের পর ঘরের ভিতর লাশগুলো দলা দলা হয়ে গেছে। কিন্তু খাদিজা তুমি আর তোমার বাচ্চা বেঁচে গেছো। আর তোমাদের মধ্য থেকে আরেকজন নিখোঁজ। তিনি হলেন ছোট সাহেব। ঘটনাটা কীভাবে হলো?

হ্যালো স্যার, জ্বি স্যার, জ্বি স্যার, আমি ওর ইন্টারভিউ নিচ্ছি। জ্বি স্যার- বেশ কথা বলছে। ওর জীবনের ইতিহাস না জানলে তো ক্রিমিনালদের ক্রাইমের সিনক্রোনাইজেশন করা যাবে না। না কেচ্ছাকাহিনী না, মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছে। জ্বি স্যার ও হ্যাঁ ছোট সাহেবের প্রশ্ন করেছি স্যার। জ্বি স্যার ওই বিষয়টাই এখনো অবসকিউর। জ্বি স্যার আমি কোচ্চেন করছি। আপনি আসেন স্যার, দশ মিনিট! ঠিক আছে স্যার।

কেডা ফোন করছিল আপা? বড় স্যার?

হ্যাঁ- বড় স্যার। আচ্ছা খাদিজা, তুমি এখানে তোমার কাহিনী একটু স্টপ করো, আমাকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেও।

কয়েন।

প্রথম হলো তোমার ওই ছোট সাহেবসম্পর্কে সত্যি বলছো কি-না আরেকবার বলো, দেখ আমি একজন মহিলা, তুমিও একজন মেয়ে মানুষ। তুমি আর যাই হোক আমার কাছে মিথ্যা বলো না।

আপা- আমি সত্যি কথাই কমু আমার বাচ্চাটারে আমার কাছে দিয়া যান, বাচ্চাটা কান্দে- আমার

খুব বুক ব্যথা হয়।
আহ্হা- দুধ খাওয়ানোর সময় তো বাচ্চা তোমার কাছেই থাকে। এখানে ইনভেস্টিগেশন সেল- এখানে বাচ্চা দেওয়া যাবেনা। আচ্ছা আবার বলো এই যে চারটা ছবিদিলাম- এর মধ্যে কোনটা ছোট সাহেবের ছবিতুমি ঠিক করে বলো।
আপা কাইলকা না আমি কইয়া দিছি, আবার ক্যান।
এটা একটা রুটিন টেস্ট। তুমি সঠিক বলছো কিনা এখন তাই ধরা পড়ে যাবে।
ও মা- কী কন! দেহি দেহি- আমি কইতাছি। হ- হ-এই চাইরটা ছবির কুনটাই ছোট সাহেবের না। ক্যামনে বুঝলা?
আপা ছোট সাহেবের মুখে ডাইনে দিকে একটা তিল ছিল।
খাদিজা! তুমি কী বলছো? ছোট সাহেবের মুখের তিল তুমি মনে রাখছো? তোমার সাথে না ছোট সাহেবের দেখাই হতো না। তাহলে কীভাবেএত কাছে থেকে তারে দেখছো?
আপা।
কী হলো? মুখ আঁচল দিয়ে ঢাকছো কেন? কাঁদছো? কাঁদছো কেন? খাদিজা। শোনো- কথা বলো।
আপা- আমি কী অপরাধ করছিলাম? কী জন্য আমার জীবনে আল্লায় এত কষ্ট দিল! আপা আমি কী এগো চিনতাম!!, না জানতাম! গিরামিন ব্যাংকের লোন লইয়া আমার মায়ে আমারে মানুষ করছে। মাইনষের পায়ে ধইরা ধইরা আমরা খাইছি। আমরা বন্দুক-পিস্তল দেহিনাই আপা... আমরা বন্দুক পিস্তল দেহি নাই। আমি যুদ্ধ কী কইতে পারি না।
খাদিজা। শক্ত হও। তোমার কথাবার্তার ওপর এই কেইসটা অনেকখানি নির্ভর করছে। তোমার জীবনে কী হয়েছে- সেটা ইম্পার্টেন্ট না- তুমি আইনের সামনে কথা বলছো, দেশে একটা আইন আছে- সেটা বুঝেসুঝে কথা বলো।
আপাগো, আইন আমারে বাঁচাইবো না। আইন আমারে কী করব। হায় হায়। আমি অহন কী করমু!
খাদিজা, শোনো। আমরা কিন্তু এখনো জানি না তোমার ওই ছোট সাহেব কোথায়? আসলে আমরা তো ছোট সাহেবকে চিনতেই পারছি না। তুমি আমাদের সাহায্য করো। তোমার বক্তব্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।
আপা আমারে একটু পানি দ্যান- পানি খামু।
নও পানি খাও।
আচ্ছা আমরা একটু সিসটেম্যাটিকালি আসি। তুমি আমার কাছে সবকিছু স্বীকার করো খাদিজা। একটু পরে স্যার আসবেন- তোমাকে আবার মারধর করতে পারেন। তুমি ভয় পেতেও পারো। তাই আমার কাছে তুমি সবখুলে বলো। নো প্রব্লেম। আমি প্রায় ১০ বছর ধরে এই লাইনে আছি- তোমার মতো মেয়ের পেটের খবর বের করতে আমার সময় লাগবেনা। তবু... তবু আমি সময় নিচ্ছি কারণ, তোমার ওপর আমার বেশ দরদ পড়ে গেছে। আমিও তো মেয়েমানুষ। তোমার কষ্টটা আমি ফিল করি। আচ্ছা বলো সেই রাতে তোমার বিয়ে হলো কীভাবে?
সেই দিন মায়ের সামনে বইসা বইসা ভাবতাছি- আমি চাইলা গেলে মায়ের কী হইবো। এমন সময় আমার খালা আইলো। খালা ওই পোল্ডারের জিয়ানীবাজার মহল্লায় থাকতো। খালা আইসা আমারে লইয়া গেল, সেই সময় খালাও একটা বোরকা পরছে- আমিও মায়ের তালিমারা বোরকা পইরা চুপচাপ পালাইছি। খালার বাসায় আইসা আমি পলাইয়া রইছি সারাদিন। শেষে সন্ধ্যার পরে বাবায় খুঁজতে খুঁজতে আইছে, আইসা খালারে জিগাইছে আমি আইছিনি। খালায় কইছে না, আহে নাই। এদিকে আমি চাইলের মটকার ভিতরে লেপটি মাইরা নিশ্বাস বন্ধ কইরা শুইয়া থাকছি। বাবায় আইসা মটকার উপরে চাইলের উপর হাত দিছে। আমার চুল পায় নাই। শেষে চইলা গেছে।
কিন্তু...
কিন্তু কী?
রাইতটা আমি চৌকির তলায় চুপচাপ হুইত্যা রইছি। খালায় কইছে, হামেলা এ্যাহানো ছাপায়া তুই থাকতে পারবিনা। সবচেয়ে ভালো হইলো তুই কাইলকা সকালে বাসে কইরা রাধানগর চইলা যা- ওখানে আমার চাচি শাশুড়ি আছে- তুই তাগো বাড়িত কাম কাজ করবি- থাকবি। আমার চাচি শাশুড়ি খুবমায়া করবো। আমি তার কথামতো রাধানগর যাইবার জন্য ঘরের বাইর হইতে গেলাম।
তারপর?
তারপর ঠিক দুপুর বেলা আমার ছোট ভাই দৌড়াইতে দৌড়াইতে আইলো। আইসা কইলো, বোনরে তুমি সত্তর কইরা বাড়ি চলো, বাপে আমাগো মায়েরে মাইরা কিচ্ছু রাখে নাই। অহন বাপে মায়ের গলার ওপর পা চাইপ্যা দাঁড়ায়ে আছে- যদি অহন তুমি বাড়িত চইলা আসো তাইলে বাবায় আর মারে মারবো না। এই কথা শুইন্যা আমি দৌড় দিলাম। বাসায় আইস্যা দেখি মায়ের গলার উপর পা দিয়া বাবা জিজ্ঞাসা করতেছে বল তোর মাইয়ারে কোথায় রাখছোস? তর মাইয়া কই? মাইয়া আবার বড় হইছে তারে সৃষ্টি কর্তার আশীর্বাদে শাদি দিমু। ঠিক কইরা বল তর মাইয়া কোথায়- না হইলে গলায় পাড়া দিয়া মাইরা ফালামু।
তারপর?
তারপর আমি চিৎকার দিয়া কইলাম মায়েরে ছাইড়া দ্যাও। আমি শাদি করুম, আমি চইলা আইছি। তো তখন বাপে হাসতে হাসতে কইলো, আমি জানি আমার ময়না পক্ষী আমার কথার বাইরে যাইবো না। আয় আয় মা- আইজ তোকে বিয়া দিমু। আমার কত আনন্দ! আমার মাইয়ার বিয়া হইবো। এই বইলা বাবা মায়ের গলা থেইক্যা পা উঠায়া লইল। আমার ছোট ভাই ভয়ে ঠকঠক কইরা কাঁপতেছিল। সে আর আমি মারে উঠাইলাম- পানি খাওয়াইলাম।
হু, ভেরি ইন্টারেস্টিং।
তো সেইদিন রাত্রেই আমার বিয়া হইয়া গেল। বিয়ার রাত্রেই আমারে বোরকা পরানো হইল। কথা হইল, নতুন অতিথি লোকটা আমারে লইয়া ঢাকায় চইলা যাইবো। রেলগাড়িতে কইরা পরের দিন সকালে ঢাকায় রওনা হইলাম। পথের মধ্যে আমাগো কুন কথা হয় নাই। ঢাকার স্টেশনে আইস্যা উনি পরথম আমারে কইলেন যে আমরা অহন একটা হোটেলে উঠমু। তুমি কারও লগে কোনো কথা কইবা না। বোরকার ভিতরে থাইক্যা আমি শুধু হু হু কইরা গেলাম। রাইতে উনি বিছানায় আমার কাছে আইলেন। আমি তখন ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদতেছিলাম। উনি আমার পিঠে হাত রাখলেন। তারপর খুবমহব্বতের লগে কইলেন, 'মাইয়া তোমার মনে কুন ডর রাইখ না। আমি তোমারে যেইটা কই সেইটা ভালোভাবেমনে রাইখা চইল- তোমার কুন কষ্ট হইবনা। মা-বাপরে ছাইড়া আইছো, মনে তো কিছু ব্যথা থাকবই। এতদিন তুমি বাপমার কাছে ছিলা, তাদের কথা শুইন্যা আইছো। অহন তুমি আমার স্ত্রী, অহন থেইক্যা আমার কথাই তোমারে মাইন্যা চলতে হইবো। রাজী? আমি মাথা নাইড়া কইলাম- হ - হ। এরপর উনি আমারে জড়ায়া ধরলেন।
তার মানে তোমার স্বামী তোমাকে বোঝালো?
কিন্তু সে নিজে কী চাকরি-বাকরি করে, এগুলো কিছুই বললো না?
না হেগুলা কিছুই বললো না। কিন্তু পরের দিন আমার স্বামীর গলার স্বর বদলাইয়া গেল। তিনি প্রথমে তার ব্যাগ থেইক্যা কী সবকাগজপত্র আর মেশিনপত্র নামাইলেন। তখনো আমি এগুলা দেখি নাই।
এগুলো কী অস্ত্র ছিল?
পরে হুনছি। এগুলা রিভলভার- পিস্তল।
তারপর?
তিনি কইলেন, ভয় পাইও না। তোমারে কিছু কথা কমু- মন দিয়া হুনো। আমি একটা যুদ্ধের জন্য তোমারে বিয়া করছি। তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার বেশি জানার দরকার নাই। মুখতাসার শুধু একটা জিনিস বুঝবা- আমি একটা যুদ্ধ করনের জন্য তোমারে লইয়া আইছি। আমি যা যা কমু তুমি তাই তাই মাইনা চলবা। আমি কিছুই বুঝি নাই। শুধু উনার কথা শুইন্যা মাথা নাড়াইছি। তখন আমার কেউ নাই। আমার মা নাই, বাবা নাই, আমার ছোট ভাই নাই। আমি জানি জীবনে আর তাগো লগে দেখা হইবো না। আমি জানি না আমি কই ভাইস্যা যামু।
আমার স্বামী কী কয়- আমি বুঝি না, যুদ্ধ কী, কার লগে যুদ্ধ? যুদ্ধ কেন? আমারে বিয়া কইরা আনছে- অহন কীয়ের যুদ্ধ! আমরা তো অহন সংসার করুম! অহন কীয়ের যুদ্ধ! অস্ত্রপাতি। আল্লারে আবার মাথার মধ্যে তখন ঠাঠা পড়ছে। উনি কইলেন আমি মাগনা মাগনা তোমারে শাদি করি নাই। একটা উদ্দেশ্য আছে। কীয়ের উদ্দেশ্য? পরে সবকথা জানতে পারবা- অহন তোমার এত কথা জানার দরকার নাই। একথা জাইন্যা রাখো তুমি আমার দ্বিতীয় স্ত্রী। আমার পরথম স্ত্রীর ঘরে একটা ছেলে আছে। সে মাঝেমধ্যে আইব, তারে খাওন-দাওন দিতে হইব।
তুমি তার দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম জন কোথায়?
ক্যামনে কমু? আমি কী তার ঠিকানা জানি? আমার বাপের লগে কেমনে আমার স্বামীর প্রথম দেখা হইছে, তাও আমি জানি নাই।
তোমারে কোনো দিন বলে নাই?
না। আমার বাচ্চা হইবার পর একদিন একটা ১৪-১৫ বছরের চ্যাংড়া ছেড়ারে আমার স্বামী ঘরে লইয়া আসে। পোলাডার একটু একটু দাড়ি হইছে- তো উনি আইসা পোলাডারে কইলেন, এ্যাইডা তোর নতুন মা, এরে পায়ে ধইরা সালাম কর।

আমি বোরকা পিন্দা ছিলাম- তো দেখলাম পোলাডার একদম অর বাপের ন্যাহাল। আমার স্বামী তারে খাওয়া দিতে কইলো। আমি ভাত-তরকারি বাইরা দিলাম। খাইয়া আমার স্বামী তার পোলাডারে আলমারি থেইক্যা অনেক ট্যাকা বাইর কইরা দিল। ট্যাকাগুলান কয়েকটা খামে ভইরা ভাগ ভাগ কইরা ওর হাতে দিল। তারপর আবার আমারে সালাম কইরা চইলা গেল। যাওনের টাইমে পোলাডার ব্যাগের মধ্যে কি একটা যন্ত্রও ঢুকাইয়া দিল। বুঝলাম উনি তার পোলাডারেও তার মতো বানাইছে।

আর ছোট সাহেব? তার কথা তোমার স্বামী কীভাবে জানালো?

ছোট সাহেবরে আমার স্বামী নেতার মতো মানতো। আসলে ছোট সাহেবই নেতা আছিল। আমার স্বামী অনেক দিন উনার কথা কইছে। বিয়ার দুই/এক মাসের মধ্যেই উনি প্রথমে আমাদের বাসায় আসেন। তখন আমরা এক বাসায় থাকতাম- মনে হয় এটা রাজশাহী বা অন্য কোনো জেলা হইব। হেইদিন আমার স্বামী আমারে ভালো কইরা রাধতে কইল। আর কইল আইজকা এক বুজর্গ আদমি আমাগো ঘরে আইব। তার কাছে নাকি জীবনের ও পরকালের সব সত্যকথা জানা যায়। তো সেইদিন ছোট সাহেবআইস্যা...

কান্দো ক্যান? এই মেয়ে কান্দো ক্যান? এ্যাই স্টুপিড কান্দো ক্যান?

আপা, আমারে আর জিগায়েন না। আইজকা আমি কইতে পারুম না।

উহ্ এই মেয়েটা ছোট সাহেবের কথা বললেই বডডো ইমোশনাল হয়ে পড়ে। এ্যাই-এ্যাই আমার পায়ে ধরো না- উহু-উহু-প্লিজ আমার পায়ে ধরো না। তুমি সত্যি কথা বলো- সত্যি কথা বলো- তাহলে তোমারই ভালো হবে।

আমি সত্য কথা কমু।

দ্যাখো, আবার বলছি, তোমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আছে- তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। জীবনেও তুমি মুক্তি পাবা না। বলা যায় না হ্যাংগিংও হতে পারে।

আপা আমার কী দোষ? কন? আমার কী দোষ? আমারে ওই লোকটার লগে আমার বাবা বিয়া দিছে... আমি

সেটাই তো ক্লু। তোমার বাবা মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার দেওয়া ঠিকানা তো আমরা লোক পাঠিয়েছিলাম। ওই পোল্ডারের ওই বেড়িবাঁধে তোমার বাবা-মা নেই। কয়েকমাস আগেই উনারা ভাগছে।

আপা!

কাঁদছো! কাঁদছো। এ্যাই মেয়ে ফ্যা ফ্যা করে কেঁদো না। একটু থামো দেখি আমার মোবাইলে কেউ কল দিয়েছে, কথা বলে দেখি।

বলেন আপা। মোবাইলে কথা বলেন।

হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো- জ্বি স্যার বলেন। কী? ছোট সাহেবকে ধরা হয়েছে? কোথায় স্যার নোয়াখালী? ওহ সোনাপুর দিয়ে.. সুবর্ণচর,.. জ্বি জ্বি. . চেয়ারম্যানঘাট হয়ে.. বয়েরচর। ছোট সাহেবের মতো? আচ্ছা আচ্ছা.. ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। মেয়েটাতো আমার সামনে বসে আছে। হ্যাঁ ইন্টারোগেশন করছি। ঠিক আছে স্যার। কালকে নিয়ে আসেন। ওকে দিয়ে শনাক্ত করাবো, ওকে স্যার। আসসালামু আলাইকুম।

আপা কী কইল মোবাইলে?

ওই যে তোমার ছোট সাহেবকে ধরা হয়েছে, আগামীকাল নিয়ে আসলে তোমাকে প্রুফ করতে হবে, দেখি কী হয়।

স্যার ছোট সাহেবরে কেমনে ধরল? হায় হায়। ওই যে নোয়াখালীর সুবর্ণচর... চেয়ারম্যানঘাট হয়ে.. বয়েরচর. .. একটা চায়ের দোকানে লোকটা চা খাচ্ছিল।

চায়ের দোকানে বইসা বইস্যা ছোট সাহেব চা খায়? হি হি হি।

আরে তুমি এত হাসছো ক্যান! কী হয়েছে তোমার? ছোট সাহেবের জন্য এখুনি তুমি কাঁদলে, এখন আবার হাসছো। মানে!

কিছু না। এমনি।

তোমার মাথা খারাপ! আচ্ছা এসব কথা থাক। এখন বলো, যে লাশগুলো আমরা পেয়েছিলাম আর কে কে ছিল সেখানে?

ক্যান, আপা আপনেরা লাশ দেখেন নাই? লোকগুলোর লাশ পাওয়া গেছিল- কিন্তু বিস্ফোরণে সব হালুয়া হয়ে গেছিল, কারও চোখ-মুখ দেখে চিনি না, সবাই দলা-মোচড়ানো কিছু মাংস... মগজ মাথা সব ভর্তা হয়ে গেছিল। আপা একটা কথা শোনেন। আমার যদি সারা জীবনের লাইগ্যা জেল হয় তয় আমার বাচ্চাটার কী হইব। বাচ্চাটার কী দোষ?

হা- হা খোদেজা- তুমি তোমার বাচ্চার কী দোষ খুঁজছো? তোমার নিজের কী দোষ? তোমাকে তো জেলখানাতেই থাকতে হবে। আইন তো আইন।

হায় আল্লাহ!

উহ্ আজকে আবার বৃষ্টি আর বৃষ্টি। আকাশটা জানি ফুটা হয়ে গেছে মনে হয়। খোদেজা, প্লিজ শোনো আমাদের হাতে আর সময় নাই। আজকেই কিন্তু শেষ দিন, তোমার রিমান্ড শেষ হবে। তোমার যা বলার আজকেই শেষ করতে হবে।

আচ্ছা আপা আমি কইতাছি।

শোনো, গতকাল যে বলেছিলাম ছোট সাহেবকে নোয়াখালী থেকে পাকড়াও করা হয়েছে- আজকে তাকে এখানে আনা হবে। তুমি তাকে দেখে শনাক্ত করবা। পারবে? দেখে চিনতে পারবা?

পারমু আপা।

কী? হাসছো ক্যান?

এমনিতই। একটা কথা মনে পড়ল।

কী কথা।

পরথম যেদিন ছোট সাহেবরে কইলাম- আপনে আমারে কোথাও লইয়া যান। এ্যাহানে আমি মইরা যামু। হেইদিনও বৃষ্টি আছিলা। আইজকাও বৃষ্টি। তার লগে যে আর দেখা হইব না। শুধু মনে আইলো।

আচ্ছা তাই বলো! বৃষ্টি দেখে তোমার মন উতলা হচ্ছে ?

হ-আপা। আমার জানি কেমুন লাগতাছে। সেবার আমার স্বামী আর ছোট সাহেব একসাথে বাইরে গেছিল। যাইবার আগে আমার স্বামী কইলো, ওই হোন, আগামী তিন-চার দিন আমরা বাইরে যামু। তুই দরজা-জানালা খুলবি না। বাচ্চারে লইয়া চুপচাপ হুইত্যা থাকবি। তিন দিনের বাজার কইরা দিলাম। এই বইলা আমার স্বামী খাটের তল থেইক্যা একটা ব্যাগ বাইর কইরা চইলা গেল। আমি দরজা বন্ধ কইরা বালিশে মুখ গুইজা পইরা থাকলাম। আপা একটা ছোট্ট ঘরের ভিতরে একটা বাচ্চা লইয়া দরজা জানালা বন্ধ কইরা কত দিন থাকুম! আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইত। আল্লার কসম খাইয়া কইতেছি এ্যাহানো আইসা এত বন্ধ জায়গার মধ্যেও আমার ভালো লাগে। আমার জেল হইলে কি হইবো, ভালোই হইব। আমিতো আগে জেলখানায় থেইক্যা খারাপ ছিলাম।

তারপর? ছোট সাহেবের কথা..

তো সেইবার তিনদিন পরে অনেক রাতের বেলা দরজার মধ্যে টোকা পড়ল। বৃষ্টির রাইতে শুধু বৃষ্টির শব্দ। আমি ভয়ে ভয়ে ঘরের ভিতরে কাঁপতাছি। কেডায় আইলো। আমি একলা কী করুম! খালি কোরআন শরিফের সুরা পড়ি। আল্লা অহন কে আইলো? শ্যাষে দরজার সামনে গিয়া জিগাই ক্যাডা আইছেন? ক্যাডা? বাইরে থেইক্যা একটা শব্দ হুনলাম, আমি- দরজা খুলো। আজি জিগাই, আপনি কে? উনি বলিলেন, আমি ইকবাল, তুমি আমার কথা হুইন্যা চিনতে পারো না? তখন আমি বুঝলাম কেডা আইছে। তো যখন আমি বোরকা পিন্দা দরজা খুইলা দিলাম, দেহি উনি আইছেন? বৃষ্টিতে ভিজ্যা উনার পাঞ্জাবি গায়ের লগে লাইগ্যা রইছে।

উনি কে? তিনি?

হ- তিনি।

বাহ- চমৎকার গল্প! বৃষ্টির রাত!

তারপর?

তারপর উনি ভিতরে ঢুইক্যা দরজা বন্ধ কইরা কইলেন, খাদিজা, তোমার স্বামী আইজকা আসবো না। সে একটা অপারেশন করতে গেছে। আরও ২/৩ দিন তাকে সেখানে থাকতে হবে। তাই আমি চইলা আইছি। আমি আদখা চমক খাইয়া উনার দিকে তাকায়া রইলাম। উনিও আমার বোরকার দিকে তাকায়া ছিলেন। আমি কইলাম, আপনি চইলা আইলেন? ওই অপারেশনে আপনার লাগবো না? উনি কইলেন, না না ওই ওখানে আমার কাজ নাই। ও একাই যথেষ্ট। আমি কইলাম তাইলে আপনি আপনার ঘরে যান- কাইলকা সকালে নাশতা দিমু। উনি ঘরের ভিতরে চইলা গেলেন। আপা আমারে এক গ্লাস পানি দ্যান।

খাও। পানি খাও। তারপর?

রাইতে আমি আর ঘুমাইতে পারি না। চুপচাপ লাইট জ্বালাইয়া বইয়া থাকলাম। হঠাৎ শুনি আমার ঘরের দরজায় টোকা। বুঝলাম উনি দরজা খুলতে কইতেছেন। তো আমি একটু চিন্তা কইরা তাড়াতাড়ি বোরকা পইরা আমার ঘরের দরজা খুইলা দিলাম। তিনি ভিতরে আইসা আমার সামনে বইসা পড়লেন। খাদিজা, তোমারে কয়েকটা কথা কইতে আইলাম। আমি ভয় পাইয়া তখন ঠকঠক কইরা কাঁপতাছি- উনি না জানি কী করেন? আমার গলার মধ্যে রক্ত আইসা জইমা গেল। উনি কইলেন, তুমি এত

ডরাইতেছো ক্যান? আমার কথা শুনো, বইলা উনি আমার হাত চাইপা ধইরা বললেন- আগে কাঁপাকাঁপি থামাও। দুইটা কথা কইয়া আমি চইলা যাবো। তারপর কইলেন- তোমার বোরকা খোলো। আমি ডরে ডরে বোরকা খুইলা ফেললাম। উনি আমার দিকে চাইয়া কইলেন- ইস এতটুকুন একটা মাইয়া- ছোট্ট একটা জালালী কবুতর! আমি তখন উনার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পারি, কিন্তু আমি কিছু কইনা। উনি কইলেন, ওইদিন তোমার স্বামী তোমাকে মারলো কেন? সারারাইত তুমি কান্দলা? আমি কইলাম, সালুনে লবণ কম হইছিল আর খাটেথে নামতে গিয়া উনার গায়ে পা লাগে। এই জন্য! ইস- উনি চিৎকার দিয়া উঠলেন, এই জন্য বউকে মারতে হয়! আমি কইলাম উনি আমাকে অনেক কম মারেন। আমার বাবা আমার মারে আরো বেশি মারতো। আমার মারে বাপ-মা তুইলা বকতো। আমার বাবা আমার মারে লাথি দিত আর লাথি দিত আর চুল ধইরা টানতো। আমার উনি আমারে খালি ঘুষা মারেন আর ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ কইরা দেন।
সাংঘাতিক!
তারপর উনি কইলেন, আমরা এখানে কী করি তুমি জানো? না, আমি কই, জানি না। ও তোমারে কিচ্ছু কয় নাই? না। ও- বুঝছি। শোনো আমরা যা করছি এগুলান অহন তোমার বোঝার দরকার নাই। আমি নিজেও বুঝি না। এই লাইনটা একটা সাপ। যারে কামড়ায় তার শরীরে বিষ ঢুকাইয়া দেয়। আমাদের সবাইকে সেই সাপ কামরাইছে, হেই লাইগ্যা আমরা খালি ছটফট করতাছি। আমাদের সমাজে অনেক পাপ জমা হইছে, আমাদের কাম এই সব পাপের ময়লা পরিষ্কার করা।

তারপর?
আপা, কিছুক্ষণ উনি চুপচাপ আমার দিকে শুধু তাকায়া রইলেন। আমি আরো ভয় পাইলাম, উনি এবার কইলেন- তুমি তোমার বাড়িতো শুনছি জামালপুর- যমুনার পার। এখন তুমি ওখানে যাইতে পারবা? ক্যান? ক্যান একথা জিগাইতেছেন? আমি অবাক হইয়া জিগাই। উনি কন, তুমি তোমার বাড়িতে ফিরা যাইতে চাও না? এইভাবে এই ঘরে মরবা? আমি কইলাম, আমার কুথাও যাইবার জায়গা নাই। বাপে আমারে এই লোকের সাথে শাদী দিচ্ছে- আমারে এই লোকের কাছে মরতে হইবো।
লোকটা এসব কথা বললো?
হ- সত্যই- ব্যাডায় এসব কথা কইলো। আমি তারে আরও কইলাম- আর আমি যামু ক্যামনে। আমার স্বামীতো আমারে ছাড়বো না। আর আমি এইভাবে বাড়িত গেলে বাজান আমারে আস্তা রাখবো না। বাজান আমারে কাইট্টা যমুনা নদীতে ভাসায়া দিবো।
হু- থামলা কেনো? বলো? সবকিছু কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে।
উনি আমার বোরখাটা হাতে লইয়া কইলেন- এই বোরখা পইরা তুমি রাইতের আন্ধারে চইলা যাও। যা কিছু হইবো পরে দেখা যাইবো। তুমি পালাও। তুমি জানো যে কোন টাইমে সরকার আমাদের সবাইকে ধরে নিয়া যেতে পারে। এমনকি সেই সময় গোলাগুলি হবে। ওরা ঢুকলে আমাদের কাউকে বাঁচায়া রাখবোনা। এই যে বাচ্চা-বাচ্চাটাকেও বাঁচাবে না- আমি বলে রাখছি। ওরা ঢুকলে প্রতিশোধ নেবেই। আর মনে রাইখো- তোমার স্বামীও তোমাকে ফেলে রেখে পালাবে। গত কয়েকটা অপারেশনে এরকমই হয়েছে। আমি আরও ভয় পাইয়া কাঁপতে কাঁপতে কইলাম। আমি বাচ্চা লইয়া এত রাইতে বৃষ্টির মধ্যে ক্যামনে যামু। উনি তখন চুপচাপ বইসা রইলেন। তাই তো আমি একথা চিন্তা করি নাই। তারপর উনি প্রথমে আমার চোখে হাত দিয়া চোখ মুছাইয়া দিলেন- তারপর আমার মাথায় হাত রাইখ্যা কইলেন- আচ্ছা- আইজ তোমার যাওনের দরকার নাই। তবে আরেকদিন সুযোগ কইরা দিমু। তুমি চইলা যাইও। আমি চাই না তুমি এহানে থাইক্যা মরো। তোমাকে আমার ভালো লাগে। আই লাভ ইউ।
বাহ- বাহ- সুন্দর ডায়লগ। আজকে তোমাদের আবার দেখা হবে, দারুন! তারপর?
আমি জিগাইলাম, আপনে ওগো ছাইড়া চইলা যান না ক্যান? আপনের কী? উনি একটুক্ষণ চুপচাপ থাইক্যা কইলেন, আমি ছাইড়া যাইতে পারমু না। আমারে শ্যাষ কইরা দিবো। তুমি এসব বুঝবা না। উনি উইঠা দাঁড়ায়া কইলেন- সুযোগ পাইলে আমিও সব শেষ কইরা দিমু। আমি তোমারে বিশ্বাস কইরা কইলাম, তুমি কিন্তু ওরে কইও না। আমি বিশ্বাস করলাম, আমি মাথা নাড়াইয়া সায় দিলাম।
দাঁড়াও! একটু স্টপ করো। স্যার টেলিফোন করেছে আমি ধরে নেই। ইয়েস স্যার, বলেন আপনারা আসছেন? নো প্রোব্লেম স্যার। মেয়েটা ইন্টারোগেশন সেলেই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বলছে- কনফেশন..... তারপর? খাদিজা তাড়াতাড়ি বলো ওরা আসছে?
পরের দিন সকালেই উনি বাসা থেইক্যা চইলা গেলেন। আর আরও ৩ দিন পরে আমার স্বামী আইলেন, আইস্যা আমারে জিগাইলেন, খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হইছিল? গেন্দা বাচ্চা কেমুন আছে? আমি কইলাম না সমস্যা হয় নাই। ভাত-ডাইল খাইয়া রইছি। কুন সমস্যা হয় নাই। আমার স্বামী আর কিছু বলে নাই। এইভাবে আমাগো দিন চলছে। আমার মনে হইছে ওই রাত্রের ঘটনা বাস্তবে ঘটে নাই- আমি স্বপ্নে দেখছি। স্বপ্নের মতো মনে হইছে। কে আইলো- কেন আইলো- আমারে কী কইলো। আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই।
তারপর?
তারপর একদিন আমার স্বামী কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়া আইলো। ছোট সাহেব তখন আমাদের বাসায় নাই। আমার স্বামীর সঙ্গে কী সব কথা কইলো- বুঝি না সব কিছু। শুধু মনে হইলো উনাদের কথার মধ্যে একটা শব্দ ছিল 'বেইমানি'। আমি কান খাড়া কইরা শুনলাম। বেইমানি'? তার মানে ছোট সাহেব 'বেইমানি' করছে?
উনারা কথা বলতে গিয়া মাঝে মধ্যেই 'বেইমানি' শব্দটা বলছিলেন। আমার মনে হইল আমার স্বামী কিছু টের পাইছেন। তারপর থেইক্যা আমার স্বামী সারাদিন খুব চিন্তা করতেন। রাইতের বেলাও চুপচাপ চিন্তা করতেন। আমি কিছু জিগাইলে গম্ভীর হইয়া কইতেন চোপ, মাগি গো এত কথা কইতে হয় না। চোপ। তারপর একদিন ঘরের মধ্যে অনেক মেশিনপত্র আইনা রাখলেন। কইলেন, দুই-একদিনের মধ্যে একটা ফাইনাল হইতে পারে। আমি কইলাম ফাইনাল কী? উনি গম্ভীরভাবে কইলেন ফাইনাল মানে রোজকেয়ামত।
তারপর?
তারপর তো আপনারা আইলেন। রাইতের বেলা আমাগো বাড়িতে কত্ত গোলাগুলি হইল, আমার স্বামী ঘরের ভিতর থেইক্যা কতগুলা চালাইলেন। শ্যাষে ওই বোমা? বোমা উনি নিজের পেটে বাইন্দা আমারে বাঁধতে কইছেন। বাচ্চার পেটে বাঁধছেন। কইছেন সবাই আমরা এক লগে মরুম। কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু উনি দরজা খুইলা আপনাগো সামনে দাঁড়াইতেই আমি বাচ্চা লইয়া সইরা গেছি- তার পরতো আমরা বাইচা গেছি।
ইয়েস স্যার। আপনারা এসেছেন? এই যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে।... আমি ওকে বাইরে নিয়ে আসছি। এই যে চলো খোদেজা। তোমার ছোট সাহেবকে দেখবে চলো।
চলেন।
এই যে সালমা। এদিকে আসেন- মেয়েটাকে এদিকে এই অ্যাম্বুলেন্সের কাছে নিয়ে আসেন। হ্যাঁ-হ্যাঁ- অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরেই শোয়ানো আছে। নোয়াখালী থেকে ডাইরেক্ট নিয়ে এসেছে, দেখি দেখি মুখের কাপড়টা খোলো।
এমা- একি? আপা, এই লোকতো মইরা গেছে। এইটা তো লাশ। হায় হায় ছোট সাহেবরে মাইরা ফালাইছেন। হায় হায়...
কী? খাদিজা এই লাশটাকে চেনো? তোমার পরিচিত মনে হয়? এ্যাই এ্যাই ভিডিও করো। ছবি তোলো খাদিজা চিনতে পেরেছে। এই লোকটাই ছিল মাস্টারমাইন্ড। ওকে আমরা নোয়াখালীর বয়েরচর থেকে ধরে আনি। পরে আমাদের সাথে বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছে।
খাদিজা, এ্যাই খাদিজা উঠো। লাশের সঙ্গে এতক্ষণ কাউকে থাকতে দেয়া হয় না। উঠে এসো।

॥ ৫ ॥

খাদিজা সত্যি কী এটা ছোট সাহেবের লাশ? তুমি কী চিনতে পেরেছো? সত্যি কথা বলো। আমি এখন রেকর্ড করছি না। সত্যি করে শুধু আমাকে বলো।
আপা, এইটা ছোট সাহেবের লাশ না।
হু। বুঝলাম। তুমি ভালোই করেছো। আপা ছোট সাহেবের মনে হয় আমিই মারছি। আপনাগো সেই গল্প বলি নাই।
ক্যান?
বললে দুনিয়ার সবাই লজ্জা পাইতো। আমাগো যে বানাইছে সেও লজ্জা পাইতো। তাই বলি নাই।

(এই উপাখ্যানের সব চরিত্র কাল্পনিক। আসলে এটা একটা কাল্পনিক কথোপকথন যার কোনো ভিত্তি নেই।)



নাটক

কলকাতার গালিব

ড. মুকিদ চৌধুরী

চরিত্রচিত্রণ
গালিব একজন কবি
নাওয়াববাঈ সংগীতশিল্পী
তকির গালিবের বন্ধু

প্রথম অঙ্ক
দৃশ্য এক
স্থান : কলকাতা নাট্যমঞ্চভবন[১]
সময় : রাত

মঞ্চ : ত্রিস্তর। উচ্চ : গজল। **মধ্যম :** সংলাপ। **নিম্ন : নৃত্য।**
নাওয়াববাঈ : গজল পরিবেশন করছে।
নর্তকী : নৃত্য করছে।
গালিব ও তকির : দর্শক।

গজল
তুমি বলেছিলে,
হৃদয় খুঁজে পেলে সেটি আর ফেরত দেবেনা;
হৃদয় হারানোর মতো হৃদয় আমার নেই।
হৃদয়ে প্রিয়ার স্মৃতি, পরমানন্দের আকাঙ্ক্ষা
তবুও পুড়ল এই ঘর, কিছুই পেল না রক্ষা।
প্রেমের লুকানো তাপ কী নিদারুণ, আহা হৃদয় পোড়ায়
যেন ধিকিধিকি জ্বলন্ত আগুন ছাই হয়ে নিভে যায়।
আনুগত্য কেমন, প্রেম কী, এ-তো প্রায় মস্তক ফাটানোর মতো ব্যাপার।
হে পাথরপ্রাণের প্রেয়সী তোমার ত্রিসীমানায় যাওয়া কেন তবেআর!

সংলাপ : গালিব ও তকির।
গালিব: কলকাতার সমস্ত লোক কি এইখানে

এসেই ভিড় জমিয়েছে?
তকির : মনে হচ্ছে। নাওয়াব বাঈ একজন জনপ্রিয় শিল্পী।
গালিব: একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কলকাতা নাট্যমঞ্চভবনে চিরায়ত সংগীতের যে উৎসবের আয়োজন করেছে তা তো চলবে সাত দিন তাই না?
তকির : হ্যাঁ। এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ উত্তর ভারতীয় ঘরানার প্রখ্যাত শিল্পী নাওয়াব বাঈ। তার জনপ্রিয়তার ঢেউ যে এমন উত্তাল, এই অত্যুৎসাহী মিলনমেলা দেখে তা স্বীকার করতেই হয়। গলায় জাদু ভরা। গীত ললিতা। কোথাও ফাঁক নেই। সুরের ফাঁকি নেই। দরদে গলা। মূর্ছিত বকুল হয়ে যেন শিশির ঝরছে।
গালিব: খুব নিখুঁত। কোথাও উর্দুর লাঞ্ছনা নেই। বাংলার নিজস্ব স্বাদেই সুন্দর করে তোলা হয়েছে। কোথায় শিখেছে এমন গান এই মেয়েটি?
তকির : লাখনৌ। তোমারই গীত মনে হচ্ছে?
গালিব: হ্যাঁ। কী দরাজ ও মেজাজি কণ্ঠে রাগরাগিনীর সুরবিস্তার। সুরের নেশাতেই কস্তুরি-হরিণের মতো নিজেই হারিয়ে গেলাম। হ্যাঁ। এই প্রথম, কলকাতায় একজন গায়িকার কণ্ঠে আমার গজল উচ্চারিত হতে শোনলাম। এই গজল সে কোথা থেকে পেল?
তকির : শুনেছি, বেনারসের এই যুবতী ইতিমধ্যে অনেক সংগীতানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে স্বীয় প্রতিভার জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে চলেছে। বহু কৃতিত্বের ও সুনামের অধিকারী সে। যেদিন থেকে চিরায়ত সংগীত পরিবেশনে দক্ষ হয়ে উঠেছে, সেইদিন থেকেই একান্তভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলেছে। নব্যকবিদের কবিতা তার সংগীত জগৎকে সমৃদ্ধ করছে। তোমার কবিতায়ও গজল বেঁধে চলেছে।
গালিব: ব্যাপারটি আমাকেও অবাক করে দিচ্ছে। গজলটি তো পুরাতন নয়।
তকির : হায় আল্লাহ! মর্ত্যের জিনিস কে নিয়ে গেল বেহেশতে?
গালিব: বিদগ্ধ বিরক্ত গালিবের জন্য বেহেশত বসে থাকে না। হৃদয়কে কেন শুধু শুধু কাঁদাবে, কেন এত আফসোস।
তকির : এবার আমি তোমাকে একটি পুরো খাতা কিনে দেব। নতুন গজল সেখানে লিখে রাখবে। তারপর সেই খাতাটি নাওয়াব বাঈকে উপহার দেব। আর কোনও কথা নয়। এবার চলো, বাড়ি যেতে হবে।
গালিব: (যেতে যেতে) হে ঈশ্বর জগৎ থেকে আমাকে মুছে ফেলছ কেন? পৃথিবীর পৃষ্ঠার ওপর আমি বাড়তি হরফ তো নই!
তকির : এই কলকাতার দ্বারপ্রান্তে তুমি চিরদিন থাকবে না, তবে এই কলকাতায় নাওয়াব বাঈই তোমাকে বিখ্যাত করে দেবে।
গালিব: তবুও এই সুখবরে কেন হৃদয় দমিত হয়, আমিও তো মানুষ, পিয়ালা-এ-সাগর নই।
তকির : তোমার এত দুঃখ কীসের গালিব?
গালিব: পাথর তো নয় হৃদয়, কেন তা বেদনায় পূর্ণ হবে না। তবুও সকল দুঃখ প্রকাশ করা যায় না।
তকির : কেন যায় না। তোমার দুঃখে আমারও তো তাতে একটা ভাগ রয়েছে। এত সতর্কভাবে, এত হিসেব করে চলে লাভ কী গালিব। এমনই কি তার মূল্য যে, সেইজন্য দুঃখটাকে উপেক্ষা করতে হবে?
গালিব: (হেসে) না, এবার হেরেছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে নিশ্চয় জানাচ্ছি তকির। তুমি মনে করেছ- শখ করে দুঃখ সহ্য করতে আমি এখানে এসেছি, তা সত্য নয়।
তকির : বেশ তো, সত্য না-ই হলো। আমি কারণটা জানতে চাই গালিব।
গালিব: (ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে) এখন থাক তকির। করুণা করো আমার প্রতি। হে ঈশ্বর এই জগৎ থেকে আমাকে মুছে ফেলছ কেন? পৃথিবীর পৃষ্ঠার ওপর আমি বাড়তি হরফ তো নই!
তকির : আরেকটি কবিতা সৃষ্টি হলো। চমৎকার। শুধু কবিতাই, দস্তান নয়?
গালিব: এক দিন হবে।
তকির : হলে দেখিয়ো।
গালিব: তুমি হাজার বছর বেঁচে থাকো, আর পঞ্চাশ সহস্র বছরের সমান হোক এক একটি বছর। তখনই দেখতে পাবে আমার দস্তান। এখন তাহলে বিদায় নিতে হয়।
তকির : কাল সকালে একবার আমার বাড়িতে এলে খুশি হব।
গালিব: (হাসতে হাসতে) খোদা হাফেজ।

দৃশ্য দুই

মঞ্চ : ত্রিস্তর।
উচ্চ : গালিব। মধ্য : নাওয়াব। নিম্ন : নৃত্যশিল্পী ও তকির।

গজল
হাজারও বাসনা হৃদয়-গভীরে, যার প্রতিটিই প্রাণহরা
যদিও মিটেছে অনেক বাসনা, রয়ে গেছে কত অধরা।
ভালোবাসার জন্য কোনো দুঃখও যখন নেই,
তবে বেঁচে থেকে কষ্ট-যাপনই হোক।

হে নিষ্ঠুর প্রিয়া আমার বিদায় ক্ষণে কাঁদতে দাও আমায়
আমি চলে যাওয়ার পর এমন যেন না হয়,
তোমার মুখের ওপর
প্রকাশিত লুকানো সকল দুঃখ আমার।

সংলাপ : তকির ও গালিব স্বতন্ত্র
[একদিকে, তকির সমগ্র ঘর ঘুরে বেড়ায়, এটা-ওটা দেখে; আর অন্যদিকে, গালিব টেবিলে বসে দস্তান লিখে চলে।]
তকির : পড়ন্ত মোগল সাম্রাজ্যের সন্তান গালিব। সে ভাগ্যবান। ভাগ্যবান হওয়ার কারণও রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, তার পূর্বপুরুষ ছিলেন সৈনিক। যেকোনও দেশের জন্য সৈনিক হচ্ছে শক্তি।
গালিব: সেকালে আমার সৈনিক পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে, সমরকন্দ থেকে।
তকির : একালে মনে হয় তা যেন চালচিত্র। সৈনিকদের সারাটি দিন কেটে যেত ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে। সৈনিক দ্বারা লড়াই করেই তো শক্তিরাষ্ট্রগুলো ক্ষমতা দখল করে। যেমন চলে ব্রিটিশ সৈন্য দ্বারা ভারতবর্ষে তাণ্ডব।
গালিব: সৈনিকদের লড়াই ছাড়া শক্তিরাষ্ট্রের তেজ থাকে না। রাষ্ট্র চেনে রক্ত। তাই তার পথে বাধা সৃষ্টি হলে নিজ সৈনিক দ্বারা চলায় খুন আর লুটতরাজ।
তকির : খুন ও লুটতরাজ করতে করতে ক্লান্ত সুরায় মাতুয়ারা সৈনিকরা, রাত্রি যখন নিঃসীম আকাশের মতো শান্ত তখন, তাঁবু খাটিয়ে প্রজ্বলিত আগুনে ঝলসাতে থাকে রক্তমাংস- লুট করে আনা নারীদের নিয়ে দেহোৎসব। বাজে রবাব-দিলরুবা। পরিবেশিত হয় গান। গান ছাড়া তো আত্মার মুক্তি নেই।
গালিব: সংগীত ও দেহোৎসবে সৈনিকের গরম রক্ত শীতল হয়।
তকির : একালেও সংগীত ও দেহোৎসবে গরম রক্ত শীতল হতে দেখেছি।
গালিব: সেকালে আমার সৈনিক ঠাকুরজানও মাঝেমধ্যে লুট করে আনা নারীর সঙ্গ, সুরা আর ক্ষমতার দম্ভ দেখাতেন। একালেও ঠাকুরজানকে নিয়ে আমার গর্বের কমতি নেই। তুরসম খাঁয়ের এক পুত্রসন্তান ছিলেন আমার ঠাকুরজান কুকান বেগ খাঁ। তার পুত্র আবদে-আল্লাহ বেগ খাঁ। ঠাকুরজান ও আব্বিজানের মাতৃভাষা ছিল সেলজুক-তুর্কি। তারা ভারতবর্ষের ভাষা বুঝতেন না।
তকির : যদিও তাদের মতো স্বহস্তে তলোয়ার ধারণ করেনি গালিব কোনওদিন, তবুও তাদের প্রতি তার গর্ব চিরস্থায়ী। অন্যের প্রাণহনন আর নিজের প্রাণবিসর্জন ব্যতীত তাদের জীবনে আর কিছুই ছিল না।
গালিব: ঠাকুরজান ও আব্বিজানের জীবন একালেও আমার কাছে স্বপ্নবৎ।
তকির : তাই বলি, দুজন গালিব রয়েছেন, একজন সেলজুক-তুর্কি, তিনি সম্রাটদের সঙ্গে মেলামেশা করেন; আর অন্যজন, আজ্ঞে, তার মাথায় অপমানের বোঝা।
গালিব: সেকালে কিংবা একালেও আমার স্বপ্নপুরুষদের সন্ধান পাইনি।
তকির : তোমার নিয়তি ছিল ভিন্ন, পেয়েছ কাব্য। কাব্য ছাড়া তো মানুষের হৃদয় চেনা যায় না।
গালিব: কাব্যই আমার জীবন- আনন্দবিষাদ, জীবনমৃত্যু, সৌন্দর্যপ্রকৃতি- সবই।
তকির : শব্দের নিবিড়তা, উদ্ধৃতির সাবলীলতা গালিবকাব্যে ভিড় জমায়। কাব্যিক স্বরূপ প্রকাশিত হয়। গালিবকাব্য আঁধার রাত্রিতে আলিঙ্গন করে ঊষাকে। অন্ধকার ঝুলে থাকে বাতাসে। মরা নদীতে ভেসে যায় তরুণী।
গালিব: একজন পরাসি কবি বলেছিলেন, *আমি তো অন্যজন*। এই অন্যজনকে সঙ্গে নিয়েই আমার উদয়, জন্মেছিলাম আগ্রায়। আকিকা অনুষ্ঠানে ভাবুক লোক ও সৈনিক আবদে-আল্লাহ বেগ খাঁ বলেছিলেন...
তকির : আমি ভাগ্যবান পিতা।
গালিব: আকিকা অনুষ্ঠানেই আগ্রার গুণীজন বলেছিলেন...।
তকির : আকাশ থেকে যেন একটি তারকা নেমে এসেছে আগ্রায়। তারকার জ্যোতিতে ভরিয়ে দেবে আগ্রার মানুষকে। এই শিশু আগ্রার মুখ উজ্জ্বল করবে।
গালিব: এসব কথা শুনলে জীবন ধন্য হয়ে যায়। দ্বিধাদ্বন্দ্বে শিহরিত হয়ে চোখ বিস্ফড়িত করে একালেও, সেকালের দিকে তাকিয়ে থাকি।
তকির : পূর্বপুরুষের গর্বে গালিবের রক্ত টগবগ

করে। নয় বছর বয়স থেকেই তার কবিতার দিকে ঝোঁক সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে পারসি কাব্যে।

গালিব: বিশ্বাস করুন, ব্যঙ্গ করছি না। আনন্দও লুটছি না। একটি পাত্র যদি ভেঙে যায় তবে বাজার থেকে আরেকটি কিনে আনতে পার। তবে মনে রেখো, রাজকীয় পাত্র থেকে গরিবের মৃৎপাত্রই ভালো। এক দিন শাহজাদা জাফরের মুফতি আমার কাছে এসে উপস্থিত হন। তাকে দেখে আমার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যদিও স্বর্গের অস্তিত্ব অন্বেষণে কবিসভা ব্যস্ত; তবুও গালিব-হৃদয় ভিন্ন কিছু ভাবলে ক্ষতি কী!

মুফতি (তকিরের কণ্ঠে) : তোমার কবিতা আমাকে মোহবিষ্ট করে। মির্জা গালিব ছাড়া আর কারও পক্ষে এমন কবিতা সৃষ্টি করা সম্ভবনয়! তোমার কবিতা কোনও কূপের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। শাহাজাদা জাফরের কবিসভায় তোমার কবিতা পৌঁছানো একান্ত প্রয়োজন। এই কাজটা আমি নিজে করতে চাই।

গালিব: (উষ্মা প্রকাশ করে) মির্জা গালিব, হায় খোদা, তার কাজ পৌঁছে যাবে শাহাজাদা জাফরের কবিসভায়? তার চেয়ে পড়ে থাক না এই সুন্দর হস্তলিপিগুলো এখানেই- অবহেলায়।

মুফতি (তকিরের কণ্ঠে) : কবিসভায় তোমার কবিতা নিয়ে যাবই। ততক্ষণ পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করো। দেখবে, সমস্ত মহাকাল তোমার কবিতার কাছে ঋণী। মির্জা গালিবের মতো কবি সহজে জন্ম নেয় না। কবিতাগুলো নিয়ে গেলাম। খোদা হাফেজ।

গালিব: আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন। আর আমি কাব্যের সন্ধানেই দৌড়াতে থাকি।

তকির : গালিব এখনও কাব্যের সন্ধানে দৌড়াচ্ছে।

গালিব: দৌড়াচ্ছি আম্মিজানকে নিয়ে একটি দস্তান রচনা করার জন্য।

তকির : যদিও সৈনিক পূর্বপুরুষের ভাঙা তির দিয়ে তৈরি কলমই তার তলোয়ার। তবুও এই তলোয়ার দিয়ে শুধু শের রচনা করা যায়, দস্তান নয়। অনাদি অনন্ত থেকে কবিতার বীজ বুকে নিয়ে সে জন্মেছে।

গালিব: গালিবকাব্য মানুষের আশ্রয় স্থল। গর্ব নয়, বরং ক্ষত- ক্ষতের-পর-ক্ষতের কথাই লিখে চলি। দর্পণ কিংবা তারকার দিকে তাকালেই কাব্য দেখতে পাই। কত আশ্চর্য সবশব্দ, হৃদয়দ্বারে হানা দেয়। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে শব্দগুলোকে সাজাই। কারা যেন সহসা এসে অন্তরে কথা বলে ওঠে; চমকে উঠি। গর্ব করে বলতে পারি, নয় বছর বয়সেই একটি অসাধারণ কবিতা সৃষ্টি করি।

তকির : নাটাই থেকে ঘুড়ি গেল ছুটে, আকাশে এলোমেলোভাবে ভাসে; বেঁধে যাবে যেকোনও মুহূর্তে বৃক্ষের মাথায়, নয়তো-বা মৃত্তিকায়।

গালিব: আগ্রা ও দিল্লি জীবনে দুটি জিনিসই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। পতঙ্গবাজি আর সতরঞ্জবাজি। উভয় খেলায় একাকী লড়াই করতে হয়, পাশে কেউ থাকে না, চোখও এক জায়গায় রাখা যায় না। পতঙ্গবাজির জন্য আকাশে আর সতরঞ্জবাজির জন্য সাদাকালো চৌখুপির মধ্যে দৃষ্টি না রাখলে পরাজয় অনিবার্য।

তকির : পতঙ্গবাজির দিনগুলো আজও মনে পড়ে। কালেমহলের পাশেই ছিল একটি সুবিশাল ছাদ।

গালিব: সেখান থেকে আমি ও তকির ঘুড়ি উড়াতাম। ওর সঙ্গে প্রায়ই ঘুড়ির প্যাঁচে হেরে যেতাম।

তকির : তখন গালিব বলত, আরে, সামনেই তো আরেকটি দিন রয়েছে।

গালিব: সেইদিন তকিরকে হারাবই। প্রতিদিন কি হেরে যেতে পারি? রাতে তকিরের সঙ্গে দাবা খেলায় কাটিয়ে দিতাম। সতরঞ্জবাজি আমাকে পতঙ্গবাজির চেয়েও অধিক টানত। এক-একটা চালে যখন তকিরের গুঁটি কাটতাম, তখন আমার সেলজুক-তুর্কি রক্ত টগবগ করে উঠত।

তকির : এক দিন অবশ্য গালিব চৌসরজুয়া খেলাও ধরে। মাঝেমধ্যে অবশ্য মির আজম আলি মাদ্রাসায় পড়তে যেত। বাড়িতে এসে শেখ মুয়াজ্জামও পড়াতেন।

গালিব: পড়াশোনায় আমার মন বসত না। মগজ খুঁজে মরত কাব্যকে।

তকির : কাব্যের মতো আলকিত ওর জীবন নয়। ওর নিজস্ব কোনও মহল ছিল না। এখনও যেখানে থাকে তাও অন্যের।

গালিব: নিজের দীনতার দিকে আঙুল তুলে বলি, মহল একটি মরীচিকা মাত্র। ছোঁয়া যায় না। শুধু মরুভূমিতে পাক খেয়ে মরে। আব্বিজানেরও কোনওদিন নিজস্ব মহল ছিল না। বাদশাহ শাহ্ আলমের দরবারে আব্বিজানের পদোন্নতির কোনও আশা না থাকায় তিনি ব্যথিত অন্তরে কখনও জয়পুর, কখনও-বা লাখনৌ বিংবা হায়দরাবাদের নবাবের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কয়েক বছরের জন্য হায়দরাবাদের নবাব নিজাম আলি খানের তিনশত সৈন্যের পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন তিনি। দিন কাটছিল মুগ্ধতায়। কিন্তু আব্বিজান সৈনিক ষড়যন্ত্রের শিকার হন।

তকির : এই ষড়যন্ত্রের কথা অবশ্য ইতিহাসে লেখা নেই, লেখা থাকলেই-বা কী!

গালিব: আব্বিজান অবশেষে চলে এলেন অলোয়ারে রাজা বখতওয়ার সিংয়ের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে।

তকির : এখানেও তিনি বেশিদিন থাকতে পারেননি।

গালিব: রাজা বখতওয়ার সিংয়ের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ দমনের সময় শত্রুর গুলিতে আব্বিজানের মৃত্যু হয়।

তকির : দুঃসংবাদ বাতাসের বেগে ধেয়ে আসে। মৃতদেহ একসময় এসে পৌঁছে।

গালিব: আব্বিজানের দেহে প্রাণ ছিল না।

তকির : লাশের পাশে রাখা তার তলোয়ারে কিন্তু ঠিকই প্রাণ ছিল। সূর্যের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছিল।

গালিব: আম্মিজান হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। প্রতিবেশীরা তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়। এটা-সেটা বলে।

তকির : গালিব পিতৃহারা হয়ে কীভাবে বড়ো হয়?

গালিব: আমি ভীষণ চঞ্চল ছিলাম, ঠাকুরজান বলতেন, আমার বিশ্বাস- এক দিন আসাদ বিশাল কিছু হবে। হয়তো-বা একজন বিখ্যাত কবি।

দৃশ্য তিন

মঞ্চ : দ্বিস্তর। উচ্চ : নাওয়াব বাঈ। মধ্য : গালিব।

[একদিকে গালিব কবিতা লিখে; আর অন্যদিকে নাওয়াব বাঈ রেওয়াজ করে।]

নাওয়াব:
প্রত্যেকটি লাল গোলাপ ফিরে ফিরে আমার মনকে টানছে;
অথচ আমি বেরিয়েছি শত ফুলবন দেখার পাথেয় নিয়ে ॥
ফুলবাগিচার রূপ দেখতে চাই, আবার ফুল তুলেও চাই-
হে বসন্তরাজ, আমার মন অপবিত্র ॥

গালিব:
দুনিয়ার ভয়ানক মজলিসে প্রদীপের মতো আমি
প্রেমের শিখাকেই সর্বস্ব জ্ঞান করি,
সর্বনাশের স্ফুলিঙ্গ তুমি, মানুষের ঘর উজাড় করতে
একাই কম কীসে?
তুমি যার বন্ধু হলে, আকাশ আবার তারও শত্রু
হতে চায় কেন?
খুশির কী আছে ক্ষেতের উপর যদি একশবারও মেঘ
আসে॥

নাওয়াব:
কেমন করে তোমাকে বলি তুমিই করেছ আমার
সর্বনাশ,
এতে ভাগ্যের দক্ষ হাতের খেলাও ছিল কিছু ॥
ফাঁদ পাতা ছিল বাসার খুব কাছে,
উড়তে-না-উড়তেই ধরা পড়ে গেলাম আমি ॥
সকল সম্পর্ক ছিন্ন কোরো না, বন্ধু;
আর যদি কিছু না-থাকে তো শত্রুতাই থাক ॥

গালিব:
পূর্বধারণা থেকে অপস্রিয়মাণ হওয়াতেই থাকে
প্রকৃতির সমস্ত শক্তি
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পথ যেমন মুছে দিয়ে যায়, সূর্য তেমন
আলো জ্বেলে রয় পথে পথে ॥
মৃত্যু ছাড়া হে আসাদ আর কীসেই বা দুঃখভরা
জীবনের পরিত্রাণ মেলে
অহর্নিশি মোম জ্বলে যায়, তাকে পুড়ে যেতে হয়
ভোর অবধি হেসেখেলে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য এক

স্থান : তকিরের বাড়ি।

সময় : সকাল।

সংলাপ : গালিব, তকির ও নাওয়াব

[একটি পুরাতন কাব্যসংকলন উলটাতে থাকে গালিব। তকির টেবিল থেকে ধুলো ঝারছে।]

গালিব: আমাকে তো প্রেমে নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছ, এবার যদি/ আমার নেশাপাত্রটি একটু কানায় কানায় ভরে দিতে!

তকির : এই সাতসকালেই নেশা করতে চাও?

গালিব: মৃত্যুই যেহেতু অনিবার্য, তাহলে নেশা নিয়ে কেন ব্যস্ত হবো না?

তকির : (মাথা নেড়ে) চমৎকার! আর-একটি নতুন কবিতা মনে হচ্ছে। (একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিতে দিতে) লিখে রাখো। তোমার এমন কত সৃষ্টি না লেখার জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গালিব: (কাগজটি হাতে নিয়ে) তকির, আমার মনে হচ্ছে এবার দিল্লিতে ফিরে যাই।

তকির : গালিব, তুমি এই ধারণা মনে পোষণ কোরো না।
গালিব: কিন্তু...।
তকির : কিন্তু আবার কী! তুমি আগ্রায় জন্মেছ, দিল্লিতে সংসার পেতেছ; তবেদিল্লি তোমার কবিতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেনি; বরং অসম্মানই করেছে।
গালিব: অসম্মান দেখে প্রথমে হাসি পেত, কিন্তু এখন কোনও কিছুতেই পায় না। আমি এমন এক উদ্যানের বুলবুলি, যে উদ্যান এখনও সৃষ্টি হয়নি।
তকির : সেই উদ্যান কি কখনও তৈরি হবে?
গালিব: হবে। একদিন হবে।
[হঠাৎ নাওয়াববাঈ ঘরে প্রবেশ করে।]
নাওয়াব: আদাব।
তকির : (ঘাড় ঘুরিয়ে) আদাব।
গালিব: আদাব।
নাওয়াব: মির্জা গালিবের একখানা কবিতার বই দেওয়ার কথা ছিল। এখন পাওয়া যাবেকি?
তকির : এই নিন তার গুল-এ-রানা গজলের বইটি। কিন্তু তার ব্যাপারে আপনি এত আগ্রহী কেন?
নাওয়াব: আগ্রহটা আমার গুরুজিই সৃষ্টি করেছেন। গত সন্ধ্যায় গুরুজির শেখানো গালিবের একটি গজল পরিবেশন করিছি। যদি তার সঙ্গে কখনও দেখা হয়, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।
তকির : এই যে, সে এখানেই বসে আছে।
নাওয়াব: এখানে! আপনি?
গালিব: (কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে) আজ্ঞে, আমি।
নাওয়াব: (মৃদু হেসে) আমি নাওয়াববাঈ।
গালিব: অপূর্ব! আপনার নাম তো অন্যকিছু হতে পারে না।
তকির : ঠিক বলেছ গালিব।
নাওয়াব: আমার নাম অন্যকিছু হতে পারে না?
গালিব: না। আম্মিজানের কাছে শেখা একটা প্রবাদ বলল?
নাওয়াব: হ্যাঁ, বলুন।
গালিব: মুখের নবাবিচাপলে কি হয়? গোপন নাবাবি চলনে বেরোয়। বুঝলেন তো কেন বলেছিলাম, আপনার নাম নাওয়াবছাড়া আর কিছু হতে পারে না।
তকির : নাওয়াববাঈয়ের সঙ্গে আলাপ করলেই মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। সুন্দর কণ্ঠটিই বন্ধুতেরই আহ্বান দেয়।
গালিব: দেবীর মুখদর্শনে বন্ধুত্ব কোমল হয়; মনের দর্পণ মুখের রং বদলায়।
নাওয়াব: (হেসে) আপনার কবিতা আসলেই অসাধারণ। আর-একটি কবিতায় বলেছিলেন, বন্ধুত্বে এমনই আগুন, সেখানে জবরদস্তি খাটে না।
গালিব: দেবীর ইচ্ছে হলে বন্ধুত্বের জন্য সম্মতি নিষ্প্রয়োজন; সে প্রেমাগ্নি জ্বালাতে কিংবা নেভাতে পারে।
নাওয়াব: আপনার কি বন্ধুত্বে অসম্মতি প্রকাশের কোনও কারণ থাকতে পারে?
গালিব: বন্ধুর বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে থাকব। বন্ধুর চুলে অদৃশ্য সবতসবির এঁকে দেবে, তখন সে আস্তেধীরে ঘুমিয়ে পড়বে।
তকির : (হেসে) আর এই ঘুমের মধ্যেই বন্ধুর চুলে তুমি কবিতা রচনা করে চলবে। এখন থেকে তুমি আর কাগজে কবিতা লিখো না, সকল কাগজ আমি পুড়িয়ে দাও গালিব।
গালিব: দুর্ভাগ্যের শিকার আমি, বন্ধুর চুলে কখনও কবিতা লেখা হয়নি, যদিও বিচ্ছেদ মুহূর্তের হিসাবকখনও রাখা হয়নি। এমনকি বন্ধুর হাতের সুরাপাত্রও আমার কাছে পৌঁছেনি। তারই প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছি, যদিও আসার প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু আসেনি।
নাওয়াব: বন্ধুর হাতের সুরাপাত্রটি তো আসে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রলোকিত রাত্রিতে।
তকির : তুমি দেখছি, গালিবেরও চিন্তার চাইতেও অনেক উঁচুতে বিচরণ করো।
নাওয়াব: (তকিরের উদ্দেশে) আপনার বন্ধুটি কি মামুলি কবি? তিনি ছোটোখাটো শায়েরও নন। মশহুর। বিশাল কবিতিনি।
গালিব: কেউ পাগলামি করতে দেখলে, লোকজন তার পেছনে ধাবিত হবেই। এটি নতুন কিছু নয়।
নাওয়াব: সরাসরি তারিফ না করে বরং গুল-এ-রানাতে তালাশ করে দেখি, ইশকের টানে সন্ধ্যায় নতুন কিছু কি উপহার দেওয়া যায়?
তকির : ঠিক বলেছ, নাওয়াববাঈ।
নাওয়াব: ঠিক বলেছি।
তকির : বিলকুল ঠিক বলেছ। একটুকুও গলতি নেই।
নাওয়াব: তাহলে আর সময় নষ্ট কেন? আসি।
[নাওয়াববাঈ গুল-এ-রানা গজলের বইটি নিয়ে প্রস্থান করে।]

দৃশ্য দুই

স্থান : কলকাতা নাট্যমঞ্চভবন
মঞ্চ : দ্বিস্তর।
উচ্চস্তর : নাওয়াববাঈয়ের গজল পরিবেশন।
নিম্নস্তর : নৃত্য পরিবেশন।
সময় : রাত।

গজল

এসো তুমি প্রাণ যায় যায়। এসো তুমি! অপেক্ষার ধৈর্য নেই আর।
জীবনশেষে দেহ যদি পাইও, জীবনশেষে জ্বালার সে কী হয় প্রতিদান?
তোমার মেহফিলে যদি কেঁদে ফেলি ভয়ে তাই মরে যাই;
প্রাণ ভরে কাঁদার মতো পাই না একটু ঠাঁই! হায়, হায়, হায়।

আমার হৃদয়ের কোথায় আছে হিংসা, ক্রোধ।
প্রেমের ভস্মস্তূপে থাকে না কোনো বিরোধ।
আমাকে হত্যার যদি করো শপথ, ভেঙে না সেই প্রতিজ্ঞা আবার;
শপথ করেছে গালিবমাতাল হবেনা, নয়তো হবেনা বন্ধুর প্রতিজ্ঞা পালন।
আয়না দেখে চুপ কেন? প্রেমলাজ? হৃদয় দেবেনা বলে গর্ব ছিল; করো সাজ।
পত্রবাহকের প্রাণ নিয়ো না তোমার হাতে; নেই তার অপরাধ।
তার তাতে যা কিছু হয়েছে আমার অপরাধ সকলি আমার।

সংলাপ : তকির, গালিবও নাওয়াব বাঈ।
তকির : তলবআছে।
গালিব: কোথায়?
তকির : বাগিচার অন্দরে।
গালিব: কে তলবকরেছে?
তকির : নাওয়াববাঈ।
গালিব: তাজ্জব। তুমি হয়তো ভুল করেছ। নাওয়াববাঈ হয়তো অন্য কাউকে তলবকরেছেন।
তকির : না, না। সে তোমাকেই তলবকরেছে। তুমি যাও।
গালিব: আমি একা যাব? তুমি যাবেনা?
তকির : এখানে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।
গালিব: সঙ্গে যাওয়ার জন্য তোমাকে পীড়াপীড়ি করবনা তকির।
তকির : তোমার ওপর আমার যে কত শ্রদ্ধা গালিব, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবনা। আর দেরি নয়, এখনই যাও।
[বাগিচার অন্দরে এসে দাঁড়ায় গালিব।]
নাওয়াব: বসুন। আসন নেই, ঘাসের আসন। এর ওপরই বসুন।
গালিব: ঘাসের ওপর শোয়া আমার খুবপ্রিয়। বসতে আপত্তি কীসের!
নাওয়াব: খুবব্যস্ত নাকি?
গালিব: না। আজকের মতো কাজ আমার শেষ।
নাওয়াব: বহুৎ আচ্ছা। তাহলে বসুন। সামনে এসে বসুন। নাকি আমার সামনে বসতে আপত্তি আছে?
গালিব: না, নেই।
নাওয়াব: তাহলে দাঁড়িয়ে আছেন যে। একটু আরাম করে বসুন।
নাওয়াববাঈয়ের সামনে বসে গালিব।
গালিব: বলুন, তলবকরেছেন কেন?
নাওয়াব: তুমি বলতে বুঝি দ্বিধাবোধ করছেন। করার কোনও প্রয়োজন নেই।
গালিব: মনে থাকবে।
নাওয়াব: খুশি হলাম। তবেএকটা আরজ ছিল।
গালিব: আরজ?
নাওয়াব: একটা অনুরোধ।
গালিব: বলো।
নাওয়াব: চাকরি করবেন?
গালিব: কোথায়?
নাওয়াব: আমি নবাবনাসিরউদ্দিনের রাজসভার শিল্পী। সেখানকার রাজশায়েরের স্থানটি বর্তমানে শূন্য।
গালিব: তুমি ব্যবস্থা করবে?
নাওয়াব: আপনার মতো একজন প্রতিভাবান শায়েরের জন্য এমনটা করতে পারাটাই তো ভাগ্যের ব্যাপার।
গালিব: বড়ো পদে যাওয়া মানেই ভীষণ ঝামেলা। সেটা আমি চাই না।
নাওয়াব: চান না?
গালিব: না।
নাওয়াব: এরকম একটা সম্মানের পদে যেতে চান না আপনি?
গালিব: না।
নাওয়াব: নাবাবনাসিরউদ্দিনের রাজশায়ের হওয়ার আপনার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই?
গালিব: চাকরি করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। স্বাধীন থাকতে চাই। স্বাধীন মনেই কবিতা লিখতে চাই। এ নিয়েই পরে থাকতে চাই। রাজকবিহওয়া একদম পছন্দ নয়।

নাওয়াব: রাজশায়ের হয়ে কবিতা লিখে বিখ্যাত হতে চান না? সমগ্র ভারতবর্ষে নাম ছড়াতে চান না?
গালিব: আমার আচরণ কিংবা কোনও কথায় যদি তোমার এমন ধারণা হয়ে থাকে তাহলে আমাকে ক্ষমা করো। এ আমার বদ নসিব।
নাওয়াব: বদ নসিব!
গালিব: এমন ধারণা যদি সত্যি সত্যিই তোমার হৃদয়ে জন্মে তাহলে আমার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হবে।
নাওয়াব: অবিচার করা হবে?
গালিব: আমি কবিতা সৃষ্টি করি। কবিতার মধ্যেই আমি নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাই। পায়ে শৃঙ্খল পরার জন্য অবিশ্যি নয়। এই পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকার একটি অবলম্বন চায়। আমার জন্য সেটি হচ্ছে কবিতা। স্বাধীন ও মুক্তভাবেকবিতাচর্চা করা। মস্তবড় শায়ের হওয়া, খেতাম পাওয়া বা দেশবিখ্যাত হওয়ার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আশাও করি না।
নাওয়াব: সে কী!
গালিব: বিশ্বাস কর, আমি এক বর্ণও মিথ্যে বলছি না। সেই আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে একবিন্দুও নেই। তবেমনে রেখ, আমিই ভারতবর্ষের প্রধান পারসি কবি, দ্বিতীয়টি নেই।
নাওয়াব: তাজ্জবকথা বলছেন আপনি!
গালিব: তাজ্জবহলেও চরম সত্য এটি।
নাওয়াব: কেন বলুন তো? কেমন যেন একটা রহস্যের মতো লাগছে।
গালিব: রহস্য।
নাওয়াব: বিরাট রহস্য। এই দুনিয়ায় সকলেই বিখ্যাত হতে চায়। কোনও মানুষই তুচ্ছ হয়ে থাকতে চায় না। একজন বাতুলও নয়। আপনি কেন তা চাচ্ছেন না?
গালিব: মানুষ কীভাবেসুখী হয় তা এক মাপে নির্ধারণ করা কঠিন।
নাওয়াব: কঠিন!
গালিব: আমার তা-ই মনে হয়। আর অন্যের কথা যা-ই হোক, আমি অন্তত মুক্তভাবেকবিতা সৃজন করে যেতে চাই।
নাওয়াব: না, হলো না। এটি আদৌ কোনও যুক্তি হলো না। অবশ্য আপনার যা ভালো লাগবেতাই করবেন। আমি শুধু ঝোঁকের মাথায় তকলিফ দিলাম আপনাকে।
গালিব: গালিবকি নির্বোধ, খোদা কখনও যে ত্রুটি ধরেন না বা ধরাটা সমীচীনবোধ করেন না, তুমি সেই সাহস করলে।
নাওয়াব: সত্যি কথা বলার সাহস তো সকলেরই থাকা উচিত। আর কথা নয়, এখন বাড়ি ফেরতে হবে। তকির সাহেবহয়তো আমার দেরি দেখে বিরক্ত হচ্ছেন।
গালিব: তাহলে চলো। ওর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।
নাওয়াব: শুকরিয়া।

দৃশ্য তিন
স্থান : রাজপথ।
সময় : রাত।

সংলাপ : তকির ও নাওয়াব।
নাওয়াব: আপনার বন্ধুকে যে দেখছি না।
তকির : সে যত্ন করেই দূরে সরে গেছে।
নাওয়াব: যত্ন করে দূরে সরে গেছেন!
তকির : হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। এখন বলো, কলকাতা তোমার কেমন লাগছে?
নাওয়াব: নিশ্চয় ভালো। তবে...।
তকির : তবেবলে থেমে গেলে কেন?
নাওয়াব: তবেআমি একটু চিন্তিত।
তকির : চিন্তিত?
নাওয়াব: হ্যাঁ চিন্তিত।
তকির : কেন?
নাওয়াব: আপনি ও আপনার বন্ধু অসম্ভব যত্নপ্রবণ। এই দুই দিন আপনারা আমাকে বড্ড বেশি কাছে টেনে নিয়েছেন।
তকির : তার জন্য তুমি চিন্তিত কেন?
নাওয়াব: আমি কী আপনাদের এই যত্নের সত্যি যোগ্য? যখন আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবএবং যোগাযোগ রাখতে পারবনা, তখন তো আপনাদের প্রতি অন্যায় করা হবে।
তকির : একটা কথা বলব?
নাওয়াব: বলুন।
তকির : হাজার হোক তুমি আমাদের অতিথি। তোমাকে যত্ন করাই তো আমাদের কর্তব্য। আর এটাই স্বাভাবিক, তাই না? আমরা লাখনৌ গেলে কি তুমি আমাদের যত্ন করবেনা? অবশ্যই করবে।
নাওয়াব: আপনি ঠিকই বলেছেন। তবুও চিন্তা, আমি কাউকে দুঃখ দিতে চাই না।
তকির : তুমি যে কাউকে দুঃখ দেবেনা সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত।
নাওয়াব: কিন্তু ভুলে যাবেনা, কারণে কিংবা অকারণে মানুষ বদলে যায়। আমি চিরকাল একইরকম নাও থাকতে পারি।
তকির : বদলে যাওয়া অর্থই তো খারাপ নয়।
নাওয়াব: আপনার সঙ্গে বকবক করে গলা শুকিয়ে গেল। আশপাশে কি কোনও চায়ের দোকান আছে? সেখানে বসে বকবকও করা যাবে, গলাটাও একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাবে।
তকির : ঐ যে পথের পাশে একটা চায়ের দোকান রয়েছে। সেখানে বসা যায়।
নাওয়াব: বেশ খিদেও পেয়েছে।
তকির : সেখানেই কিছু খাওয়া যাবে।
নাওয়াব: বাহ! চমৎকার!
[রাস্তার পাশের চায়ের দোকানটিতে এসে উপস্থিত হয় ওরা দুইজন। চায়ের সঙ্গে জলখাবার খাচ্ছে ওরা।]
তকির : তুমি কি সবসময়ই শাড়ি পর?
নাওয়াব: না, তবে কোথাও গেলে শাড়িই পরি। সত্য কথা কি কুর্তা সেলোয়ার পরে পথেঘাটে যাতায়াত করতে আমার লজ্জা করে।
তকির : লজ্জা কেন?
নাওয়াব: ছেলেগুলো এমনভাবে চেয়ে থাকে যে...।
তকির : বুঝেছি। তোমাকে শাড়িতে সুন্দর দেখাচ্ছে।
নাওয়াব: সত্যি!
তকির : হ্যাঁ, সত্যি খুবভালো লাগছে।
নাওয়াব: তাহলে ভুল করিনি।
তকির : অবশ্যই করোনি। ভারি সুন্দর করে সাজিয়েছ নিজেকে।
নাওয়াব: তাই না!
তকির : হ্যাঁ, সত্যিই তাই। একটা কথা জানতে খুবইচ্ছে করছে।
নাওয়াব: কী!
তকির : তোমার কি মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া ঠিক হয়েছে, না কি ভুল হয়েছে?
নাওয়াব: আপনি?
তকির : আমি?
নাওয়াব: হ্যাঁ, তকির সাহেব, আপনি।
তকির : শুধু কি তকির বলা যায় না। আপনি থেকে তুমিতে কি নেমে আসা যায় না।
নাওয়াব: আমি তো নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আপনি এমনভাবেআবদার করেন, আমি না বলতে পারি না।
তকির : সত্যিই? আমি কি যার-তার কাছে আবদার করি? শুধু তোমাকেই এইভাবেবলতে পারি।
নাওয়াব: অবিশ্যি। এখন তাহলে বাড়ি যাওয়া যাক।
তকির : চলো।

তৃতীয় অঙ্ক
দৃশ্য এক
স্থান : গালিবের বাড়ি।
সময় : সকাল
[দরজায় কড়া নড়ে ওঠে। দরজা খুলে দেয় গালিব।]
গজল (গালিবের কণ্ঠে)
প্রেমেই নাকি সুখের ঠিকানা, ব্যথার ওষুধ প্রেমেই আছে;
প্রেমেই এমন কষ্ট পেলাম, যার ওষুধ নেই কারও কাছে।

আমি মরার জন্য অপেক্ষায়, সে-ই তো এলো না;
আচ্ছা, মারার জন্য রূপময়ীর তূণে কি কোনো তির নেই।

প্রেম নিয়ে হায় জোর চলে না, গালিবএ এক অগ্নিদহন;
জ্বালিয়ে দিলেও জ্বলে না প্রেম, নিভিয়ে দিলেও নেভে না মন।

সংলাপ : নাওয়াবও গালিব।
নাওয়াব: তকির সাহেবের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করেই এখানে ছুটে এলাম। ভেতরে আসতে পারি?
গালিব: নিশ্চয়।
নাওয়াব: খবর না দিয়ে ছুটে এসেছি বলে ক্ষমা করবেন।
গালিব: না, না, কোনও সমস্যা নেই।
গালিব: তর্কবিতর্ক পরে হবে। এখন একটু বোসো। চায়ের জন্য বলে আসছি।
নাওয়াব: ব্যস্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই।
গালিব: একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।
[গালিবচলে যায়। নাওয়াববাঈ উঠে গিয়ে চারদিক দেখতে থাকে। বিশেষ করে টেবিলে ছড়ানো কবিতার পাতাগুলো। চায়ের পেয়ালা হাতে ফিরে আসে গালিব। নাওয়াববাঈও একটি কুর্শি টেনে বসে। গালিবচায়ের পেয়ালা দুটি একটা টেবিলের ওপর রেখে, কুর্শি টেনে নাওয়াববাঈয়ের মুখোমুখি বসে। ঘরোয়া পরিবেশে।]

নাওয়াব: গত সন্ধ্যায় আপনাকে দেখলাম না যে। আপনার দেখা পেলে খুশি হতাম। নাকি কোনও ব্যাপারে আপনি আমার ওপর রেগে আছেন।

গালিব: তোমার গান ঠিকই শুনেছি। অসাধারণ কণ্ঠ তোমার। মুনশিয়ানা গায়কি ঢং। আলাপ, বিস্তার ও তানের অলংকারে সংগীতকে তুমি যতই সাজালে ততই যেন রাগিনীর অন্তরায় নয়, নিজেকেই বিকশিত করলে। গানের সুরে সুরে যেন নিজেকেই সুন্দর করে তুললে। তোমার গান যত খুলে যাচ্ছিল ততই তুমি সুন্দর হচ্ছিলে।

নাওয়াব: (হেসে) কী যে বলছেন! কিন্তু যাই বলেন না কেন, আপনি আজ একটু অন্যরকম। পরিমিত কথা আর সংযত দৃষ্টি। তবেআমাকে একথা স্বীকার করতেই হয়, আপনার গজল ছাড়া আমার সংগীতের কোনও গতি নেই।

গালিব: সে-ই কথা! নতুন গজল না হয় লিখে দেব, তাছাড়া কী তোমার কথা ভাবার আমার অধিকার আছে?

নাওয়াব: আপনি একজন কবি, আর আমি সামান্য একজন ভক্ত। তাছাড়া আমি কোথাকার কে তা জানি না।

গালিব: সুগায়িকা!

নাওয়াব: আমার ওস্তাদও বলেন, আমি সুগায়িকা। ব্যস, অন্য পরিচয়ের দরকার নেই।

গালিব: সে তো ঠিকই বলেছেন তোমার ওস্তাদ।

নাওয়াব: কিন্তু আমার জগৎ আলাদা। এই জগতের বাইরে আমার ঠাঁই কতখানি তা জানি না।

গালিব: তোমার সংগীতভক্তরা তো তোমাকে সে চোখে দেখে না, নাওয়াববাঈ।

নাওয়াব: ছি, ছি, তাদের কথা তো বলছি না আমি। তাদের কথা তো ওঠেই না। ভক্ত তো ভক্তই। আমি বলছি, আপনার সঙ্গে আমার সহজে মেলামেশা করা বোধ হয় উচিত নয়। যা বললাম তা আপনাকে ভেবে দেখা উচিত।

গালিব: যা বলছ, হয়তো তা নিজেই জানো না। তার চেয়ে আমরা যেমন আছি তেমনই থাকা উচিত নয় কি?

নাওয়াব: মির্জাসাহেব, মিথ্যা কথা বলতে পারি না। তাই আমার আশঙ্কার কথাই ব্যক্ত করলাম। জানি, আপনি আমাকে কতটুকুই জানেন, কিংবা আমিই আপনাকে কতটুকু জানি। এর চেয়ে বেশি জেনেই-বা কী লাভ?

গালিব: তা নাই-বা জানলাম, তবে তোমার সঙ্গে যে পরিচয় ঘটল তা তো ভুলতে পারি না। সেই সকাল, সেই সন্ধ্যা, আর আজকেরই এই সময়টার কথা তো অস্বীকার করতে পারি না, নাওয়াববাঈ। তুমি কি পার সবভুলে যেতে? ভুলতে চাইলেই কি সব ভোলা যায়?

নাওয়াব: আর বলবনা, মির্জা সাহেব। (তারপর দৃষ্টি না নামিয়ে বলে) আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেলাম।

গালিব: কী?

নাওয়াব: আপনার একটি কবিতাকে নতুনভাবে ছন্দবদ্ধ করিছি। কথার সঙ্গে সুরটা ভালো বসেছে। অবশ্য কথার জন্যই সুরটা বেশ হয়েছে।

গালিব: (হেসে) তাহলে প্রমাণ হয়ে যাক।

নাওয়াব: শুনতে চাইলে সন্ধ্যায় আমার অনুষ্ঠানে আসতে হবে।

গালিব: তাহলে শর্ত বাঁধা রয়েছে।

নাওয়াব: আসবেন তো? (উত্তর শোনার আগেই) দেরি হয়ে গেল।

গালিব: রাগ করে বলছ না তো?

নাওয়াব: (উঠে দাঁড়িয়ে) রাগ করবকেন? আমার দেরি দেখে হয়তো-বা তকির সাহেবভাবতে বসে গেছেন। যাই হোক এখন উঠা উচিত।

গালিব: বেশ। আর কিছু বলবে?

নাওয়াব: (দরজার দিকে যেতে যেতে) আসছেন কিন্তু। জোর করেই সম্মতি নিয়ে রাখলাম।

গালিব: আচ্ছে।

নাওয়াব: (দরাজার বাইরে পা রেখে) আপনাকে আসতেই হবেবলে দিচ্ছি। কোনও অজুহাত শোনব না।

[নাওয়াববাঈ চলে যায়।]

গালিব: তুমি আমার সঙ্গেই আছ, তবুও কী করে হৃদয়ের কথা বলি, মুখ তো হৃদয় থেকে পৃথক।

দৃশ্য দুই

স্থান : কলকাতা নাট্যমঞ্চভবন
সময় : সন্ধ্যা।
মঞ্চ : দ্বিস্তর।
উচ্চস্তর : নাওয়াববাঈয়ের গজল পরিবেশ। নিম্নস্তর : নৃত্য পরিবেশ।

[দর্শককৃন্দ নিশ্চুপ হতেই নাওয়াববাঈ আলাপ শুরু করে। আলাপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সারেঙ্গিবাদক আঙুলের আঘাতে সুর সৃষ্টি করতে থাকে। রাগ ও ভাবের সংমিশ্রণে চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়। আলাপ শেষে একটি শায়েরি পরিবেশন করে নাওয়াববাঈ।]

প্রেম নয়, স্বীয় ভাগ্যে আছে কেবলই উন্মাদনা; এই ভাগ্য হোক-না তোমার সুরাপাত্র।
আমি তো আর নিজের শত্রু হতে পারি না, যদি অন্য কেউ তোমাকে চায় তাহলেই-বা কী!

[নাওয়াববাঈ পরম আবেগে দ্বিতীয় স্তবকটি গাইতে থাকে।]

কাউকে হৃদয় দেওয়ার পর, আফসোস করে কী লাভ!
হৃদয়ই যদি তোমার সঙ্গে না থাকে, মুখে বিলাপ কেন?

[নাওয়াববাঈয়ের শায়েরির সুর নিচু। মনে হয়, গালিবের কবিতার প্রতি তার অদ্ভুত আকর্ষণ। অপূর্ণ প্রেমের বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে তার কণ্ঠে। সারেঙ্গিতেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিষাদের সুর। সমগ্র পরিবেশ পরিপূর্ণ এই সুরে। শায়েরি এগিয়ে যায় তৃতীয় স্তবকে।]

অপেক্ষা করাই যদি হয় আমার পরীক্ষা, তাহলে যন্ত্রণা কাকে বলে?
আমার প্রেমের প্রতি আনুগত্য থাকলে আমার পরীক্ষা কেন নেবে?

[গজলের মৃদুসুর দর্শকের কাঁধ স্পর্শ করে। গজলকে জীবন্ত করে তুলতে নাওয়াববাঈয়ের ঠোঁট কাঁপতে থাকে। সারেঙ্গিতে নিঃসঙ্গতার সুর বাজতে থাকে। অতঃপর নাওয়াববাঈয়ের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় চতুর্থ ও শেষ স্তবক।]

দেহ যখন পুড়ে যায় তখন হৃদয়ও নিশ্চয় ভস্মীভূত হয়।
এখন তুমি হৃদয়ের ছাই দিয়ে কী করবেভাবছ?
তোমার জন্য আমার প্রেম ব্যর্থ হতে পারে না; প্রেম না হোক, ঝামেলা হয়েই থাকতে চাই তোমার কাছে।

[মধুর কণ্ঠে গাওয়া গজলের সুরটি দর্শকে মাতিয়ে রাখে। বিশ্বজয়ের হাসি যেন লেপটে আছে নাওয়াব বাঈয়ের মুখে। এই হাসিটি মাটির পৃথিবীতে কেমন যেন বেমানান। প্রেম, আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, সমর্পণ-সবই যেন প্রকাশ পাচ্ছে তার হাসিতে। কিন্তু তার দৃষ্টি ঘুরেফেরে গালিবের সন্ধানে; কিন্তু পায় না। সংগীতানুষ্ঠান শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই নাওয়াব বাঈয়ের কাছে এসে দাঁড়ায় গালিব।]

সংলাপ : গালিবও নাওয়াববাঈ।

নাওয়াব: আপনি এমন শান্ত থাকেন কী করে? না কি আমার সঙ্গই আপনাকে চিন্তামগ্ন করে দেয়।

গালিব: খুবরাগ হচ্ছে বুঝি!

নাওয়াব: না, না।

[হাসি ঠোঁটের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে দেখা দেয়।]

গালিব: তোমার হাসিটা কৃত্রিম।

নাওয়াব: হ্যাঁ, কৃত্রিমই তো। আমি যে একজন শিল্পী তা অবশ্যই ভুলে যাননি।

গালিব: শিল্পী বলে বুঝি কৃত্রিম হাসতে হয়?

নাওয়াব: সংগীত পরিবেশনে অভিনয়েরও প্রয়োজন পড়ে।

গালিব: সংগীতই আমাকে খুন করেছে।

নাওয়াব: কৌতুক করছেন?

গালিব: না, অবিশ্যি নয়। কিছু কথা থাকে যা হৃদয়কে করে রাখে পাথরবৎ।

নাওয়াব: সামান্যতম প্রশ্নের উত্তর দিতেও কাব্য করে কথা বলেন কেন?

গালিব: চলো বাগিচার অন্দরে।

নাওয়াব: চলুন।

[দুজনই এগিয়ে চলে।]

গালিব: তোমার ছায়াটি ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

নাওয়াব: ছায়ায় অভিভূত হওয়ার কী প্রয়োজন, জীবন্ত মানুষটিই তো আপনার পাশে। ছুঁতে তো বাঁধা নেই?

গালিব: ছুঁতে গেলে যদি আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, তাই বাস্তবমানুষটিকে ছুঁতে ভয় হয়। তাছাড়া জীবন্ত মানুষটির এতরূপ, পথ চলাই কঠিন, পথ হারিয়ে যাচ্ছি।

নাওয়াব: আপনার কথায় দম আটকে আসে।

গালিব: সত্যি বলছি, তুমি অরূপা। যেন মর্ত্যলোকের কোনও মানবী নয়, স্বর্গের অপ্সরা। চোখদুটি অসাধারণ গভীর! কী বিশালত্ব! যেন প্রস্ফুটিত জলপদ্ম। একমুহূর্তেই যেন বন্দি হয়ে যাই এই দুই জীবন্ত চোখে।

নাওয়াব: অপ্রাকৃতিক প্রকৃতির প্রভাব হয়তো-বা চলছে আপনার অন্তরে। অকারণে ছলাৎ করে উঠছে আপনার মস্তিষ্ক। এবার সত্যি করে বলুন তো আপনার এত বিরহ কেন?

নাওয়াব: আপনার কথায় এত বিরহ কেন? দূর থেকে অভিভূত হওয়ার কী প্রয়োজন, কাছে আসতে তো বাঁধা নেই?

গালিব: একজন সমাজচ্যুত বঞ্চিত কবির কি বিরহ থাকতে পারে না। আমার স্বাদ-আহলাদ, আকাঙ্ক্ষা-বাসনা থাকতে পারে না, যদিও আমার এক ভিন্ন জগতে আবাস।

নাওয়াব: আমি কবিনই, তবেশিল্পী। তাই শরীর আছে, অস্তিত্ব আছে; সুতরাং কামনাবাসনা থাকা অন্যায় কিছু নয়। জীবনের পথে হাঁটছি। সংগীতসাধনার মধ্যে ডুবেথাকায় হয়তো-বা সংসারী হতে পারিনি। স্বামী পাইনি, সন্তানের মা হইনি; কিন্তু এসবআকাঙ্ক্ষা যে মনে জাগে না তা তো নয়।

গালিব: এখন বুঝি সংসারী হতে ইচ্ছে করছে। সংসারধর্ম, সন্তান লালনপালনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর তাই হয়তো একজন জীবনসঙ্গী চাও। আনন্দ চাও। সুখশান্তি চাও। এমনটাই চাও কিন্তু অন্যায় নয়। তবে জীবনসঙ্গী হিসেবেযাকে নির্বাচন করতে চাও তার সংসার সংগতি ও স্ত্রীসন্তান পালনের ক্ষমতা আছে কিনা তা তোমাকে ভেবেদেখা উচিত। মনে রেখ, এই পুতুলের রাজ্যে রহস্যের কথা কি শুধাব? মানুষ নয়, শুধু মনুষ্যাকৃতি অনেকেই রয়েছে।

নাওয়াব: অদ্ভুত! কিন্তু আপনারই এক কবিতায় বলেছেন, সে যদি অন্যের প্রেমে পড়ে, তাহলে অপার্থিবজগতে মিশে যাব।

গালিব: সে তো যাবই। এই পৃথিবীর কোথাও আমি থাকতে আসেনি। তবেকেন আমাকে নিয়ে এই অহর্নিশ খেলা।

নাওয়াব: আপনার কবিতা শুনলে আমার মাথাটি লাটিমের মতো ঘুরে।

গালিব: অথচ অবচেতন মনে বাসনা থেকে যায়। প্রেমের বাসনা, প্রেমকে স্পর্শ করে দেখার বাসনা।

নাওয়াব: প্রেমের বাসনা সত্যিই রয়েছে গালিব-হৃদয়ে।

গালিব: আছে, কিন্তু...।

নাওয়াব: কিন্তু আবার কী!

গালিব: এমন ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে নিজের খবর রাখাই অসম্ভব। আর অন্যের ...।

নাওয়াব: অন্যের কী?

গালিব: জীবন অনেক বিস্তৃত। এই জীবনে সকলে ভাগ্যে প্রেমলাভ হয় না, কেবল সৌভাগ্যবানরাই সেটির দেখা পায়।

নাওয়াব: বাদবাকিরা?

গালিব: বিরহে কাটায়। বিরহে কাতর প্রেমিক জানে, প্রেম নাই-বা হলো আমার তাতে কিছুই যায়-আসে না, তবেপ্রত্যাশা থেকে যায়- এই জীবনে প্রেমের সন্ধান করার।

নাওয়াব: জীবন তো আর নাটক নয়। বাস্তব জীবনে ছন্দতালে নৃত্যগীতের দৃশ্য তৈরি হয় না, বরং প্রেম বিপজ্জনকই হয়ে ওঠে।

গালিব: বাহ, আমার কবিতা দিয়েই আমাকে জব্দ করতে চাও।

নাওয়াব: অপ্রেমিককে তো প্রেমিকেরই অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে হয়। অপ্রেমিককে তো প্রেমিকের দল আনতে হয়।

গালিব: আমাকে প্রেমিকের দলে গণ্য করো না, আমাকে অপ্রেমিক থাকতে দাও। প্রেম ও ভালোবাসা যেপথে প্রবল সেই পথে আমাকে নিয়ে যেও না।

নাওয়াব: এ কেমন আহ্বান যা বন্ধুকেই যন্ত্রণাবিদ্ধ করে, এই দুঃখের কথা কার কাছে বলি।

গালিব: দুঃখ! এই পৃথিবী থেকে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে, গালিবের আবাসও এখন ভগ্নস্তূপ। একদিন যমুনা ছিল আমার আবাস। আমার প্রেম। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী। সে আমার সঙ্গেই নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াত- চহরবাগ, মোতিমহল. জাফর খানের সমাধিসৌধ, বুলন্দবাগ, তাজমহল, তাজ-ই-মোকাম। আজও সে আমার স্মৃতি মনে অম্লান, কিন্তু সে অকুণ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাকে পরিত্যাগ করেছে। তীব্র তিরস্কারে জানিয়ে দেয়, এই কলকাতায় সে আসবেনা। ভর্ৎসনা নয়, বেদনার আহ্বানে সে দিল্লিতেও যায়নি।

নাওয়াব: আপনার প্রতি অভিমান ও আপনাকে পরোয়া না করেই সে আগ্রাতেই রয়ে গেল। তবুও তার বিন্দুতে বিন্দুতে চলছে উচ্ছৃঙ্খলতার ডাক। এতদিনের স্নেহমমতা সে ভুলে গেছে।

গালিব: যমুনার সুখ হোক-বা না-হোক, আমাকে দেখে শান্তি পাক-বা না-পাক, আমি তার কাছেই যেতে চাই।

নাওয়াব: আপনাকে আঘাত করা জন্য বলছি না মির্জা সাহেব, কিন্তু কোনও কোনও মানুষ ঘর ছাড়বে বলেই জন্মায়। ওদেরকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে না। এমনই তাদের নিয়তি।

গালিব: সে তো প্রাচীন কথা। কিন্তু যমুনা ছাড়া যে, আমার আর কোনও গতি নেই। এখনও যে ডেকে ডেকে আগ্রা জীবনেরই কথা শোনায়, সে আমাকে বড্ড হিংসে করে। এ বড় পরিতাপের কথা।

নাওয়াব: আমি একটি ঠুংরি গাইব, আপনি শুনবেন? এর চেয়ে যে বেশি অধিকার আমার নেই।

গালিব: অধিকার নিতে চাইলে যে অকারণে শত্রুতা বাড়বে। তবুও তো ইচ্ছে করে যে-জীবনটা পেছনে ফেলে এসে এই কলকাতায় নতুন স্বতন্ত্র জীবন গ্রহণ করেছি, এই নতুন জীবনেও যমুনার মতোই কেউ আমাকে শাসন করুক। সুখের চেয়ে বেদনা বেশি পেলেও, যমুনার প্রেম আমাকে ক্ষতবিক্ষত করলেও আমি সংগীত, কাব্য, আসর, মহফিলকে বড্ড ভালোবাসি, নাওয়াববাঈ।

নাওয়াব: দুঃখ ও বেদনার সংঘাতে ফোটে রক্তপোলাপ। পাপড়ি, সৌরভ আর কাঁটা- এই তিনটির সহবাস প্রস্ফুট কুসুমে। কথাটি তো আপনারই তাই না!

গালিব: আবার আমার কথা দিয়ে আমাকে আহত করলে। কথা বলতে বলতে তোমার ফেরার সময় হয়ে এলো।

নাওয়াব: এখন আমাকে যেতে হবে। শুধু আমার একটা প্রার্থনা।

গালিব: কী?

নাওয়াব: আগামীকাল দুপুরে একবার আসবেন। অপেক্ষায় থাকব। এলে খুশি হব।

[নাওয়াবআর দাঁড়ায় না। তার কাঁপা কাঁপা ছায়াটি বিলীন হয়ে যায় দূরে।]

গালিব: প্রেমই অন্ধকারে রচনা করে জ্যোতি; প্রেম না থাকলে জ্যোতির প্রকাশও অসম্ভব।

দৃশ্য তিন

স্থান : কলকাতা নাট্যমঞ্চভবন

সময় : রাত।

সংলাপ : তুকির ও নাওয়াব।

তকির : গালিবচলে গেল বুঝি।

নাওয়াব: হ্যাঁ, চলে গেলেন।

তকির : তাহলে চলো বাড়ি ফেরা যাক।

নাওয়াব: চলুন।

তকির : (যেতে যেতে) গালিবআমার বাল্যবন্ধু। এমন বন্ধু আমার এই জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। যদি অনুমতি দাও, তাহলে ওর সম্পর্কে তোমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।

নাওয়াব: (একটুখানি হেসে) স্বাচ্ছন্দে করতে পারেন।

তকির : গালিবের সংসারের সংগতি, স্ত্রী-সন্তান প্রতিপালনের যোগ্যতা- এসবকি চিন্তা করে দেখেছ?

নাওয়াব: কেন? বন্ধুত্ব আর সংসার পাতা তো এক জিনিস নয়, তকির সাহেব!

তকির : আমি চিন্তা করে দেখেছি, গালিবকেও বলেছি। আজ এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার জন্যই তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তোমাকে এসববিষয় চিন্তা করা উচিত। আমার পরম বন্ধু, দায়িত্বের অসহ্য ভারে উন্মাদ হয়ে এখানে দিল্লিতে পালিয়ে এসে কলকাতায় আছে।

নাওয়াব: (পাংশুমুখে) কী?

তকির : আমি ভেবেপাই না, অন্যকে খাওয়াবে কি- নিজেরই তো মোটা ভাতকাপড়ের সংস্থান নেই। [নাওয়াববাঈয়ের মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে। তকির নির্বাক, কাঠের পুতুল যেন।]

নাওয়াব: মির্জা সাহবের সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে জানা নেই, জানাও অসম্ভব।

তকির : ওর ঠিকানা তো জানো, প্রয়োজনে আমার কথা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

নাওয়াব: তিনি আপনার পরম বন্ধু, কিছু জানার প্রয়োজন হলে আপনার কাছ থেকেই জেনে নেব।

তকির : সে ও আমি অশৈশববন্ধু। কিন্তু তার ব্যবহারে মাঝেমধ্যে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

নাওয়াব: (মৃদুকণ্ঠে) লজ্জা?

তকির : তার আচরণ, তার ব্যবহারে আমি বন্ধু হয়ে যদি লজ্জা না পাই, তাহলে আর কে পাবে বলো?

নাওয়াব: কি এমনটা ঘটেছে?

তকির : তোমার সঙ্গে ও দেখা করছে। কিন্তু আগাগোড়া তা গোপন করে রেখেছে। ঠিক বুঝতে পারছি না কেন এমন করছে। কোথায় যেন একটা ভীষণ গলদ রয়েছে।

নাওয়াব: আমি একজন সংগীতশিল্পী। আপনি হয়তো সংগীতশিল্পীর সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন না, তাই তিনি আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেননি।

তকির : তাহলে আমারই অপরাধ!

নাওয়াব: না, না, অপরাধ কেন মনে করছেন? তবেসকল মানুষের প্রবৃত্তি এক রকম হয় না।

তকির : গালিবের মুখ থেকে বুঝি এমন সদগুণের বিবরণ শোনেছ?

নাওয়াব: না, তবেআমি মনে করি, কেউ যদি তার আপনজনের সংস্রবছেড়ে চলে যায়, তাহলে তিনি ভালো দৃষ্টিতে দেখবেন না।

তকির : শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদের প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ আছে কিনা, সে আলোচনা কি গালিব করেনি?

নাওয়াব: না, এমন কিছু তো বলেননি।

তকির : আমাকে ক্ষমা করবে, তোমার চেয়ে ওকে আমি বেশি জানি। তার হীন অবস্থাকে তোমার কাছে গোপন করাটাকে কী সত্যপ্রিয়তা বলা চলে? সংসার ও স্ত্রী-সন্তান প্রতিপালনে সে যে অক্ষম, তা অপরের কাছে না হোক, তোমার কাছে তো প্রকাশ

করা উচিত ছিল।
নাওয়াব: আমি এতে কোনও দোষ দেখি না। তাছাড়া তার সঙ্গে আমার পরিচয় তো আপনার মাধ্যমেই। আপনার বাড়ি না হয় সংগীতানুষ্ঠানেই আমার সময় কাটছে। তিনি সুযোগই বা পেলে কোথায় যে, তার জীবনবেদ আমাকে জানাবেন!
তকির : তুমি তার দোষ ঢাকার চেষ্টা করছ। তবে তুমিই বলো, সবকিছু যদি আগে জানতে, তাহলে কি ওকে এতটা প্রশ্রয় দিতে?
নাওয়াব: প্রশ্রয়ের কথা আসছে কেন?
তকির : তোমার কাছে একটি সত্য কথা স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জা নেই।
নাওয়াব: কী?
তকির : আমার বন্ধুকে বাঁচানোর সংকল্পে আমি দৃঢ় থাকা সত্ত্বেও, এখন দেখছি, ওকে বাঁচানোর চেয়ে তোমাকে রক্ষা করাই আমার প্রধান কর্তব্য।
নাওয়াব: মানে?
তকির : শোনো, ওর বিপদ ইচ্ছাকৃত। কিন্তু তুমি না জেনেই অন্ধকারে ঝাঁপ দিচ্ছ। এমনটি আমি জীবিত থাকে হতে দিতে পারি না। আর এটা না করলে আমার ভীষণ অন্যায় হবে।
নাওয়াব: আপনার কথার মর্মার্থ আমি বুঝতে পারছি না। তবে জানতে চাই আপনি যে এমনটা করতে যাচ্ছেন তাতে তিনি দুঃখিত হবেন না তো?
তকির : উপায় নেই। যে লোক পাষণ্ডের মতো তোমাকে প্রবঞ্চনা করছে, তার সুখ-দুঃখের চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করছি না। বন্ধুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।
নাওয়াব: আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন। আমাকে এখন সন্ধ্যার জন্য তৈরি হতে হবে।
[নাওয়াব বাঈ আর কিছু বলে না। চলে যায়।]

চতুর্থ অঙ্ক
দৃশ্য এক
স্থান : তকিরের বাড়ি।
সময় : দুপুরের একটু আগে।
সংলাপ : গালিব ও নাওয়াব।
নাওয়াব: যখন আর কিছু ছিল না তখন স্রষ্টা ছিল; যদি কিছু না-ও থাকে তবুও স্রষ্টা থাকবে। আমার অস্তিত্বই আমাকে ডোবাল; যদি আমার অস্তিত্বই না থাকে তাহলে কী হবে?
গালিব: মৃত্যু ছাড়া হে আসাদ, আর কীসে এই দুঃখময় জীবন থেকে মুক্তি মেলে? ভোর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সহস্র রঙে জ্বলে যেতে হয় মোমবাতিকে।
নাওয়াব: (হেসে) আমার অনুরোধ তাহলে রাখলেন। আপনার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম।
গালিব: দুঃখিত দেরি হয়ে গেল।
নাওয়াব: বেয়াদবি নেবেন না। আজ এখানে খাওয়ার জন্যই ডেকেছি।
গালিব: (অতিশয় বিস্মিত) নিমন্ত্রণ?
নাওয়াব: সম্মানিত অতিথির উপযুক্ত আহার ব্যবস্থা করার স্বাধীনতা আছে আমার, পরখ করুন। তাতে কি আপনার অসুবিধা আছে?
গালিব: (হেসে) না, নেই। তবে বাধা আছে, আমার নিজের দিক থেকেই।
নাওয়াব: তবে আপনার দয়া পেলে আমি ধন্য হব।
গালিব: ছি, ছি, অমন করে বলছ কেন? তাছাড়া আল্লাহ আমার প্রতি আজ ভারি প্রসন্ন, তা না হলে এত বেলায় বাড়িতে যে কি জুটবে, তা তো জানি।
নাওয়াব: রাগ করলেন?
গালিব: না, নাওয়াব। আমি কখনও তোমার ওপর রাগ করতে পারি? তোমাকে দুঃখ পেতে দেখলে আমার ভালো লাগে না। কথা প্রত্যাহার করে নিলাম। আমারই ভুল।
নাওয়াব: আর অপেক্ষা করা যায় না। খেতে চলুন।
গালিব: (গালিব এগিয়ে যায়) এই আয়োজন কি শুধু আমার জন্য?
নাওয়াব: বসুন।
গালিব: আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছি। এত খাবার খাওয়া কি একজনের পক্ষে সম্ভব? তুমিও বসো।
নাওয়াব: না। আহারের তদবির করব।
গালিব: এত বেলা উপোস থেকে আমাকে সম্মুখে বসিয়ে খাওয়ানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না। অন্যদেশে এই প্রথা নেই।
নাওয়াব: বাঙালি রমণীদের কাছ থেকেই এই আহার পদ্ধতি শিখেছি। তারা বলেন, যে-দেশের রমণীরা অভুক্ত থেকে পুরুষদের খাওয়াতে পারে না- বরং একইসঙ্গে বসে খায়- সেই সমাজের ভারি দুর্ভাগ্য। বাঙালি রমণীদের সঙ্গে আমিও একমত।
গালিব: কেন? নারী পুরুষের সমাধিকার থাকা উচিত।
নাওয়াব: এখানে সমাধিকারের প্রশ্নটা আসে কি করে? অন্যায় আর অত্যাচার যেখানে চলে সেখানেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে। যেখানে আনন্দ সেখানে অন্যায় তো কিছু হচ্ছে না। তাই এক্ষেত্রে সমাধিকার না মানলেও কারও কোনও ক্ষতি হচ্ছে না।
গালিব: ক্ষতি না হলেও সমাধিকারের ব্যাপারটি মেনে চলা উচিত।
নাওয়াব: যাদের ইচ্ছে তারা তা মেনে চলুক আমার কোনও সমস্যা নেই; কিন্তু আমি আপনাকে অভুক্ত থেকে খাবার পরিবেশন করতেই পছন্দ করছি। আপনি কি জানবেন আমার কতখানি জোর এই খাওয়ানোর মধ্যে আছে? কখন আপনার পেট ভরছে না, তা বলে দিতে পারি।
গালিব: আমার পেট ভরেছে কিনা সেও তুমি বলে দিতে পার! এ তো অদ্ভুত কথা। (খেতে খেতে) তুমি কি জানতে আরও এক সপ্তাহ উৎসব বাড়ানো হবে?
নাওয়াব: হ্যাঁ, কালরাতেই তকির সাহেব জানালেন, আরও এক সপ্তাহ উৎসবের ব্যবস্থা করা হবে।
গালিব: কেন?
নাওয়াব: দর্শকবৃন্দের অনুরোধ। তার বেশি আমার জানা নেই।
গালিব: কী কারণ থাকতে পারে, ভেবে পাচ্ছি না।
নাওয়াব: যদি বলি আপনার জন্য।
গালিব: আমার জন্য! আমি তো কখনও এমন কথা বলিনি।
নাওয়াব: সবকথা কি মুখে বলতে হয়? কিছু কিছু কথা থাকে যা বুঝে নিতে হয়।
গালিব: সত্যি! কিন্তু?
নাওয়াব: কিন্তু আবার কী! বরং এখানে আরও কিছুদিন থাকার অনুরোধ আগেই আপনার মুখ দিয়ে প্রকাশ করা উচিত ছিল। অন্যের মুখে শোনা আর লুকিয়ে আড়ি পেতে শোনা- দুটি কি সমান বলে আপনার কাছে মনে হয়?
গালিব: তোমার সঙ্গে অনেক রকম আলোচনার মধ্যে সরাসরি থাকার অনুরোধ হয়তো ছিল না। কিন্তু মন্দ অভিপ্রায়ও নেই। যার অনুরোধেই হোক তোমার সঙ্গ আরও কয়েকদিন পাওয়া যাবে, তাই ভাগ্যের ব্যাপার, সেটাই আসল কথা। আশা করি এতে তোমার তেমন ক্ষতি হবে না।
নাওয়াব: না, তা হবে না। একটা অনুরোধ করার ছিল। যদি আপনার ওপর আমার কোনও অধিকার থাকে তাহলে করতে পারি?
গালিব: অধিকার! অধিকার দেওয়ার ওপর নির্ভর করে না, নেওয়ার ওপর করে। অধিকার মানুষ আদায় করে, কারও কাছে হাত পেতে নিতে হয় না। যে অনুগ্রহ প্রার্থনার জন্য তুমি বিরক্ত হচ্ছ তা না করে বরং আমার ওপর অধিকার বলবৎ করলেই পার।
নাওয়াব: এমন কথা আপনার মুখ দিয়ে বেরুবে বলেই অনুমান করেছি।
গালিব: অনুরোধটা কী?
নাওয়াব: এখানে আরও কয়েকদিন থাকব। বোধ হয়, সপ্তাহও হতে পারে।
গালিব: তকিরের সঙ্গে যখন পরিচয় হয়েছে তখন এখানে নিশ্চয়ই ঘনঘন যাতায়াত হবে। সে তো অনেক মাহফিলের আয়োজন করে; অবিশ্যি নিমন্ত্রণ পাবে। তোমাকেও আসতে হবে।
নাওয়াব: হয়তো-বা আর আমাকে আসতে হবে না।
গালিব: কেন? বেনারসে ভার নেওয়ার একান্ত লোক আছে বুঝি।
নাওয়াব: (হেসে) সেইরকম কেউ নেই।
গালিব: মা-বাবা?
নাওয়াব: মা-বাবা, ভাই-বোন বলতে কেউ নেই। একটা ভবঘুরের মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো নষ্ট করে দিয়েছি।
গালিব: নষ্ট?
নাওয়াব: নষ্ট করিছি বলেই তো ঘুরেফিরে স্মরণ করি- কি পেলাম, আর কি দিলাম। কিছুই না। তাই সত্য বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই।
গালিব: সত্য-মিথ্যা তো অব্যাহত ব্যাপার, সত্য কিংবা মিথ্যার চেহারা মুছে যাওয়ার আগে বিবর্ণ হয়ই। তার বিরহদশায় শুধু দেয়াল আর দরজার দিকে তাকিয়েই আমরা দিন কাটাতে পারি। কখনও পুবালি বাতাস স্নিগ্ধ পরশে সত্য কিংবা মিথ্যার বারতা বয়ে নিয়ে আসে। কখনও পত্রবাহককেই ফিরে আসতে দেখা যায়।
নাওয়াব: আপনার কবিতার প্রতিটি শব্দই আমার মনের অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণতা দেয়।
গালিব: হিসাব-নিকাশ করে আর যাই চলুক, ভালোবাসা চলে না, নাওয়াব বাঈ। ভালোবাসার পূর্ণতা লাভের জন্য পুরোটা জীবনেরই প্রয়োজন পড়ে।
নাওয়াব: ভাবার কথা!
গালিব: এত ভেবে লাভ কী নাওয়াব? তার চেয়ে না হয় একটি গান ধরো নাওয়াব বাঈ?
নাওয়াব: গান!
গালিব: হ্যাঁ। আমার এই প্রাণ উৎসর্গীকৃত তোমারই গানের মোহনায়। তবে আমি জানি না সেই পূজা, সেই প্রার্থনা নিবেদন করতে হয় কি করে।
নাওয়াব: আমার হৃদয়ের অবস্থা এখন জানা নেই আমার।/ কিন্তু একথা জানা আছে, আমি আমার

হৃদয়ের সন্ধানে থেকেছি বারবার।/ আর সে হৃদয় তুমিই পেয়েছ বারবারে।

গালিব: গজলটি তো আমার।

নাওয়াব: আপনারই। অনেকদিন আগে...?

গালিব: মানে?

নাওয়াব: একদিন আমার গুরুজি এই গজলটি কণ্ঠে তুলে দিয়েছিলেন। সেদিন কী ভেবেছিলাম...।

গালিব: কী?

নাওয়াব: গুরুজি আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন। তিনিই তো ছিলেন আমার একমাত্র ভরসা, আদর, স্নেহ, সান্ত্বনার স্থল। তিনি ছিলেন জাত-ফকির। তাই হয়তো তাকে বেঁধে রাখতে পারিনি। চলেই গেলেন।

গালিব: একটু ছাড়লে বোধ হয় ভালো করে বাঁধনে জড়ানো সম্ভব, নাওয়াববাঈ।

নাওয়াব: মির্জা সাহেব...।

গালিব: তোমার কথা এত বেশি ভাবি, তাই মাঝেমধ্যে বেয়াদবিকরে ফেলি।

নাওয়াব: না মির্জা সাহেব, বেয়াদবিনয়। আল্লাহ আমার প্রতিটি আকাঙ্ক্ষাই অপূরণ রেখেছেন। আমি যেখানেই যাই সেখানেই গুরুজিকে খুঁজে বেড়াই, কিন্তু পাই না।

গালিব: হয়তো একদিন তিনি নিজের ইচ্ছায়ই ফিরে আসবেন।

নাওয়াব: হয়তো-বা! কিন্তু আমি জানি, জাগতিক মানদণ্ডে মানসম্মান কষে কষে তাকে খতম করে দিয়েছিল। তার ফলেই আজ তার এই অবস্থা। আশ্রমত্যাগী হতে বাধ্য হন। তারপরও আল্লাহ কাছে আমার প্রার্থনা...।

গালিব: গুরুজির সঙ্গে আবার মিলন।

নাওয়াব: না, মির্জা সাহেব। তা হয়তো এ জীবনে হবেনা।

গালিব: তাহলে?

নাওয়াব: আপনি এই কলকাতার প্রধান কবি হিসেবেপ্রতিষ্ঠিত হবেন।

গালিব: তা না হলে কী আর গালিবের খ্যাতি থাকে। এমন কেউ কি আছে যে গালিবের নাম জানে না। অন্যজনের সঙ্গে প্রেমের কথা তুমি তো জানো, সে-সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করলে এমন কী পাপ হতো!

নাওয়াব: অতিচমৎকার।

গালিব: প্রেম নয়, স্বীয় ভাগ্যে আছে কেবলই উন্মাদনা; এই ভাগ্য হোক-না তোমার সুরাপাত্র। আমি তো আর নিজের শত্রু হতে পারি না, যদি অন্য কেউ তোমাকে চায় তাহলেই-বা কি! তোমার জন্য আমার প্রেম ব্যর্থ হতে পারে না; প্রেম না হোক, ঝামেলা হয়েই থাকি তোমার কাছে।

নাওয়াব: ঝামেলা! কাউকে হৃদয় দেওয়ার পর, আফসোস করে কী লাভ! হৃদয়ই যদি আপনার সঙ্গে না থাকে, মুখে বিলাপ কেন?

গালিব: মনে হয়, আমার কবিতাই তোমার অদ্ভুত আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। অপূর্ণ প্রেমের বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে তোমার কণ্ঠে।

নাওয়াব: অপেক্ষা করাই যদি হয় আমার পরীক্ষা, তাহলে যন্ত্রণা কাকে বলব? প্রেমের প্রতি আনুগত্য থাকলে আমার পরীক্ষা কেন নেওয়া হবে?

গালিব: দেহ যখন পুড়ে যায় তখন হৃদয়ও নিশ্চয় ভস্মীভূত হয়। এখন ছাই দিয়ে কী করবে?

নাওয়াব: প্রেম, আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, সমর্পণ- সবই অপূর্বভাবেপ্রকাশ পায় আপনার কবিতায়।

গালিব: তুমি সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই, গুণেরও তো কমতি নেই, তাও বুঝতে পারছি।

নাওয়াব: আপনি দয়াবান। মহৎ আপনার অন্তঃকরণ।

[দুজন এক সঙ্গে হেসে ওঠে।]

দৃশ্য দুই

স্থান : গালিবের বাড়ি।

সময় : বিকাল।

সংলাপ : তকির ও গালিব।

তকির : দুঃখের বিষয় হচ্ছে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা আর বেশিদিন থাকবেনা।

গালিব: না থাকলে তোমাকে দণ্ড দেব, এমন কথা তো কখনও বলেনি।

তকির : তোমাকে দোষ দিয়ে তোমার চরম শত্রুও অভিযুক্ত করতে পারে না।

গালিব: শত্রু পারে না বলে কাজটা যে মিত্র পারবেনা, এমন অনুশাসন তো শাস্ত্রে নেই। তবে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা শেষ হতে চলেছে।

তকির : একটি বাঈজি এর কারণ। কি আছে ওর? শুকনো কাঠপানা চেহারা, গায়ের কোথাও একফোঁটা রক্ত পর্যন্ত যেন নেই। ঠেলা দিলে আধখানা দেহ খসে পড়বে বলে ভয় আমার হয়।

গালিব: তা হয়তো তোমার হয়।

তকির : দেখো গালিব, ঠাট্টা করছি না। তুমি হয়তো তোমার কবিতায় বাঁধা গজল শোনে আশ্চর্য ও অবাক হয়েছ। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ওকে দেবী বলে আহ্বান করেছ। কিন্তু আমি অতসহজে কাবু হওয়ার পাত্র নই।

গালিব: আমি শপথ করে বলছি তকির, তোমাকে কাবু করার আমার কোনও দুরভিসন্ধি নেই। ওকে না হয় একটু...।

তকির : একটু কী?

গালিব: সংযত দৃঢ়তায় একটু সমবেদনা জানিয়েছি মাত্র। তাতে তোমার আপত্তি থাকার কথা নয়?

তকির : (একটু রেগে) শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি আপত্তি থাকার কথা। তুমি জগতের বরেণ্য সৈনিক বংশের সন্তান। মালিক ও সেবক- তফাত একটা থাকে। আল্লাহই এই তফাত রেখে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার সেই তফাতটুকু মনে রাখা উচিত। তা মনে না রেখে এক বাঈজির মোহে নিজের সম্মান বিসর্জন দেবে?

গালিব: ওর চরিত্রে পুরুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে। যেকোনও পুরুষকে নক্ষত্রের মতো ভালোবাসার শক্তি ওর আছে।

তকির : ওটাকে ভালোবাসা বলো না গালিব। মোহ! মোহকে একবার তার শৌখিন আবরণ থেকে উন্মুক্ত করে দেখো, সেইখানে ক্ষুধা আছে, উন্মাদনা আছে, দুঃখ আছে; কিন্তু শান্তি নেই, আশ্বাস নেই।

গালিব: সে জাতশিল্পী। নির্মল তার চরিত্র।

তকির : তবেশঙ্কার কথা হচ্ছে বড্ড রুপোসি সে। ওর ব্যবহারে বাহারও আছে।

গালিব: লখনৌর বাহার। পাতা কেটে খোঁপা বাঁধে আধাবাঙালি ঢঙে।

তকির : ধিক্!

গালিব: ধিক কেন? তবেজানি, তোমার সমাজে শিল্পীর মর্যাদা ভীষণ কম।

তকির : তোমার-আমার সভ্যসমাজের পোশাক পরিয়ে দেখো দেখি, মোহ কাটে কিনা! তখন এই নির্জীবকাঠের পুতুলটার রূপ দেখে তোমার ভুল ভাঙে কিনা! কি পারে সে? কি সেবা করবেসে তোমার? সে শিক্ষা কি ওর আছে?

গালিব: আছে জীবনকে গভীরভাবে দেখার অভিজ্ঞতা। ওর একটা মনও আছে।

তকির : সত্য হচ্ছে, সে একজন বাঈজি। দুঃসময়ে সে যদি তোমাকে ত্যাগ না করে তাহলে আমার তকির নামের বদলে যা ইচ্ছে বসিয়ে দিয়ো, দুঃখ হবেনা। তাছাড়া তোমার যদি এইরকম পশমের কাজ এতেই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতা শহরে স্বশ্রেণির রমণীর তো অভাবনেই।

গালিব: অনেক কষ্ট করে এই কলকাতায় মন বেঁধে রেখেছি। তুমি আমার মন ভেঙে দিয়ো না।

তকির : গালিব, তুমি ঠিকই জানো, তোমার মঙ্গল ভিন্ন কখনও অমঙ্গল কামনা করি না। আমি অনেক বাঈজি দেখেছি। দু-একটি ভালো যে দেখিনি, তা নয়; কিন্তু তোমার-আমার সমাজে নাওয়াববাঈয়ের স্থান নেই। তোমার যদি বন্ধুত্ব পাতানোর এতই আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে বললে না কেন?

গালিব: আমি অন্তর থেকে বলছি, তোমার কথায় মনটা বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছে। ক্ষোভ, প্রতিবাদ, জিজ্ঞাসায় হৃদয় আহত হচ্ছে।

তকির : আচ্ছা, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, আর ওকে নিয়ে ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। নাওয়াব বাঈয়ের শ্রীচরণে নিজেকে বিসর্জন দিয়ো না। তোমাকে ধৈর্য ধরে আমাদের বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে হবে। বলো রাখবে?

গালিব: তুমি যে তোমার বন্ধুর শুভকামনায় মর্মান্তিক বিচলিত হয়েছ, তা সম্পূর্ণভাবেঅনুভব করতে পারছি।

তকির : তোমার জন্য এতবড়ো কলকাতা শহরের মধ্যে কি একটাও ভদ্রমহিলা নেই। অবিশ্যি আছে। তাই বলছি এরকম এক বাঈজির কারণে তোমার জীবনকে বিড়ম্বনার মধ্যে ঠেলে দিয়ো না। দিলে তা আমি সহ্য করতে পারবনা।

গালিব: (হেসে) কিন্তু আমি তো কিছু করিনি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তকির, তুমি তো নিজেই নাওয়াববাঈকে ডেকে এনেছ এখানে, তাহলে ওর সঙ্গে ভালোভাবেআলাপ-আলোচনা করলে তোমার বিরক্ত হওয়ার কথা নয়?

তকির : (দৃপ্তস্বরে) অন্যকে আনন্দ দেওয়ার জন্য ওকে এখানে এনেছি, বন্ধুর ক্ষতির জন্য নয়। আমি তোমার-আমার সমাজকে শ্রদ্ধা করি।

গালিব: শিল্পীকে শ্রদ্ধা করাও উচিত।

তকির : শ্রদ্ধা! আমি আমার সমাজকেই শ্রদ্ধা করি, তাই সেই সমাজ রক্ষা করা আমার প্রধান দায়িত্ব। সেই সমাজবিরোধী কোনও কর্মে তোমাকে লিপ্ত হতে দিতে পারি না। গুণি মানুষ তুমি, তাই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, সাতদিনের মধ্যেই তোমার জন্য একজন উপযুক্ত নারী এনে হাজির করব।

গালিব: উপযুক্ত নারীর জন্য যে আমি পাগল হয়ে উঠেছি, এমন কথা তোমাকে কে অবগত করল? অপরিচিত কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের আমার কোনও স্পৃহা নেই।

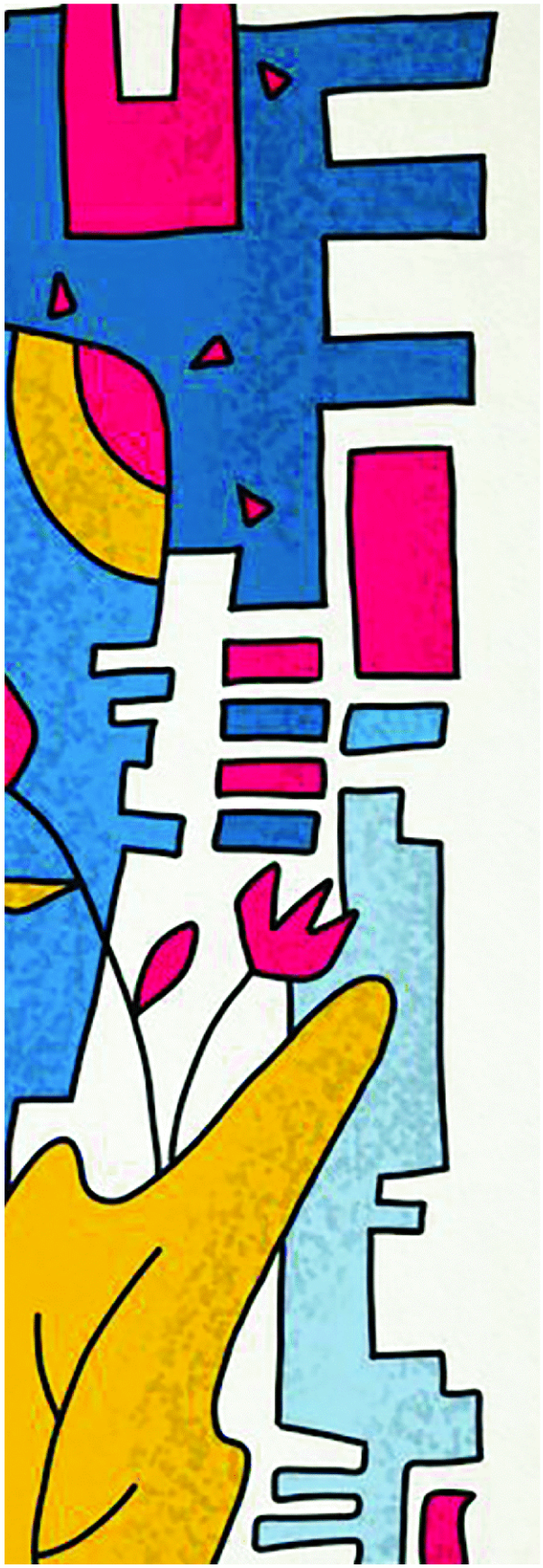

তকির : স্পৃহা নেই? তাহলে বাঈজিটা কি তোমার অপরিচিত নয়?

গালিব: আশ্চর্য। একজন শিল্পী সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে কথা বলা উচিত। শিল্পী বলে তাকে মানমর্যাদা দিতে কার্পণ্য করো তোমাকে মানায় না তকির। নিজের সীমানা অতিক্রম করা তোমার জন্য সমাজবিরোধী কর্ম নয় কি!

তকির : সমাজবিরোধী কর্ম কিনা তা শিক্ষা দিতে এসো না। জীবনের রং, রস, উত্তাপ আমার আর বোঝার বাকি নেই, গালিব। আচ্ছা বলো তো ওর বয়স কত হবে?

গালিব: জানি না।

তকির : ধরো- কুড়ি, পঁচিশ কিংবা একটু বেশি। হয়তো-বা তোমার সমবয়সি কিংবা বড়ো।

গালিব: তাতে আমার কী প্রয়োজন?

তকির : প্রয়োজন আছে। বয়সই মানুষকে ঐশ্বর্য ও প্রতিষ্ঠার জন্য কাঙ্কাল করে তোলে। আমার অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

গালিব: তোমার পক্ষে কিছুই অসঙ্গত নয়। নিজেকে অদ্ভুত নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

তকির : তোমাকে আজ ইচ্ছে করেই আঘাত করলাম। এই কথাটি বোধ করি বুঝিয়ে বলার কোনও প্রয়োজন নেই?

গালিব: না, নেই। আর কত আঘাতের পর আঘাত সহ্য করব। কী শূন্য মন! কী বিমুখ অন্তর! প্রাণের অতল থেকে উঠছে হাহাকার, আর একটি অবুঝ প্রশ্ন- এমন কেন হলো? এমন তো হওয়ার কথা নয়।

তকির : কেন এমন হলো, গালিব?

গালিব: তামসা করছ তকির। তোমার বোবা সহানুভূতির আমার কোনও প্রয়োজন নেই। মনটায় যেন একটা ভাঙচুর চলছে। অবুঝ প্রশ্নটির জবাবটি অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে নিরানন্দ ও বিষণ্ন অন্তরে, নীরবে। ক্লান্ত অন্তরাত্মা ভৈরোঁর আকুতি পাঠিয়ে দিচ্ছে অজানা ঠিকানায়।

তকির : আমি তোমার একান্ত হিতৈষী। তাই জানি, সংসারে সবাই ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু তুমি আমাকে কখনও ভুল বুঝতে পার না।

গালিব: বিভ্রান্ত ও বেদনার্ত মনে কখনও আনন্দ সৃষ্টি হতে পারে না তকির।

তকির : তবুও তোমার মুখের ওপরই বলতে হচ্ছে, তোমাকে আমি যতটুকু শ্রদ্ধা করি, তুমি তার অর্ধেকও করো না। তুমি গ্রাহ্য করো না বটে, কিন্তু তোমার এতটুকু আঘাত আমি সহ্য করতে পারি না। বাঈজিটিকে নিয়ে তুমি যদি সুখী হতে পারতে বলে আমার নিশ্চিত ধারণা জন্মাত, তাহলে সমস্ত দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করে তোমার-আমার বন্ধুত্বকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা কুণ্ঠিত হতাম না।

গালিব: তোমার-আমার বন্ধুত্বকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হওয়ার কথা আসে কেমন করে?

তকির : তুমি করো বা না করো, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব।

গালিব: কেন?

তকির : কারণ অনেক রয়েছে। তা পরে জানতে পারবে। এখন নানা অনুভূতির দোলায় দুলছে মন। মাথার ভেতর আগুন জ্বলছে। এলোমেলো উদ্ভট মনে হচ্ছে সবকিছু, অনেকটা স্বপ্নের মতো।

গালিব: এখন তাহলে তুমি আমাকে কি করতে বলছ?

তকির : তা-ই তো এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত বলে চলেছি।

গালিব: আচ্ছা, আরও একবার বলো।

তকির : এই মোহ তোমাকে যেমন করে হোক কাটাতে হবে। অন্তত, নাওয়াববাঈ যতদিন এখানে আছে ততদিন একা-একাকী ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবেনা।

গালিব: কিন্তু তাতেও যদি মোহ না কাটে? যদি মোহের বড়ো আরও কিছু থাকে?

তকির : ওসবআমি বুঝি না গালিব। আমি শুধু বুঝি, তোমার-আমার সমাজটাকে। আমার আর কিছু বলার নেই।

গালিব: এ কেমন বন্ধুত্ব যে, বন্ধু হয়েছে উপদেষ্টা; কেউ যদি উপায় বলে দিত, ব্যথার ব্যথী হতো কেউ। কিন্তু এখন নিষ্ঠুরতা থেকেও বঞ্চিত আমি- হায় ঈশ্বর একনিষ্ঠ প্রেমিকের সঙ্গে কেন এত

ষড়যন্ত্র!
তকির : আর আমার অপরাধ বাড়িয়ে দিয়ো না গালিব। এবার আমার সঙ্গে সংগীতা অনুষ্ঠানে চলো। এ-ই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।
গালিব: না, সম্ভবনয়। তুমি বিশ্বাস করো বা না করো আজ আমি বড্ড ব্যস্ত তকির।

দৃশ্য তিন
স্থান : কলকাতার নাট্যমঞ্চভবন।
সময় : সন্ধ্যা।
সংলাপ : নাওয়াবও তকির।
তকির : গালিবএলো না। এত করে বললাম একবার আমার সঙ্গে আসার জন্য। কিন্তু শোনল না।
নাওয়াব: (কুর্শিতে উপবেশন করে মৃদুকণ্ঠে) বোধ হয় জরুরি কিছু আছে!
তকির : (সহজ ও স্বাভবিক স্বরে) এমন কি হতে পারে যে, অন্তত দুইদণ্ডের জন্য একবার আমার সঙ্গে আসতে পারল না? তুমিই বলো, কী এমন জরুরি কাজ থাকতে পারে বন্ধুর কথাও শোনল না। আমি তো মরে গেলেও এমন করতে পারতাম না।
নাওয়াব: (স্নিগ্ধ হেসে) আপনার এখনও কেউ হয়নি বলেই একথা বলছেন; কিন্তু হলে ঠিকই মির্জা সাহেবের মতোই অবহেলা করে চলে যেতেন, এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।
তকির : (কুর্শির হাতলের ওপর সজোরে একটা চপেটাঘাত করে) কখ্খনো না। আমাকে তুমি চেন না, চিনলে এভাবেবলতে না!
নাওয়াব: বেশ তো, এখন থেকে চিনে নেব।
তকির : নিশ্চয়। এক শতবার। গালিবের মতো আমি আমার বন্ধুর কাছে কোনও কথা গোপন রাখি না। রাখা মঙ্গল বলেও মনে করি না।
নাওয়াব: তাহলে আপনার জীবনে কেউ থাকলে জানতে দেবেন, তাই না?
তকির : (উত্তেজিত) তুমি বলছ থাকলে জানতে দেব, কিন্তু আমি বলছি, তোমাকে না জানিয়ে, তোমার মত না নিয়ে কেউই আমার জীবনে আসবে না।
নাওয়াব: কেন?
তকির : কারণ, তোমাকে ভিন্নভাবে দেখার সাধ্য আর আমার নেই।
নাওয়াব: (সলজ্জ মুখে) আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু আপনাকে যাচাই করার শুভদিন না আসা পর্যন্ত, আমি আপনার বন্ধুকে পৃথক করে দেখতে পারবনা।
তকির : (গম্ভীর কণ্ঠে) সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে যাচাই করার শুভদিন এই জন্মে ঘটবেকিনা সন্দেহ আছে।
নাওয়াব: তাহলে আপনার বন্ধুর কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে সবকিছু জেনে নেব। নাকি ভয় পেয়ে গেলেন?
তকির : আমার কোনও ভয় নেই। সকল অপরাধ ওর কাছ থেকে জেনে নিও। তবেআমি আমার সবআপরাধ তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। তারপর মিলিয়ে নিও, আমি সত্য কিনা মিথ্যে বলেছি। তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি শিল্পী-কবির সমাজকে ভালো চোখে দেখি না।
নাওয়াব: হ্যাঁ, আপনি আগেই বলেছেন।
তকির : আর একথাও সত্য যে, আগে তোমাকে ভালো করে চিনতাম না, জানতাম না। তাই গালিবকে অনুরোধ করেছিলাম, সে যেন এখানে অন্তত সাতদিন না আসে।
নাওয়াব: না। হয়তো-বা আপনি ভেবেছিলেন পুরুষমানুষের নারীসঙ্গ ভুলতে সাতদিনই যথেষ্ট। এর কম অবশ্য অসঙ্গত।
তকির : আমি চিরদিনই নির্বোধ। হয়তো এমনই কিছু-একটা মনে করেছিলাম।
নাওয়াব: কী এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র!
তকির : তোমার বিরুদ্ধে ওকে বলেছি। শপথও করেছি, সাতদিনের মধ্যে ওর জন্য সুপাত্রী স্থির করে দেব।
নাওয়াব: আমার প্রতি যেন আকৃষ্ট না হন সেই ছিল আপনার বাসনা।
তকির : আমার বন্ধু একজন জাতশিল্পীর মোহে সমাজচ্যুত হবে, তা চায়নি।
নাওয়াব: (রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করে) ভয় হয়েছিল আপনার। এখন আশা করি আপনার আর সেই ভয় নেই।
তকির : (একটুখানি হেসে) ভয় কেটে গেছে। পাপসংকল্পও পরিত্যাগ করেছি। একথা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই।
নাওয়াব: কারণ, আপনি জানেন, তিনি আপনার নির্দেশ অমান্য করবেন না।
তকির : করেনি বলেই তো ওকে আবার অনুরোধ করেছি। কিন্তু সে অনুরোধটা রাখেনি। তোমাকে দেখা না দিয়েই চলে গেল।
নাওয়াব: চলে যাওয়ার কারণ ছিল হয়তো!
তকির : কারণ একটাই, প্রয়োজন আছে- এইটুকুই।
নাওয়াব: প্রয়োজন তো থাকতে পারে।
তকির : প্রয়োজন! প্রয়োজন! চিরকাল ওর মুখে একথাই শোনে আসছি। চিরদিন প্রয়োজনই ওর সর্বস্ব! কি প্রয়োজন, তাও কখনও বলে না। তার সুখদুঃখ ভালোমন্দ সমস্তই তার একার। ভীষণ স্বার্থপর! কখনও কাউকে তার ভাগ দিতে চায় না। কোনদিনও আমার হাত থেকে কিছু নেয়নি।
নাওয়াব: তিনি নিলেই কি আপনি সুখী হতে পারতেন?
তকির : ওর মতো পাষাণকে নিয়ে আমি কখনও সুখ পাইনি।
নাওয়াব: এ আপনার অভিমানের কথা।
তকির : আমার বাইরটা শক্ত দেখালেও ভেতরটা কিন্তু দুর্বল। গালিবঠিক তার উলটো।
নাওয়াব: তবুও আপনাদের বন্ধুত্ব এই সংসারে বিরল। আমি জানি তকির সাহেব, এই বন্ধুত্ব অক্ষয় থাকে। এবার আমাকে সংগীতানুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হতে হয়।
তকির : ঠিক আছে। গেলাম।

পঞ্চম অঙ্ক
দৃশ্য এক

স্থান : কলকাতা নাট্যমঞ্চভবন
সময় : সন্ধ্যা।
মঞ্চ : দ্বিস্তর।
উচ্চস্তর : নাওয়াববাঈয়ের গজল পরিবেশ। নিম্নস্তর : নৃত্য পরিবেশ।

গজল

এ ছিল না আমার কিসমতে, বন্ধুকে পাব মিলনে;
বহুদিন বেঁচে থাকলেও প্রতীক্ষাই সারা জীবনে।

বিরহের স্বাদ প্রিয় আমার, মিলনের স্বাদ না চাই;
কবির ভাগ্যে জুটুক বিরহ, আর মিলনের স্বাদ পাক সবাই।

চুপি চুপি এসে যদি কেউ দেখতে আসে আমার কান্না;
দেখবেহাসতে হাসতে বয়ান করছি নানা ছলনা।
সংলাপ : তকির ও নাওয়াব।
সময় : রাত।
নাওয়াব: আপনার বন্ধুকে যে দেখছি না।
তকির : সে যত্ন করেই দূরে সরে গেছে। নিজের কর্মদোষে সে এখন ব্যথিত।
নাওয়াব: কী এমন কর্মদোষ?
তকির : চলো, বাড়ি যেতে যেতে বলছি।
নাওয়াব: হাঁটতে হাঁটতেই বলুন মির্জা সাহেবের কর্মদোষ কী!
তকির : স্ত্রীর সঙ্গত্যাগ করে কলকাতায় চলে এসেছিল গালিব। এখন সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে।
নাওয়াব: কিন্তু তার মুখভরা আহ্লাদ দেখে তো মনে হয়নি, তিনি তার স্ত্রীর জন্য ব্যথিত। বরং তাকে দেখলে মনে হয় তিনি কত সুখে সুখী।
তকির : তার দুঃখকষ্ট আমি চোখে দেখেছি। দিনরাত তার মর্মান্তিক অসুখ। সংসারসুখ বিসর্জন দিয়েই সে দেশত্যাগী হয়। এখন সে বুঝতে পেরেছে স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়াই উত্তম। তবে জানি, সে ফিরে গেলে তুমি সুখী হবেনা।
নাওয়াব: কেন? আমি তার কী? আমি আকাশপ্রান্তের একটি ছিন্ন মেঘ। আজ এখানে, তো কাল ওখানে।
তকির : তোমার কণ্ঠে অনুতাপ কেন?
নাওয়াব: অনুতাপ! আপনার ভুল ধারণা। আমি তার সুখে সুখী। তবেতাকে সুখ চোখে দেখতে পেলে আমার জীবন সার্থক হতো। তিনি কি এরই মধ্যে কলকাতা ত্যাগ করেছেন?
তকির : সে যে সুখের আশা করেছিল তা তার হয়নি। ফলে আজ যদি না গিয়ে থাকে তবেকাল অবশ্যই চলে যাবে।
নাওয়াব: এত তাড়াতাড়ি!
তকির : পৃথিবীতে যত কাজ করেছ, তার মধ্যে ওকে ভালোবাসা সর্বপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। সে তোমার ভালোবাসার মূল্য দিল না।
নাওয়াব: ভ্রান্তি! তকির সাহেব, আবারও আপনি ভুল করছেন। বলুন তো কোন গুণে আমি তার ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য! চেতনা আমার কখনও মোহে আবদ্ধ হয়নি। সে ভালোবাসা আপনি দেখেছে হয়তো তা ভদ্রতা।
তকির : আমি তোমার মন বুঝি, নাওয়াববাঈ। তুমি যে ভালোবসো না, তা কেবল চোখের ভালোবাসা, তা কিন্তু নয়। দুদিনের জন্য হলেও গালিবের প্রতি তোমার গভীর ভালোবাসা জন্মছে।
নাওয়াব: আপনি আমার হৃদয়ের কথা বোঝেন না। যতক্ষণ সূর্য অনাচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ সূর্যের কিরণে সন্তাপিত হই, তবে মেঘকেই ভালোবাসি।
তকির : কিন্তু সূর্য ছাড়া সংসার যে আঁধার!
নাওয়াব: আকাশে মেঘ জমলেও কিন্তু সংসার

আঁধার হয় না। মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর আলোর বিচরণ সর্বজীবনমুগ্ধকারী, অবশ্য তা উপলব্ধির জন্য সহৃদয়তার প্রয়োজন।

তকির : সহৃদয়তা! পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন। যথার্থ প্রশ্নই বটে। তোমার নিরাশি হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমি গালিবকে চিনি। সে পুনরাগমন করবে। তোমাকে না দেখে সে আর কত ভালো থাকবে? কালে স্থায়ী প্রেম সঞ্চার হবে।

নাওয়াব: এসবের কী প্রয়োজন তকির সাহেব। তার চেয়ে বরং আমি নিজেই কলকাতা ত্যাগ করি।

তকির : উৎসব শেষ না হলে তো কলকতা ত্যাগ করতে পার না।

নাওয়াব: আপনি কৃপা করলে সবই হয়।

তকির : তবে এখন আর তর্ক নয়। আগে বাড়িতে যায় তখন দেখা যাবে।

দৃশ্য দুই

স্থান : গালিবের বাড়ি।

সময় : সকাল।

সংলাপ : নাওয়াব ও গালিব।

নাওয়াব: তাড়াতাড়ি আসুন।

গালিব: আসছি।

নাওয়াব: আমার উপস্থিতিতে আপনি মনে মনে ভারি বিরক্ত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার বেশি সময় নেবনা।

গালিব: মনের মধ্য কত কথা আছে হে দরদি বন্ধু, কিন্তু সেগুলো ঠোঁট পর্যন্ত এসে পৌঁছোয় না।

নাওয়াব: ঠোঁটে পৌঁছানোর জন্য কী করতে হবে?

গালিব: আগে একটু চা পান হোক, পরে দেখা যাবে।

নাওয়াব: আচ্ছা।

[গালিব উঠে যায়। কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে আসে।]

নাওয়াব: (জানালাটার দিকে তাকিয়ে) চমৎকার পরিবেশ। ওখানে বসেই বুঝি আপনি সব প্রেমের কবিতা রচনা করেন?

গালিব: মাঝেমধ্যে। জোর করে কলম ধরলে কবিতা সৃষ্টি না হয়ে পারে না।

নাওয়াব: জোর করেই একজন আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। দোলনায় দোলা; প্রেমিকের চিরকুট লেখা পত্র দলা পাকিয়ে ছুড়ে দেওয়া।

গালিব: দলা পাকানো পত্র পেয়ে কখনও উৎফুল্ল, কখনও-বা সমবেদনায় ভারাক্রান্ত।

নাওয়াব: আসলে বন্ধুত্ব পাতানোর মতো কোনও মানুষ সে ছিল না। ওর কারণেই আমার বান্ধবিও আর থাকেনি।

গালিব: প্রেমিকের সঙ্গে বান্ধবীর সম্পর্ক কী ছিল?

নাওয়াব: ভাই বোন। বান্ধবীটির বাড়িতে গেলে ওর ভাইটি আমাকে নানাভাবে উত্যক্ত করত। শুধু বান্ধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারিনি। তাছাড়া ধর্ষণের ভয়ও ছিল।

গালিব: ধর্ষণ?

নাওয়াব: ভাইটি বলেছিল, শরীর নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলার কথা তার বোনকে বললে সে আমাকে ধর্ষণ করবে। তার এই কুৎসিত লিপ্সায় প্রেম ছিল না। ছিল কাম, ঘৃণা আর আতঙ্ক।

গালিব: জঘন্য।

নাওয়াব: আমার ভাগ্য! এই ভাইটি আমাকে একলা পেলে, হ্যাঁচকা টানে হাত ধরে আমার গালে মুচড়েমুষড়ে লকলকে জিভটি লেপটে দিত। কী কুৎসিত সেই ঘটনা। ওর অত্যাচারে আমার মনে ভালোবাসার অনুভূতিগুলো মরতে মরতে তীব্র ঘৃণা জন্মায়। ওর কুৎসিত আচরণের কথা গোপন রাখতে রাখতে মানসিক অশান্তিও তৈরি হয়। মানসিক চাপের অভিশপ্ত কারণগুলো আমাকে প্রবলভাবে মনে করিয়ে দেয়- এই জীবন নিতান্তই অর্থহীন। আমি শুধু একখণ্ড রক্তমাংস। আমার জন্মই হয়েছে কেবল অন্যকে বিকৃত সুখ দেওয়ার জন্য। নিজেকে শেষ করে দিলেই মুক্তি মিলবে। আমার মা আমাকে আবিষ্কার করেন অচেতন অবস্থায়। তারপর চিকিৎসা। ধবধবে সাদা বিছানা। কিন্তু আমার মরণ হলো না। বিছানায় শুয়ে শুয়েই মাকে সবই বলি। মা শোনেন বন্ধুর মতো। চুপচাপ শুনে যান। ধীরে ধীরে সুস্থতা আসে। সুস্থ হলে আমার বান্ধবী আসে দেখা করতে। মা সিদ্ধান্ত নেন আমাদের বাড়িতে ওর আসা নিষেধ। কিন্তু বান্ধবীটি আমাকেই দোষী বলে ঘোষণা করে দেয়। দরজার ফাঁক গলে বেরিয়ে আসা বান্ধবীটির অশ্রাব্য-অকথ্য শব্দে আমার চোখে জল আসে। নিজেকে ভর্ৎসনা দিতে থাকি- আমি এক অপদার্থ মেয়ে। পরক্ষণে চোখের জল রূপান্তরিত হয় আগুনে। নিজেকে শক্ত করি। অন্তরে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে প্রতিবাদ। ছুটে গিয়ে বান্ধবীটিকে বলি, তোর ভাই একটা নষ্ট শয়তান। মা-ও শোনেন। তিনি আমার কাঁধে হাত রাখেন। এই স্পর্শটি আমার খুবই প্রয়োজন ছিল।

গালিব: নিজেকে উজাড় করে দিলে নাওয়াব বাঈ।

নাওয়াব: আপনি এখনও সহজ হতে পারছেন না।

গালিব: অতিরিক্ত উত্তেজনায় সহ্য করতে পারি না।

নাওয়াব: তবুও তো আপনাকে একটি প্রশ্ন করার আছে? অভয় দিলে বলতে পারি।

গালিব: (প্রসন্ন স্বরে) বুঝি নাওয়াববাঈ। বলতে পার, ভয় নেই। কিন্তু সবপ্রশ্নের উত্তর হয়তো-বা দেওয়া সম্ভবও না হতে পারে। শান্তভাবে মেনে নেওয়াই ভালো।

নাওয়াব: যাক চিন্তার আর কোনও কারণ নেই, রাগ করবেন না।

নাওয়াব: আপনি না কি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন? কোথায় আপনার অন্তর্দাহ, বুঝতে পারছি না।

গালিব: তকির! তকিরই আমার অন্তর্দাহ। তোমার কাছে যাওয়া-আসা তকির সহ্য করতে পারছে না।

নাওয়াব: এজন্যই বুঝি একটা অনির্দেশ্য এবং অস্পষ্ট ব্যথায় আপনি এমন করছেন?

গালিব: হ্যাঁ, তা-ই।

নাওয়াব: আর আপনার স্ত্রী?

গালিব: আমি বিবাহিত পুরুষ। স্ত্রীর জন্য অন্তর্দাহ সৃষ্টি হওয়াই তো স্বাভাবিক।

নাওয়াব: চিন্তার দ্বারা নিজের কথাগুলো যাচাই করে দেখার সময় বা প্রয়োজন কিছুই আমার নেই। তাই বলছি, যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব; কিন্তু আপনার অপমান সহ্য করতে পারবনা। আপনিও নিরর্থক অপমান সহ্য করবেন না। চলে যান। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলব। আপনিও করবেন এইটুকুই আমার মিনতি।

গালিব: বিলক্ষণ! তকিরের তত্ত্বকথা ও অপমানের বোঝা নিঃশব্দে দুই কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছি। এখন নীরবে প্রস্থান করাই আমার উচিত। জীবনই এখানে নিয়ে এসেছিল, মৃত্যুই দূরে নিয়ে যাবে, আসার ইচ্ছেও ছিল না আমার, যাওয়ারও নেই।

নাওয়াব: মির্জা সাহেব, যেমন করে চেয়েছিলাম তেমন করে তো কাউকেই কিছু দিতে পারলাম না। চেয়েছিলাম দিনের-পর-দিন আমি বড়ো হয়ে উঠব, কিন্তু পারলাম কোথায়? এসবকথা যখন ভাবি...।

গালিব: এত ভাবার কি আছে, নাওয়াববাঈ? যে যা চায়, যেমন করে চায়, তা কি পায়?

নাওয়াব: সান্ত্বনা দিচ্ছেন?

গালিব: না, নাওয়াববাঈ।

নাওয়াব: যখন আপনি এখান থেকে চলে যাবেন, তারপর কি মনে রাখবেন আমাকে? এই কয়েকটি দিন মনে পড়বে আপনার? আমি কিন্তু ভাবতে পারি না। অথচ দেখুন, তখনও সন্ধ্যা হবে, সকাল হবে... দিন এমনই চলবে।

গালিব: একটি গান শোনাবে নাওয়াববাঈ?

গান

মনে রেখো সখা এ সুখের দিন
ভুলে যাবে কি সবই?
যদি না থাকি সঙ্গে বাসর জাগাতে
তবু ভেবে নিয়ো প্রদীপই সুখ-নিশীথে
আর প্রভাতে হাসবে রবি-
ভুলে যাবে কি সবই?

গালিব: এ কি গান নাওয়াববাঈ?

নাওয়াব: এই গানটি একদিন...।

গালিব: কী?

নাওয়াব: এই গানটি আমার কণ্ঠে তকির সাহেব শুনেই এই কলকাতায় আমন্ত্রণ করেন। আজ মনে হচ্ছে ভুল করেছি।

গালিব: কেন?

নাওয়াব: হাজারটা দোষত্রুটি মিলিয়ে আমি একজন রক্তমাংসের মানুষ হলেও আমার মধ্যে কোনও রঙয়ের সন্ধান না পেরেই তকির সাহেবের চোখদুটি রঙিন হয়ে গেল। তিনি যেমন করে চান তেমন করে তো আমি কিছুই দিতে পারি না।

গালিব: তকিরের ভাগ্য দেখছি জ্বলছে ঈর্ষার আগুনে। এই ভাগ্যদর্শনের জন্য মোটেই আমি প্রস্তুত না।

নাওয়াব: আমিও ছিলাম না। তাই তিনি তিরস্কার করে বলেছিলেন, হিসাব, হিসাব, শুধুই হিসাব নাওয়াববাঈ। এত ছোট তোমার প্রাণ? বাঈজি মাত্রেই কি এমন হয়?

গালিব: তকির এমন কথা বলতে পারল?

নাওয়াব: সমাজের যে-স্তর থেকে আমি এসেছি, সেখানে জীবনটাকে নগ্নভাবেই দেখেছি। নৃত্য, লাস্য আর সংগীত সুধা বিতরণ করাই আমার পেশা- একথা অস্বীকার করতে পারি না। আমার জীবনে আবমিশ্র অমৃতের স্বাদ কমই জেনেছে। কণা কণা গরল মিশিয়ে প্রসাদ পেয়েছি জীবন দেবতার প্রসাতির অঞ্চলি থেকে।

গালিব: সাঙ্ঘাতিক কথা!

নাওয়াব: তবে এও সত্য, আঘাত দিতে আর নিতে জানি আমি, পোড়খাওয়া সৈনিকের মতো।

তবুও তকির সাহেবের অভিযোগে মর্মে মর্মে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।
গালিব: কী বললে?
নাওয়াব: আমি পালটা প্রশ্ন করি- আমি হিসাবি? আমার প্রাণ ছোট?
গালিব: কী বলল?
নাওয়াব: আমার কণ্ঠের আকুতি তিনি শুনেও শোনেননি। আরও নির্মম হয়ে বলেছিলেন, একখানা খোলা আকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাছে এসেছিলে তুমি, মনে পড়ে? অথচ মনটা তোমার এত ছোট যে, হৃদয়ের লেনদেন নিয়েও হিসাবকষতে চাও! ছি!
গালিব: নির্মম আঘাত। তোমার ভালো করার ইচ্ছেও যদি কখনও তার মনে আসে- তার নিষ্ঠুরতার কথা শোনে লজ্জায় আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।
নাওয়াব: কাঁপা হাতেই তিনি তার শিকারকে সঠিকভাবে বাঁধলেন। তার লক্ষ্যে এতটুকু ভুল ছিল না। প্রতিবাদ করে বলি, আপনি আমাকে এই কথা বললেন কেন? উত্তরে বললেন, বলবনা? একশত বার বলল। তোমার ভারি তেজ নাওয়াববাঈ। কিন্তু আমি তোমাকে ভয় পাই না।
গালিব: তোমার আমার মতো মানুষকে বাঁধতে চাইলেই ওরা বাঁধতে পারে?
নাওয়াব: তকির সাহেব যেমন করেই হোক আমাকে বাঁধতে চান। ছাড়তে চান না।
গালিব: তোমাকে দুঃখ পেতে দেখলে আমার ভালো লাগে না।
নাওয়াব: দুঃখ?
গালিব: দুঃখই তো প্রকাশ পাচ্ছে তোমার চোখেমুখে।
নাওয়াব: দুঃখ নয়, মির্জা সাহেব। বলুন ভাগ্য। সুখের জন্যই তো তাড়া করে বেড়াই লখনৌ থেকে কলকাতা, ভেলপুর থেকে কেদার।
গালিব: ঘুরে বেড়াও- পদ, সুর ও তালের ভারসাম্যে। সুখের কি প্রয়োজন, দুঃখ যেখানে প্রবল।
নাওয়াব: আপনি বাস্তবাদী কবি।
[অশ্রু গড়াতে থাকে নাওয়াববাঈয়ের চোখ দিয়ে।]
গালিব: তুমি কাঁদছ নাওয়াববাঈ?
নাওয়াব: না।
গালিব: তাহলে বলো, কেন তোমার চোখে অশ্রু? তোমাকে দুঃখ দিয়ে ফেললাম। ক্ষমা করো আমাকে।
নাওয়াব: না, না, কোনও দুঃখ আপনি দেননি।
গালিব: সত্যি?
নাওয়াব: সত্যি। এবার উঠতে হয় মির্জা সাহেব। হায় ঈশ্বর, আমাকে মুছে ফেলতে চাইছ কেন?
গালিব: আমি এমন এক অক্ষর, যা এক জীবনকাব্যে লেখা যায় না।
নাওয়াব: ইশকের কাছেই সময় শেষে যেতেই হয়।
গালিব: আমি শুধু সুরার পিয়ালা-এ-সাগরে নিমজ্জিত থাকতে চাই।
নাওয়াব: বিদায় মির্জা সাহেব।
গালিব: খোদা হাফেজ।

দৃশ্য তিন
স্থান : তকিরের বাড়ি।
সময় : দুপুর।
[নাওয়াববাঈকে খুঁজে পাচ্ছে না তকির। অভুক্ত শয্যার ওপর শুধু একটি পত্র পড়ে আছে। পত্রটি দেখেই তকিরের মাথা ঘুরে যায়। পত্র পড়তে হয়নি, না পড়েই সব বুঝে নেয়। বুঝে নাওয়াববাঈ পলায়ন করেছে। পত্রটি খুলে পড়তে ইচ্ছে হয়নি। তা করতলে বিমর্দিত করে। কপালে করাঘাত করে শয্যায় বসে পড়ে।]
তকির : আমি পাগল। না হলে সকালে বাড়িতে থেকে যাওয়ার সময় বুঝলাম না কেন?
[আস্তে আস্তে পত্রটি খুলে পড়তে থাকে।]

নাওয়াববাঈয়ের পত্র
জনাব তকির সাহেব,
যেদিন আপনার মুখে শোনলাম যে, আমার জন্য আপনার ও মির্জা সাহেবের মধ্যে দুঃখের ছায়া নেমে এসেছে, সেই দিনই মনে মনে সংকল্প করি, যদি কোনও সুযোগ আসে তাহলে আপনাদের সুখী করব। আপনাদের বন্ধুত্ব রখা করে কলকাতা ত্যাগ করব। কিন্তু আমার সেই ভাগ্য হলো না। আপনাদের সুখের কামনায় আমাকে কলকাতা ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও উপায় আমার নেই। আপনি যখন এই পত্রটি পাবেন, তখন আমি অনেক দূর চলে যাব। আপনাকে যে বলে আসেনি, তার কারণ এই যে, আপনি আমাকে আসতে দিতেন না। এখন আপনার কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, আমার সন্ধান করবেন না। আর যে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে এমন ভরসাও নেই। লাখনৌ ফিরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। আমার সন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। আমি এখন পথের কাঙালিনী হলাম। ভিখারিণীবেশে দেশে দেশে ঘুরে ফেরব। ভিক্ষা করে দিনপাত করব। আমাকে কেউ চিনবেনা।
আপনি আমার একটি কাজ করবেন। মির্জা সাহেবের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাবেন। আমি তাকে পত্র লিখে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। চোখের জলে অক্ষর দেখতে পারিনি। কাগজ ভিজে নষ্ট হয়েছে। ভেজা কাগজ ছিঁড়ে ফেলে আবার লেখতে চেষ্টা করেছি- আবার ছিঁড়েছি- আবার লিখেছি- আবার ছিঁড়েছি- কিন্তু কোনও পত্র লেখা হয়নি।
আপনি যেমন ভালো বিবেচনা করেন, তেমনই আমার এই সংবাদ তাকে দেবেন। তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে, আপনাদের ওপর অভিমান করে আমি দেশান্তর হয়নি। আপনাদের ওপর আমার কোনও অভিমান নেই। কখনও আপনাদের ওপর আমি অভিমান করতে পারি না। করবও না। যাদের কথা মনে হলে আহলাদ হয়, তাদের ওপর রাগ করা কি সম্ভব? আপনাদের ওপর যে অচলা ভক্তি, তা বজায় রয়েছে। যতদিন না মাটিতে এই দেহ মিশে ততদিন থাকবে। আপনাদের সহস্র গুণ আমি কখনও ভুলতে পারবনা।
জন্মের মতো সর্বত্যাগী হয়ে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আশীর্বাদ করি আপনাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক, আপনারা চিরসুখী হন।
নাওয়াববাঈ।
তকির : আমি নাওয়াববাঈকে ভীষণ ভালোবাসি। সে আমার কারণেই আত্মবিসর্জন দিতে কলকাতা ত্যাগ করেছে। তার স্থলাভিষিক্ত কেন আমি করলাম? ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! এখন আমার চেতনা হয়েছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল মরার জন্য। আমারও মরার জন্যই মোহনিদ্রা ভেঙেছে। এখন নাওয়াববাঈকে কোথায় পাই? কি করলে যেমন ছিল তেমন হয়? নাওয়াববাঈ আর কতদূর যেতে পারে? এখনই অনুসন্ধান করলে তার সন্ধান পাওয়া যাবে।
স্থান : গালিবের বাড়ি।
সময় : দুপুরের পর।
[তকির ছুটে আসে মির্জা গালিবের বাড়িতে। দরজা খুলে একজন ভৃত্য তাকে একটি পত্র ধরিয়ে দেয়।]
গালিবের পত্র
তোমার হৃদয়ের কথা বুঝি। তোমার হৃদয় নাওয়াব বাঈয়ের প্রতি রূপজ মোহে- রূপভোগলালসায় আচ্ছন্ন। এই কথা বলছি এই জন্য যে, তা ভালোবাসা নয়, বরং কামাতু চিত্তচাঞ্চল্য, বন্যার জলের মতো পঙ্কিল ও ক্ষণিক। ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলা যায় না। প্রণয় সৃষ্টি হয় প্রথমে গুণগ্রহণ, তারপর আসঙ্গলিপ্সা, অতঃপর সফল সংসর্গে। ভালোবাসা হচ্ছে প্রণয়ে আত্মবিসর্জন দেওয়া। তবে আমি তোমাকে তিরস্কার করছি না। শুধু অনুরোধ করছি- তোমার হৃদয়ের রূপজ মোহ দূর করে ভালোবাসায় নিজেকে সুখী করো। ভালোবাসাই মানুষের একমাত্র নির্মল ও অবিনশ্বর সুখ।
ভালোবাসাই মানবজাতির উন্নতির শেষ উপায়। মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসলে মনুষ্যকৃত অনিষ্ট আর পৃথিবীতে থাকবেনা।
আমার হৃদয়ে দারুণ ব্যথা। অপমানিত ও মর্মপীড়িত। অতি অধম অসহ্য। সবই আমার কপালের দোষ। এই কলকাতা বাস আমার জন্য শেষ হয়ে এসেছে। বৈকুণ্ঠের বিহঙ্গকে তো বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করতেই হয়। অথচ আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছিলেন, সেই পরিমাণে আর কাউকে হয়তো দেননি। ধন, ঐশ্বর্য, সম্পদ, মান- সবই ভূমিষ্ঠ হয়েই অসাধারণ পরিমাণে পেয়েছিলাম। বিধাতাও কার্পণ্য করেননি। শিক্ষায় পিতা-মাতা ত্রুটি করেননি। আমার তুল্য সুশিক্ষিত কেই-বা আছে! উন্নতদেহবিশিষ্ট রূপ, উজ্জ্বলবর্ণকান্তি, দেবপুরুষ, বিদ্যা, প্রণয়শীলতা- সবই প্রকৃতি আমাকে অমিতহস্তে প্রদান করেছিল। যে সম্পদ দুর্লভ- এই সংসারে অমূল্য- তোমার বন্ধুত্ব তাও আমার প্রসন্ন কপালে ঘটেছিল। গৃহলক্ষ্মী ভার্যাও আমার ছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত ভাগ্য আর কার আছে? কিন্তু জাগতিক মোহ না থাকলে এসবস্বর্গসুখ ধরে রাখা যায় না।

চিত্তসংযমের সদুপায়স্বরূপ তোমাকে, আমাকে ভালোবাসে যেতে হবে। অকপটে নিজেকে একসময় আত্মসমর্পণও করতে হয়। আর তাই, তোমার বন্ধুত্বের শক্তিতেই, বিহঙ্গ যেমন শান্তির নীড়ান্বেষণে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ায় তেমনই আমিও পরিভ্রমণে যাত্রা করলাম। আমি নিষ্ক্রান্ত হলাম। তোমার আর ভয় নেই। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ভালোবাসার কুসুমসুবাসিত নিকুঞ্জে বসবাস করতে পার। তোমাকে আমি কখনও ভুলবনা।
মির্জা গালিব।
গজল (পুরুষ কণ্ঠে)
আমার হৃদয়ে প্রেমের আগুন, বুক ভরেছে প্রেয়সীর শোকে;
এ ঘরে এমনই আগুন লেগেছে, যা পোড়াল গোটা বিশ্বকে।
প্রেমের লুকানো তাপ কী নিদারুণ আহা হৃদয় পোড়াল;
যেন ধিকধিক জ্বলন্ত আগুন ছাই হয়ে নিভে গেল।

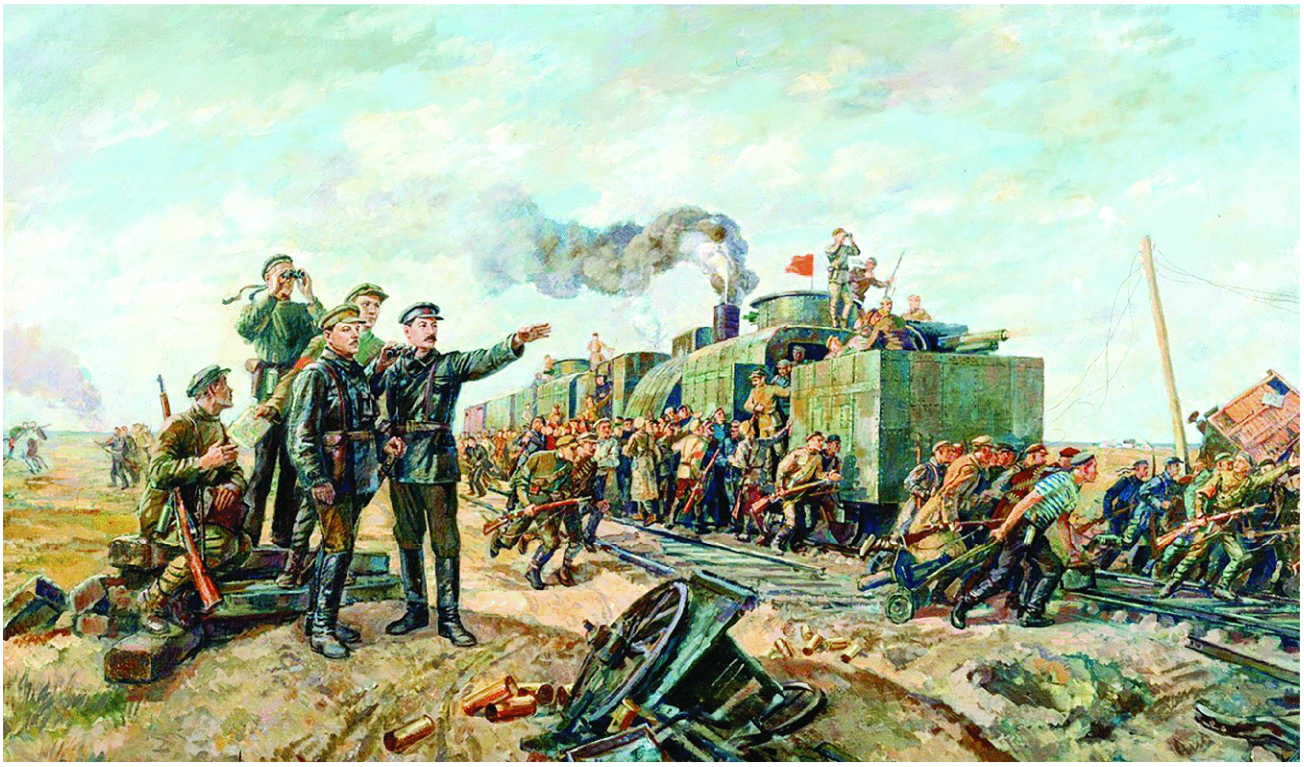

যুদ্ধ

পৃথিবীর ভয়াবহ যেসব যুদ্ধ

যুদ্ধ শব্দটির সাথেই যেন জড়িয়ে আছে মৃত্যুর বিভীষিকা, আর্তনাদ, ভয়ার্ত সময়ের চিহ্ন। সভ্যতার আদি থেকেই ক্ষমতা দখল, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা কারণেই পৃথিবীর ইতিহাসে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আর এসব যুদ্ধের কারণে অগণিত মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে অনেক নগর, বন্দর, সভ্যতা। যুদ্ধ যেমন ভয়ংকর সময়ের সাক্ষী, তেমনি সভ্যতার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে বারবার। মানবিকতাকে করেছে বিপন্ন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

পৃথিবীর ইতিহাসে যত ভয়াবহ যুদ্ধ সম্পর্কে জানা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এমনও বলা হয় যে, এটি ছিল সভ্যযুগের সর্বপ্রথম অসভ্য যুদ্ধ। ভয়াবহতম এ যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল প্রায় চার বছর। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধটি ইউরোপিয়ান মহাযুদ্ধ নামেও পরিচিত ছিল। এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার, পৃথিবীর ইতিহাসে এটি ছিল এমন এক যুদ্ধ- যার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও বিশ্বযুদ্ধ-১, বা মহাযুদ্ধ নামেও এটি পরিচিত। এই বৈশ্বিক যুদ্ধ ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই ইউরোপে শুরু হয় এবং ১১ নভেম্বর ১৯১৮ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ৬ কোটি ইউরোপীয়সহ আরও ৭ কোটি সামরিক বাহিনীর সদস্য ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম এই যুদ্ধে একত্রিত হয়। এটি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘাতের একটি এবং এর ফলে পরবর্তী সময়েও এর সাথে যুক্ত দেশগুলোর রাজনীতিতে অনেক বড় রকমের পরিবর্তন হয়। এমনকি এই যুদ্ধর কারণে অনেক দেশে বিপ্লবেরও সূচনা হয়।

১৯১৪ সালের ১৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড এক সার্বের গুলিতে নিহত হন। ফলে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং ওই বছরের ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর এমন পরিপ্রেক্ষিতে এই দু'দেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে। দেখা যায়, এই যুদ্ধে যোগ দেয় সে সময়ের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী সব দেশ। এভাবেই মূলত সূচনা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের।

তবে এটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ডই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল না। কেননা, উনিশ শতকে শিল্প বিপ্লবের কারণে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তৈরি পণ্য বিক্রির জন্য উপনিবেশ স্থাপনে প্রতিযোগিতা এবং আগের দ্বন্দ্ব-সংঘাতসহ বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একপক্ষে ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, জার্মানি ও বুলগেরিয়া। যাদের বলা হতো কেন্দ্রীয় শক্তি। আর অপরপক্ষে ছিল

সার্বিয়া, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি, রুমানিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদেরকে বলা হতো মিত্রশক্তি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৯০ লাখ যোদ্ধা ও ১ কোটি ২০ লাখ নিরীহ মানুষ নিহত হয়। প্রায় এক কোটি সৈন্য এবং ২ কোটি ১০ লাখ সাধারণ মানুষ আহত হয়। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে চারটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এছাড়া অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং তুরস্ক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা অধিকাংশ আরব এলাকা ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ১৯১৭ সালে বলশেভিকরা রাশিয়ার এবং ১৯২২ সালে ফ্যাসিবাদীরা ইতালির ক্ষমতায় আরোহণ করে। এ যুদ্ধের অন্য ফল হলো: ইনফ্লুয়েঞ্জায় বিশ্বব্যাপী ৫ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গের সাথে ভয়াবহ শব্দটা যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এ যাবৎকাল পর্যন্ত সংঘটিত সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল, এই ছয় বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়সীমা ধরা হলেও ১৯৩৯ সালের আগে এশিয়ায় সংগঠিত কয়েকটি সংঘর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

মূলত তৎকালীন বিশ্বে সব পরাশক্তি এবং বেশিরভাগ রাষ্ট্রই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল আর দুইটি বিপরীত সামরিক জোটের সৃষ্টি হয়; একটি হলো মিত্রশক্তি আরেকটি অক্ষশক্তি। এই মহাসমরকে ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্তৃত যুদ্ধ বলে ধরা হয়। এই যুদ্ধে ৩০টি দেশের সব মিলিয়ে ১০ কোটিরও বেশি সামরিক সদস্য অংশগ্রহণ করে।

এটি ছিল ইতিহাসের এমনই এক ভয়ানক যুদ্ধ যে, অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ খুব দ্রুত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সক্ষমতার সবটুকু দিয়ে অর্থাৎ অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা প্রয়োগ শুরু করে। এর ফলে নির্বিচার গণহত্যা, হলোকস্ট (হিটলার কর্তৃক ইহুদিদের উপর চালানো গণহত্যা), পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগসহ এই যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার হয় অসংখ্য মানুষ। ৫ কোটি থেকে সাড়ে ৮ কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

পূর্ব এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে জাপান ১৯৩৭ সালে প্রজাতন্ত্রী চীনে আক্রমণ করে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় ঘটনাটিকেই মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা বলে গণ্য করা হয়।

রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ

পৃথিবীর ভয়াবহ সব যুদ্ধের কথা আসলে, রাশিয়ার গৃহযুদ্ধর কথা চলে আসে। এটি ছিল প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যে ১৯১৭ সালে সংঘটিত দুইটি বিপ্লবের পরবর্তীকালে রাশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন?্য বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই। এ কথাও স্মর্তব্য যে, এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুইটি দলের একটি ছিল ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক ধাঁচের সমাজতন্ত্রের সমর্থক লাল ফৌজ এবং আরেকটি ছিল শ্বেত ফৌজ, যেটি ছিল রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও অন?্যান?্য ধাঁচের সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের একটি জোট।

মূলত ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাশিয়ান সাম্রাজ্য পতন হলে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধটি মূলত 'বলশেভিক রেড আর্মি' এবং 'হোয়াইট আর্মি'র মধ্যে সংঘটিত হলেও বহু বিদেশি আর্মি এ যুদ্ধে রেড আর্মির বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল। ভয়াবহতম এ যুদ্ধটি ১৯১৭ থেকে শুরু করে ১৯২১ সাল পর্যন্ত চলছিল। এ যুদ্ধে আনুমানিক ৯০ লাখ লোক প্রাণ হারান।

দ্বিতীয় কঙ্গোযুদ্ধ

যুদ্ধ প্রসঙ্গে ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়ার মতো অঞ্চলের দেশ আলোচনায় এলেও আফ্রিকাতেও ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আধুনিক আফ্রিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহতম যুদ্ধের প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কঙ্গোযুদ্ধের নাম আসে। কেননা যুদ্ধ যে কতটা রক্তাক্ত, কতটা বিধ্বংসী হতে পারে তার জ্বলন্ত এক দৃষ্টান্তই যেন দ্বিতীয় কঙ্গোযুদ্ধ। এই ভয়াবহতম যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল আফ্রিকার সাতটি জাতি এবং সঙ্গে সমরাস্ত্রে সজ্জিত ২৫টি আর্মড গ্রুপ। প্রথম কঙ্গোযুদ্ধ বন্ধের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রথম যুদ্ধের ভয়াবহতাকেও অতিক্রম করে ২০০৮ সালে এই যুদ্ধ শুরু হয়। আর এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এটাও পরিলক্ষিত হয় যে, প্রথম কঙ্গোযুদ্ধের ইস্যুগুলোকে সামনে রেখেই গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রতিষ্ঠা বা খনিজ সম্পদের ওপর প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ বাধে। দ্বিতীয় কঙ্গোযুদ্ধ কমপক্ষে ৫৪ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। আর লাখ লাখ মানুষ নিজেদের সম্পদ-ঘরবাড়ি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় নেয়। তথ্য মতে, ২০০৩ সালের জুলাই মাসে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোয় অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এ যুদ্ধ থেমে যায়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ

যুদ্ধের নানা রকম ভয়াবহতা থাকে আর যুদ্ধের সঙ্গে গণহত্যার প্রসঙ্গে এটা বলা দরকার, পৃথিবীর ইতিহাসে গণহত্যার জন্য সবচেয়ে কুখ্যাত যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধকে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধ নামেও পরিচিত। ভিয়েতনাম যুদ্ধ এমন এক যুদ্ধ, যাতে আমেরিকা হেরে গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালের ১ নভেম্বর ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিলে সাইগনের পতন পর্যন্ত ভিয়েতনাম, লাওস এবং কম্বোডিয়ায় চলাকালীন সংঘাত। এ যুদ্ধকে ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংঘটিত সবচেয়ে বড় সংঘাত হিসেবেমানা হয়। এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল আমেরিকানদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। অর্থাৎ সাম্যবাদী শাসন বা কমিউনিজম যেন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যেতে না পারে সে জন্যই আমেরিকা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মূলত প্রাথমিকভাবে যুদ্ধের শুরুটা হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে। মাঝখান থেকে আমেরিকা যুক্ত হলে যুদ্ধ তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং ভয়াবহ রূপ নেয়। আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে ১৯৬৫ সালে সেখানে সৈন্য পাঠায়, কিন্তু এর ফলে যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তাতে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জয়ী হতে পারেনি।

কারও কারও কাছে এই যুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ-যুগের প্রক্সি যুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত, যা ১৯৭৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ জড়িত থাকার মধ্য দিয়ে ১৯ বছর ধরে চলেছিল এবং এতে লওটিয়ার গৃহযুদ্ধ ও কম্বোডিয় গৃহযুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা এই তিনটি দেশের কমিউনিস্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটেছিল।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধর কথা আসলে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কথা চলে আসে। পবিত্র ভূমি জেরুজালেমকে মুসলমানদের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ইউরোপের খ্রিস্টানশক্তি সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। আরব দেশগুলো খ্রিস্টানদের সঙ্গে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে । ১০৯৫-১২৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩০০ বছরব্যাপী খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ পরিচালনা করে। জেরুজালেমের পূণ্যভূমি দখল নিয়ে দুই-তিন দফায় সংঘর্ষে জড়িয়েছিল মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়।

ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ

যুদ্ধ যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, ভয়াবহ হয়েছে তেমনি ক্ষণস্থায়ীও হয়েছে। জাঞ্জিবারের সুলতান সৈয়দ খালিদ ও ইংরেজদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাকে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ বলা হয়। ১৮৯৬ সালের ২৭ আগস্ট এ যুদ্ধ হয়। মাত্র ৩৮ মিনিট ছিল এ যুদ্ধের স্থায়িত্ব। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সৈয়দ খালিদ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি অ্যাডমিরাল স্যার হ্যারিসন সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতানের রাজপ্রসাদ অবরোধ করে গোলাবর্ষণ শুরু করলে মাত্র ৩৮ মিনিটের মাথায় জাঞ্জিবারের সুলতান পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেন।

মৃত্যু ছাড়াই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ

যুদ্ধ চলে একটানা ৩৩৫ বছর। গুলি ছোড়া হয়নি একটিও। আহত বা নিহত হয়নি একজনও। ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ডাচরা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজকীয় বাহিনী বা পার্লামেন্টারিয়ান বাহিনী কোনো পক্ষকেই সেই সময় তারা সমর্থন দেয়নি। যে দল জিতবে তাদের পক্ষেই তারা যাবে- এমনই ছিল ডাচদের মনোভাব। কিন্তু এটা তখন ঘটতে থাকে যে, যুদ্ধে এক সময় পার্লামেন্টারিয়ানদের আধিপত্য বিস্তার শুরু হয়। রাজা চার্লসের অনুগত বাহিনী পিছু হটতে থাকে। আর স্বাভাবিকভাবেই হাতছাড়া হতে



থাকে একের পর এক শহর। আর পার্লামেন্টারিয়ানদের জয় নিশ্চিত দেখে ডাচরাও তাদের সমর্থন দেয়। তখন রাজকীয় বাহিনী ইংল্যান্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

রাজকীয় বাহিনীর সর্বশেষ শক্ত ঘাঁটি ছিল ইংল্যান্ডের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা কর্নওয়াল থেকে ৪৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ছোট্ট দ্বীপপুঞ্জ সিসিলি। ১৬৫১ সালে, গৃহযুদ্ধের শেষ বছরে সেখানে অবস্থানরত রাজকীয় বাহিনীর যুদ্ধজাহাজের আক্রমণে ডাচ নেভির একটি জাহাজ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ঘটনার পর ডাচ অ্যাডমিরাল মার্টেন হারপার্টজোন ১৬৫১ সালের ৩০ মার্চ রাজকীয় বাহিনীর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। স্বাভাবিকভাবেই সে দাবিপ্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আর তখন ক্ষুব্ধ ডাচ অ্যাডমিরাল সিসিলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু দেখা যায়, যুদ্ধ ঘোষণা করে অ্যাডমিরাল ট্রাম্প একটিও গুলি বা গোলা না ছুড়ে জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরে যান। সে বছরই রাজকীয় বাহিনীকে হটিয়ে পার্লামেন্টারিয়ানরা সিসিলিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ফলে তাদের সঙ্গে আর ডাচদের যুদ্ধ করার সুযোগ হয় না। একসময় ডাচরা তাদের এই যুদ্ধের কথা ভুলে যায়।

এ ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা যায়, নেদারল্যান্ডসের লন্ডন দূতাবাস আনুষ্ঠানিকভাবে এই যুদ্ধের কথা স্বীকার করে নিলে রয় ডানকান ডাচ কূটনীতিককে সিসিলিতে আমন্ত্রণ জানান শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ১৯৮৬ সালের ১৭ এপ্রিল ডাচ রাষ্ট্রদূত শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অবসান হয় একটি রক্তপাতহীন যুদ্ধের, রচিত হয় নতুন একটি ইতিহাসের। যুদ্ধ চলে একটানা ৩৩৫ বছর।

তাইপিং বিদ্রোহ

চীনে মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্য অন্যতম হলো তাইপিং বিদ্রোহ। মানুষের দুঃখ দুর্দশা, দুর্নীতি আধিপত্যসহ নানা কারণে এই বিদ্রোহ হয়েছিল। এটি ছিল ১৮৫১ সাল থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধ। যে যুদ্ধে প্রায় ২ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। এটি ছিল চীনের সবচেয়ে বড় গৃহযুদ্ধ।

লুসান রেবেলিয়ন

চীনে ট্যাঙ্গ এবং ইয়ান রাজবংশের মধ্যে সিংহাসন দখলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। পৃথিবীর ভয়াবহ সব যুদ্ধ প্রসঙ্গে এটিও অন্যতম। ৭৫৫-৭৬৩ সালে সংগঠিত এ যুদ্ধে প্রায় দুই কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

মোঙ্গল শাসনকাল

১২০৭-১২৭২ সালে সংগঠিত এ যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ৩ কোটি থেকে ৬ কোটি বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে বলা দরকার, প্রায় দুইশ' বছর স্থায়ী ছিল মোঙ্গল সাম্রাজ্য। পূর্ব ইউরোপ থেকে জাপান এবং সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সাম্রাজ্য। ভয়ংকর মোঙ্গলদের আক্রমণে এসবঅঞ্চলে সবমিলিয়ে মারা গিয়েছিলেন প্রায় ছয় কোটি মানুষ।

নাপোলিওনিক যুদ্ধ

ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত যুদ্ধ হলো নাপোলিওনিক যুদ্ধ। একসঙ্গে একাধিক দেশ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল সেই সময়ে। ১৮০৩-১৮১৫ সালে সংগঠিত হওয়া এ যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ৩৫ লাখ থেকে ৭০ লাখ।

গ্রন্থনা : আহমেদ নিলয়



সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

মানজুরুল ইসলাম

প্রবন্ধ

শতবর্ষে দাঁড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো ক্ষেত্রে অর্জন ও প্রত্যাশার কথা লেখা নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাকে প্রেক্ষাপট করে এমন বিষয়ে লেখাটা হবেআরও কঠিন। কেননা এরূপ কাজের সঙ্গে দায়িত্ববোধের বিষয় জড়িত থাকে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে শুরু করে শতবর্ষে দাঁড়িয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেই এদেশীয় সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার একমাত্র ক্ষেত্র বলা যায়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় শতবর্ষের অর্জন ও প্রত্যাশাকে কালানুক্রমে এই লেখায় উপস্থাপন করতে পারলে সেটি একটি দারুণ ব্যাপার হবে। জাতীয়তাবাদী চেতনা হলো একটি দেশের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মূল চালিকা শক্তি। বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গাঢ় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সংস্কৃতিচর্চা বলি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা বলি সবই তখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। তবে আমাদের পক্ষে সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। দুটি হলো একে অপরের পরিপূরক।

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' স্লোগানটিকে ধারণ করে চিন্তাচর্চা ও জ্ঞানের স্পৃহা সৃজন ও আবহমানকালের চিন্তা, চেতনা ও জ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ সাধনকে উদ্দেশ্য করে ঢাকা

ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী শিক্ষক ও ছাত্রের প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিরা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। ব্রিটিশ শাসনামলে এ দেশের মুসলমানরা চিন্তা-চেতনায়, জ্ঞানে, গরিমায়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। এমন করুণ পরিস্থিতি থেকে মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হোসেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন মুসলমান সমাজের জীবন ও গতির পরিবর্তন সাধন। তাদের এ প্রচেষ্টা মুসলিম মানস প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সমাজের এ জাগরণই পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং এদেশের সংস্কৃতি চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের প্রসঙ্গ এলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অগ্রণী হয়ে দেখা দেয়। মূলত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার জন্মদাতা বলতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে।

'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর পর ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা সাংস্কৃতিক চর্চার কোনো প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে হলে প্রথমেই আসবে'তমুদ্দুন মজলিস'-এর নাম। এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। ভাষা আন্দোলনের সাথে বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'তমুদ্দুন মজলিস' বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা সৃষ্টিতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছে। ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল হোসেনের নেতৃত্বে 'তমুদ্দুন মজলিস' নামে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে চালু করার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে 'তমুদ্দুন মজলিস'। ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে 'তমুদ্দুন মজলিস'-এর উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকার লেখক ছিলেন তিনজন- অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমেদ। যারা সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র। 'তমুদ্দুন মজলিস'-এর উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদানের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। যার আহ্বায়ক মনোনীত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা দাবির ভিত্তিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এই সাফল্যের পেছনে 'তমুদ্দুন মজলিস'-এর যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে তা আমরা কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারিনা।

৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সবই ছিল বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন। যা বাঙালির স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এসব স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নায়কোচিত ভূমিকা এখন অবধি বর্তমান রয়েছে যদি মাঝে অনেকবার মুখ থুবড়ে পড়েছে কিংবা পড়ার উপক্রম হয়েছে।

এখন আমরা যদি এ কালানুক্রমিক বর্ণনাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনায় আসি তাহলে ব্যাপারটি আরও বিশেষ হয়ে উঠবে।

তখন ৬৯-এর গণআন্দোলনে উত্তপ্ত দেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণও খুবই উত্তপ্ত। ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ায় তার রক্তমাখা শার্ট নিয়ে মিছিলে নেমেছে ছাত্রজনতা। পুলিশের গুলিতে প্রাণ গেল নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউরের। এদিকে ছুরির আঘাতে নিহত রুস্তম। আবার নাখালপাড়ায় গৃহের অভ্যন্তরে সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর সময় পুলিশ ও ইপিআরের গুলিতে নিহত হন মা আনোয়ারা বেগম। রক্তের প্রতিশোধ নিতে জনরোষে ফেটে পড়ে ঢাকা শহর। এমনি অগ্নিময় এক সকালে ঢাকা শহরের সবাই দেখলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি দেয়াল ছেয়ে গেছে একটি কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায়-

'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়,
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।'

পঙ্‌ক্তিমালার কবি হেলাল হাফিজ। তিনি ছিলেন ঐতিহ্যবাহী শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। কবিতাংশটুকু কবির 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কবিতায় সশস্ত্র যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে। কবিতাটি নিঃসন্দেহে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনকার সময়ে। কবিতাটির অনুপ্রেরণার সাথে সন্দেহাতীতভাবে বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার এক সুস্পষ্ট মেলবন্ধন রয়েছে। এখনো কবিতাটি লাখো তরুণের ধমনিতে জাগায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস। আমাদের প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামে যার পঙ্‌ক্তিমালা বিজয়ের পথ দেখায়।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় যাদের অবদান তাদের কথা এভাবে একে একে বলতে গেলে কয়েকজনের নাম প্রথমেই বলতে হবে। তারা হলেন- অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, আহমদ ছফা ও আসাদুজ্জামান নূর। যদিও আরও অনেকেই রয়েছেন যারা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বমহিমায় মহিমান্বিত।

প্রথমে জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক স্যারের কথায় আসি। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিথযশা শিক্ষক। তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের জন্য এক অনন্য প্রতিষ্ঠান যা বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের প্রাচ্যতত্ত্ব, ইতিহাস ও রাজনীতিতে অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি শিক্ষকদের শিক্ষক হিসেবে অভিহিত হতেন। তার অনুগামীদের মধ্যে শুধু বুদ্ধিজীবী নয়, শেখ মুজিবুর রহমানের মতো অনেক রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। এমন লোক কি আমরা খুঁজে পাবো যে দার্শনিক সক্রেটিসের নাম জানেন না? খুব সম্ভবত না। যিনি তার সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছেন জ্ঞানার্জন আর জ্ঞান বিলিয়ে দেওয়ার জন্য। তবে সক্রেটিসের জ্ঞান, দর্শন কিংবা মতবাদ সমূহের কোনো কিছুই তখনকার সময়ে লিখিত আকারে ছিল না। তাতে কি সক্রেটিসের নাম ইতিহাস থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে? অবশ্যই না। এর মূল কারণ হলো সক্রেটিস তার কিছু যোগ্য উত্তরাধিকারী রেখে যেতে পেরেছিলেন। তার এই উত্তরাধিকারীরাই কালান্তরে তাদের গুরুর জ্ঞান ও দর্শনকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। আমাদের বাংলাদেশের মানুষ খুবই আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। আবহমানকাল ধরে চলমান সমাজব্যবস্থা ও চিরায়ত প্রথা আমাদের আমৃত্যু জ্ঞান ও দর্শন চর্চায় সীমা লঙ্ঘন না করার উপদেশ দেয়। তাই আমাদের মনে আতঙ্ক থাকে বেশি বৃদ্ধি পেলে ভয়ংকর ঝড়ে ভয়ংকর করে ভেঙে পড়ার। এরূপ প্রতিবন্ধকতাকে উতরে যাবে এমন মহৎ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের দেখা মেলা ভার। আমাদের প্রায় সাতান্ন হাজার বর্গমাইলে এমন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন, যিনি হয়ে উঠেছেন মহিমান্বিত ও কিংবদন্তি। তবে একদমই কি পাওয়া যাবে না? না, এমন একজন সত্যিই আমাদের ছিলেন। যিনি তার সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন সক্রেটিসের মতো জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানোৎসর্গে। তিনি জীবনভর ছিলেন জ্ঞানের অতল সমুদ্রে ডুবে। তিনি আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক স্যার। যিনি জগৎ সংসারকে দেখতেন গৌণ রূপে আর জ্ঞানার্জনকে দেখতেন মুখ্যরূপে। আমাদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে আমরা তার কাছে চিরকাল ঋণী।

চলুন এবারে আমরা আহমদ ছফাকে নিয়ে আলোকপাত করি। তিনি সম্ভবত আধুনিক সময়ে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রগতিশীল লেখক। তার কলমের শাণিত লেখনীতে সমাজের অসঙ্গতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তিনি লিখেছেন সমাজের সম্মিলনের অভাবকে পূরণ করতে। লেখনীতে আহমদ ছফা ছিলেন সবসময় সাবলীল। তিনি তার লেখনীতে শব্দচয়নের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন আহমদ ছফা। আহমদ ছফা অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বহুদূর। 'যদ্যপি আমার গুরু' বইটি আহমদ ছফা লিখেছেন তার গুরু অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাককে নিয়ে। যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্র মুখ থুবড়ে পড়েছে সেখানেই আহমদ ছফা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরা তার 'গাভী বিত্তান্ত' বইটির কথা জানি। সাহসী বক্তব্যের মাধ্যমে আহমদ ছফা তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন। তিনি যদিও তার বইতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোন প্রশাসনের কথা তিনি বলছেন তা পরিষ্কার করেননি। তবে মিয়া মুহাম্মদ আবু জুনায়েদ এ ছদ্মনামের ভাইস-চ্যান্সেলরকে কেন্দ্র করে যেভাবে তিনি গল্পের প্রেক্ষাপট সাজিয়েছেন তাতে কারোরই বুঝতে বাকি থাকার কথা নয় তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে কথা বলেছেন। আমাদের মাঝে কিছুদিন পরপরই বাঙালি, বাংলাদেশি কিংবা বাঙালি মুসলমান

ইত্যাদি নিয়ে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়। অবশ্য এ ধরনের বিতর্ক নিয়ে প্রথম লেখা 'বাঙালি মুসলমানের মন' লিখেছেন আহমদ ছফা। লেখাটির সাথে আমরা সবাই একমত নাও হতে পারি। দেখা যাবে, আমরা অনেকেই লেখাটির অনেকগুলো পদ্ধতিগত ভুল বের করতে পারবো। তবে বাঙালি মুসলমানের সামষ্টিক অবস্থাকে বুঝতে হলে আপনি আহমদ ছফার দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। এগুলো বাঙালির সংস্কৃতির অঙ্গনে এক নতুন প্রভাব সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। আহমদ ছফার 'সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার চরিত্র বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ভয়াবহ সংকীর্ণ ও একমাত্রিক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের প্রতি আহমদ ছফা এমন কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন যেগুলো প্রচলিত চিন্তাধারাকে চরম অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশ ও বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির একটি শক্তিশালী ধারার ধারক ও বাহক নিঃসন্দেহে আহমদ ছফা। আহমদ ছফা তার বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বসেই পাকাপোক্ত করেছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, ব্যক্তির আলাপের মধ্যদিয়েই আমরা শতবর্ষে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

আমরা এখন শেষ একজন ব্যক্তিকে দিয়ে অর্জনের পর্বটা শেষ করতে চাই। যদিও এতে অর্জনের খুবই সামান্য এখানে উঠে আসবে। আমরা এখন কথা বলবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরকে নিয়ে। তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের (পূর্বতন ইকবাল হল) আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন। তার স্বাধীনতা যুদ্ধে রয়েছে অপরিসীম অবদান। তাকে আমরা বেশিরভাগ চিনি 'বাকের ভাই' এই নামে। এখানে আমরা তার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করব। আসাদুজ্জামান নূরের মতে, সংস্কৃতির সাহায্যেই একটি দেশকে সারা পৃথিবীর বুকে শক্তিশালীরূপে তুলে ধরা যায়। এটা নিঃসন্দেহে সংস্কৃতির বড়ত্বের ব্যাপারে একটি বিশাল কথা। তার কাছে বহির্বিশ্বের কাছে দেশকে তুলে ধরতে সাংস্কৃতিক কূটনীতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তার এমন দৃষ্টিভঙ্গির বীজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই বপিত হয়েছিল। এমন করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে। আসাদুজ্জামান নূর বিশ্বাস করেন সবারই নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকা উচিত। কেননা মানুষকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একত্র করতে রাজনীতির চেয়ে সংস্কৃতি অনেক বেশি প্রভাবশালী। তিনি মনে করেন এমন সম্মিলন ঘটাতে হলে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে হতে হবেউদার ও মুক্তচিন্তার অধিকারী। তার মতে, ছোটবেলা থেকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রতি একটি আকর্ষণ তৈরি করে সেটাকে লালন করতে হবে।



কালানুক্রমিক বর্ণনা ও ব্যক্তির আলাপের মধ্যদিয়েই শতবর্ষে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জনের আলোচনা এখানেই শেষ হলো। এবারে আমরা প্রত্যাশার দিকে আলোকপাত করতে চাই।

প্রত্যাশার সাথে অর্জনের সঙ্গতি সাধারণত সমানে সমান হয় না। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। তবে আমাদের প্রাপ্তির ঝুলিটাও একেবারে ছোট নয়। বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে মুক্তবুদ্ধির চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই মুক্তবুদ্ধি চর্চার মূল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। তবে আমাদের দেশে আমরা মুক্তচিন্তার ব্যাপারটিকে সঠিকভাবেআমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সঙ্গায়িত করতে পারিনি। আমরা পশ্চিমা ঘরানার চিন্তাকে এনে আমাদের মাঝে বসিয়ে দিয়েছি। যা অনেক ক্ষেত্রেই যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। আমরা আমাদের মুক্তচিন্তার অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে যখন জোরদার করেছি তখন আমরা আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় আনতে সক্ষম হইনি। ফলে আমাদের মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। যা আমাদের জাতিগত বিভেদ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যদি বলি তাহলে বলতে হবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই এ ব্যাপারে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টি যেখানে হওয়ার কথা অসাম্প্রদায়িকতা চর্চার অভয়ারণ্য, সেখানে মাঝে মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রকারেই সাম্প্রদায়িক। আমরা আমাদের দেশে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তচিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মের সাথে গায়ে পড়ে বিতর্ক সৃষ্টি করতে চাই। যা আমাদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের লক্ষ্য হতে দূরে সরিয়ে দেয়। আমরা যদি ধর্মের সাথে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সমন্বয় ঘটাতে পারি তাহলে আমাদের আন্দোলনের এ যাত্রা সফল হতে পারবে। আর এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা হওয়া উচিত অগ্রগণ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন মানবিক গবেষণার স্থান নেই বললেই চলে। যা একবিংশ শতাব্দীর যন্ত্র সভ্যতার বাস্তবতায় খুবই জরুরি ছিল। শতবর্ষে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ হওয়া উচিত আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ। উন্নত ও সমৃদ্ধ পরিবেশ ছাড়া আমরা অন্তত পক্ষে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। সম্ভবনা হলে চাহিদার তুলনায় আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পিছিয়ে পড়বে। পরিশেষে শতবর্ষে এই প্রত্যাশা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিকতা ও আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে আমাদের ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নবোদ্যমে।

জয় হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, জয় হোক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের।



গল্প

খুঁতখুঁতে তুবার জীবন্ত পোস্টমর্টেম

স. ম. শামসুল আলম

রাত সাড়ে ১০টার দিকে তুবার ফোন থেকে কল এলো। রিসিভ করার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কেননা, বিকাল থেকে ওকে অনেকবার ট্রাই করেছি। ফোন বন্ধ পাচ্ছিলাম। বারবারই বলা হচ্ছিল এই মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একটিবার রিং হতে না-হতেই কল রিসিভ করলাম। বললাম, হ্যাঁ, তুবা- তুমি কোথায়? সেই বিকেল থেকে তোমাকে ট্রাই করছি-।

ওপাশ থেকে ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, একজন পুরুষের। তিনি বললেন, আমি তুবার ফোন থেকে কল করেছি ঠিকই, কিন্তু বুঝতেই পারছেন আমি অন্য কেউ।

আমি হতাশ হয়ে কিছুটা থতমত খেয়ে চুপ করে থাকি। তিনি বলে চললেন, ঘাবড়াবেন না, তুবা ভালো আছে। সামান্য এক্সিডেন্ট, আশা করি শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে। তুবা এখন ঢাকা মেডিকেলে আছে, আপনাকে দেখতে চাচ্ছে।

আমি হতাশ কণ্ঠে বললাম, আপনি কে বলছেন প্লিজ? আপনার পরিচয়? ভারী কণ্ঠটি এবার আরও ভারী মনে হলো। বললেন, আমি সামান্য কেউ। একজন পুলিশ অফিসার। আপনি দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে চলে আসুন।

ফোনটি কেটে দিলেন তিনি। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। হাসপাতাল থেকে ডাক্তার ফোন করতে পারেন। কিন্তু পুলিশ কেন? মাকে ডেকে বললাম, মা, আমি একটু হাসপাতালে যাচ্ছি।

মা চমকে উঠে বললেন, এত রাতে হাসপাতালে কেন? কার কী হয়েছে? আমি কখনো মিথ্যে বলি না। সব কথা খুলে বললাম। তুবা সকালে রওনা হয়েছিল ওর এক আত্মীয়ের বাসায় যাবে বলে। সন্ধ্যার আগেই ফেরার কথা। কিন্তু বিকেল থেকে ট্রাই করে ফোনটা বন্ধ পেয়েছি। ওর রুমমেট

শ্রেয়সীকে ফোন করেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সে-ও নাকি চেষ্টা করে তুবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। এখন এই দুঃসংবাদ।
সব শুনে মা বললেন, তোর যাওয়া ঠিক হবে না। পুলিশ ফোন করেছে মানে অপরাধ জড়িত আছে।
আমি বিনয় দেখিয়ে বললাম, পুলিশ তো ভালো কাজেও জড়িত থাকে মা।
মা বললেন, তা থাকে। কিন্তু তবুও আমার মনে খটকা লাগছে। আজকাল কতরকম উটকো ঝামেলা কতজনের ঘাড়ে এসে পড়ছে। এইসব মেয়েরা কতরকম ঝামেলার সঙ্গে জড়িত থাকছে। আজও টিভিতে খুনের ঘটনা দেখলাম, অন্য ঘটনা দেখলাম।
অন্য ঘটনা বলতে মা ধর্ষণের ঘটনা বুঝাতে চাইছেন, বুঝতে বাকি রইল না। খবরটি আমিও দেখেছি। টিভির স্ক্রলে তখনো দেখাচ্ছে। 'চলন্ত বাসে আবারও গণধর্ষণের শিকার এক তরুণী' শিরোনাম। 'আবারও' শব্দটি যুক্ত করে তারা বুঝাতে চাইছে এমন ঘটনা পূর্বে আর ঘটেছিল। একইরকম ঘটনা বারবার কীভাবে ঘটে তা বুঝার সাধ্য কারও নেই। শেষমেশ মা বললেন, দ্যাখ তোর বাবা কী বলে-।-
বাবা বললেন, আমি বাধাও দেব না, যেতেও বলব না। তুমি বড় হয়েছ, নিজের বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে পথ চলো। তবে আমি তোমার জায়গায় থাকলে এসব উটকো ঝামেলার মধ্যে জড়াতাম না।
বাবা এটাকে উটকো ঝামেলা বলছেন বাবার জায়গা থেকে। কিন্তু আমার মনে হয়, বাবা আমার জায়গায় থাকলে অনেক আগেই ছুটে যেতেন। মা-বাবার অনুমতির প্রয়োজন বোধ করতেন না হয়তো। কারণ তুবার প্রতি আমার একধরনের দুর্বলতা তৈরি হয়েছে। এটাকে ঠিক দুর্বলতা বলা যায় না। আবার প্রেমও বলা যায় না। তবে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা ইয়ে-ইয়ে ভাব এসেছে। এই ভাবটা ঠিক উপযুক্ত শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করার মতো নয়। এমন নয় যে বৃক্ষের কাণ্ডের সাথে শিকড়ের সম্পর্ক, অথবা ডালের সাথে পাতার সম্পর্ক। তবু গাছ বেয়ে ওঠা পরগাছার সম্পর্কের মতো কিছু একটা হবে। একজন ছাড়া একজন বাঁচবে না, এমন নয়। পরগাছা তুলে ফেললে আবার কোনো না কোনো গাছ পেঁচিয়ে উঠে পড়বে। মরণ হলে সেটা গাছের জন্যও যেমন, পরগাছার জন্যও তেমন। আমি ফোন করলাম শ্রেয়সীকে। সে একবাক্যে রাজি হয়ে গেল আমার সাথে যেতে। অনেক দুশ্চিন্তায় ছিল মেয়েটা।

বেরোবার সময় মা বললেন, রাতের খাবারটা খেয়ে যা। ওখানে কত দেরি হয়, না হয়-।
আমি সবিনয়ে বললাম, এসে খাব মা। এখন যাই।
একটা সিএনজি অটো নিলাম। প্রথমে গিয়ে থামলাম প্রচ্ছায়া এপার্টমেন্টের পাশে টিনশেড বাড়িটির সামনে, যে বাড়িটার একটি ঘরে ভাড়া থাকে তুবা আর শ্রেয়সী, এবং যে বাড়িটার কারণে আমরা বাড়িঅলা আর ওরা ভাড়াটিয়া।
শ্রেয়সীকে তুলে নিয়ে নয় তলা প্রচ্ছায়া পেছনে ফেলে ছুটলাম ঢাকা মেডিকেলের দিকে।
ভাড়াটিয়া বলেই হয়তো শ্রেয়সী একটু কাঁচুমাচু করে দূরত্ব বজায় রেখে বসেছে।
ওরা দুজন প্রথম যেদিন ভাড়া নেবার জন্য ঘর দেখতে এলো, সেদিন তো আমার এত মায়া করেছিল যে, মন বলছিল বিনাপয়সায় একটি ঘর ওদেরকে দিয়ে দিই।
আমাদের টিনশেড এই বাড়িটাতে বেশ কটি ঘর আছে। সবগুলোই ভাড়া দেয়া। কোনো একটি ঘর খালি হলে মেটাল শিটের একটি টু-লেট বোর্ড গেটে ঝুলিয়ে দিই, যেখানে 'ঘর ভাড়া হবে' বড় হরফে লেখা এবং ছোট হরফে আমার মোবাইল নাম্বারটি দেয়া থাকে। ছয় মাস আগে, ঠিক ছয় মাস নয়, প্রায় সাত মাস আগে তুবা যখন আমাকে ফোন করল, তখন আমার ভেতরটা কেন জানি ছেনাৎ করে উঠল। এত সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠ, শুদ্ধ ভাষা- আমি কি মিস্টার ফয়সাল গফুরের সাথে কথা বলছি?
: হ্যাঁ বলছি, বলুন?
: আমি শানজিন হক তুবা-। আপনাদের একটি ঘর খালি আছে, ভাড়া নিতে চাই।
: আমরা তো ব্যাচেলর কাউকে ভাড়া দিই না-।
: ব্যাচেলর নই, আমরা দুজন।
: ঠিক আছে, গেটের সামনে একটু দাঁড়ান, আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসতেছি।
'আসতেছি' বলে ফোনের লাইন কাটলাম, সেই সাথে জিভ কাটলাম। জিভ কাটলাম এই ভেবে যে, আমার বলা উচিত ছিল 'আসছি'। যা হোক, বিলম্ব না করে নয়তলা প্রচ্ছায়ার পাশে এসে রিকশা থেকে নামলাম। দেখি দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। নিজ থেকে পরিচয় দিয়ে বললাম, আপনারা বোধ হয় ভাড়া নিতে চাইছেন? চলুন ভেতরে গিয়ে তন্বী ভাবির রুমে বসে কথা বলি-।
তুবা বলল, না, না, ঠিক আছে। অল্প কথা। এখানেই সেরে ফেলতে পারি।
: কে কে থাকবেন এখানে?
: আমরা দুজন। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা দুটি মেয়ে।
: স্যরি, ভাড়া দিতে পারব না। বাবার নিষেধ আছে।
: আপনার বাবা নিষেধ করবেন কেন? শুনেছি ভাড়া দেয়া, ভাড়া তোলা এসবআপনার দায়িত্ব। মানে আপনি যা বলেন-।
: কে বলল?
: তন্বী ভাবি।
: ও-। আলাপ হয়ে গেছে?
হেসে উঠল দুজনেই। তুবা আর শ্রেয়সী। ওরা দুজনেই বাড্ডার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে জব করে। তুবা রিসেপশনিস্ট আর শ্রেয়সী নার্স। আগে মহিলা হোস্টেলে থাকত। বাড়িতে কিছু বাড়তি টাকার প্রয়োজন বলেই কম দামের ঘর খুঁজছিল। যদিও বাবা আহমেদ গফুরের কড়া নিষেধ ছিল, ব্যাচেলর কাউকে ভাড়া দেয়া যাবে না। সে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক। কিন্তু তুবা আর শ্রেয়সীর সাথে কথা বলে মায়ায় পড়ে গেলাম। মানুষ কত অভাবে থাকে। সে তুলনায় আমরা তো অনেক ভালো আছি। গুলশান ১ নম্বরে বাবার একটি বড় দোকান আছে। বাড্ডাতে আমাদের দেড় হাজার স্কয়ার ফুটের একটি ফ্লাট, যেখানে আমরা থাকি। আর টিনশেড জায়গাটি আট কাঠার প্লট। বাবা যখন এটা কেনেন তখন ডোবা ছিল। এখন পাশ দিয়ে বিশ ফুট পাকা রাস্তা। আশেপাশে উঁচু বিল্ডিং উঠেছে। এখনো অনেকগুলো কনস্ট্রাকশন কাজ চলছে। আমাদের প্লটটি নেবার জন্য ডেভলপারের ব্রোকাররা এসে বাবাকে তোষামোদ করছে। কত দাম হয়ে গেছে জায়গাটির। এমন পরিবেশে এমন একটি ঘর পেয়ে তুবা ও শ্রেয়সী ভীষণ খুশি। কিন্তু তুবা একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের। একেতো কমন টয়লেট (তিন পরিবারের জন্য একটি), তার ওপর পিচ্ছিল। ঘষে-মেজে ঠিক করিয়ে দিলাম। বাথরুমের শাওয়ারের স্ক্রু ঢিলা- ঠিক করিয়ে দিলাম। দরজার মর্টিস লক ঠিকমতো লাগে না- ঠিক করিয়ে দিলাম। ফ্যানের রেগুলেটর কাজ করে না, মানে স্পিড বাড়ানো-কমানো যায় না- ঠিক করিয়ে দিলাম। এভাবে নিয়মিত কমপ্লেইন পেতে পেতে আমি অতিষ্ঠ হলেও তুবার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে গেল। মাথায় শুধু তুবা-তুবা খেলা করতে লাগল। মেয়েটি শুধু ঘর গোছানোতে খুঁতখুঁতে নয়, পোশাক-পরিচ্ছদেও। কাপড়ে একটু ময়লা লাগতে দেয় না। নিজেকে এত পরিচ্ছন্ন রাখে যেন আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল বা বিমানবন্দরের থেকেও বেশিটুকু। শ্রেয়সীও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু অতটা খুঁতখুঁতে স্বভাবের নয়।
আমি জগন্নাথে সোশ্যাল সাইন্সে মাস্টার্স পড়ছি। আগামী বছর শেষ হবে। কিন্তু তুবা পড়ালেখাতেও বিঘ্ন ঘটাতে শুরু করল। অনেক রাতে ম্যাসেঞ্জারে কল করে। কথা বলতে হয়। বেশ কিছুদিন হলো ভালোবাসার কথাও ভাবতে শুরু করেছি। কিন্তু ওভাবে কিছু বলা হয়নি। তুবাও কিছু বলেনি। তবু কত কথা। অর্থবহ নাকি নিরর্থক সেটাও বুঝি না। কিন্তু ইয়ে-ইয়ে ভাবটা দুজনের মধ্যেই চলে এসেছে। শ্রেয়সী নিশ্চয়ই সেটা জানে।
শ্রেয়সীকে বললাম, তুমি কি কিছুই জানো না? তুবা কোথায় গিয়েছিল? আর এখন হাসপাতালেই বা কেন?
শ্রেয়সী মিনমিন করে বলল, আমি তো বিকালেই আপনাকে বলেছি ফয়সাল ভাই। ও বলে গেল চন্দ্রার কাছে ওর কোনো আত্মীয় থাকে, সেখানে যাচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। আমাকে অবশ্য সাথে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার ডিউটি ছিল। ওর ডে-অফ ছিল।
সিএনজির আওয়াজে পুরো কথা শুনতে পেলাম না। চন্দ্রাকে শুনেছি চান্দনা নাকি চান্দিনা- খেয়াল করিনি। সিএনজির ভাড়া মিটিয়ে ফোন করলাম তুবার নাম্বারে। রিসিভ করলেন সেই পুলিশ অফিসার। বললেন, আপনি চলে আসুন ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে।
এমন একটি স্থানের নাম শুনেই চমকে উঠলাম। শ্রেয়সীর কাছে জানতে চাইলাম, তুবা যেন কোথায় যেতে চেয়েছিল?
: কেন? কী হয়েছে? চন্দ্রা-।
: চন্দ্রা যেতে তো বাইপাইল দিয়ে যেতে হয়?

টিভির প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে বাইপাইল থেকে নবীনগর যেতে-। তার মানে ওকে উল্টোদিকে নিয়ে গিয়েছিল?
: আপনি কী বলছেন ফয়সাল ভাই? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
: সব শেষ হয়ে গেছে। চলো আমার সাথে।
: তার মানে তুবা কি বেঁচে নেই?
: জানি না। মারা গেলে ছবিটা দেখাতো। বেঁচে থাকলে ছবিপ্রকাশ করে না। তাই ভরসা পাচ্ছি, বেঁচে আছে।
দুজন দ্রুত হেঁটে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের সামনে গেলাম। দেখা পেলাম সেই পুলিশ অফিসারের। তিনি ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করলেন। তুবা শুয়ে আছে। দিব্যি সুস্থ মানুষ মনে হচ্ছে। আমাদের দুজনকে দেখে এমন



একটি হাসি দিল যেন এইমাত্র ও প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এর আগে ওর কোনো প্রাণ ছিল না। হাওয়ার ভেতরে মানুষ ধোঁয়া ওড়ায় দেখেছি, আজ দেখলাম কাউকে হাসি উড়িয়ে দিতে।
প্রথমে শ্রেয়সীর হাত ধরল তুবা। বলল, আমার জন্য দুঃখ করিস না। নিজেকে শক্ত রাখ শ্রেয়সী। জীবন একটাই। কখন কী হয়, কী ঘটে, কে জানে!
আমার চোখ ভিজে উঠছিল কেন জানি না। আমি কি তুবাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম? নাকি এখন ভালোবেসে ফেললাম? তুবা তো আমার কেউ নয়, একজন ভাড়াটিয়া মাত্র। এমন ভাড়াটিয়া কত এলো, গেল; কত আসবে, যাবে।
তবু তুবার জন্য আমার চোখ ভিজে গেল কেন?
তুবা সবাইকে অনুরোধ জানাল, আমার সাথে একা কথা বলবে বলে। পাশ থেকে নার্স, শ্রেয়সীসহ সবাই বাইরে গেল। তুবা আমাকে কাছে ডেকে বসিয়ে হাত ধরল। আমি শিউরে উঠলাম। তুবা আমার আঙুলে মৃদু চাপ দিতে দিতে বলল, আপনি কি কোনো কষ্ট পেয়েছেন? এই ঢাকা শহরে আমার আপন বলতে কেউ নেই। শ্রেয়সীর সাথে পরিচয় চাকরিসূত্রে। আপনার সাথে পরিচয় ভাড়াটেসূত্রে। আপনারা দুজনই এ-শহরে আমার বড় আপন। কিন্তু দ্যাখেন, আমরা কেউ কারো আত্মীয় নই; অথচ আপন।
আমি শার্টের আস্তিনে চোখ মুছে বললাম, কী বলতে চাও, খোলাখুলি বলো।
তুবা এবার আমার আঙুলে একটু জোরে চাপ দিতে লাগল। বলল, একটি অপবিত্র হাতে আপনাকে স্পর্শ করছি। আপনার ঘেন্না হচ্ছে না?
আমি চুপ করে থাকি। তুবা বলে যায়, জানেন ফয়সাল ভাই, আজ সারাদিন আমি বারবার মরেছি। কতবার মরেছি আমার হিসাবআছে, কিন্তু যারা যারা মেরেছে তারা কেউ হিসাব করেনি বা হিসাব রাখেনি।
: কিন্তু আমি তো দেখলাম, ঐ তিন পাষণ্ড- মানে বাস ড্রাইভার, কন্ডাক্টর আর হেলপার যখন তোমাকে রাস্তায় ফেলে যায়, তখন তুমি অজ্ঞান ছিলে। বলা হয়েছে, অচেতন অবস্থায় পুলিশ তোমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
: আমি কখনো অচেতন ছিলাম না, এবং অচেতন হইনি। আপনি জানেন আমি খুঁতখুঁতে স্বভাবের একটি মেয়ে। জীবনের প্রথম একটি অপ্রিয় ধাক্কা সামলে উঠার ক্ষমতা আমার ছিল না। প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল ঠিক। কিন্তু বৃষ্টির শব্দের মধ্যেও আমি জীবনের সবচেয়ে ঘৃণিত শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। পুলিশ আমাকে প্রথমে হাসপাতালে নেয়নি, থানায় নিয়েছিল। সেখান থেকে অনেক দেনদরবার শেষে-, শুধু তাদের দেনদরবার শেষ করেই নয়, আমাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দেবার পর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালে আসার পর জরুরি বিভাগে যে জরুরি তাণ্ডব চালানো হয়েছে, সেটাও সুখকর নয়। ডাক্তারদের আচরণেও আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। যেন আমি ওই অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ একজন।
: কিন্তু আমি তো জানি রিট পিটিশনের পাঁচ বছর পর ২০১৮ সালে আদালত রায় দিয়ে 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' বাতিল করে দিয়েছে।
: 'টু ফিঙ্গার টেস্ট'ই কি সব কথা? একটু সহানুভূতি কি কোনো টেস্টের মধ্যে পড়ে না? আমি কি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, বিশেষ করে ডাক্তার, নার্স, পুলিশ- এদের কাছ থেকে সামান্য সহানুভূতি পেতে পারি না? এই ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে এসে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছি। বিশ্বাস করেন ফয়সাল ভাই, সারাদিন আমার শরীরটা দিয়ে- মানে নিজেরই গা-ঘিনঘিন করছে। আপনার হাতটা ধরতে পেরে এখন মনে হচ্ছে ঘিনঘিন ভাবটা কেটে গেছে। মনে হচ্ছে, আমি একটি মেয়ে নই, একজন মানুষ। আমার পাশে কেউ একজন মানুষ আছে। আমার পার্সটা আমি শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম। সেটা খোয়া যায়নি বলে মোবাইলটা আছে। কিন্তু সেটাও এখন পুলিশের হাতে।
ঠিক তখন ওই পুলিশ অফিসারটি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তুবা আমার আঙুল ছেড়ে দিয়ে নিজের আঙুল মোচড়াতে লাগল। রাত তখন দেড়টা। পুলিশ অফিসার আমাকে বললেন, আপনাকে একটু থানায় যেতে হবে। ভিকটিমের কললিস্ট চেক করে দেখা গেছে, সেখানে আপনার সাথেই বেশি কথা বলা হয়েছে। নিশ্চয়ই ভিকটিম সম্পর্কে আপনি ভালো তথ্য দিতে পারবেন-।
তুবা বলল, এ বিষয়টির সাথে উনি জড়িত নন।
একটু রাগান্বিত স্বরেই বললেন পুলিশ অফিসার, আপনি কী করে জানেন উনি জড়িত নন? আজকাল তো এমন ঘটনা অহরহ ঘটে। প্রেমিকাকে না পেয়ে শেষে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে শায়েস্তা করে। ঠিক আছে, উনি জড়িত না থাকলে সেটা তো খুবই ভালো কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই তো নির্দেশ পেয়েছি। স্যরি, আমাকে উপরের নির্দেশ মানতে হবে।
আমি কোনো কথা না বলে চেয়ার থেকে উঠলাম। তুবার দিকে তাকালাম। দেখি তুবার চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। আজ সারাদিন এই জল যেন জমা করে রেখেছিল। এখন একবারে ঢেলে দিল।



গল্প

গর্ভধারিণী

শারমিন সুলতানা রীনা

বিয়ের ঠিক তিনদিন আগে হবু স্বামীর সঙ্গে দেখা করে তাকে আমার জীবনের কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বলি তাতে যদি সে বিয়ে ভেঙে দেয় কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বিয়ের পর যদি সে সব ঘটনা জানাজানি হয়ে যায় তাহলে চাই না তার প্রভাব আমার দাম্পত্য জীবনে এসে পড়ুক আর বড় ধরনের কোনো সমস্যায় পড়তে হয় দুটো পরিবারকে। আমরা মুখোমুখি বসে আছি। বুঝতে পারছি হাসানের ভীষণভাবে টেনশন হচ্ছে। আমি দ্বিধান্বিতভাবে ভাবছি ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছি কীভাবে বলি তাকে। শুনে ও যদি বিয়ে ভেঙে দেয়। তাহলে যত আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে দুই পক্ষের জন্যই বিব্রতকর হবে। তবু আমাকে বলতে হবে। হাসান আবার জানতে চায় কেন তাকে এভাবে একা একা ডেকে এনেছি। হাসানের সঙ্গে দুবছর আমার পরিচয় দুজন দুজনকে ভালোবাসি আমার ও হাসানের পরিবার আমাদের সম্পর্ককে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে। আর সবার সম্মতিতে অবশেষে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। যে কথাটি আজ তাকে বলতে এসেছি তা কেন এতদিন তাকে বলতে পারিনি নিজেকে প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পাই না আমি। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকে দুচোখে ঘুম নেই। দারুণ এক অস্বস্তিতে আমার দিন কাটছে। আমি কি তাহলে হাসানকে ছেড়ে যেতে চাইনি অথবা সম্পর্ক ভেঙে যাক তাও চাইনি বলেই হয়তো বলা হয়নি কথাগুলো। আজ যেন না বললেই নয়। তাই তাকে ডেকে শেষ দেখাটা করতে এসেছি। তাকে আমি ঠকাতে চাই না। আমার জন্য কেন ওর সমস্যা হবে? এত সব ভাবতে ভাবতে আমার চোখ ভিজে যায়। চোখে জল দেখে হাসান অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আমি কাঁদছি কেন জানতে চায়। তার কোনো ব্যবহারে কষ্ট পেয়েছি নাকি তাও সে বারবার জিজ্ঞেস করে। জীবনের কিছু সত্য ঘটনা থাকে যা কাউকে বলা যায় না আবার সহ্য করা যায় না। প্রথম দিন যখন জানলাম আমি যাদের বাবা-মা বলে জানি আসলে তারা আমার বাবা-মা নন। সেদিন যে হোঁচট খেয়েছিলাম কষ্টে আমার ছোট্ট বুকটি

ভেঙে গিয়েছিল তবু আজও তা কাউকে বুঝতে দিই না। আমার ছোট আরও তিন ভাই-বোন আছে তাদের সঙ্গে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই সে কথা ভাবতে চাই না মনেও করতে চাই না। তবু একদিন বুদ্ধি হওয়ার পরে মাকে ঘরে ডেকে দরজা বন্ধ করে জানতে চেয়েছিলাম। মা আমি যদি তোমার গর্ভের সন্তান না হই তাহলে কে সে আমার গর্ভধারিণী আর কেনই বা তারা আমাকে তোমাদের হাতে তুলে দিল। আমার মা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন তিনি এ বিষয়ে কথা বলতে চান না। শুধু বললেন আমি তোকে পেটে ধরিনি ঠিকই তবে তোকে তো কখনো অন্যের সন্তান ভাবিনি। আমার চারটি সন্তান এটাই সূর্যের মতো সত্যি। মা কথাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে চান। কিন্তু আমি যখন জেনেই গেছি আসল ঘটনা সুতরাং বাকিটুকু আমাকে জানতে হবেআমার মা প্রচণ্ড জেদি একজন মহিলা তার চোখের উপরে বাবাকেও কোনোদিন দেখিনি কথা বলতে অন্যদের তো প্রশ্নই আসে না। আমরা চার ভাই-বোন মাকে খুব ভয় পাই। মায়ের সামনে আমরা কখনো মিথ্যা বলতে পারি না মা ধরে ফেলতেন। চারটি ভাই-বোনকে মা আমাদের সমান আদর-ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করেছেন। নিজের কষ্ট হলেও আমাদের কারও আবদার কখনো মা অপূর্ণ রাখেননি। সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে মা তার সংসারের কাজকর্ম নিজ হাতে করে গেছেন। আমাদের কখনো মা দোকানেও পাঠাননি। সেই মায়ের মুখোমুখি আমি আজ সত্যটা জানতে চাই।

: সত্যি কি তাই যদি শুনিস তাহলে কি তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি নিজের মায়ের কাছে?

: এভাবে বলো না মা আমি তোমাদের ছেড়ে কোথায় যাবো কে আছে আমার?

: আছে তোর সবই আছে আমার ভয় হয় তোকে হারানোর তোকে পাওয়ার পর আমার আরও তিনটে সন্তান হয়েছে আমি কখনো তোদের ভিন্ন চোখে দেখিনি তুই আমার বড় মেয়ে অনেক আদরের বড় মেয়ে।

আমার বয়স তখন পনেরো। কিছু বলার মতো সাহসও যেন হয়েছে তাই মাকে বললাম তুমি ভয় পেও না মা আমি তোমাদের ছেড়ে এ সংসার ছেড়ে কোথায় যাবো? তোমার মতো এত ভালো আমাকে কে বাসবে?

: তোর মা-বাবা?

: কি বলছো তারাকি এখনো জীবিত আছে যদি থেকে থাকে তাহলে তারা এতদিনে আমার কোনো খোঁজখবর নেয়নি কেন? আর তোমাদের কাছেই বা এলাম কী করে। আমাকে সব খুলে বলো মা তানা হলে মরেও আমি শান্তি পাবো না। মা আমার মুখ চেপে ধরে এমন অলক্ষুণে কথা বলবি না কখনো। আমি তোকে ছেড়ে বাঁচব কীভাবেআমি তোকে সব বলব। তুই আমাকে ছুঁয়ে বল এ কথা তুই কারও কাছে বলবি না কোনোদিনও না। মায়ের শরীর ছুঁয়ে মা আমাকে প্রতিজ্ঞা করায়। আমি মায়ের গা ছুঁয়ে অলক্ষ্যে মায়ের গায়ের ঘ্রাণ নিই। আর ভেবে কষ্ট পাই মা আমার আপন মা নয়।

মা বলতে থাকে...

আমি আর তোর মা রেখা একই স্কুল কলেজে পড়েছি। আমরা ছিলাম দুই বান্ধবী। আমরা দুজন দুজনকে ছাড়া কিছুই বুঝতাম না। দুজনের একজন কেউ যদি একদিন কলেজে না আসতাম কলেজ ছুটি হলে আমরা একে অপরের বাসায় গিয়ে খোঁজ নিতাম। তোদের মতো আমাদের সময় মোবাইল ছিল না তাই যোগাযোগ করতে হলে বাসায় বা কলেজে যেতে হতো। এর মধ্যে আমাদের সঙ্গে পরিচয় হয় ফয়সাল আহমেদ নামে একজনের সঙ্গে। সে তখন এমএ পড়ে আমরা পড়ি আইচএসসিতে।

আমাদের দুজনের সঙ্গেই ফয়সালের সম্পর্ক গভীর হয়। আমার নিজের অজান্তে আমি ফয়সালকে ভালোবেসে ফেলি আমি জানতামনা রেখা আর ফয়সাল পরস্পরকে ভালোবাসে যখন জানতে পারি আমি খুবকষ্ট পাই দুজনের ওপর। কেউ আমাকে কিছু বলল না। তোর মায়ের উপর আমার চরম অভিমান হয়। একদিন ঝগড়া করে আমি বাসায় এসে জানতে পারি আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। আমি কোনো কিছু জানতে না চেয়ে সরাসরি বিয়েতে রাজি হয়ে যাই। বিয়েতে তোর মা রেখাকে দাওয়াত দিইনি ফয়সলকে তো প্রশ্নই ওঠে না। বিয়ের তিন বছর হয়ে যায় তোর মায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আমি চলে যাই শ্বশুরবাড়ি রাজশাহীতে কিন্তু আমার বড় সমস্যা হলো আমি তিন বছরে মা হতে পারিনি। শ্বশুরবাড়িতে সবার তিরস্কারে আমি অসহ্য হয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসি ঢাকায়। এসে জানতে পারি ফয়সাল আর তোর মা রেখার তখনও বিয়ে হয়নি কিন্তু রেখা মা হতে চলেছে। সময় যখন কাছাকাছি তখন মুরুব্বিদের চোখে পড়ে বিষয়টি। ফয়সাল এ অবস্থায় বিয়ে করতে চায় না বলে তোকে অস্বীকার করে চলে গেছে। অ্যাভোরশন করার সময়ও পার হয়ে গেছে। আমি বিষয়টি জানতে পেরে রেখাদের বাড়িতে যাই। আমরা দুজন দুজনকে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। রেখার বাবা-মা লজ্জিত। তারা তোকে মেনে নিতে পারছে না। এদিকে আমারও সন্তান হয় না সব ভেবে রেখাকে আমাদের বাড়িতে এনে তিনচার মাস রাখি। প্রতিবেশীদের বলেছি রেখার বর বিদেশে থাকে। তুই হওয়ার পর আমি তোকে নিয়ে নিই আমার মেয়ে করে। আমি রাজশাহী চলে আসি পরে ফয়সালের সঙ্গে রেখার বিয়ে হয়। আমি বিস্মিতভাবে শুনছি সব। মাকে বলে যে তার ঔরসজাত সন্তানকে মেনে নিতে পারেনি সেই মহিলা কি করে তাকে আবার বিয়ে করে। নিজের মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়। আমি আর কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। তবু জানতে চাইলাম তারা কোথায় থাকে? আমার দেবীর মতো মা বললেন আমেরিকায় চলে গেছে সেখানে তাদের একটি মেয়ে হয়েছে পরে। আমি আর কিছু জানতে চাইলাম না রুচিতে এলো না। শুধু ভাবলাম আমি একজন অবাঞ্ছিত সন্তান। আবার মনে হলো আমি তো এই মায়ের আদর ভালোবাসা সবটুকু পেয়ে বড় হয়েছি। মা আমাকে আবারও মনে করিয়ে দিলেন আমি তার শরীর ছুঁয়ে বলেছি কাউকে বলব না।

সময় তার মতো করেই যায়। আমিও সব ভুলে স্বাভাবিক হয়ে গেছি। কিন্তু তিনদিন পর যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবেঅন্তত তার কাছে আমি স্বচ্ছ থাকি। সে যেন আমাকে কোনোদিন ভুল না বোঝে। মায়ের থেকে অনুমতি নিয়ে আজ তাই বিষয়টা হাসানকে বলতে চাই। মা আমাকে অনুমতি দিলেন। হাসান চেয়ে আছে আমার দিকে তার মনে হচ্ছে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। অবশেষে সব খুলে বললাম হাসানকে। হাসান স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টা মেনে নিয়েছে। আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না বলেই এখন তোমাকে বললাম তুমি ইচ্ছা হলে এ বিয়ে ভেঙে দিতে পারো।

: তোমার এ জন্মের জন্য তো তুমি দায়ী নও তবে কেন নিজেকে অপরাধী করছ। একটা অনুরোধ আছে যদি রাখো তাহলে বলি- আমি অভয় দিলাম তাকে। সে আমার হাত ধরে বলল আমি জেনেছি ঠিক আছে; কিন্তু তুমি এ বিষয় আমার বাড়ির কাউকে বলতে পারবে না। আমি হাসানের হাত ধরে প্রমিজ করলাম। হাসান যাওয়ার আগে বলল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে বাসর ঘরে। আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। কি যে বলো না তুমি। মুখে কিছুই আটকায় না।

: আমি আমার বউকে বলেছি আর কাউকে তো না কথা কেন আটকাবে মুখে?

: তোমাকে না দেখে থাকতে পারবো ভাবছো আমরা ফেসবুকে কথা বলব বুঝলে মশাই।

বিয়ের দিন মা ভীষণ কাঁদছে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনে ভরা। তারা মাকে বোঝায় মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে এত কাঁদছো কেন? মেয়ে হলে তাকে পরের বাড়ি যেতে হয়। তুমি আসোনি। আমার মায়ের তাতে রাগ বেড়ে যায়। আমি মেয়ের জন্য কাঁদবো তাতে তোমাদের কি। এই প্রথম এক পরিবারকে দেখলাম যাদের আমি আগে কখনো দেখিনি। মহিলা অপলক আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি বউ সেজে বসে আছি হঠাৎ আমার চোখ যায় অপরিচিত মহিলা চোখ মুছেন। মাকে ডেকে কানে কানে বলি মা ওই আন্টিটা কে? মা বললেন তোমার একজন আন্টি অনেক বড়লোক তোমার বাবার বন্ধুর ওয়াইফ। আমি আর কিছু বললাম না। ছেলেপক্ষ আসাতে বাড়িতে উচ্ছ্বাস শুরু হয়ে গেল। এবার এ বাড়ি থেকে আমার যাওয়ার পালা। আসার সময় মা আমার হাতে একটি প্যাকেট ধরিয়ে দিল এবং বলল প্যাকেটটি যেন আমি আগামীকাল সকালে খুলি। আমি চলে এলাম শ্বশুরবাড়ি। বাসর ঘরে আমরা দুজন। আমার মন পড়ে আছে প্যাকেটের মধ্যেকি আছে তাতে? মা বলেছেন সকালে খুলতে আমি সকালের অপেক্ষা করতে

করতে কখন ঘুমিয়ে গেছি। সকালে ঘুম ভাঙলে আমরা দুজন ফ্রেস হয়ে আসি। আজ আমার বউ ভাত এ বাড়িতেও আত্মীয়স্বজনরা গিজ গিজ করছে। আমার মন পড়ে আছে প্যাকেটটিতে। হাসান আর আমি মিলে প্যাকেটটি খুললাম। আমাদের দুজনেরই চোখ স্থির হয়ে রইল প্যাকেটের ভিতরে কাগজটি দেখে। আমার জন্মদাতা আর জন্মদাত্রী দুজনের দেওয়া গিফট গুলশানে একটি ফ্ল্যাটের দলিল।

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না আরও ছিল আমেরিকায় হানিমুনে যাওয়ার দুটি টিকিট। আমার বুঝতে বাকি রইল না যিনি আমাকে দেখে চোখ মুছছিলেন তিনি আমার গর্ভধারিণী মা।



আমেরিকার ব্রডওয়ে, অফ ব্রডওয়ে, অফ অফ ব্রডওয়ে থিয়েটারের বর্তমান হাতছানিকে উপেক্ষা করে কবেআবার অভিনেতা জিয়া উদ্দীন শিপন পুনরায় ঢাকার মহিলা সমিতি মঞ্চে কিংবা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা কিংবা এক্সপেরিমেন্টাল হলে এসে দাঁড়াবেন সেটি সময় পরম্পরার উপর নির্ভর করলেও স্মৃতি এবং কল্পনায় জিয়া উদ্দীন শিপন বরাবরের মতো সত্য-সুন্দরকে আঁকড়ে ধরে অনন্য সাধারণ। আসবেই বললাম আর থিয়েটার কর্মী বনে গেলাম ব্যাপারটা চটজলদি না বরং একটা দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে এই থিয়েটার কর্মী হয়ে ওঠা। ঢাকার মালিবাগে জন্ম নেওয়া শিপনের বেড়ে ওঠা খিলগাঁও স্টাফ কোয়ার্টারে। কোয়ার্টারে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক মঞ্চস্থ হবে বলে বাল্য বন্ধুর লেখা নাটকের রাজা চরিত্র রূপায়ণের দায়িত্বে সে। এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে চার চারটি চৌকি সারি সারিভাবে বেঁধে মঞ্চ করা হলো।

অভিনয়

অভিনেতা জিয়া উদ্দিন শিপন

অবিনাশ পুরকায়স্থ

আলো আঁধারির মঞ্চ মায়ায়, মানুষের কথা অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাটকের মধ্যে দিয়ে বলবার আশায়, এক বুক ভরা ভালোবাসা আর দিবা-রাত্রি অনুশীলন-অধ্যায়ন আর সাধনায় অভিনয় সত্তার নিমগ্নতায় অভিনেতা জিয়া উদ্দীন শিপন যেন দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মরমীয় উচ্চারণে বলে যায়, 'যে দর্শক এই মাত্র আপনি নাটক দেখতে এলেন তিনি আমার হৃৎপিণ্ড। আপনি বসুলেন যে চেয়ারে সেটি আমার বুকের পাঁজর। আমার অভিনয় নিমগ্নতায় আপনি যখন করতালি দিলেন তখন তা আমার হৃৎস্পন্দন। আমার সমস্ত অভিনয় সত্তা নিয়ে হে দর্শক! আপনাকে জানাই অভিবাদন।' কেউ একজন সেই অর্থে থিয়েটার থেকে নগদ অর্থ সম্মানী না পাওয়া সত্ত্বেও কিসের জোরে এবং কিসের মোহে থিয়েটারটা করে চলে দিনের পর দিন অনেক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে মাথায় না রেখে সেটা

এক অমীমাংসিত রহস্য। জীবন্ত অনুভূতি তুলে ধরা যায়, চরিত্র থেকে চরিত্রের রূপান্তরের রসাসাধন করা যায়, প্রগতিশীল পথপরিক্রমায় অংশীদার হওয়া যায় এরকম কত কথাই না ফুটে ওঠে থিয়েটারবিষয়ক আড্ডায়, ভাবনায় কিংবা সেমিনারের কথার পরম্পরায়। কিন্তু এসবের ভিড়ে লোক নাট্যদলের নির্ভরযোগ্য অভিনেতা, সাহিত্য আশ্রীত নাটকের চরিত্রাভিনেতা এবং নাটক কঞ্জুস-এর কঞ্জুস রূপী হায়দার আলী সাহেবের পুত্র কাযিম রূপি চরিত্রাভিনেতা জিয়া উদ্দীন শিপনের নাটকীয় বিশ্বাস নাটকেরই উচ্চারিত সংলাপের পরম্পরায়। আলী যাকের নির্দেশিত, কল্যাণ মিত্র রচিত, দেশ নাট্যদল প্রযোজিত নাটক দর্পণে শরৎশশী এর মনোরমার অন্তিম সংলাপই জিয়া উদ্দীন শিপনের থিয়েটার ভালো লাগার বিশ্বাস যেখানে সরমা বলে, 'না আমার সিঁথিকণ্ঠ না আমার শরৎ-খুঁজে আর পাইনি কাউকে। কেউ কি আর ইচ্ছা করলে কাউকে বাঁচাতে পারে। যে যার নিজের জোরে বাঁচে, তাগিদে বাঁচে। তাই ভাবিওরাও বাঁচবে, ফিরে আসবে থিয়েটারে। এ মায়া একবার যার জেগেছে কেউ কি তাকে আটকে রাখতে পারে। থিয়েটার মা আমার, ঠিকই বাচ্চাদের টেনে নিয়ে আসবে তার আশ্রয়ে, আসবেই।

আমেরিকার ব্রডওয়ে, অফ ব্রডওয়ে, অফ অফ ব্রডওয়ে থিয়েটারের বর্তমান হাতছানিকে উপেক্ষা করে কবেআবার অভিনেতা জিয়া উদ্দীন শিপন পুনরায় ঢাকার মহিলা সমিতি মঞ্চে কিংবা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা কিংবা এক্সপেরিমেন্টাল হলে এসে দাঁড়াবেন সেটি সময় পরম্পরার উপর নির্ভর করলেও স্মৃতি এবং কল্পনায় জিয়া উদ্দীন শিপন বরাবরের মতো সত্য-সুন্দরকে আঁকড়ে ধরে অনন্য সাধারণ। আসবেই বললাম আর থিয়েটার কর্মী বনে গেলাম ব্যাপারটা চটজলদি না বরং একটা দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে এই থিয়েটার কর্মী হয়ে ওঠা। ঢাকার মালিবাগে জন্ম নেওয়া শিপনের বেড়ে ওঠা খিলগাঁও স্টাফ কোয়ার্টারে। কোয়ার্টারে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক মঞ্চস্থ হবে বলে বাল্য বন্ধুর লেখা নাটকের রাজা চরিত্র রূপায়ণের দায়িত্বে সে। এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে চার চারটি চৌকি সারি সারিভাবে বেঁধে মঞ্চ করা হলো। মা-খালাদের পরিত্যক্ত শাড়ি দিয়ে করা হলো কার্টেন। খেলার মাঠে রং-বেরংয়ের বেলুন বিক্রেতার মাথায় পড়ানো ক্যাপ খুলে এনে করা হলো রাজ মুকুট। পাড়া-পড়শি-এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে রাজা চরিত্রে রাজকীয় অভ্যার্থনা। পরবর্তীতে আবৃত্তি চর্চায় সাফল্য অর্জন। বাল্য কৈশর ডিঙ্গিয়ে যৌবনে এসে সেই নাট্য তাড়নায় নাট্য নিকেতনে যোগদান। কর্মশালায় প্রশিক্ষক গাজী রাকায়েতের নজরে পড়ে রেপার্টরী দল নন্দনে যুক্ত হয়ে আজাদ আবুল কালাম, গাজী রাকায়েত প্রভৃতি অভিনেতাদের সহশিল্পী হয়ে মধ্যলোকের চন্দ্রালোক নাটকে দেবদূত চরিত্রে রূপদান। সেখানে থেকে তিন ধাপে ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আরাধ্য লিয়াকত আলী লাকীর লোক নাট্যদলে যোগদান।

যোগদান হোক কিংবা বিয়োগের কার্যকরণ যেটাই হোক না কেন একলব্য কিন্তু তার গুরুকে যথোপযুক্ত দক্ষিণা প্রদানে কখনোই কার্পণ্য করেন না। যেমনটি বৈষয়িক দূরত্ব সত্ত্বেও করলেন না অভিনেতা জিয়া উদ্দীন শিপন। লোক নাট্যদলে যোগদান এক অর্থে নাটকে যোগদান আবার অন্য অর্থে জীবনেরই জয়গান। শিপনের বিশ্বাস, আজ অভিনয় জীবনে কিছু যদি অর্জন থাকে, পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের মতো এত বড় কর্মযজ্ঞের সংঘে যদি কিছু সাংঘটনিক কাজ যদি করে থাকি, দেশের সীমানা ছুঁয়ে যদি লাউসের ভূখণ্ডে শিশু নাট্যের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি তবে সে সবের ভরকেন্দ্রে আমার নাট্যগুরু, পথপ্রদর্শক, অভিভাবক এবং আমার দলের প্রাণপুরুষ লিয়াকত আলী লাকী।

লিয়াকত আলী লাকীর দিক-নির্দেশনা নিয়ে দিনের পর দিন আরোপিত চরিত্র নিয়ে ভেবে ভেবে চরিত্রকে বুঝতে চেয়েছে জিয়া উদ্দীন শিপন। বোঝাপড়া শেষে আত্মস্থতা এবং তারপর অভিনয়। কঞ্জুস নাটকে বলতে গেলে দুইশততম শোয়ের পর থেকে পালাক্রমে লাল মিয়া এবং কাযিম চরিত্রে সাবসিটিউট হিসেবে অভিনয়। অর্থাৎ মূল অভিনেতার অনুপস্থিতিতে অভিনয়ে রূপদান। কাজে নিমগ্নতা, অভিনয় দক্ষতা এবং নাটকের প্রতি ভালোবাসাই তাকে তিনশততম মঞ্চায়নের পর থেকে নিয়মিত করল কাযিম চরিত্রে। কৃপণ বাবার সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুত্র হয়ে অধরাকে ধরা। পদ্মা নদীর মাঝি নাটকে কপিলার স্বামী হয়ে অসহায়তা। তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকে অংশুমান হয়ে পিতৃ নির্দেশ পালনে কারারুদ্ধ বরণ আবার মুক্ত হয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ভালোবাসার অধিকার পুনঃআদায়করণ। মাঝ রাতের মানুষেরা নাটকে রাতে ভয়ংকর সব ঘটনার মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিটি চরিত্রের সামনে ভবঘুরে চরিত্র হয়ে অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান। মুজিবমানে মুক্তি নাটকে বঙ্গবন্ধু চরিত্রে রূপদান। কল্যাণ মিত্রের রাস্তার ছেলে নাটকে শিক্ষক চরিত্র হয়ে মূল্যবোধের জাগরণ। লীলাবতী আখ্যান নাটকে জ্যোতিষ হয়ে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা আবার মহাকবি কালিদাস হয়ে কাব্যের স্রষ্টা। আরও কত কত যে নাটকে জিয়া উদ্দীন শিপনের জয়যাত্রা তাতো লিখে শেষ করার নয়।

শেষ হবার নয় বলে কথা থেমে গেলেও চলে না। এই যে এত এত চরিত্রে এত এত মনস্তাত্ত্বিক সত্তায় চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার লড়াই, পোশাক-প্রপস-মেকআপ নিয়ে চরিত্র উপযোগী নিজেকে সাজাই সে সবেই তো লুকিয়ে আছে রক্ত-মাংসের শিল্প সত্তার জিয়া উদ্দীন শিপন, চরিত্রের নাটকের প্রতিটি সত্তার শিরায়-উপশিরায়। আর এটা আছে বলেই জিয়া উদ্দীন শিপনের ব্যক্তিসত্তা ও অভিনয় চরিত্র সত্তা মিলেমিশে একাকার অনুরাগী দর্শকদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। নয় নয় করেও মঞ্চ নাটকের সমান্তরাল পথ নাটকে অভিনয় কিছু কম নয়। দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক আশ্রিত পথনাটক নির্মূল, নির্মাণ, মহা প্রয়াণ, বাংলার মুখ প্রভৃতি এবং স্বৈরাচার বিরোধী নাটক দুঃশাসনের নাট্যগুচ্ছ প্রভৃতিতে অভিনয় অনুভূতি জিয়া উদ্দীন শিপনকে ভাবিয়েছে চাইলে রবীন্দ্র সংগীতের সমান্তরাল গণসংগীত গাওয়াও চলে। যেমন চলে মঞ্চনাটকের সমান্তরাল পথনাটকের চর্চা। ব্যাকুলতা নিয়ে গাইতে চাওয়াটা এবং চেষ্টা অব্যাহত রাখাটা জরুরি।

কোনটা জরুরি আর কোনটা অতীব জরুরি সেসব না ভেবেই ট্যাক্স ছাড়া উপদেশ দেওয়ার লোকতো সদাই সর্বত্র বিরাজমান। তেমনই এক অভিভাবক একদিন শিপনের আব্বা সিরাজ উদ্দীনকে তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, এই নাটক ফাটক করে কি হয়! এতো সময়ের অপচয়। শিপনের বাবা বলেছিলেন, কাজ না থাকলে তো সেই পাড়ার আড্ডা আর নেশা ভান। পরে পুলিশে হয়রান। ছেলে যদি পড়াশোনা শেষ করে নাটকটা করে তবে তো একটা সৎসঙ্গ পায়। এতে কর্মব্যস্ততাও থাকল আবার চিন্তার পরিধিও বাড়াল। চিন্তার পরিধি বাড়লে কর্মের পরিধিও বাড়বে। ইতিমধ্যেই শিপন মঞ্চ অভিনয় নিয়ে ভারত, নেপাল, হংকং, মোনাকো, ফ্রান্স, ইউএসএ, লাওস প্রভৃতি দেশে গেছে।

অপরদিকে মা মমতাজ বেগমের সদাই নাটকে নীরব সমর্থন। নাটক শেষে যত রাত করেই ছেলে ঘরে ফিরুক তার তত রাত জেগে থাকা। ভাত গরম করে খেতে দিয়েই তবেই ঘুমুতে যাওয়া। আর স্ত্রী শিখা তো সদাই নাট্য সঙ্গী। স্বামীকে নতুন পোশাক কিনে দিয়ে যেমন আনন্দ তেমনি নতুন নাটকে নতুন চরিত্র পেয়ে স্বামী ঘরে ফিরলেও সেই একই আনন্দ। জিয়া উদ্দীন শিপনের আনন্দ অভিনয়ের পরম্পরায়। এক চরিত্র থেকে অপর চরিত্র, এক অভিনয় থেকে অপর অভিনয়, এক দিনের অভিনয় থেকে অপরদিনের অভিনয়। এ এক আনন্দের পথপরিক্রমা। এ চলার আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেই। জিয়া উদ্দীন শিপন যেন মঞ্চের আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে শত শত চেনা-অজানা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আনমনিয়ে বলে চলে, এ মায়া একবার যার লেগেছে কেউ কি তাকে আটকে রাখতে পারে। থিয়েটার, থিয়েটার মা আমার! মাতৃত্ববোধ যেমন চিরন্তন এবং সর্বজনীন তেমনি নাটকের অভিনয় আকাঙ্ক্ষা এবং বাস্তবতার বোধ একইভাবে চিরন্তন এবং সর্বজনীন। অতীতের বিস্তৃত এবং ব্যাপৃত নাট্যাভিনয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে অভিনেতা জিয়া উদ্দিন শিপন এখন সতীর্থ নাট্য সঙ্গীদের নিয়ে আমেরিকার নাট্যমঞ্চে আমন্ত্রিত অভিনেতা হয়ে আহ্বানিত চরিত্রের সত্তায় মিলেমিশে নাট্যকারের লেখা সংলাপ, নির্দেশকের নির্দেশনায় বলবার অপেক্ষায় কিন্তু অন্তরাত্মায় মিশে থাকছে অভিনেতা জিয়া উদ্দীন শিপনের সেই বিশ্বাস যেখানে অভিনেতা জিয়া উদ্দিন শিপন বরাবর বলে এসেছেন, 'যে দর্শক এই মাত্র আপনি নাটক দেখতে এলেন তিনি আমার হৃৎপিণ্ড। আপনি বসলেন যে চেয়ারে সেটি আমার বুকের পাঁজর। আমার অভিনয় নিমগ্নতায় আপনি যখন করতালি দিলেন তখন তা আমার হৃৎস্পন্দন। আমার সমস্ত অভিনয় সত্তা নিয়ে হে দর্শক! আপনাকে জানাই অভিবাদন।'


WATA CHEMICALS LIMITED
A leading Basic Chemical Manufacturer of Bangladesh
Factory : Murapara, Rupgonj, Narayangonj.
Head Office : 17/B, Monipuripara Sangshad Avenue, Dhaka
Tel : 58152001, 58155206
পণ্য ব্যবহারকারী
সার শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পানি পরিশোধন শিল্প, কাগজ প্রস্তুতকারক শিল্প, স্টীল ও রি-রোলিং মিলস্, টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস, ব্যাটারী প্রস্তুতকারক শিল্প, চামড়া শিল্প, ডিটারজেন্ট ও সাবান প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, ঔষধ শিল্প, রাবার, ইথার, স্বর্ণ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সহ বিস্তৃত রসায়ন ও ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর।
SULFURIC ACID
ZINC SULPHATE
LABSA
ALUMINIUM SULPHATE
MAGNESIUM SULPHATE
BASIC CHROME SULPHATE



খেলা

দুয়ারে কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল

খুব বেশি দেরি নেই। বহুল প্রতীক্ষিত বিশ্বকাপ ফুটবলের ২২তম আয়োজন 'কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল' এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে। দিন যতই যাচ্ছে ততই এই বিশ্বকাপের নানা খবরাখবর ছড়িয়ে পড়ছে। আগামী ২১ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল। শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, এশিয়ানদের জন্য কাতার বিশ্বকাপ নিঃসন্দেহে বড় গৌরবেরই বিষয়। কেননা এর আগে একবার শুধু এশিয়া অঞ্চলে বিশ্বকাপের আয়োজন হয়েছিল। সেবার ২০০২ সালে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া যৌথভাবে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন করেছিল। বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য ইতোমধ্যে কাতারের মোট আটটি স্টেডিয়ামকে প্রস্তুত করা হয়েছে। স্টেডিয়ামগুলো হলো-লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম, আল বাইত স্টেডিয়াম, রাস আবু আবুদ স্টেডিয়াম, আল সুমামাহ স্টেডিয়াম, এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম, আহমেদ বিন আলী স্টেডিয়াম, খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, আল জানুব স্টেডিয়াম। এসব স্টেডিয়ামে গড়ে ৪০ থেকে ৮০ হাজার ফুটবল দর্শক একসাথে বসে খেলা উপভোগ করতে পারবেন। প্রতিটি স্টেডিয়ামেই আরাম, প্রবেশযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিটি স্টেডিয়ামই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের লড়াইকেও আরও মোহনীয় করতে উচ্চ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ বিশ্বকাপে আলোচনায় উঠে এসেছিল ভিডিও অ্যাসিস্টেন্ট রেফারি বা ভিআর প্রযুক্তি। এই পদ্ধতিতে মাঠের অনেক ভুল সিদ্ধান্ত দ্রুতই সংশোধন করা হয়। এবারও এই পদ্ধতির আরও আধুনিক প্রয়োগ দেখা যাবে। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফি কার ঘরে যাবে এ নিয়ে এখনও জোরালো আলোচনা শুরু হয়নি। তবে বিশ্বকাপের দাবিদার যে ব্রাজিল, ফ্রান্স, জার্মান, অর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এবারের বিশ্বকাপের ৩২ দেশ

প্রতিটি দেশই বিশ্বকাপ ফুটবলের গৌরবময় লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য মুখিয়ে থাকে। এজন্য প্রতিটি দেশকে বাছাই পর্বে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করে চূড়ান্ত পর্বে উঠে আসতে হয়। এবারের বাছাই পর্বেও লড়াই-এ ছিল নানা উত্তেজনা আর স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। বাছাই পর্বে ফিফার ২০৯টি দেশকে খেলতে হয়েছে। ২০১৯ সালের জুন থেকে বাছাই পর্বের খেলা শুরু হয়। বাছাই পর্বে প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গোলিয়া এবং ব্রুনাই এই দুই দেশের মধ্যে। বাছাই পর্বের প্রথম গোল করেন মঙ্গোলিয়ার নর্জমোগিনি। বাছাই পর্বে মোট ৮৬১টি

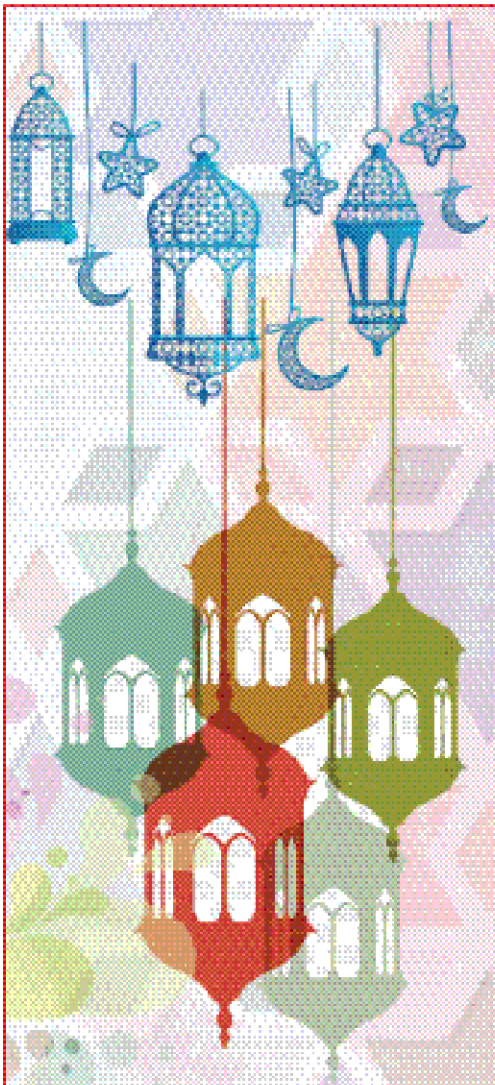

ঈদ মোবারক

সকলকে জানাই
পবিত্র ঈদুল ফিতরের
শুভেচ্ছা



আলহাজ মোহাম্মদ দেওয়ান
এমডি, এম দেওয়ান টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড
উত্তর রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বাছাই পর্বে মোট গোল হয়েছে ২৪১৮টি। এখন পর্যন্ত মোট ২৯টি দেশে চূড়ান্ত রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আরও দুটি দেশ চূড়ান্ত পর্বে যুক্ত হবে। আয়োজক দশ কাতার স্বাগতিক দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই।

এশিয়া অঞ্চল থেকে মোট ৫টি দেশ খেলবে এবারের বিশ্বকাপে। মোট ৪৬টি দেশ বাছাই পর্বের খেলায় অংশগ্রহণ করে। এশিয়া অঞ্চলের মোট ২২৯টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। মোট গোল হয় ৬৭৬টি। চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং সৌদি আরব। এছাড়া আয়োজক দেশ হিসেবে কাতার সরাসরি খেলবে।

এশিয়া অঞ্চল থেকে চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ ইরান এ পর্যন্ত মোট ৬ বার বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। এর আগে তারা খেলেছে ১৯৭৮, ১৯৯৮, ২০০৬, ২০১৪ এবং ২০১৮। দক্ষিণ কোরিয়া এবার নিয়ে মোট ১১ বার বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো। এর আগে তারা খেলেছে ১৯৫৪, ১৯৮৬, ১৯৯০, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৬, ২০১০, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবল। জাপান এবার নিয়ে মোট সাতবার বিশ্বকাপ খেলবে। আর আগে তারা খেলেছে ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৬, ২০১০, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবল। সৌদি আরব এবার নিয়ে মোট ৬ বার বিশ্বকাপ ফুটবল খেলবে। এর আগে তারা খেলেছে ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৬ এবং ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ। কাতার এবারই প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলবে।

ইতিমধ্যে কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র শেষ হয়েছে কয়েকদিন আগেই। বিশ্বকাপের ২২তম আয়োজনে গ্রুপ 'এ'তে রয়েছে কাতার, ইকুয়েডর, সেনেগাল, নেদারল্যান্ড। গ্রুপ 'বি' তে রয়েছে ইংল্যান্ড, ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চতুর্থ আরও একটি দল যুক্ত হবে। গ্রুপ 'সি'তে রয়েছে আর্জেন্টিনা, সৌদিআরব, মেক্সিকো এবং পোল্যান্ড। গ্রুপ 'ডি'তে রয়েছে ফ্রান্স, ডেনমার্ক, তিউনিসিয়া, চতুর্থ আরও একটি দল যুক্ত হবে। গ্রুপ 'ই'তে রয়েছে স্পেন, জার্মান জাপান, ওএফসি কানকাকাফ জয়ী। গ্রুপ 'এফ'তে রয়েছে বেলজিয়াম, কানাডা, মরক্কো, ক্রোয়েশিয়া। গ্রুপ 'জি'তে ব্রাজিল, সার্বিয়া, সুইজারল্যান্ড এবং ক্যামেরুন। গ্রুপ 'এইচ'-এ রয়েছে পর্তুগাল, ঘানা, উরুগুয়ে এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

এশিয়া অঞ্চল থেকে গত বিশ্বকাপে খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, সৌদিআরব এবং দক্ষিণ কোরিয়া। আফ্রিকা অঞ্চল থেকে গত বিশ্বকাপে খেলেছিল মিসর, মরক্কো, নাইজেরিয়া সেনেগাল এবং তিউনিশিয়া। কনক্যাকাফ অঞ্চল থেকে খেলেছিল কোস্টারিকা, মেক্সিকো এবং পানামা। কনমেবল অঞ্চল থেকে খেলেছিল আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়াম পেরু এবং উরুগুয়ে। উয়েফা থেকে খেলেছিল বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আইসল্যান্ড, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রাশিয়া, সার্বিয়া, স্পেন, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড।

গতবারের মতো এবারের বিশ্বকাপেও খেলতে পারছে না কিছু জায়ান্ট দেশ। এ রকম দলগুলোর মধ্যে রয়েছে ইতালি, সুইডেন, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, মিসর, কলম্বিয়া ও চিলি। গতবারের মতো এবারও বিশ্বকাপের আসরে ইতালির না থাকাটা ফুটবলমোদীদের বড় কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারবার বিশ্বকাপ জয়ী এই দলটি বরাবরই বিশ্বকাপ ফুটবলের আলাদা সৌন্দর্য। কিন্তু এবারও তারা চূড়ান্ত পর্বে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। ২৫ মার্চ কোয়ালিফাইং প্লেঅফের সেমিফাইনালে নর্থ ম্যাসিডোনিয়ার কাছে তারা হেরে গেলে বিশ্বকাপের মূল ওঠা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। স্টপেজ টাইমে গোল খেয়ে বসে দলটি। আর এতেই দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ খেলা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে তাদের।

ফিরে দেখা বিশ্বকাপ ফুটবল

বিশ্বকাপের সূচনাটা ছিল সেই ১৯৩০ সালে। মোট ১৩টি দেশের অংশগ্রহণে প্রথম আয়োজনে জয়ী হয়েছিল স্বাগতিক উরুগুয়ে। ফাইনালে ৯৩ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে তারা পরাজিত করেছিল আর্জেন্টিনাকে। এরপর চার বছর বিরতিতে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। প্রথমবারের পর ১৯৩৪ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের আয়োজন করে ইতালি। চ্যাম্পিয়ন হয় স্বাগতিক ইতালিই। দ্বিতীয় আয়োজনে তারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৩৮ সালে আবারো চ্যাম্পিয়ন হয় ইতালি। ফাইনালে তারা পরাজিত করে হাঙ্গেরিকে। সেবার বিশ্বকাপের আয়োজন ছিল ফ্রান্স। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে। ১৯৪২ সালে চতুর্থ বিশ্বকাপের আয়োজন হয় ব্রাজিলে। কিন্তু ফাইনালে হেরে যায় ব্রাজিল। তাদের হৃদয় খান খান করে চ্যাম্পিয়ন হয় উরুগুয়ে। মাঝখানে বিশ্বকাপ বন্ধ থাকে। দীর্ঘ বিরতির পর ৫৪ সালে পঞ্চম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ডে। ফাইনালে হাঙ্গেরিকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় পশ্চিম জার্মানি। ১৯৫৮ সালে বিশ্বকাপের ষষ্ঠ আয়োজনে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিল। এ বছরে বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল সুইডেন। ফাইনালে সুইডেন ও ব্রাজিল মুখোমুখি হয়। ১৯৬২ সালে সপ্তম আয়োজনেও ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হয়। চিলির সান্তিয়াগোতে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত লড়াই-এ ৩-১ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত করে তারা। ১৯৬৬ সালে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে পশ্চিম জার্মানিকে পরাজিত করে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ গ্রহণ করে।

৭০ সালে ব্রাজিল আবারো চ্যাম্পিয়ন হয়। বিশ্বকাপ ফুটবলের এই নবম আয়োজনে মেক্সিকোর মাঠে ব্রাজিল ৪-১ গোলে পরাজিত করে ইতালিকে। ৭৪ সালে বিশ্বকাপের দশম আয়োজনে চ্যাম্পিয়ন হয় পশ্চিম জার্মানি। নিজেদের মাঠ মিউনিখে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে তারা নেদারল্যান্ডকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। ৭৮ সালে বিশ্বকাপের ১১তম আয়োজনে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ গ্রহণ করে আর্জেন্টিনা। এ বছর বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ ছিল আর্জেন্টিনা নিজেই। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে আসে নেদারল্যান্ড। আর্জেন্টিনা নেদারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে কাপ নিজেদের ঘরে রাখার কৃতিত্ব দেখায়।

৮২ সালে বিশ্বকাপের অদম্য লড়াইয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ইতালি। স্পেনে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে তারা জার্মানকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে শিরোপা করায়ত্ত করে। ৮৬ সালে আবারো চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের এই আয়োজন ছিল মেক্সিকোতে। ফাইনালে পশ্চিম জার্মানিকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে ম্যারাডোনার নেতৃত্বাধীন আর্জেন্টিনা। এই বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ৯০-এ অনুষ্ঠিত পরের বিশ্বকাপে ঠিক এর উল্টোটা ঘটে। আবারো ফাইনালে আর্জেন্টিনা এবং জার্মানি মুখোমুখি হয়। জার্মান ১-০ গোলে আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরবঅর্জন করে। ৯৪ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিল। আমেরিকাতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে ট্রাইব্রেকারে পরাজিত হয় ইতালি। পরেরবার ৯৮ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ব্রাজিল আবারও ফাইনালে উঠে স্বাগতিক ফ্রান্সের মুখোমুখি হয়। ফ্রান্স ৩-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে ব্রাজিলকে।

২০০২ সালে বিশ্বকাপের ১৭তম আয়োজনে চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিল। জাপানে অনুষ্ঠিত এই বিশ্বকাপে ব্রাজিল ২-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে জার্মানিকে। ২০০৬ সালে জার্মানে অনুষ্ঠিত ১৮তম বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় ইতালি। ফাইনালে ফ্রান্সকে তারা টাইব্রেকারে পরাজিত করে। এর আগে নির্দিষ্ট সময়ে খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়। ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত ১৯তম বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় স্পেন। আমেরিকাতে অনুষ্ঠিত এই বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডকে ১-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে তারা। ২০১৪ সালে সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফুটবলের ২০তম আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত এই বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানি মেসির আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। ২০১৮ সালে রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় ফ্রান্স। ১৫ জুলাই ক্রোয়েশিয়াকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে ফ্রান্স শিরোপা লাভ করে।

ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বকাপের সুবাস

সেই জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফি ঘুরছে কয়েকটি দেশের মধ্যেই। বিশ্বকাপ ফুটবলের শিরোপা এ পর্যন্ত জয় করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে মোট আটটি দেশ। দেশগুলো হলো- ব্রাজিল, জার্মানি, ইতালি, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও স্পেন। এর মধ্যে ইতালি গত বিশ্বকাপের মতো এবারও দুঃখজনকভাবে চূড়ান্ত পর্বে উঠে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত যারা বিশ্বকাপ শিরোপা জয় করেছে এর বাইরে এবারও অন্য কাউকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ভাবার কোনো অবকাশ নেই।

এবারের বিশ্বকাপে কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হবে তা নিয়ে এখনই শুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা। পুরনো আর বর্তমান সময়কে বিশ্লেষণ করে অনেকেই অনেক ধরনের আগাম অনুমান দিচ্ছেন। তবে এবার সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নের তালিকার শীর্ষে রয়েছে ব্রাজিল, গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, আর্জেন্টিনা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন নতুন কোনো চমক না থাকলে বিশ্বকাপের দাবিদার উল্লিখিত দেশগুলোই। এই দেশগুলোর কারও না কারও ঘরেই যাবে বিশ্বকাপের ট্রফি। হট ফেবারিট হিসেবে এবারও বেশি ভাবা হচ্ছে ব্রাজিলকে। অভিজ্ঞ, উঠতি আর প্রতিভাবান ফুটবলারদের চমৎকার সম্মিলন রয়েছে এ দলে। গতবার বেলজিয়ামের কাছে কোয়ার্টার


ঈদ মোবারক
সকলকে জানাই
পবিত্র ঈদুল
ফিতরের
শুভেচ্ছা
মোঃ জামাল উদ্দীন
উপজেলা প্রকৌশলী
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ফাইনালে তারা হেরে গিয়েছিল। এবারের বাছাই পর্বে চমৎকার খেলেছে ব্রাজিল। ফিফা র‍্যাংকিং-এ ব্রাজিল এখন শীর্ষে। এ কারণেই সবার কাছেই তারা সব হিসাবনিকাশে অগ্রগণ্য হয়ে আছে। ব্রাজিল এবারও শক্তিশালী দল। ফুটবলের সৌন্দর্যের আধার বলে খ্যাত এই দলটিতেও রয়েছেন একাধিক রূপময় ফুটবলার। যাদের ফুটবলশৈলী মনোমুগ্ধকর এবং

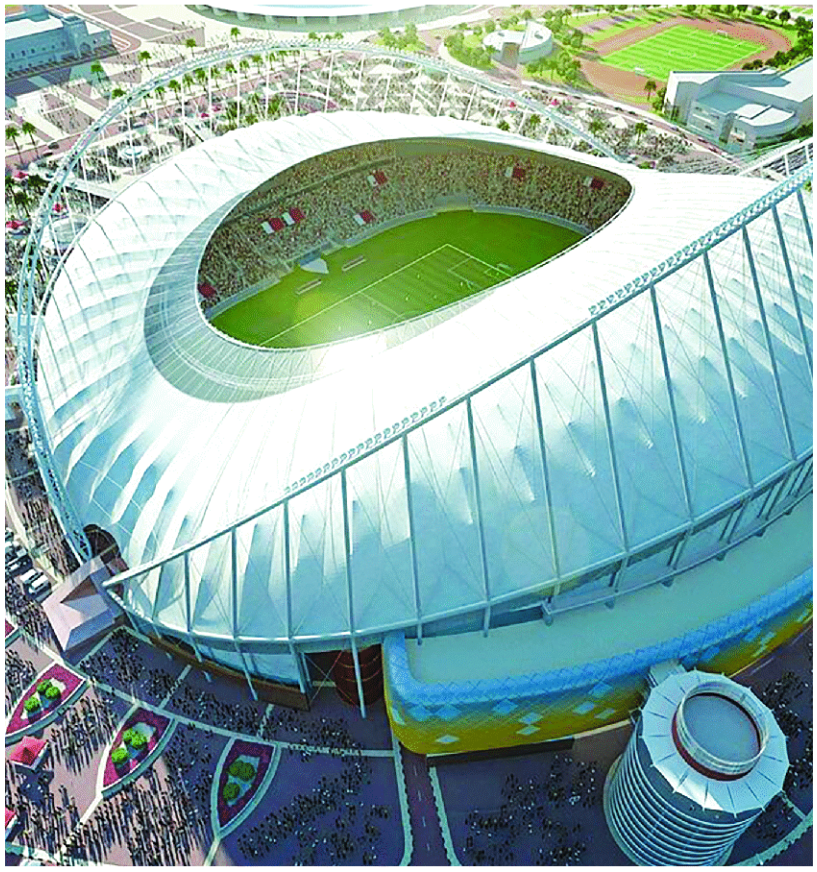

চিত্তাকর্ষক। গ্রুপে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ সার্বিয়া, সুইজারল্যান্ড এবং ক্যামেরুন।

সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নের তালিকাতে এবারও রয়েছে চারবারের বিশ্বকাপ জয়ী জার্মান। জার্মান দল খুবই শক্তিশালী এবং গোছানো। এ দলের প্রায় সবাইই ইউরোপের বড় বড় ক্লাবে খেলে থাকেন। 'পাওয়ার হাউস' খ্যাত জার্মান দলে যেমন বিশ্ব তারকারা রয়েছে তেমনি প্রতিভাবনরাও রয়েছে। শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার অদম্য ক্ষমতা রয়েছে এই দলটির। ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জয়ী স্পেন এবারও শক্তিশালী দল। এই উপমাহাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ফুটবল দল আর্জেন্টিনা এবার খুব একটি শক্তিশালী দল নয়। মেসিকে নিয়ে তারুণ্যনির্ভর দলটি। তবে গত এক বছরে তাদের পারফরমেন্স আশাপ্রদ। আর্জেন্টিনা অনেকটাই মেসিনির্ভর এটি সত্য। তবে কিছু তরুণ ফুটবলার বেশ আলো ছড়াচ্ছেন। দলের স্ট্রাইকার লিওনেল মেসিকে মূল ত্রাণকর্তা ধরেই এগুচ্ছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার চূড়ান্ত দলে এবার নতুন প্রতিভাবানদের বেশি দেখা যাবে। মেসি ও ডি মারিয়া ছাড়া পুরনোরা আর কেউ নেই। আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগের সেই পুরনো সমস্যা রয়েই গেছে। এখানে দুর্বলতা আজীবন। গ্রুপ 'সি' আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ সৌদিআরব, মেক্সিকো, পোল্যান্ড। গ্রুপ পর্ব পেরুনো খুব একটা কঠিন হবেনা। গত বারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স গ্রুপ ডিতে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে ডেনমার্ক, তিউনিসিয়া। আরও একটি দল যুক্ত হবে।

গোল্ডেন বুটের লড়াই-এ যারা এগিয়ে থাকবে

বিশ্বকাপ ফুটবলে একটি চমকপ্রদ বিষয় গোল্ডেন বুট। যে সব প্লেয়ার অপূর্ব ফুটবলশৈলী দিয়ে প্রতিপক্ষের জালে বল জড়ান, দ্রুতই তিনি সবার কাছে নন্দিত হয়ে ওঠেন। বিশ্বকাপ ফুটবলে বর্ণময় আসরে যে বেশি গোল করেন তিনি পান গোল্ডেন বুট পুরস্কার। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত গোল্ডেন বুটের কোনো প্রচলন ছিল না। ৮২ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রচলন করা হয়। গোল্ডেন বুট প্রথম জয় করেন ইতালির পাওলো রসি।

গত বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের হ্যারি কেইন। ২০১৪ সালে জার্মান চ্যাম্পিয়ন হলেও গোল্ডেন বলটি দখলে চলে গিয়েছিল কলম্বিয়ার উদীয়মান স্ট্রাইকার হামেস রদ্রিগেজের দখলে। ৬টি গোল করে শীর্ষে ছিলেন তিনি। সেবার বিশ্বকাপে অনেকটাই বিস্ময়কর খেলা উপহার দিয়েছিলেন তিনি। প্রতিটি ম্যাচেই তিনি গোল পেয়েছিলেন। গ্রুপ পর্যায়ের প্রথম খেলায় গ্রিসকে ৩-০ গোলে পরাজিত করেছিল কলম্বিয়া। শেষ গোলটি ছিল রদ্রিগেজের। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে আইভরি কোস্টের সাথে প্রথমেই দুর্দান্ত এক গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এ ম্যাচে কলম্বিয়া জিতেছিল ২-১ গোলে। গ্রুপ ম্যাচের শেষ খেলায় জাপানকে ৪-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছিল কলম্বিয়া। হামেস রদ্রিগেজ একটি গোল করেছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে রদ্রিগেজ একাই উড়িয়ে দিয়েছিল উরুগুয়েকে। তার অসাধারণ দুই গোলে জিতেছিল কলম্বিয়া। কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেলেও রদ্রিগেজ ঠিকই জয়ী হয়েছিলেন। তার পা থেকে একটি গোল স্পর্শ করেছিল ব্রাজিলের জাল। গত বিশ্বকাপে ৫ গোল করে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন জার্মানের থমাস মুলার। আর চার গোল করে তৃতীয় অবস্থানে ছিলেন লিওনেল মেসি। ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন জার্মানের থমাস মুলার।

২০০৬ সালে পেয়েছিলেন জার্মানের মিরোস্লাব ক্লোসা। ২০০২ সালে আট গোল করে গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন ব্রাজিলের রোনালদো। ৯৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপ জিতলেও গোল্ডেন বুট পেয়েছিল ক্রোয়েশিয়ার সুকার। ৯৪ সালে গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন বুলগেরিয়ার স্টইচকভ এবং রাশিয়ার সালেঙ্কো যৌথভাবে। ৯০ সালে গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন ইতালির শিলাচ্চি। ৮৬ সালে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হলেও গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের গ্যারি লিনেকার। এবার কে পাবেন গোল্ডেন বুট? বিশেষজ্ঞদের মতে এ লড়াইয়ে এগিয়ে থাকবেন ব্রাজিলের নেইমার, আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি, পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ান রোনালদো, বেলজিয়ামের রোমেমু লুকাকুসহ আরও কেউ কেউ। তবে এমনও হতে পারে নতুন কেউ এসেও চমকে দিতে পারেন সবাইকে।

কার ঘরে যাবে বিশ্বকাপের ট্রফি

বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফি এবার কার ঘরে যাবে এ নিয়ে এখনও চুলচেরা বিশ্লেষণের সময় আসেনি। দল ঘোষিত হওয়ার পর বোঝা যাবে। তবে সবাইই বিবেচনায় রাখছে ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনাকেই। তবে এ কথা সত্য এবার হট ফেভারিট ব্রাজিল। ব্রাজিল গত বারের দুঃখ এবার ঘুচাতে সক্ষম হবে বলে অনেকেই মনে করেন। অনেক বিশ্লেষকের মতে, আর্জেন্টিনাও ফেলে দেবার নয়। মেসি হয়তো জীবনের শেষ সাফল্যটা এবার পেলেও পেতে পারেন। এই তিন দলের বাইরে আলোচনায় আছে ফ্রান্স, স্পেন। এদের বাইরে আর তেমন কেউ আলোচনায় নেই। তবে মধ্যম সারির অনেক দলই আছে যারা এবার বড় দলগুলোর পথের কাঁটা হয়ে থাকবে। তবে শেষ হাসি কে হাসবে এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে শেষদিন পর্যন্ত।

জাহিদ রহমান

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা ■ জয় বঙ্গবন্ধু



ঈদ মোবারক

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী
এবং
রূপগঞ্জ ইউনিয়নের সকলকে জানাই
প্রাণঢালা শুভেচ্ছা
ও অভিনন্দন



মোঃ সালাউদ্দিন ভূঁইয়া

চেয়ারম্যান, রূপগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

বরুড়া পৌরসভা কার্যালয়
বরুড়া, কুমিল্লা



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ফোন : ০৮০২৭৫২০৬৮ (অফিস) E-mail: 01711-185053 mayorbarura@gmail.com



ঈদ মোবারক

সকলকে জানাই
পবিত্র ঈদুল ফিতরের
শুভেচ্ছা

১। সময়মত পৌরকর ও পানির বিল পরিশোধ করে পৌর উন্নয়নে সহায়তা করুন।

২। আপনার শিশুকে নিয়মিত বিদ্যালয় /মাদ্রাসায় পাঠান।

৩। গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান।

৪। নির্দিষ্টস্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলুন এবং আপনার শহর পরিষ্কার রাখুন।

৫। ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের পূর্বে পৌরসভার অনুমোদন গ্রহণ করুন।

৬। শিশু জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে পৌরসভায় জন্ম নিবন্ধন করুন এবং মৃত্যু নিবন্ধন করুন।



মোঃ বক্তার হোসেন

মেয়র, বরুড়া পৌরসভা
ও সাধারণ সম্পাদক বরুড়া পৌরসভা
আওয়ামী লীগ, বরুড়া, কুমিল্লা।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

- জয় বাংলা
- জয় বঙ্গবন্ধু



- পানির অপচয় বন্ধ করুন।
- সময়মতো পৌরকর ও পানির বিল পরিশোধ করুন।
- আপনার বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীকে ঈদুল ফিতরের

শুভেচ্ছা

ঈদ মোবারক



মো. মোখলেসুর রহমান

মেয়র
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা
ও
চেয়ারম্যান, গ্রামীণ ট্রাভেলস

জামাটা

গোলাম কিবরিয়া পিনু

যে জামাটা রোদ ও তাপ থেকে
বাঁচিয়ে রাখল
সম্ভ্রমও দিল,
সেই জামাটা পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গেল!
তাকে আর আলমারি, ওয়ারড্রবও আলনায়
রাখতে পারিনি!
কিছু কিছু জামার কথাও
বেশ মনে পড়ে যায়--মাঝে মাঝে,
সে-সবজামার কতকটা ছিল আরামদায়ক,
রং ও রুচিতে অনন্য,
কোথা থেকে--কোন মার্কেট থেকে কিনেছিলাম,
তাও মনে পড়ে যায়!
জাদুকরের জামাও পরিনি,
দৌড়বাজির জামাও!
শান্তিপুরে তৈরি উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়ের
জামাও পরতে পারিনি!
এমন কোনো জামা পরে নাচদুয়ারে উপস্থিত হইনি
নাচনেওয়ালা স্বাগত জানাবে!
তবে, জামার জন্য বেশি মাত্রায় কখনো কাঙাল হইনি
জানি, কাঙাল হলে কঙ্কাল হয়ে যেতে পারি,
তখন আর বোধ ও প্রতিবোধ কিছুই থাকবে না!
জামা ছাড়া তো ভদ্রসমাজে বের হওয়া যায় না,
আমি এখন নতুন একটা জামা কিনতে যাচ্ছি!
আমার মনের মতো,
অন্তত বোধ থাকতে থাকতে!

মুজিবমানে বাংলাদেশ

শাহরিয়ার সোহেল

মুজিবমানে প্রিয় স্বদেশ
মুজিবমানে বাংলাদেশ
মুজিবমানে সূর্যোদয়
বিশ্ব মাঝে চির উদয়
শস্য-শ্যামলা শস্যের মাঝে
মুজিবের মুখ হাসে
বাংলাদেশের প্রান্তরজুড়ে
মুজিবের প্রাণ ভাসে
আমরা সবাই মুজিবসেনা
শত্রুকে নেই ভয়
আমাদের আছে বঙ্গবন্ধু
আমাদের নেই ক্ষয়

শূন্য

শাকিলা নাছরিন পাপিয়া

মানুষ পড়তে গিয়ে আমি অমানুষ দেখেছি
আলো জ্বালাতে গিয়ে আগুনে পুড়েছি।
স্বপ্ন দেখতে গিয়ে কেঁপেছি দুঃস্বপ্নে
ভালোবাসতে গিয়ে ডুবেছি ঘৃণার সমুদ্রে।
পূর্ণতার পিছু ছুটতে গিয়ে
শূন্যতাকে পেয়েছি আপন করে।
জীবনকে ধরতে গিয়ে অবিরত
মৃত্যুকেই আলিঙ্গনে করেছি স্বজন।
অন্তবিহীন পথ শেষে অবশেষে
ভুল আর শূন্য নিয়েছি দুহাত ভরে।

প্রকৃতই জীবন জ্যামিতিক

রওশন রুবী

ধানের পাপড়ির মতো কবিতায় নেমে এলেই
আমি ছুঁতে পারি তোমাকে, তুমি শুধু অস্তিত্বহীন
নোঙ্গরে শীতল ভূমি উষ্ণ হাওয়া ছুঁয়ে চলে যাও।
ঘড়ি সবসময়ের দাস, মানুষ দ্বিধার খোঁয়াড়,
আমি ছুঁই দূরদৃষ্টির তরু-শাখা, তোমাতে আচ্ছন্ন আবেগ।
তুমি প্রত্যুষে নেমে এলে আমি গেয়ে যাই ধর্মসংগীত
নবজন্মের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, শোকাহতও উষ্ণ হয়ে ওঠে।
দায়ভারে ন্যুব্জ বালখিল্য রাখে না সাহস
সোনালি দিনের দস্তানায়, জবুথবু আরামের
কাঁধে চেপে সুষুপ্ত বোধের শাসক। আমি কার কাছে যাই?
কে জানাবে ভবিতব্য? কোন আকাশে আঁকি চেতনার বীণা?

পবিত্র বাতাসে কেবল নিশ্চল অদ্ভুতগিরি,
শোষকের খরতাপে দেউড়ি পেরুনো তেজস্ক্রিয় আলো
আজ সিন্ধুর উদর থেকে বন্দরে, বন্দর থেকে বৃক্ষে,
বৃক্ষ থেকে ইতিহাসে অবিচল, অমৃতের সম্ভার যে মুখে,
তাতে ছড়িয়ে বিষাদের ছাই অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে
খুঁজি বিপ্লবী প্রাণ।

এখানেই আমার স্পর্শ পুড়ে যায়, পুড়ে যাক
সেই নরম ছাই মেখে বিপ্লবী ফের বিপ্লবী কর।
জেনেছি আমি, প্রকৃতই জীবন জ্যামিতিক।





MIA হালাল
HALAL FOOD
BEST QUALITY FOOD



Monday - Saturday 11am - 5am

105-07 Cross bay Blvd.
bet. Liberty & 107 Ave, Ozone Park, NY 11417

CALL FOR PICKUP (718) 374-3902

ভালোবাসার টান

গোলাম সরোয়ার

চুপ থাকা মানে
ভুলে যাওয়া নয়।
তোমাকে ঘিরে নির্জনে নতুন করে স্বপ্ন বোনা।
কথা না বললে,
প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না,
আরো গভীরভাবে
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।
তোমায় ছাড়া একাকী জীবন, ভীষণ্নতায় ভরা।
কেটে যায় দিন রাত তোমারই অবহেলায়।
রঙিন প্রভাত হোক আর গোধূলি বিকাল
প্রতিটাক্ষণে তোমার বিচরণ
এই হৃদয়ে বাড়িয়ে দেয় ভার
আমি যে তোমার নিষিদ্ধ করা হৃদয়ের দাবিদার।
যেই হৃদয়ে আমার প্রতি একটুও ভালোবাসা আর ভালো লাগা নেই
যেই হৃদয়ের প্রতি টান আমার জন্ম জন্মান্তের।
যাকে দেখা হয়নি চক্ষু মেলিয়া, তার জন্য এত উদগ্রীব
এত ব্যাকুলতা
অদৃশ্য মানব তোমার অপেক্ষায় প্রহর গোনা।
দেখা দিও কোনো এক অচেনা সকালে, না হয় গোধূলি লগ্নে আসিয়া
তোমার তরে সাজানো আছে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা
অদৃশ্য মানব, শুনতে কি পাও এই হৃদয়ের স্পন্দন, এই হৃদয়ের আহ্বান?
তোমার প্রতি রইল আমার ভালোবাসার টান।

ভিতরে বাহিরে

শাশ্বত হাসান

আমি প্রতিদিন ফসল বুনি
ধান কাউনের।
কিন্তু কোনো ফসল হয় না
মরার ভূমিতে।
প্রিয়তমা, আমি যাই শূন্যের দিকে
রৌদ্রের খান যদি আসে
অন্তরে বাহিরে।
শুধু বলিদান আজ ভিতরে বাহিরে।

নত

মধুমিতা বিশ্বাস

নির্জন পাহাড়ি পথ
আঁকাবাঁকা রেখার বাঁকটানে
পথে পথ হারিয়ে যখন আমি অনাথ হয়ে গেলাম।

পাশেই বয়সের ভারে
নুয়ে পড়া বটের, আত্মার নিঃশ্বাস
আমাকে ভারী করে তুললো।

গাছের খোদলের
চিটচিটে ছোপ অঙ্ক কোষে ভাবতে থাকি
আমার বয়স কত?
কতটা পথ আমি হারিয়েছি।

এ প্রশ্নে তখন
গাছের বুকে ফালা ফালা অংশের কোটরে দেখি
ঘন অন্ধকারে রূঢ়তার খোলসে মোরা
সাপের নত হওয়া মাথা!
বিনা উষ্ণতায়, অকাল ডিমে তা দিচ্ছে।

আমি বটের নত হওয়া জীবন দেখি
দেখি, বিনা উষ্ণতায় তা দেওয়া, সাপের নত হওয়া মাথা।

এই নত হওয়া জীবনটাকেই
আমি আমার বাবা-মায়ের
জীবন হিসেবেই দেখেছি।


আল্লাহ সর্বশক্তিমান
ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক
কালীগঞ্জ পৌরসভার সর্বস্তরের
জনগনকে জানাই
পবিত্র ঈদুল ফিতরের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
ঈদ মোবারক
এস.এম রবীন হোসেন
মেয়র, কালীগঞ্জ পৌরসভা, গাজীপুর
সভাপতি, কালীগঞ্জ পৌর আওয়ামীলীগ
সৌজন্যেঃ মোঃ আল-আমিন



উপন্যাস

হে প্রেম হে অশ্রুশিখা

মাসুদুজ্জামান

মধ্যরাত। ফ্রানৎস কাফকা ঘুমিয়ে পড়েছেন। একটু একটু করে তার শেষ দিনটির শেষ মুহূর্তগুলি পেরিয়ে যাচ্ছে। ডোরা ডায়মন্ট বসে আছেন পাশেই। ডোরা, কাফকার প্রেমিকা। চোখ তার কাফকার শরীরের ওপর। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কোনো পরিবর্তন ঘটছে কিনা, লক্ষ করছেন সেটাই। টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প, তার শরীর ছুঁয়ে একটা গাঢ় দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া এসে পড়েছে পাশের দীর্ঘ দেওয়ালে। ব্যালকনির দরোজাটা খোলা। বাইরের শান্ত স্নিগ্ধ বাতাস, কাফকার ফুসফুসকে সজীব রাখার জন্য যা খুবই জরুরি, সেটা যাতে ঘরের ভেতরে ঢুকতে পারে সেজন্যই খোলা রাখা হয়েছে দরোজাটা। ডোরা নিঃশব্দে নীরবে দেখছেন কাফকার বুকের ধীর প্রলম্বিত ওঠানামা আর খেয়াল করছেন ওর চেহারাটা। কী তীক্ষ্ণ দীর্ঘ হাড় বের-করা নাক, উঁচু কণ্ঠা, চোখের গভীরে ঢুকে যাওয়া চোখের মণি। এখন আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায়, ডোরার মনে হচ্ছে,



কাফকাকে দেখতে একজন আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানের মতো লাগছে। ডোরার মনে পড়ে গেল তাকে দেখার প্রথম দিনগুলির কথা।

কাফকা আর আগের মতো নেই, সেরকম সুদর্শন। তার মুখের হাড়গুলি এখন অনেকটাই দৃশ্যমান। প্রদীপ্ত ধূসর চোখ দুটি ঢুকে গেছে কোটরে। গত কয়েক দিনে দ্রুত তার বয়স বেড়ে গেছে কয়েক মাস। এখনকার দিনগুলি ছাড়া উজ্জ্বল বালকোচিতই ছিল তার চেহারা। ডোরার সঙ্গে যখন তার প্রথম দেখা হয়, কাফকা তখন তরুণ সুদর্শন এক যুবক। কতই-বা বয়স হবেতার? সবে চল্লিশ। তার ঠিক একমাস পরেই ছিল তার একচল্লিশতম জন্মদিন।

ডোরার বিশ্বাস তিনি কাফকাকে ভালো করে তুলতে পারবেন। পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কত কিছুই তো ঘটে। যক্ষ্মার অসুখটা কাফকার গলার মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। একচুমুক পানি বা এক লোকমা খাবার খাওয়াও তার জন্য অসম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রতিবার খাবারের মুহূর্তে, তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও বার বার বেঁচে থাকার আর্তিটুকু ঠিকই বোঝা যায়। কাফকা বাঁচতে চান। ভিয়েনা থেকে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এসেছিলেন কদিন আগে। বলছিলেন তার গলা অনেকটাই ভালো হয়ে উঠছে। কথাটা শুনে কাফকা কেঁদে ফেলেন আর ডোরাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান। ভীষণ উৎফুল্ল কাফকা বার বার ডোরাকে বললো, 'জান, আমি কখনই এভাবে বেঁচে থাকার তীব্রতা অনুভব করিনি, স্বাস্থ্যের কথাও তেমন একটা ভাবিনি।' ডাক্তার বেক বা অন্য ডাক্তাররা কী বলেছেন জানি না। ডোরা ভাবলেন, কাফকা যদি আরেকটু বেশি খাবার খেতে পারেন, তাহলে ভালো হয়ে উঠবেন।

কাফকার জন্য ঘুম এখন আশীর্বাদের মতো। তার রাতগুলি নির্ঘুম কাটে। রাতজাগা মুহূর্তগুলি ঠেলে দেয় এমন দিনের দিকে যখন তাকে একটু ভালো থাকার জন্য যতটুকু জীবনীশক্তি আছে, জমিয়ে রাখতে হয়। ডোরা অবশ্য একটা বুদ্ধি বের করেছে। রাতের খাবারের সঙ্গে সে কিছুটা বিয়ার আর ওয়াইন দিয়ে দেয়। কাফকা জানেন না, তার খাবারে ঘুমের পাউডার মিশিয়ে দিয়েই তাকে ঘুম পাড়ায়। এই ওষুধটা বেশ কাজ করছে। গত কয়েকটা রাত শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন তিনি। সকালের দিকে ঘুম থেকে ওঠার পর তাকে বেশ ফ্রেশ লাগছে। ভালো অনুভবকরছেন। দিনগুলিও যে খারাপ কাটছে তা নয়। তিনি তার সর্বশেষ গল্পের বই, 'কোনো এক ক্ষুধার্ত শিল্পী'র প্রুফ দেখছেন। প্রুফগুলি প্রকাশকই পাঠিয়েছেন।

'অনেক দিন অপেক্ষা করে তারা এগুলি পাঠিয়েছে। আমার কী এসবগল্প রচনার শক্তি ছিল?' ঝুঁকে পড়ে প্রুফ দেখতে দেখতে ডোরাকে বলতে থাকেন কাফকা। তার গল্পটার আয়রনি হলো, একজন শিল্পী



ওমর খালেদ রুমি'র গ্রন্থ
বন্দুক ও জেনারেলগণ

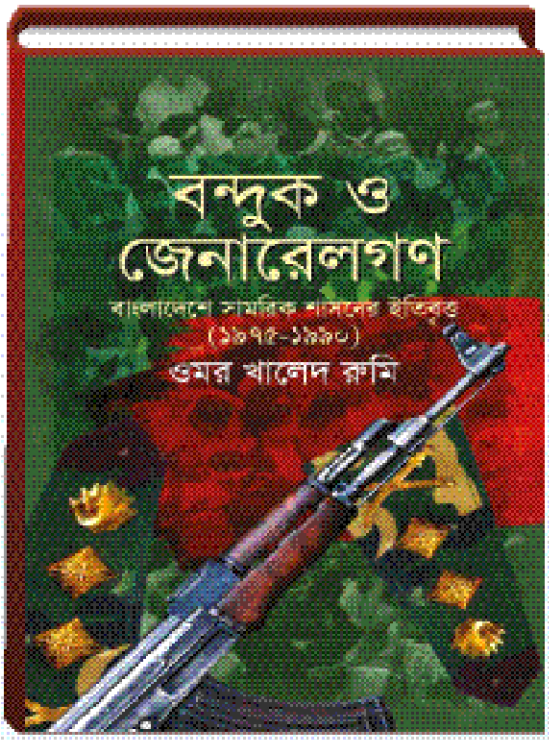

আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতার মাত্র ৩ বছর ৮ মাসের মাথায় আমরা স্ব-পরিবারে জাতির জনককে হারিয়েছি। বঙ্গবন্ধুর লাশের উপর দিয়েই তার অধিনস্তরা পরবর্তী মোস্তাক সরকারে যোগ দেয়। ৩রা নভেম্বর জাতীয় ৪ চার নেতা নিহত হলে সত্য ও ন্যায় -এর পক্ষে দাঁড়ানোর, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার শেষ ভরসাটুকু শেষ হয়ে যায়। এরপর একে একে আগমন ঘটে নানা ধরনের সার্কাসের জোকারের। এই তালিকায় প্রথম নামটি ছিলো খন্দকার মোস্তাকের। এরপর একে একে জিয়া এবং এরশাদের আগমন ঘটেছিলো। রাজনীতি এইভাবেই মাথার পরিবর্তে বন্দুকের নলের মাধ্যমে পরিচালিত হতে শুরু করে ছিলো।

রোদেলা প্রকাশনী

রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

একটা শিল্পরীতি হন্যে হয়ে খুঁজছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না। এদিকে তার খোঁজারও শেষ নেই।
কাফকার মাথাটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ডোরা তার কপালে আলতো করে একটা ঠোনা দিলেন। আদর, তোমাকে অনেক আদর, সোনা। দুর্বলতম আচ্ছন্ন সেই মুহূর্তে কীভাবেএকসঙ্গে মরবেন, সহমরণের সেই যৌথ-ছকটাও কেটে ফেললেন কাফকা ও ডোরা। প্রতিজ্ঞা করলেন, কাফকা যখন মারা যাবেন ডোরাও তখনই মরবেন। এটা একধরনের ব্লাকমেইল। ডোরা জানে। কিন্তু আবেগের এই ব্ল্যাকমেইলটুকু করতে পারায় ডোরার মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলো। ডোরার আসলেই তখন মরিয়া অবস্থা। যা কিছু করা সম্ভব, যা-যা বলা যায়, কাফকার জন্যে নিজের ভেতরে জমিয়ে রাখা সবঅস্ত্র ব্যবহার করছেন। ধীরে ধীরে ৩রা জুনের দিনটি পেরিয়ে যাচ্ছে, ডোরাও ইতিবাচক ভাবনায় ডুবে যাচ্ছেন। মনে পড়লো, সেই যৌথস্বপ্নের কথা, দুজনেই প্যালেস্টাইন চলে যাবেন, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি একসঙ্গে কাটাবেন। খুব বেশি দিন হয়নি, মাত্র এগারো মাস আগে দু'জনেই যৌথভাবেস্বপ্নের চাষাবাস শুরু করেছিলেন।

২

বাল্টিক সাগর তীরের অবকাশ কেন্দ্র হাউস হাউটেন। ডোরা ডায়মন্ট এই রিসর্টের কিচেনে কাজ করছেন। মাছ কোটার পর সেগুলি পানিতে ধুচ্ছেন। খোলা দরোজা আর বেসিনের কাছের ছোট্ট জানালা দিয়ে আলো এসে ঢুকেছে ঘরে। বাইরের মেঘ সরে গেছে এবং অপরাহ্নের সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত সোনালি আলোয় ছোট্ট কিচেনটা ঝলমল করছে। কাজ করতে করতে ডোরার মনে পড়ে গেল সেই লম্বা কালো মানুষটির কথা। লোকটা সমুদ্রের বেলাভূমিতে দুটো বাচ্চার সঙ্গে খেলছিল। লোকটার ছবিকিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না ডোরা। ভুলতে পারছে না তাকে।
ডোরা এবার পঁচিশে পা দিয়েছে। বাড়ি পোলান্ডের বেদজিনে। এখনো বিয়ে হয়নি। অনেক দিন ধরেই সে কাজের বুয়া হিসেবেকাজ করছে। জার্মানিতে, বিশেষ করে বার্লিনে, যেখানে তিনি গত তিন বছর ধরে বাস করছেন। নারীদের সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটাই অন্য রকম। জার্মানরা মনে করে 'কিশোরীসুলভ, উত্তম আচরণ বিশিষ্ট কুমারী' মেয়ে নয়, নারীকে হতে হবেস্বাধীন, চোখ-কান খোলা, আত্মনির্ভরশীল। এই নারী নিজের কেরিয়ার গড়ে নেবেএবং আয়-উপার্জনও করবে। ডোরার অবশ্য কোনো সমস্যা নেই। বয়সের তুলনায় ডোরার বয়স কমই দেখায়। বেশিরভাগ মানুষেরই মনে হবেতার বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। কেউ জিজ্ঞেস না করলে বয়সটা বলার প্রয়োজনও হয় না। কেনই-বা বলবে? পশ্চিমী দুনিয়ায় নতুন জীবন শুরু করার এটাই একটা সুবিধা। নিজেকে সে আবার গড়ে নিতে পারবেআর যা চাইবেতাই সে করতে পারবে।
ডোরা দেখতে সুন্দরী নয়। লোকে যদিও বলে সে সুন্দরী। ডোরা ততটা লম্বাও নয়। উচ্চতা মাত্র ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। ওজন বাড়তির দিকে, কিন্তু তার পা আর হাঁটু সরু, মসৃণ। দেখতেও সুশ্রী, আকর্ষণীয়। কিন্তু গোলপানা মুখ, ঠোঁট পুরু, মুখের হা-টাও অনেক বড়। ধ্রুপদী সৌন্দর্যের একেবারেই অনুপযোগী। যখন সে একটু মুখ খুলে জোরে হাসে, উপরের ঠোঁটের মাংস দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। হাসি দিয়েই সে অবশ্য ওই ত্রুটিটা ঠোঁট চেপে ঢেকে রাখতে চায়, বিশেষ করে যখন ছবি তোলার সময় হয়। ব্যাপারটা কিন্তু রহস্যময়ই লাগে, চেহারাটা হয়ে ওঠে অনেকটা মোনালিসার মতো। মোনালিসাকেই তার পছন্দ। ডোরার চোখ দুটি ঘন কালো এবং তার হালকা ধূসর রঙের চুল ছোট ছোট করে কাটা। বার্লিনে এই ববকাটাটাই এখন দ্রোহ আর জনপ্রিয়তার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ডোরার চুল তবু অনেকটাই ঘন আর ভারি। এই চুলের জন্যই তার মুখশ্রীটা ক্ষীণ লাগে না। বিশেষ করে যখন কাজ করে তখন অবাধ্য চুলগুলি তার চোখ ঢেকে দেয়। মাঝেমধ্যে নিজের চুলগুলিকে তাই হাত দিয়ে পেছনে ঠেলে দিতে হয়।
খুবভালো করে চেপে ধরে ছুরি দিয়ে ডোরা মাছের শরীর থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। আজ শুক্রবার রাতে একটা স্পেশাল ডিনার আছে। এই ডিনারটাকে বলে অনেগ শাবাত নৈশভোজ। দুপুরেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আজ একজন বিশিষ্ট অতিথি আসছেন। সেই বিশিষ্ট অতিথি হচ্ছেন প্রাহার ডক্টর কাফকা। হলিডে ক্যাম্পের রাত্রিকালীন সাবাথ ডিনারে যোগ দেবেন তিনি। অন্যান্য যেসবস্বেচ্ছাসেবী তাদেরই একজন ষোল বছরের তাইল রোজলার তাকে এই ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। দুই দিন আগে ডক্টর কাফকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আর তখনই সে কাফকার ভীষণ অনুরাগী হয়ে ওঠে। ডোরার মতো তাইলও একজন ভলিনটিয়ার যে বার্লিনের ইহুদিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রিফিউজি ক্যাম্পে ইহুদি শিশুদের জন্য কাজ করে।
ডোরার দায়িত্ব হচ্ছে কিচেনের। রিফিউজি ক্যাম্পটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহাযুদ্ধের সময়। পূর্ব ইউরোপীয় শরণার্থীদের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য যাতে রক্ষা পায় সেইজন্য বার্লিনের ইহুদিরা পোলান্ড ও রাশিয়ার গ্যালিসিয়া ও সাইলেসিয়ার গ্রাম আর শহরগুলি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া শিশুদের রান্নাবান্নার কাজে নিযুক্ত করেছে। যুদ্ধের দ্বারা গৃহচ্যুত এইসবশিশু দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে বাঁচার জন্য বার্লিনের জনবহুল শিউনেনভিয়েরতেলের ইহুদি বস্তিতে নতুন করে জীবন শুরু করে। বার্লিনে পৌঁছানোর পর, ইহুদি পিপলস হোমের লোকেরা ডোরাকে এমন একটা পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে যাতে তার মনে হয় সে নিজের পরিবারেই আছে। চারপাশে যারা বাস করছে তারাও যেন তার নিজের সম্প্রদায়েরই মানুষ। এরা আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের মতো তাদেরও অনেক কাজে যুক্ত করছে। দলের সভা করা, স্বশাসিত যুবসম্প্রদায় গঠন, হিব্রু আর মন মাতানো নাচের ক্লাস, পাহাড়ে চড়া, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা, ইহুদি কিংবদন্তি ও ধ্রুপদী গল্প বলা ইত্যাদি নানা কাজের সঙ্গে ডোরা এখন যুক্ত। হলিডে ক্যাম্পটা বার্চ গাছের দ্বারা পরিবেষ্টিত মুরিৎজ গ্রামের পুবপ্রান্তের দোতলা ভবন হাউস হাউটেনে অবস্থিত। জায়গাটা নিঃসন্দেহে ওই শিশু আর ডোরার মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার একটা আদর্শ স্থান। রাষ্ট্রহীন দুর্গত মানুষদের বসবাসের জন্য এর চেয়ে ভালো স্বাস্থ্যপ্রদ জায়গা আর হতে পারে না।
একজন পোলিশ ইহুদি উদ্বাস্তু হিসেবে বার্লিনে পৌঁছবার কিছুদিন পর অনেক কিছুই শিখতে হয় ডোরাকে। ইহুদিদের সংগঠন জিউস পিপলস হোমই তাকে ভলিনটিয়ার হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক হওয়ার জন্য যে প্রশিক্ষণটা জরুরি, সেই ফ্রবলেরিন ট্রেনিংটাও তাকে নিতে হয়েছে। উদ্বাস্তু শিশুদের পুনর্বাসনের জন্যই ছিল প্রশিক্ষণের এতসবআয়োজন। ডোরাও তো এসেছে সেই পুব থেকে। তার এটাও জানা হয়ে গেছে, ইহুদিদের কতটা ঘৃণা করা হতো। পদে পদে শুধু বাধা আর বাধা। তার বিশ্বাস একদিন ইহুদিরা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডেই হয়তো নিজেদের সেই প্রতিশ্রুত ভূমি বা একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।
দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডোরা নিজেকেই দেখে আর নিজেকেই শোনায়, 'গ্যালিলির ভূখণ্ডেই আছি আমি'। পাশাপাশি কাজ করছি সেই সবনারী-পুরুষের সঙ্গে যারা আমারই মতো দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, এসেছে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে। নিষ্ফলা আর নিচু জমিতে তারা বাগান করছে আর ভবিষ্যতের শিশুদের জন্য গড়ে তুলছে নিরাপদ এক পৃথিবী।
রাত হলেই স্বপ্ন ডোরাকে পেয়ে বসে। স্বপ্ন ছাড়া ডোরার এখন আর কিছুই নেই। নেই কোনো টাকাকড়ি বা সঞ্চয়। সবকিছুই সে ফেলে এসেছে। বাবার বিশ্বাস আর আঁকড়ে থাকার ভাবনাকে পিছনে ফেলেই পাড়ি জমিয়েছে অজানার উদ্দেশ্যে। বিয়ে না করলে সম্মানিত আর ধার্মিক পিতার বড় মেয়ে হিসেবেতার সামনে খোলা ছিল দুটো পথ : কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক হওয়া অথবা অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া। শেষের এই প্রফেশন অর্থাৎ হিসাবরক্ষক হওয়ার কথা ডোরা কখনই ভাবতে পারে না। তবে শিশুদের ডোরা ভালোবাসে। মায়ের মৃত্যুর পর নিজের ছোটভাই আর বোনদের লালন-পালনও সে করেছে। কিন্তু কখনও কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক সে হতে চায় না। ডোরার ইচ্ছাটা মা যেমনটা ভেবেছিল, তার চেয়ে আরেকটু বেশি। কমবয়সী মেয়েদের এখন কাজ করার কত ধরনের সুযোগ। ইতিহাসের যে কোনো সময়ের তুলনায় মেয়েরা অনেক ভালো অবস্থানে আছে। ডোরা এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করতে চায়। জার্মানিতে মেয়েরা এখন শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং রাজনীতিতে অনেক এগিয়ে। নিজের জন্যও ডোরা কিছু করতে চায়। এমন এক পৃথিবীর কথা সে ভাবে যে-পৃথিবীটা তার নিজের জন্য এবং অন্য মানুষদের জন্য হয়ে উঠবে বসবাসের চমৎকার একটা স্থান। বার্লিনে তার রোল মডেল হচ্ছেন সমাজবাদী নেতা, আন্তর্জাতিক ভোটাধিকার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত রাজনীতিক এবং জার্মান রিখস্ট্যাগের সদস্য নারীবাদী ক্লারা জেটকিন। মায়ের মৃত্যুর পর বড় মেয়ে হিসেবে ডোরার ওপর অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে। ডোরা তখনই ওর সমব-য়সী মেয়েদের তুলনায় স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে থাকে। দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে। ভাই-বোনদের মানুষ করা, তাদের দেখভাল, সংসারের খুটিনাটি দেখা-এভাবেই মায়ের শূন্যস্থান ডোরাকেই পূরণ করতে হয়েছে। শুক্রবার রাতে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে বিশেষ নৈশভোজ হতো, সেই অনুষ্ঠানের জন্য রান্নাবান্না থেকে শুরু করে প্রার্থনা অনুষ্ঠানটির আয়োজনও তাকেই করতে হতো। এই সময়ে একটা লাভ অবশ্য হয়েছিল ডোরার। পড়াশোনা করার অনেক সময় পেত সে। ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন এসে ভর করত তার মনে। গায়ে-গতরে বেড়ে ওঠার পরপরই, অর্থাৎ যৌবনে পা দিয়েই নারীর সনাতন ভূমিকা সে অগ্রাহ্য করতে থাকে।
ডোরা সবসময় চলত তার হৃদয় আর মনের খেয়ালে। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হতো।

তর্ক হতো। ডোরার ইচ্ছা ছিল নিজের ধর্ম সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করার। কিন্তু বাবা তার এই ইচ্ছের কোনো গুরুত্বই দেননি। তিনি মনে করতেন এ এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত, যা তাকে ধ্বংস করে দেবে। বাবার ইচ্ছা আর সমাজের ইচ্ছা-যা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো, মান্য করছে এমন ভাবকরত ডোরা। বাবাকে না জানিয়েই বেদজিনের একটা থিয়েটার গ্রুপে যোগ দেয়। কয়েকটা নাটকেও অভিনয় করে। বাবা যখন মায়ের মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পর আবার বিয়ে করে ডোরা তখন কুড়িতে পা দিয়েছে। বাবা ভাবলেন, ডোরার জন্য কিছু একটা করা দরকার। একদিন বাক্স-প্যাটরা বেঁধে তাকে কারকোয়ের সারা ক্রিমার বেইয়াকভ নামের একটা স্কুলে রেখে আসলেন।

কারকোয়েতে আসার পর নতুন নতুন ভাবনায় ডোরার চোখ খুলে গেল। ডোরা বুঝতে শিখল জীবনে আরও অনেক কিছু করার আছে। পশ্চিমে তখন চলছে সামাজিক পালাবদলের ঢেউ। বিজ্ঞান আর সমাজ রূপান্তরের সেই দিনগুলোতে তরুণরা ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষতা আর মানবতার দিকে ঝুঁকছে। তাদের সামনে খুলে যাচ্ছে নতুন নতুন সম্ভাবনার নানান পথ। তরুণরা ঘর ছাড়ছে, পেছনে ফেলে আসছে সনাতন জীবনবোধ আর ত্যাগ করছে প্রাচীন ধ্যান-ধারণার খোলস। ডোরাও ওই তরুণদের সতীর্থ হতে চাইলো। একদিন এক মাকে বললো, 'পশ্চিম ইউরোপের তীর্থযাত্রী হবার জন্যে আমি মানবিক আইনকানুন, তার জ্যোতির্ময় দিক আর সৌন্দর্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে চাই।'

কিন্তু স্কুল তার ভালো লাগলো না। দুই-দুইবার কারকোয়ের স্কুল থেকে পালালো। মনে মনে ভাবলো উদ্দীপ্ত আত্মার টানেই আমাকে জার্মানি যেতে হবে। যে-পশ্চিমী জ্যোতির্ময়তার সন্ধান সে করছিল বা শুনেছিল, এর জ্ঞানের কথা, প্রজ্ঞার কথা, স্বচ্ছতার কথা, জীবনযাপনের কথা, চাইছিল সে-সবের সংস্পর্শে আসতে। পোলান্ড ত্যাগ করার সময় তার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। দস্তয়োভস্কির উপন্যাসের একজন নায়িকার মতো যেন সে বাস্তব পৃথিবীতে পা রাখছে। এই নারী বুঝি কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের কোনো মানুষ, যার হৃদয় আর মন স্বপ্ন ও সম্ভাবনায় ভরপুর। বাবা হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে তাকে ব্রেসলাউতে পেয়ে গেল। ব্রেসলাউর অবস্থান জার্মান সীমান্তে। বাবার সঙ্গে সে-যাত্রায় তাকে ফিরতে হলো স্কুলে। দ্বিতীয়বার বাবা হাল ছেড়ে দিল। কী-ই বা তিনি করতে পারতেন? যে যেতে চায় তাকে যেতে দেওয়াই ভালো। ডোরার কারণে পুরা পরিবার সম্পর্কে সবাই ছিঃ ছিঃ করতে থাকলো। বিশেষ করে ডোরার বাবা হার্শেল ডায়মন্ট ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েন। অথচ সমাজে একজন নিবেদিতপ্রাণ সনাতন ইহুদি বলে কী সম্মান তার। কত মানুষ তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু ডোরা, কী করছে এসব! তার মনের ক্ষিপ্রতা, তার চিন্তার গভীরতা, তার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, সবই তো বৃথা প্রতিপন্ন হচ্ছে-সে যে মেয়ে! ডোরা যা করছে, বাবার ঈশ্বর তো তা অনুমোদন করেন না। পড়াশোনাতেও এই ঈশ্বরের কোনো আগ্রহ নেই। ইহুদি আইন নিয়ে পঠনপাঠনের যে আগ্রহ ডোরার, তাই-বা শিখবার কি দরকার। সব মিলিয়ে যে জীবনযাপন সে করছে, সেটাই তো ভুল। বাবার এমনটাই ধারণা।

গত চার বছর ধরে ডোরা নিজের চলার মতো আয়-উপার্জন করতে পেরেছে। প্রথমে সে কাজ নিয়েছিল বার্লিনে। ডক্টর হেরমান বাডের বাসায় পরিচারিকার কাজ। বাড ছিলেন বার্লিন সনাতন গোষ্ঠীর একজন নেতা আর প্রুশিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র অফিসার। তিনিই প্রথম ইহুদি যিনি প্রুশিয়ার সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। পরে ডোরা একটা অনাথ আশ্রমে আশ্রয় পায়। সেখানে সে গৃহকর্ত্রীর কাজ করতো। ধর্মের প্রতি ডোরা কোনো কালেই কোনো আকর্ষণ অনুভবকরেনি। বাবার সনাতন ধর্মে তার একেবারেই বিশ্বাস নেই। ধর্মীয় আচরণও সে মেনে চলে না। ডোরার যা কিছু আকর্ষণ তা শুধু ইহুদিবাদে। তৌরাতের বিধিবিধান সম্পর্কে সে পড়াশোনা করে। কৌতূহল কেবল এর গভীরতম মানবিক দিকগুলির প্রতি। আধুনিক পৃথিবীতে একজন আধুনিক নারী হিসেবেকীভাবেসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে, এটাই তার মূল লক্ষ্য। যদি তাকে বেদজিনে থাকতে হতো, তাহলে তার বইগুলি চিরতরে কেড়ে নেওয়া হতো। যদি সে বাবার পছন্দের একজন কপর্দকহীন ধর্মীয় পণ্ডিতকে বিয়ে করে, তাহলে তাকে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে, যেমনটা তার মা বা দাদি করতেন, কাজ করতে হবেসারাদিন। পালন করতে হবেস্বামীর ফাইফরমাশ আর শুনতে হবে স্বামীর সেই কথা, ভাগ্যিস আমি তোমার মতো মেয়ে হয়ে জন্মায়নি।

মাছের বুকটা চিরে ফেলে ডোরা। তারপর তেলে ভাজে। কিন্তু মনটা চলে যায় সেই সুদূর সমুদ্র সৈকতে। কত যে ভাবনা ভর করে মনে। সমুদ্রের শ্বেতশুভ্র ফেনা আর স্রোত ধেয়ে আসছে মুরিৎসের সৈকতে। পাইন, বার্চ আর লিনডেন বনের মাঝ দিয়ে গেলে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। রহস্যময় সেই কালো দীর্ঘকায় মানুষটি কী এখনো সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? দুদিন আগে ওখানেই তো তাকে প্রথম দেখেছিল ডোরা। লোকটা মাথার ওপর আচ্ছাদন দেওয়া একটা চেয়ারে বসে আছেন। সৈকতে তার দাঁড়ানো দেখেই ডোরা বুঝে ফেলে, কতটা দীর্ঘ তার শরীর, স্লিম আর কালো। দুটি শিশু, একটা ছোট্ট মেয়ে আর সেই মেয়েটার চেয়ে বয়সে বড় এক ভাই, খেলছিল। কাছেই দাঁড়ানো ছিল এক নারী, নারীটি সম্ভবত তার স্ত্রী। ডোরা দেখলো, নারীটি ছেলেটার সঙ্গে খুনসুটি করছে। ছেলেটার বয়স কত হবে, বড় জোর ১১। ডোরা ভাবলো, কী সুখী একটা পরিবার। কিন্তু ডোরা ওই লোকটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারলো না। কী যে আছে লোকটার মধ্যে। কী সেটা? গড়ন লম্বা, গায়ের রঙ কালো আর দেখতে সুদর্শন। তার ঘন কালো চুল মুখটাকে কৌণিক আকার দিয়েছে। হাসিটা চনমনে, কণ্ঠস্বর যেন সুরেলা সংগীত। ওই নারী আর বাচ্চা দুটিকে নিয়ে লোকটা যখন সৈকত ছেড়ে সামনের দিকে পা বাড়ালো আর রাস্তা ধরে শহরের দিকে হাঁটতে থাকলো, বিস্ময়কর হলেও ডোরা তাদের অনুসরণ করলো।

সময়টা মধ্যগ্রীষ্ম, কিন্তু আবহাওয়া ছিল বেশ ঠাণ্ডা আর আর্দ্র। শহরে যাওয়ার দুটো রাস্তা। দুটো রাস্তাই শহর থেকে সমুদ্রের দিকে প্রলম্বিত ঝাঁঝরিকাটা লোহার পুলের শেষ প্রান্তে এসে থেমে গেছে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে বালির স্তূপ। পশ্চিম দিকটা শহরের কেন্দ্রস্থল। হাউস হাউটনের সামনের রাস্তাটা উইন্ডমিল আর খামারবাড়ি ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে। রুক্ষ খেত থেকে কেটে-আনা খড়ের গাদাগুলি চারদিকে ইতস্তত ছড়ানো।

শহরের দিকে হাঁটছে ডোরা, অনুসরণ করছে ওই চারজনকে। কিন্তু বজায় রাখছে একটা সসম্ভ্রম দূরত্ব। লোকটার ওপর থেকে একবারও চোখ সরাতে পারছে না। কিছুটা ঝুঁকে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে সে। লোকটা তারই মতো বিদেশি, নিশ্চিত ডোরা। জার্মান নন, কিন্তু কোন দেশ থেকে এসেছেন, ধারণা করতে পারলো না ডোরা। লোকটা সোজা হয়ে হাঁটেন, দীর্ঘকায়, শুধু মাথাটা একদিকে ঈষৎ কাঁৎ হয়ে যায় যখন কিছু শোনার চেষ্টা করেন। তার লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটার ভঙ্গি দেখে ডোরা মনে মনে ভাবলো লোকটা ইউরোপীয় নন, আমেরিকার হাফব্রিড রেড ইন্ডিয়ান।

রাস্তাটা বিতিকিচ্ছিরি। পথ কেটে কেটে চলে যাওয়া গাড়ির চাকায় ছলকে-ওঠা পানি আর কাদায় থিকথিক করছে। সমুদ্রের ভেতরে নেমে যাওয়া সেতুটা কাছেই। যেখানে সবগুলো হোটেল, রিসর্ট, অবসরপ্রাপ্তদের বাড়িঘর, রেস্তোরাঁ আর দোকানপাটের অবস্থান, পথটা সামান্য বাঁক নিয়ে সেই দিকে চলে গেছে। কিন্তু এইসব হোটেল, বাড়িঘর আর দোকানপাটের মাঝখানের রাস্তার ভীষণ বেহাল অবস্থা। অনেক জায়গাতেই ইট-সুড়কি-নুড়ি উঠে গিয়ে করুণ চেহারা নিয়েছে। যুদ্ধ যদিও চার বছর আগে শেষ হয়েছে কিন্তু এখনো জার্মানিকে বইতে হচ্ছে তার ধকল। ভার্সাই যুক্তির শর্ত মেনে এইসব রাস্তা মেরামতের খরচাপাতি দিতে হচ্ছে। কিন্তু এখনো এই সড়কটি মেরামতের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উত্তরের সমুদ্র সৈকত ঘেঁষেচলা রাস্তা শুধু এটাই।

চলতে চলতে ডোরা চলে এলো একেবারে শহরের কেন্দ্রে। নিজের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলো, এই পরিবারটিকে আর অনুসরণ না করে নিজের গন্তব্যেই যাওয়া উচিত। হাঁটতে হাঁটতে মুরিৎস শহরের ঐতিহ্যের কথাও ডোরার মনে পড়লো। সারা শহর জুড়েই ছোট-বড় নানা ধরনের হোটেল, রেস্তোরাঁ, কাফে আর দোকানপাট। সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে থাকা কাঠের পাটাতনটা নির্মিত হয়েছিল ১৮৮২ সালে। তারপর উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসা সামুদ্রিক ঝড় আর উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে কতবার যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে আর কতবার যে সেটা মেরামত করতে হয়েছে। এই সমুদ্র সৈকত ধরে প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে হেঁটে চলে। কাছেই ফেরিগুলি নোঙর করা, যাত্রী তুলছে আর নামিয়ে দিচ্ছে।

সূর্য, শেষ বিকেলে যখন দেখা দিল, আকাশ কী দারুণ বর্ণচ্ছটায় সাজলো। গোলাপি আভার সোনালি রশ্মি ছাই রঙের মেঘ চিরে চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো। এরকম দারুণ পরিবেশের মধ্যেই হাঁটু অব্দি গোসলের পোশাক পরে জলকেলিতে মেতে আছে কিছু মানুষ। জলের আলিঙ্গনসুখ অনুভবকরছে। একপাশটা এরকম মুখর থাকলেও অন্য পাশটা নিথর নীরবহয়ে আছে। সৈকতে ছড়ানো ছিটিয়ে আছে অবকাশ যাপনের কিছু চেয়ার।

এসব দেখতে দেখতে ডোরার হঠাৎ মনে পড়লো বাড়িতে ফেলে আসা কাজের কথা। ফিরে গিয়েই ঢুকতে হবেরান্নাঘরে। এবার দ্রুততর হলো তার চলা। চলতে চলতে দেখতে পেল একটু আগে-আগে সেই লোকটা হেঁটে চলেছেন। সঙ্গে সেই নারী ও বাচ্চাকাচ্চারা। আহ্ ডোরা, দ্রুত ছোটো, মনে মনে নিজেকে তাড়া দিতে দিতে ওদের ছাড়িয়ে গেল।

সামান্য পাশ ফিরে একঝলক দেখে নিতে গিয়ে চোখে চোখ পড়তেই স্মিতহাস্যে মাথাটা ঝোকালো। দেখতে পেল দীর্ঘকায় ওই মানুষটির পেছনের আকাশ আর সূর্যটাকে। এতটাই দীর্ঘ তিনি, অপরাহ্নের সূর্যও তাকে ঢেকে দিতে পারেনি। ডোরা থপথপ করে মাছটাকে আছড়ে মারলো। কিছুক্ষণ আগের ফেলে আসা আবেগটা যেন ওই মাছটার ওপর ভর করে ফুঁসে উঠতে চাইছে। কেন ফেলে আসতে হলো ওই লোকটাকে? এ কী করছে সে, বোঝার আগেই মনে হলো, মন থেকে প্রাণপণে তাড়াতে চাইলেও লোকটার কথা ভুলতে পারছে না। মন শাসন মানছে না। কে এই লোকটি? কেন সে আমাকে এতটা তাতিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? লোকটা নিশ্চয়ই বিবাহিত। ব্যাপারটা বিরক্তিকর, কিন্তু কী এসে যায় তাতে! ডোরার সাধারণ বোধবুদ্ধি বুঝি লোপ পেল। শুধু বুঝতে পারলো লোকটার সঙ্গে আরেকবার দেখা হওয়া দরকার।

হঠাৎ করে ঘরটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। রান্নাঘরের জানালা আগলে কে যেন দাঁড়িয়ে। আলোর পথটা সে কারণেই রুদ্ধ হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকতে পারছে না। চোখ তুলে ডোরা তাকাতেই ছায়ার মতো কে যেন সরে গেল। আলোর স্ফুলিঙ্গে ঘরটা আবার ভরে গেল। দরোজাজুড়ে একটা লোকের দীর্ঘছায়া। কাঁধ বাঁকিয়ে ডোরা দেখলো, আরে, এ তো সৈকতে দেখা সেই লোকটা! ঠিকই ভেবেছিল, লোকটা বেশ লম্বা। কমপক্ষে ছ' ফুট তো হবেই। রান্নাঘরের দিকে তিনি পা বাড়ালেন আর ডোরার দৃষ্টিবিন্দু লোকটার চোখের ওপর স্থির-নিবদ্ধ হয়ে গেল। কী বড় বড় চোখ। বাদামি রঙ। নাকি ধূসর? তবে মুক্ত আয়তচক্ষু তো বলাই যায়। তার তোলপাড় দৃষ্টি ঘরের চারপাশটা একবার ঘুরে এলো। ডোরার সামনেই মাছের স্তূপ। কী বিব্রতকর। সেই স্তূপ থেকে দৃষ্টি এবার সরে এস নিবদ্ধ হলো, নাকি বিদ্ধ করলো ডোরার দৃষ্টি! ডোরা বিমূঢ়। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটা মুখ খুললো। শান্ত নিচু নমিত স্বর। 'এত সুন্দর হাত আর সেই হাতেই কিনা ছোপ ছোপ রক্ত! এও বুঝি হয়।'

ডোরা নিচু হয়ে হাতের আঙুলগুলি দেখলো। রক্তের দাগ লেগে বিচিত্র চেহারা নিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে লজ্জারক্তিম হলো তার মুখশ্রী। চোখ তুলে তাকালো। এবার চোখে চোখে। লোকটাকে উপহার দিল হাসি। মাথার হ্যাটটা খুলে অভিবাদন জানিয়ে লোকটা হঠাৎ অন্তর্হিত হলেন।

সেই সন্ধ্যাতেই ছিল নৈশভোজপর্ব। ডোরা সেই লোকটাকে আবার দেখলো। লম্বা একটা টেবিলকে ঘিরে কয়েকজন মানুষ আর একদঙ্গল শিশু। ডোরা বুঝলো সমুদ্রসৈকত থেকে রান্নাঘরে ঢুকে পড়া লোকটি আর কেউ নন, আজকের প্রধান নিমন্ত্রিত অতিথি, প্রাহার ডক্টর কাফকা। পাশের হোটেল হান্স গ্লুকফে উঠেছেন। সেই হোটেলে যেতে যেতেই পথ ভুল করে ঢুকে পড়েছিলেন ডোরার রান্নাঘরে। খুঁজছিলেন হোটেলে ঢোকার মূল দরোজাটা। তাহলে তিনি একাই এসেছেন। ডোরার বুকে ভালো লাগার সোনালি সুখের অনুভূতি জাগলো। সবকিছুর তো একটাই অর্থ দাঁড়ায়। আশার প্রদীপটা আরও উজ্জ্বল হলো। ডক্টর কাফকা বিবাহিত নন! বোন আর বোনের দুই ছেলেমেয়ের সঙ্গে তিনি হোটেলে উঠেছেন। ডোরার মনের আকাশে, যে-আকাশটা সে বিকেল বেলা দেখেছিল, একঝাঁক হংসমিথুন বুঝি উড়ে চললো।

আগেও ডোরা প্রেমে পড়েছে। এখন যে শহরে সে আছে, সেটি পৃথিবীর প্রেমময় সমুদ্র শহরগুলির একটি। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্যে খ্যাত। লোকের মুখে সেরকমি সে শুনেছে। দেখছেও নিজে। পুরুষরা তার প্রেমে পড়েছে, কিন্তু ডোরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু এখন একজন পুরুষ এলো তার জীবনে। সত্যি সত্যি এলো। মনে পড়ে গেল, আরও এক প্রেম, সেটাও তো সত্যি হতে পারত। ডোরা তখন ডালহেমের গার্ডেনিং স্কুলের ছাত্রী। ইচ্ছে ছিল দু'জনে পালিয়ে গিয়ে ইরোজ ইসোরোলের আঙুর বাগানে কাজ করবেআর একসঙ্গে থাকবে। কিন্তু সে তো আর হলো না। আজ এই মুহূর্তে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনে হলো, একটা মানুষই তার হৃদয়জুড়ে বসেছে, আর তিনি হচ্ছেন ডক্টর কাফকা। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন তিনি।

সারাজীবন ধরে ডোরা একা। অতিথির অনেক কথাই সেই সন্ধ্যায় সে জেনে গেল। ড. কাফকা নিরামিষাশী। অবসরে যাওয়ার আগে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। প্রাহার ওয়ার্কার্স অ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স ইনস্টিটিউটের সিনিয়র সেক্রেটারি। প্রাহাতেই ছিলেন এতদিন। কাফকা তো ডোরার খুবঅপরিচিত নন। বার্লিন শহরেই তো প্রথম পরিচয়। কী মুগ্ধতাই না সেদিন কাজ করছিল। ডোরার মনে পড়লো, বইয়ের স্টলটার নাম জুরোভিচ বুকশপ। একদিন লেখক টাইল রসলারের এই বুকশপেই কাফকার একটা বই সে ছুঁয়ে দেখেছিল। বইটা ছিল ডিসপ্লেতে। বাইরে থেকে সেই ডিসপ্লের উইনডোতে হাত দিয়ে ভেতরে থাকা বইটা ছুঁয়ে দেখার লোভ সে সামলাতে পারেনি।

ডিনারের সময় একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো। ব্যাপারটা তুচ্ছ করার মতোই, কিন্তু ডোরার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ালো না। ঘটনাটা থেকে মানুষ হিসেবেকাফকা কেমন, খানিকটা হলেও বুঝতে পারলো। সঙ্গে আসা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এমনিতেই ভালো। ওরা তো চাইবেই নিজেদের নিয়ে মেতে থাকলেও বড়রা যেন ওদের উপেক্ষা না করে। গুরুত্ব দিক। বেশ একটা ভাবনিয়ে ওরা বেঞ্চে বসেছে। লক্ষ্য, বিশিষ্ট অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণ করা। একটা বাচ্চা ছেলে, বয়স পাঁচ কী ছয় হবে, ডোরা দেখছিল ওই বেশি ছটফট করছে। সবকিছুতেই উৎসাহ। কিন্তু একবার যে-ই-না সে উঠে দাঁড়ালো, ওমনি তার পা টলে উঠলো। থপ করে মাটিতে পড়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই সে এক বিব্রতকর পরিস্থিতি, বিশেষ করে ছেলেটির জন্য। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই চারদিকে বিব্রতকর হাসির খই ফুটবেএমন যখন অবস্থা, কাফকা পরম মমতার সঙ্গে ছেলেটির উদ্দেশে বললেন, 'বাহ্, কী সুন্দরভাবেতুমি মাটিতে পড়ে গেলে আবার উঠেও দাঁড়ালে?' কথাটা কাফকা এত শান্ত আর আর্দ্র কণ্ঠে বললেন যে, হাসির কোনো ঘটনাই ঘটলো না। ছেলেটির প্রতি কাফকার সহমর্মিতা, সমীহতা, আত্মবিশ্বাসের প্রতি মমতাভরা সমর্থন মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশটাকে স্বাভাবিক করে তুললো। ডোরার মনে হলো, ঘটনাটা খুবই সামান্য, কিন্তু ভুলবার নয়।

এরপর পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে, ডোরা একদিন এই ঘটানাটাকে স্মরণ করে ডায়রিতে লিখলো, 'ঘটনাটা যখনই মনে পড়ে, তখন ভাবি, সবকিছুই তো আমরা রক্ষা করতে পেরেছি, বাঁচাতে পেরেছি, কিন্তু কাফকাকে বাঁচাতে পারিনি।' কিন্তু এ তো ঘটবে সেই পঁচিশ বছর পরে। ডিনারের সেই প্রথম রাতার ছিল কী মধুর।

ডিনারের পরে দু'জনের মধ্যে আলাপ আরও জমে উঠলো। ডোরার মতো কাফকা নিজেও হিব্রু শিখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পেরে ওঠেননি। অথচ ডোরার হিব্রু কত চমৎকার। কাফকা এটা বুঝতে পেরেই ডোরাকে হিব্রু কোনো লেখা পড়তে বললেন। ডোরাও যেন এরকম একটা কিছু চাইছিল। ভেতরে ভেতরে খুশির একটা ফল্গুস্রোত বয়ে গেল। নিজের ভাষাদক্ষতা দেখাবার জন্যে ডোরা উন্মুখ হয়েই আছে। সেই বালিকা বেলাতেই ঘটনাচক্রে সে হিব্রু বর্ণমালার প্রেমে পড়েছিল, 'আলেপ-বেজ' এই ভাষাটা আসলে শিখতো ভাই, আর পাশে বসা ডোরার কানে সেটা ঢুকতো। এভাবেই তার হিব্রু শেখা। বড় হয়ে ডোরা প্রকাশ্যে প্রথম যে বিদ্রোহটা করে, সে এই হিব্রু ভাষাকে ঘিরেই। বিদ্রোহটা ছিল বাবার বিরুদ্ধে। ডোরার বাবার কাছে হিব্রুটা ছিল পরম পবিত্র 'তৌরাতে'র ভাষা। এই ভাষা হাটে-মাঠে বলার ভাষা নয়। বিশেষ করে আধুনিক জীবনের এ কথা-সেকথা বলবার জন্যে ভাষাটা ব্যবহার করা যায় না। পবিত্রতার আবরণে লুপ্ত পবিত্র হিব্রু ভাষাটা আবার ফিরে আসুক, বাবা সেরকমটাই চাইতেন। ডোরাকে তাই নিষেধ করলেন, তুমি তো একালের আধুনিকা, হিব্রুটা তুমি শিখো না। বেদজিনের যে-স্কুলে শিক্ষকরা হিব্রু শেখাতেন, সেখানে ভর্তি হতে নিষেধ করলেন। কিন্তু ডোরা কেন শুনবে সে কথা, হিব্রুর প্রতি তার দুর্মর আকর্ষণ। বাবার নিষেধ অমান্য করে হিব্রু ক্লাসে ভর্তি হলো। সিদ্ধান্তটা আবার গোপনও করলো না। শুধু কি ভর্তি হওয়া? হিব্রু ক্লাসের সহপাঠীদের সঙ্গে ছবিও তুললো। ঘটনাটা জানাজানি হলে, বাবা স্বাভাবিকভাবেই রেগে যান, কিন্তু দ্রোহী মেয়েকে হিব্রু ভাষা শেখা থেকে বিরত রাখতে পারলেন না।

হাউস হাউটন হোটেলের লবি। সেখানে এখন দু'জন মানুষ কথা বলছেন। একজন ডোরা, আরেকজন কাফকা। ডোরা চাইছিলেন তার কথার শ্রোতা থাকুক একজনই, আর তিনি যেন হন কাফকা। ডোরা তৌরাত থেকে পয়গম্বর ঈশার (স) একটা অংশ পড়তে শুরু করলো। কাফকার মুখে প্রশ্রয়ের স্মিত হাসি। মাথা নেড়ে অনুপ্রাণিত করলেন। ডোরা ভাবলো, কত প্রাণবন্ত এই মানুষটি। প্রতিটি কথা কী মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। যে-অংশটা ডোরা পড়ছে, সেই কথাগুলিতে যেন মূর্ত হয়ে আছে তার প্রাণের কথা। প্রতিটি বাণীতে যেন জ্বলে উঠছে আত্মার শিখা। পবিত্র গ্রন্থটা চোখের সামনে খোলা আছে ঠিকই, কিন্তু ডোরা সবটাই পড়ছে স্মৃতি থেকে। নাটকীয় উত্থানপতনে কী মধুর প্রাণস্পর্শী তার কণ্ঠ। পাঠ যখন শেষ হলো, কাফকার মুখের দিকে তাকিয়ে ডোরার মনে হলো সেখানে যেন গোধূলি সূর্যের সোনারঙ খেলা করছে।

বার্লিনের ইহুদি অধিবাসীদের কাছে ফ্রাঞ্জ কাফকা খুবই জনপ্রিয় একজন লেখক। কাফকা যে হোটেলে উঠেছেন, সেই হাউস গ্লুকফের ব্যালকনি থেকে মাত্র পঞ্চাশ পা দূরেই ইহুদি সম্প্রদায়ের বসবাস। তাদেরই আমন্ত্রণে তিন দিন আগে ১০ই জুন কাফকা এখানে এসেছেন। ডোরার সঙ্গে যেদিন বিকালে প্রথম দেখা হলো, সেদিন সকালেই এক বন্ধুকে লিখলেন, 'গাছের ফাঁক দিয়ে আমি দেখলাম শিশুরা খেলছে। প্রাণবন্ত, স্বাস্থ্যবান, উদ্দীপ্ত। বার্লিনের নির্মম নির্যাতনের

হাত থেকে পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের রক্ষা করছে পশ্চিম ইউরোপের ইহুদিরা। দিন আর রাতের অর্ধেক সময়জুড়ে এর বাড়িঘর, বৃক্ষ, সমুদ্রসৈকত সুরের গহনে ডুবেথাকে। চারদিকে তুমি শুনতে পাবেসুরের ঝর্ণাধারা বইছে। এখানেও আমি সুখী নই, কিন্তু সুখস্পর্শের অপেক্ষায় আছে।' এতদূর লেখার পর কাফকার মনে হলো আরও কী যেন বলার ছিল। তিনি লিখলেন, 'জীবনে এই প্রথম আজ আমি তাদের সঙ্গে শুক্রবারের দিনটা মহাসমারোহে কাটাবো।' এর কয়েক ঘণ্টা পরই এলো সেই সময়। কাফকার সঙ্গে দেখা হলো ডোরার।

১৯১৪ সাল। বছরটির শুরু থেকেই বার্লিন কাফকাকে মুগ্ধ করছিল। নিজের জীবন সম্পর্কে তাই বেশ আশাবাদী হয়ে উঠলেন। প্রিয় বন্ধু ম্যাক্স ব্রড তাকে ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে তুললো। দার্শনিক বন্ধু মার্টিন বুবেরের কথাই বা ভুলবেন কী করে? নিজের আর অন্য ইহুদিদের সমস্যা তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন। সবার জন্যই তার অপার ভালোবাসা। মমত্ববোধ। বার্লিনে তখন বাস করছেন সাবেক প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ার। কতবার যে তাকে অনুরোধ জানালেন ইহুদি শিশুদের জন্য কিছু করবার জন্য, 'ফেলিস এটাই একমাত্র পথ যার মধ্য দিয়ে তুমি আধ্যাত্মিক মুক্তি পেতে পার। অসহায় মানুষের সাহায্যে তোমার এগিয়ে আসা উচিত।' পরদিন হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এসবকথা যখন ভাবছেন কাফকা, তখনই চকিতে মনে পড়লো ডোরার কথা। ডোরার সঙ্গে দেখা হওয়াটা কী সৌভাগ্যের ব্যাপারই না হলো। তরুণী, বুদ্ধিমতী নারী। বার্লিনের ইহুদিরা যে-কাজ করছেন, ডোরাও এখানে সেই কাজই করছে। মানুষের ভালোর জন্যে কাজ।

প্যালেস্টাইনের হিব্রু ভাষার প্রতি ডোরার দখল ও বুৎপত্তি সত্যি বিস্ময়কর। মুগ্ধ হওয়ার মতোই ব্যাপার। কত কত বছর ধরে কাফকা চেষ্টা করছেন ভাষাটা শিখতে। বেশ কয়েকজন শিক্ষকের কাছে শিখতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শেখা হয়নি। ডোরার ঝোঁক হিব্রু ধ্রুপদী কবিতা, গান আর গল্পে। এসবের মিস্টিক দিকটাই তাকে দিনের পর দিন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দাদীমাদের কাছ থেকে সে ইদ্দিশ ভাষার কত কী যে শুনেছে। ডোরা তো কাফকাকে নিজেই বলছিল, 'আমি যেভাবেবর্ণনা করছি, সেসবকিন্তু আমার দাদিমাদের কাছ থেকে শোনা। এই যে প্রবচন, গল্পগাথা, তারাই আমাকে শুনিয়েছেন।' কী চমৎকার একটি মেয়ে। কাফকার ভাবতে ভালো লাগছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, ডোরা স্বাধীন এক নারী। বয়সে আমার চাইতে পনেরো বছরের ছোট। আমি যা এখনো করতে পারিনি, ডোরা এরই মধ্যে তা করে ফেলেছে। পিতার মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগ-অনুভূতির শৃঙ্খল থেকে সে মুক্ত হতে পেরেছে। যে-ধর্মাশ্রিত মানুষ তাকে শৈশবেঘিরে রাখতো, সে তাদের অগ্রাহ্য করে মুক্ত দিগন্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ডোরা নিজেই নিজেকে ব্যক্তিমানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বার্লিনে যাপন করছে মুক্ত জীবন। এই জীবনেরই তো স্বপ্ন দেখেন কাফকা।

অল্প কয়েক দিনের ছুটিছাটা বা কোথাও ভ্রমণে যাওয়া ছাড়া, কাফকা কখনো প্রাহা ছেড়ে যাননি। পিতার কর্তৃত্ব বা বন্দিত্ব থেকেও মুক্ত হতে পারেননি। বাবার সঙ্গে কাফকার সম্পর্কটাকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সমুদ্রের উপরিতলটা শান্তই দেখায়, কিন্তু গভীর তলদেশটা থাকে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিত। বাবার সঙ্গে কাফকার সম্পর্কটা এমনই। উপরে উপরে শান্ত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যুদ্ধংদেহী। কাফকা সম্পর্কে হেরমান কাফকা সবসময়ই সমালোচনামুখর, আক্রমণাত্মক, নিষ্ঠুর। পুত্রকে তিনি অনেক ভালোবাসেন কিন্তু তাকে নিয়ে তার হতাশা চরম। কাফকার ওপর বিরক্ত তিনি। এই দ্বৈরথে জীবনের প্রথম দিকে কাফকা বেশ আহত হয়েছেন। বালক কাফকার মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কাফকা এই যন্ত্রণাই বয়ে বেড়াচ্ছেন। যন্ত্রণাটা ক্রমশ দুঃসহ দুর্বহ মনে হচ্ছে। এসবকথা তো মনে হলেই তিনি ডায়রিতে লিখে রাখেন। ডোরার সঙ্গে দেখা হওয়ার এক বছর আগেই লিখছিলেন, 'ছোট্ট শিশু হিসেবেআমি আমার পিতার দ্বারা পরাজিত হয়েছি। কিন্তু হলে হবেকী, জীবনবাসনা যেহেতু অসীম অপার, ফলে এই বাসনাকে ত্যাগ করতে পারছি না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকেও সরে যাচ্ছি না। এই যুদ্ধে অবশ্য আমিই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।'

দিনটা ছিল ১৯২৩ সালের ১৩ই জুলাই, শুক্রবার। একটা দিনও যায়নি, কাফকা আর ডোরার আবার দেখা হলো সেই পবিত্র 'ওনেগ শাবাতে'র দিনে। ওনেগ শাবাত, অর্থাৎ প্রার্থনার পবিত্র শুক্রবার। এখন তাদের প্রতিদিনই দেখা হয়। দেখা হওয়ার পরে কাফকা প্রতিদিনই আশ্রমে ফিরে আসেন। ফিরেই রাত জেগে ডোরাকে চিঠি লেখেন। আর প্রতি শুক্রবার প্রার্থনার দিনে অবধারিতভাবেদু'জনেই মিলিত হন নিবিড় প্রার্থনায়। এভাবেই মুরিৎসে কাফকার কেটে গেল তিন-তিনটি সপ্তাহ। যাদের আশ্রয়ে ছিলেন তাদের সঙ্গও বেশ উপভোগ করলেন। শিশুদের ক্লাস নেওয়া, গল্প শোনোনো, সবই বেশ ভালো লাগছিল। তবেএসবছাপিয়ে ডোরার বন্ধুতা ও সান্নিধ্যই তাকে মুগ্ধ করলো বেশি। সে এক অপার্থিবসাহচর্য। ডোরাও একইভাবে কাফকার প্রতি অনুভবকরলো তীব্র মধুর হার্দ্রিক টান। মানুষটা সত্যি একেবারেই আলাদা। হুটহাট রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। আলু কাটতে সাহায্য করে। শুধু কি তাই? সমুদ্রপারের পাটাতনে দু'জনে নীরবেবসে থাকি। পায়ের তলায় আছড়ে পড়ে দুগ্ধফেননিভ জলরাশি। অনতিদূরের সৈকতের গাছগুলির পত্রপুষ্পে সরসর শব্দ হলো আরও নিবিড়ভাবে পরস্পরকে অনুভবকরি।

কাফকার মাঝে অন্য এক পুরুষকে খুঁজে পেলো ডোরা। কাফকারও ভালো লাগছে ডোরার সঙ্গ। মুরিৎস থেকে চলে আসার কয়েক দিন আগে বন্ধু টাইলকে লিখলেন, তোমার চিঠি যখন এসে পৌঁছলো তখন আমি সমুদ্রসৈকতে। ডোরার সঙ্গে। আমরা ছোট্ট একটা হিব্রু লেখা পড়ছিলাম। সে ছিল অনেক কাল পরের একটা রৌদ্রকরোজ্জ্বল অপরাহ্ন। এ রকম বিকাল যদি আবার আসে, আসবেহয়তো, অনেক অনেক দিন পরে। এই যে ভালো লাগার মুহূর্ত, তা যেন শেষ না হয়। কিন্তু কাফকার ওই সময়েই মনে হতে থাকলো, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ঘুম হচ্ছে না ঠিকমতো। মাথাব্যথাও আছে। এ-এক বিস্ময়, কেন এসবহয় আমার? কেন আমাকে আমি ভালো থাকতে পারি না? কাফকার মনে হলো, আমি বোধ হয় এক জায়গায় বেশিদিন থাকার মানুষ নই। অন্য সবাই যখন ভ্রমণে থাকে, তারা ভ্রমণও করে আবার বাড়ির জন্য টানও অনুভবকরে। কিন্তু আমার কেন এমন হয় না? এখানকার সবাই তো খুবভালো। কত যত্নআত্তি করছে। যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশিই করছে। ডোরা, ওর সঙ্গে দারুণ সময় কাটছে। সবসময়ই আমরা একসঙ্গে থাকছি। অসাধারণ এক নারী ডোরা।

প্রতিদিনই ডোরা আর কাফকা সৈকতের বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের পারে রাখা চেয়ারে গিয়ে বসেন। দশ বছর তো হয়েই গেল, কাফকা ভাবেন, এভাবে তো সমুদ্র-দর্শনে আসা হয়নি। কী চমৎকার কাটছে এই সময়টা, কী প্রাণবন্ত, অনুভব করছি তারুণ্য। জীবনে এরকম সময় তো আর আসেনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাফকা আর ডোরা কথা বলেন। বেশিরভাগই ডোরার জীবনের কথা। এ ছাড়া আরও কত কী বিষয়ে যে কথা হয়। সেসববিষয়ে দু'জনেরই আগ্রহ সমান। কীভাবেকথা বলতে হয়, কাফকা জানেন। প্রশ্ন করার ব্যাপারেও পারদর্শী। ডোরাই বললো কাফকাকে, 'আহা, দুই কান দিয়ে কথা কীভাবে শুনতে হয় সবটাই জানো দেখছি। একবারও তো ক্লান্ত হও না।' ডোরা তার শৈশবের কথা শোনায়। বেদজিনে তার ফেলে আসা পরিবারের কথা। মা, দাদি তাকে কত কত যাদুগাথা শুনিয়েছেন। বাল শেম তোভ নামের প্রিয় বইটা থেকে উজার করে কিংবদন্তি আর পুরাণের কথা বলেছেন। আরব্য উপন্যাসের মতো ছিল সেই দিনগুলি। ডোরাও কাফকাকে এসবগল্প শোনায়। প্রতি রাতে শেহারজাদে যেভাবেগল্প শোনাত শাহ-রিয়ারকে, সেভাবেই ডোরা গল্প শোনায় কাফকাকে। গল্প শুনতে শুনতে কাফকার মনে হয়, সম্রাট তিনি, কিন্তু নির্মম নিষ্ঠুর সম্রাট নন। ডোরাও যখন গল্প শোনায়, সেও সাধারণ নারী নয়, সে শেহারজাদি। এক ধরনের অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করে ডোরা আমাকে জাদুবাস্তবময় গল্পের জগতে নিয়ে যায়। ওর স্মৃতির ঝাঁপিতে কত গল্প যে আছে। কত রূপকথা, লোকগাথা, পৌরাণিক গল্প, প্রবচন। ডোরা যখন এসবগল্প বলে, কাফকা তখন সেই গল্পগুলি মুগ্ধ হয়ে শোনেন। মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে পড়ে তার শরীরে-মনে।

কাফকা দেখছেন ডোরার আরও এমন কিছু গুণ আছে যা মুগ্ধ হওয়ার মতো। সহজ, স্বাভাবিক, স্বতস্ফূর্ত, স্বাস্থ্যবান। মনের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। জীবনযাপনের ধরনটা একেবারে নিজস্ব। ডোরাও এরকম কারুর সঙ্গে আগে পরিচয় হয়নি। কাফকার মতো কারো সঙ্গেই ডোরা আগে সেইভাবেমেশেনি। তার মনে হয়, কাফকা অনন্য, অসাধারণ, বিশেষ কেউ। অন্যরাও সেটা বোঝেন। সুপুরুষ আর পরিশীলিত মানুষ কাফকা। সবসময়ই হাসিখুশি থাকতে চেষ্টা করেন। কৌতুক করতে ভালোবাসেন। চোখের দিকে তাকালেই সাদর অভ্যর্থনার আহ্বান তাতে জ্বলজ্বল করে। নিজের স্বভাবটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন। নিজের কথা খুব একটা বলেন না। অথচ অন্যদের সম্পর্কে কৌতূহল অনেক।

আসলেই তাই। পশ্চিম ইউরোপের কোনো পুরুষের প্রতি ডোরা সেইভাবেআকৃষ্ট হয়নি। আকৃষ্ট হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পায়নি। এমন কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখা হয়নি যাতে তার নারীহৃদয় সেই পুরুষপ্রবরের দিকে ধাবিত হতে পারে। জার্মানিতে ডোরা এসেছিল অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। তার আত্মিক বাসনা পূরণ হবে, এমনটাই ভেবেছিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই বুঝতে পারলো এখানকার মানুষ ভীষণ অস্থির।

মানবিক অনুভবসম্পর্কে যে গভীর ধারণা আছে, তাও নয়। কাফকার মধ্যেও অস্থিরতা আছে। কিন্তু কাফকা নিরন্তর নিজের শরীরকে ছাড়িয়ে বাইরে পৃথিবীর সঙ্গে যেন যুক্ত হতে চায়। কী যেন খোঁজে। পেতে চায়। একবার ডোরাকে বললো, 'অবিধ্বংসী কিছু, ডোরা, এরকমই একটা কিছু খুঁজছি আমি। আমি বোধ হয় এরকমই। আমার সত্তাটা এভাবেই বুঝি জেগে থাকে।' কাফকা যখন কথা বলে, ডোরার মনে হয় এ কোনো সামান্যশ্রবণ নয়। এক ধরনের মায়া যেন জড়িয়ে থাকে কাফকার কথায়। এক ধরনের আর্তি। কাফকা আরেকবার বললো, 'আমি জানো, কেউ নই, কিছুই নই। কিন্তু আমি কিছু একটা হয়ে উঠি যখন বাইরের কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত হই।' ভাবনার অতলে মাঝেমধ্যে ডুবে যান কাফকা। জীবনে যা কিছু পেতে চেয়েছেন তার অনেক কিছুই যেন এই পূর্ব ইউরোপীয় ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন। আর, আর ডোরা সেই নারী যার কাছে প্রথম নিজের জীবনকে মেলে ধরলেন। আমিই তো ডোরাকে সৃষ্টি করছি, আমার মনে মাধুরী দিয়ে। এজন্যই ডোরার সঙ্গে চমৎকার সময় কাটে আমার। দু'জন দু'জনকে বেশ বুঝতে পারি। ডোরার মতো আর কেউ তো আমাকে বুঝতে পারেনি। ব্রডের মুখেও তো শুনেছি আমাদের বোঝাপড়াটা নাকি চমৎকার। সত্যি, ডোরার পোলিশ ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার কৌতূহল আছে। আমি যেমনটা চাই, ডোরাও সেইভাবে সবকিছু মেলে ধরছে। সে আমার আগ্রহ আর কৌতূহলের অনিঃশেষ উৎস। ডোরা আসলে এমন এক তরুণী, পশ্চিমের সংস্কৃতি সম্পর্কে যার ধারণা সামান্যই। আমাকে যেন সে শিক্ষক মনে করে। শিক্ষক হিসেবে সম্মান করে, ভালোবাসে। সেদিন তো বলেই বসল, তুমি আমার স্বপ্নপুরুষ। স্বপ্নকল্পনার জগতে মনে মনে ঘুরে বেড়াই, উড়ে বেড়াই। তোমাকে আমি ভালোবাসি। কাফকা বুঝতে পারেন, দু'জনে ইউরোপের দুই বিপরীত প্রান্ত থেকে এসেছেন। ডোরার জন্ম পোলান্ডের গোঁড়া একটা ইহুদি পরিবারে। কিন্তু সমস্ত ট্যাবু আর সামাজিক বাধানিষেধ ছিন্ন করে সে চলে এসেছে। নিজের ধর্মের প্রতি তার আকর্ষণ এতটুকু কমেনি। কাফকা এসেছে প্রাহা থেকে। উত্তরাধিকার সূত্রে তার মাতৃকুলের সবাই ইহুদি। ধর্মশিক্ষক। প্রাহার ইহুদি পাড়ায় তার বেড়ে ওঠা। কিন্তু কখনো সেই জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভবকরেননি। এই চল্লিশ বছর বয়স অব্দি শুক্রবাসরীয় সাবাথ প্রার্থনাসভায় কখনো যোগ দেননি। ইহুদী ধর্মীয় আচরণের বিষয়টি তার কাছে পরম পবিত্র আর রহস্যই থেকে গেছে। বাবা মুখস্থ করে তৌরাত পড়তে বলতেন। তৌরাত তো হিব্রুতে লেখা। কাফকা পড়তেন ঠিকই, কিন্তু এর একবর্ণ অর্থ বুঝতেন না। বর্ণের ধ্বনিগুলো অদ্ভুত লাগত। একটা তের বছরের বালকের কাছে সবটাই মনে হতো নির্যাতন। আরেকটু যখন বড় হলেন, তখন ইহুদি ঐতিহ্য আর শেকড়ের মধ্যে খুঁজে পেলেন মরমী ভাব। কিন্তু যে সমাজ ও রাষ্ট্র ইহুদিদের ঘৃণা করে, সেখানে বেঁচে থাকার জন্য তো নিরন্তর সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ডোরার অবস্থারও পরিবর্তন হয়নি। মহাযুদ্ধের পর সবাই ভেবেছিল পরিস্থিতি শান্ত হবে। মুক্ত সমাজের স্বপ্ন সফল হবে। কিন্তু তা তো হয়নি। ডোরা ভেবেছিল পশ্চিমে গেলে মুক্ত সমাজের দেখা মিলবে। কাফকার মতো ডোরাও ডায়রি লিখতো। ডায়রি পাতায় উৎকীর্ণ থাকত তার মনে কথা। কাফকার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর একরাতে ডায়রিতে সে লিখল, 'আমি ছুটতে ছুটতে পশ্চিমে চলে এসেছি। পশ্চিমেই দেখা পাবআলোর। বার বার মনে হয়েছে পশ্চিমের মানুষ যা চাইছে আমি তাদের তা দিতে পারব। কিন্তু ইউরোপ যেমনটা হবে বলে ভেবেছিলাম, তেমনটা হয়নি। এখানকার মানুষ আত্মিকভাবে সুস্থির নয়। কিসের যেন অভাব তাদের। পুবের মানুষ বুঝতে পারেন মানবজীবনের অর্থ কত গভীর। সমাজে মানুষের বিচরণ এত সহজ নয়। বিপন্ন নয়। সবকিছু তারা বলতে পারেন না। কিন্তু তারা মানুষের ঐক্য আর সৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন। কাফকাকে যখন প্রথম দেখি, সেই প্রথম বুঝতে পারি মানুষ আসলে কী। মানুষের প্রকৃত প্রতিমূর্তিটি তিনি আমার মস্তিষ্কে গেঁথে দিয়েছেন। তিনিও যখন গভীরভাবে আমাকে দেখেন, মনে হয় কী যেন চাইছেন। লোকটা আমাকে গভীরভাবে টানছে।

কাফকা ভীষণ অসুস্থ। স্বাস্থ্যগত কারণেই তার মুরিৎস শহরে আসা। নিউমোনিয়া থেকে যক্ষা, পাঁচ বছর ধরে তিনি ভুগছেন। গত এক বছর ধরে তো প্রায় শয্যাশায়ী। সৈকতে হাঁটতে হাঁটতে ডোরাকে বললেন, 'লম্বা কোনো ভ্রমণের আগে একটু দেখছি, কতটা পারি। বুঝতে চাইছি কতটা ধকল সহ্য করতে পারব। বলেছি তো তোমাকে, আমি প্যালেস্টাইনে যেতে চাই। সম্ভবত সেটা এই বসন্তেই।' একটা কিছু, হয়তো সাধ্যাতীতও হতে পারে, কাফকা করবেনই। আর সেটা করবেন বাঁচার মতো বাঁচার জন্য। ডোরার এখন এটা বুঝতে আর বাকি নেই। প্রাহায় বাবা-মাকে রেখে, তাদের মুঠো থেকে আলগা হয়ে প্যালেস্টাইনে যাওয়ার চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে?

জীবনে বেঁচে থাকার আলোর ইশারা তো তিনি পেয়েছেন বন্ধুপত্নীর কাছ থেকে। বন্ধু হুগো বার্গমান। বার্গমান জেরুজালেম হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কয়েক মাস আগে তার স্ত্রী কাফকাকে জেরুজালেম ঘুরে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। থাকা ও বেড়ানোর দারুণ ব্যবস্থা নাকি আছে সেখানে। কাফকা সরাসরি গিয়ে উঠবেন তাদের অ্যাপার্টমেন্টে। প্যালেস্টাইনে গেলে সেখানকার গরম শুষ্ক আবহাওয়ায় কাফকা ক্রমশ ভালো হয়ে উঠবেন। ফিরে পাবেন স্বাস্থ্য। বাড়তি যা ঘটবে, শেকড়ের সন্ধান মিলবে। প্রস্তাবটা নিঃসন্দেহে লোভনীয়। কাফকা বন্ধুকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন জেরুজালেম আসছেন আর সেটা এই অক্টোবরেই।

এই হচ্ছে সেই বড় স্বপ্ন, যে-স্বপ্নের ভেতরে বিচরণ করছে দু'জন মানুষ। একজন নর, আরেকজন নারী। একজন ফ্রাঞ্জ কাফকা, আরেকজন ডোরা ডায়মন্ট। প্যালেস্টাইনেই অভিবাসী হিসেবে তারা থিতু হবেন। দু'জনের দেখা হওয়ার কয়েক দিন পরেই শুরু হয়ে যায় জেরুজালেমের দিকে তাদের যৌথস্বপ্নযাত্রা। আলাদিনের ম্যাজিক কার্পেট যেন পেয়ে গেছেন। উড়ে চলেছেন সেই পবিত্র ভূমিতে, যেখানে রয়ে গেছে তাদের শেকড় ও স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন তো শুধু উড়ে চলে না, দিনও তো ফুরিয়ে আসে। দু'জনের গ্রীষ্মকালীন অভিসারের দিনগুলো কখন যেন শেষ হয়।

কাফকার মধ্যে প্রাহায় ফিরে যাওয়ার দুঃস্বপ্ন এসে ভর করে। ডোরার সঙ্গে কাফকা আলোচনা করে ঠিক করেন, প্যালেস্টাইনে যাওয়ার আগে তারা বার্লিনে থাকবেন। এর কিছুদিন পরে যাবেন প্যালেস্টাইনে। কিন্তু সবকিছু নির্ভর করবে কাফকার স্বাস্থ্যের ওপর। তার স্বাস্থ্যটা যে ভালো যাচ্ছে না। খুবই নাজুক। প্যালেস্টাইনে যাওয়ার স্বপ্ন তাই দু'জনের বুকের মধ্যে ডানা ঝাপটালেও কতদূর কী হবে, এখনই বলা মুশকিল। ডোরার সঙ্গে যখন দেখা হয়েই গেল, কাফকা চাইছেন যতদিন সম্ভব বার্লিনে থাকবেন। দশ বছর ধরেই তো তিনি ভাবছেন জার্মানির রাজধানীতে চলে আসবেন। দশ বছর আগে তার বয়স যখন তিরিশ, ভেবেছিলেন, যদি বার্লিনে যাওয়া সম্ভব হয়, স্বাধীন হতে পারব আমি, একদিন একদিন করে এগুবে জীবন। যদি ক্ষুধার্তও থাকতে হয় তবু ফিরে পাব আমার সমস্ত জীবনীশক্তি। চেষ্টাও করেছিলেন অনেক। কিন্তু বন্ধুদের বুঝিয়ে-সুঝিয়েও কাজ হয়নি। বার্লিনে পাড়ি দিতে পারেননি। একা যাওয়ারও সাহস হয়নি। শারীরিক সমস্যাই বড় বাধা। তা ছাড়া বোনেরা তার দেখাশোনা করে। যত্নআত্তি করে। তাদের ছেড়ে তো যাওয়া যায় না।

ডোরাই এই সমস্যার সমাধান দেয়। একেবারে যথাযথ সমাধান। তিন বছর ধরে আমি বার্লিনে আছি। বার্লিনের সবকিছু আমি চিনি। বার্লিনে থাকার ব্যাপারে আমিই তোমাকে সাহায্য করবো। কম ভাড়ার একটা ফ্লাট ভাড়া করবো। সেই ফ্লাটে থাকার জন্য যা যা দরকার আমি করবো। সব দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও। ডোরার কথা শুনে কাফকার বাদামি চোখে সোনালি ঝিলিক। ইতিমধ্যে ডোরা আরও ভালো করে হিব্রু শিখতে শুরু করেছে। ভর্তি হয়েছে 'অ্যাকাডেমি অফ হিব্রু স্টাডিজে'। কাফকা বার্লিনে এলে তাকে সেখানে ভর্তি করিয়ে দেবে। দু'জনে একসঙ্গে হিব্রু শিখবে। কাফকাকে কখনও একা থাকতে হবেনা। কী দারুণ প্রস্তাব। কী চমৎকার সুযোগ। দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণের হাতছানি। জীবনে যদি সত্যি সত্যি বাঁচার মতো বাঁচতে হয়, তাহলে এভাবেই বাঁচবো। ডোরার প্রস্তাবটা কাফকা কি তাই আর ফিরিয়ে দিতে পারে?

৩

বাল্টিক সাগরের নীল জল উঠে আসছে সৈকতে। এখানেই সমুদ্রের খুবকাছকাছি দুটো চেয়ারে এসে বসেছে কাফকা আর ডোরা। অপরাহ্নের এই সময়টাতে কাফকার শরীর কিছুটা ভালো থাকে। এ কদিনে ডোরা সেটা বুঝে গেছে। গ্রীষ্মের ঝলমলে এই বিকালে কাফকার মনটাও বেশ ভালো থাকে। কিন্তু গোধূলির ধারালো আলোতেও তার মুখে আজ বিষণ্ণতার দুর্বহ ছায়া। দৃষ্টি দূরদিগন্তের দিকে। সেখানে যতদূর চোখ যায়, নীল-সবুজ পানি। আকাশটাও কী স্বচ্ছ। নিচে সমুদ্রের জলপৃষ্ঠ ছুঁয়ে একঝাক সীগাল উড়ছে। ডোরার ইচ্ছে হলো কোলের ওপর বিছিয়ে রাখা হাতটা দিয়ে কাফকার একটা হাত ধরবে। তাতে যদি বিষণ্ণতার কিছুটা উপশম হয়। কিন্তু কাফকার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিতেই শরীরটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো ডোরার। কাফকা চোখের কোণ দিয়ে হাতার আবছায়া নড়ে ওঠা দেখলো। শান্তভাবে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো,

-কী, থমকে গেলে কেন?

-না, কিছু না। তোমার মনটা ভালো নেই, তাই ভাবলাম...।

-ঠিকই ভেবেছো।

-কাল তোমাকে ফিরে যেতে হবে, তাই তো?

-হ্যাঁ, সে তো তুমি জানই।

-তিন সপ্তাহের মতো হয় আমি এসেছি। তোমার সঙ্গে পরিচয় সেই দ্বিতীয় দিনেই।
-কিন্তু তুমি ফিরে গেলেও খুবশিগগির তো আবার আসছ।
-আসছি, কিন্তু যেতে তো হচ্ছে। প্রাহাতে কীভাবে কাটবেআমার দিনগুলি সে তো তুমি জানই। বলেছি তোমাকে।
ডোরার হাতটা নিজের ডান হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আলতো করে কাফকা আঁকড়ে ধরলেন। দু'জনেই নীরব। সামনের ডুবন্ত সূর্যের মতো অনাদিকালের নৈঃশব্দ্যের গহনে দু'জনেই যেন ডুবে গেল।
এরকমই হচ্ছে। তিন সপ্তাহের মতো হয় কাফকা মুরিৎসে এসেছে। এখানকার ইহুদি ধর্মসম্প্রদায় পরম সমাদরে তাকে আতিথ্য দিচ্ছে। তিনিও বাচ্চাদের অনানুষ্ঠানিক ক্লাস নিচ্ছেন। তাদের গল্প শোনাচ্ছেন। এরকম একটা জায়গায় ডোরার মতো কোনো নারীর সঙ্গে দেখা হবে, কস্মিনকালেও সেটা ভাবেননি। কাল কাফকা ফিরে যাবেন প্রাহায়। গত কয়েকদিন ধরে একটা বিন্দুতে এসে তাদের কথাগুলি স্থির হয়ে যাচ্ছে। দু'জনে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কাফকা কদিন পর প্রাহায় জমে থাকা কিছু জরুরি কাজকর্ম সেরে মুরিৎসে ফিরবেন। মুরিৎস থেকে একসঙ্গে যাবেন বার্লিনে। দু'জনে থাকবেসেখানেই। এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেয়াটা কী সহজ ছিল ডোরা জন্য? বা কাফকার? ডোরা কখনও কোনো পুরুষের সঙ্গে থাকেনি। যুদ্ধশেষের আধুনিক বার্লিনে সে যে-কোনো পুরুষের সঙ্গে থাকতে পারতো। প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত কোনো নারী ও পুরুষ একসঙ্গে বাস করলে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু শহরের বাইরে এটা ঠিক ভাবা যায় না। ওখানে কেউ এভাবে থাকাটা বাঁকা চোখেই দেখবে। বাজেভাবেনেবে। আর বেদজিনে, সেই পিতৃভূমিতে ব্যাপারটা জানাজানি হলে রক্ষে নেই। চিরদিনের মতো ডোরার সুনাম ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে। কুৎসা রটবে। কাফকাও কি কখনো কোনো নারীর সঙ্গে থেকেছে? না, থাকেননি। বাড়ির বাইরে তার যেটুকু থাকা সে ওই বোন ওত্তেলার বাড়িতে। কাফকা যে নপুংসক তাও তো নয়। তিন-তিন বার এনগেজমেন্ট হয়েছে। দুইবার আবার একই নারীর সঙ্গে। সেই নারী হচ্ছে তার প্রথম প্রেম ফেলিস। কাফকা তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। বিয়েও করতে চেয়েছেন। এনগেজমেন্টও হয়েছে। কিন্তু দুইবারই তিনি সেই এনগেজমেন্টের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেন। প্রিয়তমা ফেলিসকে বিয়ে করেননি। অবিবাহিতই আছেন। কিন্তু অবিবাহিত থাকতে কী ইচ্ছা হয়? সর্বনাশটা ঘটে ডোরার সঙ্গে দেখা হওয়ার ছয় বছর আগে। মারাত্মক সেই রোগটা ধরা পড়ে। যক্ষা। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে তার জীবনটাকে তছনছ করে দেয়। কারুর শরীরে এরকম একটা রোগ বাসা বাঁধলে কি আর বিয়ে করা যায়? বিয়ে করার মতো শরীর বলে কিছু কি থাকে? কাফকা এসবঠিকই বুঝতে পারেন। কে জেনেশুনে মৃত্যুপথযাত্রী একজন যক্ষ্মার রুগিকে বিয়ে করবে? কোন বাবা এরকম একজন পুরুষের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবেন? কী মেয়ে, কী বাবা, কেউ-ই এরকম ঝুঁকি নেবেন না। মেয়ের বিধবা হওয়ার ঝুঁকি। কেননা যক্ষা মানেই তো অবধারিত মৃত্যু।
কিন্তু ইচ্ছে তো হয়। বাসনা তো জাগে। কাফকা অনেকবার এ নিয়ে ভেবেছেন। কিন্তু যতবারই ভাবেন ততবারই মনে হয় বাবা হতে পারলে মন্দ হতো না। মনে পড়ে পবিত্র তৌরাতের সেই কথাটা, বউ ছাড়া কোনো পুরুষই পুরুষ নয়। পুরুষের বউ থাকবেনা, তাও কি কখনো হয়। কিন্তু আর দশজন পুরুষের মতো কাফকা নন। বিয়ে না হয় করা গেল। কিন্তু লেখালেখি? লেখালেখির জন্য যে সময়টা দিতে হবে তা কী করে দেবেন? বিয়ে করার মতো সুস্থ-সমর্থও তো নই। হায় ঈশ্বর, এ কেমন যুদ্ধ! নাকি অজুহাত? মধ্যবিত্তের ভাবনাটাই ভর করে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন, বিয়ে করবেন না। তবু ভাগ্নি গের্তির যেদিন জন্ম হলো সেই রাতে ডায়রিতে লিখলেন, 'ঈর্ষা, বোনের প্রতি আমার তীব্র ঈর্ষা জাগছে, অথবা ওর স্বামীর প্রতি, কীভাবেবাবা হয়ে গেল, কিন্তু আমি কখনও বাবা হতে পারবো না।'
কিন্তু ডোরা মেয়েটা তো সবকিছু ওলোটপালট করে দিচ্ছে। ডোরার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কাফকা বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করলেন। এমনকি বাবা হওয়ার সুপ্ত ইচ্ছেটাও ডানা মেলতে শুরু করলো। ডোরার স্বাধীনতা, তার আকর্ষক তারুণ্য, উদ্যম, ভয়হীন মানসিকতা, তার প্রতি ডোরার ভালো লাগা ও মুগ্ধতা কাফকাকেও সাহসী করে তুললো। জীবনে বাঁচার মতো বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। 'প্রিয় বন্ধু মিলেনা, মিলেনা এসেনস্কা, তোমাকেই বলি।' কদিন আগে অনেক রাত অব্দি সমুদ্র সৈকতের সেই জায়গাটাতে ডোরার সঙ্গে সময় কাটিয়ে ঘরে ফিরে মিলেনাকে লিখলেন, 'মিলেনা, তোমাকে সেই কবে হারিয়েছি। কিন্তু এই জুলাইতে দারুণ সবঘটনা ঘটছে। জীবনে কত মধুর ঘটনা যে ঘটে। আমি এখন মুরিৎসে, বোনের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি। হ্যাঁ, প্রাহা থেকে দূরে। শুরুতে খুবসন্দিহান ছিলাম। কী না কী ঘটে। কিন্তু বিস্ময়কর কতকিছু যে ঘটছে আমার জীবনে। তুমি তো জানো আমার স্বপ্নের কথা। তোমাকে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার। সামনের অক্টোবরে আমি জেরুজালেমে যাবো। মনস্থির করেছি। আমার মন থেকে এই ভাবনাটা কখনো সরে না। হ্যাঁ বলতে পারো, এটা এক ধরনের ফ্যান্টাসি। ফ্যান্টাসিই বলবো। আমার মন থেকে কখনও মুছে যায় না। আর তাই যদি হয় তাহলে আমি প্যালেস্টাইনে যাবোই-বা না কেন?
-চলো, রাত হচ্ছে। ডোরার কথায় স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরলেন কাফকা।
-আমরা কিন্তু বার্লিনে যাবো। একসঙ্গে থাকবো। কথাটা মনে আছে তো তোমার?
-আছে। ডোরার শান্ত জবাব। ভেতরে ভেতরে ডোরা বেশ উৎফুল্ল।
-আমি কিন্তু কখনই এটা ভাবিনি, কারো সঙ্গে একসঙ্গে থাকবো, তাও আবার বার্লিনে। বার্লিন থেকে প্যালেস্টাইনে, সেই স্বপ্নটাই ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে।
-তুমি যা চাইছো তাই হবে। আমিও তো এরকমই একটা স্বপ্ন দেখি।
-জানো, কাফকা বলে চলেন। আগে অনেকবার বার্লিনে থাকার কথা ভেবেছি। কিন্তু শুধু বার্লিন কেন, পৃথিবীর কোথাও আমার একা থাকা সম্ভবহবেনা। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় কেমন যেন বদলে যাচ্ছে।
দু'জনে উঠে পড়লেন। অপরাহ্নের সমুদ্র সৈকতের তপ্ত হাওয়াটা এখন আর নেই। ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই বাতাসটা কাফকার শত্রু। একেবারেই সহ্য হয় না। গলাটা কেমন যেন ধরে আসে। শুধু কাফকা নয়, ডোরার জীবনটাও বদলে গেছে। দুরাশার যে একক জীবন ছিল, সেখানে এখন এক পুরুষ। দুরাশার কুয়াশা সরে গিয়ে দেখা দিচ্ছে স্বচ্ছ নীলাকাশ। এই রাতের মতো আবার সেই আকাশটা কালো হয়ে উঠবেনা তো? ডোরা ভাবলো, প্যালেস্টাইনে যাওয়াটা তার কাছে স্বপ্ন নয়। কাফকাকে সঙ্গে নিয়েই প্যালেস্টাইনে যাবো। ওর শরীরটা একটু ভালো হোক। কাফকাই আমার সামনে খুলে দিয়েছে স্বপ্নের পৃথিবী।
-স্বপ্ন, সেই স্বপ্নটা চোখের পাতায় ভর করছে, কাফকা।
-আমার হাতটা ধরো, ডোরা।
-ধরছি। তুমিও তোমার চোখ দুটো বন্ধ করো। কয়েক মুহূর্ত আমাকে জড়িয়ে থাকো।
সৈকতের গাছগুলির শাখা-প্রশাখার ভেতর দিয়ে এখন জোরে বাতাস বইছে। সরসর শব্দ হচ্ছে। ঝাউপাতাগুলি তিরতির করে কাঁপছে। কাঁপছে, নীরবেএকে অন্যকে জড়িয়ে থাকা দু'জন নর-নারী।

পাবিয়ানিস, পোলান্ড, ১৮৯৮

কোন এক দূরদেশ থেকে কোথায় এসে পড়েছে ডোরা। ভাবলে বিস্ময় জাগে। কিন্তু এই যে জীবন, সে তো স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে। দাদির কাছেই ডোরা নিজের জন্মের কথা শুনেছিল। শীতকাল। সেবার তীব্রশীত নেমেছিল চরাচর জুড়ে। একটা শতাব্দী তখন শেষ হয়ে আসছে। কাফকাকে কদিন আগে তার নিজের প্রায় সবকথাই ডোরা বলেছে। কাফকা তো এমনিতেই মনোযোগ দিয়ে সবার সবকথা শোনে। ডোরার কথা শোনার সময়েও, ডোরা দেখলো, চোখে-মুখে ফুটে উঠছে উৎকণ্ঠিত কৌতূহল।
অল্পবয়সী এক দম্পতি। হর্ন আরোন ডিয়ামেন্ট ও ফ্রাজদা ফ্রিদ ডিয়ামেন্ট। একজনের বয়স চব্বিশ, আরেকজনের পঁচিশ। পোলান্ডের পাবিয়ানিসে তারা থাকেন। বিশশতক শুরু হওয়ার বছর দুই আগের কথা। জন্ম হলো এক কন্যাশিশুর -দরজা ডিয়ামেন্ট। এই দরজাই হচ্ছে আজকের ডোরা। পারিবারিক পদবী ডিয়ামেন্ট। কিন্তু এই পদবীটি আরও কতভাবে যে লেখা হয়, উচ্চারিত হয়। ডোরা যখন জার্মানিতে এসে অভিবাসী হিসেবেনাম লেখালো তখন সে নিজের নাম লিখলো ডোরা ডায়মন্ট। কাফকার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রথম মুহূর্তে এই নামটাই সে কাফকাকে বলেছিল। দাদির কাছেই ডোরা জেনেছিল তার স্বামী, অর্থাৎ ডোরার দাদা ছিলেন তাঁতি। ছয় সন্তানের এই জননীর এক সন্তান ছিলেন ডোরার বাবা। পরিবারে চলছিল ইদ্দিশ ভাষার। মায়ের একটা ইদ্দিশ নামও ছিল। দাদি তাকে সেই নামেই ডাকতেন -ফ্রিদেল। ডোরার আগে জন্ম হয় এক ভাইয়ের। তার নাম ডেভিড। এরপর জন্ম হয় আরও চার ভাইবোনের। বাচ্চা জন্ম দিতে দিতেই মায়ের মৃত্যু হলো। সে যে কী দুঃসহ সময় গেছে। কিশোরী ডোরার ওপর ছোট-ছোট ভাইবোনদের দায়িত্ব এসে পড়লো। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আরেকটা শহরে চলে এলেন। জায়গাটার নাম বেদজিন। রুশ সীমান্তঘেঁষা মধ্যযুগীয় পুরনো ঐতিহ্যবাহী শহর। এর একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে একটা প্রবাহিত নদী। শহরটিতে মূলত ইহুদিদের বসবাস। এই শহরেই আছে ইহুদিদের একটা বিশাল সিনেগগ। প্রতি শুক্রবারে এই উপাসনালয়ে মানুষের ঢল নামে।

ডোরার বাবা ছিলেন এর সঙ্গে যুক্ত। প্রচুর বই পড়তেন। লোকে তাকে ভীষণ সমীহ করতেন। সারাজীবন দারুণ একটা কাজ করে গেছেন বাবা। প্রতি শুক্রবার গরিবমানুষদের বাড়িতে এনে খাওয়াতেন। ভীষণ দয়ালু আর অতিথিপরায়ন ছিলেন তিনি। কিন্তু তার একটা জিনিস ডোরা পছন্দ করতো না, আর সেটা হলো তার রক্ষণশীলতা। তৌরাতে বর্ণিত বিধিনিষেধগুলোকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তৌরাতেই যেহেতু নতুন কোনো ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করা যাবেনা বলা হয়েছিল, বাবাও সেটাকে অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করতেন। কিন্তু সমাজে তখন নতুনত্বের হাওয়া বইছে। সবক্ষেত্রেই তরুণরা ঢুকে পড়ছে- শিল্পে-সাহিত্যে, রাজনীতিতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। বার্লিন, ভিয়েনা, প্রাহা, বুদাপেস্ট, ওয়ারশতে ঘটছে বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের উত্থান। বেদজিনেও এর ঢেউ এসে লাগলো। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেওয়া ডোরা এই নতুনত্বের কেতন ওড়ানোদের দলে ভিড়ে গেল। ভিড়বেই না কেন? সে তো সবসময়ই প্রথাবিরোধী একটা মেয়ে। দ্রোহী বললেও ভুল হবে না। স্কুল পেরিয়েই সে পড়ে ফেললো গোর্ট্যে ও দস্তোয়েভস্কির লেখা। এদের সেকুলার সাহিত্য তাকে সংস্কারমুক্ত আর আধুনিক করে তুললো। কোনো কোনো দেশের নারীরা তখন ভোটাধিকারও পেয়ে গেছে। যুগের এই হাওয়াই তাকে অনেকটা বাঁচিয়ে দিল। অল্প বয়সে মেয়েদের যে বিয়ে দেওয়া হতো, ডোরা তা থেকে রক্ষা পেল।

-জানো, আমার এক শিক্ষক ছিলেন। তিনিই আমাকে বদলে দেন। অবশ্য বদলে দেন না বলে বলা উচিত গড়ে দেন।

-কি নাম ছিল সেই শিক্ষকের?

-ডেভিড মালেজ। তার কাছেই আমি প্রথম হিব্রু শিখি। বাবা এটা পছন্দ করতেন না। বাবা মনে করতেন হিব্রু একটা পবিত্র ভাষা। মেয়েরা শিখলে অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু আমার সেই শিক্ষক একদিন আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে কী কী যেন বোঝালেন। বাবা এর পর থেকে হিব্রু শিখতে আর বাধা দেননি।

কিন্তু সর্বনাশা এক যুদ্ধ সবকিছু তছনছ করে দিল। সে তো এখন ইতিহাস। তুমিও জানো। ডোরা তবু বলে চলে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সম্রাট আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড খুন হলে বেশকিছু ইউরোপীয় রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার। বেদজিন যদিও কখনও যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি, আমি তবু যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তরুণদের দলে যোগ দিলাম। সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম। হিব্রু ভাষার সঙ্গে তো আগেই পরিচয় ঘটেছিল। এবার একটা প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডের স্বপ্ন বুকের মধ্যে লালন করতে থাকলাম। সারা জীবন এই স্বপ্নই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ডোরার যেমন স্বপ্ন ছিল, তেমনি স্বপ্নভঙ্গও ঘটলো। বড় ভাই ডেভিড বিয়ে করলেন। সেই আনন্দের রেশ কাটতে-না কাটতেই বিয়ে করলেন বাবা। ডোরার বয়স তখন কুড়ি। তারও বিয়ের কথা উঠলো। ডোরা বিয়ে করবেনা বলে জানিয়ে দিল আর থিয়েটারে অভিনয় করা শুরু করলো। কিন্তু বাবা মেয়েকে ফিরিয়ে আনার অন্য পথ ধরলেন। বিখ্যাত কারকো শহরে ডোরাকে নিয়ে গিয়ে এমন একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন যেখান থেকে পাশ করলেই ধর্মশিক্ষকের চাকরি জুটে যাবে।

কারকোতে থাকার সময়েই ডোরা জেনে যায় কীভাবে পোলান্ডে ইহুদিনিধন হয়। মুক্ত পোলান্ডের যে স্বপ্ন সে দেখতো, সেটা তার মাথা থেকে উবেযায়। ডোরা বুঝতে পারলো এই স্কুলটা তার জন্যে নয়। স্কুলের মেয়েদেরকেও তার ভালো লাগতো না। এক ভোরে ছোট্ট একটা সুটকেস নিয়ে কাউকে কিচ্ছু না বলে ডোরা স্কুল ত্যাগ করলো। এসে পৌঁছুলো জার্মানির বেসলাউ শহরে। বাবা তাকে খুঁজতে শুরু করলেন। পেয়েও গেলেন একসময়। আবার তিনি ঢুকিয়ে দিলেন সেই স্কুলে। কিন্তু কয়েক মাস পরেই ডোরা আবার পালালো। কিন্তু এবার ধ্বস্ত বাবা তাকে খুঁজতে বের করার কোনো চেষ্টাই করলেন না।

ডোরা আবারও বেসলাউতে এলো। যে-পথ দিয়ে বেসলাউতে সে ঢুকেছে, সেই পথটাই সোজা চলে গেছে বার্লিনে। এই শহরের অনেককেই ডোরা চিনতো। বেসলাউ আসলে ইহুদিদেরই শহর। এই শহরে ডোরা একবছরের মতো থাকলো। বাচ্চাদের একটা স্কুলে কাজও জুটে গেল। শুরু করলো জার্মান শেখা। সাহিত্যিকদের সঙ্গে সখ্য হলো। বেশ কয়েকটা সাহিত্যগোষ্ঠীর সদস্য হলে অনেক লেখকের সঙ্গেই পরিচয় ঘটলো। সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতিতেও ডোরা এই সময় জড়িয়ে পড়ে। ১৯২০ সালে চলে এলো জার্মানির রাজধানী বার্লিনে। এই শহরেই তখন বাস করছিল সবচেয়ে বেশি ইহুদি। বার্লিনই হচ্ছে জার্মানি ও ইউরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর। আধুনিক সংস্কৃতিচর্চা, শিল্প ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে শহরটির অবস্থান শীর্ষে। ব্যক্তিস্বাধীনতা এখানো অবারিত। মুক্তিচিন্তার সুযোগ অনেক বেশি। এসব দেখে ডোরা ভীষণ মুগ্ধ। কাফকা ডোরার কথা শুনতে শুনতে ভাবলেন, মেয়েটা সত্যি সত্যি স্বাধীন। এরকম একজনের অপেক্ষাই তো করছিলেন তিনি। কিন্তু এতকিছুর পরেও বার্লিনের ইহুদিরা সুখে নেই। শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি নানা দিক থেকে তারা এগিয়ে। কিন্তু পদে পদে বাধা। একসময় তারা খুবভালো সুতা তৈরি করতো। আইন করে তাদের কাছ থেকে সুতা কেনা নিষিদ্ধ করা হলো। ব্লাক ডেথের জন্যে ইহুদিদের দায়ী করা হলো। শহর থেকে তাদের তাড়িয়ে দিল। কয়েক শো বছর ধরে এরকম চলার কারণে ইহুদিদের সংখ্যা অনেক কমে গেল। কিন্তু সংখ্যা কমলে কি হবে, শিল্পসংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে তাদেরই প্রাধান্য। বড় বড় বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও সংবাদপত্রের মালিক তারাই। জার্মানির রাজনীতিতেও তারা ঢুকে পড়লো। বার্লিনের সংস্কৃতি মানেই ইহুদিদের সংস্কৃতি। ডোরা এখানে আসার পর এসব জেনেছে। কিন্তু কাফকা জানতেন আগেই। বার্লিন তাই কাফকার প্রিয় শহর। এতটাই প্রিয় যে, এখানেই তিনি থাকতে চান। তারপর পাড়ি দেবেন জেরুজালেমে।

৩

এক সপ্তাহের মতো হয় কাফকা মুরিৎস থেকে প্রাহায় এসেছেন। এসেই ডোরাকে পোস্টকার্ডে একটা চিঠি লিখলেন। চিঠি তো নয় যেন কথার পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হলো। ডোরাই এখন তার হৃৎস্পন্দন। দুদিন পর ডোরা চিঠিটা পেল। প্রিয়তমা ডি, আমি ঠিকসময়ই প্রাহায় পৌঁছেছি। কিন্তু আমার মন পড়ে আছে সেই সমুদ্রসৈকতে। ভালোবাসার যে উষ্ণ আলিঙ্গনে তুমি আমাকে বেঁধেছো, সেই আলিঙ্গনের ছোঁয়া আমি সারাক্ষণ অনুভবকরছি। দুদিন পর আমি বার্লিন যাবো। ওখানে সবকিছু ঠিকঠাক করে আবার ফিরবো প্রাহায়। তারপর জরুরি কিছু কাজ সেরে বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একেবারে বার্লিন চলে যাবো। আমি যে বার্লিন যাবো, একথা কাউকে এখনো বলিনি। ততদিনে তুমিও তোমার কাজগুলি গুছিয়ে নিয়ে বার্লিন চলে এসো। এখানকার আবহাওয়াটা খুবভালো যাচ্ছে না। আমার মনের গহনে যে পুষ্পবৃষ্টি ঝরছে, তাই দিয়ে তোমার উৎকণ্ঠিত হৃদয়টাকে শান্ত করতে ইচ্ছে করছে। প্রিয়তমা। ইতি তোমার কে.।

দেখতে দেখতে তিন সপ্তাহ চলে গেল। ডোরার দিন কাটছে মুরিৎসে। সেই শিশুদের হোমে। আগস্ট মাসের শেষে ডোরা বার্লিন যাবে। একটা ফ্লাট তাই ডোরাকে খুঁজে বের করতে হবে। ভাড়া বেশি হলে চলবেনা। আবার চমৎকার পরিবেশও যাতে পাওয়া যায় সেটাও দেখতে হবে। ডোরার আগে কাফকার অবশ্য বার্লিনে যাওয়ার কথা। ডোরার জন্যে অপেক্ষা না করে সে নিজেই একটা ফ্লাট দেখবে। তারপর ডোরাকে জানালে ডোরা গিয়ে উঠবে। এরকমই কথা হয়ে আছে। কাফকা মুরিৎস ছেড়ে প্রাহায় চলে যাওয়ার আগে দু'জনে কথা বলে এরকমই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কাফকা ঠিক সময়েই প্রাহায় পৌঁছালো। তার ইচ্ছে প্রথমে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। তারপর তাদের জানিয়ে বার্লিন যাবে। কিন্তু প্রাহায় ফিরেই কাফকা জানতে পারল ওরা ছুটি কাটাচ্ছেন। যেখানে বেড়াতে গেছেন সেই জায়গাটার নাম মেরিনবাদ। এদিকে প্রাহার আবহাওয়া দিন দিন দ্রুত খারাপ হচ্ছে। বার্লিন যাওয়ার আগে বন্ধু ব্রডের সঙ্গেও দেখা হওয়া দরকার। কিন্তু ব্রড এখন কার্লবাদে। একটা কনফারেন্সে ব্যস্ত। কাফকার ইচ্ছে হলো কার্লবাদে গিয়েই ব্রডের সঙ্গ দেখা করবে। এরপর প্রাহায় ফিরে এসে বার্লিন রওনা হবে। এদিকে ডোরার জন্যেও কাফকার উৎকণ্ঠা বাড়ছে। মেয়েটা না জানি কী ভাবছে। এখন তো কাফকার বার্লিনে থাকার কথা।

আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন। একটা পোস্টকার্ডে কাফকা ডোরাকে চিঠি লিখলেন। ডোরার কাছ থেকে কত দূরে আমি। এখানে তোমার মতো যত্নআত্তি করার মতো কেউ নেই। মানসিকভাবেধ্বস্ত কাফকার শরীর ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। যতদিন মুরিৎসে ছিলেন, যতদিন বাল্টিক সাগরের হাওয়া গায়ে লেগেছে, ততদিন খারাপ বোধ করেননি। কিন্তু সেখান থেকে ফেরার পর গত তিন সপ্তাহে শরীর অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। বার্লিনে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চান না। ব্রডকে লিখলেন, 'এই মুহূর্তে আমার বার্লিনে যাওয়া ঠিক হবেনা। দিনগুলো কেমন কাটছে তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। এক-একটা মুহূর্ত যায় আর আমি আরও একা হয়ে পড়ি। আরও একা, বন্ধু।'

শরীর নিয়ে কাফকা সবসময়ই চিন্তিত। একসময় যখন রোগটা ধরা পড়েনি, তখনও কী জানি কী হচ্ছে মনে করে আতঙ্কিত থাকতেন। আর এখন তো কথাই নেই। তাপ বাড়ছে শরীরের। প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়ছে। মাথাব্যথাটাও প্রচণ্ড কষ্ট দিচ্ছে। সেই সঙ্গে কাশি। ইনসমোনিয়া বাড়তে বাড়তে এমন হচ্ছে যে পুরা শরীরটাই বুঝি ভেঙে পড়বে। বেঁচে থাকাটা এত কষ্টের, কে জানত। নিজের ঘরে নিঃসঙ্গ কাফকা একটু একটু করে যেন নিঃশেষ হয়ে

যাচ্ছেন। কদিন আগে ব্রডকে চিঠি লিখলেন, কিন্তু তারও দেখা নেই। প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্য পেলে হয়তো কিছুটা ভালো লাগতো। ভাবলেন, না, ব্রডকে আবার একটা চিঠি লিখতে হবে। অন্য দিনগুলোর মতো আবারও একটা রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। ভোর হয়ে আসছে অথচ চোখে ঘুম নেই। যে ছোট্ট টেবিলটাতে বসে কাফকা লেখালেখি করেন, সারা রাত সেখানে বসে থাকলেন। চেষ্টা করলেন কিছু লিখবার। এক-একবার যন্ত্রণায় টেবিলের ওপর মাথাটা নুয়ে এলো। বিছানায় গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘুম আসছে না। গ্রীষ্মের রাত। গুমোট আবহাওয়ায় অস্থিরতা বেড়েই চললো। ঢং ঢং ঢং... দেয়াল ঘড়িতে তিনটে বাজার সংকেতধ্বনি শুনলেন। না, এবার যে করেই হোক ঘুমুতে হবে। মনে হলো তৃষ্ণা পাচ্ছে। বিছানা থেকে উঠে টেবিলের ওপর রাখা পানির গ্লাসটা ধরতে গিয়েই থমকে গেলেন। একটা বড়সড় তেলাপোকা। ঠিক গ্লাসটার পাশেই। মানুষের সাড়া পেয়েই তেলোপোকাটা ফরফর করে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে উড়ে পালালো। কত আগে, সেই কবেএকটা গল্প লিখেছিলেন। কোনো রকমে পানির গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে পানি খেলেন। আর এক মুহূর্ত নয়, এবার ঘুমাতে হবে। কোনো রকমে পানির গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে থপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘরের আলো নেভাতেও সাহস হলো না। কিন্তু এ কেমন শোয়া হলো? চিৎ হয়ে! কাফকা পাশ ফিরে শোয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাথাটা ঝোকাতেই মাথার ব্যথাটা যেন বাড়লো। আবার তিনি চিৎ হয়েই শুয়ে থাকলেন। এই বাড়িতে ব্রডের যাতায়াত একেবারেই অবারিত। ব্রড যখন কাফকার ঘরে ঢুকলেন তিনি তখনও বিছানায়। রাতে তো একেবারে ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে তাই চোখ বুঁজে আসছিল।

-কি হয়েছে তোমার বলতো? ব্রডের আগমনে কাফকার ঘুম ভেঙে গেছে। তবু বিছানা থেকে তার উঠতে ইচ্ছা করলো না। বললেন,

-তুমি তো জানই। তোমাকে চিঠিতে লিখেছি। শরীরটা একেবারে ভালো যাচ্ছে না।

-সে তো লিখেছো, ব্রড হাত বাড়িয়ে কাফকার কপালে হাত রাখলেন। হুম, গাটা দেখছি গরম। ওষুধ খাচ্ছ?

-খাচ্ছি। ব্রড দেখলেন টেবিলের ওপর একগাদা ওষুধ। কদিন আগে তুমি মুরিৎস ঘুরে এলে। সেখানে তোমার দিনগুলো নিশ্চয়ই ভালো কেটেছে?

-হ্যাঁ, কেটেছে। সাহসও বেড়ে গেছে। এতটা সাহস, এতটা উদ্দীপনা, আমি কখনই অনুভবকরিনি।

ব্রড দেখলেন, এই সাতসকালে কাফকার বিষণ্ন চোখ থেকে প্রত্যাশার হিরকদ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। কথার তোড়ে অবসাদগ্রস্ত শরীর আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কাফকা বললেন, সবকিছু ছিন্ন করে আমি বার্লিনেই যাবো। ডোরার সঙ্গে থাকবো। এ ছাড়া, ব্রড, আমার সামনে আর ভালো হয়ে উঠবার, ভালো থাকার, অন্য কোনো পথ খোলা নেই। মেয়েটিও দারুণ। আমাকে অনেক ভালোবাসে। আমি তো বাঁচতে চাই। আমার এই বেঁচে থাকা আমার লেখালেখির জন্যে। এসবতুমি জানো।

কথাগুলো বলতে বলতে কাফকা যেন কিছুটা বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। ব্রড এতক্ষণ বিছানার ওপরে বন্ধুর খুবকাছে বসে কথা বলছিলেন। কাফকার বিষণ্নতা দেখে উঠে গিয়ে ঘরের একটা জানালা খুলে দিলেন। ওই জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে সকালের সূর্যের আলো ঢুকে পড়লো। এরই একচিলতে এসে পড়লো কাফকার মুখে। ব্রড দেখলেন কাফকার মুখের অর্ধেক অংশ আলোকিত হয়ে আছে, অর্ধেক অন্ধকারে ঢাকা। আমার কি মনে হয় জানো, তুমি শুধু শুধু উদ্বেগে ভোগো, ব্রড বললেন। রাজ্যের যতসবভুতুড়ে চিন্তা তোমার ওপর ভর করে। তুমি যতটা না অসুস্থ, তার চেয়ে ভাবো বেশি। এই ভাবাভাবিটা তুমি বাদ দিতে পারো না? ব্রডের কথা শুনে কাফকার মনটা আরো বিষণ্ন হয়ে গেল।

-মুশকিলটা হলো, সবাই এটা মনে করে। অসুখের চাইতে অসুখ নিয়ে আমি নাকি ভাবি বেশি। তুমিও তাই বললে। কিন্তু আমার শরীর আমার চাইতে আর কে ভালো বুঝবে? তবেবার্লিনে গেলে দেখো, আমি ভালো হয়ে যাবো।

-কিন্তু বাবা-মাকে ছেড়ে ওই শহরে যাওয়াটা কি তোমার ভালো হবে? আর বোনেরাও তো এখানে থাকলে তোমার খোঁজ-খবর নিতে পারে। তুমি বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে ওরা এখানে এসে তোমার দেখাশোনাও করতে পারে।

-হ্যাঁ, বাবা-মাকে ছেড়ে গেলে আমার জীবনে কী ঘটবেজানি না। তবেবাবার শৃঙ্খল থেকে আমি বেরুতে চাই। তিনি আমাকে কোনো স্বাধীনতা দেন না। নিজে যা ভাবেন, নিজের সমস্ত সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপিয়ে দেন। জন্মের পর থেকেই এটা চলে আসছে। জন্মের পর থেকেই আমি পরাধীন। বোনেরা ভালো। বিশেষ করে ছুটকি, মানে ছোট আত্তেলা আমাকে বেশ বুঝতে পারে। আমার যত্নআত্তি যদি কেউ করে থাকে সে ওই আত্তেলা। কিন্তু ওরও তো নিজের জীবন আছে। সংসার আছে। সারাক্ষণ তো আমার কাছে পড়ে থাকবেনা। আমি সেটা চাইও-না। একনাগাড়ে এতগুলা কথা বলে কাফকা থামলেন। বেশ কষ্ট হচ্ছে তার। শ্বাসকষ্ট। গলাটা ধরে এলো। দু'জনেই এখন চুপচাপ। কিন্তু কাফকার আরও কিছু কথা আছে যা ব্রডকে বলা দরকার।

-আমরা ঠিক করেছি, আমি আর ডোরা, আমরা একসঙ্গে থাকবো। বার্লিন আমার স্বপ্নের শহর। আমি ওখানে যাবই আর বাকি জীবনটা আমরা একসঙ্গে কাটাবো। হিব্রু ভাষাটা আমি শিখছি। দাঁড়াও তোমাকে হিব্রু একটা আয়াত শোনাই। কাফকা ব্রডকে হিব্রুতে লেখা লিভিটিকাসের একটা অংশ পড়ে শোনালেন। কী গম্ভীর আবেগকম্প্র উচ্চারণ। ব্রড জানেন, কাফকা যখন কিছু পড়েন তখন তীব্র আবেগের সঙ্গেই তা পড়েন। ফলে যে-কোনো সাধারণ লেখাও অসাধারণ পাঠে পরিণত হয়।

-তুমি জানো, মাকেও একটা হিব্রুতে লেখা প্রার্থনার একটা বই এনে দিয়েছি।

ব্রড বুঝতে পারলেন কাফকার হিব্রুপ্রীতি বেড়েছে। আর এটা নিশ্চয়ই ডোরার অবদান। ডোরা সত্যি কাফকাকে বদলে দিচ্ছে। কাফকার আত্মবিশ্বাসটাও কী তাতে বেড়েছে?

ডোরার গল্পে গল্পে রাতে ব্রডের তেমন একটা ঘুম হলো না আর কাফকা তো ইনসমোনিয়ার কারণে জেগেই থাকেন। রাতটা এভাবেই কাটলো। পরদিন ব্রড বিদায় নেওয়ার পর কাফকার শরীরটা আরও খারাপ হলো। শরীরটা কাফকাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এত যে স্বপ্ন, সবমিলিয়ে যাচ্ছে। শরীরের এরকম অবস্থায় তো প্রাহা ছেড়ে যাওয়া যাবেনা। ওজন ক্রমশ কমছে। ছ'ফুটের একটা দেহের ওজন যখন ১১৮ পাউন্ডে এসে ঠেকে, তখন সেই মানুষটাকে কঙ্কাল ছাড়া আর কী বলা যায়? ভাইয়ের খবরটা ওত্তেলা আগেই পেয়েছিল। কাফকার শরীর ভালো যাচ্ছে না। কিন্তু এবার ভাইয়ের বন্ধু ব্রডের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে পরদিনই কাফকাকে দেখতে ছুটে এসেছে। গরমের দিনে আলাদাভাবেভালো থাকার জন্যে ওত্তেলা গ্রামে একটা বাড়ি কিনেছে। সেখান থেকে ছুটে এসে সোজা কাফকার ঘরে। কাফকার দিকে তাকিয়েই বললো, একি হাল করেছো শরীরের। চলো, এখানে আর তোমাকে থাকতে দেবো না। স্কেলেশেনে চলো, আমার বাড়িতে।

কাফকা এই ছোট বোনটাকে দারুণ পছন্দ করে। দেখতে সুন্দরী নয়, কিন্তু কি প্রাণবন্ত, মেধাবী, সংবেদনশীল, সাহসী, স্বাধীনচেতা। সবচেয়ে বড় গুণ, কাফকা দেখে আসছে, অসম্ভবদয়ালু আর নম্র স্বভাবের মেয়ে। যার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা দরকার, ঠিক তেমনটাই করে। বাবাকেও সে ছেড়ে কথা বলে না। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ওর, মানসিক দৃঢ়তাও উল্লেখ করার মতো। প্রচণ্ড কর্তৃত্বপরায়ণ বাবাকেও যখন যা বলা দরকার বলে। স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হলে প্রতিবাদ করে। কোনো কিছু ভালো না লাগলে মেনে নেয় না। অথচ কাফকা স্বৈরাচারী বাবার কোনো কিছুরই প্রতিবাদ কখনো করতে পারলো না। কাফকার চোখে ছোট বোন ওত্তেলা তাই অসাধারণ একটা মেয়ে। ওত্তেলার মতো কেউ নয়।

এলি আর ভ্যালি, অন্য দুটি বোনের স্বভাবএকেবারেই বিপরীত। ওত্তেলার সঙ্গে তুলনাই হয় না। বাবা যখন বিয়ের কথা ভাবলেন। বাবার পছন্দের দুটি পাত্রকেই দু'জন মেনে নিয়ে কিয়ের গাউন পরে রাজি হয়ে গেল। টু শব্দটি করলো না। কিন্তু ওত্তেলা সেরকম মেনে নেওয়ার মতো মেয়েই নয়। ছয় বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর ওত্তেলা সেই ছেলেটাকেই বিয়ে করলো, যাকে সে ভালোবাসতো। ছেলেটার ধর্মও আলাদা -জু নয়, খ্রিস্টান। কিন্তু বাবা প্রথমে যখন ওত্তেলার এই প্রেমিক ডেভিডের কথা জানতে পারলো, তখন কী কাণ্ডটাই না হলো। কাফকার এখনো মনে আছে, বাবা সোজা জানিয়ে দিলেন, এ ছেলেকে বিয়ে করা যাবেনা। ওত্তেলাও কম যায় না। সারাটা দুপুর নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে থাকলো। তারপর সন্ধ্যার একটু আগে ছোট্ট একটা কাঁধের ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। গেল তো গেল, দু'দিন কোনো খোঁজ নেই। যাওয়ার সময় কাফকার টেবিলের ওপর রাখা বইয়ের তলায় ছোট্ট একটা চিরকুট রেখে গেল : 'আমি এক বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছি। তুমি কাউকে কিছু বোলো না। বাবাকে আমি একটা শিক্ষা দিতে চাই। দু'দিন পর জানিয়ে দিও আমি কোথায় আছি। বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে এলেই কেবল আমি ফিরবো।' সত্যি, কী সাহস রে বাবা। যে-বাবার সামনে দাঁড়ালে আমার গলা শুকিয়ে আসে, সেই বাবাকেই কিনা কী শিক্ষাটা সেবার দিল। ওত্তেলার প্রেমে কাফকা কখনো বাধা দেয়নি, বরং প্রশ্রয় দিয়েছে। তোমার হৃদয় যা বলে তুমি তাই করবে। এরকম একটা কথা ওত্তেলাকে সে বলেছিল। কাফকা এই ছোটবোনটাকে আসলে অনেক ভালোবাসে। ডেভিডকে বিয়ে করার আগে ওত্তেলা চাষাবাদ বিষয়ে পড়তে চাইলো। বাবা তাতে আপত্তি জানালেন। কাফকা ওত্তেলাকে বললেন, তুই পড়।

বাবা যদি তোর লেখাপড়ার খরচ না দেয়, আমি দেবো। এরকম কতরকম ষড়যন্ত্রই না দু'জনে করেছে। বাবা-মা আর অন্য দুই বোন সেসব ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি।

একবার ওত্তেলা কাফকাকে তার বাড়িটা দিয়ে দিয়েছিল। আলকেমিস্ট লেনের ওই বাড়িটা ছিল ওত্তেলার ভীষণ সখের আর প্রিয় একটা বাড়ি। তখনও ওত্তেলা আর ডেভিডের বিয়ে হয়নি। বাড়িটা ওত্তেলা কিনেছিল প্রেমিক ডেভিডের সঙ্গে নিভৃত-নির্জনে প্রেম করবার জন্যে। কাফকার তখন দুঃসময় যাচ্ছে। দু-তিন বছর চলে গেল, কিছুই লিখতে পারছেন না। কয়েক দিনের জন্যে কাফকা ওত্তেলার কাছে বাড়িটা ব্যবহারের জন্যে চাইলেন। যদি লেখাটেখা আসে, ওই বাড়িতে থেকে লেখালেখি করবেন। ভাইয়ের এই ইচ্ছের কথাটা শুনে ওত্তেলা একমুহূর্ত দেরি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছে। কিন্তু দিন যায়, কয়েক দিন আর ফুরায় না। দিনের পর আসে মাস। এভাবেই কেটে গেল কয়েক মাস। কাফকার ওখানে ব্রড প্রায়ই আসতেন। একদিন ব্রডকে বললেন, এ হলো একজন প্রকৃত লেখকের যথার্থ গৃহকোণ, যেখানে থাকলে তুমি কিছু না কিছু লিখতে পারবে। কাফকার অনেক দিনের বন্ধ্যাত্ব তখনই কেটে যায়। ওই বাড়িতে থাকাকালে তিনি লিখে ফেলেন তার বেশিরভাগ প্যারাবল আর ছোটগল্প। এখনো যে-লেখাগুলোকে তিনি প্রকাশ করছেন।

হেরমান ও জুলি কাফকার একমাত্র জীবিত পুত্র কাফকা। কাফকার বয়স যখন তিন ও চার বছর, তখন পর পর দুই ভাই -জর্জ ও হেনরিকের জন্ম হয়। কিন্তু দু'জনই বেশি দিন বাঁচেনি। বিমর্ষ বাবা-মা কাফকার লালন-পালনের ভার এক পরিচারিকা আর কাজের লোকদের ওপর ছেড়ে দেন। কাফকার কাছে কখনও তারা ভাইয়ের মৃত্যু নিয়ে কোনো কথা বলতেন না। কাফকা ভাবতেন ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যে তিনিই দায়ী। ভাইদের জন্মের পর ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন বলেই হয়তো তারা অকালে মারা গেছে। কাফকাও ভাইদের জন্যে অনেক সময় বিষণ্নতায় ভোগেন। কিন্তু বোনদের সঙ্গে কাফকার সম্পর্ক অনেক সহজ, সুন্দর। কাফকার তিন বোনের সবাই বয়সে তার চেয়ে ছোট। গত মাসে কাফকা সমুদ্রশহর মুরিৎসে গিয়েছিলেন সবার বড় এলির সঙ্গে। এলিকেই ডোরা কাফকার বউ বলে ভুল করেছিল। কাফকার বয়স যখন ছয়, তখন এলির জন্ম হয়। পরের বছর জন্ম হয় ভ্যালির। এর দুই বছর পরে জন্মগ্রহণ করে ওত্তেলা। এলি ভ্যালির মতো সুন্দরী আর ওত্তেলার মতো সাহসী নয়। কাফকার সঙ্গে তাদের যেমন দূরত্ব আছে, তেমনি মধুরও। কিন্তু বাবার সঙ্গে কোনো বোনের সম্পর্কই ভালো নয়। এলি দেখতে কিছুটা স্থূল। বাবা এ কারণেই এলিকে পছন্দ করেন না। কদিন আগেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটেছিল। রাতের খাবার টেবিলে সবাই জড়ো হচ্ছে। বাবা ও কাফকা আগেই এসে বসেছেন। এরপর ঢুকলো এলি। এলিকে ঢুকতে দেখে বাবা তির্যক চোখে ওর দিকে তাকালেন। এলি যখন চেয়ার টেনে বসতে যাবেতখন বাবার মন্তব্য, 'এই এলি, এ কী মোটা হয়েছিস! থুমসি কোথাকার। টেবিলটা থেকে দূরে গিয়ে বস। টেবিলটা না হলে তো উল্টে যাবে।' কাফকা কথাগুলো নীরবেশুনলো। এ কেমন কথা। তাও বাবার মুখে। বাবা না পারেন ভালো কথা বলতে, না পারেন কৌতুক করতে। ব্যাপারটা কী বিরক্তিকর। কী রুচিহীন।

৪

মাসখানেক হলো কাফকা মুরিৎস থেকে প্রাহায় এসেছেন। ডোরা কথা দিয়েছে বার্লিনে গিয়ে সে একটা বাসা ভাড়া করবে। তারপর দু'জনে একসঙ্গে থাকবে।

মধ্য আগস্ট। ডোরা বার্লিনে এলো। কাফকাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে একটা বাসা খুঁজতে শুরু করলো। কাজটা সহজ নয়, তবু খুঁজে পেতে হবে। আগেও ডোরা বার্লিনে ছিল। তখন কোনো একটা রুম অথবা কোনো একটা থাকবার জায়গা সে ঠিকই খুঁজে পেয়েছে। কখনো একা, কখনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে থেকেছে। একবার বার্লিনের একেবারে কেন্দ্রে মিত্তে নামক একটা জায়গায় ডোরা থাকতো। আরেকবার আশ্রয় জুটেছিল শার্লটবার্গের একটা অনাথ আশ্রমে। এই আশ্রমটি ছিল রাজপ্রাসাদের খুবকাছেই। এখানেই তার একটা কাজ জুটে যায়। গৃহকর্মীদের কাজকর্ম দেখাশোনার কাজ। এরকম অভিজাত এলাকায় সুবিধা মতো বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া সম্ভবনয়। কিন্তু শহরতলিতে পাওয়া সহজ। ডোরা এই শহরতলিতেই কাফকার জন্যে একটা ফ্লাট খুঁজতে থাকলো। কাফকার চাই একটা শান্ত-সবুজ-নির্জন থাকবার জায়গা। খুঁজতে খুঁজতে ডোরা শহরতলীর চমৎকার একটা এলাকার সন্ধান পেল। বার্লিনে থাকতে এখানে ডোরা আগেও এসেছে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তের এই জায়গাটার নাম স্টেগলিৎজ। শহরতলি হলেও পুরো এলাকাটা ছায়াচ্ছন্ন সবুজ বৃক্ষরাজি, বাগান আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনিন্দ্য সুন্দর। এখানেই একটা ওয়েল ফার্নিশড় অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে গেল ডোরা। অ্যাপার্টমেন্টটা ওর এতটা পছন্দ হয়ে গেল যে, সঙ্গে সঙ্গে ভাড়া নিয়ে নিল। যে-রাস্তার ওপর অ্যাপার্টমেন্টটা, তার দুই পাশে সারি সারি সবুজ গাছ। একটু দূরে দূরে বাগান। কোনো কোনোটি ঠিক বাগান নয়, পার্ক। পার্কের পরিবেশটাও দারুণ। এখানে প্রকৃতি অনেক শান্ত নিথর। পাখির কলকাকলি ছাড়া প্রাকৃতিক নৈঃশব্দ্যে এতটুকু চিড় ধরে না। ডোরা নিশ্চিত জানে এই জায়গাটা কাফকার ভীষণ পছন্দ হবে। শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী, যাদের বেশিরভাগই অবসর জীবনযাপন করছে, তাদেরও ভালো লাগবেকাফকার। বার্লিনের কেন্দ্রস্থল থেকে জায়গাটা খুবকাছেই। বাসে এলে তিরিশ মিনিটেই পৌঁছনো যায়। কাফকা তো এরকমই চায়। রুমটা বেশ বড়। এতে যে দুটো জানালা আর দরোজা আছে, সেগুলোও বেশ বড়। ঘরটাতে তাই প্রচুর আলো-বাতাস ঢোকে। ঘরটার লাগোয়া চমৎকার একটা টানা বারান্দাও দেখতে পেল ডোরা। রুমটা চমৎকারভাবেসাজানো। সেই সঙ্গে আছে একটা রান্নাঘর আর বাথরুম। যে রকম ভাড়ায় অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছিলেন সে রকম ভাড়াতেই পাওয়া গেল। বাজেট আর ভাড়াটাও মিলে গেল ঠিকঠাক। আরেকটা কাকতাল ব্যাপারও যে কীভাবেমিলে গেল, ডোরা সেটা ভেবেও রোমাঞ্চিত অনুভবকরলো। কাছেই ডাহলেম গার্ডেনিৎ স্কুল। একসময় এই স্কুলে পড়বার ইচ্ছে হয়েছিল কাফকার। ঘরটাতে ফায়ার প্লেস আছে, আছে রান্নাবান্না করার চুলাও। সবচেয়ে ভালো লাগলো ঘরে একটা পিয়ানো দেখে। কিন্তু এই ঘরে পিয়ানো কী করে এলো? ডোরার এই কৌতুহলটা মেটালেন বাড়িওয়ালি। আগে যে ভাড়াটে ছিলেন তিনি রেখে গেছেন। কথা দিয়েছেন খুবশিগগির পিয়ানোটা নিয়ে যাবেন। কিন্তু এই বিষয়টা ডোরার বেশ ভালো লাগলো। পিয়ানোটাই রুমটাকে একটা দারুণ আভিজাত্য আর নান্দনিক সৌন্দর্য দিয়েছে।

চারদিকের প্রাকৃতিক নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডোরা কানে যেন ভেসে এলো কোনো অপার্থিক অনন্য সুর। সেই সুর, মনে হলো, হয় বাখের অথবা হেইডেনের পিয়ানো সোনাটার। সবখুলে কাফকাকে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখলো ডোরা। প্রিয় আমার, কী দুঃসহ যে লাগছে। তোমাকে ছাড়া কী করে যে এক-একটা দিন আমি যে কীভাবে কাটাচ্ছি, বলে বোঝাতে পারবো না। তুমি যেমনটা চেয়েছিলে ঠিক তেমনটাই পেয়েছি। বার্লিনে বা এর শহরতলিতে এর চেয়ে ভালো কোনো জায়গা আর আছে কিনা আমার জানা নেই। তারপর ওই চিঠিতে অ্যাপার্টমেন্টার বিস্তৃত মনোগ্রাহী বিবরণ। ডোরা আরও লিখলো, আমি তোমার অপেক্ষা করছি। কবেতুমি আসবে, কবেআমরা একসঙ্গে থাকতে পারবো? আমার কাঁধে-বাহুতে তোমার সেই দীর্ঘশ্বাস, সমুদ্রসৈকতে হাঁটতে হাঁটতে তোমার শরীর থেকে যা নিঃসরিত হয়ে আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল, সেসবতো ভুলবার নয়। তোমার জন্যে এই অ্যাপার্টমেন্টটা পেয়ে খুবভালো লাগছে। আমাদের দিনগুলো এখানে ভালো কাটবে। যত তাড়াতাড়ি পারো, চলে আসো।

কিন্তু কোথায়, আগস্টের শেষে এলো সেপ্টেম্বর। ডোরা কিই-বা করতে পারে, অপেক্ষা আর প্রার্থনা ছাড়া। কাফকা, ডোরা জানে, শরীর সুস্থ হলে ঠিকই বার্লিনে চলে আসবে। এদিকে ডোরা যখন কাফকার অপেক্ষায় দিন গুণছে, কাফকা তখন ওত্তেলার ওখানে। স্কেলসেনের গ্রামের বাড়িতে। ওত্তেলার নতুন একটা মেয়ে হয়েছে -হেলেন। মেয়েটির বয়স সবে তিন মাস। গ্রামের পরিবেশটাও দারুণ সুন্দর। ফিরতি চিঠিতে কাফকা ডোরাকে সবলিখলো। এখানে বাতাস কী নির্মল, কী স্বচ্ছ। আকাশটাও নীল। আমার এখানে ভালো থাকবারই কথা। কিন্তু সেটা হচ্ছে কোথায়? ওত্তেলা, আমার সবচেয়ে এই প্রিয় বোনটি, কত যে যত্ন করছে। সার্বক্ষণিকভাবেখেয়াল রাখছে। কিন্তু তাতেও আমি ভালো থাকতে পারছি না। প্রতিপক্ষের শক্তিই যেন বেশি। কাফকা একই কথা ব্রডকেও লিখে জানালো। প্রতিপক্ষের কাছে আমি নিশ্চয়ই ভীষণ মূল্যবান কেউ। শয়তানটা সারাক্ষণ আমার পেছনে লেগে আছে। কী জঘন্য, বলতো? সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখে ব্রডকে লেখা ওই চিঠিতে কাফকা জানালো, আমার দেহের ওজন কিছুটা বেড়েছে। এ হলো বাইরের বিভ্রম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছি। নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। দেয়ালে আঁচড় লাগছে।

এবার নিয়ে কাফকা স্কেলসেনে চারবার হলো থাকছে। অবশ্য থাকছে না বলে বলা উচিত, থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কাফকা অন্তত তাই মনে করে। তবে শহরটা বেশ ভালো। এলবিনদীর পাড়ের এই ছোট্ট শহরটা ছোট-বড় নানান পাহাড় দিয়ে ঘেরা। প্রাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত শহরটি যেমন শান্ত, তেমনি সবুজে সবুজে আচ্ছাদিত। কাফকা প্রথম এই শহরে আসে যখন অতিমারি ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছিল। মহামারিটি তখন কেড়ে নিয়েছিল দুই কোটি মানুষের জীবন। সেটা ১৯১৮ সালের কথা। কিন্তু কাফকা

এখানে আসে এর একবছর আগে। সেবারই কাফকার যক্ষা রোগটা ধরা পড়ে। চিকিৎসকরা জানিয়ে দেয়, তার ফুসফুস যক্ষার সংক্রমণে বিপর্যস্ত, দুর্বল। এরপর যখন মারনঘাতী ইনফ্লুয়েঞ্জা তাকে আক্রমণ করে বসলো, তখন সে আক্রান্ত হলো ডাবল নিউমুনিয়ায়। ফুসফুস আর শরীর আরও বিপন্ন হয়ে পড়লো। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কাটলো কয়েক মাস।

কাফকার মনে আছে, দ্বিতীয়বার স্কেলসেনে সে আসে ১৯১৯ সালের একেবারে শুরুতে। কী করে কাফকা ভুলবে সেই দিনগুলোর কথা। সেই যে মেয়েটি, জুলি ওয়েরজেক, প্রাহা থেকে এখানে এসেছিল সুস্থ হওয়ার জন্যে। দু'জনেই ভেবেছিল, এরকম জায়গায় কিছুদিন থাকলে সুস্থ হয়ে ফিরতে পারবে। প্রায় দু' মাস, দু'জনে সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা এই শহরটাতে ঘুরেছে, বেড়িয়েছে, হাতে হাত রেখে নির্জন পাহাড়ি পথে অনেক দূর হেঁটে গেছে। এরকমই কোনো এক দিন, হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে আসে এলবিনদীর তীরে। চারপাশটা ভীষণ নির্জন। জনমানুষের চিহ্ন নেই। সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত নদীতীর। নদীর জল মৃদুমন্দ বইছে। বাতাসও ধীর, চলিষ্ণু। তবে শীতকাতর হওয়ার মতো নয়। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত কাফকা আর জুলি ওই ঘাসের ওপর বসে পড়লো। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে দু'জনেই ওই ঘাস আর ভূমিতে শয্যা নিল। অপরাহ্নের ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়ে কাফকা অস্ফুট স্বরে জুলিকে বললো,

-এখানে আমরা কেন এলাম, জুলি?

-ভালোবাসি বলে।

-তুমি কি আমাকে সত্যি ভালোবাসো?

জুলি হাঁ-সূচক মাথা নাড়তেই কাফকা বললো,

-তাহলে প্রতিশ্রুতি দাও তুমি আমাকে কখনও ভুলে যাবেনা। আমি তোমাকে বিয়ে করবো। কথা দিচ্ছি প্রাহাতে ফিরে গিয়ে বাবাকে তোমার কথা বলবো। তারপর বিয়ে। এখানে অবশ্য একটা কথা বলি। তুমি তো এরই মধ্যে জেনে গেছ আমি অসুস্থ। সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেই শুধু তোমাকে বিয়ে করা সম্ভবহবে। ফেলিসের সঙ্গে দ্বিতীয় বার এনগেজমেন্টটা ভেঙে গেলে কাফকা এরকমই কাউকে খুঁজছিল। প্রথমে জুলিকে যে তার খুবপছন্দ হয়েছিল, তাও নয়। বরং বন্ধু ব্রডকে সে যে চিঠি লিখলো, তাতে মেয়েটি সম্পর্কে এক ধরনের উন্নাসিকতাই প্রকাশ পেল। সাধারণভাবেআমার মতো পুরুষের জুলিকে অগ্রাহ্য করার কথা। ওর বাবা মুচি, একটা সিনেগগের পাহ-াদার। নিজেও লেখাপড়া তেমন একটা করেনি। সেলসগার্ল। তবু আমি ওর প্রেমে পড়েছি। মেয়েটি সুন্দরী। হৃদয়টা বড়। সৎ আর চনমনে স্বভাবের। আমার বিয়ের প্রস্তাবটা সে গ্রহণ করেছে।

সেদিনই এটা ঘটেছিল। এলবিনদীর সেই ঘাসের শয্যায় শুয়ে কাফকা জুলিকে বিয়ের প্রস্তাবদিলে সে রাজি হয়ে যায়। কাফকা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ফেলিসকে তো বিয়ে করা হলো না। অনেক মানুষই এরকম যন্ত্রণা আর না-পাওয়া রুক্ষ সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দূরে অথবা কাছেই হয়তো দেখা পায় সবুজ কোনো দ্বীপের। পরদিন ছোটি বোন ওত্তেলার বাড়িতে পারিবারিকভাবেকাফকা জুলির সঙ্গে এনগেজমেন্ট করলো।

তীব্র যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন কাটছিল জুলিরও। জুলি যে ছেলেটিকে ভালোবাসতো, যুদ্ধে সে মারা যায়। সেই স্মৃতি ক্ষতের মতো হৃদয়ে স্থায়ী হওয়ার আগেই তার জীবনে আসে কাফকা। কাফকার প্রস্তাবটি তাই তার কাছে কী যে প্রশান্তি বয়ে আনে। এনগেজমেন্টে সে রাজি হয়। দু'জনে সিদ্ধান্ত নেয় সামনের নভেম্বরেই তারা বিয়ে করবে। কিন্তু কাফকা যখন পরিবারের সবাইকে এই বিয়ের কথা জানালো, বাবা হেরমান কাফকা তখন ক্রোধে ফেটে পড়লেন।

-কচি একটা মেয়ে, তাই জুলির প্রতি তুমি আকৃষ্ট হয়েছো। কিন্তু যৌন-আকর্ষণের সঙ্গে বিয়েকে গুলিয়ে ফেলার মতো বোকামি করো না।

-না বাবা, একা থাকতে আমার ভালো লাগছে না। আমি মেয়েটাকে ভালোবাসি। সে সুন্দরী, স্মার্ট।

-ঠিক আছে বিয়ে তুমি করো, কিন্তু আমাদের সমপর্যায়ের কাউকে করো। সামাজিকভাবে মেয়েটা যেন আমাদের মতো হয়।

-এসবদাম্পত্য জীবনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নয় বাবা। ফেলিসের সঙ্গে এনগেজমেন্টটা ভেঙে যাবার পর আমি খুবনিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি।

হেরমান কাফকা এবার আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

-বুঝেছি, মেয়েটির পোশাক-আশাক দেখেই তুমি ভুলেছো। প্রাহার মেয়েরা তো এমনই হয়। পোশাকের চাকচিক্য দিয়ে তোমাকে বশ করেছে। আর তুমি কিনা তাই দেখে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে।

-বাবা। তুমি কোনো দিনই আমার মনের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করনি। যতদ্রুত সম্ভবআমার বিয়েটা করা দরকার। আসছে সপ্তাহে, আগামীকাল, এমনকী সম্ভবহলে আজই।

-তোমাকে আমি সত্যিই বুঝতে পারি না, কাফকা। তুমি তো এখন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। শহরে বাস করো, কিন্তু জানো না কাকে বিয়ে করতে হবে, তোমার যোগ্য সেরা মেয়েটি কে।

বাবার আপত্তিতে ভীষণ হতাশ কাফকা। প্রায় নিঃশব্দে বাবার সামনে থেকে সরে এলো। জুলির সঙ্গে বিয়ে হলে জীবনটা চমৎকার কাটবে, মুহূর্তের মধ্যে সেই স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল। উড়ন্ত এক চিলের করুণ চিৎকারের মতো কণ্ঠ চিরে হতাশাকে উগরে দিতে চাইলো। নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যর্থতায় হৃদয় ভরে গেল করুণ হতাশ্বাসে।

জুলির সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে যাবার পর তৃতীয়বারের মতো কাফকা সেই নভেম্বরেই স্কেলসেনে এলো। এবার একা নয়, সঙ্গী প্রিয় বন্ধু ব্রড। এখানে পৌঁছেই কাফকা বাবাকে ৭৬ পৃষ্ঠার দীর্ঘ একটা চিঠি লিখলো। সেই চিঠির পাতায় পাতায় বাবার বিরুদ্ধে অন্তহীন অভিযোগ, অনুযোগ। বাবার প্রতি তার সবক্ষোভ, হতাশাকে কাফকা উগরে দিল। কাফকা লিখলো, জুলির সঙ্গে বিয়েতে রাজি না হওয়ায় সে ভীষণ অপমানিত বোধ করছে। চিঠির ছত্রে ছত্রে শব্দের স্ফুলিঙ্গ। এবার চিঠিটা তো বাবার কাছে পৌঁছনো দরকার। কাফকা চিঠিটা মাকে দিল। বললো বাবাকে পৌঁছে দিও। কিন্তু মা সেটা পড়ে প্রমাদ গুণলেন। মনে মনে ভাবলেন, এই চিঠি, কী করে দিই তাকে। তিনি চিঠিটা কাফকাকে ফিরিয়ে দিলেন। কাফকার কাছ থেকে ব্রড চিঠিটা নিয়ে পড়ল।

-দেখি, চিঠিটা আমাকে দাও তো।

-তুমি জানো, আমার সঙ্গে বাবা সারাজীবন কী ধরনের ব্যবহার করে আসছেন। এই চিঠিতে সেসবকথাই, প্রথমবারের মতো, অকপটে বলেছি। বলতে পেরে শান্তিও পাচ্ছি। কিন্তু মা চিঠিটা বাবাকে দিলেন না। এখন আমি কী করবো, বলো? বাবাকে সরাসরি পাঠাবার সাহসও তো আমার হয় না।

-থাক, চিঠিটা আমার কাছে থাক। একদিন এই চিঠি হয়তো আমি ছেপে প্রকাশ করবো।

-না না, কক্ষনো এটা কোরো না, ব্রড। দাও চিঠিটা আমি পুড়িয়ে ফেলি।

-না, আমার তো পড়াই হলো না। পড়ি আগে।

-পড়ো, কিন্তু আমার কোনো চিঠি তুমি কখনো প্রকাশ করবেনা। আমি সেটা চাই না। একেবারেই চাই না।

এ কথার কোনো জবাবনা দিয়ে ব্রড চিঠিটা নিজের কাছে রেখে দিল। এই চিঠি, ব্রড একান্তে পড়ার পর বুঝতে পারলো, পিতা-পুত্রের মধ্যে চলছে সম্পর্কের তীব্র মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েন।

বাবার নিষেধ সত্ত্বেও কাফকা জুলির সঙ্গে আরও কয়েক মাস যোগাযোগ রেখেছিল। কিন্তু এই সম্পর্কের পরিণতিটা সুখের হবেনা ভেবে, বিশেষ করে যক্ষা রোগে ভুগছে বলে ছয় মাস পরে জুলির সঙ্গে বাগদানটা ভেঙে দিয়েছিল।

কাফকার আশঙ্কা, ডোরাকে নিয়েও বাবা জুলির বেলায় যেমনটা করেছেন, সেরকমই একটা কিছু করবেন। ধন-সম্পদ আর আভিজাত্যকে তিনি ভীষণ গুরুত্ব দেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে হেরমান কাফকার ছেলেবেলাটা কেটেছিল। ভাগ্যান্বেষণে তিনি যখন প্রাহায় আসেন, তখন নিজের চেষ্টায় একটা ব্যবসা দাঁড় করান। এরপর বিয়ে করেন। পুরো পরিবারকে নিয়ে এখন তিনি প্রাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রথম পুত্র কাফকার যখন জন্ম হয় তখন তিনি সেই সময়ের শাসক সম্রাটের নামানুসারে কাফকার নাম রাখেন। ব্যবসাও চালাচ্ছেন বেশ বুদ্ধি করে। ভাবখানা এমন যে তিনি ইহুদিও নন, খ্রিস্টানও নন। সনাতন সিনেগগ ছেড়ে তিনি উপাসনা করতে যান নতুন সিনেগগে। তবেসবসময় নয়, বছরে চারবার সেই সিনেগগে প্রার্থনা করতে যান। কাফকা জানে, ডোরার মতো একটা মেয়ে, যে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে কিন্তু ধনী নয়, অভিজাত পরিবারের নয়, বরং উদ্বাস্তু; তাকে বাবা কিছুতেই পছন্দ করবেন না। বাবাকে, এমনকি পরিবারের অন্য কাউকে কাফকা ডোরার কথা বলতে পারছে না। বার্লিনে দু'জনে গিয়ে থাকবে, এ কথা তো মুখেই আনা যাবেনা। এমনকি ব্রডকেও কাফকা এসবকথা বললো না। কিন্তু ছোটবোন ওত্তেলাকে সবখুলে বললো। ওত্তেলা যেমন ভাইকে সববলে, ভাইয়ের সবকথায় সায় দেয়, কাফকাও তেমনি ওত্তেলার কাছে ডোরার কথা গোপন করলো না। ওত্তেলা ডোরার কথা শুনেই ভীষণ খুশি। কাফকাকে বার্লিন যেতে উৎসাহিত করলো, তুমি একটু সুস্থ হও, তারপর যেও।

গ্রীষ্ম ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। ফুরিয়ে আসছে গ্রীষ্মের দিনগুলি। কিন্তু কাফকার কোনো উন্নতি নেই। তার শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এদিকে যতদিন যাচ্ছে, কাফকাকে নিয়ে ডোরার উৎকণ্ঠা তত বাড়ছে। একজনের চিঠিতেই ওত্তেলার লেটারবক্স ভরে যায়। প্রতিটি চিঠির ভাষা এক : কবেতুমি আসছো, প্রিয়তম? প্রতিটি চিঠিতেই সেই পুরাতন উৎসাহব্যঞ্জক কথা : কী চমৎকার পরিবেশ, কী সুন্দর আবহাওয়া। মিগুয়েল সড়কের সারি সারি বৃক্ষের পাতাগুলোর রঙ একটু একটু করে বদলাচ্ছে আর ঝরছে। বিকাল বেলাটা এখন আগের তুলনায়

আরও দীর্ঘ। সেই সঙ্গে এখানে দীর্ঘ হচ্ছে গ্রীষ্মকালটাও। সন্ধ্যা, কী যে সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রতিটি বাড়ির ঘিরে থাকা ফুলের বাগান থেকে তখন যে সুগন্ধ উত্থিত হয়, কী রকম অনির্বচনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, সেসবকথা তোমাকে ভাষায় প্রকাশ করে বলার ক্ষমতা আমার নেই। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের রাস্তাটা আবার যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই মনোমুগ্ধকর গ্রামের শুরু। সেই পথ দিয়ে পনেরো মিনিট হাঁটলেই ঘন সবুজ গাছগাছালিতে ভরা বোটানিকাল গার্ডেন। তুমি আরও যদি আধঘণ্টা হাঁটো তাহলে পেয়ে যাবেকয়েক শো একরের বিস্তীর্ণ গ্রুয়েনভালদের বার্চ বন।

ওত্তেলার স্বামী স্কেলসেনের গ্রামীণ বাড়িটা অক্টোবর পর্যন্ত ভাড়া নিয়েছে। কাফকা ততদিন সেখানেই থাকবে। ডোরার চিঠি পেয়ে বার্লিনে থাকার খুবলোভ হলেও ডোরাকে চিঠি লিখে এই কথাটা জানিয়ে দিল। কাফকার কী কী পছন্দ, ডোরা সবাই জানে। লিখেছেও সেসবকথা। কী চমৎকার একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছে। কাফকার সবই পছন্দ হয়েছে। এখন খুবইচ্ছে করছে একসঙ্গে থাকার। প্রাহা যদি হয় প্রহেলিকা, বার্লিন সেই তুলনায় প্রতিশেধক। চিকিৎসক বন্ধু ক্লপস্টক, যার পরামর্শ অনুসারে কাফকা চলতে হয়, কাফককে চিঠিতে এরকমই লিখলো। বার্লিনে বসবাসের ব্যাপারে ক্লপস্টকের কোনো আপত্তি নেই। বার্লিন সবসময়ই কাফকার স্বপ্নের শহর। এখান থেকে খুবসহজেই জেরুজালেম যাওয়া যাবে। স্কেলসেনে তাই কাফকার এক মুহূর্তের জন্যে মন টিকছে না। কিন্তু শরীরও ভালো হচ্ছে না। ক্লপস্টককেই লিখলো, 'কম্বলের তলা থেকে আমি আমার হাতটা বের করে পাশের টেবিলে রাখা ওষুধগুলো যে খাবো, তাও পারছি না। বার্লিন যেন দূরের সেই সবুজ দ্বীপ, দেখা যায় কিন্তু পৌঁছনো যায় না।

কাফকার অবস্থা সত্যি দিন দিন খুবখারাপ হতে থাকলো। জ্বর, যা অনেক দিন ধরে আছে, বাড়ছে তো বাড়ছেই। অন্য আরও অনেক সমস্যা তো আছেই। প্যালেস্টাইনে যাওয়ার স্বপ্নটা ক্রমশ জ্বরের উত্তাপের তলায় গলে গলে পড়ে মিলিয়ে গেল। বিবর্ণ গ্রীষ্মের অবসাদন ঘটলো। শুরু হলো শীত। কাফকার অসুস্থতা একটুও কমলো না। তার মুক্ত স্বাধীন শান্তিপূর্ণ জীবনের আশাটা যেন ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। কল্পলোকেই চললো দিনযাপন। মনোলোকে ডোরার সঙ্গে বসবাস। গত দশ বছর ধরে এই কল্পলোকেই বিচরণ করেছে কাফকা। কখনো ফেলিসের সঙ্গে, কখনো জুলির সঙ্গে; আর এখন ডোরার সঙ্গে।

৫

দেখতে দেখতে সেই দিনটি বেশ দ্রুতই এগিয়ে আসছে। ওম কিপ্পুর। হিব্রু নববর্ষের প্রথম দিন। পবিত্রতম দিন। এরও দশ দিন আগে আছে আরেকটি চমৎকার দিন। সেই দিনটি তো শুধুই উৎসবের দিন। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠবার দিন। ঈশ্বর এই দিনেই সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। পবিত্র তৌরাতে এমন কথাই আছে। ডোরা এখনো মনে করে, কাফকা নববর্ষের আগেই বার্লিনে এসে পৌঁছুবে। সবার সঙ্গে সেও উৎসবে মেতে উঠবে। কত দিন হয়ে গেল কাফকা সেই যে বিদায় নিল, আর তার দেখা নেই। ডোরাকে সে অনেক ভালোবাসে। তা না হলে কি হুট করে কাফকা বাড়ি ভাড়া করে? মুরিৎস ছাড়ার আগের সন্ধ্যায় ডোরা যখন কাফকাকে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরবে, তখনই সে ডোরার হাতে টাকাগুলো গুঁজে দেয়।

-এই টাকাগুলো রাখো। তুমি যে বাড়ি ভাড়া করবে, সেই টাকা। ডোরা ইতস্তত করছিল। কাফকা ডোরাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললো,

-আমি তো দিতে পারছি। তুমি রাখো। আরও প্রয়োজন হলে দেবো।

কাফকা হিসাবমতো ডোরাকে বাড়ি ভাড়ার দু'মাসের টাকা দিয়েছিল। ডোরা ইতস্তত করছিল কারণ এই টাকাটা সে নিজেই দিতে চাইছিল। তবু একটা কথা ভেবেটাকাগুলো সে নেয়। ডোরা ভাবলো, টাকাগুলো দেওয়ার অর্থ, কাফকা এক ধরনের অলিখিত প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হলো। সে বার্লিনে চলে আসবে। এতে আর কোনো দ্বিধা থাকলো না।

কাফকার স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে ডোরা মিকুইস্ট্রাসের অ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া নিয়েছে। ইতিমধ্যে দু'মাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। কাফকাও বার্লিনে আসার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। প্রায় প্রতি দিন ডোরাকে সে একটার পর একটা চিঠি লিখছে। ডোরা বুঝতে পারে যখনই সুযোগ পাবে, কাফকা বার্লিনে চলে আসবে। সেই দিনটির জন্যে ডোরাও উন্মুখ হয়ে আছে। চারদিকে কত কত গাছ। কী সবুজ। কিন্তু একসময় এই বিবর্ণ হবে। তখন পাতা ঝরবে। পাতা ঝরার দিনগুলো শুরুর আগে, চারপাশটা কেমন যেন আবার ধূসর হয়ে আসে। এই সময়টা ক্যানারি পাখিদের দিন। ওরা মিষ্টি-মধুর স্বরে ডেকে ডেকে চারপাশটা মুখর করে তোলে। কাফকা যদি এই সময়ে চলে আসতো তাহলে ক্যানারি পাখির ডাকা নিশ্চয়ই শুনতে পেত। ডোরা উৎকর্ণ হয়ে শোনো ক্যানারির ডাক। মনটা কেমন যেন হুহু করে ওঠে। মনে পড়ে বেদজিন আর মুরিৎসের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। ঘুরে-ফিরে জেগে থাকে এই ভাবনাটি, কাফকা নিশ্চয়ই দু-একদিনের মধ্যে বার্লিনে চলে আসবে। কিন্তু সময়, একটা বিন্দু থেকে দ্রুত আরেকটা বিন্দুতে দ্রুত গড়িয়ে যেতে থাকলো। গাছগুলোর সবুজ পাতা, ডোরা লক্ষ করে, তামাটে হয়ে যাচ্ছে। রাতের হিম বাতাস জানিয়ে দিল, শীত আসন্ন। এবার কী শীত বেশ জাঁকিয়ে নামবে। বলা যায় না। এদিকে দিন যত ছোট হতে থাকলো, কাফকার বার্লিনে আসার সম্ভাবনা ততই ক্ষীণতর হয়ে এলো।

তাহলে কী ডোরার সঙ্গে কাফকার দেখা হবেনা? স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে? কিন্তু ডোরা কী করে সেটা হতে দেবে। কাফকাই তো তার সেই প্রার্থিত পুরুষ, যার জন্যে সে এতকাল অপেক্ষা করে আছে। প্রার্থনা, হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসার আর্তিটুকু যদি উঠে আসে, যদি সে অন্তর দিয়ে কাফকাকে কামনা করতে পারে, তাহলে তার বাসনা হয়তো পূরণ হবে। রোশ হাশানা থেকে ওম কিপ্পুর। খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি হিব্রু উৎসব। এই উৎসবদুটির মাঝে যে দশটি দিন আছে। বলা হয়, সেই দিনগুলোতে কেউ কিছু কামনা করলে, ঈশ্বর নাকি তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন। লিখে ফেলেন মানুষের আমলনামা। ডোরাও কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে জানাবে, কাফকা হচ্ছে সেই পুরুষ যাকে সে পেতে চায়। বাবাকেই ডোরা দেখেছে। ওম কিপ্পুরের দিনটিতে সাদা ধবধবেএকটা চাদর মাথায় জড়াতেন। মাথা থেকে চাদরটা নেমে আসতো কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠ অব্দি। তিনি ওই পোশাকে প্রার্থনা কক্ষে ঢুকতেন আর সারাদিন উপোস থাকতেন। এটাই রীতি। এখনো চলছে। বাসনা প্রকাশের দশ দিন, ডোরা দেখেছে, কতজন কতকিছু চাইতো। ওম কিপ্পুরের দিন তো সবাই জিকির করতে করতে নিজেদের বাসনার কথা বলতো। সেই দিনটাই হচ্ছে কোনো কিছু চাওয়ার শেষ দিন। নিজেদের বাসনার কথা বলতে বলতে তাদের চোখ থেকে অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরতো। গণ্ড আর চিবুক বেয়ে সেই অশ্রু ভিজিয়ে দিত বুকের দুই পাশে ঝুলে পড়া শাদা পাগড়িটাকে। ডোরাও তাই করবে। নিজের কথা ডোরা বলবে, আর যা কিছু করার ঈশ্বরই করবেন। ওম কিপ্পুরের দিনটিতে মধ্যরাত ঘনিয়ে আসার আগেই জানাতে হবেনিজের বাসনার কথা। মধ্যরাতের বিশেষ মুহূর্তেই লেখা হয়ে যাবেমানুষের ভাগ্যলিখন বা আমলনামা, আর সেটা লিখবেন সেই পরমেশ্বর। এলো সেই দিন। ঘনিয়ে এলো ওম কিপ্পুরের রাত। ডোরা বসলেন প্রার্থনায়। জায়নামাজের মতো একটা আসনে বসে মনে মনে বললেন, 'হে ঈশ্বর, 'জীবনের খাতায়' কাফকার পাশেই তুমি আমার নামটি লিখো। সেটাই যেন হয় আমার আগামী দিনের ভাগ্যলিখন। আমার আমলনামা।'

শৈশবে বেদজিনের দিনগুলো কেমন কাটতো আর এখন? ডোরা আবার মনে করার চেষ্টা করে। এই দুই জীবনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। তখন নববর্ষের প্রথম দিনগুলোয় সারাশহর উৎসবে মেতে উঠতো। রাস্তাগুলো জনশূন্য। সবাই সিনেগগে ঢুকে পড়েছে। সেখানে তিল ধারণের ঠাঁই থাকতো না। পুরুষেরা দুই হাত তুলে প্রার্থনা জানাতো। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিত। একটাই প্রার্থনা, ঈশ্বর যেন তাদের ভুলে না যান। ঈশ্বরের আমলনামায় যেন ভালো কিছু লেখা হয়। প্রতিটি মানুষের সারাটা বছর যেন ভালো কাটে। আর আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। মহিলারা জড়ো হতো উপাসনালয়ের পেছনে। তারা ফিসফিস করে প্রায় নিচুস্বরে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, প্রার্থনা করতো। ঈশ্বর, আমাদের আমলনামায় ভালো কিছু লিখে দিও। নারীকুলের সবাই যে উপাসনালয়ে যেত তা নয়, অনেকেই বাড়িতে থেকে সারারাত প্রার্থনা করতো। এই সমস্ত আয়োজন একসময় যখন শেষ হতো, সেও ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। সারাদিনের পর সন্ধ্যার সময় সবাই একসঙ্গে শিঙ্গায় ফু দিত। শিঙ্গার সেই সমস্বর ছড়িয়ে পড়তো সারা শহরে। শিঙ্গায় ফু দেওয়ার অর্থ হলো উপবাসের সমাপ্তি টানো। উপবাস আসলে ছিল উপাসনার অংশ। এরপর শুরু হতো মহাভোজ, সেও ছিল উপাসনার অংশ। এভাবেই ছুটির সমাপ্তি ঘটতো। বার্লিনে এর কিছুই হয় না। বছরের অন্য দশ-পাঁচটা দিনের মতো দিনগুলো আসে আর চলে যায়। পাপ-মুক্তি আর প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রার্থনা, এরকম কিছুই ঘটে না। কিন্তু ডোরা জানে, এই উৎসবের গুরুত্ব আর মহিমা কোথায়। উৎসব এক ধরনের মানবিক দায়িত্ববোধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষুধা দারিদ্র্য নিয়ে অনেক মানুষ কষ্ট ভোগ করে। মানুষ হিসেবে সেই সবমানুষের দুঃখ-কষ্টকে উপলব্ধি করতে হবে। আগামী দিনগুলো সবার সঙ্গে মিলে-মিশে যাতে ভালো কাটে, সে-জন্যই তো এই উৎসব।

পরদিন শুক্রবার, ২১ শে সেপ্টেম্বর। একটা বিস্ময়কর অভাবনীয় ব্যাপার ঘটলো। প্রাহা থেকে

কাফকা একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। সোমবার ২৪ সেপ্টেম্বর বার্লিনে আসছে। চিঠিতে কাফকা জানতে চেয়েছে, ডোরা কি স্টেশনে থাকতে পারবে? ডোরার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আরও তিন দিন। কী করে সে অপেক্ষা করবে?

প্রাহা, ২১ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩

হিব্রু নববর্ষের প্রথম দিন। কাফকা স্কেলসেন ছেড়ে প্রাহায় এলো। দুঃসহ কাশি আর মাথাব্যথার প্রকোপটা এখন অনেকটাই কম। এমনকী কাফকার ওজনও কিছুটা বেড়েছে। কাফকা তার শারীরিক পরিবর্তনের কথা বন্ধু ব্রডকে জানিয়ে লিখলেন, 'মেদবৃদ্ধিই আমাকে সুরক্ষা দেবে, কি বলো? আমি এখন বার্লিনে যেতে পারি। কিন্তু তার আগে আমাকে প্রাহায় যেতে হবে। গোছগাছ করে তারপর বার্লিন যাবো। বার্লিন আমার জন্যে অপেক্ষমাণ। তোমাকেও সেখানে সাদর আমন্ত্রণ, বন্ধু।' কাফকা প্রাহায় এসে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করলো। শনিবার আরেকটা চিঠি লিখলো চিকিৎসক বন্ধু রবার্ট ক্লপস্টককে, 'কাল ভোরে আমি প্রাহা ছাড়ছি। আগামী বারো ঘণ্টার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে, আমার শরীরটা বিগড়ে না গেলে বার্লিনে রওনা হবো। কয়েক দিন থাকবো সেখানে।'

জার্মানি রাজনৈতিকভাবে সুস্থির নয়। এক ধরনের অস্থিরতা চলছে। অর্থনৈতিক মন্দাও জেঁকে বসেছে। কিন্তু এসবছাপিয়ে প্রিয়জনদের সবারই ভাবনা কাফকাকে নিয়ে। ওর শরীরের যা অবস্থা তাতে বার্লিনে যাওয়াটা হবে খুব বাজে ব্যাপার। পরদিন রবিবার। কাফকার প্রায় সারাদিন কাটলো জটিল সবকিছু গোছগাছ করে ট্রাঙ্ক গোছাতে। সোমবার সকাল। শেষবারের মতো বাবা হেরমান পুত্রকে থামাতে চেষ্টা করলেন। ওত্তেলার স্বামী ডেভিড, যার ডাক নাম পাপা, জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বেড়ে যাওয়ার কথা শোনালো। খাদ্য সংকট বাড়ছে। বাড়ছে বেকারত্ব। জার্মানির রাজধানীতে রাতের বেলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনাও ঘটছে।

সৃষ্টিশীলতা আর শিল্পসাহিত্যচর্চার দিক থেকে বার্লিনের অবস্থান সবার শীর্ষে। কিন্তু মুদ্রার তো আরেক পিঠও থাকে। সেই পিঠের ছবিটা হলো, বার্লিনই সবচেয়ে অস্থিতিশীল একটা শহর। বেশিরভাগ খুনখারাপি বার্লিনেই ঘটছে। অন্য শহরের মানুষের তুলনায় বার্লিনের লোকজন খুবউগ্র আর অসহিষ্ণু। পাপাই বললো, 'কোনো কারণ ছাড়াই আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারে। গ্রেপ্তারের পর আপনার ভাগ্যে কী ঘটবে বলা মুশকিল। এটা এমন একটা শহর, বিশ্বাস করেন, আপনাকে কেউ দুম করে গুলি করে বসতে পারে। পিটুনি দিতে পারে। দুর্ব্যবহার তো কোনো ব্যাপারই না।' পাপা স্মরণ করিয়ে দিল, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর এখন চরম নৈরাজ্য চলছে। সোস্যালিস্ট আর কমিউনিস্টদের নির্বিচারে খুন করা হচ্ছে। ছোট ছোট রাজনৈতিক দল-উপদলের মধ্যে হানাহানি লেগেই আছে। খুন করা হয়েছে রোজা লুক্সেমবার্গ আর কার্ল লিয়েবনেশটের মতো বিপ্লবীদের। গত চার বছর ধরে এরকমই চলছে জার্মানি। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা অনেক ইহুদিকে মেরে ফেলেছে।

কাফকা জানে, সংবাদগুলোর ভূমিকাও ভালো নয়। পাপার কথার সূত্র ধরে বললো, সেনাবাহিনী আর পুলিশের প্রতি খবরের কাগজগুলো সহানুভূতি দেখাচ্ছে। ফলে, আমলাতন্ত্র শক্তিশালী হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কিছুই করার নেই। শ্রমিকরা প্রতিবাদ করলেই তাদের গুলি করে মারছে। এই শ্রমিকদের অধিকাংশই আবার কমিউনিস্ট। দিনেরবেলা তারা মিছিল করছে আর রাত হলেই ন্যাশনালিস্ট ও নাৎসিরা ফ্যাসিবাদী কায়দায় তাদের ধরে এনে মেরে ফেলছে। যে-এলাকায় গরিবরা থাকে, সেখানেই নির্যাতনের মাত্রাটা বেশি। সরকারও গা-বাঁচানোর উপায় হিসেবে এই নাৎসিদের সমর্থন করছে। সুসংগঠিত কমিউনিস্টদের দমন করার জন্যে তাদের দিকে ঝুঁকছে। কমিউনিস্টরা জিতে যাচ্ছে মনে হলে সরকারি পুলিশও মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। 'পুলিশ বিক্ষুব্ধদের দমন করার জন্য গুলি চালাতে বাধ্য হলো- দশ জনের মৃত্যু', এরকম খবর এখন ভাত-মাছ: যে কোনো পত্রিকার হেডিং হতে পারে। পাপার এই প্রশ্নে কাফকা ভ্রূকুঁচকে কী যেন ভাবলো। কোনো আইন নেই। কোনো বিচার নেই। কোনো প্রতিকার নেই। মানুষ যেন পোকামাকড়, পিষে মেরে ফেলা যায়। তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বললো পাপা। কাফকা নীরবেকথাগুলো শুনছে। পাপার সবকথার একটাই অর্থ দাঁড়ায়, বার্লিনে না যাওয়াই ভালো। বার্লিন এখন একটা বিপজ্জনক শহর। কাফকা তার উত্তরে স্বগতোক্তির মতো করে অস্ফুট স্বরে বললো, 'আমাকে যেতেই হবে। প্রাহায় থাকলে আমি মরে যাবো।' কাফকা যখন এই কথাগুলো বলছে ঠিক তখনই ঘরে এসে ঢুকলো ছোট বোন ওত্তেলা। কোলে তিন মাসের কন্যা। ওত্তেলা জানে তার এই প্রিয় অসুস্থ ভাইটি কারও নিষেধ শুনবেনা। কী আর করা, ওর যা ইচ্ছে করুক।

'আমি জানি আমি অসুস্থ। ঝুঁকি নিয়েই আমাকে বার্লিনে যেতে হবে। বার্লিনও যে বসবাসের যোগ্য একটা শহর, তাও নয়। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়ার দিকে এগুচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়কার রাশিয়ার সঙ্গে শুধু এখনকার বার্লিনের মিল দেখতে পাই।'

চারদিক থেকে শুধু নিষেধ আর নিষেধ। নিষেধের খড়্গ উঁচিয়ে সবাই কাফকাকে বার্লিনে যেতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু যে হৃদয়ের আহ্বান শুনতে পেয়েছে, সে কি আর প্রাহায় থাকতে পারে? বিশেষ করে বাবার দুঃসহ সর্পিল শৃঙ্খলে? নিজের সুখের জন্যে কাফকা চূড়ান্তভাবে বার্লিনে যাওয়াই মনস্থির করলো। মনে মনে ভাবলো, ছিন্ন হোক সবসম্পর্ক, বার্লিনে আমাকে যেতেই হবে, ডোরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ডোরার সঙ্গে থাকলেই আমি সবচেয়ে সুখী হবো।

রাত পোহালেই বার্লিন। কিন্তু সেই রাতটাই হয়ে উঠলো কাফকার জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ রাত। আজীবন যে-মানুষটি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, সে কী করবে এখন, এমন ভাবনাতেই মনটা খচখচ করছে। ঘুম আসলো না কাফকার। বিছানায় ছটফট করছেন। দিনের বেলা ওত্তেলাকেই বলেছিল, তুমি বুঝতে পারছো, উদ্বেগের তাড়নায় আমি কতটা বিপর্যস্ত। এত বড় সংকট কোনো মানুষের জীবনে আসেনি। গভীর রাত। কাফকা বিছানা ছেড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন। একসময় পড়ার টেবিলের কাছে এলেন। টেবিলের ওপর কয়েকটা খাতা। একটা খাতা টেনে নিলেন। শূন্য সাদা পৃষ্ঠায় খসখস করে লিখতে শুরু করলেন, 'না ডোরা, আমি আজ বার্লিনে আসছি না। কবে আসবো জানি না...'

কাফকার নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হলো। কিন্তু ওই পর্যন্ত লিখেই হঠাৎ থামলেন। মনে পড়লো ডোরার মুখখানি। কী মায়াময়। কী উৎকণ্ঠা কাফকার জন্যে। নাহ্, এরকম টেলিগ্রাম পাঠানো ঠিক হবেনা। ডোরা তাহলে ভীষণ আহত হবে। বিমর্ষ হয়ে পড়বে। লেখা কাগজটাকে মুঠোর মধ্যে দুমড়ে-মুচড়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন। দলা পাকানো কাগজটা ঘূর্ণিপাকের মতো মেঝেতে একপাক ঘুরে দেয়ালের গায়ে গোত্তা খেয়ে থেমে গেল। কাফকাও যেন শান্ত হলো। ঘূর্ণিপাকের পরে যেভাবে শান্ত হয় প্রকৃতি। সে নিঃশব্দে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। সকালে যথাসময় ঘুম ভাঙলো। পাপা সন্ধ্যাবেলায় ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল। ফলে, ঘুম থেকে উঠতে সমস্যা হলো না। বাড়ি থেকে যখন পথে পা বাড়াবেন, তখন বাবা এসে পেছনে দাঁড়ালেন। কাফকা দেখলো বাবার চোখে বিষণ্ণতা ভর করেছে, শূন্য, উৎকণ্ঠিত। মায়ের চোখ ছলোছলো, ভাবলেশহীন।

বার্লিন, অক্টোবর, ১৯২৩

ম্যাক্স ব্রড, কাফকার সেই পরমপ্রিয় বন্ধু, ডোরা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। বিশেষ করে কাফকার জীবনে ডোরার ভূমিকা যে কত বড় হয়ে উঠছে, ধারণা ছিল না তার। ব্রড কয়েক দিন আগে বার্লিনে এসেছে। একদিন শহরের জনপ্রিয় কাফে জস্টিতে দুজন দেখা করলো। কাফকা মনে মনে ভেবে রেখেছিল ডোরার কথা সে এড়িয়ে যাবে। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুরো আলাপটাই ব্রডের জীবন, ক্যারিয়ার, যা তখন প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে, সে-সবের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকলো। ডোরা সম্পর্কে কাফকা মুখ খুললো না। বার্লিনে ব্রডের আসার কারণটা কাফকাকেন্দ্রিক ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত। চেক অপেরা 'হেনুফা', এই অপেরার কয়েকটি অনুষ্ঠান আসন্ন বসন্তে কীভাবে বার্লিনে হতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে ব্রড বার্লিনে এসেছে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনে বইছে ঝড়। তার প্রেমিকা এমি সালভেতার এই শহরের বাসিন্দা। দুই বছর ধরে ঘূর্ণিপাকের মতো কাটছে তাদের সম্পর্ক। এমির ইচ্ছে বড় অভিনেত্রী হবে। এই লক্ষ্যে সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে বার্লিনের একটা হোটেলে কাজ নিয়েছে। ব্রড যদিও বিবাহিত, তবু এমিকে সে ভালোবাসে। নিজের 'ঈশ্বরীর সঙ্গে জীবনযাপন' বইতে এমিকে সে দারুণ এক নারী হিসেবে তুলে ধরেছে।

'সে রূপবতী। তার সবকিছুই তোমাকে ঘিরে। কী মেয়েরে বাবা, যে-কথাই বলি, তোমাকে সেই কথার মধ্যে টেনে আনে।' জুলাই মাসে মুরিৎস থেকে প্রাহায় ফেরার পথে এমির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর কাফকা ব্রডকে এরকমটাই লিখেছিল। কাফকা বুঝতে পারে ব্রডের প্রেমিকার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে। আছে কৈশোরক অনমনীয় মনোভাব। সে যা ভাবে বা করে, সরাসরি করে। ঢাক গুড়গুড় নেই। বেশ সিরিয়াস মেয়ে সে। ব্রডের প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হওয়ার এরকম বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়ার পর কাফকা লিখলো, 'তুমি আর তোমার স্ত্রীর জন্যে শুভকামনা রইলো -ফ্রাঞ্জ।'

ব্রড আর এমির সম্পর্কটা অবশ্য সুস্থির থাকলো না, তাতে উঠলো তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ঢেউ। এমি এরকম একটা সম্পর্কে জড়িয়ে থাকুক এমির পরিবার সেটা চাইছে

না। প্রথমে এমির বাবা-মা সম্পর্কটা মেনে নিল। ব্রড তখনই প্রতিষ্ঠিত চেক লেখক ও সমালোচক, ফলে মেনে নিতে সমস্যা হয়নি। কিন্তু যখন জানতে পারলো ব্রড তার স্ত্রীকে ডিভোর্স করবেনা, তখনই তারা বেঁকে বসলো। এরকম অবস্থায় ব্রড কী করবে, বন্ধুর সহায়তা চাইলো। জীবনের নানা বাঁকে কত যে রহস্য লুকিয়ে থাকে। যে-বন্ধুর নিজের জীবনেরই ঠিক-ঠিকানা নেই, কোনো নারীর সঙ্গে যে তার রোমান্টিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে পারেনি, তার পরামর্শ! ব্রড অবশ্য নিশ্চিত, বন্ধু কাফকা এ ব্যাপারে তাকে ভালো পরামর্শ দিতে পারবে। যে-কোনো সমস্যাকে সে ভালো বুঝতে পারে। তার আছে বাস্তব জ্ঞান, কুশলী মন, পরামর্শ দেওয়ার দূরদর্শিতা। সে সাধারণত ব্যর্থ হয় না। তবে সবসময় যে ভালো পরামর্শ দিতে পারে, তাও নয়। এই তো এই ব্যাপারে কাফকা ব্রডকে বললেন, প্রাহা আর বার্লিনে তোমার দুই প্রিয় নারীকে রেখো না। এমিকে প্রাহায় নিয়ে যাও আর একই ছাদের নিচে তুমি, তোমার স্ত্রী আর এমি একসঙ্গে থাকতে শুরু করো।' এটা কি কোনো ভালো পরামর্শ হলো?

ব্রড আর কাফকার বন্ধুত্ব সাহিত্য-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। ব্রড বন্ধুকে অনেকবার বলেছে, 'আমার অস্তিত্বের মূল কেন্দ্রে তোমার অবস্থান।' এই সম্পর্কের শুরু সেই তখন থেকে যখন দুজনে প্রাহার চার্লস ফার্দিনান্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিল।

'তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কবে দেখা হয়েছিল বল তো?' ব্রড অনেকবার কাফকাকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছে।

'কেন তোমার মনে নেই, সেই ১৯০২ সালের শীতকালে। কী চমৎকার সময় ছিল আমাদের।'

'নিঃসন্দেহে। আমি দেখি, দীর্ঘদেহী এক ছাত্র, ছাত্রই তো হবে, আমার সামনে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রাহার রিডিং অ্যান্ড লেকচার হলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, বক্তৃতাটা ছিল নীৎসেকে নিয়ে। নীৎসের নিহি-লিস্ট ভাবনা নিয়ে দর্শনের কোন এক জাঁদরেল প্রফেসর বক্তৃতা করলেন।'

'হ্যাঁ, এর মাত্র দু-বছর আগে নীৎসের মৃত্যু হয়। কিন্তু অধ্যাপকের নামটা আমারও মনে নেই। যা-ই বলো, নীৎসের নিহিলবাদী ভাবনা আমি পছন্দ করি না। সেদিনও ওই বক্তৃতাটা আমার ভালো লাগেনি।'

'মনে আছে তোমার? তুমি যখন নিহিলিজমের বিরুদ্ধে বলছিলে, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম।'

'ওই সময় আমি একের পর এক আমার প্রিয় লেখকের কথা বলছিলাম, যারা নীৎসের ভাবনাকে ধারণ করতেন না।'

'সে তো ছিল তোমার কথা। আমিও তো ছেড়ে কথা বলিনি। নীৎসের ভাবনার সঙ্গে মেলে এরকম লেখকদের উদ্ধৃতি দিচ্ছিলাম।'

'কী সরল আর স্বাভাবিকভাবে কথাগুলো বলেছিলে তুমি। তোমার স্বভাবটা এরকমই দেখে আসছি। সেদিনও আমি এটা লক্ষ করেছিলাম। আমি কী উত্তেজিত, তুমি শান্ত।'

'হবে হয়তো।'

এই যে দুই বন্ধুর স্মৃতিরোমন্থন, তখন কাফকার বয়স ১৯ আর ব্রডের ১৮। কাফকা ও ব্রড দুজনেই আইনের ছাত্র। দুজনেরই শিল্পসাহিত্যের প্রতি দুর্মর আকর্ষণ। তবে দু-জনের স্বভাব আর আচার-আচরণ একেবারে উল্টো। সভাসমিতিতে কাফকা সাধারণ চুপচাপ থেকে বক্তৃতা বা আলোচনা শুনে চলে আসতো। কিন্তু ওই সভায় সে নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। ব্রডের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল। ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে অনেকক্ষণ কথা বললো।

'দেখো, তোমরা যাকে আধুনিক-টাধুনিক বলো, আমি সেসব পছন্দ করি না। আমার ঝোঁক ক্লাসিক্সের প্রতি।' জবাবে কাফকা শান্তভাবে বললো,

'এরকমভাবে বলছো কেন? ভেবে দেখো, আমরা কোন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।'

'তুমি মেরিঙ্কের পারপেল ডেথের শুরু লাইনগুলো দেখো। এরকম কিছু নেই।'

'না, এটা তেমন কোনো গল্পই নয়। এই গল্পের সবটাই নিখুঁত পরিকল্পনা করে লেখাম কৃত্রিম। কিন্তু হোফমানস্থলকে পড়েছো? তার লেখায় স্যাঁতসেঁতে মানচিত্রের একটা গন্ধ আছে।'

'মানছি। দারুণ একজন পাঠক তুমি, যার চোখ-কান খোলা। সত্যি কথা বলতে জান তুমি।'

'শোনো, কোনো কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার দিন এখন আর নেই। সব কেমন যেন ভেঙে পড়ছে। ভঙ্গুর, অনিশ্চিত।'

'তোমার কথা বুঝেছি। তবু আমি এখনো সমাজের অগ্রগতি নিয়ে ভাবি। তোমার ভাবনাটা কেমন? লেখোটেখো নাকি?'

'লিখি। তবে পড়তে আমার খুবভালো লাগে। আমি গ্রোগ্রাসে পড়ি। রূপকথা আমাকে টানে। অভিযানের গল্প, দূর কোনো দেশের রহস্য, রহস্যগল্প আমার প্রিয়।'

'আর কি কি পড়েছো?'

'গোটে, ডারউইন, স্পিনোজা, একহার্ট।'

'বাহ্, দারুণ তোমার পঠনপাঠন। আর লেখালেখি?'

'লিখেছি কিছু। কিন্তু সব পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'বলো কি, তুমি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলে তো আমাকেই তোমার জীবনী লিখতে হবে।'

ব্রডের কথা শুনে কাফকা সামান্য হাসলো। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেল।

+++

সেদিন আর আজ। কত পার্থক্য। ব্রডের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব থাকার পরেও কাফকা বা ডোরা ব্রডকে তাদের একসঙ্গে থাকার কথাটা বললো না। ডোরা দেরি না করে কাফকার ফ্লাটে উঠলো। তবে আগে যেখানে ছিল সেই এতিমখানা থেকে নিজের জিনিসপত্র সব নিয়ে আসেনি। সেখানেও মাঝে মাঝে থাকতো। এদিকে যত দিন যেতে লাগলো, ডোরার প্রতি কাফকার নির্ভরশীলতা তত বাড়তে থাকলো। ডোরা এতিমখানা ত্যাগ করে কাফকার সঙ্গে থাকা শুরু করলো। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী। বিয়ে নয়, পারস্পরিক সম্মতিতেই একা থাকতে পারে। দুজনে এভাবেই বিয়ে না করে থাকতে শুরু করলো। কিন্তু কাফকার বাবা-মা সেটা মেনে নিতে পারলো না। খুবই ক্ষুণ্ন হলো তারা, মর্মাহত। ডোরার চরিত্রও খারাপ, এমনটাই ভাবলেন তারা। ডোরা আর কাফকার মধ্যে এসব নিয়ে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। দুজনে নিজেদের যাপনের মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে থাকলো।

অ্যাপার্টমেন্টের পরিবেশটা দারুণ। প্রতিবেশীরাও বেশ ভালো। অ্যাপার্টমেন্টটা কাফকার খুব পছন্দ হয়েছে, জায়গাটাও। ছোট বোন ওত্তেলা উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে ভেবে কাফকা তাকে একটা চিঠি লিখলো, 'এখানকার সন্ধেগুলোতে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির বাইরে পা বাড়ালেই বাগানে ফুটে থাকা ফুলের সুগন্ধ মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়। বেশ তীব্র আর ঝাঁঝালো তার গন্ধ। অন্য কোথাও আমি এরকম দেখিনি বা উপলব্ধি করিনি। সবকিছু ঘটছে এই বাগান আর ফুলের সুগন্ধকে ঘিরে। ভাষায় এসব বর্ণনা করে বোঝানো কঠিন।' কাফকার ইচ্ছে, ওত্তেলা নিজে এসে সব দেখে যাক। ভাই কেমন আছে, কোথায় আছে। চিঠির শেষে একটা বাক্যের নিচে দাগ দিয়ে কাফকা সেটা বোনকে বুঝিয়ে দিলেন : 'যা-ই বলিস, তোর কি ইচ্ছে হয় না নিজের চোখে এসব দেখতে?

শুরুতেই যে সমস্যাটা দেখা দিল সেটা হলো হুহু করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। কাফকা ওই চিঠিতেই বোনকে আরও লিখলো, 'বাড়িওয়ালি আমাকে পেয়ে বেশ খুশি। আমি যে ঘরটা ভাড়া নিয়েছি সেটার ভাড়া ২০ ক্রাউনের বেশি নয়। কিন্তু আমরা তাকে সেপ্টেম্বর মাসের জন্যে ৭০ ক্রাউন আর অক্টোবর মাসের জন্যে ১৮০ ক্রাউন দিয়েছি। তবে জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বাড়ছে।' একই দিনে বন্ধু ব্রডকে লিখলেন, 'আমি এখানে এসে অঙ্কের চক্করে পড়ে গেছি।'

হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে মানুষের স্বাভাবিক জীবন। কুঁজো হয়ে যাচ্ছে শিরদাঁড়া। সংবাদপত্রের পাতায় অর্থনীতি ধসে পড়ার হেডলাইন। চারিদিকে হাহাকার, হাহুতাশ। যে সংবাদপত্রের একটা কপি কিনে পড়তে লাগতো ৪০ মার্ক, মুদ্রাস্ফিতির কারণে লাফ দিয়ে হলো এক লক্ষ মার্ক। অথবা ২৫০ ডলার। যে রুটির দাম ছিল ৬৯ হাজার মার্ক, একমাসের ব্যবধানে সেই রুটি বিক্রি হতে থাকলো ৪০ লক্ষ মার্কে। আর এই দামে যখন রুটি বিকোচ্ছে সেটা ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর এভাবেই জ্যামিতিক হারকে ছাড়িয়ে বাড়ছিল জিনিসপত্রের দাম। কাফকা এই সেপ্টেম্বরেই বার্লিনে আসে। ওই বছরটা জার্মানির ভয়াবহ মুদ্রাস্ফিতির বছর। প্রতিদিন জীবনযাত্রার ব্যয় ২০ শতাংশ করে বাড়ছে। প্রতিদিন দুপুরে মুদ্রার নতুন হার ঘোষণা করা হচ্ছে। টাকা যেন খোলামকুচি। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাড়া তাড়া নোট ছাড়া কোনো কিছুই কেনা সম্ভব হচ্ছে না। যুদ্ধের আগে এক মার্কের বিনিময় হার ছিল এক গোল্ড মার্ক। এক ডলারের বিনিময় হার ছিল চার জার্মান মার্কের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি। নভেম্বর আসতে না আসতেই জার্মান মার্কের ঘটলো মহাপতন। জীবন বাঁচানো ভীষণ কঠিন হয়ে উঠলো। ছোট আর মাঝারি আকারের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়লো। বেকারত্ব বাড়ার হার অকল্পনীয়। যাদের চাকরিবাকরি আছে তাদের অবস্থাও করুণ। একগাদা নোট নিয়ে মানুষ বাজারে ছুটছে আর সামান্য কয়েকটা জিনিস কিনে বাড়ি ফিরছে। শ্রমিকদেরকে প্রথমে সপ্তাহে এক বার, পরে দুই বার, এবং সবশেষে পাঁচ বার মজুরি দেয়া হচ্ছে। প্রকাশক লেখককে অগ্রিম টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু লেখকের হাতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই সেই টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপিটাও পাঠানো যাচ্ছে না। কী দুর্ভাগ্যপীড়িত লেখক।

যুদ্ধের কারণে সিন্দাবাদের বোঝার মতো ঋণের বোঝা জার্মানির কাঁধে। অর্থনৈতিক এই দুরবস্থার

জন্যে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীরা এই ঋণকেই দায়ী করলো। কেউ কেউ অভিযুক্ত করছে বড় বড় শিল্পকারখানার মালিক আর ধনী ভূস্বামীদের। ১৯২৩ সালের এই বছরই কি তাহলে জার্মানিতে বেজে উঠলো গণতন্ত্রের বিদায়ঘণ্টা?

++++

ডোরা আর কাফকা, সম্পর্কটাকে রক্ষা করছে গোপনে। বার্লিনে পৌঁছেই প্রিয় বন্ধু ব্রডকে কয়েকটা চিঠি লিখলো। কিন্তু কোনো চিঠিতেই ডোরার কথা নেই। শুধু একবার, একবার, ২৭ শে সেপ্টেম্বর যখন ব্রডের প্রেমিকা এমি কাফকার অ্যাপার্টমেন্টে দেখা করতে আসে, তখন সেখানে ডোরা উপস্থিত ছিল। এইটুকু। 'প্রিয় ব্রড, গতকাল, বৃহস্পতিবার, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এই প্রথম আমি সামাজিকতা করলাম। ডোরাও তখন হাজির ছিল। ডোরার উপস্থিতি সত্যি বলতে অনিবার্য ছিল।' ডোরা সম্পর্কে এর বেশি একটা কথাও নয়। চিঠিতে ডোরার এরকম ক্ষীণ উল্লেখ দেখে ব্রড খেপে গেল। কাফকা ডাক্তার বন্ধু ক্লপস্টককে লিখলো, 'এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। পরে কখনো বিস্তারিত বলবো।' কিন্তু কাফকা ডোরা সম্পর্কে তাকে কখনও কিছু বলেনি।

কাফকা আর ডোরার সম্পর্কের কথা প্রথম জানতে পারলো রোসলার। আর তাতেই তার হৃদয় ভেঙে চৌচির। রোসলার থাকতো স্টিগলিৎজে। কাফকা বার্লিনে আসার পরে তার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে যায় বার্লিনে। সঙ্গে এক শিল্পী ছেলেবন্ধু। বার্লিনে আসার পর রোসলারকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে ডোরার সঙ্গেই তার বেশিরভাগ সময় কাটছে। কিন্তু এটা যে কোনো রোমান্টিক সম্পর্কে গড়াতে পারে, রোসলারের তা মনে হয়নি। উনিশ বছরের এই টিনএজ মেয়েটির ইচ্ছে নৃত্যশিল্পী ও কোরিওগ্রাফার হওয়া। কাফকাকে নিয়ে সে দিবাস্বপ্নে ডুকে আছে। কাফকা যখন মুরিৎসে তখন তাঁকে দেখার জন্যে সেখানে ছুটে গিয়েছিল। অবশ্য মুরিৎসতে শুধু রোসলার নয়, ডোরাও নয়, আরও অনেকের কাছেই কাফকা ছিল প্রার্থিত পুরুষ। কেউ হয়তো কাফকার লেখা একলাইনও পড়েনি, কিন্তু তার দুর্মর আকর্ষণে পতঙ্গের মতো প্রদীপের দিকে ধাবিত হতো। সবাই ভাবতো কাফকা নিশ্চয়ই আবার তাদের মাঝে আসবে। এতেই তারা গৌরববোধ করতো। সাবাইন, ডাক নাম বাইন, রোসলারের পরিচিত বার্লিনের ষোল বছরের একটি মেয়ে, সেও কাফকার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে।

অক্টোবর ১৯২৩। হঠাৎ করে রোসলার কাফকার অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির হলো। দরোজা খুললো ডোরা। ডোরাকে দেখেই রোসলার মনে মনে চমকে উঠলো, 'ওহ্, মুরিৎসের সেই রান্নার মেয়েটি না, এখানে! এ তো দেখছি একেবারে কাফকার বউয়ের মতো আচরণ করছে।' মুখে সে কিছুই বললো না, কিন্তু গভীর বিষাদ তাকে ঘিরে ধরলো। গত দুই মাস ধরে যে দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবেছিল, হঠাৎ করে তা দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো। তার মন ক্রমশ অনিশ্চিত অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যেতে থাকলো।

দুই সপ্তাহ হয় বার্লিনে এসেছে কাফকা। এবার ছোট বোনটাকে একটা চিঠি লেখা দরকার। বার্লিনে যখন কাফকা আসে তখন ওত্তেলাকে বলেছিল, 'বার্লিনে একবার বেড়াতে আসবি। কেমন থাকি দেখে যাবি।' চিঠিতে আবারও সে-কথারই পুনরুক্তি করলো কাফকা। তবেশুধু বোনই যেন আসে, অন্য কেউ আসুক কাফকা তা চায় না, 'আমি বিরক্ত হই, তুই নিশ্চয়ই তেমন কোনো কথা বলবিনা।...আমি অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে খুবভয় পাই। এখানে আমি থিতু হবো কিনা, সেটা বলার সময় এখনো আসেনি। রাতগুলো এখনো ঘনকৃষ্ণকালো। অনেক শঙ্কার মধ্য দিয়ে কাটছে রে। বার্লিন যেন আমার শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করে দিচ্ছে। কঠিন সময় পার করছি আমি। বাবার কথা তো জানিস। তিনি যা ভাবেন, ভাবতে পারেন। প্রাহাকেই আমি যেন বার্লিনে বয়ে এনেছি।' এরকম ছিল না কাফকার দিনযাপন। নতুন করে নতুন জীবনযাপনে সে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। তার প্রিয় পত্রিকা 'সেলবস্টার' (আত্ম-প্রতিরোধ)। প্রতি সপ্তাহে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি কাফকার কাছে আসে। সেই ১৯১৩ সাল থেকে পত্রিকাটি সে পড়ছে। প্রথম প্রচ্ছদ থেকে শেষ প্রচ্ছদ, কোনো কিছুই বাদ যায় না। লেখক ও দার্শনিক বন্ধু ফেলিক্স ওয়েলশ পত্রিকাটির সম্পাদক। ফেলিক্সই এর সর্বশেষ সংখ্যাটা কাফকাকে পাঠিয়েছে।

কাফকা ফেলিক্সকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি লিখলো, 'যত দিন বাঁচবো ভেবেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশি দিন বেঁচে আছি। তোমার পত্রিকাটা তাই আমি মিস করতে চাই না।' সেই সঙ্গে কাফকা জানালো, 'যদিও এক শহরে আছি, তবু তোমার বোন লিসের সঙ্গে এখনো দেখা করতে পারিনি। দিনগুলি কত ছোট, অন্তত আমার জন্যে। প্রাহার তুলনায় কত দ্রুত যে দিন ফুরায়। হ্যাঁ, আনন্দে আছি বলেই হয়তো এরকম মনে হয়। ক' লাগে দিনগুলি দ্রুত শেষ হয়ে যায় বলে। কিন্তু সময় তো এমনই। যখনই তুমি তোমার হাতটা সরিয়ে আনবেতখনই এর চাকাটা ঘুরতে থাকবে, তুমি তোমার হাতটা দিয়ে আর তাকে ছুঁতে পারবেনা।' বার্লিনে কীভাবেদিন কাটছে চিঠিতে দিলেন তার দীর্ঘ বর্ণনা। লিখলেন আমি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে খুবএকটা যাই না। প্রতিবেশীরা দারুণ। আমার অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তা আর চারপাশটা যেন আধা গ্রাম আধা শহরের মতো। কিছু দূর গেলেই বাগানঘেরা গ্রাম। আমার এখান থেকে আরো পনেরো মিনিট গেলে একেবারেই জঙ্গল। এখনো সেখানে আমার যাওয়া হয়নি। তো, প্রিয় বন্ধু, শহরের এই নতুন আগন্তুকের বেশ চমৎকার দিন কাটছে।'

দু সপ্তাহ হয় কাফকা বার্লিনে এসেছে। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তবু ভালোই লাগছে শহরটাকে। ওত্তেলাকে জানালো, শীতটা এখানে থাকতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। উদ্বেগে আছি জিনিসপত্রের আকাশচুম্বি দাম নিয়ে। লাগামহীনভাবে বাড়ছে তো বাড়ছেই। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ভালই থাকি। কদিন আগে সিটি সেন্টারে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কাশি শুরু হয়ে গেল। উদ্বেগ বাড়লো। শহরগুলো মারাত্মক। মনে হয় আমার বিরুদ্ধে লেগে থাকে। এতকিছুর পরও বার্লিন আমি ছাড়তে চাই না। ক্লপস্টককেও লিখলো একই কথা। শহরটা বেশ শান্ত। অনিন্দ্য সুন্দর শিশুদের দেখি। পাতা ঝরা দেখি। শহরের কেন্দ্র থেকে দূরে থাকতেই ভালো লাগে। সারি সারি গাছ। শুনি পাখির ডাক।

একই দিন ব্রডকেও একটা চিঠি লিখলেন কাফকা। ব্রডের জিজ্ঞাসার জবাবে বললো, সে আর প্রাহায় ফিরতে চায় না। অন্তত এখন নয়। দুই মাসের মধ্যে নয়। ভয়ের কোনো কারণ নেই। পত্রিকাটত্রিকা এখন কাফকা পড়ে না। ব্যক্তিগতভাবে এখনো সে শান্ত আছে। যতদিন পেটে ভাত জুটবেততদিন বার্লিনে সে থেকে যাবে। যেমন থাকতো প্রাহায়। আবহাওয়া খারাপ হলে কাফকা বাইরে বের হয় না, ঘরেই সময় কাটায়। কফ, যা নিয়ে কাফকার উদ্বেগ, তেমন একটা ফিরে আসে না। গত কিছু দিন ধরে রাতগুলো যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তবু তার প্রাহায় ফিরে যাওয়া হবেনা। খুবকরে চাইলেন ব্রড যেন বার্লিনে এসে কাফকার সঙ্গে দেখা করে। সঙ্গে যেন কাফকার জন্যে একটা গরম কাপড় ভরা সুটকেস নিয়ে আসে। ব্রডের নিজের জিনিসপত্রের সঙ্গে সেটা আনতে নিশ্চয়ই সমস্যা হবেনা।

কাফকার চিঠিটা পেয়ে ব্রডের দুশ্চিন্তা আরও বাড়লো। উৎকণ্ঠিত ভাষায় কাফকাকে চিঠি লিখে বললো, বার্লিনে কাফকার দিনগুলি কেমন কাটছে তোমার সেটা জানাও। কুড়ি বছরের সম্পর্ক তাদের। ব্রড ঠিকই বুঝতে পারলো, কাফকা অনেক কিছু লুকাচ্ছে। কিন্তু ব্রডের জানা দরকার কাফকা কেমন আছে। কেমন করে তার সময় কাটে। খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা আছে? আর ডোরা নামের এই নারীই-বা কে? তোমার কাছে কিছুই লুকাচ্ছি না। তিন দিন ধরে লেখা লম্বা একটা চিঠিতে লিখলো, আমি যদি কিছু না বলে থাকি তার কিছু সঙ্গত কারণ আছে। নিশ্চয়ই তুমি সেটা বুঝবে। আমি শব্দকে বিশ্বাস করি না, চিঠিকে বিশ্বাস করি না, আমার শব্দ ও চিঠিকেও আমি বিশ্বাস করি না। একটা চিঠিকে কত যত্ন করে আমরা পাঠাই। শিল্পে, আমি মনে করি, এ ধরনের কৌশলগত কিছু ব্যাপার থাকতে হয়। শব্দের মধ্য দিয়ে সত্যিটাকে তুলে আনতে হয়।

ফেলিস আর মিলেনা, কাফকা তার এই দুই পূর্ব-প্রেমিকার সঙ্গে চিঠি লিখেই প্রেম করেছে। কিন্তু এখন অন্য ব্যাপার। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবকরতে পারছে ডোরাক। স্পর্শ আর দৃষ্টির পরিসীমার মধ্যে বিচরণ তার। কাফকার সঙ্গে একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। এইভাবে কোনো নারী, যে তাকে অনুপ্রাণিত করছে, একসঙ্গে থাকছে, সেই অভিজ্ঞতার কথা কাফকা এখন বলতে পারে। কিন্তু ব্রডকে সেসবকথা বলা যাবেনা। তবু বন্ধু, কিছু না কিছু তো বলতেই হবে। কাফকা ব্রডকে জানালো ওর নাম ডায়মন্ট। তবেশুধু এই একটি বাক্য, ডোরা সম্পর্কে আর কিছু লিখলো না কাফকা। পরে আরও একটা চিঠিতে ডোরার উল্লেখ ছিল। কিন্তু সে শুধু 'ডি' এরকম সংক্ষিপ্ত রূপে। ডোরা আছে তাই খাবারদাবারের সমস্যা নেই। আসলে ব্রড তো জানে না, কত চমৎকার রান্না করতে পারে ডোরা। এছাড়া দুজনে বাইরে রেস্তোরাঁতে গিয়েও তো খায়। সেই খাবারও তো ভালো। এরপর বন্ধুকে সেইসবখাবারের ফিরিস্তি দিল কাফকা।

কাফকা আর ডোরা অবশ্য সবসময় রেস্তোরাঁতে খেতে যায় না। ডোরাই সবকিছু রান্না করে। দিনে কাফকা ফ্রেশ ফল, য়ুগার্ট ও রুটি খায়। অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই আছে চমৎকার একটা চেক বেকারি। সেখান থেকে মাখন নিয়ে আসে। অক্টোবরের মাঝামাঝি। বার্লিনে আসার পর এই প্রথম সে বাবা আর মাকে চিঠি লিখলো। বিগত চল্লিশ বছরেও এত চিঠি কাফকা তাদের লেখেনি। সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশটা চিঠি তো হবেই। যদিও শোনা যাচ্ছে জার্মানিতে খাদ্য সংকট চলছে, তবেকাফকার

কোনো খাবার সংকট হচ্ছে না। ভেজিটেরিয়ান কাফকা, সেই সঙ্গে ওজন বাড়ানোর জন্যে ডাক্তারের পরামর্শে মাখন খেতে হয়। কিন্তু মাখন এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। এ মাসেই এক পাউন্ড মাখনের দাম বেড়ে দাঁড়ালো ছয় লক্ষ মার্ক। কাফকা যে ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ করতেন সেখান থেকে পাচ্ছেন অর্থ। তারা টাকাটা দিচ্ছে চেক মুদ্রা ক্রোনেনে। যারা বিদেশি মুদ্রায় মাখন কেনে, তারা কিনতে পারে। ওত্তেলাকেও কাফকা লিখলো মাখন পাঠাতে।

বার্লিনে কাফকা বিদেশি। এই বিদেশি হওয়ার কারণে তার অনেক সুবিধে হলো। কাফকা ওয়ারকার্স অ্যাকসিডেন্ট ইন্সুরেন্স থেকে পেনশন পেতেন চেক ক্রোনেন মুদ্রায়। আমেরিকান ডলারের বিনিময় এর হার ছিল আন্তর্জাতিক মানের। চক্রবৃদ্ধি হারে এইসময় বাড়ছিল বাড়িভাড়া, খাদ্যের দাম, গাড়ি ভাড়া, এইসব। কাফকার বাবা-মা এই টাকাটা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তারা টাকাটা কাফকাকে না দিয়ে আটকে দিল। আর এদিকে অস্থির কাফকা ওই টাকাটা পাওয়ার জন্যে চিঠির পর চিঠি লিখতে থাকলো। বাবা মা মনে করলো, আর কিছু না হোক, এই টাকার জন্যেই কাফকা তাদের চিঠি লিখবে। ক্লপস্টককে কাফকা এখনো ডোরার কথা বলেনি। কিন্তু বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবনের লক্ষ্য পূরণ হতে যাচ্ছে বলে জানালো। আর সেটা ঘটতে চলেছে বার্লিনেই। এই যে দিন দিন জিনিসের দাম বাড়ছে, তাও সে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেনা। এই শহরের বাইরে অন্য কোথাও কাফকার ভালো থাকা হবেনা।

বার্লিন এখন কাফকার সবচেয়ে প্রিয় শহর। এই শহরের সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে তার প্রাণস্পন্দন। জীবন। বয়সও তো অনেক হয়েছে, চল্লিশ। এতদিন পর পূরণ হতে চলেছে তার দীর্ঘলালিত স্বপ্ন। অক্টোবরের এক সন্ধ্যায়, ডোরার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'প্রাহা থেকে শিকড় ছিন্ন করে এসেছি। যদিও দেরি হয়ে গেছে, তবু স্বপ্নপূরণ আর সফলতার আগে কারুর মরে যাওয়ার অধিকারও জন্মায় না।'

চতুর্থ অধ্যায়

বার্লিন নভেম্বর ১৯২৩

কাফকা আর ডোরা এখন একই অ্যাপার্টমেন্টে। একই ছাদের নিচে। কাফকার সঙ্গে একদিন থাকার অর্থ তার সবকিই পড়ে ফেলার চেয়েও ঢের বেশি আনন্দে থাকা। কাফকার বন্ধু দার্শনিক ফেলিক্সকে ডোরা এমনটাই বলেছিল। কাফকা যে একজন খ্যাতিমান লেখক, ততদিনে ডোরার তা জানা হয়ে গেছে। ডোরা আসলে কোনো লেখকের প্রেমে পড়েনি। মানুষ বলতে ডোরার একধরনের আইডিয়া বা ভাবনা আছে। ফেলিক্সকে ডোরা লিখলো, 'আপনার বন্ধুটি সবসময় আমাকে হাসি-তামাশায় মাতিয়ে রাখে। ওর সঙ্গে থাকা মানে স্বর্গবাস।' কাফকার লেখাপত্তর ডোরার খুবই প্রিয়। কিন্তু তার চেয়ে প্রিয় এই মানুষটি। হ্যাঁ, মানুষের যে ভাবমূর্তি ডোরা এতদিন নিজের মধ্যে লালন করছিল, কাফকা ঠিক তেমনই। কাফকার গ্রন্থের চাইতে কাফকা অনেক বড়। কাফকা একেবারেই ভিন্ন প্রজাতির মানুষ। কাফকার সঙ্গে যেদিন তার প্রথম দেখা হয়, সেদিনই সে সেটা বুঝেছিল। শুধু ডোরা নয়, অন্যেরাও বোঝে। বন্ধু আর পরিচিতজনদের সবার মুখে একই কথা। কাফকার প্রভাবকেউ এড়াতে পারে না। কাফকা যেন সেই জ্যোতির্বলয় যার চারপাশ ঘিরে থাকে একটা আলোর বৃত্ত।

শুরু হলো যৌথ দিনযাপন। গল্পকথন, উঁচু স্বরে বই পড়া আর মধুর খুনসুটি।

'এই, তুমি তো আমাকে পাগল করে দেবে।'

'এইটুকুতেই হয়ে গেল? আমি তো জন্ম থেকেই এমন। ফান করতে ভালোবাসি।'

'হু, বাবা, বুঝেছি। এই যে তুমি চিঠিটা খুলতে খুলতে কত কথা বললে। কার না কার চিঠি।'

'ব্রডের চিঠি। এই চিঠির মধ্যে তেলাপোকা আছে কিন্তু...।'

'ওহ্, না বাবা।'

'এই দ্যাখো টেবিলের ওপর চিঠিটা রাখছি। খুললেই তেলাপোকাটা বেরুবেআর ফরফর করে উড়ে এসে তোমার চুলে বসবে।'

'আবার? আচ্ছা ঠিক আছে এবার থামো। আমি মানছি তুমি তেলাপোকাদের পরম বন্ধু। কিন্তু আমার তো ভয় করছে।'

'কী বোকা তুমি। সত্যি সত্যি কি কেউ চিঠির মধ্যে তেলাপোকা পাঠায়?'

'তা পাঠায় না। তুমি যে ফান করছো সেটা তো বুঝেছি। কিন্তু তেলাপোকার নাম শুনলেই আমার গা গুলিয়ে আসে। ভীষণ ভয় করে।'

'কিন্তু জানো, এই ছোট্ট প্রাণীটা আমার খুবপ্রিয়। এই বৈরি পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বেঁচে আছে।'

'থাক, এ নিয়ে আর ফান নয়, সোনা। এবার শান্ত হও।'

দিনটা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। কাফকা ভাবছিল আজ কোন খেলাটা খেলবে। ভাবতে ভাবতে এই খেলাটার কথা তার মাথায় আসে। কিন্তু চিঠি, কে পাঠাবেআজ চিঠি? আর তখনই ব্রডের চিঠি এলো। ব্রড এমনই। একদিন-দুদিন পরপর চিঠি লেখে। বেচারা তার প্রেমিকাকে নিয়ে বেশ ভাবনায় আছে। ব্রডের চিঠিটা পেয়েই কাফকার মনে হলো খেলাটা আজ দারুণ জমবে। কাফকা জানে, ডোরা মেয়েটা বড্ড দুখি। ওকে সবসময় আনন্দে রাখতে হবে। যেভাবেই হোক। ডোরাও কাফকার এই নিত্য-নতুন খেলার কাছে নিজেকে সঁপে দিল। এই সঁপে দেয়ার মধ্যেও যে কত সুখ। একথা শুধু ডোরাই জানে।

'আমার ভাবনার সবটাই ধোঁয়াশায় ভরা। যদি কিছু হয় আমাকে ঘিরে তাহলে আমি বেশ তৃপ্ত থাকি।' কাফকা বললো।

'কিন্তু সম্পর্ক কি এতটা আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে?' ডোরার প্রশ্ন।

'না, একেবারেই নয়। আমি আত্মকেন্দ্রিক কিন্তু তোমার প্রতি মনোযোগটা অনেক গভীর।'

'হ্যাঁ, সে আমি জানি।'

'সম্পর্ক হতে হয় সুনির্দিষ্ট, লক্ষ্যভেদী, নিরেট, ভারসাম্যপূর্ণ। এসবগুণ তো আমার নেই।'

'না, আছে। তুমি তো আমাকে সবসময় আনন্দেই রাখছো।'

'আমাকে ঘিরে আছে নিঃসীম কুয়াশা। কেউ এরকম পরিবেশে আমার সঙ্গে থাকতে চাইবেনা।'

'কিন্তু আমি তো থাকছি। আমি তো তোমার সঙ্গে মেঘের কুয়াশার মতোই মিশে আছি।'

'এ তোমার বদান্যতা।'

'না, এ আমার ভালোবাসা। আমি তোমার স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ঢুকে পড়েছি তোমার খেলার মধ্যে।'

'কোনো দিন তোমার স্বপ্নভঙ্গ হবেনা তো? ছেড়ে যাবেআমাকে?'

'মনে হয় না।'

কাফকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো,

'তাহলে বলো, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি?'

দুজনের একই স্বপ্ন।

ডোরা জানালো জেরুজালেমে যেতেই হবে। দুজনেই যাবে, একসঙ্গে।

'সেখানে গিয়ে আমরা নতুন জীবন শুরু করবো। একটা রেস্তোরাঁ খুলবো।'

'আমি রাঁধবো আর তুমি ওয়েটারের কাজ করবে।'

'আমাদের এই স্বপ্নটা যেন সত্যি হয়।'

'হবে, হবে, সোনা।'

'জানি না, আমরা কবে জেরুজালেম পৌঁছুতে পারবে।'

'তুমি যখন ওয়েটারের কাজ করবেতখন প্রতিদিনের জীবনকে অনেক কাছে থেকে দেখতে পাবে।'

'তাহলে ওয়েটারের কাজটা আমাকে করতেই হবে। একাই করবো কাজটা।'

ডোরা জানে কাফকার এই একটাই স্বপ্ন। একটাই লক্ষ্য। কিন্তু কাফকার শরীরটা এমন যে এই স্বপ্নপূরণ কখনো সম্ভবহবেনা। কাফকাও এটা জানে। কিন্তু তারপরও সে এরকম বলে। কাফকার কাছে এটা হয়তো একধরনের খেলা। তবেসিরিয়াস একটা খেলা। ডোরা ভাবে, এরকম স্বপ্ন দেখে যে মানুষ সে কী করে নিহিলিস্ট হয়? কাফকা মদ্যপানও করে বেশ আনন্দের সঙ্গে। ডোরা এবার কাফকাকে জিজ্ঞেস করে,

'তুমি তো মদ্যপান করতে ভীষণ ভালোবাসো। আনন্দ পাও। জীবনকে তুমি ভীষণ ভালোবাসো। কী করে তাহলে এসবলেখা লেখো? কী করে ঘৃণার কথা তুমি বলো?'

'দ্যাখো, নিজের লেখার প্রতি আমি সৎ থাকতে চাই। সময়টাই তো এমন। এখন কোনো শুভবোধ আর অবশিষ্ট নেই। সবকিছু ভেঙে পড়ছে। আমার লেখা তো এমনই হবে। একইসঙ্গে আমি আবার জীবনকেও উপভোগ করতে চাই।'

ডোরা আর কথা বাড়ায় না। সে কাফকার হৃদয়ের গভীর তলদেশ পর্যন্ত দেখতে পায়।

অন্যদিকে কাফকার আগ্রহ ডোরাকে নিয়ে। এমনভাবে তো কেউ তার জীবনে আসেনি। তাকে নিয়ে ভাবেনি। পোলান্ডে কেমন করে কাটতো ডোরার দিন? তার বাবার কথা কাফকা শুনেছে। কিন্তু আরও অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে।

এসবকথা ভাবতে ভাবতে কাফকা দেখলো দিনের আলো কমে আসছে। বাইরে সারি সারি গাছের ফাঁক গলে শেষ বিকেলের আলো ঢুকে পড়ছে ঘরে। সেই আলোর কিছুটা এসে পড়লো ডোরার মুখে। অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রীতে সূর্যরশ্মির কী চমৎকার রেখাচিত্র। কী সুন্দর যে লাগছে ডোরাকে। কাফকা মুগ্ধ। ডোরা সম্পর্কে তার আগ্রহের যেন শেষ নেই।

'আমার সম্পর্কে তোমার তো দেখছি অনেক কৌতূহল।'

কাফকা আর ডোরা দুজন একটা টেবিলের মুখোমুখি বসে কথা বলছে। এবার ডোরার কথা শুনে তার কাছে এসে আলতো করে কপালে একটা চুমু খেল। ডোরার কথার জবাবে বললো,

'থাকবেনা? কি বলো? আমার তো অনেক কিছু সম্পর্কেই আগ্রহ। প্রতিদিনের জীবনকে আমি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখি।'
'সেটাই তো দেখছি। ছোটখাট কোনো কিছুই তোমার দৃষ্টি এড়ায় না।'
'প্রতিদিনের জীবনের মধ্যেই আমি ঈশ্বরের উপস্থিতি লক্ষ করি।'
'তুমি তো মানুষকে সাহায্য করেও আনন্দ পাও।'
ডোরা জানে কাফকা কথা বলতে ভীষণ ভালোবাসে। যখন সে কথা বলে, ডোরা লক্ষ করেছে, তার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে। হাসির কথা কাফকা বলবেই। কিন্তু শুধু হাসি নয়, হাসির আড়ালে যে অশ্রুপাত থাকে, কাফকার কথায় সেই আইরনিটুকুও থাকে। কথা বলে এমন করে যে, সে-ই সবটা জানে অন্যেরা জানে তার চাইতে কিছুটা হলেও কম। তার কথা বলার ভঙ্গিটাই দারুণ প্রাণবন্ত। কথার মধ্যেই থাকে ছবির পর ছবি। কাফকার লেখার মতোই তার কথাগুলিও তাই চিত্ররূপময়। তার দুহাতের দুটো কব্জি ক্ষীণ কিন্তু সুন্দর। হাত দুটো অন্য সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশ লম্বা। কথা বলার সময় হাতের আঙুলগুলো শূন্যে ঘুরতে থাকে। কাফকা যখন কোনো গল্প বলে তখন সেই আঙুলগুলো নানা আকার নেয়। এই আকার পাওয়া আঙুলগুলো অন্য গল্প বলে। কাফকা যেন আঙুল দিয়ে শব্দকে আঁকে। বাক্য লেখে। কাফকা যখন সুন্দরভাবে কিছু প্রকাশ করতে পারে, অর্থাৎ কথা যখন শিল্প, ডোরা তখন দেখেছে, কোনো কিছু নির্মাণের তৃপ্তিকর অনুভূতি তার চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে। কাফকার জীবনের শেষ দিনগুলো এরকমই।
ডোরা সেই দিনগুলোকে নানাভাবে ভরিয়ে তুললো। কিন্তু কাফকার শরীর ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ডোরা ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো। কাফকাকে স্যানেটোরিয়া ভর্তি করিয়ে দিল। ভীষণ অসুস্থতা নিয়ে স্যানেটোরিয়ামে দিন কাটছে কাফকার। এরই মাঝে একদিন ডাকে বইয়ের প্রুফরিডিংয়ের একটা প্যাকেট এসে পৌঁছুলো। 'আ হাঙ্গার আর্টিস্ট' বইটার প্রুফ দেখা শুরু করলো কাফকা। বন্ধু ব্রডও একদিন কাফকাকে দেখতে এলো। কাফকাকে দেখে স্বস্তি বোধ করলো ব্রড।
কাফকার ওখান থেকে ঘুরে গিয়ে ডায়রিতে ব্রড লিখলেন, 'ফ্রাঞ্জকে দেখে খুব ভালো লাগলো। কী প্রাণবন্ত উৎফুল্ল লাগছিল ওকে। যে স্ট্রবেরি আমি ওর জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই লম্বা সময় ধরে তার গন্ধ শুকলো, খেলো।
এরকম ভালো লাগা থেকেই কাফকা চিঠি লিখতে বসলো। বাবা মায়ের কাছে লেখা শেষ চিঠি। সম্বোধনও উল্লেখ করার মতো, কাফকা চিঠিটা শুরু করলো, 'প্রিয়তম বাবা-মা, প্রায়ই তো আমাকে বাড়িতে আসতে বলো। আমিও প্রতিদিন ভাবি, একবার ঘুরে এলেও তো পারি। কতদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় না।' কিন্তু এই চিঠিটা শেষ করতে পারলো না কাফকা। লিখতে লিখতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।
'আর লিখতে হবেনা, আমাকে দাও।' কাফকার হাত থেকে চিঠিটা কেড়ে নিল ডোরা।
'অনেকটাই তো লিখেছো তুমি। বিশেষ করে জরুরি কথাগুলো বাদ যায়নি।' একটু রাত হয়েছে। কাফকা ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু ডোরার ঘুম এল না। মনে মনে ভাবলো, সামান্য কটা লাইন, কিন্তু কী অসামান্য চিঠি। কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে এরকম অসুস্থতার মধ্যেও বাবা-মাকে চিঠি লেখা যায়।
পরদিন, ১৯২৪ সালের ৩ জুন। কত কত রাত গেছে ডোরা কাফকার শিয়রের কাছে বসা। কিন্তু আজকের সকালটা কেন যেন অন্যরকম লাগছে। প্রতি মুহূর্তে ডোরা যেটা করে, কাফকার শ্বাসপ্রশ্বাস আর বুকের ওঠানামা নিবিড়ভাবে লক্ষ করতে থাকলো। বুকটা কি একটু বেশি কেঁপে কেঁপে উঠছে? অন্য দিনগুলোতেও কি এরকম হতো? তখন ভোর চারটা। প্রত্যুষের আলো ভালো করে ফোটেনি। ডোরার কেমন যেন মনে হলো। সে দ্রুত কাফকাকে ছেড়ে দোতলায় উঠে রবার্টকে ডেকে তুললো।
'কী হয়েছে ডোরা? খারাপ কিছু? চলো দেখছি।' রবার্টের দায়িত্ব হচ্ছে কাফকার দেখভাল করা। স্যানেটোরিয়াম থেকেই তাকে এই কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
দু-তিন মিনিট মাত্র। শেষ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে রবার্ট আর ডোরা প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নামলো। রবার্ট একটু কাছেই যেতেই বিপদ আঁচ করতে পারলো। সেই সময়ের ডিউটি করা ডাক্তারকে রবার্ট ডেকে আনলো।
'আমি একটা ইনজেকশন দিচ্ছি। কিন্তু কোনো কাজ হবেনা। কিছুই হয়তো এবার আর করা যাবে না।'
ডাক্তার চলে গেলে ডোরা কাফকার মাথাটাকে নিবিড়ভাবে কোলে টেনে নিল। যতটা সম্ভব তাকে আরাম দিতে চাইল।
'ডোরা, আমার ডোরা... আমার কপালে তোমার হাতটা রাখ তো।'
কাফকার বুকটা যেন হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে।
'এই হাত, সত্যি বলছি, আমার সাহস আমার স্বস্তি।' তীব্র বেদনায় কুঁকড়ে গিয়ে কাফকা কথাগুলো বলছিল। ডাক্তার যখন ইনজেকশন দিচ্ছিল, ডোরা তখন কাফকার কাছে ছিল না। ইচ্ছা করেই সে পাশের ঘরে চলে যায়। এর আগে ডোরা দেখেছে এরকম ইনজেকশন দিলে কাফকা প্রচণ্ড ব্যথা পায় আর তার শীর্ণ শরীর বেঁকেচুরে বিছানায় ছটফট করতে থাকে। এ রকম দৃশ্য ডোরার সহ্য হয় না। কিন্তু কাফকা যখন 'স্বস্তি' কথাটা উচ্চারণ করলো তখন বেদনার নীলাভ একটা প্রবাহ ডোরার শরীর চিরে বেরিয়ে এসে কাফকাকে বুঝি জড়িয়ে ধরে স্বস্তি দিতে চাইলো। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'আহা, জীবন'।
কাফকা এর মাঝেই কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। তার মনে পড়ে গেল বাবা-মাকে লেখা চিঠিটার কথা। ডোরাকে বললো, 'চিঠিটা পোস্ট করে আসো, এখুনি।' ইতোমধ্যে ডাক্তারের কথামতো নার্স আইসব্যাগ নিয়ে এসেছে।
'না, তোমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে আমি এখন যেতে চাই না।' কথাটা শুনে কাফকার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। রবার্ট কাফকার অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে ভেবে ডোরাকে চিঠিটা পোস্ট করে আসতে বললো। অনিচ্ছুক ডোরা চিঠিটা নিয়ে প্রায় ছুটে বাইরে চলে গেল।
কাফকার দিকে তাকিয়ে রবার্ট বুঝতে পারলো মরফিন ইনজেকশনটা কাজ করা শুরু করেছে। নিজের শরীরের অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি দিয়ে কাফকা আইসব্যাগটা ছিঁড়ে ফেললো। ছুঁড়ে ফেললো দূরে।
'আমাকে আর অত্যাচার করো না', বলেই কাফকা কেঁদে ফেললো। 'আমাকে সেই মাদকটা দাও যা নিলে আমি ভালো থাকি। কেন আমার কষ্ট বাড়াচ্ছ? ... চার বছর ধরে তো তোমরা আমাকে বলে আসছো আমাকে স্বস্তি দেবে, তাহলে এখন কেন এমন করছো?' কাফকার অভিযোগের তির রবার্টের দিকে।
'তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ। তোমার সঙ্গে আমি আর কথা বলবো না।'
রবার্ট আরও দুটো ইনজেকশন দিল। কাফকার অবস্থা খারাপ হচ্ছে ভেবেই এই ইনজেকশন দেয়াটা জরুরি হয়ে পড়ে।
'আমাকে তুমি চিট করো না।' কাফকা প্রায় ফিসফিস করে কথাগুলো বললো।
'মেরে ফেলো, আমাকে মেরে ফেলো। তুমি তো একটা খুনি।'
রবার্ট আরও একটা ইনজেকশন পুশ করলো।
'খুব ভালো। দাও, আরও দাও। কিন্তু এগুলো কোনো কাজে আসবেনা।'
রবার্ট দেখলো ডাকাক্তের নির্দেশ মতো প্রয়োজনীয় ইনজেকশনগুলো দেয়া হয়েছে। সিরিঞ্জগুলো পরিষ্কার করার জন্যে একটু সরতেই কাফকা বললো, 'আমাকে ছেড়ে যেও না। ডোরা কোথায়, ডোরা?' কথাটা বলেই কাফকার হঠাৎ মনে পড়লো ডোরাকে তো সে-ই চিঠি পোস্ট করতে পাঠিয়েছে।
রবার্ট বললো, 'আমি আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি না।'
'কিন্তু আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি।' গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো কাফকা। মরফিনের আচ্ছন্নতায় কাফকা এখন কোন অতলে যেন তলিয়ে যাচ্ছে।
'যাও, চলে যাও এলি। কাছে এসো না, এতটা কাছে কেন এলি? তুই তো আমার ছোঁয়া পেলে যক্ষায় ভুগবি রে।'
রবার্ট কাফকার কথাগুলো শুনতে শুনতে বিমর্ষ আর অস্থির হয়ে পড়লো। 'সবকি শেষ!' অস্ফুট এই কথাটা সেই ঘনকৃষ্ণ আচ্ছন্নতার মধ্যেই কাফকার কানে গেল, সে বললো, 'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। সব শেষ।'
চেতন-অবচেতনের মধ্যবর্তী স্থানে কাফকা যখন গভীরভাবে ডুবে যেতে থাকলো তখনই দরোজার কাছে আবছায়া একটা ছায়ামূর্তি। ডোরার ছায়ামূর্তি। কাফকার চৈতন্যে তখনও সেইসব লাল নীল মাছ। একদিন সমুদ্রসৈকতে বেড়াবার সময় যে মাছেরা দু'জনের পায়ের
পাতা ছুঁয়ে দিয়েছিল।
'এই যে নীল কোরাল মাছটা দেখছো, সেটা হলে তুমি। এজন্যেই বার বার সে আমার পায়ের পাতায় এসে চুমু খাচ্ছে। আর ওই যে লাল রক্তবর্ণ মাছটা, সেটা হচ্ছি আমি। তোমার হৃদয়কে আমি রক্তাক্ত করেই হয়তো পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাব।'
ছায়ামূর্তিটা ধীরে ধীরে আরও নীল হতে থাকলো। গভীর বেদনায় আর কষ্টে কাফকার দেহের ওপর ঝুকে পড়ে খুঁজতে থাকলো সেই রক্তবর্ণ মাছটাকে, যে তার হৃদয়কে এতদিন লোহিত বর্ণচ্ছটায় রাঙিয়ে রেখেছিল।
যেতে কাফকা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।



ইউক্রেন সংকট বদলে যাচ্ছে বিশ্ব ব্যবস্থা

ইউক্রেন সংকট

মাহবুবআলম

ইউক্রেনে রুশ অভিযান শুরু হলে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুক চাতলুক বলেন, উইক্রেন সংকট গোটা বিশ্বকে বদলে দেবে। সত্যিই তাই হচ্ছে। ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে বিশ্ব। বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশ রুশবিরোধী ঐক্যে শামিল হচ্ছে। সেই সঙ্গে তাদের ঐক্যকে আরও জোরদার ও সুসংহত করছে। অন্যদিকে ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ভেনিজুয়েলা ও ইরানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ইউক্রেন সংকট থেকে নিজেদের দূরে রাখতে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের কৌশল নিয়েছে। ফলে এসব দেশ ইউক্রেনে রুশ অভিযানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা প্রস্তাবে সায় দেয়নি। জাতিসংঘে নিন্দা প্রস্তাবের ওপর অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে ভোটদানে বিরত থেকেছে। এর ফলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম পদক্ষেপেই বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ইউক্রেনে রুশ অভিযানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপনের আগে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক নজিরবিহীন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে খোদ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, তার স্ত্রী-কন্যাসহ মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য এবং রাশিয়ার বিভিন্ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি-গোষ্ঠী। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞায় বলা হয়েছে, কোনো দেশ রাশিয়ার সঙ্গে কোনো রকম ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেন এমনকি কোনো যোগাযোগ স্থাপন পর্যন্ত করতে পারবে না। কিন্তু এই আর্থিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞাকে কাঁচকলা দেখিয়ে ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল, গ্যাসসহ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী আমদানি অব্যাহত রেখেছে। গোপনে নয়, প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েই এটা করছে ভারতসহ বিভিন্ন দেশ।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর ভারতে একটি সরকারি পেট্রোলিয়া ইন্ডিয়ান ওয়েল করপোরেশন প্রথমে ৩০ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানির চুক্তি করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের চুক্তির পরপরই একটি বেসরকারি

প্রতিষ্ঠান ২০ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানির চুক্তি করে। এই চুক্তির একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজার দর থেকে রাশিয়া প্রতি ব্যারেলে ২৫ ডলার কম মূল্য ধরে। শুধু তাই নয়, এ জন্য ভারতকে ডলার বা বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ পরিশোধ করতে হবেনা। ভারত তাদের নিজস্ব মুদ্রা রুপিতেই তেলের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে। স্বল্প মূল্যে এই তেল আমদানির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারত রাশিয়া থেকে প্রতি বছর.... ব্যারেল তেল আমদানির একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি রাশিয়ার সঙ্গে করছে।

উল্লেখ্য, একের পর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাশিয়ার অর্থনীতি ধ্বংসের চক্রান্তের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ব্যবস্থা সুইফট থেকেও রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এ অবস্থায় রাশিয়া মিত্রদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে দ্রুত স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেনের ঘোষণা দেয়। সেই সঙ্গে ঘোষণা দেয়, পশ্চিমা অমিত্রদেশগুলোকে রাশিয়ার তেল ও গ্যাস ক্রয়ের জন্য রুশ মুদ্রা রুবলে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এই রুশ পদক্ষেপে রাতারাতি রুশ মুদ্রা রুবলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে ডলারের বিপরীতে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে রুশ মুদ্রা রুবলের দরপতনের মার্কিন প্রচেষ্টা মাঠে মারা যায়। তাই বাধ্য হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অন্যতম পাইপ আরগান ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাখোকে বলেন, এটা সম্ভবনয়। ম্যাখো তেল-গ্যাসের মূল্য রুবলে পরিশোধের দাবি অগ্রহণযোগ্য বলে উড়িয়ে দিলেও হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়াসহ উইরোপীয় ইউনিয়নের একাধিক দেশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের শর্ত মেনে তেল-গ্যাস আমদানির মূল্য রুবলে পরিশোধে সম্মত হয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে।

রাশিয়া থেকে তেল-গ্যাস কিনতে হলে এখন থেকে (এপ্রিল ২০২২) রুবলে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই ঘোষণার পরপরই সৌদি আরব ঘোষণা দেয়, তার দেশ চীনের কাছে তেল বিক্রি করবে চীনা মুদ্রা ইউয়ানে। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই ঘোষণা অর্থাৎ ইউক্রেন সংকটের মধ্যে সৌদি আরবের এই সিদ্ধান্ত অনেকটা কাকতালীয় হলেও এটা কিন্তু চীনের সঙ্গে দীর্ঘ দুই বছরের আলোচনার ফলাফল। শুধু ঘোষণা নয়, এ বিষয়ে চীনের সঙ্গে সৌদি আরব একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। চীনের সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দিনের 'পেট্রো ডলার' যুগের অবসান হলো।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন সৌদি আরবের কাছে প্রস্তাব করেন, তখন থেকে একমাত্র মার্কিন ডলারেই তেল বিক্রি হবে। সেই থেকে সৌদির তেল বিক্রির সঙ্গে পেট্রো ডলার শব্দটি যুক্ত হয়। সেই ধারার অবসান হলো চীনের সঙ্গে সৌদি সরকারের তেল বিক্রির নতুন চুক্তিতে। এর ফলে একদিকে যেমন ডলারের আধিপত্য কমে আসবে, অন্যদিকে চীনের মুদ্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে বিশ্বব্যবস্থায় তেল-গ্যাসসহ আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রিত হয় মার্কিন ডলারে। এরপর পাউন্ড ও ইউরোতে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। দীর্ঘ দিনের সেই সুবিধা এখন বড়-সড় ধাক্কা খাবে ইউয়ান, রুবলে তেল-গ্যাস বিক্রির ব্যবস্থা। এ ঘটনা এমন এক সময় ঘটছে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাশিয়ার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে রাশিয়াকে দুর্বল করে দেশটিকে টুকরো টুকরো করার পৈশাচিক খেলায় মেতে উঠেছে। এই খেলায় এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাড়ে পাঁচ হাজারের অধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে যুক্তরাজ্যসহ তার পশ্চিমা মিত্ররাও একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। সর্বশেষ (৭ এপ্রিল) ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া থেকে ৪৩০ কোটি ডলার মূল্যের কয়লা আমদানি স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়লা আমদানি স্থগিত করার ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, রাশিয়া ও প্রেসিডেন্ট পুতিনের ওপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানো হবে। এ প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনের মুখপত্র বলেন, রুশ ব্যাংক সেক্টরের দুই তৃতীয়াংশের বেশি তারা ব্লক করেছে। পাশাপাশি পুতিন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি-গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্লক করা হয়েছে। ব্লক করা হয়েছে বড় বড় রুশ সংস্থাকে। এর ফলে রাশিয়ার জিডিপিতে ধাক্কা লাগবে। জিডিপি ২% কমে যাবে।

৭ এপ্রিল ব্রুসেলসে ন্যাটো জোটের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক শেষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ করে ইউক্রেনকে আরও অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, রাশিয়া পুরো ইউক্রেন দখল করতে চায়। এ বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের শান্তি আলোচনাকে স্বাগত জানানোর পরিবর্তে পেন্টাগন বলেছে, এটা কূটকৌশল। পেন্টাগনের ওই বক্তব্য ও অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার ঘোষণায় ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি শান্তি আলোচনার অগ্রগতিকে নস্যাৎ করতে বলেছেন। কথায় নয়, কাজ দেখতে চাই। সেই দেখা রাশিয়া সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দেয়। শান্তি আলোচনার পরপরই রুশ বাহিনী কিয়েভ ও চেরনেহির ছেড়ে যায়। কিন্তু এরপর জেলেনস্কির অভিযোগ, রাশিয়াকে বিশ্বাস করা যায় না। রাশিয়া ইউক্রেনকে ভাগ করতে চায় কোরিয়ার মতো। তাদের দীর্ঘদিন এখন ডনবাস ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, জেলেনস্কি পশ্চিমাদের কাছে আরও অস্ত্র দেওয়ার ও রাশিয়া বিরুদ্ধে আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানান। এক কথায় ইউক্রেন সংকটকে দীর্ঘায়িত করার মার্কিন কৌশল বাস্তবায়নে জেলেনস্কি অটল। এ ক্ষেত্রে তার দেশ যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, দেশের মানুষ অসহায়ভাবে মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়ছে, সে বিষয়ে কোনো দৃষ্টি নেই। একে বলে সাম্রাজ্যবাদী খেলা।

এই খেলা রাশিয়াকে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়ার মার্কিন পরিকল্পনা তার পশ্চিমা মিত্ররা একমত হলেও নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নে কোনো কোনো দেশ বিশেষ করে শক্তিধর জার্মানি একমত হতে পারছে না। জার্মানির অর্থমন্ত্রী ৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, পুতিনের ক্ষতি করতে গিয়ে আমরা নিজেদের ক্ষতি করছি না, তা ভেবে দেখা দরকার। তিনি বলেন, গ্যাস আমদানি বন্ধ করা সম্ভবনয়। গ্যাস আমদানি বন্ধ করলে জার্মানির অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। উল্লেখ্য, জার্মানি রাশিয়ার গ্যাস ও তেলের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। রাশিয়া তার তেলের ৩৭% আর প্রকৃতির গ্যাসের ৪২% আমদানি করে রাশিয়া থেকে। জার্মানির তেল-গ্যাসের নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে পরক্ষভাবে নিষেধাজ্ঞার বিপক্ষেই অবস্থান নিচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া থেকে বিরত আছে। তবে ইউক্রেনীয় ইউনিয়ন অন্যতম বৃহৎ শরিক দেশ হাঙ্গেরি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, ইউক্রেন সংকটে হাঙ্গেরি নিরপেক্ষ থাকবে। তারা কোনো নিষেধাজ্ঞায় শরিক হবে না। রাশিয়া থেকে তেল-গ্যাস আমদানি অব্যাহত রাখবে এবং রাশিয়ার দাবি অনুযায়ী, রুবলেই মূল্য পরিশোধ করবে। হাঙ্গেরিকে অনুসরণ করে স্লোভাকিয়াও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বলেছে, তারা প্রয়োজনে রুবলেই অর্থ পরিশোধ করবে।



উল্লেখ্য, শুধু জার্মানি, হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়া নয়-ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের অধিকাংশ দেশই রুশ তেল-গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। জি-৭-এর সদস্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ইতালি তার প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার ২৯% আমদানি করে রাশিয়া থেকে। অনুরূপভাবে তুরস্ক আমদানি করে ৩৬%, নেদারল্যান্ড ১৫.৭%, হাঙ্গেরি ১১.৬%, পোল্যান্ড ৯.৬% এবং বেলারুশ ১৮.২%।

ফলে চাইলেও এই মুহূর্তে পারবেনা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অন্যদিকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট....বলেছেন রুবলে তেল-গ্যাসের মূল্য রুবলে পরিশোধের দাবি চুক্তি করবেন। অবশ্য, তেল-গ্যাস কেনার চুক্তি করে সে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত কি চুক্তির মধ্যে পড়ে? এই ক্রয় কে করবে তাকে।



গল্প

শুভ বিবাহ

আহমদ মতিউর রহমান

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিল। রোদের হলদে আলো মনে হয় সারা রাস্তাজুড়ে সোনা ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে। ইস্কাটনে অফিসের সামনের বাগানে পাতাবাহারি গাছটায় রোদের আলো চিকচিক করছে। রোদের আলাদা একটা বিউটি আছে বুঝল রায়হান। রায়হান সাঈদ। অল্প সময়ের জন্য বাইরে বেরিয়েছিল। এই মাত্র ঢুকল আবার অফিসে। এবার কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করছিল সে। লাঞ্চ আওয়ারও চলে এসেছে। দেড়টা নাগাদ তার মোবাইল বেজে উঠল। বন্ধু মাহতাবের ফোন। প্রকৌশলী রায়হানের অফিস একটা বহুতলের দশতলায়। মাহতাবের অফিস আলাদা, কিন্তু ওই বিল্ডিংয়েরই ছ'তলায়। মাঝেমধ্যেই এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে তার ক্যান্টিনে ডেকে নেয়, একসঙ্গে লাঞ্চ করে। আজ মাহতাবরায়হানকে ফোনে বলল-

: আমাদের ক্যান্টিনে চলে আয়। তোর ভাবিনীপা একটা ভালো খাবার করে এনেছে, জমিয়ে খাওয়া যাবে। মাহতাবআর তার স্ত্রী নীপার একই বিশ্ববিদ্যালয়। চাকরিও একই অফিসে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই মাহতাবের সঙ্গে প্রেমের শুরু নীপার। সুন্দরী নীপা স্কুল আর কলেজজীবনে প্রেম যে করেনি তা নয়। সময়ের

চাকায় সেগুলো চুকে বুকে গেছে, পরিণতি পায়নি। মাহতাবের সঙ্গে প্রেমটা টিকে গেল। চাকরির পর একটু থিতু হয়ে ওরা বিয়ে করেছে। মাহতাবের প্রস্তাবে রায়হান রাজি হয়ে যায়। বলে-

: দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।

একটু পরে রায়হান ছ'তলার ক্যান্টিনে এসে দেখে, মাহতাব এবং তার স্ত্রী নীপা ছাড়াও একটা মেয়ে বসে আছে নীপার পাশের চেয়ারে। রায়হান একটা খালি চেয়ারে বসল মাহতাবের পাশে।

নীপা বলল, রায়হান ভাই, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, এ হচ্ছে আমার বন্ধু, ঊর্মি। কিছুদিন হল আমাদের অফিসে জয়েন করেছে। ঊর্মি, মাহতাব এবং আমারও খুব ভালো বন্ধু। ওরা দু'জন গ্রামের একই স্কুলে একসঙ্গে পড়েছে দীর্ঘদিন।

রায়হান ঊর্মিকে বলল, ভালোই হলো, এখন থেকে আমারও বন্ধু হলে। ঊর্মি চুপ করে থাকে। কিছু বলে না।

মাহতাব বলল, বাড়ির খবর কী?

রায়হান বলে, আরও খারাপ। বাবা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। বিয়ে করার সময় নাকি পেরিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন এক কথা! আজকালকার ছেলেরা নাকি দায়িত্ব নিতে চায় না, তাই আমি বিয়ে করছি না।

: আমারও তো একই অবস্থা। এতদিন শুধু মা বলত, ক'দিন ধরে বাবাও গলা মেলাচ্ছে! ঊর্মি এবার মুখ খুলল। কতক্ষণ বোবা সেজে বসে থাকা যায়। সে আরও বলল, কাল আমি বলে দিয়েছি বাড়াবাড়ি করলে আমি ঢাকার বাইরে ট্রান্সফার নিয়ে নেব।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায়হান বলে, আমার সমস্যা আমি একমাত্র সন্তান। বাবা কিছুদিন হলো রিটায়ার করেছে। মায়েরও বয়স হয়েছে। নানা রোগে ভোগে। আমি যে ট্রান্সফার নেব, তার উপায় নেই। ট্রান্সফারের কথা শুনলে মা এমন কান্নাকাটি শুরু করে দেয় যে কী বলব।

ঊর্মি বলে, আমার দুর্বলতা আমার বাবা। ছোটবেলা থেকে আমার সব ব্যাপারে বাবা গাইড করেছে। যা চেয়েছি তা-ই এনে দিয়েছে। বাবা থেকে থেকেই বলে 'মা, তুই বিয়েটা কর না। তোর যদি কোনো ছেলে পছন্দ হয়ে থাকে বল, আমি যোগাযোগ করব।' আশ্চর্য! আমি এখন বিয়ে করব না মানেই আমি প্রেম করছি! আমার বয়ফ্রেন্ড আছে! কিছুতেই বোঝাতে পারি না।

মাহতাব আর নীপা দুজনের কথা শুনে মুখ টেপাটেপি করে।

শেষে মাহতাব দু'জনকেই সান্ত্বনা দেয়, অত ভাবিস না, বিয়ে যে দিন হওয়ার, ঠিক হবে।

: তা-ই যদি হয়, তা হলে বিয়ের জন্য চাপ দেওয়া কেন? যে দিন হওয়ার সে দিন তো হবেই! রায়হান ক্ষোভ প্রকাশ করে।

: চাপ দেওয়াটা বাবা-মা'র কর্তব্য, গম্ভীর হয়ে বলে মাহতাব।

: তোকে চাপ দিয়েছিল চাচা বা চাচি? জানতে চায় রায়হান।

মাহতাব হাসে। বলে-

: আমার ঘটনা উল্টো। ভাইয়াকে জ্বালিয়ে মেরেছি বিয়ে করার জন্য। বাবা-মা দু'জনেই বলে দিয়েছিল, বড় ছেলের বিয়ে না দিয়ে ওঁরা ছোট ছেলে মানে আমার বিয়ে দেবে না। ওদিকে তাদের বড় ছেলে প্রেমে হাফসোল খেয়ে বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা করেছে। অনেক কষ্টে তাকে রাজি করাতে হয়েছে। তা না হলে নীপা কবে আমাকে নীপবনে বনবাসে পাঠাত। শুনে হাসলো রায়হান ও ঊর্মি।

নীপা বলল-

: করতামই তো! প্রেম করার সময় মনে ছিল না! সাত-আট বছর প্রেম করার পর যদি বিয়ে না-হয়, ভাবতে পারছ?

রায়হান বলে, আমার সমস্যাটা অন্য, আমি চিনি না, জানি না, একটা মেয়েকে হুট করে বিয়ে করে ফেলব? এ রকম হয় না কি? আজকাল জীবন অনেক জটিল। ও রকম হুট করে বিয়ে করা যায় না কোনো মেয়েকে।

একমত হয় ঊর্মিও, ঠিক তাই। কোনো ছেলেকেও বিয়ে করা যায় না ওভাবে। তার পর কোনো দিন আমাকে গলা টিপে বা আগুন জ্বালিয়ে মেরে ফেলবে। না হলে বাবার কাছ থেকে টাকা আনার জন্য অত্যাচার করবে। তা ছাড়া বিয়ে তো আমি করব। বাবা-মা কেন ছেলে দেখবে, ছেলে ঠিক করবে? আমি রীতিমতো ক্যারেক্টার অ্যান্ড পাস্ট ভেরিফাই করে পাত্র নির্বাচন করব।

: কী করে ভেরিফাই করবি? নীপার প্রশ্ন। সঙ্গে ঝেঁকিময় হাসি।

: সেটা ভাবতে হবে। কিন্তু বাবা-মা একটা ছেলেকে ধরে এনে বলল, একে বিয়ে কর', আর আমি তা-ই করব, সেটি হবে না।

: ঠিক কথা, রায়হান বলল, পাত্রী নির্বাচনে বাবা-মার কোনো ভূমিকা থাকবে না। আমি জানিয়ে দেব, আমি একে বিয়ে করতে চাই। তার পরের দায়িত্ব বাবা-মার।

সেদিনের মতো আড্ডা এবং লাঞ্চ খাওয়া শেষ হলো। তবে প্রায় দিনই লাঞ্চের সময় এই প্রসঙ্গটা ওঠে। কিন্তু কোনো সমাধানের পথ না পেয়েই যে যার কাজে ফিরে যায়।

দিন পনেরো পর এক দিন লাঞ্চ করতে করতেই মাহতাব বলল, দেখ, তোদের দু'জনের বাড়িতেই অশান্তি এড়ানোর একটাই রাস্তা আছে। তোরা যদি রাজি থাকিস তো আমি সেই রাস্তাটা দেখাতে পারি।

: কি বলছিস বুঝতে পারছি না। প্রস্তাবটা আগে শুনে দেখি, বলে রায়হান।

: দেখ, তোদের যে জায়গায় আপত্তি তার সঙ্গে আমি আর নীপা একমত। অচেনা, অজানা কাউকে বিয়ে করার কোনো মানে নেই। তার দৃষ্টিভঙ্গি কী রকম, সে ঠিক কী চায়, কী পছন্দ-অপছন্দ করে সেটা না জানলে একজন বুঝবে কী করে যে, বাকি জীবনটা তার সঙ্গে কাটাতে পারবে কি না। সমাজে ডিভোর্সের সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে তার কারণই হচ্ছে, জীবনবোধের এই বিরোধ। আরও কিছু হয়তো থাকতে পারে।

: ভূমিকাটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে না, বলে ফেল না ... রায়হান কপট রাগত স্বরে বলল।

মাহতাব বলল, আমি তোকে এবং ঊর্মিকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। তোরা একজন অন্যজনকে এখন চিনিস এবং জানিস। তোদের যদি আরও কিছু জানার বা চেনার থাকে সেটাও কথা বলে নিতে পারিস। যদি মনে হয় তোদের চিন্তাভাবনার মিল আছে, তোরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে পারিস। ফর্মাল নেগোশিয়েশনে অ্যারেঞ্জমেন্টের অনেক ঝামেলা। তোর পছন্দ হলো তো ফ্যামিলির পছন্দ হলো না, আবার ফ্যামিলির পছন্দ হলো তো তোর ওপর চাপ দিতে শুরু করল... তার চেয়ে তোরা চুপচাপ কাজী অফিসে গিয়ে কাজটা সেরে নে। আমরা থাকব আত্মীয়স্বজন সেজে। জানিস তো, মিয়া বিবি রাজি, কেয়া করেগা কাজি। এক মাস পর রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে বাড়িতে জানিয়ে দিবি। বাড়ির লোকেরা মেনে নিলে সোশ্যাল ম্যারেজ হবে ধুমধাম করে। আর না মানলেই বা কী, বিয়ে তো হয়েই গেল! তোদের ইচ্ছেমতো।

নীপা বলল-

: আর একটা কথা। তোদের মনের মিল পরখ করতে কক্সবাজার ঘুরে আয় দু'জনে। খরচ আমার। আমার এক বন্ধুর ট্যুরিস্ট ক্লাব আছে, বললে এখনি ম্যানেজ করে দেবে সব।

রায়হান এবং ঊর্মি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিল। বলছে কি ওরা এসব! একটু চুপ করে থেকে ঊর্মি বলল-

: ভাবতে একটু সময় লাগবে।

: আমারও, রায়হান বলল।

: ভালো কথা। সাতদিন সময় নে। দু'জনেই ভাবাভাবি কর। দরকার হলে দু'জন দু'জনের সঙ্গে আলাদা দেখা কর, কথা বল। নীপার প্রস্তাব মতে কক্সবাজার ঘুরে আয়। উইকএন্ডে চলে যাবি। এ আর এমন কি? সাত দিন পর ঠিক কর, কী করবি। এই সাত দিনে আমরা এ প্রসঙ্গে কিছুই আলোচনা করব না, দু'জনকে আশ্বাস দেয় মাহতাব।

পরের সাত দিন লাঞ্চের সময় বিয়ে সংক্রান্ত আলোচনা কেউ করল না বটে, তবে মাহতাব যেমন রায়হানকেকে ফোন করে ঊর্মিকে বিয়ে করার পক্ষে নানা যুক্তি দেখাল, তেমনই নীপাও কয়েকবার ঊর্মিকে ফোন করে রায়হানকে বিয়ে করার পক্ষে নানা যুক্তি দেখাল। সাত দিন পর যখন ওরা ক্যান্টিনে মিলিত হলো, তখন রায়হান মনে মনে ঊর্মির প্রতি দুর্বল হলেও সে জানে না ঊর্মির প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। আবার ঊর্মিও জানে না তার সম্পর্কে রায়হানের কী মনোভাব, যদিও তার রায়হান সম্পর্কে অনেকটাই ইতিবাচক মতামত গড়ে উঠেছে।

মাহতাব একটা কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, আজ আমরা লাঞ্চ খেতে খেতে সিদ্ধান্ত নেব, রায়হান এবং ঊর্মি আমার প্রস্তাবে রাজি কি না। আমি মনে করি, সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র পথ। এতে দু'জনেই তাদের বাবা-মাকে বোঝাতে পারবে, বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামতই চূড়ান্ত। তাই প্রস্তাব করছি, প্রথমে রায়হান বলুক সে কী ঠিক করেছে।

: কেন, আমি কেন, দোস্ত। লেডিজ ফার্স্ট! রায়হান বলল।

: না। এ ক্ষেত্রে তোকেই বলতে হবে, মাহতাব বেশ গম্ভীর হয়ে বলল।

রায়হান একটু সময় নিয়ে বলল, ঊর্মি যদি রাজি

থাকে, আমার আপত্তি নেই।
মাহতাব ঊর্মির দিকে তাকাল। ঊর্মি চোখ নামিয়ে ডান হাতের নখের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, আমারও আপত্তি নেই। তবে বাড়িতে কিন্তু ঝড় উঠবে।
মাহতাব বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল-
: আজকালের মধ্যে বিষয়টা পাকাপাকি করে ফেল। মনে রাখিস, শারমিন রহমান ঊর্মি ডটার অব আফতাবুর রহমান।

কাজী অফিসে যাওয়ার কয়েক দিন আগে লাঞ্চ



করতে করতে মাহতাব বন্ধুকে বলল, এটা করবি তা হলে বুধবার। তার পর তুই আমাদের লাঞ্চ খাওয়াবি। লাঞ্চ খেয়ে আমরা একটু আড্ডা মেরে ঊর্মির বাড়ি যাব। সেখানে নীপা ঊর্মির মা-বাবাকে জানাবে বিয়ের ব্যাপারটা। ধারণা করা যায় একটা ঝড় উঠবে। গর্জন এবং বর্ষণও হবে। উঠতে দে, বর্ষণও হতে দে। তার পর সেদিনই আমরা রায়হানের মা-বাবাকেও ব্যাপারটা জানাব। এ ধরনের খবর ফোনে জানানো ঠিক নয়।
নির্দিষ্ট দিনে নির্বিঘ্নে রায়হান এবং ঊর্মির বিয়ের রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। ওরা চারজন একটা ভালো রেস্তরাঁয় খাওয়াদাওয়া করল। নীপার কথায় ঊর্মি শাড়ি পরে এসেছিল। এক সময় রায়হান বলল, : তোমাকে শাড়িতে বেশ সুন্দর লাগছে তো! এ কথায় যেন লজ্জা পেল ঊর্মি।
সলজ্জ ভঙ্গিতে ঊর্মি বলল-
: থ্যাঙ্ক ইউ।
তার এই ধন্যবাদ দেওয়ার ভঙ্গিটিও বেশ লাগল রায়হানের।
তবে ফোস করে উঠল নীপা। বলল-
: অ্যাই, থ্যাংক ইউ কিন্তু আমার পাওনা। আমি ঊর্মিকে শাড়ি পরতে বলেছি। এরপর সবাই হাসাহাসি করল।
লাঞ্চ সেরে খানিকক্ষণ আড্ডার পর মাহতাব বলল, রায়হান, এবার তোর শ্বশুরবাড়ি যাব। তার আগে নীপা তুমি একবার ঊর্মির বাবা-মাকে ফোন করে বলে দাও আমরা আসছি। ঊর্মির বাড়ি গিয়ে বাকি যা বলার নীপা বলবে।
এর মধ্যে মাহতাবের ফোন বেজে উঠতে সে তাড়াতাড়ি ফোন ধরে কাউকে বলে, আমরা রওনা দিচ্ছি। ঠিক সময়মতো পৌঁছে যাব।
: ঊর্মির বাড়িতে ফোনটা তো নীপা ভাবির করার কথা, তুই করলি কেন? প্রশ্ন করে রায়হান।
: নীপাও করবে, মাহতাবের নির্লিপ্ত উত্তর।
ঘটনাটা কিছুই স্পষ্ট হলো না রায়হানের কাছে। একটা ধোঁয়াশার মতো মনে হতে থাকে।
রায়হান এবং ঊর্মি ভেবেছিল, ঊর্মির বাড়িতে ঢোকার পর তাদের বাক্যবাণের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু তা ঘটল না। ঘটল বরং উল্টোটা। নীপা যখন ঊর্মির বাবা-মাকে জানাল যে, ঊর্মি এবং রায়হান আজ বিয়ে করেছে, ঊর্মির বাবা বেশ সহজভাবেই বললেন-
: এটা একটা ভালো কাজ হয়েছে। তারপর নীপার মাথায় হাত রেখে বললেন, এতদিন আমরা যা পারিনি, তুমি তা-ই করে দেখালে মা। নীপা মাথা নিচু করে হাসে। ঊর্মির মা নীপার থুঁতনি ধরে আদর করে বলেন, মেয়ের আনন্দ যে ধরে না!
সহজেই সব হয়ে গেল। ঊর্মির বাবা-মা সাদরে মেয়ে-জামাইকে ঘরে ডেকে বসান। রায়হানের পুরো ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগতে শুরু করে। তার বিস্ময় আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হন রায়হানের বাবা-মা। নাটকীয় ঘটনা বলতে হয়। এটাই তাহলে ধোঁয়াশা, ভাবছে রায়হান।
সে প্রায় চমকে উঠে তার মাকে জিজ্ঞেস করে, মা, তোমরা হঠাৎ এখানে কেন? কী ব্যাপার?
ছদ্মগাম্ভীর্য নিয়ে রায়হানের মা বললেন, আমরা তো এ বাড়িতে মেয়ে দেখতে এসেছি। আফতাব সাহেবের মেয়ে, কী যেন নাম, ঊর্মির সঙ্গে তো তোর সম্বন্ধ করেছিলাম। তুই তো কিছু না দেখে-শুনেই নাকচ করলি...মাহতাব, বাবা তোকে অনেক ধন্যবাদ। তুই ভালোয় ভালোয় ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলি। এবার একটা দিনক্ষণ দেখে বিয়ের অনুষ্ঠানটা হয়ে গেলেই আমার মুক্তি। এই যে বৌমা, আমার ছেলে এখন থেকে তোমার সম্পত্তি, সামলেসুমলে রেখ কিন্তু...
: সে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, আমাকে যখন তুমি সামলেছ, বৌমাও তোমার ছেলেকে সামলাবে, বাবা লোকমান হোসেন বললেন।
: সে যাই হোক...রায়হানের বাবা-মার কাছে যখন আমি জানতে পারি ওঁদের পছন্দ করা পাত্রী আমার স্কুলমেট, আবার ঘটনাচক্রে একই অফিসে জয়েনও করেছে, তখনই আমি আর নীপা ঊর্মির বাবা-মার সঙ্গে দেখা করি। তারপর সূক্ষ্মভাবে অনেক রকম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে! এত দিনের ভেদ ভেঙে ধোঁয়াশা কাটিয়ে বলে মাহতাব।
রেস্তোঁরা থেকে বেরোনোর আগে রায়হানের মা আমাকে ফোন করেছিলেন, আমরা কখন এখানে আসছি জানার জন্য। তখনও আমি কিছু ভাঙিনি। সে যা-ই হোক, মধুরেণ সমাপয়েৎ তো হয়েই গেল! এবার দুই চাচা এবং দুই চাচি আম্মা...আমাদের ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না...আমাকে আর আমার বৌকে ভালো করে ঘটক-বিদায় দিতে হবে কিন্তু! হাসতে হাসতে মাহতাব বলল।
ঘর-ভর্তি আনন্দ-উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত হাসিমুখের মাঝখানে একে-অপরের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল রায়হান আর ঊর্মি।
: বেঁচে থাক বাবা মাহতাব আর মা মণি নীপা। তোমাদের বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। দোয়া রইল তোমাদের জন্য। বললেন রায়হানের মা রোকসানা হোসেন। তিনি আরও বললেন-
: অবশ্যই ঘটকের ফি তোমাদের পাওনা রইল। আমার সাহেবনা দিলেও আমি ব্লাংক চেক দেব, তোমরা টাকার অংক লিখে নিও।
: বেয়ান, শুধু আপনি না ব্লাংক চেক আমিও দেব। বললেন ঊর্মির মা লুৎফা রহমান। এরপর হাসির ফোয়ারা বয়ে গেল।



গল্প

তুমি রবে গরবে

রোকেয়া ইসলাম

অনেকটা পথ হেঁটেছে আজ, কপালে ঘাম চকচক করছে, কিছুটা হাঁপ ধরেছে, মহানগর ব্রিজের কাছে এসে দাঁড়ায় পারভীন। ব্যারিকেটের উপর অনেকেই বসে আছে, পারভীনও দূরত্ব বজায় রেখে বসে পড়ে। মাস্কটা দেওয়াই আছে, তবুও টেনে ঠিক করে নেয়। চশমাটা ঠিকঠাক করে। মাথায় ওড়নাটা তুলে দেয়। একটু জিরিয়েই আবার উঠে পড়ে, মহানগর ব্রিজের র‍্যালিং ধরে হাঁটতে থাকে, এপারে এসে আবার একটু জিরিয়ে নেয়। চন্দ্রপ্রভা গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, সবুজে, হলুদে অনন্য সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। উপরে নীল আকাশ। সামনের রাস্তায় গাড়ি ছুটছে দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে। হর্নের শব্দে চমক ভেঙে যায় বারবার। কোনদিকে যাবে পারভীন দিকভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেদিনের মতো।

রামপুরার দিকে মোড় নিয়ে এগিয়ে যায়, এবার ওর পা ধরে যায়, হাঁটতে পারে না, সামনের খোলা জায়গায় বসে পড়ে। এক কাপ চা পেলে ভালো হতো। আশপাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে পায় সারি সারি চেয়ার সাজিয়ে বসে আছে ফুডকোর্ট। শুধু চা হবে না। কফি এবং স্ন্যাকস নিতে হবে। পারভীন ফাস্টফুডে অভ্যস্ত নয়, ওর চাই ঝাল-মুড়ি আর চা।

চটপটি পাওয়া গেল, কপাল মেনে সেটাই অর্ডার করে বসে থাকে সাদা কাঠগোলাপ গাছটার নিচে। সামনে ঝিলের জলরাশিতে ভাটার টান লেগেছে। তবুও জলযান চলছে। জলছোঁয়া বাতাস গায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। একটু শীতল অনুভূতি ওকে জাগিয়ে তোলে। ফুলহাতা মোটা কামিজ তার ওপর পাতলা পশমিনা শাল যথেষ্ট ওঁম দিচ্ছে, এতক্ষণের হাঁটাহাঁটিতে একটু গরম আমেজ ভেদ করে শেষ শীতের প্রখর দাঁত কিছুটা কামড় তো বসায়ই শরীরে।

কত বয়স হলো পারভীনের। বয়সটাও বের করতে ইচ্ছে হচ্ছে না আজ। আজ শুধু মতিনকে মনে পড়েছে। সেই কবে ওর জন্য ঘর ছেড়েছিল, প্রিয় শহর ছেড়েছিল আজন্মের বাঁধন মা-বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছিল শুধু মতিনের জন্য। মতিনের বাবার পোস্টিং ছিল পারভীনদের শহরে। মতিনের বাবার সরকারি কোয়ার্টার পারভীনদের বাসার কাছে। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার পথে দেখা, দেখার পথ হেঁটে কথা, কথার সুতো ধরে কাছে আসা, তারপর

প্রেম। এক কান দুই কান করে দুই বাড়িতেই কথাটা ঢুকে যায় চেনা-জানাদের কাছে রটে যায় পারভীন আর মতিনের প্রেমকাহিনী। হাসাহাসি কানাকানি দুই ইঁচড়ে পাকার প্রেম। দুজনের উপর বেতের আঘাত চড়-থাপ্পড় লাথিগুঁতা চলতে থাকে, ওরাও সমানতালে প্রেম করতে থাকে। পারভীনের প্রভাবশালী পিতা মতিনের সরকারি কর্মকর্তা পিতার কাছে নরম সুরে বিচার প্রার্থনা করে।

সেদিন মতিনকে মতিনের সরকারি কর্মকর্তা পিতা কোমরের বেল্ট দিয়ে ইচ্ছামতো পেটায়। হিতে বিপরীত হয়ে যায়। মতিন আর পারভীন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পারভীনের পিতা আর ছাড় দিতে রাজি নয়, এদিকে মতিনের পিতাও বদলি নিয়ে চলে আসে পারভীনের শহর ছেড়ে। দুই পরিবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। একদিন পারভীনের মা দেখে মেয়ে ঘরে নেই আত্মীয়-স্বজনের বাসায় নেই শহরে নেই গ্রামে নেই। খোঁজ লাগিয়ে জানতে পারে মতিনও ওদের বাড়িতে নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করে এখানকার জল ওখানে ঘোলা করে তবে ওদের খোঁজ পায়। ফিরিয়ে আনে দুজনকে মতিনের বাবা, ফিরিয়ে দিতে চায় পারভীনের পরিবারের কাছে।

বেঁকে বসে দুজন। ওরা আত্মহত্যা করবে যদি ওদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মতিনের পিতার সরকারি চাকরি রক্ষার ভয় কাজ করে তাই বিয়েতে সম্মতি দিতে হয়। পারভীনের পিতা সেদিনই কসম কাটে জীবনে আর কন্যার মুখ দর্শন করবে না, পারভীন যেন কোনোদিনও আর ফিরে না যায় পিতার বাড়িতে, সম্পত্তিতেও যেন কোনোদিন অধিকার না রাখে। সব মেনে নেয়, মতিনের ভালোবাসার কাছে সব তুচ্ছ।

অনেক পরে পিতার মৃত্যুশয্যায় দেখা করতে চেয়েছে; কিন্তু ভাইয়েরা আর দেখা করতে দেয় না, সম্পত্তিরও কোনো অংশ দেয়নি ওকে।

পারভীনও কোনোদিন কোনোকিছুতে লোভ করেনি। দাবি করেনি। মতিনের পিতা যা দিয়ে গেছে সেটুকুই নেড়েচেড়ে বড় করেছে। পারভীনের লেখাপড়া আর হয়নি তাতেও আফসোস নেই। শুধু মতিনের ভালোবাসা ওকে সবসময় ভরে রেখেছে। জগতের সবকিছু তুচ্ছ করে মতিনের ভালোবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করে আনন্দে।

দিন কেটে গেছে দিনের মতো। পারভীন মতিনের ভালোবাসার সংসারে এসেছে দুই ছেলেমেয়ে। চলে গেছে মাতৃময়ী শাশুড়ি পিতার স্নেহদানকারী শ্বশুর। যোগ হয় পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা, পারভীনের ভরভরান্ত সংসার। এতদিনেও এতটুকু মালিন্য হয়নি মতিনের ভালোবাসা, পারভীনের ভালোবাসার পাত্র উপচে পড়ে। একদিন বলা নেই কওয়া নেই মতিন ধুম করে চলে গেল। বেদিশা পারভীন বুঝতেও পারল না কার কাছে রেখে গেল মতিনের ভালোবাসার পারভীনকে। শুধু বুঝতে পারে ওর যা হারিয়ে যাওয়ার তা আর কোনোদিন পূর্ণ হবে না। সম্পত্তি ভাগাভাগি করতে বসে পারভীনের ছেলে। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কী ভাগাভাগি করতে চায় ছেলে। ওর মাত্র অংশ দু'আনি। কি ফেলে এসেছে এই সংসারে ও। কত পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছে এই সংসার ও। আর আজকে ছেলের কাছ থেকে ভগ্নাংশ নিতে হচ্ছে ওকে। দেবর-ননদরাও আসে শালিসে। তাদের এক কথা, যতদিন ভাবী বেঁচে আছে ততদিন কোনো ভাগাভাগি নয়, মনটা খিঁচে যায় পারভীনের, ছেলের সাথে সম্পদের ভাগ!

সব ছেড়ে দেয় ও। নিচতলার একপাশে নিজের সংসার গুটিয়ে বসে।

প্রতিদিন সকালে সামনের বকুল গাছটার নিচে চেয়ার পেতে বসে থাকে। ঝুরঝুর করে ফুল পড়ে। কখনো মাথায় কখনো কাপড়ে কখনো শরীরে। পুরো জায়গাজুড়ে সুবাস ছড়িয়ে থাকে।

একদিন সকালে দেখে গাছ কাটার লোক এসেছে। পারভীন এসে দাঁড়ায়, ওদের কাছে শুনতে পায় বাড়িটা ডেভেলপারের কাছে দিয়েছে। বিশতলা ভবন হবে। আজকাল শহরে এতবড় জায়গা নেই-ই। অনেক ফ্ল্যাট হবে। বকুলগাছটা কেটে ফেলবে! এই গাছটা কিসের প্রতীক হয়ে আছে সেটা তো অজানা নয় ছেলের কাছে, তাহলে! সব তো ছেড়েই দিয়েছে পারভীন। গাছটা গায়ে হাত বুলাতেই চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। বুকটা ফেটে যেতে চাইছে। আস্তে আস্তে বের হয়ে সেই হাঁটছে এলোপাতাড়ি। এখন একটু সুস্থির হয়ে বসে। বকুলগাছটা লাগিয়েছিল শাশুড়ি, ওদের যেদিন বিয়ে হয় সেদিন। বলেছিল এটা তোদের ভালোবাসার বৃক্ষ। কাঁদছে পারভীন।

কোন সকালে বের হয়েছিল বাসা থেকে এখন সন্ধ্যাও মিশে গেছে রাতের গায়ে। বাসার কাছে আসতেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বৃক্ষহীন ফাঁকা জায়গাটার মতোই শূন্য মনে হয় নিজেকে। কাটা গাছের গুঁড়ির কাছে বসে পড়ে পারভীন। ওর ভালোবাসার বৃক্ষটির চিহ্ন আর নেই পৃথিবীতে। মাটির গভীরের মোটা শেকড় জানান দিচ্ছে একদিন ছিল সে পৃথিবীতে আজ হেরে গেলে পুঁজিবাদের দাঁতাল সময়ের কাছে।

পারভীন মতিনকে প্রথম স্পর্শের মতো করে পড়ে থাকা গুঁড়িটার ওপর হাত বুলায়। ভালোবাসা হারতে পারে না কখনো হার মানবে না।

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে।

পথচারীদের আওয়াজে বুঝতে পারে বাড়ির ভেতরের মানুষজন। কাটা গাছের কাছে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে আছে পারভীনের প্রাণহীন শরীর।





তেগাতাই আকাশ প্রাসাদ

ভ্রমণ

তপন কুমার দাশ

আকাশ রানী কিং প্যালেস, ভিন্ন নারী
ভয়-ডর ঝেড়ে ফেলে তাকিয়েছি তার দিকে
খোলাখুলি এবং লজ্জার কোনো ছিলো না বালাই।
-ফ্রান্সিসকো আর্সিলিয়ানা

ফিলিপাইনে এসেছি শিক্ষা ভ্রমণে, ফিরছিলাম তেগাতাই থেকে। এখন যাচ্ছি স্কাই প্যালেস দেখতে। বিকেল তিনটার দিকে প্যালেস বাস স্টপেজের পাশেই আমাদের মাইক্রোবাস থামল। নামতে হবে গাড়ি থেকে। কিন্তু কেন!
আমাদের গাইড জানালো, এ গাড়ি প্যালেস পর্যন্ত যাবেনা। আমাদের এখন জিপনিতে উঠতে হবে। জিপনি মানে আমাদের পাহাড়ি এলাকার জিপ বা চাঁদের গাড়ীর মতো এক ধরনের গাড়ি। একের পর এক জিপনি ছেড়ে যাচ্ছে প্যালেসের দিকে, উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়ায়। প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে আসছে। আমরাও উঠে বসলাম একটিতে। আমাদের আশপাশে ফিলিপিনো তরুণীরাও উঠেছে। সবার পরণে খুবই ছোট হাফপ্যান্ট, গায়ে টি শার্ট, অথবা শার্টের মতো কিছু একটা। ওরা অনর্গল কথা বলছিল। বুঝতে পারলাম রাজবাড়ী দেখা নিয়েই তাদের কথা-বার্তা। আমাদেরও তো কথা বলার অভ্যাস! তাই গলা বাড়িয়ে সামনের তরুণীর কাছে জানতে চাইলাম, ইজ ইট ইউর ফার্স্ট ভিজিট টু দ্যা প্যালেস?
দু'তিনটি মেয়ে প্রায় এক সঙ্গেই উত্তর দিল ইয়েস, ইয়েস? ডিড ইউ ভিজিট আর্লিয়ার?
আমি বললাম, নো-নো, দিস ইজ অলসো মাই ফার্স্ট ভিজিট।
হোয়ার আর ইউ ফ্রম, মেয়েদের এ প্রশ্নের উত্তরে বললাম, উই ক্যাম ফ্রম বাংলাদেশ। ইউ নো?
ওরা বললো, নো স্যার। সরি!
প্রশ্ন করেই জানলাম কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের এ দলটি এসেছে সেবু সিটি থেকে। প্যালেস দেখাই উদ্দেশ্য। সামনের আসনে বসা আমাদেরই একজন এ মেয়েদের সাথে কুটুস করে একটি ছবি তুললো। সবার হাতেই মোবাইল। ওদের মধ্যেও একজন আমাদের কয়েকটি ছবি তুললো, বুঝতে

পারলাম।
আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আমাদের জিপনি-টি তখন কেবলই উঠছে উপরের দিকে। চারপাশে শুধু পাহাড়, ঘন সবুজ বন। কোথাও কোথাও আবার দেখা যাচ্ছে ন্যাড়া পাহাড়।
মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম প্যালেসের সামনে। আর তখনই চক্ষু একেবারেই চড়ক গাছ। মনে হয় পৃথিবীর চূড়ায় আকাশে এসে পৌঁছেছি। আশপাশের সব পাহাড়, গাছপালা, সবুজের সীমারেখা, সবই মনে হচ্ছে নিচে, অনেক নিচে। আর সবার উপরে দাঁড়িয়ে আছি আমি একটি পরিত্যক্ত রাজবাড়ীর সামনে। অভূতপূর্ব এ দৃশ্য!

কেন এ প্রাসাদ

এখান থেকেই একটু সিঁড়ি বেয়ে উঠে দাঁড়ালাম প্রাসাদের মূল ভবনের সামনে। মূল ভবন মানে অনেকটা তিন তলার মতো একটি প্রশস্ত গোলাকার দালান, যা ইনকমপ্লিট। আমরা প্রবেশ করলাম ভবনের অভ্যন্তরে। বোঝা যাচ্ছে এখানে সাদা, গোলাপি, নীল রঙের টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে ফ্লোরে, নানা স্থানে। মাঝখানে একটি বড় কক্ষ, আশপাশে আরও নানা কক্ষের মতো রয়েছে। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম দোতলায়, তারপর তিন তলায়। তিন তলাটা মনে হলো একটি বড় হলরুম। এখানকার কেয়ারটেকার বলল, এটা ডিসকো রুম। বুঝলাম, এটা হয়তো পার্টি রুম বা জলসা রুম হিসেবেই নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল।
আসলে এ ভবনটির সত্তর ভাগ কাজ শেষ হওয়ার পরপরই স্থগিত হয়ে যায় নির্মাণ কাজ। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বোঝার উপায় নেই, কি জন্য এ সবকাঠামো তোলা হয়েছে বা শেষ পর্যন্ত এগুলো কীভাবে সাজানো হতো!
তবে এখানে আসা মানুষ-জন ও ডিউটিরত কেয়ারটেকারদের সাথে কথা বলে বা কাগজপত্র পড়ে বুঝলাম যে, মূলত ফিলিপাইনের স্বৈরশাসক ফার্দানেন্দ মার্কোসের স্ত্রী ইমেলদা মার্কোসের ইচ্ছেতে এ ভবনটি তৈরির মহাপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়।
সে সময়ে অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন ইমেলদা মার্কোস। সারা পৃথিবীতে তার পরিচিতি ছিল জুতার জন্য। পাঁচ- সাত হাজার জুতা ছিল তার। তার মধ্যে ছিল সোনার জুতা, হীরক খচিত জুতা, মুক্তা খচিত জুতা ইত্যাদি। আর ছিল হাজার হাজার সেট মণি-মুক্তা খচিত গাউন, ড্রেস। এ রাজরানী সবকিছুতেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবতেন, আর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় যা খুশি তাই তিনি করতেন।
তেগাতাই এলাকায় তাল ভলকানোর নৈসর্গিক দৃশ্য, বিশেষ করে ঘন সবুজে ঢাকা বন আর নির্জনতা তাকে প্রলুব্ধ করে এ এলাকায় একটি বাড়ি বানানোর জন্য। আর যেহেতু তিনিই ফার্স্ট-লেডি, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, সুতরাং তার মতে তার বাড়িই হবে উচ্চতর স্থানে এটাই স্বাভাবিক। তাই নির্বাচন করা হয় এই সর্বোচ্চ পাহাড়টি, প্রাসাদ তৈরির জন্য।
বাড়ি তৈরির আগে এ এলাকাটি ছিল আসলে খাসজমি। তখন এ সব পাহাড়ে কলা, আনারস আর নারকেল চাষ করত কয়েক হাজার ফিলিপিনো আদিবাসি দরিদ্র বাসিন্দা। তারাই ঘরবাড়ি নির্মাণ করে এখানে থাকত। প্রাসাদের স্থান নির্ধারণের প্রাক্কালে তাদের এখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়। কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদানের তো প্রশ্নই ওঠে না, কোথায় যে তারা চলে গিয়েছে এ এলাকা ছেড়ে, সে খবরও আর কেউ রাখেনি।
মনে পড়ে শ্রী সেনগুপ্তের লেখা কবিতার ক'টি লাইন-

একটা একটা অহংকারের ইট দিয়ে তৈরি হয়েছে
সুদৃশ্য গগন ভেদি ইমারত,
তারই পোশাকি নাম রাজপ্রাসাদ।

১৯৮১ সালে মূলত শুরু হয় ভবন নির্মাণের কাজ। প্রথমেই ভূমি থেকে প্রায় ২৫ হাজার ফুট উপরে অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়ায় মালামাল তোলার জন্য রাস্তা নির্মিত হয়। বুলডোজার চালিয়ে পাহাড়ের চূড়াকে সমতল করা হয়। তারপর সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় দামি পাথর, ইট, সুরকি, আর অন্যান্য মালামাল। শুরু হয় নির্মাণ কাজ। সে এক হুলস্থুল কাণ্ড!
দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল নির্মাণ কাজ। এর মধ্যেই আবার ঘোষণা করা হলো, আমেরিকার প্রেসিডেন্টি রিগান ফিলিপাইনে আসছেন এবং তিনি এ প্রাসাদেই বেড়াতে আসবেন। তাই নির্মাণ কাজের গতি বাড়ানো হলো। জানা যায়, সে সময়ে এক হাজারের উপর নির্মাণ শ্রমিক এখানে কাজ করতে শুরু করে, দিন রাত করে। ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই মূল ভবন, প্রবেশ পথ, তোরণ-দ্বারসহ রাজপ্রাসাদের একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু বিধি হলো বাম!
১৯৮৩ সালের দিকে হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেন্ট রিগানের ফিলিপাইন সফর বাতিল করা হয়। আর এ সংবাদে কিছুটা বিচলিত হয় রাজপরিবার। তা ছাড়া, সে সময়ে মার্কোস বিরোধী বিক্ষোভও কঠিন আকার ধারণ করে। ফলে ১৯৮৩ সালেই একরকম আচমকাই পরিত্যক্ত হয় ভবনের নির্মাণ কাজ। এ এলাকার প্রবেশ পথসহ সমগ্র এলাকাই সিল করে দেওয়া হয় হঠাৎ করেই।
সে যাক, প্রাসাদ দেখতে দেখতে আমরা তখন এসে পৌঁছেছি পিছনের এলাকায়। এখানে ভবনের সাথে লাগোয়া কক্ষসমূহে কিছু সুভেনির শপ বসানো হয়েছে। সামনের দিকেও অনেকগুলো কক্ষ, একেবারেই ফাঁকা।
আমাদের টিম লিডার শ্যামল কান্তি ঘোষসহ একটু সামনে এগিয়ে এক ফিলিপিনো দর্শনার্থীর সাথে আলাপ করে জানলাম, সামনে লম্বাটে একতলা ঘরটা ছিল কিচেন, আর বাম পাশের ছোট ছোট ঘর ক'টি হয়তো তৈরি হয়েছিল দাস-দাসিদের থাকার ঘর হিসেবে।
আমরা আর একটু এগিয়ে বাম দিকে যেতেই দেখলাম চমৎকার সুন্দর সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। সামনেই সুইমিং পুলের কাঠামো। এরপর আরও কয়েকটি ছোট ছোট ঘরের কাঠামো দেখলাম। এগুলো সম্ভবত বৈঠকখানা বা পানাহ-ার, কিংবা বসে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যই তৈরি হচ্ছিল। সবকিছু একসাথে মিলিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায়, জৌলুসপূর্ণ এ ভবন তৈরির জন্য গৃহীত হয়েছিল রাজকীয় মহাপরিকল্পনা।
সূর্যদেব ততক্ষণে একপাশে ঢলে পড়েছে। মনে হচ্ছে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে ক্রমাগত, দ্রুত। এবার আমাদের ফিরতে হবে। তাই সুইমিং পুল এলাকা থেকে আবার সিঁড়ি বেয়ে মূল-ভবনের পিছন দিক থেকে উপরে উঠে এলাম। আবার চলে এলাম ভবনের পাশে। আমার মনে হচ্ছিল, সমগ্র ফিলিপাইনে এখন সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু এখান থেকে এখনো সূর্য দেখা যাচ্ছে, হয়তো আরও কিছুক্ষণ দেখা যাবে। আমরা অনেক উপরে বলেই পশ্চিম আকাশে একদম নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছি লাল এ অগ্নিপিণ্ড, কমপক্ষে একটি বড় বাসের চাকার সমান।
এ ভবনটির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে অন্য কোনো ভবন, গাছপালা, বা অন্যকিছুর ছায়া পড়বে না এ কাঠামোর উপর। কারণ এ ভবনটিই সবচেয়ে উঁচুতে। আর এই উঁচুতে থাকতে চেয়েছিলেন ইমেলদা মার্কোস, ফিলিপাইনোর এই লাস্যময়ী, অসীম ক্ষমতাধর রাজরানী।

কেমন করে এলেন এই ইমেলদা

অতি সাধারণ গ্রামাঞ্চলীয় বংশোদ্ভূত ইমেলদা ছোটবেলা তার এক কাজিনের সংগীত দোকানের সামনে খরিদ্দার আকর্ষণের জন্য নাচতেন। সেখান থেকেই তিনি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পর সুন্দরের রানী হিসেবে মানুষের হৃদয়পটে আবির্ভূত হন। ১৯৫৪ সালে পঁচিশ বছর বয়সে কংগ্রেস সদস্য ফার্দিনান্দ মার্কোসের সঙ্গে তার শুভ পরিণয় ঘটে। তার মাত্র বারো বছরের মাথায় ফার্দিনান্দ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ইমেলদা অভিষিক্ত হন ফার্স্ট লেডি হিসেবে এবং শুরু হয় তার স্বৈরাচারী আচরণ। তার সাত বছর পরেই মার্কোস সামরিক শাসন জারি করলে ইমেলদাকে একদিকে কাঠিন্য আর অন্যদিকে তার স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের জন্য 'স্টিল বাটার ফ্লাই' নামেও অভিহিত করতে শুরু করে সাধারণ মানুষ। প্রেসিডেন্ট মার্কোস ১৯৮০ সালের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লে দেশ পরিচালনার ভার ইমেলদাই গ্রহণ করেন। তখন তার ইশারাতেই ঘটে যাবতীয় স্বেচ্ছাচারিতার ঘটনা। তখন বিরোধীদলীয় নেতা বেনেগার ইক্যুইনোকেও দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এ সময়ে শত শত ফৌজদারি মামলার আসামি ইমেলদার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে মার্কোস তখন একটি কমিশনও গঠন করেছিলেন। যদিও ইমেলদা সে কমিশনে নির্দোষ প্রমাণিত হন।
যাই হোক, এই বজ্র কঠিন নারী মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ফিলিপাইনে হার্ট ও লাং সেন্টার, ফিল্ম সেন্টার, কোকোনাট প্যালেস এবং ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার তৈরি করেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তিনি নির্মাণ করেছিলেন ফোক-থিয়েটারসের অবকাঠামো এবং আয়োজন করেছিলেন মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা।
সে যাক, ১৯৮৬-এর নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে মার্কোস শাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে ফিলিপিনরা। ওই সময়ে মার্কোস ও ইমেলদাকে

দেশ ছাড়তে হয়। ইতোপূর্বে ইমেলদার ক্রয় করা নিউইয়র্কের ম্যানহার্টনে অনেকগুলো প্রাসাদসম বাড়ি থাকার পরও ইমেলদা দম্পতি পাড়ি জমান হাওয়াই দ্বীপে। ইমেলদা দেশ ত্যাগের সময় সঙ্গে করে নিয়ে যান তার ধনসম্পদ, পোশাক-আসাক আর অনেকগুলো জুতা। কথিত আছে, তারপরেও পাঁচশ'র উপর রাজকীয় গাউন, হাজারের উপরে ব্যাগ ও সাড়ে সাত হাজার জুতা তিনি ফেলে যান। যেগুলো পরে ফেলে দেওয়া হয় কিংবা ধ্বংস করা হয়।

ইমেলদা মার্কোসের কথা ভাবতেই পশ্চিম দিকে তাকিয়ে আমাদের দলের একজন সদস্য জানতে চাইল, আচ্ছা পশ্চিমদিকে ওই যে অপেক্ষাকৃত নিচু পাহাড়ের উপর লাল রঙের দালান-কোঠা দেখা যাচ্ছে, সেগুলো কেন তৈরি হয়েছে? সত্যিই তো! এগুলো তো এতক্ষণ খেয়াল করিনি! আমাদের গাইড হেইদি আমাদের পাশেই ছিল। এখানেই তার দেখা হয়েছে এক বান্ধবীর সাথে। সেও আরেক সুন্দরী, রাজরানী না হলেও বিদূষী ফিলিপিনো। নীল রঙের টাইট জিনসের সাথে পরেছে খোলামেলা গোলাপি রঙের টি-শার্ট। ডুবন্ত সূর্যের উজ্জ্বল লাল আলোতে ঝলমল করছে তার রং, রূপ, সৌন্দর্য। সে এগিয়ে এসে বলল, পাইক পেয়াদা ছাড়া রাজরানী কি থাকতে পারে। ওখানে সাজানো হয়েছিল রাজ-কর্মচারীদের অফিস-আদালত ও বাসভবন। এখান থেকেই তো সাময়িকভাবে ফিলিপাইন শাসনের পরিকল্পনা ছিল ইমেলদার।

এ সবকথা যখন আলাপ করছিলাম তখন কে যেন কিছু ধূসর রং ছিটিয়ে দিয়েছে এ সুন্দর মেয়েটির চোখে-মুখে। সে বলল, ওই সময়ে ফিলিপাইনের দরিদ্র লোকেরা অনাহারে থাকত। অনেকের বসতবাড়িই ছিল না, আর তাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে তৈরি হচ্ছিল এ বিলাস ভবন। সে সময়ে শুধু একজন নারীর এ মাউন্টেন প্যালেস বানানোর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যই নষ্ট করা হয়েছিল আট মিলিয়ন ইউএস ডলার।

সে যাক, আর একবার নয়ন ভরে অবলোকন করলাম, চন্দ্রালোকে সম্পূর্ণ একা দাঁড়িয়ে থাকা এ ভবনটির রূপ। বারবার মনে জাগরিত হচ্ছিল ইমেলদার কথা। মনে মনে ভাবলাম, এই জ্যোৎস্না ঝরা মনোরম রাতে এখানে যদি এসে দাঁড়াতেন প্রাচ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সুন্দরের রানী তার হীরকখচিত ধবধবে সাদা গাউন পরে, কেমন দেখা যেত তাকে! দু'চোখ বন্ধ করে শুধু হৃদয় দিয়েই উপভোগ করলাম সে সৌন্দর্য!

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, একবার, এমনকি একদিন, কিংবা একঘণ্টার জন্যও এখানে আসা হয়নি কিংবা আসেননি ইমেলদা।

মনে পড়ল মুঘল সম্রাট শাহজাহানকে উদ্দেশ্য করে কবিগুরুর লেখা 'শা-জাহান' কবিতার কটি লাইন:

কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন, ধনমান।
শুধু তবঅন্তর বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের এ ছিল সাধনা ...।

১৯৮৬-এর পরে অ্যাকুইনো ক্ষমতায় আসার পরই এ ভবন এলাকা খুলে দেওয়া হয়। নামে মানুষের ঢল। কিং প্যালেস নামে নির্মাণ শুরু হলেও মানুষ এ ভবনকে স্কাই প্যালেস, মাউন্টেন প্যালেসসহ নানা নামে অভিহিত করে। নন্দিত আর নিন্দিত হন ইমেলদা! আবার শুরু হয় এ ভবনের সংস্কার। একে সাজানো হয় নতুনরূপে। এ নতুন অবয়বের নাম দেওয়া হয় পিপলস পার্ক।

এ ভিজিটের অনেক বছর পরে যখন এ লেখা লিখছি, তখন টিভিতে বারবার প্রচারিত হচ্ছিল, তীব্র বেগে হাওয়াই দ্বীপের দিকে ধেয়ে আসছে হ্যারিকেন, ঘণ্টায় প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার বেগে। সেখানকার বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর টিভি পর্দায় দেখা যাচ্ছিল, শত শত গাড়ি ত্যাগ করছে ঝড়ের আশংকা যুক্ত এলাকা। এ সংবাদ শুনতে শুনতে আমার বারবারই মনে হচ্ছিল, সেখানেই রয়েছেন ইমেলদা মার্কোস, রয়েছে তাদের বাড়ি। তিনি নিরাপদে থাকবেন তো! আবার মনে হচ্ছিল ইমেলদা এখন ম্যানিলায়ও তো থাকতে পারেন। কারণ ১৯৯১ সালে তৎকালিন রাষ্ট্রপতি অ্যাকুইনোর অনুমোদনে ইমেলদা দেশে ফিরে আসেন। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কিন্তু তার তিন বছর পর সে 'লেতে' এলাকা থেকে আবার কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন।

সে যাক, সাঁঝের আকাশে উপচে পড়া কালো রং ততক্ষণে আরও নিকষ হয়েছে। সে কালো রং দু'পাশে সরিয়ে প্রায় শতেক কিলোমিটার বেগে আমাদের মাইক্রোবাস তখন ছুটতে শুরু করেছে ম্যানিলার উদ্দেশ্যে। ঘণ্টা খানেক পরেই রাস্তার দু'ধারে ঝলমলে বাতি, ঘরবাড়ি, দোকান-পাট দৃশ্যমান হতে শুরু করল। বুঝলাম, আমরা মেট্রো-মানিলায় পৌঁছে গেছি। মাকাতি, ম্যান্ডালিয়ন পার হয়ে পাসাই সিটিতে এসে পৌঁছে গেলাম আরও ঘণ্টা খানেক সময়ের মধ্যে। হোটেল রিচমন্ডও যেন ঝলমল করছে আর হাতছানি দিচ্ছে আমাদের ঘরে ফেরার জন্য। সে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে ফিরে গেলাম হোটেলে, নিজ নিজ কক্ষে।

তবে হৃদয়ে থেকেই গেলেন স্বপ্নরানী ইমেলদা। আর থেকে গেল নন্দিত ও নিন্দিত সে রাজভবন, আকাশপ্রাসাদ।





অনুবাদ গল্প

এখনও একটি গুলি বন্দুকে আছে

মূল : ডিঙ লিঙ
অনুবাদ: শাহাজাদা বসুনিয়া

‘তোমরা কি গল্প বলছো? ওহে বালক তুমি ভীতিগ্রস্ত হইও না, আমাকে সত্যি কথা বলো; এখন আমি বুড়ি বিধবা; আমি কি তোমাদের ক্ষতি করতে পারি?’

বৃদ্ধার মুখটি বলিরেখায় ভর্তি, গায়ে ছিল জীর্ণশীর্ণ তুলা দিয়ে বুনানো লম্বা কোট। তার মাথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল কিছু ধূসর বর্ণের চুল। স্কার্ফের নিচ থেকে তা কপাল পর্যন্ত ঝুলে ছিল। গাছের ডাল দিয়ে তৈরি একটি লাঠির ওপর ঝুঁকে পড়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আতঙ্কিত বালকদের প্রতি তিনি ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তার পরনে ছিল জীর্ণশীর্ণ পোশাক, এমনকি তার মাথায় টুপিও ছিল না। সাদা দাঁতগুলো বের করে তিনি হেসে উঠলেন, মুখটা কাঁপছিল বৃদ্ধার। তিনি বললেন:

‘ওহ!, তুমি, আমি তোমাকে চিনি, তুমি...।’

বালকটির বয়স প্রায় তেরো বছর। উজ্জ্বল চোখ দুটো দিয়ে সে সামনে পেছনে দ্রুতগতিতে তাকাচ্ছিল। বৃদ্ধার দিকে সে ইতস্তত তাকাচ্ছিল এবং বৃদ্ধাও বন্ধুসুলভ ও পবিত্র দৃষ্টিতে বালকটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বালকটি সীমাহীন সমতলের দিকে তাকাল কিন্তু একটি গাছের কারণে সে একটিও মানুষের ছায়া দেখতে পেল না। ইতোমধ্যে সূর্য মামা পাহাড়ে ঢাকা পড়েছে, দিগন্তে কুয়াশা ছড়িয়ে পড়েছে, দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, অদৃশ্যমান রাজপথের মতোই বালকটির স্বপ্নগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। মাথা ঘুরিয়ে বালকটি বারবার বৃদ্ধার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল:

‘আসলে আপনি কিছুই জানেন না।’

‘সত্য সত্যই আমি কিছু জানি না, আমি গুলির কোনো শব্দ শুনিনি। গত বসন্তে ‘রেড আর্মি’ ছাড়া এখানে আমি কাউকে দেখিনি। কমরেডরা অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিল। তারা এখানে তিনদিন ছিল, আমাদের গান শুনিয়েছিলেন এবং অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। তাদের খাওয়ানোর জন্য আমরা তিনটি ভেড়া জবাই করেছিলাম। তারা আমাদের আট ডলার দিয়েছিল, ডলারগুলো দেখতে চকচকে সাদা ছিল। রেড আর্মির পরে নর্থ-ইস্ট আর্মি এখানে এসেছিলেন।’ বৃদ্ধা তাদের সম্বন্ধে কিছু না বলেই গালি দিল, ‘এই...’।

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন এবং ওপরের দিকে তাকালেন। বালকটির মুখের দিকে আরও একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নির্দিষ্ট করে বললেন, 'এসো, আমার সঙ্গে আসাই তোমার জন্য মঙ্গল হবে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে একসময় কি কারও হাতে ধরা পড়বে, হুম?'

বৃদ্ধা তার লাঠির ওপর ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন, দীর্ঘক্ষণ পরে তিনি বুঝতে পেলেন যে, মোজা তার ক্ষুদ্র পায়ে পাঁচিয়ে গেছে।

বালকটি একগ্রতায় বিকেলের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু সে অনুভবকরলো যে, ওই বৃদ্ধার সঙ্গে সে যেতে পারবেনা। বালকটি মিষ্টি সুরে জিজ্ঞেস করল:

'দাদি, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?'

'একজন ছেলে, মেষ পালকের কাজ করতে অন্যের বাড়িতে গিয়েছে। তার স্ত্রী ও কন্যা উভয়েই এক বছর আগে মারা গেছে। ওই বছরে একই রোগে প্রচুর লোক মারা গিয়েছিল। কেউ জানতেন না কী রোগ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল।'

'দাদি, আজ আপনি কোথায় ছিলেন?'

'আমার ভাগ্নির প্রসববেদনা, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু ওখানে রাত কাটালাম না। দশ কিলোমিটারের বেশি হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এলাম, আমি বড্ড ক্লান্ত।'

বালকটি দ্রুত এগিয়ে গেল। বৃদ্ধার হাত তার ঘাড়ে নিয়ে বলল, 'আমার কাঁধে চড়েন।' বালকটি তার লম্বা ও এলোমেলো চুলের ভেতর দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে তাকিয়ে বলল,

'আপনার গ্রামে কতজন পরিবার বসবাস করেন?'

'অনেকগুলো পরিবার না, মাত্র সাত অথবা আটটি পরিবার বাস করে। তুমি ভীত, কোন পরিবার তোমার ক্ষতি করবে? তুমি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছো? আমাকে বলো। তুমি কি রেড আর্মির একজন ছোট সদস্য? হারিয়ে যাওয়া স্নেহশূন্য ওই বালকটির দিকে বৃদ্ধা তার চোখের সুচতুর ক্ষীণ দৃষ্টিতে চোখ টিপলেন, যা আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল না।

বালকটিও হাসল। শান্তভাবে সে বলল, 'এ প্রসঙ্গ টানার কোনো প্রয়োজন নেই। যখন আমরা বাড়িতে পৌঁছাবো, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন আমাকে রাস্তায় কুঁড়িয়ে পেয়েছেন। আমি সত্য সত্যই আপনার ছেলের মতন; কীভাবেরান্না ও কাঠ কাটতে হয় আমি তা জানি। আপনার কি গবাদিপশু আছে? তাদের কীভাবেখাওয়াতে হয় তা আমি জানি।'

পশু সম্পত্তি। বালকটি সুন্দর একটি ছাউনিতে একটি ঘোড়ার কথা ভাবছিল। ঘোড়ার মুখে একটি লম্বা সাদা দাগ ছাড়া পুরো দেহেই লোমগুলো একই রঙের ছিল। ঘোড়ার মুখের সাদা দাগটি সে প্রায়ই বুলাতো, তাকিয়ে থাকত ঘোড়াটির দিকে, ঘোড়াও তার দিকে তাকিয়ে থাকত। ঘোড়াটি নাক ঝাঁকুনি দিত, আবার নাক দিয়ে তাকে মৃদু ঠেলা মারত। এমন এক পোষা জন্তু। ঘোড়াটিকে খাওয়া-দাওয়ানোর প্রায় অর্ধেক বছর অতিবাহিত হলো। মঞ্জিদী থেকে ঘোড়াটি আনা হয়েছিল, ঘোড়াটি একটি রাজনৈতিক কমিটির প্রধানের ছিল। ঘোড়াটি এতই সুন্দর ছিল যে, রেজিমেন্টাল অধিনায়কেরও এমন ঘোড়া ছিল না। বালকটি ঘোড়াটির কথা ভাবছিল, ঘাড়ের ওপর লম্বা চুলগুলো ব্রাশ করার কথা মনে পড়ল, ঘোড়াটির লেজ মাটিতে লাগত এবং ওটির...। ঘোড়াটির দুটি বুদ্ধিদীপ্ত, প্রেমময় চোখ বালকটির ভেতরে দৃষ্টিগোচরীভূত হলো এবং হঠাৎ অবিচ্ছিন্ন অশ্রু তার মুখে পড়ল।

বালকটি বারবার বলতে লাগল, 'আমি গবাদিপশুকে খাওয়াতাম, আমি গবাদিপশুকে খাইয়েছিলাম।'

'হুম, তুমি গবাদিপশুর একজন মাইপোষ ছিলা কিন্তু কোথায় ওগুলো গবাদিপশু এবং কোথায় তোমার মুনিব? এখন তুমি এখানে এসেছো।'

আস্তে আস্তে হেঁটে তারা দুজন একটা উপত্যকার মুখে এসেছিল। উপত্যকার চারপার্শ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি গুহার দরজা ছিল। মাটির প্রাচীরঘেরা দুটি কামরা/প্রকোষ্ঠ ছিল। বৃদ্ধার হাত ধরে সে তির্যক পথে নামতে থাকল কিন্তু একটিও কথা বলার সাহস হলো না বালকটির, সে কেবল খোলা চোখে চতুর্দিকে তাকাল। ইতোমধ্যে উপত্যকার ভেতর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, গুহার দুটি দরজা থেকে বাতির ক্ষীণ রশ্মি বেরিয়ে আসছিল। একটি গাধা মাইলস্টোনের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কোনো লোককে ওখানে দেখা গেল না। তারা যে দুটো গুহা অতিক্রম করেছিল, সেখানকার অনেক ফাটল থেকে ধুয়া বের হচ্ছিল, তা দেখে বালকটি বৃদ্ধার পেছনে লুকালো। অন্য আরেকটি গুহার সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা তালা খুললেন এবং তাকে প্রথম ভেতরে ঢুকতে বারণ করলেন। গুহার ভেতরটা ভীষণ অন্ধকার ছিল, বালকটি নড়াচড়া করতে সাহস পেল না। বৃদ্ধার হাঁটার শব্দ বালকটি শুনতে পাচ্ছিল। তিনি অন্ধের মতো কিছু খুঁজছিলেন। বাটিতে রাখা তেল দিয়ে তিনি একটা শলিতা জ্বালালেন এবং সেখান থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল।

বৃদ্ধা নিঃশব্দে বললেন, 'ওহে বালক ভয় পেও না, আগুন জ্বালাও, আগুনে নিজেকে একটু চাঙ্গা কর, তুমি অবশ্যই অনেক ক্ষুধার্তও।'

তারা দুজনেই মাটির চুলার সামনে বসে পড়ল। আগুনের আলো তাদের মুখের ওপর জ্বলজ্বল করছিল এবং চুলা থেকে প্রচুর বাষ্প বের হচ্ছিল। বৃদ্ধা তাকে পছন্দ করতেন। বৃদ্ধার জন্য বালকটিও উষ্ণ ছিল। বালকটি ভীষণ ক্ষুধার্তও ছিল এবং ওই রাতে কমপক্ষে একটা উষ্ণ বিছানায় সে ঘুমাবে তাও জানত। সবকিছুই তাকে প্রফুল্ল করল। সে ইতোমধ্যেই ভয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, জেগে থাকার চেষ্টা করলেও ঘুম তাকে বশীভূত করল। উত্তর শানঝিতে শীতের রাতে প্রায়ই উত্তর-পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হতো। হালকা মেঘের ভেতর দিয়ে একাকী নিঃসঙ্গ চাঁদটা বেরিয়ে আসত। চাঁদের অবারিত আলো ছড়িয়ে পড়ত সমতল ভূমিতে। তবেরাতে হলুদ পৃথিবীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা, অন্ধকার গুহার ভেতরে হারিয়ে যাওয়া একটি মধুর স্বপ্ন, ঘুরে বেড়ানো বালকটিকে বিভোর করল। বালকটি ভাবছিল, সে তার সৈন্যদল নিয়ে ফিরে আসল, রণভেরির সঙ্গে নিজেকে মাতিয়ে তুলল অথবা প্রচার বাহিনীর সদস্যের সঙ্গে নিজেকে উপভোগ করালো বা রেজিমেন্টের অধিনায়ক তার কান ঝালাপালা করে বকা দিচ্ছিল: 'তুমি অপদার্থ, তুমি খাও, বেড়ে ওঠো না কেন?' অথবা সে সম্ভবত ভাবছিল লালচে রঙের ঘোড়াটির লাগাম আলতোভাবে ঘাড়ে রেখে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাগান্বিত, নোঙরা বৃদ্ধা বিধবাও উপত্যকার বাইরের বাতাস থেকে দূরে ছিল। তিনি বালকটির পাশেই শুয়েছিলেন।

'আমি ওয়াইওবাও (wayoabao একটি চীনের বৈপ্লবিক জায়গা) থেকে এসেছিলাম। প্রায় গ্রামবাসীরা ওই কথা বারবার বলে আমাকে নিয়ে মজা করতেন। সবাই জানতেন ওইটা রূপ কথার গল্প। তার সামনে বিশেষ করে, যে সকল যুবতীরা সেলাই করার জন্য জুতার তলা তাদের বুড়ো আঙ্গুল ও আঙ্গুলগুলোর মাঝখানে ধরে থাকতেন। তারা হাতগুলো ঘষা মারতেন; তাদের হাতগুলো অতি ঠান্ডায় ক্ষত হয়েছিল। তারা বলতেন,

'আসলে তুমি কোত্থেকে এসেছো? আমরা তোমার কথাবার্তা বুঝি না, তুমি কি ওয়াইওবাও থেকে এসেছো। ওহে বালক, তুমি নিশ্চয় কৌতুক করছো?'

বালকটি অন্যের পেছনে পেছনে দৌড়াতো। ঘাস কাটার জন্য তাদের সঙ্গে বহুদূরে যেত এবং বড় বড় বোঝা পিঠে বহন করত। মনে হতো বস্তার ভেতর লোক বহন করছে, কাঁধে করে বস্তাটি গ্রামে ফিরে আসত বালকটি। ময়লা স্তূপের চারদিকে কোনো মানুষ দেখা যেত না, ময়লা-আবর্জনা বহনকারী ট্রাক, ঘোড়ার খুর আর পদচিহ্ন ছাড়া সেখানে কিছুই দেখা যেত না। সূর্য উদিত ও অস্ত যাওয়ার সময় নিজের দিকে মনোনিবেশ করা তার পক্ষে সম্ভবহতো। বালকটি দক্ষিণ-পূর্বদিকে গভীর মমতায় তাকিয়ে থাকত, যেখানে তার বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন থাকতেন, বাড়িটি স্থায়ীভাবেনির্মিত যেখানে বালকটি বসবাস করত। তার দলটি কতদূরে গিয়েছিল? বালকটি শত্রু বিমান থেকে রক্ষার্থে তার অনেক সহযাত্রী, সৈন্যদলের বিশেষ সেবাপ্রদানকারী সদস্য ও তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপত্যকার গর্তে লুকিয়ে রেখেছিল-গত কয়েকদিন থেকে ওইসবমনে পড়ায় বালকটি গভীরভাবেঅনুশোচনা বোধ করছিল।

একটি ছোট গুহার মধ্যে লুকিয়ে থেকে শুনতে পেয়েছিল বিরামহীন বোমার বিস্ফোরণ। বালকটি ভাবছিল জীবনে কতবার সে ঝুঁকির মধ্যে পড়েছিল। পরে, যখন পরিবেশ শান্ত হলো, সে গুহা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল সে একাই বেঁচে ছিল। বালকটি চিৎকার করে সহযাত্রীদের ডাকল। তারপর সে রাস্তার দিকে পাগলের মতো ছুটছিল। ভেবেছিল সঠিক পথে সে এসেছিল। কিন্তু সে কাউকে দেখতে পায়নি। পুরো বিকেল সে রাস্তা ধরে ছুটে চলেছিল এবং রাত্রিতে বেশি ঠান্ডা থাকায় সে ঘুমাতে পারেনি। পরের দিন আবার সন্ধ্যাবধি হেঁটেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ওই বৃদ্ধ মহিলার মুখোমুখি হলো। বালকটির ভাগ্য ভালো কারণ ওই গ্রামের সবাই তাকে ভালোবাসত এবং সবাই তার প্রতি যত্নশীল ছিল। গ্রামবাসী শুধু রেড আর্মির একজন সদস্য হিসেবেতাকে ভাবতেন। কিন্তু তার ব্যাপারে গ্রামবাসী উদ্বিগ্নতা অনুভবকরতেন না। অন্যদিকে, ভাগ্য বিড়ম্বনা: তাকে না জেনে অন্যরা কিভাবেচলে যেত? সে গ্রামে ফিরে আসত, গ্রামবাসীর সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত হলো এবং সেখানে টিকে থাকল। সে নিজেও গ্রামে আসত এবং তাদের দলের হারিয়ে যাওয়া সদস্যদের সন্ধানে গভীর আগ্রহে বালকটি চেয়ে থাকত। সন্ধ্যায় বালকটি পানি আনতে যেত কিন্তু কোনো খবরই পেত না। সে দূরের সীমাহীন সমতলে তাকিয়ে থাকত। তার

কানে একটি শব্দ আসল। যেন শব্দটি অনেক পরিচিত, যেন শব্দটি ভেঁপুতে নাম ডাকার (Roll-call) মতন।

গুহায় তরুণটির পাশের দরজায় একজন ছেলে থাকত। তার চোখ দুটো কালো এবং তার মুখটি ছিল বড়। ছেলেটি তার কাঁধে চাপড় মারল। তখন তাকে বেশ কয়েকবার একটি গান গাইতে বলল। প্রথমে তরুণটি অনুভবকরল যে, ছেলেটি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছে, পরে সে লক্ষ্য করল যে, ছেলেটির সঙ্গে তার সেনা অধিনায়কের যথেষ্ট মিল রয়েছে। অনেক দিন আগে সে তার সেনা অধিনায়ককে একবারই দেখেছিল। কুচকাওয়াজের সময় একদিন সে ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্য যেখানে গিয়েছিল, ওখানেই তার সেনাধিনায়ক বিশ্রাম করছিলেন। হেসে হেসে তার অধিনায়ক বলেছিলেন, 'কি হে নবগত, তুমি কোত্থেকে এসেছো? কীভাবে'রেড আর্মি'তে তুমি আসলে?' তখন কী বলেছিল বালকটি তা মনে করতে পারল, 'যাহোক, তুমি যেভাবে'রেড আর্মি'তে যোগদান করেছো, আমিও একইভাবে'রেড আর্মি'তে যোগদান করেছি।' অধিনায়ক আরও প্রকাশ্যে হাসছিলেন: 'আমি তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি: 'আমরা কেন জাপানি সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করবো?' এবং তার পর তরুণটি কমান্ডারকে তার পাশের কাউকে চুপ করে বলতে শুনলেন, 'আমাদের অবশ্যই তাদের সঠিকভাবেপ্রশিক্ষিত করা উচিত, ওই ছোট শয়তানরা সবাই সত্যিকারের ভালো ছেলে।' ওই মুহূর্তে সে কমান্ডারের স্নেহ ও নিষ্ঠার ভঙ্গি দেখে তার ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছিল। তার পর থেকে তরুণটি অধিনায়ককে আরো বেশি পছন্দ করত। এখন ওই পাশের ছেলেটি হুবহু দেখতে তার অধিনায়কের মতন। সুদূরে অবস্থানরত সেনাসদস্যদের চেয়ে আরো বেশি করে ওই বিষয়টি এখন তাকে ভাবিয়ে তুলল। কেউ ভুট্টা দিয়ে তৈরি করা সেদ্ধ রুটি নিয়ে এলো, আবার কেউ কাসুন্দিসহ শাক-সবজির বাটি নিয়ে এলো। যাহোক ছেলেটির গায়ে ছিল উলের মোজা এবং মাথায় স্পশানুভূতি ক্যাপ ছিল এবং ক্যাপটি লাল রঙের পাঁচ স্টার বিশিষ্ট। ছেলেটির বুক পকেটেই ক্যাপটি ভাঁজ করা ছিল যা বের করার সাহস পায়নি। সবাই ছেলেটিকে আনন্দের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছিল, সবাই আশা করেছিল ছেলেটি তাদের সত্য কথাটি বলবে, সামান্য হলেও 'রেড আর্মি' সম্বন্ধে কিছু বলবে। 'রেড আর্মি' মহান, ওহ।' ওই বছরের বসন্তে তার বড় ভাই চীনে প্রতিষ্ঠিত সৌভিয়েত অঞ্চলের একটিতে গিয়েছিলেন। তার ভাই বলেছিলেন ওখানকার জীবনযাপন খুবই সুন্দর। জমিজমা চাষ করতে সাধারণ জনগণকে 'রেড আর্মি' সহযোগিতা করে।' সবাই বলতেন, 'এতটুকু একটি তরুণ। ইতোমধ্যেই 'রেড আর্মি'তে যোগদান করেছে! তোমার বাবা-মা কি জানেন?'

'কমরেড। ঠিক আছে? সবাই একে অন্যকে কমরেড বলে সম্বোধন করে। কমরেড, ভয় পাবেন না, আমাদের সবখুলে বলুন, আমরা সবাই এক পরিবারের সদস্য!'

তরুণটির মুখ থেকে স্নেহমাখা ও নিষ্পাপ হাসি বেরিয়ে এলো। সে সবসময়েই তার সম্বন্ধে এমন ভালো মন্তব্য শুনে আসছিল। প্রায়শই সে ওই জাতীয় মন্তব্য শুনত এবং কৃষকদের কাছ থেকে সহৃদয়তা পেত। ওই গ্রামে একাই এসে দেখল যে, গ্রামবাসী আরো বেশি আন্তরিক যা তরুণটি কখনও প্রত্যাশা করেনি। মুহূর্তের মধ্যেই তার উদ্বিগ্নতা কেটে গেল এবং 'রেড আর্মি' সম্বন্ধে বলতে লাগল। দলসভা এবং বিভিন্ন বক্তব্যে বালকটি যা যা শুনেছিল তা পুনরাবৃত্তি করল এবং সামরিক পরিভাষা যা সে 'রেড আর্মি' থেকে আয়ত্ত করেছিল। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো: 'রেড আর্মি' হচ্ছে একটি বিপ্লবী সেনা। ওই সেনাদলটি কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। জাপানি সাম্রাজ্যবাদীদের পতন ও চীনা জাতির মুক্তিই হচ্ছে 'রেড আর্মি'র বর্তমান গুরু দায়িত্ব। জাপান প্রায় চীনকে ধ্বংস করতে বসেছে। যারা একটি বিজয়ী জাতির দাস হতে চান না, তাদের সবাইকে 'রেড আর্মি'তে যোগ দিতে হবেএবং জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে...।'

চারপাশের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বালকটি দেখল তাদের স্থির দৃষ্টিতে উত্তেজনা এবং তাদের মুখে সীমাহীন প্রশংসা। ঠোঁট টিপে বৃদ্ধা বললেন: 'প্রথমবার যখন আমি তাকে দেখলাম, আমি জানতাম যে, এই তরুণটি এখনকার নয়: তার মুখের কথা আপনারা শুনুন।'

তার পর যুদ্ধে অর্জিত তার অভিজ্ঞতার কথা তরুণটি বলল। যদিও সে কিছুই বাড়িয়ে বলে নাই তবুও তার বাস্তবতার বর্ণনা অবিশ্বাস্য ছিল। সুতরাং নিচের কথাগুলো তাকে বলতে হয়েছিল:

'আমরা লড়াই করছি কারণ হচ্ছে আমরা শিক্ষিত, অন্যরা জাপানিদের অধীনে দুই ডলারের জন্য চাকরি করছে। আমরা শ্রেণি-গোত্র-জাতির স্বার্থে লড়াই করছি; সেজন্য 'রেড আর্মি'র একজন সদস্যও মরতে ভীতু নয়। কে দুই ডলারের জন্য তার জীবন ফেলে দিতে রাজি?'

তারপর তরুণটি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু সংগীত পরিবেশন করল। উপস্থিত ছেলে-ছোকড়াও তার সঙ্গে গান গাইতে চেষ্টা করল। তারা কপালের চুলগুলো পেছনে ব্রাশ করল, তারা মুক্তো দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসছিল এবং বৃদ্ধাও মুচকি হাসলেন। কিন্তু বিকেলে যখন তারা চলে গেলেন, বালকটি তখন নিশ্চুপ থাকল।

বালকটি পুনরায় সৈন্যদের কথা ভাবছিল, যে ঘোড়াটিকে সে খাওয়াত ওই ঘোড়াটির কথাও তার মনে পড়ছিল। সে অনুভবকরল যে, তার ভেতরে একটি আতঙ্কের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। সে ভাবল, দৈবাৎক্রমে গ্রামের কোনো লোক তার উপস্থিতির সংবাদ ফাঁস করলে তার কী হবে?

এমনটি মনে হচ্ছিল যে, বুড়ো বৃদ্ধা বালকটির মনে কী ছিল তা দেখতে পেলেন। সুতরাং তিনি চৌকির ওপর তাকে লেপ দিয়ে মোড়ালেন। এবং চাতুর্যভাবেবললেন, 'যদি কোনো বদ লোক তোমার কাছে আসে তুমি শুধু শুয়ে থাকবেএবং অসুস্থতার ভান করবে, তুমি কী শুনছো? তুমি কেবল নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্য রাখো, এখানে প্রত্যেকেই সৎ!'

গ্রামবাসীরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে এভাবেবলত: 'যদি আবার 'রেড আর্মি' ফিরে আসে; তুমি তাহলে তাদের সঙ্গে যেও, আমরাও তাদের সঙ্গে যাব-তাহলে কেমন হবে?'

'আমি ওয়াইওবাও থেকে এসেছি।' ওই বাক্যটি সময়ে সময়ে যথাযথ কৌতুক হিসেবেব্যবহার করা হতো। যখন সে শুনত, বিব্রত হাসি দিয়ে তা উড়িয়ে দিত।

একরাতে কিছু কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল এবং তারপর ঘোড়ার মৃদু হ্রেষাধ্বনি, টহলের শব্দ এবং মানুষের চিৎকারের শব্দ গ্রামে বিকটভাবে প্রতিধ্বনিত হলো। বলা মুশকিল যে, হঠাৎ করে কতগুলো মানুষ ও ঘোড়াকে গ্রামে এনে হত্যা করা হয়েছিল।

'নেমে এসো; শব্দ করো না। কী হয়েছে সেখানে, আমাকে দেখতে যেতে দাও।' বালকটির একপাশ ধরে বৃদ্ধা উঠে পড়ল এবং গুহার দরজায় গেলেন। আগুন নিভিয়ে বালকটি তার প্রচণ্ড হৃদয়কম্পন অনুভবকরে ভাবল: 'আমার দলের লোকেরা কি আসতে পারে?' সে মেঝেতে বসে পড়ল। সে দেয়ালে মাথাটি রেখে একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে বাইরের শব্দ শুনছিল।

'ধাম!' গুহার দরজাটি বন্দুকের গোড়ালি দিয়ে এক ধাক্কায় খুলে ফেলল। ছড়িয়ে পড়া আকাশের ম্লান আলোতে বালকটি একদল মানুষের ছায়া দেখল।

'তোর মা একটা..।' ভুল করে ভিতরে এসে সৈন্যরা বৃদ্ধাকে মাটিতে ফেলে দিলেন।' 'কুত্তার বাচ্চারা আমার পথ অবরোধ করছে...' অভিশাপ দিয়ে বালকটি চুলার কাছে গিয়ে বলল, 'হু! আমি দেখছি যে আমার এবং বন্ধুদের জন্য পাত্রে খাবার রান্না হচ্ছে।'

অন্ধকারে তরুণটি তার জায়গা থেকে উঁকি দিল। সে জানত ছেলেটির টুপির আকারও টুপির ব্যাজটি তার থেকে আলাদা ছিল। নিজের মধ্যেই হারিয়ে গেল। সে ভাবল যদি দেয়ালের সাথে মিশে যেত পারত, হঠাৎ করে যদি তার ডানা গঁজাতো, উড়ে যেতে পারত, কোথায় যেত সেটি কোনো বিষয় নয়; যে নতুন দল থেকে বহুদূরে যেতে চেয়েছিল। আরও কয়েকজন সৈন্য ভেতরে আসল এবং পরের গুহায় থাকা শিশুরা উঠোনে এসে কাঁদছিল।

কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধা তার পায়ে উঠে দাঁড়ালেন। বালকটি চুলার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি তার কাছে গেলেন। তিনি তার হাত দুটো দিয়ে তরুণটিকে আদর করলেন। অপরিচিত ব্যক্তির ওপর তার ক্ষীণ দৃষ্টি পড়ল কিন্তু তিনি একটি কথাও বলার সাহস করলেন না।

কেউ জব্দ করে দুটি মুরগি এনে শস্যের ঝুড়িতে রেখে ঝুড়িটি উল্টে রেখেছিল। উঠোনে পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। নারীকণ্ঠের মতো কান্নার শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো, 'আপনি একটি ভালো মৃত্যুর জন্য প্রাপ্য না।' ভেসে আসল, 'বুড়ো ডাইনি, আরও আগুন জ্বালাও।' লোকেরা যত্রতত্র ছোটাছুটি করছিলেন, বেওনেট এবং রাইফেলের বাঁট দিয়ে দরজা ও অন্যান্য জায়গায় আঘাত করা হচ্ছিল। খোলা দরজা দিয়ে বাতাসের ঝাপটা হু হু করে আসছিল। চারদিকে সন্ত্রাসের পরিবেশ বিরাজমান। গ্রামের মধ্যে ভয়ভীতি ও গোলমাল শোনা যাচ্ছিল, তখন মেঘের আড়ালে চন্দ্র ঢাকা পড়েছিল।

একটি সময় পর্যন্ত গোলমাল চলল। তারপর খাবার-দাবারের পর ঘোড়া ও মানুষ শান্ত হলো। তারা ময়লা বাটি, চপস্টিকস এবং ঘাসগুলো পাশেই ফেলে রাখলেন। তাদের অল্পসংখ্যক লোক কাঙ্গের ওপর শুয়ে পড়ে জব্দকৃত আফিম টানছিলেন। অন্যরা রুমের ভেতর আগুন জ্বালিয়ে চুলার চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বসে চা পান এবং অশ্লীল গান গাইলেন।

'তোর মা একটা...। আমাদের আগামীকাল ছুটি নেওয়া উচিত। গত কয়েকদিন থেকে আমরা মৃত্যু পথে হাঁটছি। আমরা তাদের যত ধাওয়া করছি, ততই তারা দৌড়াচ্ছে। যাহোক রেড শয়তানদের পা কী দিয়ে তৈরি?'

তারা বললেন, 'আমাদের আস্তে আস্তে চলাই বরং ভালো। আমরা যেন বৃত্তাকারে পেছন থেকে তাদের আক্রমণের সুযোগ না দিই। বহুবার ওই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।'

'আমরা আগামীকাল এখানে নিশ্চিত অবস্থান করবো। এখনো আমাদের পনেরো কিলোমিটার পেছনে 'রেড আর্মি' রয়েছে। আমরা মাত্র এক পদাতিক বাহিনী নিয়ে কাজ করছি। বন্ধুরা, গত ছয় মাসে রেড আর্মির ডাকাতরা আমাদের ভীষণভাবে আঘাত করেছে। সবসময় পেছনে এবং সামনে আমরা দৌড়াচ্ছি। এই অঞ্চল তেমন ঘনবসতি নয়, এখানে অপ্রতুল খাবারের ব্যবস্থা। কী এক নরকের ভেতর আমরা বাস করছি।'

বৃদ্ধার মুখে কারও দৃষ্টি পড়ল। বৃদ্ধা এখনো ভয়ে জড়সড় হয়ে মেঝেতে বসে পেছনে থাকা বালকটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন। 'থু!' বৃদ্ধার গায়ে একমুঠো থুথু নিক্ষেপ করলেন।

'এই বুড়ো ডাইনি এক পাশে বসে কী করছে? ঝেং দশেং বললেন, ওখানে গিয়ে তল্লাশি করো এবং দেখ, বৃদ্ধা কোনো মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছে কিনা? বৃদ্ধা তার পাশে বালকটি আছে স্বীকার করলেন। 'তুমি ঠিক বলেছো! বৃদ্ধার পাশে কেউ আছে-একটি বালিকা।'

দলটির তিনজন তাকে ছোঁ মেরে ধরে ফেললেন। 'স্যার, আমাকে ছেড়ে দেন, সে আমার একমাত্র নাতি-অত্যন্ত অসুস্থ সে।' বৃদ্ধাকে তারা একপাশে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, ধাক্কায় মাথার চুলগুলো তার মুখে পড়ল।

তারা বালকটিকে আগুনের চুলার কাছে আনলেন। ঝেং দশেং বালকটির কানে থাপ্পড় মারলেন। এখানে একটাই ছেলে কেন?

'ধুর। ওই বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন না।' অন্য একটি লোক দুটো অগ্নিসদৃশ চক্ষু দিয়ে বালকটির দিকে তাকালেন। বালকটিকে ধরে নিয়ে লোকটি তার গায়ের কাপড়চোপড় ধড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেললেন। বৃদ্ধা আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ঈশ্বর, এই খুনিরা।' বালকটিও রাগে তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বলল, 'তোর মা একজন...। যদি আমার হাতে বন্দুক থাকত, তাহলে আপনাকে আমি গুলি করতাম, আপনি একটা জানোয়ার।'

বালকটি ভয়ংকর চোখ দুটির দিকে তাকাল যেন লোকটির চোখ দুটি অগ্নিসদৃশ। বালকটি সৈন্যটিকে একটি লাথি দিল, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তিনি মাটিতে লুটে পড়লেন। তার পর বালকটি দরজার দিকে দৌড় মারল কিন্তু বালকটি একজন সৈন্যের বড় হাতের মুঠোয় ধরা পড়ল।

'এই বুনো আগাছা কোথা থেকে এসেছে।' আবারও এক ঘা তার ওপর পড়ল। 'বল, তোর নাম কী? তুই কী করিস? শোন, তার উচ্চারণ, সে আশপাশের ছেলে নয়!'

বালকটি কোনো কথা না বলে হা করে তাকিয়ে থাকল।

'হে ঈশ্বর। তারা আমার নাতিকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে। দয়া করো। আমার একটিই নাতি। আমার মৃত্যুর সময় এই নাতিটির প্রয়োজন...।' বৃদ্ধা মেঝে থেকে উঠতে চেষ্টা করছিলেন, পুনরায় তাকে লাথি দিয়ে ফেলে দেওয়া হলো। বৃদ্ধা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলেন।

দরজাটি হঠাৎ খুলে গেল। দরজার মুখে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। রুমটি হঠাৎ শব্দহীন হলো। সব সৈন্যরা ঝাঁপ দিয়ে তার পায়ে পড়ল। তাকে স্যালুট দেওয়ার পর ঝেং দাশেং বললেন: 'স্যার, নোংরা ছোট একজন গুপ্তচরকে আমরা এখানে ধরতে পেরেছি।'

কোম্পানি কমান্ডার রুমে ঢুকলেন। বালকটির দিকে গভীরভাবে তাকালেন এবং একটি ছোট টুলে তিনি নিশ্চুপ হয়ে বসে পড়লেন।

খবরটি সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। 'অহ! তিনি এই ছোট গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন!' গুহার বাইরে লাইনের পর লাইনে লোকজন দাঁড়িয়ে থেকে ঘটনাটি দেখছিলেন।

'সে আমার নাতি, তাকে কৃপা করো, সে আমার একমাত্র ধন। যদি বিশ্বাস না করো আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করুন, সবাই জানে সে আমার...।'

ভীতগ্রস্ত কয়েকজন গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন তারা। তারা সাহস সঞ্চয় করে উত্তরে বললেন, 'এ কথাটি সত্য, বালকটি বৃদ্ধার নাতি...।

একজন সেনা বললেন, 'স্যার, তার ব্যাপারে আপনি অবশ্যই খোঁজখবর নিন।' একজন কমান্ডার তরুণটিকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দরজার বাইরে অন্য সৈন্যরা প্রতিবাদ করে বললেন, সে এখনও একটি শিশু, সে গুপ্তচর নয়!'

কোম্পানির কমান্ডার দীর্ঘক্ষণ বালকটির চোখে স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিলেন। আবার এদিক-ওদিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে তিনি নির্দেশ দিলেন, 'তাকে তল্লাশি করো।'

বালকটির পকেট থেকে দুটি কাগজের নোট পাওয়া গেল। তার কোমড়ের বেল্টে একটি কালো টুপি বাঁধা ছিল। রুমের ভেতর আরও কিছু জিনিস পাওয়ার জন্য উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

কমান্ডারের হাতে থাকা জিনিসগুলোর দিকে সবার চোখ নিবিষ্ট হলো। নোটগুলোতে মুদ্রিত দুটি মাথা ছিল, একটি লেলিনের-অপরটি মার্ক্সের; নোটের অপরদিকে 'স্টেট ব্যাংক অব দ্য পিপলস সোভিয়েত রিপাবলিক অব চায়না' শব্দগুলো মুদ্রিত ছিল।

টুপিতে পাঁচটি লালতারা মুদ্রিত ছিল যা জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। কমান্ডার যখন ব্যাজটি দেখলেন, তার ভেতরে বালকটির হৃদয় জ্বলজ্বল হয়ে উঠল এবং হৃদয়ের ভেতর একটি উঁচু ও উষ্ণ অনুভূতি জাগল। চুপচাপ বিচারের অপেক্ষায় থাকল বালকটি।

কোম্পানি কমান্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যটি ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, 'কোন মায়ের জন্ম...। এই ছোট বালকটি ইতোমধ্যেই 'রেড আর্মি'র একজন দস্যু।'

কোম্পানি কমান্ডার আদেশ করলেন, 'বালক, তুমি দোষ স্বীকার করো।'

দোষ স্বীকার করার কিছুই নেই, আপনি কেন আমাকে মেরে ফেলছেন না? 'রেড আর্মি' দস্যু না, আমরা কখনো সাধারণ জনগণকে বিরক্ত করি না। সবাই আমাদের স্বাগত জানায়, এবং নর্থ ইস্ট আর্মির কাছে আমরা অত্যন্ত ভালো হিসেবে পরিচিত। আমরা আপনাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেষ্টা করছি। কিছুদিন পরে আপনারা বুঝবেন এবং আমাদের কাছে ফিরে আসবেন।'

'রেড আর্মি' যেমন একগুঁয়ে, তেমনি এই ছোট দস্যু বালকটিও তেজস্বী। কোম্পানি কমান্ডার বালকটির দিকে নিরাবেগভাবে তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন, 'তুমি কি মৃত্যুর ভয় পাচ্ছ?'

প্রশ্নটি স্পষ্টতই বালকটিকে উদ্বিগ্ন করল। সে অধৈর্যশীল হয়ে মাথা উপরে তুলে দ্রুত উত্তর দিল, 'আমি যদি ভয় পেতাম, তাহলে 'রেড আর্মি'তে যোগদান করতাম না!'

আরও বেশি বেশি লোক তাকে দেখার জন্য চারপাশে ভিড় জমাল। তাদের মধ্যে অনেকেই ঘামছিল এবং অনেকেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাদের চোখের দৃষ্টিতে দেখা গেল ভীরুতা ও চোখগুলো আশঙ্কাগ্রস্ত। তারা অবাক দৃষ্টিতে কমান্ডারের প্রতি তাকালেন। কিন্তু তিনি নিজের অনুভূতি লুকিয়ে রেখে শান্তভাবে বললেন,

'ঠিক আছে, এখন আমরা তোমাকে গুলি করবো।' বৃদ্ধ বিধবা কেঁদে উঠলেন। রুমের ভেতর প্রায় সবাই মাথা নত করলেন। অনেকেই চলে গেলেন। তবে কেউ কেউ এমনকি হৃদয়হীন সৈন্যরাও কমান্ডারের শেষ আদেশটি তাৎক্ষণিভাবে পালন করবেন কিনা তা জানতে চাইলেন না।

'না', বালকটি বলল, 'স্যার, বুলেটটি নষ্ট করবেন না, জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এটি রেখে দিন। আপনি একটি ছুরি দিয়ে আমাকে হত্যা করুন!'

কমান্ডার নিজেকে আর সংযত করতে পারলেন না। তিনি সংবাদকর্মীদের দিকে এগিয়ে গেলেন। বালকটিকে ওঠালেন এবং প্রচণ্ড চিৎকার করে তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আপনারা কেউ কি তাকে হত্যা করতে চান? সবার বিবেক কোথায়? জাপানিরা আমাদের গ্রামগুলো দখল করে নিয়েছে। আমাদের পিতামাতা, স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের হত্যা করেছে।' কিন্তু প্রতিশোধ না নিয়ে বরং আমরা সহগোত্রীয় চীনাদের হত্যা করে চলেছি। এই রেড আর্মির ছোট বালকটির দিকে তাকাও; তার সঙ্গে আমাদের কারও তুলনা হয়? সে রেড আর্মির সদস্য। আমরা কি তাকে 'রেড আর্মি'র জগৎ বলতে পারবো! কে তাকে হত্যা করতে চাও? বরং তোমরা আমাকে আগে হত্যা করো।' কমান্ডারের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হলো। সবাই এক সঙ্গে জড়ো হলেন। তারপর বালকটি অনুভবকরতে লাগল যে, পানির মতো কিছু একটা তার হাত ও পোশাকে গড়িয়ে পড়ছে। তার চোখ দুটো ধীরে ধীরে মেঘলা হয়ে উঠল এবং নিজেই অনুভবকরল যে, কোনো কুয়াশায় বা তুষারযুক্ত কাচের পেছনে যেন সেও লাল তারার মতো ভাসছে এবং উঠছে।

ডিঙ লিঙ (Ding Ling) একজন চীনা গল্পকার। এই গল্পটি ১৯৩৭ সালে লিবারেশন উইকলি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। গল্পটি স্টিফেন ফ্লেমিং (Stephen Fleming) অনুবাদ করেন। এই গল্পে জাপানি সাম্রাজ্যবাদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও চীনে তাদের তাণ্ডবলীলার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। ইংরেজিতে গল্পটির শিরোনাম ছিল 'A Bullet still in the Gun'.



অভিনয়

সংস্কৃতিতে হাসনাহেনার সুবাস তাসমী চৌধুরী হানসা

হাসনা আর হানসা শব্দ দ্বয় না নামে এক, না অর্থে। হাসনাহেনা ফুলের নাম যা চারদিকে ঘ্রাণ ছড়ায়। অন্যদিকে হানসা হাস্যোজ্জ্বল মুখের বিশেষণ যা চারদিক রাঙিয়ে দেয়। ঢাকার নিউ মার্কেটে ঐতিহ্যবাহী ফটো স্টুডিওর নাম হানসা। এখানে ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ আসতো এবং এখনো আসে মনের মতো ছবিটি তুলে নিয়ে যেতে। এই হানসা স্টুডিওতে বসেই বরিশালের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সামাজিক-সংগঠক এবং শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুরাগী হান্নান চৌধুরী এবং তার সতীর্থ বন্ধুরা মেতে উঠতেন বিশ্ব সাহিত্যের শিল্প সাধনায়। হান্নান চৌধুরী এবং হেনা চৌধুরীর ভালোবাসাকে অর্থপূর্ণতা দিয়ে সংসার আলো করে এলেন যে শিশু, যার ভূমিষ্ঠতাতেই চৌদিকে আলোক ঝলমল, পারিপার্শিক মানুষের মনে আনন্দের হিল্লোল, যার বাচিক কণ্ঠস্বর আবৃত্তির অঙ্গনে আদরের, যার কণ্ঠের শ্বাসন বেতার নাটকে নিখুঁত চরিত্রের চিত্রায়ন, যার মঞ্চের অভিনয় চরিত্রের জীবন্ত অনুভূতি দর্শককে পাইয়ে দেয়, যার টেলিভিশন-শর্ট ফিল্ম-বিজ্ঞাপন চিত্রে চরিত্রের রূপায়ণ জীবনেরই কথামালার উদ্ভাসন, যার অভিনয় জীবনের চলতি পথের প্রদর্শক আদি ঢাকার সন্ধ্যা নিবেদন সংগঠনের নাহিদ আহমদ পিয়াল, যার অভিনয় বিস্তৃতি এবং গভীরতার মর্মমূলে নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, যার কাছে শিল্পজীবনের উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণসাধন, সেই আলোকোজ্জ্বল মানুষটির শৈশবআবহে আদর করে এবং ভবিষ্যতে শিল্পের রোশনাই ছড়ানোর আহ্বানকে স্বাগত রেখেই নামকরণে নামের শেষে যুক্ত করলেন হানসা তথা পুরোটা মিলেমিশে রূপদান করা হলো তাসমী চৌধুরী হানসা, যিনি শিল্পাঙ্গনে এখন সৃজনশীল নির্মাতাদের কাছে সংকটে এবং সম্ভাবনায় এক পরম নির্ভরতা। নির্ভরতা করার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হয়ে ওঠাটা জরুরি। বিশ্বস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শিল্পের সাধনা তথা প্রস্তুতি থাকাটা আরও জরুরি। এই প্রস্তুতি একটু একটু করে হয়ে ওঠাটাই সিঁড়ি। বাবারই বোন শামীমা আক্তার এগিয়ে দিলেন চিত্রাংকন শিল্পে যেখানে তাসমী চৌধুরী হানসা বুঝলেন, প্রকৃতির নিখুঁত শিল্পকে আবিষ্কার করা প্রকৃতিকে নিমগ্নে অবলোকন করার মধ্যদিয়ে হতে হবেএবং যে চিত্রকর যতবেশি তা নিখুঁতভাবেআঁকতে পারবেন সেই হবেন ততো বড় চিত্রশিল্পী। তার বোধকে পরিশীলিত করেছে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী ব্যাপ্টিস্ট মিশন গার্লস হাই স্কুলে পড়তে পারায়। আজকের শিশুরা যখন সীমায়িত ঘরে পড়াশোনা চালিয়ে নিতে নিরুপায়ভাবে বাধ্য, তখন তাসমী চৌধুরী হানসা যখন ব্যাপ্টিস্ট মিশন গার্লস স্কুলে পড়ছেন তখন স্কুল ক্যাম্পাসের মাঝেই রয়েছে বিশাল ধানক্ষেত, বড় বড় পুকুর, খেলার মাঠ, আবাসিক হোস্টেল, বিশ্ব সাহিত্য ধারক লাইব্রেরিসহ আরও কত কি। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছ থেকে তাসমী চৌধুরী হানসা শিখেছে: 'পাঠ্য

বইয়ের সমান্তরাল আরও আরও বই পড়তে হয় স্মৃতিকে বাঁচাতে আর কল্পনাশক্তিকে জাগাতে। যার কল্পনাশক্তি যত বড় তার সৃজনশীলতা ততো গভীর এবং বিস্তৃত।' বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজে পড়তে পড়তে কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে বাচক শিল্পী হিসেবে অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় নান্দনিক এবং বাচিক ব্যঞ্জনায় প্রশংসিত উপস্থাপক হিসেবে বুঝেছেন, 'বাচিক শিল্পীকে হতে হয় মাত্রা নিয়ন্ত্রিত মালির মতো যার অনিয়ন্ত্রিত উপস্থাপনায় বাগান হয়ে যায় জঙ্গল আর নিয়ন্ত্রিত উপস্থাপনায় বাগান ফুল-ফল শৌভিত নয়নাভিরাম তপোবন।

বরিশালের তপোবন সাদৃশ্য অরণ্য নদী পরিব্যাপ্ত জনস্থানকে পিছনে ফেলে ঢাকায় এলে অধ্যায়ন শুরু করলেন ইডেন মহিলা কলেজে। এখানেই শুরু হলো 'সন্ধ্যা নিবেদন' স্টুডিওতে সাংস্কৃতিক প্রবাহমানতার অন্বেষণ। সাংস্কৃতিক শিক্ষকও প্রদর্শক নাহিদ আহমেদ পিয়ালের কাছেই তার প্রথম অভিনয়ে হাতে খড়ি। এতদিন তাসমী চৌধুরী হানসা জানতেন, কণ্ঠস্বরের খাদে ওঠা নামায়, দম নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রক্ষেপণে, কণ্ঠকে শাসন করে চরিত্র সত্তার মনোভাবকে অদলবদল করে সাহিত্যের বক্তব্যকে কিংবা রচিত চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু এটা জানতেন না যে আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক অভিনয় নিজ দেহে মনে আশ্রয় করে অপরাপর এক বা একাধিক চরিত্রকে মঞ্চমায়ায় জীবন্ত করে তোলা যায়। এই নতুন পথের সন্ধানই শুধু দিলেন না সংগঠক-নির্দেশক-সন্ধ্যা নিবেদনের দলীয় প্রধান নাহিদ আহমদ পিয়াল বরং তাসমী চৌধুরী হানসার সামনে ছুড়ে দিলেন একে একে চারটি নাটকের চারটি চরিত্র। 'চা অথবা কফি' নাটকে তাসমী চৌধুরী হানসা চুমকি চরিত্রে অভিনয় করে বোঝালেন, টুবিঅর নট টুবি(হতেও পারে নাও পারে) শুধু ডেনমার্কের হ্যামলেটের একক সত্তার সম্পত্তি নয়, এই দোদুল্যমানতা আপনার আমার আমাদের সকলের। 'এমনও দিনে' নাটকে গৃহিণী দম্পতি চরিত্রের রূপায়ণে বোঝালেন, বেলায় বেলায় বেলা গড়িয়ে গেল, সেভাবে তো নিজেদের দিকে চোখ ফেলানো হলো না, ছুঁয়ে দেখা হলো না, আজ এই বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় এমনও দিনে আর দূরে থাকা নয়। চল ভাসি এবং ভাসাই এই ভরা প্লাবনের স্রোতধারায়। 'প্রতারক জ্যোৎস্না' নাটকে অভিনেত্রী তাসমী চৌধুরী অত্যন্ত কঠোরতায় আপন মানুষের কথা দিয়ে কথা না রাখার পারঙ্গমতাকে নিখুঁত চিত্রায়নের মধ্যদিয়ে চিনিয়ে দেয় প্রতারক জ্যোৎস্নায়। 'নবরত্নাহার' নাটকে অভিনেত্রী তাসমী চৌধুরী নিজেই বিস্মিত, মানুষ কেন এত দ্রুত মুখোশ বদলায়!

বদলটাই সত্য মানবজীবনে তবে সে বদল সদার্থক হওয়াটাই শ্রেয়। গ্রীষ্ম আসে গ্রীষ্ম যায়, পোড়ামাটিতে বৃষ্টি, বর্ষা, জল দেয়, শীত-কুয়াশার ছাদর পড়ায় আবার হেমন্ত ধানের শীষে রোদ লাগায়, শরৎ কাশফুলের ছোঁয়া দেয়, বসন্ত জীবনকে প্রশান্তির পূর্ণতা পাইয়ে দেয়। এই বদল, এই বিবর্তনের সদার্থক প্রবাহমান অভিনয় শিল্পী আবৃত্তি শিল্পী তাসমী চৌধুরী হানসার প্রতি শিল্পে বাকের শিরায় উপশিরায়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে চ্যানেল আই-এর আয়োজনে সারা বাংলাদেশ থেকে আবৃত্তি শিল্পী নির্বাচনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান 'আবৃত্তি ছন্দে আনন্দে' চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হন। ২০১৩ সালে তালিকাভুক্ত সংবাদ উপস্থাপিকা হিসাবে বাংলাদেশ বেতারে যোগদান করেন। অতিথি শিল্পী হিসেবে শৌখিন থিয়েটারের ১ম প্রযোজনা অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের রচনায় এবং হামিদুর রহমান পাপ্পুর নির্দেশিত 'মন্টু মিয়ার বায়োস্কোপ' নাটকে হাতক্কা চরিত্রে কমেডি অভিনয় দিয়ে মঞ্চে হাসির জোয়ার তোলেন। এখানে উল্লেখ্য, ৮০-র দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে হাতক্কা টিভি চরিত্রে অভিনেত্রী নিমা রহমান মনে রাখার মতো অভিনয় করেন। নিমা রহমানের অভিনয় ভঙ্গিমা মনে রেখেই অভিনেত্রী তাসমী চৌধুরী হানসা নিজেকে তুলে ধরেন এবং নতুন সময়ে নতুন অভিনয় প্রদর্শনে তিনি প্রশংসিত হন। অভিনেত্রী তাসমী চৌধুরী হানসা বিশ্বাস করেন, 'আমরা প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক শক্তির উত্তরাধিকারী এবং যোগ্য অধিকারী হয়ে ঐতিহ্যকে আধুনিকতার আশ্রয়ে উপস্থাপন করতে পারাটা সমকালের দক্ষ শিল্পীর গৌরবের এবং দায়বদ্ধতার।'

দায়বদ্ধতাই শুধু না বরং অঙ্গীকার এবং ভালোবাসার জায়গা থেকে অভিনেত্রী তাসমী চৌধুরী হানসা বিগত সময়ে পদাতিক নাট্য সংসদে (টিএসসি) অভিনয় করেন কালরাত্রি, গুনজান বিবির পালা, বেদের মেয়ে, কালের যাত্রা এবং জনমাংক নাটকে।

নাটকের দলের ভিড়ে বাংলাদেশের প্রথম সারির নাট্যদল, ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল 'আরণ্যক নাট্যদল'-এ কর্মশালায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যদিয়ে নাট্যকর্মী হিসাবে কাজ করছেন। আরণ্যক দলের সবার ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় নাট্যকর্মী হিসেবে তার বর্তমান পথচলা আরও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে বলেই তার বিশ্বাস। আরণ্যক নাট্যদলে তার প্রথম অভিনয়, কর্মশালাভিত্তিক প্রযোজনা অপু মেহেদীর রচনায় এবং হাশিম মাসুদের নির্দেশনায় 'বিদ্যাপিতা কিংবা সময়ের গল্প'। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নানান সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রেক্ষাপটে রচিত নাটকটির এক অধ্যাপকের স্ত্রীর চরিত্রে বিউটি পার্লার খোলার নির্বুদ্ধিতার চরিত্রকে বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ে তুলে ধরায় অভিনেত্রী তাসমী চৌধুরী প্রশংসিত হন। শ্রদ্ধেয় নাট্যজন মামুনুর রশীদের রচনা ও নির্দেশনায় মঞ্চ নাটক 'কহে ফেসবুক' নাটকে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে তার অভিনয় শেখার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। তাসমী চৌধুরী হানসার উপলব্ধি, 'অভিনয় শিক্ষার ক্ষেত্রে নাট্যগুরু মামুনুর রশীদ স্যারের গল্প উপস্থাপন, চরিত্রের বিশ্লেষণ, চরিত্রের উপস্থাপন থেকে শুরু করে নাটকের সকল ক্ষেত্রে তিনি যে শিক্ষা প্রদান করেন তা এক বিস্ময়। তিনি শুধু তার নাট্যগুরু নন তিনি তার কাছে গুরুকুলের মতো শিক্ষণীয় প্রতিষ্ঠান।'

রেপারেটরি থিয়েটার দৃশ্যকাব্য নাট্যদলের প্রযোজনায় অতিথি শিল্পী হিসেবে নাসরীন মুস্তফা রচিত এবং ড. আইরিন পারভিন লোপা নির্দেশিত 'বাঘ' নাটকে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চরিত্র এবং কাল্পনিক চরিত্রে সফলতার সঙ্গে অভিনয় করেন।

বিগত সময়ে পদাতিক নাট্য সংসদের (টিএসসি) বিভিন্ন প্রযোজনায় জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনয় করেন। প্রযোজনাগুলো- হলো 'কালরাত্রি', 'গুণজান বিবির পালা', 'বেদের মেয়ে', 'কালের যাত্রা' এবং 'জনমাংক'।

তিনি কণ্ঠশিল্পী এবং কণ্ঠ অভিনয়শিল্পী হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে আসছেন। পেশাগত ডাবিং শিল্পী এবং কণ্ঠ অভিনয় শিল্পী হিসেবে এস আর কে স্টুডিও থেকে সূচনা। ভিজ্যুয়াল মিডিয়ায় তিনি নিয়মিত কাজ করে থাকেন। তার অভিনীত নাটকের নাম 'গেইম ওভার', 'নামকরণ', 'দশ দিগন্ত', 'জিন্স পার্টি', 'শিকল', 'বীরাঙ্গনার সন্তান', 'চৈত্রের এক বিকেল' এবং শৌখিনের ব্যানারে 'চিঠি', 'ছায়াচ্ছন্ন', 'দাবা' ও 'সক্কু মিয়ার গলি'-তে অভিনয় করেন। টিভিসি, ওভিসিসহ বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে উপস্থাপনায় কাজ করাসহ আবৃত্তি ও নাটকে অভিনয় করেছেন এবং করছেন।

সাংসারিক জীবনে স্বামী একজন নাট্যপ্রাণ মানুষ হামিদুর রহমান পাপ্পু শৌখিন থিয়েটারের সভাপতি এবং অরিজা এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি-এর জেনারেল ম্যানেজার। উভয়ের ভালোবাসার আদরের সন্তান জেনিতা রহমান হিয়া। হিয়া ৩ বছর বয়সে প্রথম মঞ্চ নাটকে অভিনয় করে। ইতিমধ্যে শিশু হিয়া পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কাজ করছে।

তাসমী চৌধুরী হানসা এবং তার ছোট্ট পরিবার সামগ্রিক অর্থে শিল্প পরিবার। শিল্পের এবং শিল্পর মূল্যায়নে শিল্পী তাসমী চৌধুরী হানসার বিশ্বাস, 'শিল্প কাজ করে মানুষের মন নিয়ে। এই সৃজনশীল কাজে কেউ অধিক পরিচিত কেউ বা অল্প পরিচিত আবার কেউ বা স্বল্প পরিচিত। পরিচিত মাত্রার ব্যবধান থাকতে পারে কিন্তু একজন সৃজনশীল মানুষের মানবকল্যাণে শিল্প সৃজনের চেষ্টায় যে স্ট্রাগল, যে দায়বোধ সেটা কিন্তু সব শিল্পীর জীবনে সত্য। পক্ষান্তরে, মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে তার যে বোধ সেটাও কিন্তু প্রায় সমান সমান। ফলে মূল্যায়নে দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন যেমন খাদ্য তেমনি মানুষের শিল্পের প্রয়োজন মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। আমার ব্যক্তি জীবন আমার সংসার, আমার প্রতিবেশী, আমার সামাজিক দায়িত্ব পালনে স্বার্থক আবার আমার শিল্প জীবন সাদা-কালোর বর্ণ-বৈষম্যের ঊর্ধ্বে, ধনী-গরিবের বৈষম্যের ঊর্ধ্বে, সম্প্রদায়গত বিভাজনের ঊর্ধ্বে তথা সামগ্রিক মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধনে। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, পূর্ণেন্দু পাত্রী, নির্মলেন্দু গুণ, জীবনানন্দ দাশ, জয় গোস্বামী, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শ্রীজাত, তারিক সুজাতসহ প্রভৃতি কবিদের সৃজিত কাব্যের কাব্যময়তার মাঝ দিয়ে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের 'নতুন অভিযান' কবিতার দুটি পঙক্তি উচ্চারণের মধ্যদিয়ে বলে যাই, কেন-কীভাবে এবং কীসের জন্য শিল্প অন্বেষণে একজন শিল্পী হিসাবে আমার লড়াই সর্বজনীন এবং চিরন্তন, নতুন পথে যাত্রা পথিক চালাও অভিযান, উচ্চকণ্ঠে উচ্চারো আজ মানুষ মহীয়ান।

দিগন্ত প্রান্তর


jb
JAJ BHUIYAN GROUP
Bringing excellence to lead
BUSINESS UNITS
Textiles
Garments
Real Estate
Automobiles
Power/Gas (Service)
Building Materials
Packaging
Telecom
Media
Agro Industry
Transportation
Aviation
Information Technology
HEAD OFFICE & FACTORY:
Nowpara, Madhabdi,
Narsingdi-1604 Bangladesh
Phone : +88 09610 110 220-5
www.jajbhuiyangroup.com
CORPORATE OFFICE:
Gawsia Kashem Centre, 7th Floor,
10/2 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000.
Phone : +88 02 41 070 208 -15
+88 09610 110 220-5

রাঙ্গামাটি পৌরসভা কার্যালয়
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঈদ মোবারক

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই ঈদের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

জরুরি গণবিজ্ঞপ্তি

পরিবেশ বান্ধব, পর্যটনমুখী, যানজটমুক্ত, আধুনিক পৌর শহরে
রূপান্তরের লক্ষ্যে পৌরবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান

- শহর উন্নয়নে শরিক হোন। নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন এবং কর পরিশোধে অন্যকে উৎসাহিত করুন।
- আবর্জনা নির্ধারিত ডাস্টবিনে ফেলুন। দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখুন।
- স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি লেট্রিন ব্যবহার করুন। ড্রেনের জল, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করুন।
- শিশুদের নিয়মিত টিকা দিয়ে ৭টি মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা করুন।
- গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।
- জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে পৌরসভায় নাম তালিকাভুক্ত/রেজিস্ট্রেশন করুন এবং সনদপত্র গ্রহণ করুন।
- নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন, শহর উন্নয়নে শরিক হউন।
- নির্দিষ্ট স্থানে যানবাহন পার্ক করুন, শহরকে যানজটমুক্ত রাখুন।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করুন।



মোঃ আকবর হোসেন চৌধুরী
মেয়র
রাঙ্গামাটি পৌরসভা
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।


জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
ঈদ মোবারক
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই
আন্তরিক অভিনন্দন
ও শুভেচ্ছা
লায়ন মোঃ রবিউল আলম
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বরুড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ
বরুড়া, কুমিল্লা।
ও চেয়ারম্যান
১১নং গালিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ

সুনামির চেয়ে বড় কিছু

মুস্তফা হাবীব

ঊনসত্তরের জলোচ্ছ্বাস- বন্যায়
ভেসে যায় খড়কুটো ঘরবাড়ি দূর সাগরে।
ডুবে যায় পোষা প্রাণী, দ্বীপাঞ্চলের ফসলি প্রাঙ্গণ
একই বৃক্ষের ডালে সাপ- মানুষের গলাগলি
শিয়ালের সঙ্গে বাঘের আলিঙ্গন।
তারপর বিচিত্র নামে ঘূর্ণিঝড়-প্লাবন আসে
ভয় দেখিয়ে উড়ে যায় আপন দিগন্তে।
এখন মানুষ নিবিড় নীরবে প্রার্থনায় দুহাত তুলে
চায় নুহের আমলের মহাপ্লাবন।
কেন চায়!
চায় প্রতারক দুর্বৃত্তের গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য,
স্বদেশী হায়েনার যাতনা থেকে বাঁচার জন্য
মানুষ পূজারির বেলেল্লাপনা দেখতে চায় না আর
সত্য ইতিহাসের পুনর্জীবন চায়, শান্তি চায়।
তাই এখন মানুষ সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করে---
সুনামির চেয়ে বড় ঐতিহাসিক প্লাবন এসে
ভাসিয়ে নিয়ে যাক স্বৈরিণীর তখ্তে তাউস, রংমহল।

ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি পেলে

শাহিন শাজনীন

তোমার ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি পেলে,
শোরগোল পড়ে যায় আমার
দেহমন জমিনের মেঘেঢাকা জনপদে।
সুখের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে
তৎপর জনপদের মোড়ল, মন;
একদা প্রেম-পুঁজিবাদী প্যাঁচে
দুঃখবৈভবে ফুলে উঠেছিল।
তোমার ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি পেয়ে
এখন তুখোড় শব্দমিস্ত্রী;
রাতদিন এক করে নির্মাণ করে
ফুলবাগান সমেত সুরম্য কবিতার অট্টালিকা।
নতুন পথের দিকনির্দেশনা দিতে
তৎপর জনপদের প্রদর্শক, স্বপ্ন;
একদা ভুল সমীকরণে
জীবন কষে বিষণ্নতায় ডুবে গিয়েছিল।
তোমার ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি পেয়ে
এখন দুর্বার স্বপ্নবাজ; পাড়া দাপিয়ে
ফেরি করে বিক্রি করে
তিমিরভেদী রাঙা আলোর জোয়ার!

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

মাহমুদুজ্জামান জামী

মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে
একসময় সিরিয়াস হয়ে যেতাম,
প্রত্যুত্তরে আমার উচ্চারিত শব্দের ঝালে-
কারো কারো মনে রীতিমতো জ্বালা ধরে যেত।
পরিবেশ ক্রমশ ভারী হয়ে উঠলে
একটা অমীমাংসিত জটলার জালে-
তখন নিজেকেই অসহায় মনে হতো!
কে কখন কী চায় বোঝা বড় দায়,
কে কখন কী ভেবে বলে কথা- যায় না বোঝা!
অপূর্ব সকালের রৌদ্রে
বেড়ে যায় মেঘের আনাগোনা;
একগুচ্ছ গোলাপ প্রতীকী শুধু-
মুহূর্তের দৃষ্টিরঞ্জকমাত্র- যেন আর কিছু নয়!
কারো দিকে কারো তাকানোর সময় নেই এখন;
ঊর্ধ্বমুখী দৌড়ে ব্যস্ত সবাই-
সহ্যশক্তির বারোটা বাজিয়ে
নিজেরটাই যেন শুধু রাখে ঠিক;
আর চোখেমুখে সবসময় ভাব কেমন-
'আমার-আমার।'
এই তো গতকালই একজন বললেন আমাকে-
'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নেয়ার
কী দরকার? তার চেয়ে বরং
তেল দাও নিজের চরকায়- সেটাই ভালো।'
মনে হচ্ছে, অনেক হয়েছে, আর না-
আর বলবো না;
এখন আমি আর এদিক-সেদিক তাকাবো না;
একদম সোজা হেঁটে যাবো।

অতীত

ফাহমিদা ইয়াসমিন

সময়ের পিঠে চড়ে এসেছি বহুদূর
মাঝখানে কিছু স্মৃতি ফেরাতে চায়
কিছু কথা নীরবে ব্যথা দিয়ে যায়।
যেখানে যাই খুবলুকিয়ে থাকি
অতীত যেন খুঁজে মোরে না পায়
তবুও অতীতের কাছে খুবঅসহায়।
অতীত এমনই এক সফরসঙ্গী
তুমি ভুলে গেলে সে অমরসঙ্গী।


জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
ঈদ মোবারক
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
১০নং শিলমুড়ি উত্তর ইউনিয়নের
সর্বস্তরের জনগণকে জানাই
শুভেচ্ছা
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম
সহ সভাপতি
১০নং শিলমুড়ি উত্তর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ
ও সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী

দিগন্তের অশ্বারোহী

সমর চক্রবর্তী

রক্তের নিঝুম দ্বীপে মানুষ কখনো হয় না একা
গোপন সুখ, দহনে নির্বেদ সে বর্ণ শব্দ হয়,
ভাষার আকাশে কখনো বিষণ্ন করবী, কখনো
শোণিত গোলাপ!
অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের যমজ জোছনায় বায়বীয় সে
প্রজাপতি
উজ্জ্বল তারার অন্ধকারে কালো জলের উপর
গভীর ছায়া ফেলে লিখে যায় শুধু নিজের নাম
একরৈখিক স্বপ্নডানায় মৃত চোখ শুয়ে থাকে

শূন্যতার সৌন্দর্য

মাসুদ অর্ণব

কবি শূন্যতার সঙ্গী খুঁজে বেড়ান
কবিতার সমুদ্রে।
শূন্যতার শব্দের বুননে
নির্মিত হয় কবিতার শরীর;
কবিতার শরীরের সৌন্দর্য;
শূন্যতার সৌন্দর্য।
সৌন্দর্যের সীমানা খুঁজতে খুঁজতে
কবি একদিন ঘুমিয়ে পড়েন;
তারপর
ঘুমের মাঝেও জেগে থাকেন অনেক দিন।

সৃষ্টি সুরের গান

বজলুর রশীদ

সম্পর্কের আলো জ্বলে উঠলে বোঝা যায়
একটা বিশ্বাস দরকার ছিল সুরে জাগে গান।
সম্প্রীতির পথে লিখতে থাকি নিজের গান;
এই গান নাকি সিগারেটের শেষটুকুর মতো নয়!
অতঃপর, উষ্ণতার অভিযান গুটিয়ে
স্বদেশ প্রেমে রচিত হয়
সৃজনে আনন্দে গাহি...সৃষ্টি সুরের গান।

পিছুটান

রেবেকা ইসলাম

ঢং ঢং ঢং ছুটির ঘণ্টা আর বাজে না
সময়ের সীমানা জানাতে
চোখবোজা সেই শৈশবস্মৃতি
মনের বাষ্পঘরে দ্রবীভূত হয়ে গেছে।
আজকাল সময়ের গতিবিধি যেন
দুর্বোধ্য হরপ্পা লিপি,
বেশভূষার চাকচিক্য টেনে নেয়
চলি পিছু পিছু, কখনো দৌড়াই।
ডাকছে সময়ের শেষপ্রান্ত
ডাকছে পৃথিবীর মাটি,
হাজারো পিছুটান আটকে দেয়
মায়ার টানে মঞ্চস্থ হয় মিথ্যার নাটক
যেতেই হবে সবকিছু ফেলে
তবুও শেষপাতের মিষ্টির মতো
বড় লোভনীয়
এই গোলকধাঁধায় বেঁচে থাকা।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা ■ জয় বঙ্গবন্ধু





ঈদ মোবারক

৪নং (দঃ) খোশবাস ইউনিয়নের

সর্বস্তরের জনগণকে জানাই

পবিত্র ঈদ উল ফিতরের

শুভেচ্ছা



শুভেচ্ছান্তে-

আব্দুস সাত্তার টিটুল

সভাপতি মুক্তজি মাস্টার ছোবহান উচ্চ বিদ্যালয় বরুড়া, কুমিল্লা।

ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক বরুড়া উপজেলা ছাত্রলীগ

সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী

প্রচারে : ৪নং (দঃ) খোশবাস ইউনিয়নবাসী



জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু



ঈদ মুবারক

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই

শুভেচ্ছা





মরহুম শামছুল হক এডভোকেট
(সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য)
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী
মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক
সাবেক সভাপতি উপজেলা আওয়ামী লীগ
মুক্তাগাছা।

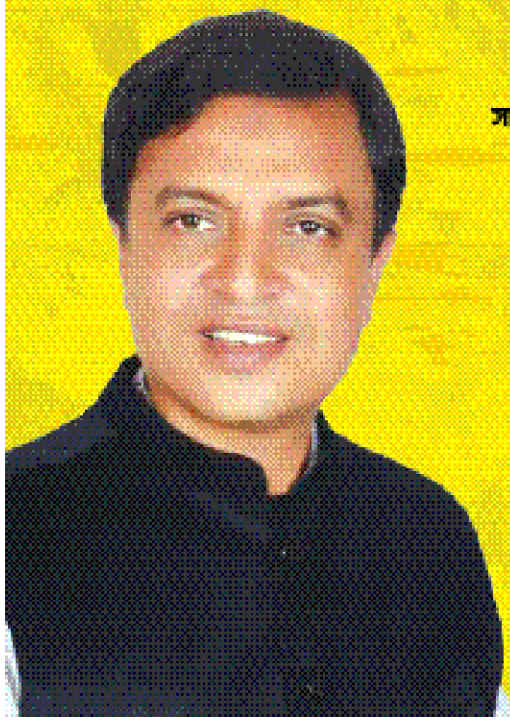

মরহুম শামছুল হক এডভোকেট সাহেবের সুযোগ্য পুত্র

মো. তারেক

সাবেক সদস্য, ধর্ম বিষয়ক উপকমিটি
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সাবেক প্রচার সম্পাদক, মুক্তাগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগ।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

দুমকি, পটুয়াখালী- ৮৬০২।



ঈদ মোবারক



পবিত্র ঈদুল ফিতর
সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও শান্তি
ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশির জোয়ার
ঈদ মানে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার অপূর্ব বন্ধন।
এই আনন্দ উৎসব সবার জীবনে বয়ে আনুক খুশির বন্যা, ভুলিয়ে দিক সববিভেদ।
সেই প্রত্যাশায় সকলের প্রতি রইল ঈদের

শুভেচ্ছা



প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত
ভাইস চ্যান্সেলর
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
দুমকি, পটুয়াখালী।





সংস্কৃতি

মঞ্চের হ্যামলেট মাসউদ সুমন

লেমন লিজা

জীবন বড় অদ্ভুত! বুঝি কিন্তু বুঝি না। হিসাব মেলে কিন্তু মেলে না। যা চাই তা চাই না। যা ভাবী বাস্তবতা হয় না। যা দৃশ্যমান তা দৃশ্যমান না। নেপথ্য নেপথ্য না। হতেও পারে আবার নাও হতে পারে, হিসেবের দোদুল্যমানতা মেটে না। যশোরের মাইকেল মধুসূদন খ্রিষ্টোফার মার্লো, শেক্সপিয়র, বেন জনসনদের সমগোত্রীয় আবার সমগোত্রীয় নয়। জমিদারিই শৈশবসব সত্য বলে গৌধূলি বেলা হবে 'মর্নিং সোজ দ্যা ডে'-এর মতো সে হিসাবআলিপুর দাতব্য হসপিটালে বসে মিলানো গেল না। উইলিয়াম শেক্সপিয়রের হ্যামলেট আর মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ এত নীতি পরায়ণ-সত্যনিষ্ঠ-দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বীর যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও কেন নিয়তির কাছে পরাস্ত হতে হলো সে হিসাবতো মেলে না। একিলিস শোকে-তাপে দগ্ধ হয়ে ক্রোধে অন্ধ হয়ে হেক্টরের সাথে যুদ্ধ ময়দানে লড়ছে আর অন্ধ হোমার কল্পনার বুননে সত্যের চেয়ে বড় সত্য হয়ে ইলিয়াড-ওডিসি মহাকাব্য বুনছে। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা সে হিসাবকি মেলে! কোনটা ব্যাকুলতা কোনটা কামনা কিংবা কোনটা মোহ কোনটা কুহেলিকা, কোনটা পিপাসা নিবৃত্তির জল আর কোনটা মরুর মরীচিকা এই সংশয়ের সমাধান কি এতই সহজ-সরল। উইলিয়াম শেক্সপিয়রের হ্যামলেটের পাগলামিটা রোগ না যোগ, সেকি ব্যতিক্রম প্রতিভাবান কল্পনা শিল্পী নাকি দুর্বল, অগোছালো, অযৌতিক, মন্দবুদ্ধির এই ভাবনা ভাবতে ঢাকার মঞ্চে অভিনয় দক্ষতায়-অভিনয় সত্তায়-অন্তরের অন্তর্যাত্রায় যিনি হ্যামলেটের বিচক্ষণতাকে চোখ দিয়ে ফুটিয়ে, সন্দেহতাকে ভ্রুকুঁচকে, প্রণয়কে ওষ্ঠে-নাকে রাঙিয়ে, বীরত্বকে বাহু দ্বারা তরবারি প্রক্ষেপণে, ঘৃণাকে আক্রোশের অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে, প্রেতকে আত্মা দিয়ে জাগিয়ে, প্রেমকে চোখের জলের গভীরতায় ভাসিয়ে, অন্যায় না করেও কেন এই শাস্তি ভোগ বিবেচনাকে মঞ্চাভিনয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি অত্যন্ত জরুরি ও স্বাস্থ্যকর দোটানার অভিনয়ের মধ্যদিয়ে মঞ্চে হ্যামলেট চরিত্রকে এনে হাজির করে আবার নিজেই হয়ে ওঠেন স্বয়ং হ্যামলেট, সেই তিনিই লোকনাট্য দলের প্রায় দুই যুগ কালের নিয়মিত অভিনেতা, অসংখ্য মঞ্চ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রাভিনেতা এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির রেপার্টরি নাট্যদলের প্রযোজনা হ্যামলেট নাটকের নাম-ভূমিকার অভিনেতা মাসউদ সুমন হ্যামলেট চরিত্রে সমার্থক-সমান্তরাল এবং সর্বজন গ্রাহ্য বলিষ্ঠ এবং আগুন ফলবান অভিনেতা। হ্যামলেটের নির্দেশক মঞ্চসারথী আতাউর রহমানের কাছে মাসউদ সুমন একান্তের নির্ভরতা।

অভিনেতা মাসউদ সুমনের জন্ম-শৈশবের বেড়ে ওঠা সেই মাইকেলের জন্মস্থান যশোরের প্রান্তিক সীমান্ত খিতি বদিয়ায় গ্রামে। পেশায় ব্যাংকার এবং নেশায় ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বশীল চাকলাদার গোলাম মোস্তফা ও গৃহিণী রাজিয়া মোস্তফা ভালোবাসাকে অর্থপূর্ণতা পাইয়ে দিয়ে এক নবপ্রভাতে আলোক রোশনাই ছড়িয়ে মাসউদ সুমনের শুভ আগমন। বাবার অভিনীত শৌখিনভাবে বাৎসরিক নাটক বা যাত্রা 'মা মাটি মানুষ' কিংবা 'নীচু তলার মানুষ' দেখেই তার প্রথম নাট্যাভিনয় শক্তির রসাস্বাদন। ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল খেলার মধ্যদিয়ে দেহ গঠন। ফুটবল টিমে ক্যাম্পাস পরিসরে বেস্ট ইলেভেনে নির্বাচিত হওয়াটা দক্ষতার স্ফুরণ। বাংলাদেশ টেলিভিশনে তখনকার সময়ে প্রতি শুক্রবার সকালে প্রচারিত মঞ্চ নাটক দেখে দেখে মাসউদ সুমনের অভিনয় কল্পনার রাজ্যে অবগাহন। যশোরকে পেছনে ফেলে ঢাকায় এসে জগন্নাথ বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হতে বেইলি রোডের সাগর পাবলিশার্সে লিয়াকত আলী লাকীর প্রাণের দল লোকনাট্য দলে নাট্যকর্মী সদস্য


জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
ঈদ মোবারক
সকলকে জানাই
পবিত্র ঈদ উল ফিতরের
শুভেচ্ছা
আশরাফুল আলম আশরাফ
মেয়র, কালীগঞ্জ পৌরসভা
কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

হিসাবে নেবে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন ফর্ম পূরণ। শিক্ষক-অভিভাবক ক্রিস্টি হেফাজের নেতৃত্বে একটা শক্তিশালী জুরিবোর্ডের সামনে বাচিক অভিনয়, সংশয় প্রশ্নের মীমাংসা দিতে পারায় এবং অভিনয় শিখে অভিনয় প্রদর্শনের তীব্র ব্যাকুলতায় মাসউদ সুমন ২০০১ সালে লোকনাট্য দলে দলীয় একজন হয়ে অভিনয়বান্ধব প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পায়।

খুঁজে পাওয়াই শুধু নয় বরং কর্মবীর নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকীর নির্দেশনায়, বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে অর্থ দিয়ে সবকিছু করায়াও করা চলে বিশ্বাসে বিশ্বাসী চন্দ্রকেতু চরিত্রে রূপদানের মধ্যে দিয়ে ২০০৪ সালে আইটিআই নেপাল কেন্দ্র আয়োজিত ত্রিদেশীয় আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে অভিনেতা মাসউদ সুমন জীবনের প্রথম মঞ্চ রজনীর পর্দা উন্মোচন করে। আজ ২০২২ তবুও মাসউদ সুমনের মনে হয়, 'একে তো বিদেশ, তার উপর জীবনের প্রথম মঞ্চায়ন, না জানি কি হতে কি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মুখ রক্ষা করতে পারব তো। তখন দলীয় প্রধান এবং নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকীর বলা কথাটা স্মৃতিতে ফিরে আসায় যেন সম্বিৎ ফিরিয়ে দিল। তিনি বলেছিলেন, 'কো-আর্টিস্টের প্রতি রিঅ্যাকশান দিতে ভুলো না তবে তোমার অ্যাকশানের অভাব হবেনা।' বেশ শুরু হয়ে গেল অভিনয়। আমার অর্থ আমার অহংকার ফলে দেহাপসারিণী তরঙ্গিণী ও আমার। সেই তরঙ্গিণী কেন চালহীন চুলোহীন তপস্বীর প্রতি ক্রমে ক্রমে প্রণয়ে মজে হচ্ছে অন্ধ। তাহলে আমি এখন কি করি! অর্থের অহংকারের পতনকে স্বীকার করি নাকি তরঙ্গিণীর তেজের আগুনে জ্বলে মরি। আঙ্গিক-বাচিক আর সাত্ত্বিক অভিনয় ভঙ্গিমায় সেদিন যেভাবে মঞ্চের আলো আঁধারীতে চরিত্রের সাইকোলজির দাবানলে পুড়তে পুড়তে জ্বলে প্রজ্বলিত হয়েছিলাম সেই অভিনয় সাধনার নিমগ্নতার ঘোর কেটেছিল নেপালি এবং নেপালস্থ বাঙালি দর্শকদের মুহুর্মুহু করতালির মূর্চ্ছনায়। নাটক শেষে দর্শক সারি থেকে নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকীর বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে স্বীকৃতি প্রধান চিরস্মরণীয় হয়ে রইল আমার। বুঝেছিলাম এবং বুঝে নিলাম, মঞ্চ মায়ায় জীবন বাস্তবতার নিখুঁত ছবি আঁকার যে স্বাদ আজ আমি পেলাম তা ভুলছি না, ভুলবনা কোনো সময়। এই মঞ্চ আমার, আমি এই মঞ্চের, মঞ্চায়নের মধ্যদিয়ে একজন অভিনেতার পক্ষে যতটা সম্ভবমানুষের মনের প্রতিনিধিত্ব করা সেটুকু করাটাই আমার গর্বের আমার অধিকারের। ফলে মঞ্চে রইলাম এবং রইবার আকাঙ্ক্ষায় উজানে ভাটায় অভিনয়ের নাও ভাসাইলাম।'

ভাসমান নাও একে একে ছুটে চললো নাটকের অসংখ্য ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে। লোকনাট্য দলের সর্বাধিক মঞ্চায়িত নাটক 'কঞ্জুস'-এ অভিনেতা মাসউদ সুমন অভিনয় করলেন বদিউজ্জামান চরিত্রে। পুরান ঢাকায় কৃপণ ব্যক্তি হায়দার আলীর কন্যাকে পাওয়ার আশায় বনেদি পরিবারের সন্তান বদিউজ্জামান চাকরের ছদ্মবেশে রূপ থেকে রূপান্তরের মাধ্যমে যেভাবে তার প্রেয়সীকে লাভ করে এবং হৃত পরিবারকে খুঁজে পায় সেই প্রেক্ষাপটে মাসউদ সুমনের কমেডি অভিনয় নিজে হাসে আবার দর্শকদের হাসায়। এই কঞ্জুস নাটকে ২০০৪ সাল থেকে মাসউদ সুমনের টানা প্রায় বিরতিহীন ২৫০-এর অধিক মঞ্চায়ন এনে দেয় অভিনেতা হিসাবে, হিসাবের এক ভিন্ন রসায়ন। ২৫০টি শো উপলক্ষে দলীয় নিয়মানুসারে ন্যূনতম তিনটে করে রিহার্সেল-রান থ্রু করলে তবে সেটি ৭৫০টি রান থ্রু। মূল মঞ্চে ২৫০ রজনী। শুধু এই নাটকে তিনি ১০০০ রজনীর অধিক সময় দিয়েছেন যা প্রায় একটানা তিন বছরের মতো সময়ের যেটা সত্যিই বিস্ময়কর। ২০০৪ সাল থেকে নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকী কঞ্জুসের প্রাকটিসে ৪টি করে গ্রুপ করে দেন। মহড়া কক্ষ, বন্ধুদের বাড়ির ছাদে নিয়মিত রিহার্সেল, অনুশীলনের মধ্যদিয়ে কঞ্জুস এবং বদিউজ্জামানকে হৃদয়ে এবং দৈহিক অবয়বে ধারণ-আত্তীকরণ এবং নিরবচ্ছিন্ন অংশ গ্রহণ। ২০০৪ সাল থেকে কঞ্জুস নাটকে অভিনয় শুরু করে, ২০২২-এ চলমান থেকে, আগামীর মঞ্চায়ন উপলক্ষে এই যে একজন অভিনেতার দীর্ঘ নিমগ্নতা এবং সাধনার অনুশীলন সেখানে দাঁড়িয়ে অভিনেতা মাসউদ সুমনের মনে হয়, 'এমনতো আছে হয়তো অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী আপ্রাণ চেয়েছে কিন্তু পঞ্চাশ বছর থিয়েটার জীবন কাল পার করেও হয়তো ২০০-এর অধিক রজনীতে মঞ্চমায়ায় দাঁড়াতে পারেননি। অথচ অভিনয় অনুশীলন, অভিনয় ভাবনায় তার কেটেছে সারাটা জীবন। সেখানে অন্যান্য নাটকের হিসাব ছাড়াই যে একটি মাত্র নাটক কঞ্জুস করার সুবাধে যে এত স্বল্প সময়ে ২৫০-এর অধিক রজনী সন্ধ্যায় মঞ্চের মায়ায় দাঁড়াতে পারলাম দর্শকদের মনের শিল্প পিপাসা, নান্দনিকভাবে বিনোদিত হওয়ার প্রত্যাশা আর আদি ঢাকার মানুষের হাস্যোজ্জ্বল মিউজিকাল জীবনাচরণ-বাচন ভঙ্গিমা কাছ থেকে দেখার আশায় নিবৃত্তির প্রত্যাশায়, সেকথা ভাবতেই অভিনেতা হিসাবে আমার বুকটা ভরে যায় আনন্দে, উচ্ছ্বাসে আর দর্শক এবং দলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায়।'

নোবেল জয়ী চীনা নাট্যকার গাও সিং জিয়াং-এর রচনায়, আবদুস সেলিমের অনুদিত নাটক 'মাঝরাতের মানুষেরা'য় এরকম এক পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র থেকে পরিত্যক্ত যুবকের ঠগ হয়ে ওঠা, মানুষকে ঠকানো এবং শেষ পর্যন্ত নিজে ঠগে যাওয়ার ঠগ চরিত্রে বহুমাত্রিক অভিনয় ব্যঞ্জনায় নিজেকে মঞ্চে উজাড় করে দেন অভিনেতা মাসউদ সুমন। ঠগ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েন এবং জীবনাচরণ অনুকরণ করতে করতে একজন অভিনেতা মাসউদ সুমন অনুধাবন করেন, 'পরিবার সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় পাঠশালা। বাবা-মায়ের অবহেলা-অনাদার, শৈশবে সন্তানের উপর সংগঠিত ভায়োলেন্স এবং পরিবার থেকে সহানুভূতি না পাওয়াটা একটা বড় কারণ, একটা দেবতাসুলভ শিশুকে শয়তান রূপ পশুতে রূপান্তর করে ফেলা। কেউই অপরাধী হয়ে জন্মায় না বরং পারিপার্শ্বিকতাই তাকে অপরাধী বানিয়ে ফেলে।'

আমানবিকতার নিদারুণ দৃশ্যে অভিনেতা মাসউদ সুমন পৌঁছে যায় যখন নাসরীন মুস্তফার 'লীলাবতী আখ্যান' নাটকে শ্বশুরের চক্রান্তে পুত্রবধূ 'খনা'র জিহ্বা কাটা হতে চলে। একদিকে বাবার নিষ্ঠুর আদেশ অন্যদিকে প্রিয়তমা স্ত্রী খনার উপর সংগঠিত হতে চলা মহাকালের নিষ্ঠুরতম নৃশংসর মাঝে দাঁড়িয়ে, নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকীর নির্দেশনায় আতংকে-আক্রোশে-অসহায়তায় মিহির চরিত্রে অভিনেতা মাসউদ সুমন যেমন ভাবে নিজের কণ্ঠ নিজের হাতের ফাঁসে মৃত্যুযন্ত্রণা দেহে-মনে-সত্তায় ধারণ করে মাটিতে পড়ে গোঙাতে গোঙাতে বিলিন হয় তখন বোঝা যায় মিহির-হ্যামলেট-মাসউদ সুমনরা বাংলা-ইউরোপ-বিশ্ব পরিভ্রমণ করে কাল থেকে কালান্তরে আর সেকারণে অভিনয়-সাহিত্য তথা শিল্প কনটেমপরারি থেকে ক্ল্যাসিকালের মর্যাদা পায়, শিল্পানুরাগীদের বিবেচনায় যুগ থেকে যুগান্তরে।

যুগ থেকে যুগান্তরে বিবেচনা সময়ের দাবি কিন্তু ঘটনার বাস্তবতায় বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্প অবলম্বনে আমরা তিনজন নাটকে অভিনেতা মাসউদ সুমন বুদ্ধদেব বসুর মানস চরিত্র বিকাশ হয়ে আজও মঞ্চে তরু তথা আদরের মোনালিসাকে খুঁজে চলে। কবি নজরুল ইসলামের মানস সত্তা চিত্রশিল্পী হয়ে ক্যানভাসে প্রেয়সীকে নতুন থেকে নতুনতর সত্তায় এঁকে চলে। এই এঁকে চলে, এই নাটকের ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলায় অভিনেতা মাসউদ সুমন ইতিমধ্যে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের চন্দ্রকেতু হয়ে পরিভ্রমণ করেছে নেপাল, মাঝরাতের মানুষ নাটকের ঠগ হয়ে ভারতে, উত্তরপ্রদেশে রাস্তার ছেলে নাটকের চরিত্রে, ফ্রান্সের গা লাগোয়া দেশ মোনাকো-তে কঞ্জুস নাটকের বদউজ্জামান চরিত্রে, ভারতের গঙ্গা-যমুনা নাট্যোৎসবে লীলাবতী আখ্যান নাটকে মিহির চরিত্রে, কানাডা ও আমেরিকার ফ্লোরিডায় কঞ্জুস নাটকের বদিউজ্জামান চরিত্রের অনবদ্য অভিনয় অভিনেতা মাসউদ সুমনের দেশের পাশাপাশি বিদেশে মঞ্চাভিনয়ে স্ববিশেষ পরিচিতি এনে দিয়েছে। আমেরিকার ফ্লোরিডায় মঞ্চাভিনয়ে তিনি সেরা অভিনেতা নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়েছিলেন। বাচিক অভিনয় শিল্পী স্ত্রী মেহেজাবীন মাহাবুবের স্বামী এবং কন্যা আনাদীয়া মুমু'র পিতা ব্যক্তিজীবনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগে সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র) হিসাবে কর্মরত মাসউদ সুমন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও দিকনির্দেশনায় চলচ্চিত্র বিভাগ ও অ্যাক্রোবেটিক দল পরিচালনা বেগবান করায় বিশেষ কৃতিত্ব রেখেছেন। একাডেমির সাংস্কৃতিক দল বিদেশে অনুষ্ঠান পরিবেশনায় গেলে মাসউদ সুমন যেমন রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে অংশগ্রহণ করেছেন তেমনি দেশব্যাপী পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের শিশু নাট্যকর্মশালার একজন নিয়মিত প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। অভিনেতা মাসউদ সুমনের বিগত সব চরিত্রের অভিনয় অভিজ্ঞতার উপলব্ধি যেন পূর্ণতা পাইয়ে দিয়েছে মঞ্চসারথী আতাউর রহমান নির্দেশিত হ্যামলেট নাটকের হ্যামলেট চরিত্রে রূপদানের মধ্যে দিয়ে। মাসউদ সুমন তার অভিনয় জীবনে অভিনয় দর্শন খুঁজে নিয়েছেন লিয়াকত আলী লাকীর নির্দেশনায় ও লোকনাট্য দলের ক্যানভাসে। অন্যদিকে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের কথায়, জগতের এই নাট্যশালায় আমরা সবাই অভিনেতা। ফলে প্রতিটি মঞ্চে ওঠার আগে একদিকে নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকীর বলা কথার দর্শন অন্যদিকে শেক্সপিয়রের অনুরণন। মাঝখান থেকে মঞ্চের হ্যামলেটরূপী অভিনেতা মাসউদ সুমনের হৃদয় মূল থেকে উচ্চারণ, আজকের মঞ্চ মায়ায় হ্যামলেট চরিত্রের হবেকি যথাযথ চিত্রায়ন! হতেও পারে, নাও হতে পারে, টুবি অর নট টুবির দোদুল্যমানতা থেকে কেউ কি বেরিয়েছে কবেকখনো! অতএব, চল উঠি মঞ্চে, উঠুক পর্দা, জ্বলুক আলো, ধ্বনিত হোক আবহ, অনুরাগী দর্শকদের সম্মুখে আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক অভিনয় সত্তায় অভিনয়ে অভিনয়ে হোক মানবজীবনের সত্যের অনুসন্ধান।

ঈদ মোবারক

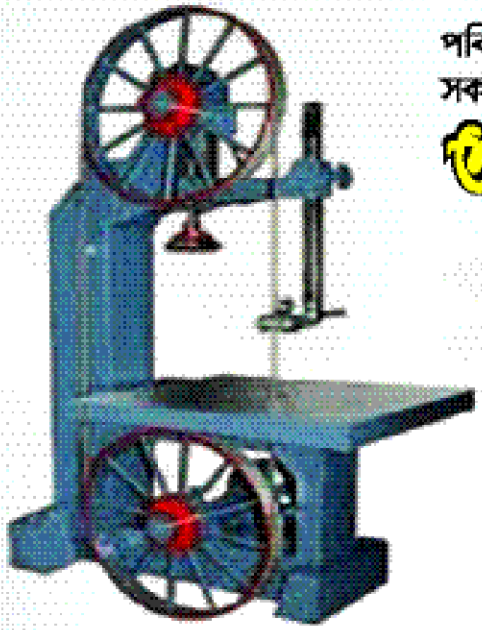

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই
অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

মো. শহীদুল ইসলাম শহীদ
পরিচালক
মেসার্স শহীদ টিম্বার এন্ড 'স' মিল
সাটুরিয়া-ঢাকা রোড পূর্ব নান্দেশ্বরী
(বটতলা), ধামরাই, ঢাকা।

পবিত্র ঈদুল ফিতর
উপলক্ষে সকলকে
জানাই
ঈদ মোবারক



লায়ন আলহাজ্ব এম এ রশিদ
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
আসপাড়া পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
ভালুকা, ময়মনসিংহ।



উপন্যাস

মহাকালের সৌরভ

সালাম সালেহ উদদীন



বৃষ্টি নেই তবুও আকাশ কাঁদছে, চিরকালের বিরহ নিয়ে। রোদের ঝিলিক অশান্ত মনের তাপ বাড়াচ্ছে। একটি অপরিণত দুঃখকে লালন করে সামনে এগোতে চেয়েছিলেন তিনি। দুঃখ-বেদনা-অনুতাপ কখনো জীবনের গতি বাড়াতে সাহায্য করে না, বাড়ায় না মনের বেগও। অতি পড়ন্ত বয়সে পুরনো বাড়ির জানালা দিয়ে রংহীন ফ্যাকাশে আকাশ দেখার চেষ্টা করছেন তিনি। দুচোখ ঝাপসা ফিকে হয়ে আসছে দৃষ্টির অপ্রসারতার কারণে। স্মৃতিতাড়িত মন স্মরণ করতে পারছে না কষ্ট-আকীর্ণ সংগ্রামী দিনগুলোকে, যখন তিনি তার শরীর মনের ভার বহন করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন জীবনকে মনে হতো বিচূর্ণ ছবি। কখনো মনে হতো বিস্তৃত নদীর মতো প্রবহমান, পাহাড়ের মতো বিশাল, সাগরের মতো উত্তাল। তার পায়ের তলায় যখন বালু অনুভূত হতো, তখন জীবনকে মনে হতো ধু-ধু বালুময় তপ্ত মাঠ। এক ধরনের কাচা উপলব্ধির ভেতর বেড়ে উঠেছেন তিনি, দুচোখে ঘোরলাগা স্বপ্ন নিয়ে। জীবন সায়াহ্নে তার ভেতর এই বোধ জাগ্রত হলো, বয়স বাড়লেও কিছু মানুষের ঘোরকাল শেষ হয় না, মাত্রার হেরফের হয় মাত্র। কিছু মানুষ আমৃত্যু ঘোরে পড়ে থাকে। বাস্তবতা তাকে স্পর্শ করে না। জীবন হচ্ছে ঘোরকাতর, স্বপ্নকাতর, স্মৃতিকাতর এমন উর্বর উপলব্ধিতে তিনি যখন বিভোর, তখন আবার আকাশের দিকে তাকালেন। বোধশক্তি জেগে ওঠা থেকে জীবনের পড়ন্তবেলা পর্যন্ত আকাশ তার কাছে চির রহস্যময় অসীমের বাহন মনে হয়েছে। যেখানে মিলিয়ে গেছে নীলিমা রহস্য সেখানে আরও গভীর। রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উজ্জ্বল চাঁদ, ক্ষীণ আলোর আজস্র তারা, নানা গ্রহ কক্ষপথ। রাতের আঁধার আরেক রহস্যের বিচিত্রবোধ। এসবরহস্য জীবনকে আলাদা আনন্দ দেয়, ভিন্ন দ্যোতনার সৃষ্টি করে, বেঁচে থাকার উদ্দীপনা জোগায়। তার ধারণা, তিনি এত বছর বেঁচে আছেন, নিয়ামক শক্তি এসবই। সারাজীবন ঘোর আর রহস্যের ভেতর তার জীবন ঘুরপাক খেয়েছে। মনের ভেতর সৃষ্টি হয়েছে জটিল রসায়ন। দুর্বল অতি-পরিণত দৃষ্টিকে সামনে


আল্লাহ সর্বশক্তিমান
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
ঈদ মোবারক
পবিত্র ঈদ উল ফিতর
উপলক্ষে সকলকে
জানাই
শুভেচ্ছা
এবিএম আনিসুজ্জামান
মেয়র, ত্রিশাল পৌরসভা
সাবেক সভাপতি, উপজেলা যুবলীগ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

প্রসারিত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে কী ভাবছেন তিনি? শৈশবের স্বপ্নময় দুরন্ত দিনগুলোর কথা, যৌবনের আন্দোলিত সংগ্রামী স্বর্ণসময়। নাকি কোনো মায়াবী মুখচ্ছবি, যা আলোর চেয়েও আলোকময়। তিনি সময়কে নিজের মধ্যে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। ধারণ করতে চেয়েছিলেন ফুল, পাখি, নদী, প্রকৃতিকেও।

ভালোবাসাকে ভালোবাসার মধ্য থেকে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, জীবন হবে কেবল ভালোবাসাময়। তিনি জানতেন না, এসব করা মানে বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করা। তিনি তখন সুজ মাঠ বরাবর হেঁটে যেতেন, ভাবতেন মাঠই তার হৃদয়। নদীর কুলকুল ধ্বনি, তার নান্দনিক প্রবহমানতা, পাখির সুমিষ্ট কলধ্বনি- এসবতার হৃদয়ের সুরঝংকার। তার হৃদয় হবে পৃথিবীর চেয়ে প্রসারিত। পাহাড়ের মতো উচ্চতায় খেলা করবে তার সুখ। আকাশের মেঘের মতো উড়ে বেড়াবে তার উল্লাস। রঙিন ঘুড়ির মতো হবেতার ইচ্ছে। তার বিচিত্র চিন্তার দরোজা খুলে গিয়েছিল আশৈশব থেকে। অন্য দশটা ছেলের মতো কাদামাটি আর শরীর একাকার করে ফেলত না। ওরা পাখির পেছনে ছুটতো, ঘাসফড়িং ওদের মাতোয়ারা করত। তার মাথায় অদ্ভুত চিন্তা খেলা করত। একটি উজ্জ্বল জীবনকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন তিনি। সৃষ্টিরহস্য তার অপরিণত চিন্তাকে নানা স্তরে নিয়ে যেত।

২.

আনমনে নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি আত্মজিজ্ঞাসায় মনোযোগ দিতেন, অপলক তাকিয়ে থাকতেন জলপ্রবাহের দিকে। বর্ষায় ভরা নদী গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায়। তার পায়ের তলার যে মাটি, এ মাটি কোথাও উর্বর আবার কোথাও অনুর্বর। বিশ্বের মধ্যে মানুষই সৃষ্টিকর্তার বন্দনায় কাতর। প্রকৃতির যে নানামুখী উদার বিস্তার, সবুজের যে ঘন-আবেশ, এসবতার মনে প্রশ্ন জাগায়। তার মনে হতো নদী তাকে ডাকছে। জল তাকে গাইতে বলছে পতনের গান। তিনি হেঁটে হেঁটে অনেক দূর চলে যেতেন, নদী যেখানে বাঁক নিয়ে, আকাশ যেখানে মিলিয়ে গেছে সুদূরে। পেছন ফিরে গ্রামের দিকে তাকাতেন। গ্রামকে মনে হতো সাজানো পাহাড়। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে খেলা করছে তার চিন্তা, জিজ্ঞাসা। তিনি কি জল ও নদীর সঙ্গে মিশে যাবেন, নাকি ফিরে যাবেন জন্মগ্রামে। যে গ্রামের পাখিগুলো তার খুবপরিচিত। তাদের কণ্ঠ যেন নিজেরই কণ্ঠ। যেখানে সকালের রোদ হামাগুড়ি যে অপার ভালোবাসা নিয়ে। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটে থাকে অনন্তের জিজ্ঞাসা নিয়ে, বেনায় ঝরে যাওয়ার জন্য। জলটলমল গ্রাম্য পুকুরে ঘন সবুজ কচুরিপানার বিস্তার। যেন নকশা করা একরঙা চাদর। তিনি গ্রামে ফিরলেন না। নদী, জল আর আকাশের আকর্ষণে পায়ের বেগ বাড়ালেন। এখনই হয়তো ঝড় উঠবেআকাশ কাঁপিয়ে। তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। গ্রাম তাকে ডাকছে, আকাশ তাকে টানছে তীব্র আহ্বানে। রাত নানা অপরাধ ও রহস্যের জন্ম দিলেও দিনের চেয়ে রাতই তার কাছে বেশি মোহনীয় আকর্ষণীয় মনে হয়। রাতের যে নির্জনতা, যেন এক মহাকাব্য। রাত যত গভীর হতে থাকে তিনি ততো শিহরিত আমোদিত হন। রাতের আয়োজন তার কাছে অন্যরকম মনে হয়। বিকাল গড়ালেই রাতের যে আগমনী সংকেত, তা দিনের শুরুতে পাওয়া যায় না। রাত মানেই ঘরে বা আশ্রয়ে ফেরা, বিষাদে উল্লাসে স্বপ্ন-ভরসায় যেভাবেই হোক না কেন। তিনি মনে করেন জীবনের বিচিত্র আহ্বান রয়েছে রাতের মধ্যে, ইতি-নেতি যেটাই হোক। এই আহ্বান যতটা না দৃশ্যমান, তার চেয়ে বেশি অদৃশ্য ও রহস্যে ঘেরা। বিকালের মরা রোদ ফিকে ধূসর হয়ে এলে পৃথিবীতে করুণ সুর বাজে। এই সুর বাজায় দিনের আলো। কারণ তার দাপট ও উজ্জ্বলতা ম্লান হতে শুরু করে। সে জানে না আগামী দিন সকালটা আলোকিত হবেকিনা, নাকি মেঘ সূর্যকে ঢেকে দেবে। দিনের কারুকাজ সুবাস সৌন্দর্য হচ্ছে ওই আলো কিংবা আলোকোজ্জ্বল পৃথিবী। পৃথিবীতে গোধূলি নামে, এটা তিনি কিশোরকাল থেকেই শুনে এসেছেন। এই গোধূলিলগ্নে পৃথিবীতে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়, মানুষসহ অন্যান্য প্রাণিকুলের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, বেড়ে যায় ব্যস্ততা। রাতকে অভ্যর্থনা জানানোর যে প্রস্তুতি, তা তো দিনের জন্য নেই। ভোর মানেই হচ্ছে রাতের বেদনা শোক আর উল্লাসের সমাপ্তিরেখা। কামনা-বাসনার মোহনা থেকে দিনের যাত্রা। যারা ঘুমঘোরে থাকেন তারা তো দিনের শুরুটাই উপভোগ করতে পারেন না। আর যারা মধ্য-দুপুর পর্যন্ত নিয়মিত ঘুমান, তারা সকালের আবেশ স্নিগ্ধতা কী জানেন না। সুখের দুপুর এমন কথা খুবকমই শুনেছেন তিনি। তাই প্রকৃত উৎসবরাতের মধ্যেই নিহিত। রাত এলে বেশিরভাগ পাখি তার কণ্ঠ ভুলে যায়, অজানা জাদুমন্ত্রে। মানুষের মধ্যে রাত প্রত্যাশা স্বপ্ন জাগায়। রাতের একটি সুখকর প্রশান্তিময় স্বপ্ন মানুষ আজীবন মনে রেখে তাড়িয়ে তাড়িয়ে সুখ-স্মৃতি অনুভবকরে। প্রতিটি রাতে প্রত্যাশা করে আরেকটি স্বপ্ন যেন রাত তাকে উপহার দেয়। রাত দুঃস্বপ্নও ডেকে আনে। তবু তিনি রাতের জন্য অপেক্ষা করেন। রাত তাকে বাইরে ডাকে। তিনি বহুদিন ঘর থেকে বের হয়ে যা প্রত্যক্ষ করেছে, তা তার জীবনের পরম প্রাপ্তি। রাতের নদী, প্রকৃতি জীবনকে অন্যরকম আনন্দ দেয়, প্রেরণা জোগায়। একটা বৃষ্টিমুখর রাত কিংবা একটা পূর্ণ জোছনাকাতর রাত যদি ভালোভাবে উপভোগ করা যায় তবেতো জীবনের অপার আনন্দ, জীবনের হিল্লোল। এই আনন্দ হিল্লোল তার জীবনের সুখ-স্মৃতি।

নিস্তব্ধ গভীর রাতে তিনি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন একা। কখন যে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসেছেন, তা জানেন না। কে যেন তাকে টেনে বের করে এনেছে। হতে পারে তা রাতের আকর্ষণ অথবা অদৃশ্য কোনো শক্তি। ঘোরলাগা গভীর রাত এক মহাশক্তির আধার। যে কাউকে নেশাগ্রস্ত করে, যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। রাতের নদী এত শান্ত, সৌম্য এত মায়াবী তার জানা ছিল না। নদীর জল কি কাঁপছে, নাকি তার পা কাঁপছে, ভয়ে অথবা শিহরণে। মনের ভেতরে যেন আরেক নদীর জন্ম নিচ্ছে, যে নদী বড় অশান্ত বিক্ষুব্ধ জল থইথই। মানুষ নদীকে নদীর মতো করে চলতে দেয় না, জীবনকেও চলতে দেয় না জীবনের মতো করে। সবকিছুর যে সরলপ্রবাহ তা রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। নদীর দিকে তাকালেন তিনি, আলো-আঁধারির সঙ্গে মিলিয়ে গেছে জল। কারণ আকাশে জোছনার প্রাবল্য নেই, নেই অন্ধকারের একচেটিয়া রাজত্ব। পেছন থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। ঘরে ফিরে যাও ঘরে ফিরে যাও, বিপদ বাড়বে। কী বিপদ বাড়বেতার? তিনি জীবনকে কখনোই পরোয়া করেননি। সুখ ও সৌন্দর্যের চর্চা ও অনুসন্ধান করেছেন তিনি। এসবযারা করেন তাদের সাহসী ও কৌতূহলী হতে হয়। তিনি হয়তো তেমনই। বাতাসের বেগ বাড়তে শুরু করলে, তার শরীরে ঠান্ডা অনুভূত হয়। রাতের নদী থেকে উঠে আসা শীতল বাতাস তার শরীরে আদরের পরশ বুলিয়ে দিল। তিনি নতুন করে শিহরিত হলেন। তার জিজ্ঞাসা, নদী কি ঘুমায়? রাত কি ঘুমায়? রাত ও নদীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। রাত আসে বলেই নদী এত স্নিগ্ধ সুন্দর। জলের মধ্যে টুপটাপ শব্দ শোনা যায়। দূরে একই ধরনের শব্দ ভেসে আসছে। এটা হয়তো নদীর সঙ্গে মাছের মিতালির কারণেই শব্দভাণ্ডার মুখরিত হয়ে উঠছে। তাই তার মনে নতুন করে স্পন্দন জাগছে। চারদিকের পরিবেশ যেমনই হোক, এই আবহ তিনি ধরে রাখতে চান।

মানুষ অপেক্ষা করে কখন স্বপ্নপূরণ হবে, জীবনে অর্থ-বিত্ত আসবে, আসবেভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা, খ্যাতি। তিনি অপেক্ষা করেন প্রবল জোছনার জন্য। জোছনার প্লাবনে ভেসে যেতে চান তিনি। জোছনা-কাতর মন কত কী না চায়। পৃথিবীতে যখন জোছনার ঢল নামে, তখন বদলে যায় সবকিছু। এমন নান্দনিক পরিবর্তন আর কখনোই আসে না। পৃথিবী সাজে নববধূর মতো লাজুক ভঙ্গিমায়। জোছনার আকর্ষণে তিনি উন্মাতাল হয়ে যান। বাড়ির বিস্তৃত উঠানে পুকুরপাড়ে, খোলা মাঠে, নদীর তীরে, ছাদে তিনি জোছনা উপভোগ করেছেন, আত্মস্থ করেছেন নিজের মধ্যে। এই ভেবে, তিনি জোছনার মতো উজ্জ্বল ধবল হতে চান ব্যক্তিগত জীবনে। তিনি মনে করেন জোছনাই তাকে পরিশুদ্ধ হতে শিখিয়েছে। জোছনার নিজস্ব মাধুর্য ঐশ্বর্য দ্যোতনা আছে, মানুষ ও প্রকৃতিকে আকর্ষণ করার অসীম ক্ষমতা রয়েছে।

৩.

ভরা পূর্ণিমায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন নির্জন জায়গায়। চারপাশের গাছপালায় জোছনা ঠিকরে পড়েছে তার সবস্নিগ্ধতা আর জলুস নিয়ে, যেখানে তিনি একেবারেই গৌণ। নিচের যে দূর্বা ঘাস, জোছনা খেলা করছে তার ডগায় শিশুতোষ মন নিয়ে। গাছের সবুজ পাতার রং বদলে দিয়েছে জোছনা। কচি পাতাকে মনে হচ্ছে জ্যোতির্ময় আভা, মহাকর্ষণের আধার। আকাশের দিকে সরল দৃষ্টিতে তাকান তিনি। সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে অসীমের পানে, যে মেঘ থেকে কখনো বৃষ্টি হবেনা। জোছনার ঝিরঝির পতন হচ্ছে, যে পতনের শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তার শরীরজুড়ে এখন জোছনার কাঁপন। এ কাঁপন তাকে নিয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত এক শিহরণের জগতে, যেখানে কখনো চাঁদ ডোবেনা, পূর্ণিমা শেষ হয় না। যেখানে খেলা করে অনন্তের উজ্জ্বলতা।

অন্ধকার মানেই ভয়ের একচেটিয়া রাজত্ব, শিহরিত গোপন রহস্য, বহুচারী অপরাধীদের আনাগোনা- এমনটা মনে করেন তিনি। শরৎচন্দ্র যেমন আঁধারের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনিও তেমনটাই। তিনি মনে করেন আঁধার নিয়ে তার দর্শন ও অনুভূতি যেমন, তা অন্যদের সঙ্গে মিলবেনা। কারণ তার চোখ আর অন্যদের চোখ এক নয়। প্রগাঢ় অন্ধকারে যখন চারদিন প্লাবিত হয়ে যায়, তখন

তার কাছে ভেতর বাইর একই রকম মনে হয়। তিনি প্রথমে মনে করেছিলেন ঘরের অন্ধকারই বেশি উপভোগ্য। যখন তিনি বাইরে এলেন, দাঁড়ালেন উঠানে, তখন মনে হলো, অন্ধকারের বাইরের রূপটা ভিন্নরকম। তার শরীরের সঙ্গে অন্ধকার একাকার হয়ে মিশে আছে, রক্তপ্রবাহের মতো। দূরের যে আমগাছটা সেখানে অন্ধকার কাঁপছে। আমগাছটাকে মনে হচ্ছে ছায়ামূর্তি। তার পায়ের তলা থেকে শির শির করে উপরে উঠছে জমাটবাঁধা অন্ধকার, যা এখনই তাকে অবশ করে ফেলবে। কারণ অন্ধকারের শক্তির চেয়ে তার আকর্ষণ বেশি। অনেকেই মনে করেন, তার জীবন অন্ধকারে ঢাকা। এই কথাটার তিনি কোনো যৌক্তিক অর্থ খুঁজে পান না। জীবনে অন্ধকার আছে বলেই আলোর ঝলকানি খোঁজার জন্য এত চেষ্টা- সংগ্রাম। আমাদের জীবনে যে আলোর প্রয়োজন, অনেক বেশি আলো, এ কথা অন্ধকারই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। আলোর প্রত্যাশী বলেই আমরা অন্ধকারে হাতড়ে মরি। তার পাশ দিয়ে কী যেন একটা হেঁটে চলে গেল। মাথার উপর দিয়ে শাঁ করে উড়ে গেল অজানা পাখি। তার প্রশ্ন, এমন ঘন অন্ধকারে কী করে পাখি উড়ে গেল? সে কি দূরে কোথাও আলোর সন্ধান পেয়েছে? পেছন ফিরে তাকালেন তিনি, অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যায়। না কোনো আলো নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ অন্ধকার কেবল ভয় দেখাচ্ছে। এখন কোনো অপরাধীর সঙ্গে মিতালি পাতাবে সে।



আকাশের দিকে তাকালে তিনি। এমন তারাহীন আকাশ তিনি কখনো দেখেননি। যেন অন্ধকার তার নিজস্ব শক্তি বলে তারাপুঞ্জকে উধাও করে দিয়েছেন। একই শক্তিবলে অন্ধকার কি তাকে তুলে নিয়ে যাবেসপ্তম আকাশে। নাকি তিনি তলিয়ে যাবেন মাটির গভীরে। এই মধ্যরাতে একটি অপরিণত চিন্তাকে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চান। অনিশ্চয়তার দোলাচালে দুলছে তার জীবন। অন্ধকারের রাহুগ্রাসী ভাবথাকলেও, তার ভেতর আলোর ভয় রয়েছে। আলো এলেই তার করুণ পরিসমাপ্তি।

৪.

তিনি যখন সম্মোহিত আকর্ষিত ও মুগ্ধ নদী-প্রকৃতি জোছনা অন্ধকার ও চারপাশের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিরহস্য নিয়ে এবং তার মনোজগৎ বৃষ্টিস্নাত বিকালের রংধনুর মতো সাজানো, ঠিক তখনই একটি অন্যরকম বই তার হাতে আসে। বইটির চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে অতি পুরনো ও বহুলপঠিত। হাত বা আঙুলের স্পর্শে ধুলোমলিন ফ্যাকাশে রাস্তার মতো অবস্থা। এই গ্রামে বই পড়ার মতো বয়স্ক লোক রয়েছে মাত্র তিন জন। কেন যেন তার মনে হচ্ছে, যিনি তাকে বইটি দিয়েছেন তিনিই বারবার পড়েছেন। তার জন্যই বইটির এই করুণ হাল। তিনি মনে করেছেন, এই বইটি এই গ্রামে আর একজনই পড়তে পারে, যে বয়সের চেয়েও বুদ্ধিতে পাকা। তার মন যতটা না প্রশস্ত, চিন্তার জগৎ তার চেয়ে বহুগুণ বিস্তৃত। যে কারণে অকারণে দিগ্বিদিক ঘোরাফেরা করে। হঠাৎ হঠাৎ ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। নির্লিপ্ত চোখে আকাশের রহস্য খোঁজার চেষ্টা করে। নির্জন পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে। লোকটি তাকে নিয়ে এভাবেনাও ভাবতে পারে। এটা তার কষ্ট-কল্পনা মাত্র। তবে বইটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখার পর মনে হলো, তিনি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে বইটি দিয়েছেন। এর একটি হতে পারে, তাকে নজরবন্দি বা ঘরবন্দি করার জন্য। হয়তো তার কর্ম ও আচরণ লোকটির ভালো লাগে না। অজপাড়াগাঁয়ের ছাত্রদের যে স্বাভাবিক আচরণ হওয়া উচিত, সে আচরণও তার নয়। তার পরিবারের বিশেষ কারও পরামর্শে লোকটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা, তা তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না। তার একটু একটু করে স্মরণে আসছে, এই লোকটি তার আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও অনেক দিন থেকে তাকে অনুসরণ করছেন। গভীর রাতে নদী পাড়ে আলো-আঁধারির মাঝে যে ছায়ামূর্তি দেখেছিলেন, সেটা হয়তো তিনিই। পেছন থেকে কি তিনিই বলেছিলেন- ঘরে ফিরে যাও, ঘরে ফিরে যাও, বিপদ বাড়বে।

বইটি দেওয়ার আগে লোকটি বলেছিলেন, অন্য কাউকে না দেখাতে বা দিতে। তিনি এও বলেছিলেন, বইটা পড়তে হবে গোপনে, গভীর অভিনিবেশের মাধ্যমে। তার কথা শুনে মনে হয়েছিল, জীবনে এই প্রথম তিনি কোনো শর্তের জালে আবদ্ধ হলেন। শর্ত দিয়ে কেন বইটা পড়তে দিলেন। তার কাছ থেকে তো বইটা অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করে চাওয়া হয়নি। এই রহস্য কুয়াশার মতো তার চোখে আটকে রইল। লোকটা যখন তাকে বইটি দিয়েছিল, তখন বিকাল। হঠাৎ তার ভেতর অস্থিরতা দেখা দিল। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তার প্রশ্ন, কী আছে এই বইয়ের ভেতর? এই কৌতূহল তিনি নিবৃত্ত করতে পারছেন না। পাঠ্যবইয়ের বাইরে তিনি কোনো বই পড়েননি। বেশকিছু সময় কেটে গেল তার এলোমেলো ভাবনার মধ্যে। যেন নিষিদ্ধ কিছু তার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। যা ফাঁস হয়ে গেলে বিপদ আসবে নিঃশব্দ রাতের আগমনের মতো। বইটি লুকিয়ে রেখে তিনি বাড়ির পশ্চিম দিকে হাঁটা ধরলেন। লোকটির চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দাঁত কেলিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় হাসছেন তিনি, যেন অস্ত্র শত্রুর দিকে তাক করা। এবার তার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। লোকটি বলছেন, জীবনে যা কিছু আনন্দের কৌতূহলের বিস্ময়কর ও স্বপ্নময় তা এই বইয়ে রয়েছে। এই বইয়ের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে ঘোর মাদকতা মায়াজাল ছায়াজাল বিপজ্জনক বার্তা ও আবিলতা। তিনি থেমে গেলেন। তিনি মনে করছেন, ভেল্কির মধ্যে পড়ে গেছেন তিনি। রাস্তার এদিক বেশ নীরব। চারদিকে প্রবীণ ও বাড়ন্ত গাছপালা। পাখির কলকাকলিতে মুখর এ জনপদ। এরা সন্ধ্যার আগমনী বার্তা ঘোষণা করছে। তিনি সামনে না এগিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

রাত বাড়তে থাকলে তার ভেতর অজানা শিহরণ জাগে। কী আছে বইয়ের ভেতর, এই প্রশ্ন তাকে কাতর করে ফেলে। তার এও মনে হতে থাকে, বইটি স্পর্শ করা মাত্র তার শরীর অবশ হয়ে যাবে। বাইরে কারও গলা খাকারি শোনা যাচ্ছে। বাড়ির কেউ কি জেগে উঠল। চারটিকে মনোযোগ বাড়ান তিনি। না শব্দটা বাইরে থেকে এসেছে। হয়তো কেউ তাদের বসতির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হারিকেনের অল্প আলোতে বইটি উল্টাতে শুরুও করেন তিনি। ভেতরের ছবিগুলো দেখে অবাক হন তিনি। ছবিগুলো আঁকা, শিল্পীর নিখুঁত কারুকাজ। বেশির ভাগ ছবিই হয় অর্ধনগ্ন না হয় বিবস্ত্র। নর-নারী একে অন্যকে আবেষ্টন করে আছে।

কোনো কোনো নারী আছে নাচের ভঙ্গিতে। উন্নত বক্ষধারী নারীর অর্ধনগ্ন ছবিও রয়েছে তাতে। এসবছবি দেখে যে কারও উন্মাদনা জাগবে। একটি অর্ধনগ্ন নারীর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। তার সারা শরীর শিহরিত হতে থাকে। একদিন স্বপ্নের মধ্যে তিনি এমন একজন নারীকে দেখেছিলেন। যে রাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন, ওই রাত থেকে তিনি বদলে যেতে থাকেন। ওই নারী তাকে বলেছিল, তুমি কেবল সামনে এগোবে, কখনো পেছনে তাকাবেনা। পেছনে তাকালেই তুমি আমাকে হারাবে। এই স্বপ্নের অর্থ খুঁজে পাননি তিনি। তবে স্বপ্ন দেখার পর থেকে তার শরীর, মন দ্রুত বদলে যেতে থাকে। ওই স্বপ্ন তিনি আবার দেখতে চান। এ জন্য তিনি রাতে এক ধরনের বিশেষ প্রস্তুতি নেন। রাতের বেলা নদী থেকে গোসল করে আসেন এবং পরিষ্কার পোশাক পরিধান করেন। এই দৃশ্য দেখে বাড়ির সবাই অবাক হয়। তবে কেউ তাকে প্রশ্ন করে না। স্বপ্নের জন্য তিনি যতই প্রস্তুতি নিন না কেন, স্বপ্নে নারী তার কাছে ধরা দেয় না। অথচ আজ অলৌকিকভাবে বইয়ের মধ্যে ওই নারীর ছবি দেখতে পেলেন তিনি। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির দেখা।

৫.

আজকের রাত যেন তার জীবনে অন্যরকম আবহ তৈরি করল। তার সমস্ত শরীর মন বারবার শিহরিত হচ্ছে। এ এক মহাঘোর লাগা উন্মাদনা। আবেগের সমুদ্রে যেন তিনি ভেসে যাচ্ছেন। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে হেরিকেনের মৃদু আলোতে বইটি হাতে নিলেন তিনি। উপরে লেখা হাজার রজনীর গল্প, ঠিক স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। যেন অক্ষরের

উপর ময়লার স্তূপ পড়ে আছে। এই ধরনের বইয়ের নাম এই প্রথম তিনি শুনলেন। এক হাজার রজনীর গল্প লেখা সহজ কথা নয়। এক রাতের গল্পই মানুষ লিখতে পারে না। আর এখানে হাজার রজনীর গল্প। ছবিতে যেমন তার চোখ আটকে গিয়েছিল, একইভাবে বইয়ের ভূমিকায়ও তার চোখ আটকে গেল। হাজার রজনীর গল্পের গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত-সমালোচিত নিষ্ঠুরতম চরিত্র বাদশাহ শাহরিয়ার। প্রত্যেকদিন তিনি একটি করে বিয়ে করতেন, পরের দিনই তাকে জবাই করার হুকুম দিতেন। আসন্ন মৃত্যুতে পতিত নারীদের কান্নার শব্দ শুনে তিনি পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করতেন। তার মনে প্রশ্ন জাগে, এটা কী করে সম্ভব? একজন বাদশাহ এত অমানবিক নিষ্ঠুর হতে পারে? যিনি এই গল্প লিখেছেন তিনি ডাহা মিথ্যা লিখেছেন, অথবা আশ্রয় নিয়েছেন অতি কল্পনার, বাস্তবের সাথে যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই নিষ্ঠুর গল্প মানুষকে অপরাধ করতে অনুপ্রাণিত করছে।

প্রতিদিন একজন নারীকে খুন, যে নারী তার স্ত্রী। এ কথা ভাবতেই তার সারা শরীরে কাঁপন ধরল এবং হাত থেকে বইটি পড়ে গেল। গভীর রাতে বই পতনের শব্দ কেউ শুনতে পেয়েছিল কি না, তা তিনি বলতে পারবেন না। তার একটা কথা বারবার মনে হলো, স্বপ্নে যে নারীকে তিনি দেখেছিলেন, যে নারী বইয়ের মাধ্যমে তার কাছে ধরা দিল, ওই নারীকেও কি বাদশা বিয়ে করেছিলেন এবং পরের দিন তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন?

পাখিরা কিচিরমিচির করে উঠলে তার ঘুম ঢুলুনি ও ঘোর অনেকটা কেটে যায়। তিনি গাছের উপর দিয়ে সূর্য ওঠা দেখেন। আজ সূর্যটাকে বেশি ক্ষরিত রক্তাক্ত মনে হয়। যেন বাড়তি কোনো বেদনা তার ওপর ভর করেছে অযাচিতভাবে। তাই আজ পৃথিবী তার ন্যায্য আলো-তাপ থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি আগের মতো নদীর তীর ঘেঁষে হেঁটে চলেছেন। তবে এবার পায়ের বেগ বেশি, মন দুর্বল। রাতে তার ভেতরও রক্তক্ষরণ হয়েছে, কাদামাটির প্রলেপ দেওয়া মন কেঁদেছে অজানা অযৌক্তিক কারণে। তার জীবন থেকে কিছু কি হারিয়ে গেছে, খসে গেছে, ঝরে গেছে। এমন প্রশ্ন নিজের ভেতর উদয় হলো, ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসের আমেজ নিয়ে। অন্যদিন নদীরঙিন ভোর তার মন জুড়িয়ে দেয়। জলের দিকে তাকালে তিনি সজীব হয়ে ওঠেন। আজ যেন তার চোখ বদলে গেছে, বদলে গেছে তার মন। কে যেন তার শারীরিক শক্তি কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে তার মানসিক শক্তিও। মানুষ স্বপ্নে কতকিছুই দেখে, বিভোর হয়। বইয়ের মধ্যে লেখা থাকে কত বেদনাময় নিষ্ঠুর কাহিনী। সে জন্য তো কেউ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না। দেয় না নিজের জীবনের গতিকে থামিয়ে। তা হলে তার ভেতর কেন এই মনোবেদনা, আর কেনই বা এমন ঝড়ো-হাওয়া ভাব। আজ নদীর জল কি লাল অস্বচ্ছ দূষিত। নিরপরাধ হত্যার শিকার নারীদের রক্ত কি এই নদীর জলে মিশে গেছে?

পাশের গ্রামের এক গৃহবধূকে তার স্বামী গলা টিপে হত্যা করেছিল। এই জনপদে স্ত্রী হত্যার ঘটনা এই প্রথম। সারা এলাকায় আলোড়ন তুলেছিল ওই হত্যার ঘটনা। পরে এলাকাবাসী জানতে পারে লোকটার স্ত্রী ব্যভিচারী ছিল। এক তরুণের শরীর-আসক্ত ছিল তার স্ত্রী। লোকটা নাকি তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন, একবার নয়, একাধিক বার। এক হত্যার ঘটনায় এত আলোড়ন। অথচ বাদশা শাহরিয়ার প্রতিদিন কম বয়সি নারীকে হত্যা করেছেন। এটা কি মেনে নেওয়া যায়। এই সীমাহীন অপরাধের কি বিচার হয়েছিল? বইয়ের পাতায় কি সে গল্প লেখা আছে। সবার আগে তার সেটা জানতে হবে। তিনি বাড়ির দিকে যাত্রা করেন। হঠাৎ তার পিলেই চমকে যায়। তার আত্মীয়, যিনি তাকে বইটি পড়তে দিয়েছিলেন, তিনি দূরে দাঁড়িয়ে আগের মতো দাঁত কেলিয়ে হাসছেন।

আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে আকাশের বেদনা। তারও আড়ালে আছে চির রহস্য, যে রহস্য ভেদ করা মানুষের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়। তার হৃদয়ের সাথে আকাশের হৃদয় যেন বাঁধা। একদিন তিনি পাখির মতো আকাশে উড়তে চেয়েছিলেন। আজ সে ইচ্ছে তার নেই। কারণ তিনি নিশ্চিত জানেন, উড়তে পারবেন না কোনোদিনই। তিনি মনে করেন, পৃথিবীতে কিছু জিনিস কেবল দেখার আছে, আছে দূর থেকে উপভোগ করার জন্য । তার কাছে গেলে, তাকে ধরতে চাইলে বিপদ বাড়বে, জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে। জীবনের ধর্ম হচ্ছে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা, বেঘোরে প্রাণপাত করা নয়। আজ তার ভাবনায় নতুন বাঁক নিয়েছে। মানুষ কেন মানুষকে খুন করে। মানুষের রক্ত নিয়ে মানুষ কেন উল্লাস করে? সৃষ্টির আদি থেকে চলছে এই নিষ্ঠুর হত্যালীলা। মূলত অর্থ ক্ষমতার অন্ধ দাপট আর নারীকে কেন্দ্র করেই চলছে হত্যা। আত্মহনন আরও একটি অন্ধকার দিক। গেল বছর তাদের গ্রামে এমন এক ঘটনা ঘটেছিল। রমিজ উদ্দিন ফকিরের বাস্তুভিটায় গলায় ফাঁস দিয়েছিল জয়নাল শেখ। কী তার দুঃখ, কী তার বেদনা, যার কারণে তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তার কারণ আজও অজানা। এসবকথা মনে হলে তার মন বিষিয়ে যায়। তার আজ আর বইটা স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছে না। তবে কী কারণে বাদশা শাহরিয়ার প্রতিদিন একজন নারীকে বিয়ে করার পর হত্যা করতেন তা জানার অদম্য কৌতূহল তার রয়েছে। এটা কি কেবল নতুন নতুন কম বয়সি নারী সম্ভোগের জন্য, না অন্যকিছু এই প্রশ্ন তাকে ভাবিয়ে তোলে।

৬.

তিনদিন অতিবাহিত হলো তিনি বইটি স্পর্শ করলেন না। এতে যে তার খুব একটা লাভ হয়েছে তাও নয়। তিনি রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারছেন না। ঘুম তার দুচোখ স্পর্শ করা মাত্রই তিনি নারীকণ্ঠে চিৎকার শুনতে পান, যে নারী কিছুক্ষণ পর হত্যার শিকার হবে। তিনি রক্তের নদী দেখতে পান। যে নদীতে ভেসে যাচ্ছেন নিষ্ঠুর বাদশা শাহ-রিয়ার এবং তিনি নিজে। তার সারা শরীরে ঘাম দেখা দিল। এক ধরনের রি রি গো গো শব্দ তার মুখ থেকে বের হতে লাগল। তিনি তো কোনো নারীকে বিয়ে কিংবা খুন করেননি, তা হলে কেন রক্ত-স্রোতে ভাসবেন। একজনের অপরাধের শাস্তি কেন অন্যজন ভোগ করবে। এবার তার মনে পড়ল তিনি তো বইটির ভূমিকাই শেষ করেননি। ভেতরে যে সবছোট ছোট গল্প রয়েছে, যার নাম হাজার রজনীর গল্প, পড়েননি তাও। সবকিছু না পড়ে নিজের মধ্যে এভাবে ভীতি জাগিয়ে তোলা ঠিক নয়। তিনি এও ভাবলেন, বইটি তার আত্মীয়কে ফেরত দেবেন। অযথা জীবন-জটিলতা তৈরি করে কী লাভ? বইটি যদি তার জীবনে বাড়তি কোনো ইতিবাচক দিকের পথ দেখাত, তা হলে কথা ছিল। তিনি কেন এই বাড়তি জঞ্জাল বয়ে বেড়াবেন আর রাতের বেলা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘেমে নেয়ে উঠবেন? তিনি বরাবরই শুনে এসেছেন, বই জ্ঞান ও চেতনার আধার। জীবনের আলোক শিখা হচ্ছে বই। বই পড়লে মনের দুয়ার খুলে যায়। এবার তার কোন দুয়ার খুলে যাবে, তা তিনি ভেবে পাচ্ছেন না।

বইকে কেন্দ্র করে তার ভেতর এক ধরনের ভীতি জাগ্রত হলে, আগে যে তীব্র কৌতূহল ছিল তা যেন মিলিয়ে যেতে শুরু করল। তবে বইয়ের ভূমিকা গল্পগুলোর শিরোনাম এবং ছবিগুলো তিনি ভালোভাবে পড়তে ও দেখতে চান। আজ বইটিকে কেন্দ্র করে এটা হয়তো তার শেষ ইচ্ছে।

বইটিকে কেন্দ্র করে তিনি যে মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন, একটা সিদ্ধান্তে ভারমুক্ত হলেন। লোকটার সঙ্গে দেখা হলে বইটি তিনি ফেরত দেবেন। কারণ বইটি তার মুক্ত চিন্তার জগৎকে এলোমেলো করে দিয়েছে, চিন্তাকে এককেন্দ্রিক করে ফেলেছে।

হারাম হয়ে গিয়েছে তার রাতের ঘুম। দুদিন লোকটাকে খোঁজ করে পাওয়া গেল না। পরে তিনি জানতে পারেন, লোকটা দূর গ্রামে বেড়াতে গিয়েছেন। কবে ফিরবেন তা পরিবারের কেউ বলতে পারে না।

গ্রামের নির্জন পথ ধরে তিনি হাঁটতে থাকেন। কিছুতেই তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না, একটা বই নিয়ে তার এত মাথাব্যথা কেন? কোথাকার কোন বাদশাহ কী অপরাধ করেছেন, কাকে হত্যা করেছেন, এ নিয়ে তার শিরপীড়নের দরকার আছে কি? তাও ওই সবকথা বইয়ে লেখা। লেখক তো কল্পনা বাস্তবের মিশেলে কত কী লেখেন? সে সব বিশ্বাস করে বসে থাকলে কি জীবন চলে? এই কথা তিনি যখন ভাবছেন, তখন বেশকিছু মায়াবী অনিন্দ্য সুন্দর মুখচ্ছবিতার চোখের সামনে ভেসে উঠল, যারা প্রতিদিন নিষ্ঠুর হত্যার শিকার হয়েছে, জীবনকে উপভোগ করার আগেই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, করুণ কাহিনীর জন্ম দিয়ে, যে কাহিনী আজ তার মনোপীড়ার কারণ হয়েছে। আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। তিনি দেখলেন এক বিস্ময়কর দৃশ্য। আকাশের খাজে খাজে ভাঁজে ভাঁজে খোদাই করা আছে বাদশাহ শাহরিয়ারের নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। তার মনে হলো, আকাশজুড়ে আজ শত শত কণ্ঠ একসঙ্গে আওয়াজ তুলছে। আমরা মরিনি, আমাদের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা আবার পৃথিবীতে আসব, হাসব, মায়া ছড়াব। নতুন করে পৃথিবীতে রোপিত হবে মায়াবীজ। স্নিগ্ধ ভালোবাসায় গভীর মায়ায় ভরিয়ে দেবো সবার হৃদয়।

৭.

আজকের রাতটা অধিক রহস্যময়, অন্ধকার বেশি ঘন মনে হচ্ছে তার কাছে। কত রাতের অজানা পাপ-কাহিনী হৃদয়-খণ্ডিত ইতিহাস চাপা পড়ে আছে কালের করুণ গহ্বরে, সে খবর কজন রাখে। কিছু মানুষ রাতের ঘুম অথবা আনন্দবিহারে উপভোগ্য জীবন নিয়ে ব্যস্ত। কিছু মানুষ দুঃখ হতাশা নিয়ে গভীর গ্লানিবোধ নিয়ে শোক ও বেদনা নিয়ে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দেয়। কখন ভোর হবে,

পুরাতন সূর্য নতুন করে উঠবে, আলোকিত করবে নিঃস্বার্থভাবে নিঃস্ব গর্জনমুখর পৃথিবীকে সে দিকে ভ্রূক্ষেপহীন তারা। কারও কারও জন্য রাত কেবল বিষাদ আর চোখের জলই এনে দেয়, শ্রাবণ-বৃষ্টির অজস্র করুণ ধারার মতো। রাতকে তার মিশ্র অনুভবে যেভাবেই নিক না কেন, রাত তো রাতই, গভীর রহস্যের আধার-মানিক। একটা পরাজিত ভুল চক্কর খাচ্ছে অন্ধকারকে কেন্দ্রবিন্দু করে। একটা ভীতিসঞ্চারী মন প্রদক্ষিণ করছে হাজার মনে। আজ রাতের ভাবনাটা যেভাবেই পাক খেতে থাকুক না কেন, তিনি কাঁপা হাতে বইটা হাতে তুলে নিলেন। বইটা আজ তার কাছে বেশি ওজন সম্পন্ন মনে হচ্ছে। বইটা পাশে রেখে অন্ধকারে নিজের হাত পরীক্ষা করছেন তিনি। বইটি স্পর্শ করা মাত্র তার হাত রক্তাক্ত হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে প্রগাঢ় অন্ধকারে তিনি কীভাবে উপলব্ধি করবেন। লাল কালো তো একাকার হয়ে আছে। এবার তিনি পরোখ করলেন খুনের রক্তে তার হাত ভিজে গেছে কিনা। শত শত বছর আগে যদি কেউ নির্বিচারে খুন হন, সেই রক্ত খুনির হাতে না লেগে কী করে তার হাতে লাগবে, এও কি সম্ভব? সমস্ত দ্বিধা আর কষ্ট-কল্পনাকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বইয়ের ভূমিকা পড়তে শুরু করলেন। তিনি জানতে পারলেন বাদশা শাহরিয়ার আর শাহ জামান ছিলেন দুই ভাই। দুজনে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য শাসন করতেন। দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক আর তাকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসই বলা হোক না কেন, দুই ভাইয়ের স্ত্রী ছিলেন কালো হাবসীর শরীরী প্রেমে কাতর, যাকে দুই ভাই বলছে ব্যভিচারিণী। চরিত্রগত স্খলন বা শরীরী উচ্ছ্বাসময় অপরাধের কারণ দুই ভাই স্ত্রীকে হত্যা করেন। বিশেষ করে বাদশা শাহরিয়ারের মধ্যে প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে।



বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার দুনিয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভালো। এমন বোধ বাদশা শাহরিয়ার ও তার ভাইয়ের মধ্যে জাগ্রত হলে, দুই ভাই রাতেই প্রাসাদের খিড়কির দরোজা দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়লেন। দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলতে থাকেন তারা। অবশেষে একদিন এক সমুদ্রের উপকূলে এসে হাজির হলেন দুজন। নির্জন সৈকত। কাছের এক বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে থাকেন তারা। ঘণ্টাখানেক কেটেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, দূরে সমুদ্রের মাঝখানে এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমেই আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ওই কুণ্ডলীটা এক বিকটাকার আফ্রিদি দৈত্যের রূপ ধারণ করল। এই না দেখে দুই ভাইয়ের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। দৈত্যটা কূলের দিকে এগিয়ে আসছে। উপায়ন্তর না দেখে গুঁড়ি বেয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসলেন দুজনে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ওদের গাছের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল আফ্রিদি। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল দুই ভাইয়ের। আরও কাছে আসতেই নজরে পড়ল, তার মাথায় বিরাট একটা বাক্স। গাছের তলায় এসে বাক্সটা নামিয়ে বসে পড়ল সে। বাক্সটার ভেতর থেকে একটা লোহার সিন্দুক বের করল। সিন্দুকটা খুলল। কী আশ্চর্য! তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো পরমা সুন্দরী এক যুবতী! কী তার রূপের ছটা! গাছের তলাটা আলোয় ঝলমল করে উঠল। মুগ্ধ চোখে, অনেকক্ষণ ধরে, দৈত্যটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার রূপ, যৌবন। তারপর আদর করে বলতে লাগল, বুকের কলিজা, তোমার শাদির দিনে তোমাকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছি। সেই দিন থেকে আমার চোখে ঘুম নাই। দুস্তর সাহারা সমুদ্র ঘুরে বেড়িয়েছি তোমাকে মাথায় করে। আজ আমি বড় ক্লান্ত। ঘুমে চোখ আমার বুজে আসছে। একটু ঘুমুতে চাই। এই বলে মেয়েটির কোলে মাথা রেখেই নাক ডাকতে লাগল। একা একা বসে এদিকওদিক চাইতে চাইতে, মাথার উপরে গাছের ডালে শাহজামানদের দুজনকে দেখতে পায় মেয়েটি। আফ্রিদির মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে ইশারা করল। ওদের, হাতছানি দিয়ে ডাকল। নিচে নেমে আসতে বলল। আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, দৈত্যের ঘুম এখন ভাঙবেনা, তোমরা নির্ভয়ে নিচে নামতে পারো। দ্বিধা ও ভয় কাজ করতে লাগল দুই ভাই এর মধ্যে। তারা যদি না নামে তা হলে আফ্রিদিকে জাগিয়ে শায়েস্তা করা হবে। গলাটিপে মেরে ফেলবে সে। মেয়েটি দুই ভাইকে পালাক্রমে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য করে। সম্ভোগ শেষে চরম পুলকে উচ্চশব্দে হেসে ওঠে মেয়েটি। সেমিজের পকেট থেকে একটা ছোট্ট থলে বের করল মেয়েটি। থলেটার ভেতর থেকে তুলে ধরল একটা আংটির ছড়া। বলল, জানো, এগুলো কী? এই চেনে ১৭০টি আংটি রয়েছে। এই মুখপোড়া আফ্রিদিটার চোখে ধুলো দিয়ে যাদের দিয়ে আমার কাম হাসিল করিয়েছি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা করে আংটি নিয়ে এই চেনে গেঁথে রেখেছি। এগুলো আমার স্মৃতিচিহ্ন। তোমাদের কাছেও চাইছি। দুটো আংটি। দাও, এর সঙ্গে গেঁথে রাখব। পরে যখন দেখব, তোমাদের সঙ্গে আজকের এই সুখ-সম্ভোগের কথা মনে পড়বে আমার। এ কথা শুনে স্তম্ভিত হলো ওরা। দুজনেই একটা করে আংটি খুলে দিল রূপসীর হাতে। মেয়েটি বলল, জানো, এই শয়তান দৈত্যটা আমার শাদির রাতে চুরি করে নিয়ে এসেছে আমাকে। এই লোহার সিন্দুকে কয়েদ করে, সিন্দুকটাকে আবার ওই বাক্সটায় ভরে, লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে, মাথায় করে ঘুরেছে নির্জন মরুপ্রান্তরে, জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে। কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। শেষে, ওই সমুদ্রের তলায় নেমে গিয়ে অন্য পুরুষের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে আমাকে। কিন্তু ও বেটা জানে না, আমরা মেয়েরা যা চাইব, যেন-তেন-প্রকারে তা পূরণ করবই। কেউ কখনো তা রোধ করতে পারেনি, পারবেনা।

শাহজাদাদের চৈতন্য উদয় হয়। এই ভয়ঙ্কর দৈত্যের এমন দুর্ভেদ্য সুরক্ষাকে কলা দেখিয়ে এই সুন্দরী কলাবতী যেভাবে তার কাম হাসিল করে চলেছে তা কল্পনাতীত! এর তুলনায় তাদের বেগমদের প্রহরা কিছুই নয়। এই ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পেলে ওরা। আর কালবিলম্ব না করে তক্ষুনি নিজের নিজের শহরে ফিরে গেল। প্রাসাদে পা দিয়েই বাদশাহ শাহরিয়ার নিজের হাতে বেগমের গর্দান নিল। হারেমে যত দাসদাসী ছিল সবাইকে কেতিল করার হুকুম দিল। তারপর উজিরকে ডেকে বলল, আজ থেকে প্রতি সন্ধ্যায় একটি কুমারী মেয়ে চাই আমার শোবার ঘরে। সারা রাত ধরে তাকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করব আমি। আর ভোর বেলায় নিজের হাতে হত্যা করব তাকে। যাতে সে অন্য পুরুষের শরীর-শায়িনী না হতে পারে। উজির, এখন তোমার কাজ হলো প্রতি রাতে একটি করে কুমারী মেয়ে জোগাড় করে আনা। বাদশাহর হুকুমে তিনটি বছর ধরে প্রতি রাতে একটি করে মেয়ে জোগাড় করে আনতে থাকে উজির।

৮.

এবার তার কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তার মনে হলো, স্ত্রীর ব্যভিচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিদিন একজন তরুণীকে বিয়ে করা এবং সারারাত তাকে ভোগ করার পর হত্যা করা, এ কেমন নজির। স্ত্রীর ব্যভিচারের প্রতিশোধ নিতে স্ত্রীকে হত্যা করা কিংবা গভীর মনোবেদনায় হতাশায় স্বামীর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বহু। কিন্তু এমন ঘটনা তার কাছে উদ্ভট মনে হয়েছে। যদি এমন হতো বাদশাহ শাহরিয়ার দু-চারটে মেয়ের ওপর এমন জিঘাংসামূলক নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তা তো করেন না তিনি। টানা তিন বছর এই সীমাহীন অপরাধ করেছেন তিনি। আসলে কি তিনি স্ত্রীর ব্যভিচারের প্রতিশোধ নিয়েছেন, নাকি প্রতিদিন কম বয়সি সুন্দরী নারী সম্ভোগের এটি একটি অপকৌশল মাত্র। অন্য অর্থে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে জীবনকে উপভোগ্য করে তোলা। মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহরা তো সুন্দরী নারী সম্ভোগের নানা রাস্তা তৈরি করেছিলেন। হেরেমখানা ছিল তাদের, বাদী উপ-পত্নীর অভাব ছিল না। নারী ও সরাব ছিল তাদের রাজকীয় সৌন্দর্য। এই দুটি দিকের উন্মাদনায় অতিঘোরে তাদের পতনও হয়েছে। তারা তো বাদশাহ শাহরিয়ারের মতো গণহত্যাকারী ছিলেন না। সম্ভোগের পর অথবা কথার অবাধ্য হলে, কোনো কোনো নারীকে তারা হত্যা করেছেন, তবে পাইকারি হারে নয়। নাকি বাদশা শাহরিয়ার পৃথিবীতে একজন বিতর্কিত আলোচিত বাদশা হিসেবে মানুষের মুখে মুখে

কল্পনায় টিকে থাকার জন্য এই নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন করেছেন। নাকি বাদশা শাহরিয়ার বলে কেউ কখনো ছিল না, এটা কোনো কবির উর্বর মস্তিষ্কজাত কল্পকাহিনী।

বাদশা শাহরিয়ারের মনে তার ব্যভিচারী স্ত্রী সম্পর্কে তখন এই প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, এত রাজকীয় সম্মান এত প্রেম-ভালোবাসা পায়ে দলে কী করে সে কালো হাবসির মতো পর পুরুষের সাথে নষ্টামিতে লিপ্ত হতে পারল? বুকের ভেতরটা হু হু করে পুড়ে যাচ্ছিল তার। তার বেগমের কুসুম কোমল শরীর কীভাবে দখল করেছে ওই নিগ্রোটা, এটা ভাবতেও তার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে প্রথমে তিনি তার স্ত্রীকে হত্যা করেন, পরে সংশ্লিষ্ট অন্য সবাইকে। এর পর তিন বছর ধরে হত্যা করছেন রাজ্যের কোমলমতি মেয়েদের। আর এই মেয়ে সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন তার বিশ্বস্ত উজির। রাজ্যজুড়ে ভয়ানক আতঙ্ক। যাদের ঘরে উঠতি যৌবনবতী মেয়ে ছিল, তারা রাজ্য ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। আর যারা পালাতে পারল না, তারা বাদশার নারকীয় খেয়ালের অসহায় শিকার হলো। যে বাদশাহকে একদিন তারা প্রজাহিতৈষী ভাবতেন, এখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সবাই তার মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। কিন্তু বাদশাহর রোষ থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। পাহাড় পর্বতে পালিয়ে থাকা পিতার বুক থেকে তাদের আদরের মেয়েদের ছিনিয়ে আনা হয়। আর একাজের প্রধান সহযোগী উজির। কিন্তু উজির জানতেন না, তাঁর তার মেয়েদের দিকেই ছুটে আসছে। রাজ্যে মেয়ে যখন শেষ হয়ে যায়, তখন বিপদে পড়েন উজির। সারা দেশ চষে বেড়িয়েও একটা কুমারী মেয়ে জোগাড় করতে পারেন না। সারা দিন পথে-প্রান্তরে ঘুরে অবসন্ন ক্লান্ত দেহে ঘরে ফেরেন উজির। খালি হাতে বাদশার সামনে গেলে গর্দান নেবেন তার। নিজের প্রাণ কীভাবে বাঁচানো যায় সে চিন্তা করতে লাগলেন তিনি।

৯.

উজিরের দুই কন্যা। দুজনই পরমা সুন্দরী। রূপের চেয়ে গুণ আরও অনেক বেশি। রুচি, প্রকৃতি, বিদ্যা-বুদ্ধি, বিচক্ষণতায় তাদের জুড়ি নেই। বড় কন্যার নাম শাহারজাদ। আর ছোটটির নাম দুনিয়াজাদ। শাহারজাদ ইতিহাসে পণ্ডিত। সেকালের নবাব-বাদশাহদের কাহিনী, নানা দেশের বিচিত্র কিংবদন্তী তার ঠোঁটস্থ। হাজার হাজার গল্পগাথা পড়েছে সে। তার বিনম্র ব্যবহার, আর সুললিত কণ্ঠের গানে মুগ্ধ হয় সবাই। বাবাকে ওইভাবে বিষণ্ন, চিন্তিত দেখে বড় মেয়ে শাহারজাদ জিজ্ঞেস করে, আব্বাজান, তোমাকে আজ এমন চিন্তায় উদ্বিগ্ন দেখছি কেন? কী হয়েছে? কোনো বিপদ আপদ ঘটেছে কী? তুমি তো জানো, আব্বাজান, কবি বলেছেন- কোনো কিছুর জন্যই শোকে দুঃখে কাতর হয়ে ভেঙে পড়া উচিত নয়। কারণ, সুখ যেমন চিরদিন থাকে না তেমনি দুঃখও চিরস্থায়ী নয়। মেয়ের কথা শুনে একটু ভালো লাগে তার। বাদশাহর নৃশংস খামখেয়ালিপনার আদ্যোপান্ত সবকাহিনী বললেন, উজির। শাহারজাদ বলল, খোদা ভরসা, আব্বাজান, আজ রাতেই তুমি আমার শাদি করিয়ে দাও বাদশাহ শাহরিয়ারের সঙ্গে। আমি যদি সাচ্চা মুসলমানের মেয়ে হয়ে থাকি তবে বেঁচে থাকব। আর যদি মরতেই হয় তবে এমন কাজ করে মরব যাতে বাদশাহর ভয়ে কোনো মানুষকে দেশ ছেড়ে পালাতে না হয়। মেয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল, উজির, আল্লাহ তোমার ভালো করবেন, মা। এই বিপদের দিনে একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমার আসল পরিচয় কখনো ফাঁস করো না তার কাছে। শাহারজাদ বলল, তা আমি খুব ভালো করেই জানি, আব্বাজান।

নারী প্রতারক বিশ্বাসঘাতক ব্যভিচারী এসব যখন তার ভেতরে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিশোধপরায়ণতা যখন তীব্র হয় তখন বাদশা শাহরিয়ার প্রতিদিন একজন কুমারী নারীকে বিয়ে ও ভোগ করার পর হত্যা করে। তিন বছরে তিনি এক হাজার আশি জন নারীকে হত্যা করে। এভাবে বাদশার উল্লাস আর ভোগের পর হত্যার শিকার হয়ে রাজ্য কুমারী নারীশূন্য হয়ে পড়ে। যার শেষ শিকার হবে উজিরের বড় কন্যা শাহারজাদ। হাজার রজনীর গল্পে প্রথম দিকে তিনি যখন এই কাহিনী পাঠ করেন তখন তার মধ্যে এই ধারণার জন্ম নেয় যে পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশা-সম্রাট এত নারী ভোগ ও হত্যা করেননি, খোঁড়া অজুহাতে। এটা হতে পারে তার জ্বলন্ত ঘৃণাকে ঠাণ্ডা করার জন্য এই অদ্ভুত প্রতিশোধের পথ বেছে নেন বাদশা। তবে প্রতিশোধের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে কুমারীর শরীর ভোগের মাধ্যমে অপার আনন্দ লাভ করা। তার মনে হলো এই বই এক স্বপ্নের দুনিয়ায়। এর সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। এতদিন তিনি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, চারপাশের ঘটনা যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার সাথে এই বইয়ের গল্পের কোনো সাজুয্য নেই। তিনি কিছু গল্পের শিরোনাম দেখলেন। সিন্দবাদ ও দৈত্য, আলীবাবা ও চল্লিশ চোরের কাহিনী, একদিনের বাদশা শাহজাহান, গাধা বলদ আর গৃহস্বামীর উপাখ্যান, আলাদিনের চেরাগ, চিচিং ফাঁক, একচোখা দৈত্য এমন অনেক অদ্ভুত শিরোনামের গল্প রয়েছে। কোনো কোনো গল্পে দৈত্যের কাছে বন্দি রাজকুমারীকে উদ্ধারের ঘটনা রয়েছে, যা তাকে অন্য রকম চিন্তার জগতে নিয়ে যায়। সৌন্দর্যে ভরপুর এ গ্রন্থের শব্দের গাঁথুনি, বর্ণনা, প্রাঞ্জল উপস্থাপনা সত্যিই চমৎকার। এবার তার মনে পড়ছে দু-একটা গল্পের কাহিনী তিনি তার দাদার মুখে শুনেছিলেন। আলাদিনের চেরাগের মাধ্যমে দৈত্য হাসিল করা। দৈত্য এসে বলে, হুকুম করুন মালিক।

হাজার রজনীর গল্প বাদশা শাহরিয়ারকে কে শুনিয়েছিলেন, এটা তিনি এখনো জানেন না। গত রাতে বইটি বিচ্ছিন্নভাবে দেখেছেন তিনি। এই বইয়ের কারণে তার জীবনযাপন বদলে গেছে। বইয়ের চরিত্রগুলো তার চোখের সামনে ভাসছে। এইসব চরিত্র তার কাছে বাস্তব কি অবাস্তব সেটা এখন একেবারেই গৌন। বইয়ের চরিত্রগুলো তার মনকে এতটা স্পর্শ করবে, তা তিনি কখনো ভাবেননি। বইয়ের ভাষাও অত্যন্ত গতিশীল, যেন জাদুমাখা। এবার তিনি জানতে পারলেন গল্পগুলো উজির-কন্যা শাহারজাদ বাদশা শাহরিয়ারকে কে শুনিয়েছিলেন। যেহেতু সে ছিল গল্পের জাদুকর, তার পক্ষেই এসব গল্প বলা সঙ্গত। যে রাতে শাহারজাদ বাদশা শাহরিয়ারের মুখোমুখি হয়েছিল, তার মনে কোনো বাদশা-ভীতি কিংবা জীবনভীতি ছিল না। সে ছিল উচ্ছ্বাসপ্রবণ উল্লসিত। শাহারজাদ কারণে বাদশার খাস কামরা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আলো-আঁধারির মাঝে এক ধরনের আকর্ষণ ও মায়া ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে শাহারজাদের প্রতি অন্যরকম আকৃষ্ট হয়েছিলেন বাদশা। শাহারজাদ বাদশার উদ্দেশে বলেছিল, শাহানশাহে আলম, অনুমতি দিলে আপনাকে একটি গল্প শোনাতে পারি? শাহারজাদের কথায় অবাক হয়েছিল নিষ্ঠুর বাদশা। তার উপস্থাপন ধরন তাকে মুগ্ধ করেছিল।

উজিরের ধারণা, তার কন্যাকে তো পরের দিনই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কিন্তু কন্যার মাথায় তো ভিন্ন চিন্তা, বিয়ের রাতে শেহেরজাদী সুলতানকে একটি গল্প বলা শুরু করলেন, কিন্তু রাত পেরিয়ে ভোর হলেও গল্প শেষ হয় না, এদিকে সুলতান গল্পে মুগ্ধ হয়ে শেষ জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ফলে মৃত্যুদণ্ডের সময় পিছিয়ে যেতে থাকে। এভাবে প্রতি রাতে একটি করে গল্প বলা চলতে থাকে, প্রতিটি গল্প পরেরটির সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কিত যে, সুলতান কাহিনীর শেষাংশ জানার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এভাবে মাস, বছর পেরিয়ে হাজার রজনী অতিক্রান্ত হয়। যত দিন যায় সুলতান গল্পের সঙ্গে গভীরভাবে একাত্ম হতে থাকেন। ১০০০ তম রাতে শেষ হয় গল্প বলা। এর ফলে কষাই বাদশার হাত থেকে কেবল শাহারজাদই বেঁচে যায় না, অন্য কোনো কুমারী নারীকে বিয়ের পর হত্যার সুযোগ পায় না বাদশা। তার নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধপরায়ণ মানসিকতারও বদল ঘটতে থাকে।

১০.

এই বইটি তার মনোজগৎকে নাড়া দিয়েছে, সাড়া ফেলেছে। টক-জাল-মিষ্টির সমাহার রয়েছে এখানে। অদ্ভুত অদ্ভুত চরিত্র আর ঘটনা তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। তার কল্পনার জগৎকে বিস্তৃত করেছে। তবে বিপত্তিও দেখা দিয়েছে। তিনি যখন আকাশের দিকে তাকান, দেখতে পান বিশাল দৈত্য উড়ে আসছে, তারই কাছে। বলছে হুকুম করুন মালিক। তিনি দৈত্যকে বলছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে আমার সামনে হাজির করো। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, জগতের সবউজ্জ্বলতা আর আকর্ষণ নিয়ে মেয়েটি তাকে আহ্বান করছে আকাশে ওড়ার জন্য। এমন সুন্দরী মেয়ে বাদশা শাহরিয়ারও কোনো দিন দেখেননি। তিনি দৈত্যকে বললেন, আমার পুরনো বাড়িটি রাজপ্রাসাদ করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটি রাজপ্রাসাদ হয়ে গেল। তিনি যখন মহাঘোরের মধ্যে আছেন, তখনই একটি হাত তার কাঁধে এসে পড়ল। চেতনা ফিরে পেলেন তিনি। দেখতে পেলেন, লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে, যিনি তাকে বই দিয়েছিলেন। লোকটিকে তিনি বহুদিন গ্রামে দেখতে পাননি। এতদিন পর তিনি কোথা থেকে এলেন, সে প্রশ্নও তিনি করার সাহস পেলেন না। আজ লোকটিকে তার বাদশা শাহরিয়ার মনে হচ্ছে। আঞ্চলিক-শ্রুতি রয়েছে, তার প্রথম স্ত্রী নাকি ব্যভিচারী ছিলেন। এই কথা যখন তার কানে পৌঁছে, তখন তিনি সংসার ছেড়ে চলে যান। এ বিষয়ে স্ত্রীকে কিছুই বলেন না। কিংবা বাদশা শাহরিয়ারের মতো প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে হত্যাও করে না। তার সংসার ত্যাগের কারণে প্রথম স্ত্রী বিষ খেয়ে মারা গিয়েছে, এমন কথাও মানুষের মুখে শোনা যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি গ্রামে আসেন। বিষাদ আর নির্বাক যাতনার মধ্যে

তিনি বেশ ক'বছর কাটিয়ে দেন। পরে দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

লোকটাকে তার সবসময় রহস্য-মানবমনে হয়। তিনি এই আছে এই নেই। গ্রামের লোকজন বলে, ও তো পাগল, নিজে ঠিক নেই সংসার ঠিক নেই। খোলা মাঠে অথবা নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। অপলক তাকিয়ে থাকেন ঘন সবুজে ঘেরা বাগান এবং উঁচু গাছগুলোর দিকেও, যেখানে প্রকৃতির উদার বিস্তার। এমনও তো হতে পারে লোকটা তার মতোই প্রকৃতি-পাগল। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যাওয়া, আকাশ ও প্রকৃতির খেয়াল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা, ঘাসে বেড়ে ওঠা দেখা নিজের বেড়ে ওঠার কথা স্মরণে আসা, পৃথিবীর তাবত সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ভাবা, তার কিনার খুঁজে না পাওয়া- এসববিষয় হয়তো লোকটার মাথার মধ্যে সবসময় কাজ করে। আর এ কারণেই গ্রামের লোকজন তাকে পাগল বলে। তার মনে হলো লোকটা দেশের একজন বড় লেখক দার্শনিক হতে পারতেন, হয়তো পরিবেশ সুযোগ কোনোটাই তার পক্ষে ছিল না।

তিনি ভেবেছিলেন লোকটা তার কাছে বইটি ফেরত চাইবেন, অথবা জিজ্ঞেস করবেন বইয়ের গল্পগুলো তার ভালো লেগেছে কিনা। ভালো লেগে থাকলে কোন গল্পটা তাকে বেশি আকৃষ্ট আমোদিত করেছে। না লোকটা তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। লোকটা তার প্রতি রুষ্টভাবাপন্ন কিংবা গভীরভাবে সন্তুষ্ট তাও তার মনোভাবে বোঝা গেল না। লোকটা তার দিকে স্নেহময় বৃক্ষছায়ার দৃষ্টিতে তাকালেন, যেখানে শ্রাবণের বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে আশীর্বাদ। তার ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিছু একটা বলতে চেয়েও বললেন না তিনি। হয়তো তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে বইটি যাকে দেওয়া হয়েছে তিনি তা পাঠ করেছেন এবং তার মনোজগতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। লোকটা আবার তার কাঁধে হাত রাখলেন, দ্রুত হাত নামিয়েও ফেললেন। তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

লোকটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরও তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। জন্মের পর থেকে তাকে দেখছেন তিনি। দাদার কাছে আসতেন, গ্রামের শেষপ্রান্তে তার বাড়ি। ওই বাড়িতে তিনি দু'চারবার গিয়েছেন। বাড়িটাও যেন কেমন রহস্যময়, ঠিক লোকটার মতো। দাদার সঙ্গে নানাভাবে গল্পে মেতে উঠতেন লোকটা। দুজনের মধ্যে ভাববিনিময়ের ধরন ছিল অন্যরকম। দাদাকে ওই লোকটাই প্রথম দৈত্যের গল্প বলেন।

হাজার রজনীর গল্প বইয়ের দৈত্যের গল্পটি তিনি গ্রামের এক মুন্সিকে বলেছিলেন। মুন্সি তাকে বলেছিলেন, তিনি যদি তার স্বপ্ন পূরণ করতে চান তবে মুন্সি তাকে সে কৌশল শিখিয়ে দেবেন। হুকুম করলে দৈত্য যা যা করত জিনও তাই করবে। মুন্সির কথায় অবাক হন তিনি। বর্তমান দুনিয়ায় দৈত্য-কাহিনী আছে নাকি। মুন্সি তাকে বলেন, সাতদিন যদি তিনি গভীর রাতে তার শেখানো বিশেষ কিছু শব্দ আওড়াতে থাকেন, তবে ঠিক সাতদিন পর জিন এসে টিনের চালে আওয়াজ তুলবে। জিন হাসেল করতে পারলে তার ভাগ্য খুলে যাবে আলাদিনের মতো। তবে এ কাজের জন্য মুন্সিকে কিছু টাকা দিতে হবে। লোভ না সম্মোহনী জাদু তাকে পেয়ে বসল, তা তিনি বলতে পারবেন না। মুন্সির কথায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন। এ কাজের জন্য মুন্সিকে তিনি টাকাও দিলেন। জিন হাসেল করার জন্য তাকে দুইশো শব্দ মুখস্থ করতে হলো। গ্রামের লোকজন অবাক হয়ে দেখল যে মুন্সির সঙ্গে তিনি নদীর তীর ঘেঁষে হাঁটছেন। হঠাৎ মুন্সির সঙ্গে তার ভাব এবং দুজনে নির্জনতা বেছে নিয়ে সময় কাটানো, দুজনেই ফিস ফিস করে কথা বলা গভীর রহস্যের জন্ম দেয়। মুন্সি তাকে বলেছিলেন, শব্দগুলো শেখানোর জন্য নির্জন জায়গা প্রয়োজন।

কোনো মুন্সির সঙ্গে নদীর তীর ঘেঁষে হাঁটা এবং তার সঙ্গে কথোপকথন এই প্রথম। এটা তার জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। মুন্সি তার দিকে তাকিয়ে হাসে, আঙুল বুলায় পাতলা তুলোর মতো দাড়িতে। মুন্সি তাকে প্রথম পাঠ দেয়। যে শব্দ তাকে মুখস্ত করতে বলা হয়েছে, এই ধরনের শব্দের সঙ্গে তিনি পরিচিত নন। তবে শব্দগুলোর মধ্যে আকর্ষণ রয়েছে। এই ধরনের শব্দ ভালোভাবে আওড়াতে পারলে, জিন কেন যে কাউকে মোহাবিষ্ট করা সম্ভব। শব্দগুলো ভালোভাবে মুখস্ত করতে তার সাতদিন লেগে যায়। এবার তিনি মুন্সিকে শোনায়। তার শ্রুতিমধুর উচ্চারণ শুনে অবাক হন মুন্সি। তিনি নিজেও এভাবে সুমিষ্ট উচ্চারণ পারেন না। এবার মিশন সফল হওয়ার পালা। গভীর রাতে দুই শোবার পাঠ করতে হবে। জিন এসে টিনের চালে টোকা না দেওয়া পর্যন্ত পাঠ করতে হবে। মুন্সির কথা শুনে তার ভেতর অদ্ভুত এক শিহরণ জাগল। জিন হাসিল করে তিনি বিশেষ কিছুই পেতে চান না। তিনি কেবল প্রত্যক্ষ করতে চান, দৈত্যের মতো তার কথা শোনে কিনা। তিনি অর্থ-সম্পদ-ক্ষমতা-নারী চান না। তিনি জিনকে বলবেন, আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি এনে দাও, চোখের সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাবে এখনই। পৃথিবীর সবসবুজ তার সামনে হাজির হবে, যত সুগন্ধি আছে তার নাকে এসে লাগবে। তিনি মাতোয়ারা হবেন। বাদশা শাহরিয়ার যতজন কুমারী নারীতে হত্যা করেছেন, তাদের মুখের কথা শুনতে চান তিনি। উজিরকন্যা শাহারজাদ যে ভঙ্গিতে বাদশাহকে গল্প শুনিয়েছেন, ওই দৃশ্য দেখতে চান তিনি। এমন অজস্র কল্পনা ও ইচ্ছা তার সামনে ভেসে উঠল। তার সামনে চিন্তার শত দরোজা খুলে গেল।

মুন্সি তাকে বলেছেন, আজ অমাবস্যার কাল। অমাবস্যা মানেই গভীর অন্ধকার। আর এই অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে জিনেরা পৃথিবীতে নেমে আসে। মিশে যায় নিকষ কালো প্রগাঢ় অন্ধকারের সঙ্গে। যারা তাদের বিশেষ মন্ত্রের মাধ্যমে হাসিল করেছেন, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবেন তারা। গভীর রাতে অন্ধকার যখন পৃথিবীর সঙ্গে একাকার হয়ে গভীর মিতালী পাতাতে শুরু করবে। গাছপালা ঘরবাড়ি মগ্ন চরাচর যখন দৃশ্যমান হবে না, পৃথিবী যখন ধ্যানমগ্ন হবে বোধিবৃক্ষের তলায় বুদ্ধের মতো। ঠিক তখনই নিজেকেও ধ্যানমগ্ন করতে হবে বিশেষ মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে। মুন্সির কথাকে নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। আজ অমাবস্যার রাত। পৃথিবীতে নানা ধরনের ঘটনার জন্ম দেয় এই রাত। এই রাত সবচেয়ে রহস্যময় শিহরণ জাগানিয়া। অন্ধকার শরীরকে ডাকে, প্রলোভনকে ডাকে, রক্তকে ডাকে। স্বপ্নকে ডেকে স্বপ্নখেকো বানিয়ে দেয়।

সন্ধ্যার পর তিনি নদী থেকে গোছল করে এলেন। যাতায়াতের সময় তিনি বিশেষ মন্ত্র আবার পাঠ করলেন, ধ্যানমগ্ন হওয়ার সময় যাতে ভুল না হয়। মুন্সি বলেছেন, একবার ভুল হলে জিন হাসিল তো হবেই না, উপরন্তু হিতেবিপরীত হতে পারে। এই কাজে যেমন স্বপ্ন ছোঁয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, আবার জীবনঝুঁকিও একেবারে কম নয়। বিশেষ মন্ত্র পাঠে ভুল হলে, জিন তাকে আকাশে তুলে নিয়ে যাবে, উড়িয়ে দেবে মেঘের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, যেখান থেকে তিনি আর কোনোদিনও ফিরে আসতে পারবেন না। তার ভেতর ভয় ও শিহরণ দুটোই কাজ করতে লাগল। এই মহৎকর্ম সম্পাদনের জন্য যখন তিনি পথে নেমেছেন, এর শেষ দেখে ছাড়বেন। ঝুঁকিপূর্ণ অসাধারণ কাজ করতে হলে বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়ার প্রশ্ন চলে আসে। এই প্রশ্ন তার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। সন্ধ্যার পর গোছল করার জন্য নদীতে যখন ডুব দেন তিনি, পানির ভেতর থেকে কে যেন ভরাট কণ্ঠে বলছে- হুকুম করুন মালিক। প্রথমে তার কানে বাড়ি খেয়ে শব্দতরঙ্গ হয়ে আকাশে ভাসছে, পৌঁছে যাচ্ছে আলাদিন অথবা সিন্দবাদের কাছে। তিনি যতবারই ডুব দেন ততবারই একই ধরনের আওয়াজ শুনতে পান। ঘোর বিস্ময় ভীতি সমান্তরালভাবে তার ভেতর কাজ করতে লাগল।

গোছল সেরে পবিত্র হয়ে গভীর রাতে তিনি ধ্যানে মগ্ন হলেন। শতভাগ নিবিষ্টতা নিয়ে বিশেষ শব্দগুলো বারবার পাঠ করতে লাগলেন। তার কেবলই মনে হলো, এই বুঝি জিন এসে ঘরের চালে টোকা মারছে এবং তাকে বাইরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করছে। তার আজকের রাত যেভাবে কাটল, লৌকিক-অলৌকিক মিশ্র দ্যোতনার মধ্যে, এভাবে



কখনো কাটেনি। কখন যে ভোর হয়ে গেছে টের পাননি তিনি। রাত-ঘোর কাটতে সময় লাগল তার। এবার তার মনে হলো বুদ্ধ কেন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। ঋষি কেন ধ্যান করতে গভীর বনে চলে যায়। ধ্যানের মহিমাই আলাদা। যিনি ধ্যান করেন কেবল তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন, এই জীবন কেমন উপভোগ্য। এ এক অভ্যন্তরীণ মুগ্ধ পৃথিবী। তার এও মনে হলো, একজন মানুষ কেবল ধ্যানের মাধ্যমে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। জীবনের এই স্তর না ইহজাগতিক না পারলৌকিক। তিনি ধ্যানরত অবস্থায় যে সবশব্দ পাঠ করছেন এবং নিজেকে যতটা মগ্ন রেখেছেন, তাতে তার মনে হলো তিনি এই বদ্ধ ঘরে তো দূরের কথা পৃথিবীতেই নেই। জিন তাকে নিয়ে আকাশে ভাসছে, চাঁদ তারার সঙ্গে মিতালী করছে, নিয়ে গেছে কোনো আলোকিত প্রাসাদে। যেখানে হীরা মুক্তা মণি মাণিক্য রাজকুমারী কোনোটার অভাব নেই। এমন রাজকীয় আলোঝলমল স্থান তিনি জীবনেও দেখেননি। তাকে দেখে সবাই হেসে উঠছে। তিনি এও অনুভবকরলেন, তার শরীর পেজা তুলার মতো হালকা বাতাসে উড়ছে তো উড়ছেই। রাজকুমারী তাকে উষ্ণ আহ্বান করছে তার বিশেষ কামরায় যাওয়ার জন্য। চারদিন থেকে যে সুবাস উঠছে, যে সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে তিনি মাতোয়ারা হয়ে গেলেন। আজ তার কানে যে সুর লহরী বাজছে, এমন মাধুর্যময় সুরঝংকার এর আগে তিনি কখনো শোনেননি। তার মন আজ উড়ে বেড়াচ্ছে অনন্তলোকে। ঘরের কোণের কী একটা শব্দে তার ধ্যান ভেঙে গেল। নিজের মধ্যে মনোযোগ বাড়িয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন তিনি। তার বিশেষ শব্দগুচ্ছ পাঠ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। এখন যা তার মধ্যে কাজ করছে তা নিছক ঘোর, বলা যেতে পারে অতি-ঘোর। ঘোরাক্রান্ত মানুষ অবচেতনে অনেক কিছুই করতে পারে, যা সে কখনোই কল্পনা করেনি। বিশেষ শব্দগুচ্ছ পাঠ এবং ধ্যানমগ্ন হওয়ার আজ অষ্টম দিন, কই ঘরের চালে জিন এসে তো টোকা দিল না। নাকি তার মনোযোগ নিবিড়তা কম ছিল। অথবা তিনি কোনো ভুল করেছেন। এই ধরনের নানা প্রশ্ন তার মনের মধ্যে?ঘুরপাক খেতে লাগল। মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এখনই বাড়ির সবাই জেগে উঠবে। তার মনে হলো স্বপ্নপূরণের কাছাকাছি এসে তিনি হোঁচট খেয়েছেন, কোনো এক অজানা কারণে। এই শক্তিশালী কারণ চিহ্নিত করা তার পক্ষে সম্ভবহয়ে উঠল না। তিনি ছোটবেলা থেকে জেনেছেন, শ্রম-সাধনা কখনো বিফলে যায় না। শক্তির মতো অবিনাশী, রূপান্তর ঘটে মাত্র।

১১.

নবম দিনের মতো তিনি গভীর রাতে আত্মমগ্ন হলেন। মুন্সি তাকে বলেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত ঘরের চালে টোকা না পড়বেততদিন এই বিশেষ কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে বাড়তি চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল। প্রথম যে চিন্তা তার মাথায় এবং তাকে বেসামাল করে তুলল। এভাবেযদি তিনি একমাস কাজটা চালিয়ে যান বিশেষ গুরুত্বের সাথে একান্ত নিবিড়ভাবে, তার পরেও যদি ঘরের চালে টোকা না পড়ে, তা হলে তার সাধনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবেএবং তিনি গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হবেন। অনেক সময় বাড়তি কৌতূহল অতিরিক্ত লোভ মানুষের জীবনে বিপদ ডেকে আনে, জীবন বিপন্ন হয়ে যায়। বুদ্ধির অপরিপক্কতা ও অতি আবেগের কারণে এটা হয়ে থাকে। আজ ধ্যানস্ত হওয়ার আগে তার মনে হচ্ছে, ওইসববিষয় পরিপূর্ণভাবেতার ভেতর রয়েছে। হাজার রজনীর গল্প পড়া থেকে এ পর্যন্ত তিনি যা ভেবেছেন ও করেছেন, এটা তার আগের জীবনের সঙ্গে সাজুয্য নয়। গভীর কোনো প্রলোভন তাকে এ পথে নিয়ে এসেছে এবং তার চিন্তার স্বাধীনতা বিনষ্ট করেছে। তিনি আগে নদীর তীরে হেঁটে গাছপালা প্রকৃতির দিকে বিমুগ্ধচিত্তে তাকিয়ে যা ভাবতেন, ওই জগৎ ছিল অনেক সমৃদ্ধ। সে জায়গা থেকে কী করে তিনি ছিটকে পড়লেন, তা তিনি আজ ভেবে পাচ্ছেন না। যার নিজস্ব বিবেচনাবোধ আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি নেই, তাকে তো যে কেউ যে কোনোদিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, নিয়ে যেতে পারে বিপদসংকুল দিকে, যেখানে মরণ অনিবার্য। আরও একটা বিষয় তিনি ভাবছেন। গভীর রাতে জিন যখন ঘরের চালে টোকা দেবে, ওই টোকাটা কেমন হবে? অই টোকার শব্দ কতটা জোরে হবে, তাতে বাড়ির সবাই জেগে উঠবেকিনা। অথবা চোর এসেছে ডাকাত এসেছে বলে বাড়ির লোকজন চিৎকার করে গ্রামবাসীকে জাগিয়ে তুলবেকিনা। টোকার শব্দতরঙ্গ ধ্বনির মাত্রা যদি বেশি হয় তা হলে বাড়ির লোকজনের চিৎকার করার আগেই ঘটে যাবেভয়ংকর ঘটনা। কারণ জিন বলে কথা। যাকে হুকুম করলে পৃথিবীর সবভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাবে, তার টোকা তো আর সাধারণ টোকা হতে পারে না। আজকের রাত তার কাছে ভেজা ভেজা মায়াবী মনে হচ্ছে। বাইরের পরিবেশ বেশ শরীরসহায়ক আরামপ্রদ। পৃথিবীব্যাপী প্রবল জোছনার ঢল নামার কথা রয়েছে। বিকেলে তার পাশ ঘেঁষে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তি এমনটাই উচ্চারণ করেছিলেন। লোকটি এও বলেছিলেন, গ্রাম ঘুমিয়ে পড়লে তিনি নাকি গভীর রাতে জোছনা-গোছল করবেন। কথাটা তার মনে ধরেছিল। লোকটার মধ্যে রুচি আর নান্দনিকতার আবেশ রয়েছে। তবেতাকে তিনি কখনো দেখেননি। হয়তো তিনি দূর গ্রামে বাস করেন। বেড়াতে কিংবা পারিবারিক কাজে এখানে এসেছেন। আজ ধ্যানমগ্ন হওয়ার আগে চারদিকে তাকালেন তিনি। ঘর ততটা অন্ধকার নয়, ঘরের ফাঁক গলে বাইরে থেকে আলো আসার চেষ্টা করছে। এমন পরিবেশে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন, বাইরে জোছনার প্রাবল্য রয়েছে। আজ কততম রাত তার বিশেষ শব্দ পাঠের, হিসাব নেই তাও।

তিনি শুনেছেন, চাঁদের গ্রহণকালে পৃথিবীতে কিছু একটা ঘটে। একইভাবেঅমাবস্যার সময়ও পৃথিবীতে নানা ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এই দুই গ্রহণকাল অনেককিছুর নিয়ন্তা। ভরা জোছনা রাত স্মরণে এলেই তার মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তবেকি আজ পৃথিবীতে নতুন কিছু ঘটবে, ঘটবেতার জীবনে। তিনি মনে করেন যে জীবন তার নয়, সে জীবন সম্পর্কে কতটুকুই বা জানেন। অনুমান-নির্ভর হয়ে তো সবকিছু নিশ্চিত হওয়া যায় না। বাস্তবতাও এটাকে সমর্থন করে না। অথচ তিনি যা করছেন, ভাবছেন, হাসেল করতে চাচ্ছেন তা কোন কাতারে পড়ে, এটাও তিনি ভেবেপান না।

তবেএকটা বিষয় তিনি নিশ্চিত হতে পারলেন, অন্যান্য রাতের চেয়ে আজ তার মনোযোগটা একটু বেশি। হিসাবমাফিক তার হতাশ হবার কথা। মুন্সি তাকে দু'ধরনের কথা শুনিয়েছিলেন। একবার বলেছিলেন, সাত দিনের মধ্যে তিনি জিন হাসিল করতে পারবেন। আবার বলেছিলেন যতদিন পর্যন্ত জিন এসে ঘরের চালে টোকা না দেবে, ততদিন পর্যন্ত তার এই বিশেষ মন্ত্র পাঠে বিরতি দেওয়া চলবেনা। মুন্সি তাকে যা-ই বলুক না কেন, এতদিনে তার হতাশ হয়ে পড়ার কথা। হতাশ না হয়ে উপরন্তু তিনি চাঙা হলেন। শরীরজুড়ে ভিন্ন ধরনের শিহরণ খেলা করছে, যেন তিনি প্রেমে পড়েছেন। কোনো সুন্দরীর প্রেমে না পড়ে তিনি প্রবল জোছনার প্রেমেও পড়তে পারেন। আবিষ্টতা মোহমুগ্ধতা মায়া ভালোবাসা জন্মাতে পারে মানবীর বাইরেও।

তিনি যখন গভীরভাবেআত্মমগ্ন, যার মধ্যে কোনো ফাঁক-ফাঁকি নেই, দরদ ও মনোযোগ রয়েছে শতভাগ। ঠিক তখনই তিনি ঘরের চালে শব্দ শুনতে পেলেন, একবার নয় বারবার। যেন গোপনে কেউ তাকে ডাকছে বাইরে আসার জন্য। এই আহ্বানের মধ্যে আকর্ষণ রয়েছে।

অতি সন্তর্পণে তিনি দরজা খুলে বাইরে এলেন। বাইরে এসে তার দুচোখে রাজ্যের বিস্ময়, প্রকৃত অর্থেই আজ পৃথিবীজুড়ে জোছনার ঢল নেমেছে। চাঁদ যেন লোকালয়ে নেমে এসেছে তার সমস্ত আভিজাত্য আর আলো নিয়ে। আলো ঠিকরে পড়েছে গাছের পাতায় সবুজ মাঠে। সমস্ত চরাচর আজ মুগ্ধ। এমন এক আবেশের মধ্যে তিনি যখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তখন তিনি বিভ্রমের জালে আবদ্ধ হলেন। কী কারণে গভীর রাতে তিনি বাইরে এসেছেন, ভুলে গেলেন তাও। তার ভেতরে হিল্লোল বয়ে গেল। আনন্দে মাতোয়ারা মন যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল। তার গান গাইতে ইচ্ছে হলো। এমন জোছনার প্লাবন তিনি বহু বছর উপভোগ করেননি। দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করতে গিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। এবার তার একটু একটু করে মনে পড়ছে, কী কারণে তিনি বাইরে এসেছেন। জিন তাকে আহ্বান করেছে বাইরে আসার জন্য। কিন্তু দূরে কাছে কোথাও তিনি জিনের আলামত টের পেলেন না। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, জিন তার সামনে হাজির হয় কিনা। নিশ্চয়ই জিন এসে দৈত্যের মতো বলবে, হুকুম করুন মালিক। তার আগ্রহ ও অপেক্ষা অধীর হয়ে উঠল। এক ধরনের অস্থিরতা তার ভেতর কাজ করতে লাগল। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। তার সরল প্রশ্ন যদি জিন না আসে তবে ঘরের চালে টোকা দিয়ে তাকে আহ্বান করল কে? টোকার শব্দ পেয়েই তো তিনি বাইরে এলেন। নাকি জিন তার সঙ্গে তামাশা করছে, লুকিয়ে আছে কোনো গাছের আড়ালে। এমন ধারণা যখন তার মধ্যে জন্ম নিল, তখন তিনি চারদিক ভালোভাবেপ্রত্যক্ষ করলেন। না কোথাও জিনের দেখা মিলল না। রাতের বাতাসে সবুজ পাতা নড়ে উঠল। জোছনার যে আলাদা ঘ্রাণ ও আবেদন রয়েছে তা তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন। আজ তার শরীর মনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে জোছনা ও রাতের প্রকৃতি। তার মনে হলো জিন নয়, এটাই তার জীবনে প্রকৃত সত্য। যে সত্যের পথ বেয়ে অনেক দূর যাওয়া যাবে অনেকদিন পর প্রবল জোছনার ঢল দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি, এটা যেমন সত্য, একইভাবে

জিনের দেখা না পেয়ে হয়েছিলেন আহত ও হতাশ। তার এখন কী করণীয় তা তিনি বুঝতে পারছেন না। ওই রাতে কখন তিনি ঘরে ফিরেছিলেন, বলতে পারবেন না। রাতের বাকি সময় তার ঘুম হয়নি। চোখ বন্ধ করলে তার চোখের সামনে দৈত্য কিংবা জিন নয়, ভেসে ওঠে জোছনাঘেরা মায়াবী প্রকৃতি, তার উদার আকর্ষণ। সকালে ঘুম ঘুম চোখ আর রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে নদীর তীরে এলেন। কতদিন তিনি নদীর তীরে এসেছেন সে হিসাব নেই। গ্রামের নির্জন ছায়াঢাকা পথে এবং নদীর তীরঘেঁষে হাঁটতে তার ভীষণ ভালো লাগে। কিন্তু আজ এই চিরচেনা পরিবেশ তার কাছে বড় অচেনা লাগছে। কে যেন সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। কী কারণে ভোরেই তিনি নদীর পাড়ে এলেন? তিনি কি কাউকে খুঁজতে এসেছেন জরুরি প্রয়োজনে। নাকি বরাবরের মতো অপার মুগ্ধতা তাকে টেনে এনেছে তার প্রিয় জায়গাটিতে। এক জায়গায় স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন তিনি। আকর্ষিত দৃষ্টিতে তাকালেন নদীর দিকে। এবার তার মনে পড়ল, কী কারণে তিনি এখানে এসেছেন। তিনি আসলে মুন্সিকে খুঁজতে এসেছিলেন। মুন্সিকে তিনি বহুদিন একা একা নদীর তীরঘেঁষে হাঁটতে দেখেছেন। তার সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা এখান থেকেই। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও মুন্সি নেই। বেলা বেড়ে গেছে, এখন তার আসার সম্ভাবনাও নেই। মুন্সিকে তিনি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন জিন নাকি আপনি টোকা দিয়েছিলেন ঘরের চালে? সকালবেলা মুন্সিকে না পাওয়াকে প্রশ্নটা তার ভেতরই ঘুরপাক খেতে লাগল। মুন্সি কী বলবেন, সে ধারণাও তার ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুন্সি খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলবেন, শব্দ পাঠে বিশেষ মনোযোগ ছিল না। নিশ্চয় পাঠের সময় কোনো শব্দ ছুটে গেছে। না হলে জিন আসবেনা কেন। আজ তার মনে আরও একটি প্রশ্ন উদয় হলো এবং এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে বোকা সেজে গেল। এই প্রশ্ন তার মনে আগে জাগেনি কেন? বিশেষ শব্দ পাঠের মাধ্যমে যদি জিন হাসিল করা যায়, মালিক হওয়া যায় বিপুল ধন-সম্পদের, তবে এই কাজটি মুন্সি করছেন না কেন? তার জানামতে মুন্সি ঠিক মতো সংসার চালাতে পারেন না। তিনি কী করে জিনের মাধ্যমে অন্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করবেন?

১২.

নদীর পাড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। দৃষ্টি রাখলেন চারপাশে, যতদূর রাখা যায়। কোথাও তিনি মুন্সিকে দেখতে পেলেন না। তিনি ভাবলেন, মুন্সিকে পেলেই বা কী হবে। হয়তো প্রথমে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবে, পরে হয়তো হাতাহাতিও হতে পারে। এর ফলে নদীর পাড় দিয়ে চলাচলকারী মানুষ জড়ো হবে। তার মধ্যে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ মানুষই হয়তো বেশি থাকবে। তারা অতিশয় কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করবে কী কারণে তার মতো ভালো মানুষ, আরেক ভালো মানুষ মুন্সির সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। তখন মানুষের কৌতূহল গিয়ে পড়বে লক্ষ্যবস্তুতে। তারা মূলে যেতে চাইবে। তারা যখন জানতে পারবে প্রকৃত ঘটনা, তখন হয়তো বা কারও কারও মনে বিস্ময়ের জন্ম দেবে। তাই তিনি মুন্সিকে খুঁজে বের করার আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। তার দৃষ্টি এখন দূরবর্তী গ্রামের দিকে। ওই গ্রামে তিনি কখনো যাননি। তবে ওই গ্রাম নিয়ে নানা গল্প চালু রয়েছে। কেউ বলে ওটা চোরদের গ্রাম, কেউ বলে ওটা ভূতের গ্রাম। রাতের বেলা ভূতেরা বের হয়ে নাকি নদীতে মাছ খেতে আসে। এ সবকথা ভেবে তার মনে প্রশ্ন জাগল, দূরগ্রামে কি দৈত্য কিংবা জিন থাকে? তারা কি রাতের বেলা বের হয়। তারা কি কারও ইচ্ছা স্বপ্ন পূরণ করে। নদীর পাড়জুড়ে কেমন মেছো গন্ধ, যা আগে কখনো ছিল না। গন্ধটা তীব্র হয়ে তার নাকে লাগছে। হয়তো গত রাতে ভূত নদী থেকে অনেক মাছ খেয়েছে। তারই উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কী সবউদ্ভট চিন্তা করছেন তিনি। জিন হাসেল করতে না পেরে কি তার মাথা খারাপ হয়ে গেল? নদী থেকে উঠে আসা প্রশান্তির শীতল বাতাস তার শরীর জুড়িয়ে দিল। জলের দিকে তাকালেন তিনি। হেমন্তের এই সময় জল বেশ শান্ত নীরব থাকে। জলের উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হলে, জলের রূপ বদলে যায়। তিনি খেয়াল করলেন, দূরে কোথাও জল নড়ছে, চারপাশে ঢেউয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। কী কারণে এমনটি হচ্ছে, তা তিনি জানেন না। হয়তো কোনো মাছ লাফ দিয়েছে, রাতের বেলা ভূতের তাড়া খেয়েছিল মাছটি। তালগোল পাকানো চিন্তার মধ্যে পূর্বদিকে তাকিয়ে তিনি অবাক হলেন। ওই লোকটা, যিনি তাকে বই দিয়েছিলেন, তিনি এদিকে আসছেন। বহুদিন তার সঙ্গে দেখা নেই। জিন হাসিল নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তার কথা তিনি প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। লোকটাকে দেখামাত্র তিনি মুন্সির কথা ভুলে গেলেন। তিনি ধীরগতিতে তার কাছে এলেন। মুখে আগের মতোই রহস্যপূর্ণ হাসি। তার চোখের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে আরেক চোখ। আগের মতোই দাঁত কেলিয়ে হাসলেন। তার হাতে একটি বই। বইটি তার হাতে দিয়ে বললেন, দৈত্য আর জিন নিয়ে তো বেশ কিছুদিন ব্যস্ত ছিলে। এবার এই বইটি নিয়ে পড়া শুরু করো, নতুন কিছু পাবে। আমি জানি তুমি নতুনের প্রত্যাশী, পূজারী। লোকটার কথা শুনে তার মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা। তিনি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন নাকি অন্য কোনো ভৌতিক জায়গায় বুঝতে পারছেন না। তিনি কোনোভাবেই নিশ্চিত হতে পারছেন না, কীভাবে লোকটা জিন হাসিলের বিষয়টি জানতে পারলেন। দৈত্যের বিষয়টি তিনি জানতেই পারেন। কারণ যে বইটি তিনি দিয়েছিলেন, অই বইতে দৈত্যসংক্রান্ত অনেক কথা রয়েছে এবং লোকটা এ সবনিশ্চয়ই জানেন। বইটি পড়ে এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেই তিনি হয়তো তাকে দিয়েছিলেন। এবার তিনি বুঝতে পারছেন মুন্সি লোকটাকে রসিয়ে রসিয়ে জিনসংক্রান্ত ঘটনা বলেছেন। তার ধারণা, এই ঘটনা মুন্সি আরও অনেককেই বলেছেন। এই ধারণা তার ভেতর বদ্ধমূল হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি যখন রাস্তায় বের হন, তখন কেউ কেউ তার দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কী যেন বলতে চান তাকে। তারাও লোকটার মতো দাঁত কেলিয়ে হাসে। আগে তাদের আচরণ এমন ছিল না। মুন্সি ও লোকটার মধ্যে একটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। লোকটা তাকে বইটি দেওয়ার পর এ বিষয়ে কারও সাথে কোনো কথা বলেননি। এর প্রমাণ তিনি পাননি। আর মুন্সি জিন হাসিলসংক্রান্ত বিষয়ে তার কাছ থেকে টাকাও নিয়েছে আবার মুখরোচক ও রাহস্যিক কায়দায় ঘটনাটি প্রচারও করেছেন। লোকটা সম্পর্কে তার চাচা আর মুন্সি তার প্রতিবেশী। লোকটা বইটি দিয়ে আগের মতোই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বইটি হাতে করে তিনি নদীর পাড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। এই বইটি হাজার রজনীর গল্পের মতো মলিন ছেঁড়া নয়। এর আগে কেউ পাঠ করেছে তেমনও মনে হচ্ছে না। বইয়ের মধ্যে অন্যরকম ঘ্রাণ রয়েছে। তার মনে হলো তিনি যখন জিন হাসিলের জন্য ধ্যানে ছিলেন, তখন জিন মুন্সির হাতে না দিয়ে লোকটার হাতে বইটি দিয়েছে, তাকে দেওয়ার জন্য। ছোট হোক আর বড় হোক এটা তার জন্য সান্ত্বনা পুরস্কার। কারণ তিনি জিনকে পাওয়ার জন্য অনেক রাত সাধনা করেছেন। এই সাধনার পুরস্কার তো তিনি পেতেই পারেন, তা যার মাধ্যমেই হোক।



১৩.

যে লোকটা তার দূর সম্পর্কের চাচা তিনি অত্র এলাকায় খান সাহেব নামে পরিচিত। গ্রামের লোকে বলে তিনি নাকি খুব দূরদর্শী চিন্তাশীল বুদ্ধিমান। উচ্চশিক্ষা নিয়ে তিনি অনায়াসে সরকারের বড় পদে যেতে পারতেন। তিনি নাকি এক সময় এলাকার কোনো মুখরোচক কাহিনী নিয়ে কবিতা লিখতেন। ওই কবিতা অনেকটা পুঁথির আদলে পেত। ওই পুঁথি তিনি গল্পের আসরে পাঠ করে শোনাতেন। তার পুঁথি পাঠ শুনে এলাকার মানুষ মোহিত হয়ে যেত। তার কণ্ঠ অত্যন্ত সুললিত মাধুর্যপূর্ণ। তিনি নাকি গান গাইতেন, বাঁশিও বাজাতেন। বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী তিনি। এ কথার সত্যতা পাওয়া যায় তার বেশভূষা ও আচরণে। তার লম্বা চুল-দাড়ি, সবসময় পাঞ্জাবি পরে থাকেন। কথা বলেন গুছিয়ে। তিনি যখন গল্পের আসরে কবিতার ঢং-এ পুঁথি পাঠ করতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতাদের অনুরোধে

গানও গাইতেন। বিমুগ্ধ শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনতেন। এভাবে ধীরে ধীরে গ্রামে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে কাল হয় তার বাঁশি। নিস্তব্ধ রাতে তিনি গ্রামের শেষ প্রান্তে, নদীর পাড়ে যে জামগাছটি, ওখানে বসে তিনি বাঁশিতে সুর তুলতেন। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি বাঁশি বাজাতেন। বাঁশিতে সুর তোলার সঙ্গে সঙ্গে, গ্রামের লোক জানত, তার অবস্থান এখন কোথায়। এমন মন আকুল করা সম্মোহনীপূর্ণ সুর, তারা এর আগে কবে শুনেছে কিংবা আদৌ শুনেছে কিনা স্মরণ করতে পারছে না। অনেকের জন্য ঘুম পাড়ানি মাসী-পিসির ভূমিকা পালন করত এই বাঁশি। অবশেষে তিনি বাঁশি বাজানো ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন কবিতা লেখা গান ও কবিতাকারে পুঁথি পাঠও। তিনি চলে যান দূর গ্রামে, ফিরেও আসেন কিছুদিন পর। গ্রামে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন নির্জন কোনো জায়গায় অথবা নদীর পাড়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবেন। তার এ ভাবনার আগামাথা গ্রামের লোকজন বুঝতে পারে না। তাদের কারও কারও ধারণা পরীবানুর আত্মহত্যার সঙ্গে তার সব সৃষ্টিশীল কাজ থেমে যাওয়ার একটা সম্পর্ক রয়েছে।

খান সাহেবের এমন পরিবর্তন গ্রামের কেউ মেনে নিতে পারেনি। অনেকেই তাকে সরাসরি প্রশ্ন করেন। কিন্তু এর কোনো সঠিক উত্তর পায় না। কেন তার তাবত সৃষ্টিশীল কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, তার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেন না। খান সাহেব ঘণ্টা পর ঘণ্টা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই নদীই নাকি পরীবানুকে কেড়ে নিয়েছে। আর এর জন্য তিনিই দায়ী। পরীবানু তাকে কিছুই দেয়নি, আবার সবকিছুই দিয়েছে, অন্তত তিনি তাই মনে করেন। মানুষের জীবনে যা যা প্রাপ্তি তার সবই সুখের ও মাধুর্যময় নয়। কোনো কোনো ঘটনা তার জীবনে বড় ধরনের অভিজ্ঞতা ও অভিঘাতের কাছে নিয়ে যায়। জীবনে গভীর অনিরাময় ক্ষত হয়ে থাকে। পরীবানুকে কেন্দ্র করে তার জীবন অত্যন্ত করুণভাবে আবর্তিত হয়েছিল।

খান সাহেব যখন নানা ধরনের সৃষ্টিশীল কাজ করতেন এবং মানুষের খ্যাতি কুড়িয়েছেন, তখন তিনি বয়সে তরুণ বিয়ে করেননি। রাতের বেলা নদীর ধারে গাছের নিচে বসে বাঁশি বাজানোর ঝোঁকটা অনেক বেশি ছিল। বাঁশি বাজানোর মাঝে তিনি নিজেকে খুঁজে পেতেন। সম্ভবত এই কারণে আত্মমগ্নতা ছিল বেশি। তার বাঁশির সুর অনেকেই হয়তো পছন্দ করত, তবে আত্মহারা হয়েছিল একজনই। কেবল আত্মহারা নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি যে হারিয়ে ফেলেছিল, সে পরীবানু।

রাতের বেলা বাঁশির সুর যখন ঘন হয়ে আসত তখন পরীবানুর মন উতলা হতো। অন্য এক ধরনের শব্দে মগ্নতা ভাঙে খান সাহেবের। তিনি যারপরনাই বিস্মিত হন। রাতের বেলা নদীর পাড়ে পরীবানু তার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? পরীবানু তার হাত ধরে বলছে, বাঁশিওয়ালা তোমারে চাই আমি।

পরীবানুর কথা শুনে খান সাহেবের বাঁশি থেমে যায়। ও যে এ ধরনের কোনো কিছু বলবে, তা তিনি আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারছিলেন। আজ চতুর্থ দিন ও তার কাছে এসেছে। খান সাহেব তাকে বারণ করেছিলেন, এত রাতে তার কাছে আসা ঠিক নয়। গ্রামের কেউ দেখলে কেলেংকারি হয়ে যাবে। কে শোনে কার কথা। পরীবানু তার কথায় ও সিদ্ধান্তে অনড়। সে তাকে চায়, এটাই তার শেষ কথা। কেমন পুরুষ তুমি, মেয়ে মানুষের মন বুঝতে পারো না। যেখানে পারো আমারে নিয়া যাও। খান সাহেবজানেন এটা তার আবেগের কথা, হয়তো এর সঙ্গে ভালোবাসাও আছে। কিন্তু চাইলেই তিনি তাকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে নিয়ে যেতে পারেন না, তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও নয়। তার এটাও মনে হলো, অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল তার বাঁশির টানেই সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। সে রাতে পরীবানু তার হাত ধরে মিনতি করেছিল। গভীর রাতে এমন দৃশ্যের অবতারণা হবে এটা ছিল তার ধারণার বাইরে। তিনি কোনো কথা বললেন না। কারণ পরীবানুর এই কথার উত্তর তার জানা নেই।

১৪.

গ্রামের লোক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে, খান সাহেবের বাঁশি আর বাজে না। যিনি নিয়মিত বাঁশি বাজান ঝড়-বৃষ্টি-শীত উপেক্ষা করে, কী কারণে তার বাঁশি থেমে গেল। বাঁশি থেমে যাওয়া মানে অনেক কিছু থেমে যাওয়া। বাঁশির সুর যাদের আনন্দ দিত, মনে যাদের সুখ এনে দিত, অন্যরকম প্রশান্তি খেলা করত, তারা বড় ধরনের হোঁচট খেলো। আর যারা বাঁশির সুরে মোহাবিষ্ট হয়েছিল, হয়েছিল প্রেমাসক্ত তাদের মনোজগতে বইছে সমুদ্রের ঢেউ। বাঁশি আবার না বাজা পর্যন্ত এই ঢেউ থামবেনা। বাঁশি থেমে যাওয়া মানে রাতের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। বাঁশি রাতকে অন্যরকম মাদকতা দিয়েছে। বাঁশি যেন আনন্দ-বেদনার কাব্য। সেই বাঁশি আজ থেমে গেছে।

অনেকদিন গ্রামের মানুষ খান সাহেবকে এলাকায় দেখতে পায় না। যে মানুষ টানা দশ বছর বাঁশি বাজিয়েছেন, সেই বাঁশি থেমে যাওয়া মানে জীবন থেমে যাওয়া। এলাকার মানুষ খান সাহেবকে অনুরোধ করবে, তিনি যেন আবার বাঁশি বাজান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিনি তার মামার বাড়িতে গিয়েছেন এবং অচিরেই ফিরবেন। কারণ আগামী মাসে তার বিয়ে। যতদিন তিনি বাঁশি বাজিয়েছেন, ততদিন বিয়েতে রাজি হননি। যেই বাঁশি থেমে গেল, তখনই তিনি বিয়েতে রাজি হলেন, এ ধরনের একটা গল্প গ্রামে চালু হয়ে গেল।

যে রাতে খান সাহেবনববধূকে নিয়ে বাসর রাতে যান, অই রাতে নাকি খাঁ বাড়ি থেকে গ্রামের লোকজন বাঁশির শব্দ পেয়েছিল। বাসর রাতে নববধূর সামনে কেউ বাঁশি বাজায়, এমন উদ্ভট কথা কেউ কখনও শোনেনি। কারও কারও ধারণা নববধূ তার বাঁশির খুবভক্ত, তার অনুরোধেই তিনি বাজিয়েছেন।

অই রাতে বাঁশির সুর শুনে পরীবানু খাঁ বাড়ির আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ বাঁশি বেজেছে ততক্ষণই সে দাঁড়িয়েছিল। বাঁশি থেমে যাওয়ার পর সে অই জায়গায় আসে, যেখানে খান সাহেব নিয়মিত বাঁশি বাজাতেন, নদীর পাড়ে। সেখানে নাকি সে ফজরের আজানের আগ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণ কেঁদেছে সে। তারপর ভোর হওয়ার আগে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে।

খান সাহেবতাকে দ্বিতীয় যে বইটি দিয়েছিলেন, ওই বইয়ের ব্যাপারে তার আগ্রহ কম ছিল। এর প্রধান কারণ হলো, প্রথম বইটি দেওয়ার পর তার জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। জীবনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। তিনি জিন হাসিলের মতো কাজে জড়িয়ে পড়েন। তাই তিনি দ্বিতীয় বইটি তার পড়ার টেবিলে লুকিয়ে রাখেন। বেশ কদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার মনে হলো বইটি উল্টিয়ে দেখা দরকার। এটা আবার কোনো হাজার রজনীর গল্প। বইটি দেখতে আকর্ষণীয়, প্রথম বইয়ের মতো নয়। বইটির নাম তার ভালো লাগল। মোঘল হেরেমের নারীরা। মোঘল হেরেম সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। তবে এটা তিনি বুঝতে পারছেন, এই বইটিও বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুল। এই বইয়ের শুরুতেও দীর্ঘ একটি ভূমিকা রয়েছে। তিনি ভূমিকাটি পড়লেন। তাতে রয়েছে বিচিত্র সবতথ্য, যা পাঠের পর মোঘল হেরেম সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

১৫.

নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। সাধারণ মানুষের অনুপ্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে হারেম বা হেরেম সব যুগেই মানুষের কাছে ছিল এবং আছে অতীব আগ্রহের জায়গা হিসেবে বিবেচিত হয়ে। কেউ বলেন এটি তুর্কি শব্দ আবার কারও মতে, হারেম শব্দটি এসেছে আরবি 'হারীম' থেকে যার অর্থ নিষিদ্ধ বা অলঙ্ঘনীয় সীমারেখা; এটি হলো মহিলাদের জন্য নির্ধারিত পবিত্র স্থান যেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। তুর্কি সাম্রাজ্যেই হারেমের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় যা পরবর্তী সময়ে মুঘল সম্রাটদের মাধ্যমে উপমহাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব স্থান লাভ করে। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে বাবরের জয়ের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। মুঘল সম্রাটরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্ক-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত। মুঘল সাম্রাজ্য এমনিতেই পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ফলে হিন্দুস্তানে তাদের আগমন সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতেই অজস্র উপাদান যোগ করে। সুদীর্ঘ শাসনামলে মুঘলরা শুধু সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্যই নিয়ন্ত্রণ করেনি, হিন্দুস্তানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক সব ক্ষেত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মুঘল হারেম তেমনি এক সংযোজন। হারেমের উল্লেখ প্রায় সব রাজপরিবারের ভেতরেই পাওয়া যায়। এটি সেই স্থান যেখানে বসবাসের জন্য কেবল মাহরামের (ইসলামি পরিভাষায় মাহরাম দ্বারা বোঝায়, যাদের বিবাহ করা হারাম) প্রবেশাধিকার আছে। হারেমে সম্রাটদের একাধিক স্ত্রীরা তো থাকতই, আরও থাকত উপপত্নী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, আত্মীয়া এবং দাসীরা। অর্থাৎ হারেমে সবাই যে রাজরক্তের ছিল না তা স্পষ্ট। তখনকার সময়ে সম্রাট বা রাজার অনেক পত্নী আর উপপত্নী থাকবে এটাই স্বাভাবিক ছিল। নিজেদের দাস-দাসী আর পত্নীদের সম্রাট নিজের ইচ্ছেনুযায়ী ব্যবহার করবেন সেটাও অবাক করার মতো ব্যাপার ছিল না। হারেমে তাই সর্বাধিক গুরুত্ব পেত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। অন্তঃপুরের একাংশে থাকত বাদ্যযন্ত্র এবং হাতি, ঘোড়া ও রথের সাজসজ্জা। এগুলোর বিশেষ প্রয়োজন পড়ত পুরন-রীদের ভ্রমণের সময়ে। সম্রাটের বিনোদনের জন্য হারেমে প্রায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রাখা হতো। তাই সম্রাটের আত্মীয়-পরিজনের পাশাপাশি থাকত

সংগীতশিল্পী আর নৃত্যশিল্পীরাও। মাঝেমধ্যেই বসত নৃত্যগীতের আসর। পৃথিবীর সবযুদ্ধবাজ সম্রাটদের বিরুদ্ধে যে সবঅপবাদ শোনা যায় তার ভেতরে উল্লেখযোগ্য হলো যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বিভিন্ন প্রদেশ কিংবা অঞ্চল থেকে নানান ধর্ম ও বর্ণের মেয়ে এনে নিজেদের হারেমে রাখা। মুঘল হারেমেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কখনো কখনো নাকি হারেমে মেয়েদের সংখ্যা ৭-৮ হাজার ছাড়িয়ে যেত। বাদশাহ আকবরের হারেমেই নাকি প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি বেগম ও সেবিকা ছিল! সম্রাজ্ঞী, রাজকন্যা কিংবা সম্রাটের রক্ষিতারা সকলে নাকি প্রায় একভাবেই সাজগোজ করত। বেণি করে আটকে রাখা চুল, ঝলমলে পোশাক আর মণিমুক্তার অলংকারে চারপাশ আলোকিত করে রাখত তারা। সবার বুড়ো আঙুলে ছোট্ট আয়না বসানো আংটিও পরা থাকত যার মধ্যদিয়ে তারা নাকি নিজেদের প্রতিবিম্বের দিকে দিনভর চেয়ে থাকত!

১৬.

বইয়ের ভূমিকা পড়ে একইসঙ্গে তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। মোঘল সম্রাট শাহজাহানের কথা তিনি শুনেছেন। কোনো এক বইয়ে মোঘল স্থাপত্যের কথাও শুনেছেন তিনি। শাহজাহান মমতাজের ভালোবাসার নিদর্শন তাজমহল দুনিয়াজুড়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। সারা বিশ্বের পর্যটকরা তাজমহল দেখার জন্য ভিড় জমায়। কবি লিখেছেন কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল তাজমহল। আগ্রার যমুনার তীরকে আলোকিত করে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা ত্যাগ মহিমার কথা উঠলেই মানুষ তাজমহলের উদাহরণ দেন। তার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। মোঘল হেরেমে বহু নারী বেষ্টিত ছিলেন তিনি। দাসী বাদী রক্ষিতা গাণিমাতের মাল কত কী। একাধিক স্ত্রীও ছিলেন তার। এতে কি প্রমাণিত হয় তিনি মমতাজকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আর সেই ভালোবাসার নিদর্শন তাজমহল। একজন বহুগামী বহুরূপী সম্রাট কি একজনের ভালোবাসায় থিতু একনিষ্ঠ হতে পারে। তা ছাড়া মমতাজ তার প্রথম স্ত্রী নন। তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন। মধ্যযুগের রাজা বাদশা সম্রাটরা সরাবনারী নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতেন। তারা প্রচণ্ড রকমের ক্ষমতালিপ্সু ছিলেন। ক্ষমতার জন্য বাবা ভাইকে বন্দি ও হত্যা করতে কোনো রকম দ্বিধা করতেন না। এই ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় ঘটিয়ে তিনি বিশ্বপ্রেমিক সেজে গেলেন। আসলে মমতাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা নয়, বিশ্বের বুকে ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি এটা করেছে। এটা সম্রাট হিসেবেতার উপর চালাকি। রাত গভীর হলে দ্বিতীয় দিনও তার বইটি পড়তে ইচ্ছা করল। এই ইচ্ছাটা অদম্য, অনেকটা হাজার রজনীর গল্প পড়ার মতোই। মোঘল হেরেমের গল্পটি তার বেশ ভালোই লাগছে। হারেমের ভেতরে বাইরে লাগানো হতো জীবন্তী, শ্বেতা মুষ্কক ও বন্দক লতার গাছ। ওই লতা তুলে দেওয়া হতো পেজাত ও অশ্বত্থগাছের ডালে। এ সবগাছ চেনা তো দূরের কথা, নামও আমাদের অনেকের হয়তো জানা নেই। অথচ এ সবলতা ও গাছের জন্য নাকি বিষধর সাপ ভেতরে ঢুকতে পারত না। আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পোষা হতো বিড়াল, ময়ূর, বেজি ও চিত্রল হরিণ। এ সবপ্রাণী সাপ দেখলে আক্রমণ করত, তারপর খেয়েও ফেলত। হারেমের ভেতরে সাপের বিষ নির্ণয় করার জন্য পোষা হতো টিয়া, সারিকা ও ভৃঙ্গরাজ পাখি। সাপের বিষের গন্ধ পেলেই এ সবপাখি ছটফট শুরু করত। খাদ্যে বিষ নির্ণয়ের জন্য আরও পোষা হতো ক্রৌঞ্চ, জীবঞ্জ-জীবক, মত্ত কোকিল ও চকোর পাখি। আশপাশে বিষ থাকলে নানারকম প্রতিক্রিয়া হতো এ সবপাখির মধ্যে। ক্রৌঞ্চ মূর্ছা যেত, জীবঞ্জ-জীবক অবসন্ন হয়ে পড়ত, মত্ত কোকিল মারা যেত, আর রক্তবর্ণ ধারণ করত চকোরের চোখ। বস্তুত সেকালের শাসকরা বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে আতঙ্কিত থাকতেন সবসময়। হারেমের অভ্যন্তরে 'বেগানা' পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বলে হারেম-রমণীদের শল্যচিকিৎসার ভারও ছিল নারীদেরই ওপর। এদের বলা হতো, 'জারাহ'। তবে রোগীদের অবস্থা যখন জারাহদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেত, তখন বাধ্য হয়েই পুরুষ হাকিমদের ডেকে পাঠাতে হতো বেগমখানায়। তাদের হারেমে নিয়ে যাওয়ার ঝক্কিও কম ছিল না। বেগমের জন্য নির্ধারিত খোঁজার কঠিন পাহারায় আপাদমস্তক কাশ্মীরি শালে মুড়ে অন্ধের মতো তাকে ভেতরে নেওয়া হতো। কেউ তার চেহারা দেখত না, তিনিও কাউকে দেখতে পেতেন না। ভেতরে প্রবেশের পরেও শাহী নিয়ম অনুযায়ী, বাতচিৎ করা যেত না সরাসরি বেগমের সাথে।


www.nrcbank.com.bd
এনসিসি ব্যাংক
হোম লোন
স্বপ্ন হোক বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা
বাকি দায়িত্ব থাক আমাদের কাছে।
এনসিসি ব্যাংক

মুঘল পুরুষরা তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারতবর্ষকে শাসন করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, তারা যেভাবেশাসনের উত্তাপ ছড়িয়েছে, তেমনি মুঘল হারেমের নারীরাও ছিলেন দারুন অগ্রসর, কেউ কেউ নিজেদের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন বাদশাহ বা শাহজাদার বিকল্প নীতিনির্ধারকও। বইটি পড়তে পড়তে তিনি ঘুমিয়ে যান। মুহূর্তে চলে যান স্বপ্নের জগতে। সম্রাটের পোশাকে আবৃত তিনি। তার চারপাশে সুন্দরী নারী, সম্রাজ্ঞী সুবাস ছড়াচ্ছে। কেউ হাসছে, কেউ তার সেবা করছে। কেউ বা পায়ে নূপুরের ঝংকার তুলছে। দুজন নারী তাকে সরাব তুলে দিচ্ছে। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, গুলবদন বেগম, সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল, নাদিরা বেগম তাকে আহ্বান করছেন। তিনি ঘুমের মধ্যে রি রি করে ওঠেন। এক সময় তার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি হাজার রজনীর গল্প পাঠের সময়ও একসঙ্গে এত নারী দেখেননি। তিনি বইটি আবার হাতে নেন। কী কারণে অন্ধকারের ভেতর বইটি হাতে নিলেন তা তিনি জানেন না। যে সবঅভিজাত নারীকে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন তাদেরই হয়তো বইয়ের পাতায় খুঁজছেন তিনি।

১৭.

মুঘল হেরেমের যে সবনারী সুবিখ্যাত হয়ে আছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাবর-কন্যা গুলবদন বেগম, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, শাহজাহান-পত্নী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল, দারাশিকোর স্ত্রী নাদিরা বেগম, আওরঙ্গজেবকন্যা জেবুন্নেসা, শাহজাহান-কন্যা রওশন আরা, শাহজাহান দুহিতা জাহানারা এবং বাহাদুর শাহ জাফরের স্ত্রী জিনাত মহল। বিশেষত, নূরজাহান বা 'জগতের আলো' নামে খ্যাত এই মুঘল রমণী কেবল ভারতবর্ষ বা মুঘল ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসেরই এক বিস্ময়কর নারী ব্যক্তিত্ব। স্বরচিত কাব্যপাঠ বা 'মুশায়েরা' তার সময় থেকেই উপমহাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নূরজাহানেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকাই মসলিনের একটি নতুন ধরন ও নকশা প্রবর্তন করা হয়, যাকে বলা হতো 'আবে রাওয়াঁ' বা 'জলের ইন্দ্রজাল'। নূরজাহানের আগমনের পর জাহাঙ্গীরের বহুনারীবিশিষ্ট হারেমে একক স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য প্রথার প্রচলন হয়। তিনিই প্রজাদের মনে রাজা-রানীর যৌথ ভূমিকার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক সৃষ্টি করেন। কাচ্চি বিরিয়ানির প্রবর্তনকারীও এই নূরজাহান। বিবাহবার্ষিকীতে অভ্যাগত অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য মৃগনাভি সুরভিত জাফরানি কাচ্চি বিরিয়ানি পরিবেশন করেন তিনি।

সূর্য উঠি উঠি করছে। ভোরের বাতাস প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে তার শরীরে। নদীর তীরঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন খান সাহেব। প্রায় জনশূন্য নদীর তীর। দূরে দু'একজনকে দেখা যাচ্ছে। আজ নদীতে কোনো নৌকাও দেখা যাচ্ছে না। শৌখিন মাছ-শিকারির দেখাও নেই। নিস্তরঙ্গ জলের দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছেন তিনি। তিনি কি জলের স্বচ্ছতা পরিমাপ করছেন, নাকি অন্য কিছু। তার মনে কোনো চঞ্চলতা নেই, শিরা-উপশিরা যেন স্থবির হয়ে গেছে। পরীবানু এই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অদৃশ্য হওয়ার আগে পরীবানু তার হাত ধরে মিনতি করেছিল। তখন তিনি বুঝতে পারেননি, পরীবানু এমন কঠিন ও বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। রাতের বেলা পরীবানু নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই নদীর জল তাকে আহ্বান করেছিল, তার সঙ্গে মিতালি করে একাকার হয়ে যাওয়ার জন্য। সেদিন জলের আহ্বান ও আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারেনি সে। তাই জলে ঝাঁপ দিয়ে তার জীবনের এক চরম ও ব্যর্থ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল। তার স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনী ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার যে

বেদনাভার তা আজ বহন করতে হচ্ছে খান সাহেবকে। অপ্রাপ্তির কারণে মানুষের জীবন কত তুচ্ছ হয়ে যায়। ভালোবাসার সঙ্গে গভীর আবেগ তার জীবনে ভর করেছিল। যার কারণে তার জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি হলো। আজ জীবনকে জীবন মনকে মন আর ভালোবাসাকে ভালোবাসা দিয়ে উপলব্ধি করতে চান খান সাহেব। অদৃশ্যকে অদৃশ্য দিয়ে কি তিনি উপলব্ধি করবেন? যদি তাই করেন, তা হলে পরীবানুর মতো তাকেও জলের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। পরীবানু যে পথে গিয়েছে সে পথে তার যাওয়া উচিত। কারণ আজ তার মনে হচ্ছে পরীবানুর অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। তবে তার মনে আজ শান্তি নেই স্বস্তি নেই। তার মন আজ আকাশের অসীমে জলের গভীরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আজ আকাশ তাকে ডাকছে জল তাকে আকর্ষণ করছে। বলছে তুমি দাঁড়িয়ে না থেকে পরী-বানুর কাছে চলে যাও। তাতে সুখ পাবে। জীবনের প্রশান্তি ওখানেই।

ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। গত রাতের সুখময় স্মৃতি তার দেহমনের প্রচণ্ড প্রফুল্লতায় ভরে রেখেছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিত্যকার কাজগুলো সারলেন। পোশাক পরিবর্তন করে প্রাসাদের পূর্ব বেদিতে গিয়ে আকাশ পানে তাকালেন। তারপর জমিনের দিকে। আকাশে সূর্য উঠেছে। মৃদু বাতাসের সঙ্গে ভোরের পাখ-পাখালির ডাকাডাকি এবং প্রাসাদ চত্বর থেকে দুর্গের সিংহদ্বার পর্যন্ত হাজারো মানুষের ব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যে অদ্ভুত এক শক্তি অনুভবকরলেন। প্রথমে নিজের দিকে তাকালেন। গভীরভাবে নিজেকে অবলোকন করার চেষ্টা করলেন। ভারী অদ্ভুত তো তিনি। তার শরীরের বেশির ভাগ অংশেই তো দেখতে পাচ্ছেন না। অনেক আয়নার সাহায্য ছাড়া যে মানুষ নিজের শরীরটি দেখতে পায় না, সে মানুষের পক্ষে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কতটুকু দেখা সম্ভব? কিংবা কতটুকুই জানা সম্ভব! এই এককিত্বে অনুভব করলেন, তার ক্ষমতা, বৈভব, চিন্তা-চেতনা। অর্থাৎ সবকিছুরই একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মানুষের সীমাবদ্ধতা দেখানোর জন্য কিংবা বোঝানোর জন্যই হয়তো বা আল্লাহ মানবশরীরের মাধ্যমেই মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বাদশাহ আবার আকাশের দিকে তাকালেন জোরে জোরে নিশ্বাস নিলেন আবার ত্যাগ করলেন। নাক দিয়ে প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়া এবং মুখ দিয়ে ছাড়ার মাধ্যমে দেহমনে যে গতির সঞ্চার হয়, তা বাদশাহর জানা ছিল। এরপর তিনি আরাম করে বসলেন। চোখ বন্ধ করে ধ্যান শুরু করলেন। মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা দিয়ে আজকের সকালের অনুভূতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার মুহাফেজখানার দলিল-দস্তাবেজ পড়ে জোরে জোরে কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। জীবন-জীবিকা, রাজ্য ও রাজত্ব নিয়ে ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে পড়লেন। আনমনে সম্রাট তার খাস কামরার পর্দার দিকে তাকালেন। বাতাসে পর্দাগুলো কাঁপছিল এবং মাঝেমধ্যে উল্টে গিয়ে বাইরের দৃশ্য কামরার মধ্যের মানুষটির মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। তিনি ভাবতে থাকলেন, কেনই বা পারস্য রাজ শাহ আব্বাস তার একজন উর্ধ্বতন সেনাপতিকে গুপ্তচর করে আগ্রায় পাঠালেন। আবার কেনই বা সেই সেনাপতি ছদ্মবেশে সরাসরি তার সামনে পড়ে কৌতূহলদীপ্ত শব্দমালা উচ্চারণ করল। তার নবপরিণীতা স্ত্রী কেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন, নূরমহলের পিতা মির্জা গিয়াস বেগ এক সময় পারস্য রাজদরবারে চাকরি করতেন। তবেকি নূরমহলের সঙ্গে পারস্য রাজের কোনো সংযোগ। চিন্তাজগতের এ পর্যায়ে এসে সম্রাট ক্ষান্ত হলেন। কারণ চিন্তার একটি সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত। অযাচিত চিন্তা মানুষকে সর্বদা বিপথে চালিত করে। কাজেই চিন্তা না করে বাস্তবসম্মতভাবে ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার যেহেতু সুযোগ রয়েছে, যেহেতু সম্রাট বিষয়টি ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করতে চাইলেন।

নূরজাহানের প্রেম ও তার সাহসিকতার অনেক কাহিনী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। মুঘল প্রাসাদের অন্দরমহলে তার রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে অনেক কাহিনী রয়েছে। নূরজাহান ছিলেন একজন কবি, দক্ষ শিকারি এবং খুবই সৃজনশীল এক স্থপতি। আগ্রায় তার তৈরি নকশাতেই নির্মাণ করা হয়েছিল তার বাবা-মায়ের সমাধিসৌধ। কথিত আছে পরবর্তী সময়ে এই স্থাপত্য রীতি মেনেই নাকি তাজমহলের স্থাপত্য নকশার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এই মুঘল সম্রাজ্ঞীর পিতৃদত্ত নাম ছিল মেহেরুন্নিসা। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৫৭৭ সালের ৩১ মে। একজন বলিষ্ঠ, সম্মোহনী ও উচ্চশিক্ষিত নারী হওয়ায় তাকে ১৭০০ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী ভাবা হয়। মেহেরের বাবা ছিলেন গিয়াস বেগ। গিয়াস বেগ স্ত্রীকে নিয়ে তেহেরান থেকে ভাগ্যের সন্ধানে হিন্দুস্তান এসেছিলেন। তখন পথের মধ্যেই নির্জন মরুপ্রান্তে এক বাবলাগাছের তলায় জন্ম হয় মেহেরুন্নিসার। এই সময় গিয়াস বেগ ও তার পত্নী এমন দুর্দশায় পড়েছিলেন যে মেয়েকে বাঁচানোর কোনো উপায় না পেয়ে পথের মধ্যেই শিশু মেয়েকে শুইয়ে রেখে রওনা হন। আশা ছিল, কোনো সহৃদয় ব্যক্তি যদি তাকে পেয়ে আশ্রয় দেয় তবে শিশুটি প্রাণে বেঁচে যাবে। কিছুদূর যাওয়ার পরই শিশুকন্যার কান্না শুনে তারা আর থাকতে পারলেন না। ফিরে এসে মেয়েকে বুকে চেপে সহায়-সম্বলহীন গিয়াস বেগ এসে পৌঁছালেন লাহোরে। কাজ জুটিয়ে নেন মুঘল রাজদরবারে। পরবর্তী কালে মেয়ে মেহেরের স্থান হলো হেরেমে। নূরজাহান ছিলেন সম্রাটের বিশতম স্ত্রী অন্যদিকে নূরজাহানের দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। ১৭ বছর বয়সে মেহেরুন্নিসার বিয়ে দেওয়া হয় মুঘল বাহিনীতে কর্মরত ইরানি সমরনায়েক শের আফগান আলী কুলি খান ইসতাজলুর সঙ্গে। এরপর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় সুদূর বর্ধমানে। জাহাঙ্গীর সম্রাট হওয়ার কিছুদিন পরে শের আফগানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ও বিদ্রোহমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলা হয়। জাহাঙ্গীর প্রচণ্ড চেষ্টা করেন শের আফগানকে মেরে ফেলার। কয়েকবার চেষ্টা করেও অবশ্য সফল হননি তিনি। শের আফগান ছিলেন ভীষণ শক্তিশালী ব্যক্তি। ফলে শের আফগানের কাছের মানুষের সাহায্য নেন জাহাঙ্গীর। এভাবে সম্রাটের বাহিনীর হাতে নিহত হন শের আফগান। এককালের প্রণয়িনীকে পাওয়ার জন্যই শের আফগানকে হত্যা করেন জাহাঙ্গীর। তিনি জাহাঙ্গীরের বিশতম পত্নী হলেও সবচেয়ে প্রিয়তম স্ত্রীতেও পরিণত হন নিজগুণে। সেই সময়ের মুঘল রাজদরবারের রেকর্ডে খুবকম নারীর কথাই উল্লেখ আছে। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথায় ১৬১৪ সালের পর থেকে তার সঙ্গে নূরজাহানের বিশেষ সম্পর্কের উল্লেখ আছে অনেকবার। তিনি নূরজাহানের এক অনুরাগময় চিত্রই এঁকেছেন তাতে। নূরজাহান সেখানে বর্ণিত হয়েছেন একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী, চমৎকার সেবাদাত্রী, বিজ্ঞ পরামর্শদাতা, দক্ষ শিকারি, বিচক্ষণ কূটনীতিক এবং শিল্পবোদ্ধা হিসেবে। মুঘলদের পুরুষশাসিত জগতে নূরজাহান ছিলেন এক অসাধারণ নারী। কোনো রাজকীয় পরিবার থেকে তিনি না এলেও সম্রাটের হেরেমে তার উত্থান ঘটে এক দূরদর্শী রাজনীতিক হিসেবে। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য আসলে তিনি ও সম্রাট জাহাঙ্গীর মিলে একসঙ্গেই শাসন করতেন।

নূরজাহান ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রণয়ঘটিত নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে উপমহাদেশজুড়ে। তরুণী নূরজাহান বা মেহেরুন্নিসাকে দেখেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন শাহজাদা সেলিম বা জাহাঙ্গীর। কিন্তু একজন রাজকর্মচারীর মেয়ে হওয়ায় সম্রাট আকবর এ সম্পর্ক মেনে নেননি। তিনি তড়িঘড়ি করে অন্য এক সেনাকর্মীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেন সুদূর বর্ধমানে। ১৬০৭ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর নূরজাহান ও তার মেয়ে লাডলি বেগমকে আগ্রায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে মুঘল হেরেমের কর্ত্রী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সৎ মা এবং সম্রাট আকবরের প্রধান স্ত্রী রুকাইয়া বেগমের সেবায় তিনি নিয়োজিত হন। মরহুম স্বামীর জীবদ্দশায় তৈরি রাজনৈতিক শত্রুদের থেকে নিরাপত্তার জন্য নূরজাহান নিজেই মুঘল দরবারের আশ্রয় প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তার স্বামী রাজদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এবং তার কন্যা মুঘল দরবারে যথেষ্ট সম্মানজনক অবস্থান লাভ করেন। এদিকে নূরজাহানের প্রতি জাহাঙ্গীরের আকর্ষণ যে অনেক আগে থেকেই ছিল, যা তখনো যায়নি। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ছয় বছর চলছে। ১৬১১ সালের ২১ মে সন্ধ্যায় শাহী মহলের মীনা বাজারে বর্ষবরণের উৎসবনওরোজ দেখতে বের হন সম্রাট। এখানেই এক পোশাকের দোকানে দেখে এত বছর পরেও মেহেরুন্নিসাকে চিনতে একটুও অসুবিধা হয়নি তার। তৎক্ষণাৎ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন জাহাঙ্গীর। সেই মাসেরই ২৫ তারিখে, আরবি ১২ রবিউল আউয়াল ১০২০ হিজরি তারিখে মেহেরুন্নিসাকে বিয়ে করে মহলে নিয়ে আসেন জাহাঙ্গীর। নতুন স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়েই হয়তো তার নাম দেন 'নূরমহল' (মহলের আলো)। বিয়ের পাঁচ বছর পর, ১৬১৬ সালে এই নাম পরিবর্তন করে সম্রাট স্ত্রীর নাম দেন 'নূরজাহান' (জগতের আলো)। শুধু একটি মহলই নয়, মেহেরুন্নিসার কীর্তি ও মহিমা মহল ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে। তাই 'নূরমহল' নামটিতে তাকে সীমাবদ্ধ করা যায়নি।

খাস কামরায় ফিরে শাহেনশাহ তার মুহাফেজখানার রাজনৈতিক ইতিহাস সংরক্ষণকারী মুন্সিকে খবর পাঠালেন- পারস্য ও ভারতবর্ষের কূটনৈতিক সম্পর্কের দলিলপত্র হাজির করার জন্য। হুকুম তামিল হওয়ার পর সম্রাট ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে যা জানলেন, তা ছিল এক কথায় সুদূর পারস্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক- প্রায় সাড়ে

চার হাজার বছর; কিন্তু সরকারি নথিতে প্রথম দলিল সংরক্ষণ হয়ে আসছে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনামল থেকে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী চাণক্য পণ্ডিত সুন্দরভাবেসবকিছু লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রতিটি ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে দলিলের পাতায় পাতায় নড়াচড়া করছে। ঘটনাটি শুরু হয়েছে মহাবীর আলেকজান্ডারের মৃত্যুর অব্যবহিত পর। অর্থাৎ ভারত থেকে ফেরার পথে তিনি যখন বসরায় মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন তার বিজিত রাজ্যসমূহের সেনাপতিরা রাজ্যগুলো ভাগ করে নিলেন। এশিয়ার রাজ্যসমূহের মালিক হলেন সেনাপতি সেলুকাস। ভারতবর্ষে তখন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। সময়টা ছিল ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দ থেকে ৩১৬ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম ভারত, অর্থাৎ আজকের পাঞ্জাব, সিন্ধু, দাহরান এবং মাকরান অঞ্চলের দিকে মনোনিবেশ করেন। বিভিন্ন যুদ্ধে গ্রিকবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় আশ্রিত রাজ্যসমূহকে শোচনীয়ভাবেপরাজিত করেন। নিকানোর এবং ফিলিন নামের দুই গ্রিক রাজপ্রতিনিধিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেন। এশীয় রাজ্যগুলোর গ্রিক শাসক সেনাপতি সেলুকাস কোনো উপায় না দেখে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করেন। তার চেয়েও আশ্চর্য বিষয়, তিনি তার এক কন্যাকে চন্দ্রগুপ্তের কাছে বিয়ে দেন। চন্দ্রগুপ্ত কিংবা তার ছেলে বিন্দুসার বা বিন্দুসারের ছেলে মহামতি অশোকের সময়কাল পর্যন্ত পারস্য, মিসর ও বেবিলনের সঙ্গে ভারতবর্ষের চমৎকার সুসম্পর্ক ছিল। সম্রাট এও লক্ষ্য করলেন, এই প্রভাবশালী রাজবংশের রাজধানী কিন্তু দিল্লি বা আগ্রা ছিল না। বর্তমান বিহার রাজ্যের পাঠনা নামক স্থানে তৎকালীন রাজধানীটি সগৌরবে পাটালীপুত্র নাম ধারণ করে বিশ্বময় প্রভাববিস্তার করছিল। এভাবেচলে গেল প্রায় ৯৫০ বছর। সপ্তম শতাব্দীতে এসে ভারতবর্ষ ও পারস্যের সম্পর্ক নতুন মোড় নিল। ভারতের বিখ্যাত রাজা হর্ষবর্ধন এক পারস্য রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যে এই রাজকুমারীকে মহাশ্বেতা দেবী হিসেবেপরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ভারতের অন্যতম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বানভট্ট তখন হর্ষবর্ধনের সভাকবিএবং ভুবন বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সিনেটর। বানভট্ট রচিত হর্ষচরিত ও অন্যান্য লেখায় মহাশ্বেতা দেবীর পরিচয় ফুটে উঠেছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর এ সব ইতিহাসের খুঁটিনাটি জানতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার মুহাফেজখানার দলিল-দস্তাবেজ পড়ে জোরে জোরে কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। জীবন-জীবিকা, রাজ্য ও রাজত্ব নিয়ে ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে পড়লেন। কিন্তু অদ্ভুত ইতিহাস একটি রাজবংশ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর রাজত্ব করল।

১৮.

নির্জনপথে হাঁটতে গেলে মনের নির্জনতা বেড়ে যায়। রাজ্যের চিন্তা এসে ভিড় করে মাথায়। মোটা দাগের চিন্তা সূক্ষ্মচিন্তা কত কী। চিন্তায় বাঁক নিলে অনেক সময় হাঁটার গতি কমে যায়। যেন বিষাদে আক্রান্ত হয়েছে পা, সামনে এগোতে চাচ্ছে না। কদিন ধরে খান সাহেবকে খুঁজছেন তিনি। অতীতের অভ্যাসবশত তিনি গ্রাম থেকে উধাও। এবার তিনি কোনদিকে গিয়েছেন বলতে পারছেন না তার ঘনিষ্ঠজনরাও। তিনি যে কেবল খেয়ালের বশে দূরগ্রামেই চলে যান না, দূরবর্তী অঞ্চলেও চলে যান। এই যাওয়ার মধ্যে তিনি অপার আনন্দ খুঁজে পান। তার জীবন বিষাদে ঢাকা, জীবনের উজ্জ্বলতা বলতে কিছু নেই। সম্ভবত এ কারণেই তিনি হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যান। অনেকটাই বিবাগী জীবন তার। এমন জীবন অনেকেরই থাকে। তৃতীয় দিনের মতো খান সাহেবকে খুঁজতে তিনি এই নির্জন পথে এসেছিলেন। কারণ তিনি বহুদিন তাকে এই পথে দেখেছেন। কী এমন শক্তিশালী কারণে খান সাব তাকে ব্যতিক্রমধর্মী দুটো বই তাকে উপহার দিলেন, তা তিনি আজও জানতে পারেননি। তিনি যা বুঝতে পেরেছেন, তা সবই তার অনুমান-নির্ভর চিন্তা। তার গতানুগতিক চিন্তাকে পরিবর্তনের জন্যই সম্ভবত বই দুটো তিনি দিয়েছেন। প্রথম বইটি



ফিরিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও দ্বিতীয় বই সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। তবেদুটো বই-ই তার ভীষণ ভালো লেগেছে এবং তার মনোজগতেও এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। তবে দুটো বইয়ে নারী চরিত্র ঘটনাবহুল এবং যে কাউকে আকৃষ্ট করবে। তিনি আসলে তাকে খুঁজছেন দ্বিতীয় বইটি ফেরত দেওয়ার জন্য। তার ধারণা দ্বিতীয় বইটি ফেরত না দিলে, তার কাছ থেকে আর কোনো বই পাওয়া যাবেনা। বই পড়ানোর জন্য তিনি পাঠক খুঁজে পাচ্ছেন না, এই ধারণা থেকে তিনি বই দুটো তাকে পড়তে দিয়েছে, এটা মিথ্যা কথা। গ্রামে থেকেও তিনি যাতে সমৃদ্ধ হতে পারেন, এই কারণেই তিনি বই দুটো তাকে দিয়েছেন। বই দুটোতে বিচিত্র সব ঘটনা স্থান পেয়েছে, যা তাকে আনন্দ দিয়েছে। সবুজ মাঠের পাশঘেঁষে যে বড় রাস্তা সেদিকে তাকালেন তিনি। না খান সাবকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তার দেখা না পাওয়ায় মনটা হুহু করে উঠল।

১৮.

খান সাব যে হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যান, এ খবর গ্রামবাসীর অজানা নয়। তাই তাকে কেউ গ্রামে না দেখলে হতাশ হয় না। তারা ধরে নেয়, তিনি হয়তো কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছেন। গ্রাম ছেড়ে কেবল যে তিনি আত্মীয়ের বাড়িতে যান, তা নয়। কখনো কখনো পথে পথেও কাটিয়ে দেন। সারা রাত তিনি নদীর পাড়ে বসে থেকেছেন। এমন খবরও গ্রামবাসী জানে। নদীর সঙ্গে তার সখ্য রয়েছে, অথবা নদীকে তিনি অনেক ভালোবাসেন। নদী এবং তিনি ভিন্ন সত্তা, এমন কথাও উঠে এসেছে কারও কারও মুখ থেকে। কেবল তার গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীই নয়, তিনি যখন দূর-গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে যান, সেখানে গিয়েও তিনি নদীর তীরে বসে থাকেন। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, তিনি কখনো নদীর উজানে হাঁটেন না। তার টান জলের মতো ভাটির দিকে। ভাটির টানকে তিনি তার জীবনের পতন মনে করেন। তা হলে তিনি কি কোনো সময়েই নদীর উজানে যাননি। পরীবানু যে দিন নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল, তার আগে হয়তো বা তিনি নদীর উজানে গিয়েছেন, এটা কেউ কেউ স্মরণ করতে পারছেন। পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর থেকে তার পরিচিতি ঘনিষ্ঠ কেউ আর তাকে নদীর উজানে যেতে দেখেনি। তিনি প্রায়ই যে আত্মীয়ের বাড়িতে যান, ওই গ্রামেও একটি নদী রয়েছে। এই নদীর পাড়ে বসেও তিনি রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি অবধারিতভাবেই মনে করেন, পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ভাটির দিকে চলে গেছে। ও ভাসতে ভাসতে এক নদী থেকে আরেক নদীতে চলে গেছে। তার ধারণা একদিন তিনি নদীতে ভাসমান অবস্থায় পরীবানুকে দেখতে পাবেন। আর ওই সময়ে তিনি নদীতে ঝাঁপ দেবেন। যে নদীর পাড়ে খান সাব দাঁড়িয়ে আছেন, এটা দূর গ্রামের নদী। তার গ্রামের নদীর চেয়ে এই নদীটা অনেক ছোট শান্ত বেশি আকর্ষণীয়। তবেসারা বছর জল থাকে না। গ্রীষ্ম এলেই চারদিকে জলের জন্য হাহাকার শুরু হয়ে যায়। জল শুকিয়ে নদীটি যখন মরা খালে পরিণত হয় এবং নদীর বুকের উপর গরু ছাগল হেঁটে বেড়ায়, বিচ্ছিন্নভাবে গজিয়ে ওঠে ঘাস লতাপাতা খায়, তখনও ওই দৃশ্য তার ভালো লাগে। তিনি নদীর জলের চেয়ে রেখাকে গুরুত্ব দেন বেশি। তিনি মনে করেন নদীর জল, তার বয়ে চলার কুলকুল ধ্বনি এ সবনদীর প্রাণ নয়। নদীর রেখাই নদীর প্রাণ, নদীর কাঠামোই নদীর অস্তিত্ব। নদী যদি তার বাঁক রেখা হারিয়ে ফেলে, তা হলে তার কিছুই থাকে না, জল তো দূরের কথা। ইতিমধ্যেই শত শত নদী হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। তাই তার কাছে জল ছল ছল ভরা নদী আর শুকনো নদী একই। খান সাব বরষায় নয় গ্রীষ্মের খরদাহকালে এই দূর গ্রামে আসেন, শুকনো নদীর রঙিন সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। দুটো নদীই তার প্রাণ হৃদয়ের স্পন্দন।

যেদিন পরীবানু তাকে জীবনের সঙ্গে হৃদয়ের গভীর তন্ত্রীতে জড়াতে না পেরে নদীতে ঝাঁপ দিল, সেদিন থেকে তার নদী দেখার চোখ বদলে গেল। তিনি তার দুচোখ যতই প্রসারিত করুক না কেন, নদীকে তার মনে হয় বিষাদ আর বেদনার আঁধার। এই

নদীই তার পরীবানুকে কেড়ে নিয়েছে। নদী ওকে ডেকেছে বলেই পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। আগেও তিনি নদীর পাড়ে বসে থাকতেন, বসে থাকেন এখনো। দুই সময়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। আগে দেখতেন নদীর জলপ্রবাহ অথবা শুকনো নদীর মাঠের মতো সৌন্দর্য। আর এখন নদীর দিকে তাকালেই পরীবানুর সরল মায়াবী মুখ ভেসে ওঠে। পরীবানু তাকে ডাকছে। এ যেন অনন্তের আহ্বান। অনেকদিন পর তিনি বইটি হাতে নিলেন। বইয়ের প্রতি তার আগের মতো মনোযোগ কিংবা আকর্ষণ নেই। তিনি আসলে খুঁজে বেড়াচ্ছেন খান সাবকে। খান সাবঅনেকদিন থেকে গ্রামে নেই। দেখা হলে হয়তো তিনি নতুন কোনো বই হাতে ধরিয়ে দেবেন। তিনি বইটি হাতে নিলেন। শুরু হলো এক কিশোরীর গল্প । রোকসানা দুর্গ চূড়া থেকে পাহাড়ের পাদদেশে তাকিয়ে থাকত। উপর থেকে তাকালে মানুষগুলোকে ছোট ছোট পিপিলিকার মতো আর ঘোড়া এবং গাধাগুলোও খেলনা পুতুলের মতো মনে হতো। যেদিন আকাশে চাঁদ উঠত সেদিন পাহাড়ের পাদদেশের বনভূমি, বহতা ঝর্ণা কেমন যেন স্বপ্নপুরীর মতো মনে হতো। রোকসানার খুবইচ্ছে হতো-দৌড়ে সেখানে চলে যেতে। কিন্তু দুর্গের সুকঠিন নিয়মনীতি এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণেন কিশোরীর স্বপ্ন সাধ কেবলই বোবাকান্না করত আর বিদ্রোহ করতে চাইত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। একদিন সে কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মনে মনে। খুব ভোরে সে দুর্গ থেকে বের হয়ে চলে যাবে পাহাড়ের পাদদেশে- সমতল ভূমিতে। নদীর জলে অবগাহন করবেআর বনভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াবেসারাদিন। সে একটুও চিন্তা করল না কীভাবে বের হবে, কিংবা কীভাবেফিরে আসবে। কিশোরী মনের দুরন্তপনা তাকে অস্থির করে তুলল। পূর্বাপর কিছু না ভেবেই রোকসানা দুর্গ থেকে বের হওয়ার জন্য রাতের শেষ প্রহরে চলে গেল সিংহদারের কাছে। রোকসানা কিশোরী হলেও ছিল যথেষ্ট বুদ্ধিমতি। সে লক্ষ্য করেছিল, প্রতি ৬ ঘণ্টা অন্তর ৪০০ সৈন্যের একটি দল দায়িত্ব পালন শেষে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য পাহাড়ের পাদদেশের গ্যারিসনে চলে যায়। অনুরূপভাবেনতুন ৪০০ সৈন্য নিচ থেকে এসে দায়িত্বে যোগ দেয়। সে ভোর রাতে প্রাসাদ রক্ষীর পোশাক পরে সৈন্যদের সঙ্গে মিশে যায় এবং কোনোরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই দুর্গের সিংহদার অতিক্রম করে চলে যায় পাহাড়ের পাদদেশে। রোকসানা যখন ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝর্ণার কিনারে নামল তখন সবে পুবআকাশ লাল হতে শুরু করেছে। পাহাড়ের উপরের বাতাস সারা বছরই থাকে ঠান্ডা-আর শীতকাল হলে তো কথাই নেই। অন্যদিকে দিবারাত্র সবসময় মেঘের আনা গোনার কারণে সবকিছুই থাকে শিশির ভেজা হয়ে। কিন্তু সমতল ভূমির অবস্থা অমন নয়। সেখানকার বাতাস, মাটি এবং পানি যেন সম্পূর্ণ ভিন্নতর। রোকসানা ঘোড়াটিকে একটি গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ঝর্ণার কিনারে গিয়ে বসল। আনন্দ, খুশি, কৌতূহল এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে সে সবকিছু ভুলে গেল- একবারও তার মাথায় এলো না কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে যদি তার পিতা সব কিছু জেনে যায়।

১৯.

খান সাবের পায়ের গতি সবসময় ধীর। তিনি এমনভাবেপথ চলেন চারপাশের প্রকৃতি তো দূরের কথা, মাটিও টের পায় না। তার ধারণা, পায়ের শব্দ প্রকট হলে মাটি ছাড়া ও বিরক্ত হবে। তার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়বে। মাটি হচ্ছে মহা চুম্বক, আকর্ষণের আধার। মাটি পবিত্র বলেই তার এত কদর মূল্য। মাটি আর নারীর দখল নিয়েই পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ অরাজকতা হত্যা রক্তের হোলিখেলা। তিনি মনে করেন মাটি থেকে এসেছেন এবং এই মাটিতেই একদিন তাকে মিশে যেতে হবে। তাই তিনি মাটিতে পা ফেলেন অতি সাবধানে, যেন তিনি সুতোর উপর দিয়ে হাঁটছেন। পা ফসকে নিচে পড়ে গেলেই মৃত্যু অবধারিত। তিনি যখন ঘরের বাইরে বের হন, হয় তিনি হাঁটেন না হয় দাঁড়িয়ে থাকেন। কেউ তাকে কোথাও বসা অবস্থায় কখনোই দেখেননি। তিনিই এও মনে করেন বসে পড়া বা বসে থাকা মানে জীবন স্থবির হয়ে যাওয়া। বিশ্রামহীন অকারণে শুয়ে থাকাকেও তিনি আলস্যময় জীবন মনে করেন। লোকে বলে, খান সাবযখন হাঁটেন মাটিও টের পায় না। কোনো মানুষ যখন একাকী হাঁটেন, তখন তার মধ্যে নানা চিন্তার উদ্রেক হয়। অতীত জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়, খোঁচায় জ্বালায়। শোক বিহ্বলতা বিরহ-বেদনা জোটবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু পরীবানু, যে তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে স্মৃতির আবিষ্টতায় একরাশ ভালোবাসা ছড়িয়ে।

ঝর্ণার তীরে বসে রোকসানা তার কোমর থেকে কোমরবন্দ এবং তলোয়ার খুলে ফেলল। জুতা জোড়াও খুলল। তারপর প্রবহমান কলকল স্রোতের ধারায় পা দুটো ভেজানোর জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি পাথরের ওপর বসল। জীবনে এই প্রথম দুর্গ ছেড়ে সে কোথাও বের হয়েছে তাও আবার একাকী এবং নিশুতি রাতের শেষ প্রহরে। গত কয়েকদিন ধরেই তার মন আনচান করছিল বের হওয়ার জন্য। সে প্রথমে পরিকল্পনা করেছিল তার ছোট ভাই কিংবা চাচাতো বোনকে নিয়ে বের হবে। তারপর ভাবল-না একাই বের হবে। কারণ প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দেওয়ার মতো যোগ্য সঙ্গী না পেলে একা বের হওয়াই উত্তম। অন্যদিকে তার ছোট ভাই দুর্গের বাইরে যেতে সাহস পাবেএটা চিন্তা করাই বোকামি-কারণ ওরা রোকসানার প্রিয় পাত্র হলেও সঙ্গী হিসেবেছিল নিতান্ত গোবেচারা এবং ভীতুর ডিম। বাইরে বের হওয়ার উত্তেজনায় গতরাতে সে একটুও ঘুমোয়নি। নিজ খাস কামরায় শুয়ে শুয়ে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সে ছটফট করেছে। তৃতীয় প্রহরে সে প্রথমে তার কামরা থেকে বের হয়ে অতি সাবধানে মহলের প্রধান ফটক অতিক্রম করে। এরপর বাগান পার হয়ে খানসামা ও আয়াদের কলোনির পাশ দিয়ে চলে যায় আস্তাবলে। সেখানে গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে চলে আসে দুর্গের মূল সিংহদারের নিকটে। অনেকক্ষণ ধরে চুপটি মেরে বসে থাকে এবং সময়মতো ঘোড়ায় চড়ে রাতের আঁধারে সৈন্যদের সঙ্গে মিশে যায়। সারাটি রাত জেগে থাকার কারণে রোকসানা ছিল খুবই ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত। তাই ঝর্ণার পানির প্রবাহে পা ডুবানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো দুনিয়ার তাবৎ সুখ যেন তার নিকট ধরা দিয়েছে। রোকসানা উপুড় হয়ে হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করতে চাইল। ঠিক এমন সময় পিছন থেকে ভেসে এলো অদ্ভুত এক শব্দ!

রোকসানা যখন ঝরনার কিনারে সূর্য তখন মধ্য গগনে। সে ও তার ঘোড়া উভয়ে ছিল পিপাসার্ত এবং ক্ষুধার্ত। কাবিলাটি ঝর্ণা থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে আরেক ছোট পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ঝর্ণার তীর ধরে বনভূমি পেরুলেই গ্রাম। গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু এবং সোজা পথ রয়েছে। সেই পথ দিয়ে গেলে ৩-৪ ঘণ্টা সময় লাগে। অন্যদিকে ঝর্ণার আঁকাবাঁকা প্রবাহের পাশ দিয়ে সমভূমিতে পৌঁছতে সময় লাগে ৬-৭ ঘণ্টা। ঝর্ণার তীরঘেঁষে লম্বা পথ ধরেই বনভূমি অতিক্রম করতে চাইল রোকসানা। কারণ পথটি দীর্ঘ হলেও তুলনামূলক নিরাপদ। পথে পথে বিশ্রাম নেওয়া যাবে। পিপাসার্ত হলে পানি পান করা যাবেএবং চলতি পথে একজন হলেও বনভূমিতে বাস করা নারী-পুরুষের দেখা মিলবে। অন্যদিকে বনের মধ্যদিয়ে আড়াআড়ি যে পথটি চলে গেছে তা অতিক্রম করা রীতিমতো ভয়ঙ্কর একটি ব্যাপার। সবচেয়ে বড় ভয় বনের মধ্যে যে কোনো সময় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই এই বিশাল বনভূমির বাসিন্দারাও একাকী বেশি দূরে যায় না। এরপর রয়েছে জন্তু-জানোয়ার, সাপ, বিচ্ছু ও বিষাক্ত মাকড়সার ভয়। দিনের বেলা যখন রোকসানা অতিক্রম করত তখন বাঘ, হাতি, চিতাবাঘ, হায়েনা, বানর, ভালুক, বুনো মহিষেরা দলবেঁধে দাঁড়িয়ে যেত এবং বিস্ময়ে কাফেলার দিকে তাকিয়ে থাকত। ভয়ঙ্কর সাপেরাও পথ করে দিত। যাত্রাপথের সামনে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে যাওয়া তো দূরের কথা ভুলেও সামনে পড়ত না। অন্যদিকে রোকসানা রাতে যখন অতিক্রম করত তখনো এক ধরনের অতি পার্থিবআনন্দ অনুভবকরত। রাত যদি অন্ধকার হতো তবেশত শত মশাল জ্বালিয়ে, ঢোল বাজাতে বাজাতে পথ অতিক্রম করত রোকসানা। অন্যদিকে চাঁদনী রাতে মশালের দরকার হতো না। কয়েকবার তো গভীর জঙ্গলে তাঁবু ফেলে রাত্রি যাপনও করেছে সে। দিনের বেলায় শিকার করা হরিণ জবাই করে তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালিয়ে কাবাবকরে খাওয়া হতো। দলে দলে হায়েনা, চিতাবাঘ প্রভৃতি মাংশাসী প্রাণীলোভী জিহ্বা বের করে তাঁবুর অদূরে বসে থাকত অবোধ শিশুর মতো। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করত না। সবাই পেটপুরে খাবার পর অবশিষ্ট কাবাব এবং উচ্ছিষ্ট হাড্ডিগুড্ডি পশুগুলোর দিকে ছুড়ে দেওয়া হতো। আর ওগুলো একান্ত গৃহপালিত পশুর মতো ওরা চেটেপুটে খেতো।

২০.

আজ নদীর পাড়ে নয়, শত বছরের প্রাচীন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। গ্রামীণ পথচারী যারা তাকে বহু বছর ধরে চেনে, তারা দেখে অবাক হয় । কারণ তারা কখনো তাকে এভাবে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি। কী কারণে তিনি ভোর বেলায় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন, তা তারা আন্দাজ করতে পারে না। খান সাবের মনের খবর তারা জানে না। কেউ কেউ পথচলার বিরতি দিয়ে অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ তাকে বড় অচেনা মনে হয়। মাটি আছে বলেই গাছ আছে, মাটি আছে বলেই মানুষ আছে। হঠাৎ তার মুখ থেকে এ কথা উচ্চারিত হয়। তিনি এও

ভাবেন, বাঁশি আছে বলেই সুর আছে, সুর আছে বলেই ভালোবাসা আছে, আছে বিরহ বেদনা। নদী আছে বলেই জল আছে, আছে স্বচ্ছ জলের ধারা, আছে মৃত্যুর অমোঘ অমোচনীয় দুর্নিবার আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে পরীবানু। গ্রামের এক প্রবীণ লোক তাকে বলেছিলেন, তুমি যে বাঁশি বাজাও এর মাঝে যেমন আনন্দ ও সুর লহরী রয়েছে, রয়েছে মানুষকে মুগ্ধ করার জাদু, একইভাবেএর মধ্যে রয়েছে বিরহ-বেদনা, মোহকাতরতা। বাঁশির সুরে কেউ মোহকাতর হয়ে পড়লে তাকে আর ফেরানো যায় না, যেমন ফেরানো যায়নি পরীবানুকে। সে তার বাঁশির সুর চিরদিনের জন্য থামিয়ে দিয়ে চলে গেছে দূর অজানায়।

বারবার পুরনো গাছটির দিকে তাকান খান সাব। গাছকে ঘিরে বিচিত্র ধরনের খেলা। এই খেলা চলছে বহু বছর ধরে। পাখি-পোকামাকড় পথচারীদের আশ্রয় এই গাছ। এক সময় একজন পাগল বসে থাকত এই গাছের নিচে। সে সারাক্ষণ আল্লাহ আল্লাহ বলে জিকির করতো। গভীর রাতে যারা চলাচল করতো তারা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতো লোকটা একইভাবেআল্লাহ আল্লাহ করছে। সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণের ক্ষেত্রে তার যে নিবিষ্টতা তার যে দরদ, সত্যি বিস্ময়কর। একদিন খান সাবতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সারাক্ষণ যে আল্লাহ আল্লাহ করো, তুমি কি জান আল্লাহ কোথায় থাকেন? পাগলটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, আমার অন্তরে। উত্তর শুনে খান সাবের ভেতর কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া জন্মালো না। তিনি তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন। পাগল তাকে বলে, চাইয়া চাইয়া কী দ্যাখতাছো, আকাম বাদ দিয়া আল্লারে ডাক। পাগল তাকে আল্লারে ডাকতে বলেছে, ভালো কথা। কিন্তু আকাম বাদ দিতে বললো কেন। তিনি তো জেনেশুনে কোনো অপরাধ করেননি। নাকি তার বিয়ে আর প্রেমকাহিনী নিয়ে এলাকায় যে কল্পকাহিনীর বিস্তার, যা গত ৩০ বছর ধরে এলাকায় চালু রয়েছে, সেটাকেই পাগল আকাম বলছে। নাকি তার যে উদাস জীবন, নিরন্তর পথচলা কিংবা নদীর পাড়ে আবেগমথিত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, হঠাৎ হঠাৎ গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যাওয়া। এসবকে সে আকাম বলেছে।

তিনি তো বরাবরই সংসারের প্রতি অমনোযোগী একজন মানুষ। গান গাওয়া বাঁশি বাজানো এসবকি আকাম। তার মনে হচ্ছে পাগল তাকে বড় ধরনের একটা ধাক্কা দিয়েছে, যে ধাক্কায় তিনি নন, পরীবানু নদীতে পড়ে গিয়েছে।

তার আর বই পড়তে ভালো লাগছে না। দ্বিতীয় বইটি তিনি খান সাবকে ফেরত দিতে চান। এও বলতে চান, তিনি যেন তাকে আর কোনো বই না দেন। কারণ তার জগত প্রকৃতি ও সৃষ্টি নিয়ে যে মৌলিক চিন্তা, সেটা এই বই পড়ার মাধ্যমে ব্যাহত হচ্ছে। তিনি ফেরত যেতে চান খান সাবের বই প্রদানের আগের জগতে। বইটি ফেরত দেওয়া আগে তিনি আবার পাতা উল্টালেন, এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। সেখানকার বর্ণনা ঘটনা তাকে আকৃষ্ট করলো।

ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল শাসনকারী মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত নারীর কথা জানা যায়, যারা পর্দার অন্তরালে থেকে প্রভূত ক্ষমতা চর্চা করেছেন এবং নানা ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন। প্রথাগতভাবেই মোগল রাজবংশে নারী, কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদে, সর্বদা-সর্বাবস্থায় সম্মানের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সেখানে 'পাদসা বেগম' বা 'পাটরাণী'র প্রথা প্রচলিত ছিল, যার সন্তান সিংহাসনাধিকারে অগ্রাধিকার পেত। মোগল নারীদের মধ্যে অনেকেই কেবল আক্ষরিক ক্ষেত্রে নয়, বাস্তবিক ক্ষেত্রেও ছিলেন সম্রাটের প্রকৃত 'অর্ধাঙ্গিনী'। মোগল হেরেমের রমণীগণ তাদের মধ্য এশীয় ঐতিহ্যানুযায়ী প্রায় সবাই অশ্বারোহণ করতেন, যাকে বেখাপ্পা বা পুরুষালী আচরণ বলে মনে করা হতো না। তারা পোলো খেলতেন এবং স্বামীর সহগামী রূপে শিকারে গমন করতেন। সকলেই প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা গৃহাভ্যন্তরেই পেতেন, যদিও অনেক মোগল নারী বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত সাহিত্য ও শিল্পকলায় উচ্চতর শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়েছিলেন। সেই স্বাক্ষর সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমন কি, জায়গিরদারি, বাণিজ্য-কারখানার মালিকানা এবং স্থাপত্য শিল্পে লক্ষণীয়। প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের কন্যা, আকবরের ফুফু গুলবদন বেগমের হুমায়ুননামা কেবল প্রামাণিক ঐতিহাসিক দলিলই নয়, প্রকৃষ্ট সাহিত্যকর্মও বটে। আকবরের মাতা হামিদা বানু ছিলেন বিদুষী ও তেজস্বিনী নারী। আকবরের অন্যতম মহিয়ষী সেলিমা বেগম ছিলেন গুণবতী রমণী। পুত্র জাহাঙ্গীর যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন বিমাতা সেলিমা বেগমই মধ্যস্থতা করে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। দারাশিকোর কন্যা শাহজাদা আযমের স্ত্রী এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্রবধূ দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়ে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন।

২১.

আকাম শব্দটা খান সাবের মাথা থেকে কিছুতেই সরছে না। ঘণ্টা খানেক হলো তিনি গ্রামের এই প্রাচীন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। বহুদিন ধরে পাগল এখানে বসে না। পাগল হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেছে গ্রামের কেউ তা জানে না। অনেকের ধারণা পাগল রাতের কোনো এক ঝরে মারা গেছে। ঝড় শুরু হলে পাগল দিশাহারা হয়ে পড়লে তার শরীরে ভয়ংকরভাবেকাঁপন ধরে। সে কই মাছের মতো কাতরাতে কাতরাতে অনেকটা হামাগুড়ি দেবার মতো করে নদীর কাছে আসে এবং এক সময় নদীতে পড়ে যায়। পরীবানু না পাগল আগে কাকে নদী আহ্বান করেছিলেন তার গহ্বরে মিলিয়ে যেতে এটা কেউ নিশ্চিত হতে পারছে না। তবে দুজনেই নদীর সঙ্গী এটা খান সাবনিশ্চিত হয়েছেন। তিনি বাঁশি বাজাতে ভালোবাসতেন। বাঁশি অন্যকে যতটা না আনন্দ দেয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ দেয় যিনি বাজান তাকে। বাঁশির মাধ্যমে তিনি তার জীবনের অব্যক্ত কথা প্রকাশ করতেন, ভুলে থাকতে চেষ্টা করতেন জীবন-যন্ত্রণা। বাঁশিই তার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। আর গান তিনি গাইতেন গ্রামের লোকজনের অনুরোধে। গান আর বাঁশির মাধ্যমে জীবনের বহিঃপ্রকাশ প্রায় একই। অন্তত খান সাব তাই মনে করেন। অথচ পাগল এ দুটোকেই আকাম বলেছে। এই কারণেই কি তিনি এ দুটো মহৎ কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, নাকি পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দেবার পর থেকে গভীর মনোবেদনায় এসব ছেড়ে দিয়েছেন। যতবার পাগলের সঙ্গে তার কথা হয়েছে, তাতে তার মনে হয়েছে পাগল তার বাঁশির সুরে মোহিত। একবার পাগল তাকে বলেছিল, কী বাঁশি বাজাও, আরো দরদ দিয়া বাজাইতে পারো না। তোমার বাঁশিতে রাত কাঁপে না, বৃষ্টি হয় না, ঝড় আসে না। তাইলে কী বাঁশি বাজাও তুমি?

যে গ্রামে বাঁশি বাজে সে গ্রাম সুরের মাধুরি-মাধুর্যমাখা। সে গ্রামে বাঁশির সুরে বাতাস নাচে সবুজ মাঠ নাচে নদী নাচে। খান সাব যখন বাঁশি বাজাতেন রাতের দ্বিপ্রহরে তখন বাঁশির সুরে আবিষ্ট হতো রাতের পাখি গাছ চাঁদ তারা আকাশ। গ্রামের প্রবীণ লোকের ঘুম চলে আসতো সুর শুনে। অই সময়ে সুরের মোহ মুগ্ধতায় ঘর থেকে কেবল পরীবানুই বের হতো না, বের হতো সুর-পাগল অনেকেই। সুর শুনে রাতের গাছ অধিক ধ্যানমগ্ন হয়ে যেত। এই গ্রামকে সুর-সমৃদ্ধ করেছিল খান সাবের বাঁশি। পরীবানুর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিকেন্দ্রিক সবমুগ্ধ আয়োজন ভেস্তে গেছে। বাঁশিটি হাতে করে তিনি একবার নদীর পাড়ে গিয়েছিলেন। সুর তোলার জন্য নয়, বাঁশিটি নদীতে ফেলে দেওয়ার জন্য। যে বাঁশির কারণে পরীবানুর জীবন চলে গেছে সে বাঁশি রেখে লাভ কী। বাঁশিটি নদীতে ছুড়তে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠলো। হাত এতোটাই দুর্বল হয়ে গেল যে তিনি শরীরের সমস্ত শক্তি হাতে এনেও সফল হলেন না। নদীর জল থেকে আওয়াজ উঠলো, খান এটা কী করছো তুমি, এই বাঁশি পরীবানুর প্রণয়-স্মৃতি জীবন-স্মৃতি। এই বাঁশি ফেলে দিও না। বিষয়টি এভাবেকখনো ভাবেননি খান সাব। তার চেতনায় নতুন মোড় নেয়। তার মন হুহু করে কেঁদে ওঠে। এই কান্না কি কেবল পরীবানুর জন্য, নাকি বাঁশি বাজাতে না পারার বেদনা, নিশ্চিত হতে পারেন না তিনি। নদী থেকে শীতল বাতাস উঠে আসছে। এই বাতাস তার



মন শীতল করতে পারছে না। তিনি যে জায়গায় বসে বাঁশি বাজাতেন সে জায়গায় এলেন। এরপর বাঁশি ঠোঁটের কাছে আনলেন। সুর তোলারও চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। পৃথিবীর সমস্ত জড়তা যেন তাকে আঁকড়ে ধরেছে। এই জড়তা হয়তো আর কখনোই কাটবেনা।

তিনি দেখতে পেলেন খান সাবগ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন গাছের নিচে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। তার স্মরণে আসে, মাস কয়েক আগেও তিনি এখানে দাঁড়িয়েছিলেন। ওইদিন তিনি তার সঙ্গে কথা না বলে পাশ কেটে চলে গিয়েছিলেন। আজ তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে। অনেক দিন ধরে তিনি গ্রামে নেই। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় বইটি তাকে ফেরত দেয়া দরকার। সেজন্য অনেক দিন ধরেই তিনি তাকে খুঁজছেন। শিকার হাতের কাছে পাওয়ার মতো অবস্থা হলো তার। তিনি যারপরনাই আপ্লুত হলেন। খান সাবের পাশ ঘেঁষে তিনি দাঁড়ালেন। কথা বলার জন্য তার ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করছে। এর আগে কখনো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। তিনি লক্ষ করলেন, খান সাব যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি। তার পাশে এসে কে দাঁড়ালো, কে হেঁটে গেল, সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। তিনি গলা খাকারি দিলেন। কিন্তু তার এই আকর্ষণ করার সনাতন উদ্যোগটি কোনো কাজে লাগলো না। খান সাবআগের মতোই গাছের দিকে নিবিষ্ট। তিনি দ্বিতীয়বার গলা খাকারি দিলেন। এবারো উদ্যোগটি ভেস্তে গেল। না কোনো সাড়া নেই। তিনি ভাবলেন, এবার চলে যাওয়াই উত্তম। তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবেনা। তিনি যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। পেছন থেকে আওয়াজ উঠলো, বই পড়া শেষ হয়েছে? আওয়াজ শুনে পেছনে তাকালেন তিনি। তাকিয়ে অবাক হলেন, খান সাব তো একই ভঙ্গিতে গভীর নিবিষ্টতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তা হলে আওয়াজ করলো কে? তিনি মহা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলেন। সামনের দিকে পা না বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল কোনো কথা নেই। তখন তিনি এটা নিশ্চিত হলেন, আসলে খান সাব তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। এটা তার মন থেকে উদয় হওয়া কথা। যা তিনি খান সাবের কণ্ঠের মাধ্যমে শুনতে পেয়েছেন। তিনি আবার সামনের দিকে পা বাড়ালেন। পেছন থেকে আবার আওয়াজ উঠলো। বললে না তো, বই পড়া শেষ হয়েছে কিনা? তিনি আবার দাঁড়ালেন এবং খান সাবকে একই ভঙ্গিতে দেখতে পেলেন। এবার তার মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হলো। তার মনে হলো, গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন গাছের নিচে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি খান সাবনন। তিনি এতক্ষণ যা দেখেছেন, শুনেছেন সবই বিভ্রম-ভেলকি। এসবই এই গাছের কারসাজি। এ কথাটা পাগল তাকে বলেছিলো।

ঘোর ও আতঙ্ক নিয়ে তিনি সামনের দিকে পা বাড়ালেন। কয়েক কদম যাওয়ার পর, আবার তিনি খান সাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। পেছন ফিরে তাকালেন তিনি। খান সাব তার দিকে ধীরপায়ে হেঁটে আসছে। তিনি ভালো করে দেখছেন, যিনি তার দিকে আসছেন, তিনি আসলে খান সাব কিনা। খান সাব এসে তার হাত স্পর্শ করলেন। তার হাতের স্পর্শে তিনি যেন মহাঘোরে পড়ে যান। খান সাব তাকে বলেন, তোমাকে একই কথা বারবার জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাচ্ছি না কেন? খান সাবের কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। খান সাব বলেন, শুনেছি দ্বিতীয় বইটা ফেরত দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে খুঁজেছো। আমি একটু গ্রামের বাইরে ছিলাম। তোমাকে বইটা ফেরত দিতে হবেনা। তোমাকে আমার সংগ্রহ করা কিছু বই দেবো। কিছু বই আমি কিনে দেব। ঘর জমিও আমি দেব। এলাকায় তুমি একটি লাইব্রেরি গড়ে তোল। তুমি একজন ভালো পাঠক। তোমার পক্ষে এই মহৎ কাজ করা সম্ভব। উত্তরে তিনি বললেন, আমাদের এলাকায় শিক্ষার হার কম। এমন অবস্থায় কে লাইব্রেরিতে এসে বই পড়বে। খান সাব বললেন, আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এলাকায় একটি লাইব্রেরি গড়ে উঠুক। হতাশ হওয়ার বা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ধীরে ধীরে পাঠকশ্রেণি গড়ে উঠবে। আমি গান গাওয়া বাঁশি বাজানো ছেড়ে দিলাম। মূল চেতনা সুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। ছন্নছাড়া উদাসী মানুষের দ্বারা ভালো কোনো কাজ হয় না। আমার দ্বারাও হবেনা। বলতে পারো আমি বিবাগী মানুষ। যতোটা ভরসা করি তোমাকে দিয়েই। গ্রামে গানের সুর বাঁশির সুর না থাক, বইয়ের নীরব সুর প্রবাহিত হোক। খান সাবের কথা শুনে তিনি তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না। তার চেতনার জগতে ভেসে উঠলো আরেক আলোকময় জগত।

যে এলাকায় শিক্ষার হার কম এবং সাধারণ মানুষের মানসিকতা সংস্কৃতিমুখী নয়, সে এলাকায় পাঠাগার গড়ে তোলা অবান্তর। খান সাবের কথায় তিনি সায় দিলেও, তার মনে এই কঠিন কথাটা উদয় হলো। এই এলাকায় খান সাবের অনেক জমি আছে। জমিতে প্রচুর ফসল হয়। শাক-সবজির আবাদও হয় ভালো। যার কারণে সংসার চালানোর চিন্তা তার তেমন একটা করতে হয় না। ছোট ভাইয়ের ওপর দায়িত্ব দিয়ে তিনি অনায়াসেই বহি-মিয়ান হতে পারেন, চলে যেতে পারেন দূরগ্রামে, আত্মীয়ের বাড়িতে। তিনি খুবসহজেই ধ্যানস্থ হতে পারেন নদীপাড়ে পথের ধারে প্রাচীন বড় গাছের নিচে। জীবন সম্পর্কে যার গভীর নাভিশ্বাস রয়েছে, তার পক্ষে একটা উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নেওয়া এবং সেই উদ্যোগ সফল করা কতটা যৌক্তিক ও সম্ভব? এই প্রশ্ন তার সামনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাকে দুটো বই কৌতূহলবশত পড়তে দেয়া, আর পাঠাগার গড়ে তোলা এক কথা নয়। পাঠাগারের জন্য জমি, ঘর, বই দেওয়া আর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে বইমুখী করে তোলা কঠিন কাজ। অই দিন খান সাব আরও কিছু স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। যা শুনে তিনি রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন। খান সাব বলেছিলেন, পাঠাগারের ভেতর দেয়ালে ঝুলানো থাকবে বেশ কিছু ছোট-বড় নানা কিসিমের বাঁশি, থাকবে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু এসব কেবল প্রদর্শনী হিসেবে থাকবে, কেউ স্পর্শ কিংবা ব্যবহার করতে পারবে না। বইয়ের পাশাপাশি এটাই হবে পাঠাগারের বাড়তি নান্দনিক সৌন্দর্য। খান সাবের স্বপ্ন অদ্ভুত মনে হলেও প্রকৃত অর্থে এর ভেতর মাধুর্য রয়েছে। তিনি গান ও বাঁশি বাজানো বন্ধ করে দেওয়ার কারণেই এমন স্বপ্ন তার মাথায় এসেছে। বিষয়টি এমনও হতে পারে, পাঠাগার নয়, মূলত বাঁশি ও বাদ্যযন্ত্র তার উজ্জ্বল স্মৃতির অংশ, তার জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে রয়েছে। সেই স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিনি পাঠাগার করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

২২.

অত্র এলাকার মানুষ খান সাবকে গান ও বাঁশি পাগল এবং সংসার-উদাসী লোক হিসেবেই জানে। তারা এও জানে, কেবল অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকায় তার মতো বিবাগী লোকের সংসার টিকে আছে। এ ক্ষেত্রে খান সাবের পরিবার সৌভাগ্যবান এই কারণে, এই ধরনের লোক সাধারণত চালচুলোহীন হয়ে থাকে। খান সাবের উদাসী স্বভাবের কারণে এলাকার এক শ্রেণির মানুষ তাকে পছন্দ করে না। আবার আরেক শ্রেণির লোক তাকে নিয়ে মশকরা করে। তারা বলে মানুষটা ভাদাইমা কিসিমের, তবে প্রতিভা আছে। তারা মনে করে, কারো কারো পক্ষে গান গাওয়া সম্ভব হলেও বাঁশিতে সুর তোলা সম্ভব নয়। এটা বিশেষ যোগ্যতার ব্যাপার, যে যোগ্যতা খান সাবের রয়েছে।

যারা বিকেলে নদীর পাড়ে ছিল, তারা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলো, খান সাব বাঁশি হাতে পুরনো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এলাকার লোকজন জানে, তিনি তার দরদী বাঁশি গভীর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কবেই নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। এখন আবার নতুন বাঁশি এলো কোথা থেকে? তিনি কি বাঁশিতে সুর তুলবেন আগের মতো। তার সুরের তালে নদীতে কি ঢেউ উঠবে, বাতাস বইবে তীব্র বেগে। তার সুরের তালে গাছ-পাখি সবুজ মাঠ কি নাচতে থাকবে, নিজস্বতা নিয়ে। পরীবানু কি বাঁশির সুরে পাগল হয়ে নদীর জলে হেঁটে হেঁটে গভীর উচ্ছ্বাস নিয়ে খান সাবের কাছে এসে বলবে, আমি মরিনি। যে তোমার মরমি জাদুকরি বাঁশি শুনেছে সে মরতে পারে না।

খান সাব একাধিক বাঁশি একই সুরে বাজাতেন। এর আগে দুটো বাঁশি তিনি নদীতে ফেলে দিয়েছেন। আজ শেষ বাঁশিটি তিনি এনেছেন নদীতে ফেলে দেওয়ার জন্য। তিনি কি পরীবানুর সমস্ত স্মৃতি মুছে দিতে চান। হৃদয়ের সম্পর্ক বলতে যা বোঝায়, পরীবানুর সঙ্গে তার ছিলো না। তিনি কেবল ওর অতি আবেগ দুরন্তপনায় ঠাসা ভালোবাসাকে বোঝার চেষ্টা করছেন। নানা কথা ভেবে তার ভেতর এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কারো জন্য কেউ এমনি এমনি নদীতে ঝাঁপ দেয় না। পরীবানুর গভীর মনের আকুলতা, তার অকৃত্রিম ভালোবাসাকে তিনি করতে পারেনি অনুধাবন। পরীবানুর আবেগমথিত কথাকে তার নিছক কথাই মনে হয়েছে। যিনি মানুষের মনকে, মনের গভীরতাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম তিনি কেমন বাঁশিওয়ালা। এই বোধকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে পরীবানুর পায়ের বেগ বাড়িয়েছে এবং নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, কাছের মানুষ মরে গেলে আক্ষেপ বাড়ে। আজ নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে খান সাবের সেই পুরনো কথাই মনে হলো। আজ যদি তিনি বাঁশিটি নদীতে ফেলে দেয়, তাহলে পরীবানুর কোনো চিহ্নই তার কাছে থাকে না। বাঁশিটি হচ্ছে ভালোবাসার গতি জীবনের ছন্দ। এই গতি ছন্দ আজ তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন একটি বাঁশি সুর তুলে জলের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে।

জলে ঢেউ উঠছে, লাল নীল সবুজ বেগুনি হলুদ নানা রঙের ঢেউ। ওই ঢেউয়ের উপর পা রেখে পরীবানু নাচছে হাসছে গান গাচ্ছে। জীবনের শেষ গান, শেষ কণ্ঠস্বর।

খান সাব যেভাবে নিবিষ্টমনে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি আজ একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পরিচিতজন এই দৃশ্য দেখে অবাক হলো। কারও কারও মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো, তিনি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে খান সাবের প্রক্সি দিচ্ছেন। খান সাবই হয়তো এই দায়িত্ব পালন করার জন্য তাকে বলেছেন। তিনি অনেকদিন খান সাবকে পলকহীন চোখে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছেন। তিনি হয়তো ভেবেছেন, জলের প্রবাহ থেকে পরীবানু জেগে উঠবেন। ঠিক এই মুহূর্তে তার মনে অদ্ভুত প্রশ্নের উদয় হলো। আসলেই কি অই রাতে পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। নাকি এলাকার মানুষ এটাকে গল্প হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে। তার মনে পড়ছে পরীবানুর শরীর ছিলো জলের মতোই স্বচ্ছ-সরল। বিস্ময়কর ভঙ্গিতে হাসতো সে। হাসার সময় তার চোখ জ্বলে উঠতো অপার স্নিগ্ধতা নিয়ে। ওর কপালে খেলা করতো মায়াবী রোদ। এমন একটা মেয়েকে কী কারণে খান সাব এড়িয়ে চলতেন, তা তার বোধগম্য নয়। খান সাব যদি তার আবেগের মূল্য দিতেন, তা হলে পরীবানু বেঁচে যেত। তিনি দেখতে পেলেন কে যেন আকাশ থেকে সরাসরি নদীতে এসে পড়লো। তার মনে হলো পরীবানু এতোদিন আকাশে ছিলো। আজ তার সামনে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে সে। তিনি পরীবানুর প্রতি বিমুগ্ধ ছিলেন। ওর সঙ্গে দেখা হলেই মৃদু হাসতো সে। কুশল বিনিময় করতো। পরীবানু নেই এই কথাটি ভাবতেও তার অবাক লাগছে।



তিনি আসলে খান সাবকে খুঁজতে নদীর পাড়ে এসেছিলেন। নদীর পাড়ে এসে চারদিকে তাকিয়ে যখন তিনি তাকে দেখতে পেলেন না, তখন নদীর জলের দিকে তাকালেন। তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর এক ধরনের জলজ-উন্মাদনা খেলা করতে লাগলো। জল যে জাদু জানে এবং খুবসহজেই একজন মানুষকে সম্মোহিত করতে পারে, এর আগে তার জানা ছিলো না। জলের প্রতি সব মানুষের এক ধরনের আকর্ষণ থাকে। যার জলভীতি রয়েছে সেও জলে নামতে চায়। জলের উপর দিয়ে যখন শান্ত বাতাস প্রবাহিত হয় তখন, এক ধরনের কাঁপন ওঠে। যে এই দৃশ্য দেখেছে সে জলের কাছে যেতে চাইবে। কিন্তু আজ তিনি নদীর জলে কোনো কাঁপন না দেখেই তাকিয়ে রইলেন পলকহীন। আসলে তিনি জলের ভেতর আলাদা সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছে। জল তাকে ডাকছে তার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে যাওয়ার জন্য। ওই রাতে নিশ্চয়ই জল পরীবানুকে আরও নিবিড়ভাবে ডেকেছিলো। জল তার অদ্ভুত জাদুকরি রূপ প্রদর্শন করেছিলো, যার কারণে জলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট আবিষ্ট হয়ে পরীবানু জলে ঝাঁপ দিয়েছিলো। পরীবানুর মতো তারও আজ জলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে। তবে ঝাঁপ দেবার আগে সে খান সাবকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চায়। তিনি যে নদীর পাড়ে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকেন, কী দেখেন তিনি জলের ভেতর। তার মতো বিচিত্র রূপ কি তিনি দেখতে পান। জল কি তাকে ডাকে তার কাছে যাওয়ার জন্য। এসব তিনি কিছুই জানেন না। জলের মোহ থেকে তিনি কিঞ্চিৎ মুক্ত হয়ে পেছনে ফিরে তাকালেন। না খান সাবকে কোথাও দেখতে পেলেন না। তার এখন মনে হচ্ছে কে যেন পেছন দিক থেকে ডাকছে। তাকে বলছে, দ্রুত নদীর তীর থেকে ফিরে যাও। নদী বড় রহস্যময়, জলের মায়াজাল বড় ভয়ঙ্কর।

২৩.

একটি অদৃশ্য শক্তি তাকে নদীর পাড় থেকে উত্তর দিকে নিয়ে গেল। এই শক্তিই হয়তো খান সাবকে নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে রাখত। এই শক্তিই তাকে গান গাওয়া ও বাঁশি বাজানো বন্ধ করেছে এবং পরীবানুকে নদীতে ঝাঁপ দিতে উৎসাহিত করেছে। বলেছে, তুই এখনো নদীতে ঝাঁপ দিলি না। নদীতে ঝাঁপ দে, ঝাঁপ দে। জলে রয়েছে অপার শান্তি। জল শুকিয়ে একদিন বাষ্প হয়ে যায়। তুইও একদিন বাষ্প হয়ে ইথারে মিলিয়ে যাবি। উত্তরদিকে তিনি কেন হাঁটছেন, বুঝতে পারছেন না। এদিকটাতে তার নিজের বাড়ি তো নয়-ই, কোনো আত্মীয় বাড়িও নেই। এছাড়া প্রকৃতির অপার মুগ্ধতার টানে তিনি এদিকটাতে খুব এটা আসেননি। তার নিয়মিত যাত্রা পশ্চিমের প্রকৃতি-নির্ভর জায়গায়, যেখানে তিনি অনেকবার গিয়েছেন। আর দক্ষিণে নদীর পাড়ে নানা কাজে এলাকার মানুষ যেভাবে যায়, তিনিও গিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, যারা তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে, তারা তার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে। এই তাকানোর অর্থ তিনি বুঝতে পারছেন না। তবে এটা তিনি নিশ্চিত হলেন, তার চেহারায় বিরাট কোনো পরিবর্তন হয়েছে। যার কারণে তারা ওভাবে তাকাচ্ছে। অতিরিক্ত চিন্তা কিংবা নদী তীরের শীতল বাতাস তার চেহারা পরিবর্তনে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। না হলে মানুষ অবাক দৃষ্টিতে তাকাবে কেন। তার সঙ্গে কোনো আয়না নেই। আশপাশে কোনো বাজার নেই যেখানে সেলুন থাকবে। আর সেলুনের বিশাল আয়নায় তিনি নিজেকে দেখবেন, মগ্ন হবেন আত্মপ্রেমে নিজস্ব মগ্নতায়। অনেক সময় রাস্তায় হাঁটতে গেলে উড়ন্ত পাখি তরল কিছু গায়ে এসে লাগে অপ্রত্যাশিতভাবে। যা মহাবিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তেমন কিছু হলে তো তিনি টের পেতেন। তা হলে হলোটা কী, যে মানুষ তার দিকে তাকিয়ে অবাক হচ্ছে। তার মনে হলো, তার কপালে ছোপ ছোপ রক্ত লেগে আছে। এই রক্ত পরীবানুর। নদীর জল রক্ত হয়ে গেছে এবং কে যেন ওই রক্ত তার শরীরে নিক্ষেপ করেছে।

২৩.

বাজারের পাশে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন খান সাব। এর আগে কখনো তাকে এখানে দেখা যায়নি। তিনি বাজারের থলে হাতে করে বাজার করতে এসেছেন, এ কথাও কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। বাজারে অলস আড্ডা দেওয়ারও তার ঝোঁক নেই।

আত্মমগ্নতাই তার জীবনের প্রধান অবলম্বন। তিনি নিজের ভেতর যে জগত সৃষ্টি করেছেন তা এই পৃথিবীর চেয়ে বিশাল। যে জগতের অধিকর্তা তিনি নিজে। তার পৃথিবী কেবলই রহস্যময়। নিজের জগত সম্পর্কে তার উপলব্ধি বেশ চমৎকার। এখানে তিনি নিমজ্জিত হন নিজের মতো করে। যার কারণে তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে যান, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। কতক্ষণ যে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন তা পৃথিবীর কেউ পারছেন না। তার পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী লোকজন, যারা তাকে চেনে তারা তাকে দেখে অবাক হলো। খান সাব কেন বাজারে এসেছেন, এই প্রশ্ন অনেকের মনের মধ্যে জেঁকে বসলো। খান সাব দাঁড়িয়ে মানুষ দেখছে, কুকুর বেড়াল কাক শালিক দেখছে। বাজারের চারদিকে অভাব হাহাকারগ্রস্ত মানুষ দিশাহারা হয়ে ঘুরঘুর করছে। তার মনে হলো এটা নিত্যদিনের দৃশ্য।

মানুষ মানুষকে দেখছে অবহেলার চোখে। যারা বাজার থেকে বের হওয়া মানুষ, তারা দেখছে খান সাব দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাজার থেকে কী আবিষ্কার করতে চান তিনি। নদী ও বাজার দুটোই লোক সমাগমের জায়গা। বিচিত্র সব লোক এসব জায়গায় ভিড় করে। বিচিত্র তাদের মতামত ও কর্মকাণ্ড। তিনি কি তাহলে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা বাদ দিয়ে এখন থেকে বাজারকে বেছে নিয়েছেন? দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমে তারই মহড়া চলছে।

খান সাবকে বাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলেন তিনি। তিনি বাজারের রাস্তা দিয়ে তার এক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিলেন। কী কারণে খান সাব তার চিরাচরিত নদীর পাড় ছেড়ে এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। তাকে এ তল্লাটে কোনোদিন দেখা যায়নি। মানুষ কৌতূহলবশত কিংবা কাজে যে কোনো জায়গায় যেতে পারেন। খান সাবও হয়তো এসেছেন। তিনি সরাসরি তার কাছে গেলেন না। দূরত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। এই দাঁড়িয়ে থাকাটা তার জন্য ফলদায়ক হলো না এই কারণে যে, দুজন কী কারণে প্রায় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন, এ নিয়ে বাজারে চলাচলকারী পরিচিতজনদের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিলো। নদীর পাড় হলে হয়তোবা পথচারীরা এভাবে ভাবতেন না। এর যৌক্তিক কারণ হচ্ছে নদী পাড়ে খান সাবও যান, তিনিও মাঝে

মাঝে যান। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে খান সাব যেভাবে নদী ও আকাশ দেখতেন, এখানে দাঁড়িয়ে তিনি কখনো চলাচলকারী মানুষ কখনোবা আকাশ দেখছেন। অর্থাৎ তার মনোভঙ্গি প্রায় একই রয়েছে। কেবল তিনি কেন, এলাকার মানুষ জানেন খান সাবের একটি সুন্দর কৌতূহলী মন রয়েছে। তার রয়েছে শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি প্রবল ঝোঁক। গ্রামীণ মেলায় যাত্রাপালা এলে তিনি তা দেখতে যেতেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রতি বছর সরকার বাড়িতে সীতার বনবাস নাটক ও কীর্তন হয় তাও উপভোগ করতেন তিনি। কোথাও পুঁথি পাঠের খবর শুনলে, সেখানেও যেতেন তিনি। এতোসবসত্ত্বেও খান সাবের দাঁড়ানোটা অনেকেই স্বাভাবিক মনে করছেন না। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেলো, খান সাব আগের ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার তিনি ধীরে ধীরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার এখানে হঠাৎ আগমন কিংবা দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে তিনি বিস্মিত হলেন না। মৃদু হেসে বললেন, তোমাকে অনেকদিন থেকে খুঁজছি। তোমার লাইব্রেরি করার কী হলো। নাকি আগ্রহ নেই। আমাকে কিছু বললে না তো। খান সাবের বলার ভঙ্গি সাবলীল হলেও তার দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নেমে এলো। যেখানে তিনি খান সাবকে খুঁজে পাচ্ছেন না। এমনকি তিনি গ্রামেও ছিলেন না। অথচ তাকে উল্টো প্রশ্ন করছে। তিনি অবধারিতভাবেই জানেন পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দেবার পর থেকে খান সাবের মনোজগতে ব্যাপক ভাঙন ক্ষরণ হয়েছে। এর মধ্যে তাকে এলোমেলো কিছু জিজ্ঞেস করা স্বাভাবিক।

এলাকার বেশ কজনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। যারা মোটামুটি লেখাপড়া জানেন, তাদের বই পড়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। এদের আগ্রহ কেচ্ছাকাহিনী বা কল্প কাহিনীতে। পুঁথি পাঠ বা গানের আসর বসলে এরা বেশি মজা পায়। এরা বাজারে, রাস্তার মোড়ে, নদীর ঘাটে আড্ডা মারতে বেশি আগ্রহী। তার এ কথার সঙ্গে একমত নন খান সাব। তিনি বলেন, তোমাকে বলেছি আমরা এলাকায় পাঠাগার করবো। এটা আমার স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নের সফল রূপ দিতে হবে তোমাকেই। আগেও বলেছি জমি ও টাকার ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবেনা। আর হ্যাঁ, পাঠাগারে থরে থরে সাজানো থাকবে বাঁশি, থাকবে বাদ্যযন্ত্র। এসব কেউ ব্যবহার করবেনা। জাদুঘরের মতো প্রদর্শিত থাকবে। এবার তার মনে পড়লো খান সাব এসব কথা তাকে আগেও বলেছিলেন। তিনি তার কথার কোনো জবাব দিলেন না। কেবল নীরব শ্রোতা হয়ে শুনলেন। খান সাব তাকে এও বললেন, যদি পাঠাগারে কেউ না যান, তাহলে তুমি আমি নিয়মিত যাবো, বই পড়বো। দেখবে, আমাদের দেখাদেখি অনেকেই সেখানে বই পড়তে যাচ্ছে। এ কথা বলে খান সাব তাকে রেখেই আগের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেলেন। তিনি তার সঙ্গে পাঠাগার নিয়ে নাটক করছেন কিনা তাও বুঝতে পারছেন না। তার চলে যাওয়ার ভঙ্গিটা অনেকটা অভিমানী বালকের মতো। দৃষ্টির আড়াল হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে দেখলেন তিনি। তাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। যে কোনো জিনিস চাওয়া কিংবা পাওয়ার ব্যাপারে তার শক্তিশালী কোনো মানসিক দৃঢ়তা নেই। ঠিক এই মুহূর্তে তার ভেতর পুরনো দার্শনিক-বোধের উদয় হলো, মন একবার ভেঙে গেলে, কাচ ভাঙার মতো অবস্থা হয়, জোড়া লাগে না। যে কারণে তার হৃদয় ক্ষরিত রক্তাক্ত সে কারণটি হয়তোবা তার জীবনের একটি বড় দিক, বড় ঢেউ। যে ঢেউ তাকে বেসামাল করে তোলে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় জীবনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, পুরনো জীবন থেকে নতুন জীবনে। আলো থেকে অন্ধকারে, প্রগাঢ় অন্ধকারে। যেখানে স্বপ্নের হাতছানি নেই, আছে হতাশা প্রাণচাঞ্চল্যহীন জীবনের ধীরগতি।

২৪.

খান সাব বেশ ক'বছর ধরে সরকার বাড়িতে কীর্তন শোনেন। এখানে তিনদিনব্যাপী যে মেলা হয়, সেখানে ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে আসেন। কীর্তনের মাঝে তিনি যে ভক্তি ও আবেগ দেখতে পান, তা বিরল। এখানে মূলত রাধা-কৃষ্ণের পালা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে তিনি একটি বইয়ে পড়েছিলেন, কীর্তন হচ্ছে কোনো দেব-দেবীর নাম, গুণাবলি বা কীর্তিকাহিনী সম্বন্ধিত গান। প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত জয়দেব রচিত গীতগবিন্দম, কীর্তন গানের প্রকৃত উৎস। এছাড়াও বড়ু চন্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ প্রচুর কীর্তন গান রচনা করেন। ১৫০০ শতকে শ্রীচৈতন্য ভক্তি সংগীতের এই ধারার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তার গান নারী, পুরুষ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন ভগবানের উপসনার জন্য গান ধর্মগ্রন্থ পাঠের চেয়ে সহজতর মাধ্যম। চৈতন্যের মৃত্যুর পর লীলা কীর্তনের আরও পাঁচটি ধারার সৃষ্টি হয়। এই ধারাগুলোর নামকরণ করা হয় তাদের উৎপত্তি স্থান অথবা কবিদের নাম অনুসারে, গাদানহাটি, মনোহর্ষী, রেনেটি, মান্দারনি এবং ঝাড়খাণ্ডি। ১৬০০ শতকে নরোত্তম দাস গাদানহাটি ধারাটির সূচনা করেন। তিনি ছিলেন রাজশাহী জেলার গাদানহাটি পরগনার বাসিন্দা। বীরভূম জেলার আনান দাস মনোহর মনোহর্ষী ধারাটির প্রবক্তা। বর্ধমানের বিপ্রদাস ঘোষ সূচনা করেন রেনেটি ধারার। মান্দারান সরকার প্রচলন করেন মান্দারনি কীর্তনের। ঝাড়খণ্ডি কীর্তনের উদ্ভব হয় ঝাড়খণ্ড জেলায়। কীর্তন সংগীত তিনটি তালে গাওয়া হয়, দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিত। কোলকাতা শহরের পত্তনের আগে, কীর্তন ছিল সম্পূর্ণ রূপে গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশ। ১৮০০ শতকের গোড়ার দিকে কোলকাতার পত্তনের পর পাঁচালী ও কীর্তন শহুরে সংস্কৃতির অংশ হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে হিন্দু-মুসলিম উভয়েই কীর্তন সংগীত শুনত। এমন কি স্বাধীন বাংলাদেশে অনেক জায়গায় হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে বসে কীর্তন শোনেন। কাজী নজরুল ইসলাম বেশকিছু কীর্তন সংগীত রচনা করেছেন। গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় কীর্তন হয়। যেমন প্রতি বছর হয় সরকার বাড়িতে। এই কীর্তন শোনার জন্য হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানরাও ভিড় করে। সরকার বাড়ির মেলায় ভক্তদের সঙ্গে খান সাবও রাত জেগে কীর্তন শুনেছেন। সারা রাত তিনি মহা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। যেন তিনি বাতাসে ভেসেছেন, চলে গেছেন অসীমে। ও রাধে তুমি যেও না শ্যামের কাছে। তুমি যেও না নীল যমুনার ঘাটে। শ্যামের বাঁশি জাদু জানে, ঘরের বাহির করে। ও রাধে যেও না অই ঘাটে। এ কথা বলে নর-নারী একজন আরেক জনকে জড়িয়ে ধরছে। কান্নায় চোখ হৃদয় ভাসিয়ে দিচ্ছে। কী আবেগ, কী সম্মোহনী মন্ত্র, কী ভক্তিরস। দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। খান সাব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন, চারদিকে বাঁশি বাজছে, কালার বাঁশি। সেই বাঁশির সুরে মোহিত হয়ে পরীবানু তাকে জড়িয়ে ধরছে। তাকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে বলছে শ্যামের বাঁশি আজও থামে নাই, তোমার বাঁশি থামলো কেন খান। তুমি বাঁশি বাজাও। আমি মরি নাই। যতোদিন পৃথিবীতে বাঁশি বাজবে ততদিন আমি আছি। আমি তোমার রাধে। পরীবানুর কথা শুনে তার মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। সামনে তাকিয়ে দেখেন, তিনি শ্যামা হয়ে বৃন্দাবনে বসে বাঁশি বাজাচ্ছেন। অয়ন ঘোষের চোখ ফাঁকি দিয়ে রাধে রূপী পরীবানু তার কাছে ছুটে আসছে, কাঁটার আঘাতে পা রক্তাক্ত করে।

কীর্তনের আসরে প্রথম যখন বাঁশির সুর ওঠে, তখন খান সাব ভেবেছিলেন, অই বাঁশি তিনিই বাজাচ্ছেন। নিজের বাঁশির সুরে নিজেই মাতোয়ারা হয়ে গেলেন। যখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় এলেন, তখন দেখলেন, বাঁশিওয়ালা তিনি নন অন্য কেউ। রাধে যাকে বলা হচ্ছে সে পরীবানু নয়। এবার তার স্মরণে এলো, পরীবানু কবেই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, আর তিনিও বাঁশি বাজানো ছেড়ে দিয়েছেন, শ্যামার বাঁশির সুর না থামলেও তার সুর থেমে গেছে এক করুণ পরিসমাপ্তির মধ্যে।

শীতে সরকার বাড়ির আঙিনা সাজে চিত্তাকর্ষক হয়ে। দূর থেকে দেখে মনে হয় বাড়ি নয় যেন ফুলের বাগান। বাড়ির চারদিকে সারি সারি গাদা ফুলের গাছ। হলুদ গাদাফুল ফুটে আছে রঙিন কলসির মতো, প্রেয়সীর চোখের মতো। এই ফুল পরিচর্যা ও বাগান দেখভালের জন্য আলাদা লোক রাখা আছে। বড় ধরনের হলুদ গাদা ফুলের প্রতি যাদের লোভ রয়েছে, তারা পরিচর্যাকারীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়।

সরকার বাড়িতে যেদিন মেলা শুরু হয়, তার একদিন আগে সবফুল ছেঁড়া হয়। কিছু ফুল দিয়ে বড় বড় মালা তৈরি হয়। বাকি ফুল দিয়ে সাজানো হয় মঞ্চ। মঞ্চের চারদিকে ফুল ঝুলে থাকে। আর মালাগুলো পরানো হয় ভক্ত আশেকানদের গলায়। বিশেষ করে যারা কীর্তন পরিবেশন করেন। মঞ্চে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়লে ভক্ত-শ্রোতাদের মনে আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। তারা আপ্লুত হয়ে পড়েন। যেন তারা ফুলের রাজ্যে এসে পড়েছেন। চারদিকে সৌরভ আর সৌরভ। স্নিগ্ধতায় ভেসে যাবে সবাই। এর সঙ্গে রয়েছে আগর আর ধূপের বাহার। সব মিলিয়ে সরকার বাড়ি পরিণত হয় এক মহা উৎসবে। এর পাশাপাশি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সমাহার তো রয়েছেই। যারা কীর্তন অনুষ্ঠানে আসেননি, তারা বুঝতে পারবেন না এর সৌন্দর্য আবহ। সবকিছু মিলিয়ে যে আকর্ষণ টান মূলত এর জন্যই খান সাব প্রতি বছর এ মেলায় আসেন। পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দেবার পর এই প্রথম এলেন তিনি।

উপমহাদেশের নাম করা একটি স্থান নূরুল্লাপুর দরগাশরীফ। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে এখানে হজরত শাহলাল শাহ চিশতীর উড়শ পালন করা হয়। আর এই উড়শে জড়ো হয় বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ। এই উরশকে কেন্দ্র করে এখানে বসে গ্রাম্যমেলা। প্রায় ১৫ দিন স্থায়ী হয় এই মেলা। এই

অঞ্চলের সবচেয়ে বড় গ্রামীণ মেলা এই নুরুল্লাপুর। এই মেলায় বিভিন্ন ধরনের বিনোদন পাওয়া যায়। যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ ইত্যাদির আসর বসে এই মেলায়। ধামাইল হচ্ছে এই মেলার প্রধান আকর্ষণ। বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে এই ধামাইল ভক্তরা পালন করে থাকেন। ধামাইলের আগে বাঁশ নাচানো হয়। বাঁশের আগায় দীর্ঘ সাদা চুল বেঁধে, লম্বা বাঁশকে রঙিন কাপড় দিয়ে পেঁচানো হয়। একটি দুটো নয়, দশ-বারোটি বাঁশ। ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই বাঁশ নাচানো হয়। সঙ্গে থাকে বাজনা দল। কেউ চাল, কেউ টাকা দেয় এদের। খান সাব বহুদিন এই বাঁশ নাচানো দেখেছেন। এটা জীবনের অন্যরকম মাদকতা, ছন্দ। যে দেখেনি সে বুঝতে পারবেনা কোনোদিন এর আবেদন আকর্ষণ। এই মেলায় নানা রকম মিষ্টি, চানাচুর, নিমকি, বিন্নি খই, নানা ধরনের খেলনা, প্রসাধন সামগ্রী, চুড়ি আলতা, নূপুর পাওয়া যায়। তবে খান সাবের কাছে বাঁশ নাচানো ও যাত্রা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়।

২৫.

আবহমান বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির শেকড় 'যাত্রা'। সহস্রাব্দকাল পার করলেও প্রাচীন এ সাংস্কৃতিক মাধ্যমটি পূর্ণ অবয়বনিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাত্রার মানোন্নয়নে অতীতে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা না থাকায় সীমাহীন অবহেলা নিয়ে আপন গতিতেই বিকশিত হয়েছে মূলত গ্রামীণ এ শিল্পমাধ্যম। যাত্রাই একমাত্র সাংস্কৃতিক জনমাধ্যম যার মাধ্যমে একসঙ্গে ১৫/২০ হাজার মানুষের বিনোদন চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। বিনোদনের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের মাঝে শিক্ষণীয় নানা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও যাত্রার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীনকালে ধর্মীয় উৎসবে শোভাযাত্রার আবহে পৌরাণিক কাহিনীর গীতিবদ্ধ উপস্থাপনা এক সময় যাত্রাগান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৬০ সালে ঢাকায় কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১১-৮৮) কৃষ্ণবিষয়ক ঢপ কীর্তন পরিবেশনের পাশাপাশি পৌরাণিক পালা রচনা ও মঞ্চায়নের মাধ্যমে যাত্রার যে গতি সঞ্চার করেন, চারণকবি মুকুন্দ দাসের (১৮৮৭-১৯৩৪) হাতে তা হয়ে ওঠে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের জাগরণী মন্ত্র। বিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রজেন্দ্র কুমার দে'র (১৯০৭-৭৬) হাতে যাত্রা বিকশিত হয়ে পৌরাণিক পালার পাশাপাশি ঐতিহাসিক, লোককাহিনীভিত্তিক ও সামাজিক পালায় পরিণত হয়। পেশাদার যাত্রাদলের আবির্ভাবে যাত্রা হয়ে ওঠে গ্রাম্য শিল্পমাধ্যম। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কেবল ব্যক্তি জীবনেই যাত্রা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না, তাদের সাহিত্যকর্মেও ছিল যাত্রার উজ্জ্বল উপস্থিতি। তবে খান সাবের কাছে যাত্রার কনসার্ট (বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমাহার) বেশ উপভোগ্য। কনসার্টের সময় এক ঝাঁক নারী ঝুমুর তালে নাচে। যা দর্শকের হৃদয়কে আলোড়িত করে, মন ভেসে বেড়ায় স্বর্গরাজ্যে।

মঞ্চে যখন উত্তাল নাচ শুরু হয়, তখন খান সাব অন্য এক পৃথিবীতে চলে যান। দর্শক সারি থেকে হুল্লোড় ওঠে। সবার হৃদয়ে ঢেউ জাগে, সমুদ্রের ঢেউ। খান সাবের হৃদয়েও আছড়ে পড়ে মহা-ঢেউ। এলাকার যারা প্রভাবশালী ও খ্যাতিমান, তাদেরকে বসানো হয় সামনের সারিতে। বখশিশ পাওয়ার আশায় নৃত্যশিল্পীরা তাদের দিকে বুক-শরীর বাড়িয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে। দর্শক সারি থেকে আবার হুল্লোড় ওঠে বেশ জোরে। এই দৃশ্য প্রত্যেক দর্শকের জীবনে অন্য রকম মাদকতা এনে দেয়। তারা মহাঘোর নিয়ে ঘুম ঘুম চোখে বাড়ি ফেরে। পরিবারের বকাঝকার মধ্যেও পড়ে কেউ কেউ। অনেকেই আবার সাতদিনেও ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে নাচের দৃশ্য ও মর্মস্পর্শী কিছু সংলাপ। খান সাবের কাছে মনে হয়েছে, যাত্রা কেবল বিনোদন মাধ্যম নয়, লোকশিক্ষার বাহনও। নিরক্ষতার অনগ্রসর সমাজে যাত্রা পালন করছে ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়ের ভূমিকাও।



এটি একটি ভালো মাধ্যম। এখানে শেখার অনেক কিছু রয়েছে। প্রাচীন শিল্পমাধ্যম যাত্রার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয় ব্রিটিশ শাসনামলেই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি উচ্চারিত হওয়ায় ব্রিটিশ শাসকরা বন্ধ করে দেয় মুকুন্দ দাশের স্বদেশি যাত্রা। পাকিস্তান আমলেও যাত্রাশিল্পটি রক্ষণশীল ও মৌলবাদীদের রোষানলে পড়ে। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খাঁর নির্দেশে বন্ধ করা হয় রূপবান যাত্রা। নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝেও যাত্রাশিল্প বন্ধ হয়নি। এলাকায় যেখানেই যাত্রাদল আসে, খান সাব সেখানেই ছুটে যান, দূর যতোই হোক। তিনি মনে করেন জীবন ও মনের গতি এনে দেয় যাত্রা। তিনি আনমনে হেঁটে চলেছেন নদীর দিকে। নিয়মমাফিক তার তো নদীর দিকে যাওয়ার কথা নয়। যাওয়ার কথা খান সাবের। খান সাবই নদীপ্রেমিক। তার সঙ্গে রয়েছে জলের নিবিড় সম্পর্ক। তিনি যতটা জল ভালোবাসেন, এ তল্লাটে একজনও এমন জলপ্রেমিক পাওয়া যাবেনা। তিনি কেন সকাল বেলা আনমনে হেঁটে চলেছেন নদীর দিকে, তা কেউ বলতে পারছে না। এমনকি যিনি হেঁটে চলেছেন অধিকতর নিবিষ্টতা নিয়ে তিনিও জানেন না, কেন যাচ্ছেন নদীর দিকে। নদী মানুষকে টানে আজন্মকাল। তাকেও হয়তো একই প্রক্রিয়ায় টানছে। এলাকার লোকজন খুবসহজেই উপলব্ধি করতে পারছে খানসাবের প্রভাব তার মধ্যে পড়তে শুরু করেছে। এটা খারাপ না ভালো প্রভাবতা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এলাকার অনেকেই জানেন খান সাব তাকে পাঠাগার করার কথা বলেছিলেন। এ ব্যাপারে যাবতীয় অর্থনৈতিক ও মানসিক সমর্থন তার রয়েছে। তারা এও জানেন, যেখানে খান সাব কোনো ব্যাপারে স্থির নয়, কেবল নদীর তীরে দাঁড়ানো ছাড়া। তিনি কী করে এলাকায় পাঠাগার গড়ে তুলবেন। এই দ্বিধার মাঝেও কেউ কেউ মনে করেন, প্রায় সবক্ষেত্রেই খান সাবের সঙ্গে তার এক ধরনের যোগাযোগ রয়েছে। তিনি নদী তীরে এসে দাঁড়ালেন। আজ নদীটি বেশ শান্ত স্নিগ্ধ। ঝিরঝিরে বাতাসে মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি ডানে বায়ে তাকালেন, কাউকে খোঁজার ভঙ্গিতে নয়, স্বভাবসুলভভাবে। তবে নদীর দিকেই তার মনোযোগ বেশি। নদীর ওপাড়ে যে গ্রাম সেখানে নাকি খান সাব প্রায়ই যান। এ ব্যাপারে একদিন তাকে জিজ্ঞেসে করলে, তিনি বলেন, ও খানে একজন গান গায়। সে গান শোনার জন্য তিনি যান। তিনি নাকি পরীবানুর নদীতে ঝাঁপ দেওয়া নিয়ে গান বেঁধেছেন। খান সাব গেলেই নাকি তিনি একই গান বারবার গান। গান শুনে খান সাবের নরম কাদা বুক আরও নরম হয়ে জলের মতো নদীতে গড়িয়ে যায়, দুঃখ বিষাদ হয়ে শোক হয়ে। যতক্ষণ গান চলে ততক্ষণ চোখের জল গড়ায়।

২৬.

দিনকয়েক আগে আজকের মতো তিনি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অই দিন এসেছিলেন তার রাগ-জিদ প্রশমিত করার জন্য। তিনি শুনেছেন নদী নাকি সবকিছু গ্রহণ করে। তার একটা বাজে অভ্যাস হচ্ছে, তিনি রেগে গেলে সহজে তার রাগ থামে না। এই রাগ এক ঘণ্টা থেকে সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ীই হয়। রাগী মহিলাদের মতো কখনো কখনো ধ্বংসাত্মক কাজের জড়িয়ে পড়েন তিনি। তখন রাগ প্রশমনের জন্য তিনি নদীর তীরে আসেন। অত্যন্ত ঠুনকো কারণে তিনি রেগে যান। অনেক সময় রেগে যান যুক্তিহীনভাবে। জিদ আর রাগের সংমিশ্রণে রিরি করতে করতে তিনি যখন নদীর তীরে এলেন তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য তার চোখে পড়ল। তিনি দেখতে পেলেন খান সাব মাথায় গামছা বেঁধে সাঁতার দিয়ে নদী পাড় হচ্ছেন। তিনি নদীর হালকা ঢেউয়ের তালে দুলছেন। যেমন করে ছোট নৌকা দোলে। এবার তার মনে হলো পরীবানুর ওপর রচিত গান শোনার জন্যই তিনি এ কাজ করছেন। তার হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা ও উদ্দীপনা তাকে যারপরনাই মোহিত করে। এই ঘটনায় খান সাবের প্রতি তার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তার মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলো যে, প্রকৃত অর্থে তিনি একজন প্রেমিক। মানুষকে কী করে ভালোবাসতে হয় তিনি জানেন। নদীর শীতল বাতাস তার গায়ে লাগার পর এক ধরনের প্রশান্তি এলো মনেও। তার জিদ রাগ দ্রুত কমে গেল। সামনের দিকে তাকালেন তিনি। দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। গ্রাম থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। সম্ভবত পরীবানুর ওপর

রচিত গান।
তিনি যাচ্ছেন দূরবর্তী গ্রামে। অন্তত দশটি গ্রাম পেরিয়ে ওই গ্রামে যেতে হয়। অনেক দিন পর তার এ যাত্রা। পথে পথে তিনি নানা জিনিস দেখতে পেলেন। শতবর্ষী গাছটি দাঁড়িয়ে আছে আগের মতোই। গাছটি অনেক কিছুর আশ্রয়দাতা। এই গ্রামে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছে গাছটি। এই গাছটির পাতা ঝরা কখনো কেউ দেখেনি। কখনো নতুন পাতা গজিয়েছে কিনা তাও কেউ বলতে পারবেনা। নতুন পাতা গজায় শীর্ণকায় পাতা হলুদ পাতা ঝরে যায়, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। গাছটি এই নিয়মের বাইরে। বসন্ত এলে প্রতিটি গাছের যে পরিবর্তন ঘটে, এই গাছের মধ্যে তা নেই।
অনেকেই মনে করেন এই গাছের গোড়ায় এমন বিশেষ মাটি রয়েছে, যে মাটির গুণগত মানের কারণে গাছটি চিরযৌবন লাভ করেছে। পৃথিবীর সব গাছ মরে গেলেও এই গাছের মৃত্যু হবেনা কোনো দিন। প্রবীণ কেউ কেউ মনে করেন, গভীর রাতে ঝড়ের মাঝে উড়ে এসেছিল গাছের চারাটি। এরপর এক কৃষক পথের ধারে গাছটি রোপণ করেছিল। গাছটির চারা যখন সে হাতে নিয়েছিল, তখন সারা শরীর প্রচণ্ডবেগে ঝাঁকুনি দিয়েছিল। চারাটি নাকি তার সঙ্গে কথা বলেছিল, হেসেছিল। চারাগাছ আওয়াজ তুলে বলেছিল আমি অমর। আমি তোদের আশীর্বাদ। এই কথা মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে গ্রামকে গ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল। এই গাছটি দেখার জন্য বহুদূর থেকে মানুষ আসে। এই গাছের দিকে তাকিয়ে যে যা প্রত্যাশা করে তাই তার জীবনে ফলে। তিনি গাছটির দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকলেন। তার কোনো প্রত্যাশা নেই স্বপ্ন নেই, তাই গাছের কাছে কোনো কিছুই চাওয়ার নেই।
তিনি যে আত্মীয়ের বাড়িতে যাবেন, সে দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। এই দিকটায় এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। গ্রামীণ জনপদ কিছুটা নাগরিক রূপ নিয়েছে। সামনেই একটা বাজার। সপ্তাহে একদিন হাট বসে এখানে। আজ হাটবার। কৌতূহল বশত তিনি হাটে ঢুকলেন। হাটের ভেতরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। একটা লোক বাঁশি বাজাচ্ছে, লোকজন মোহিত হয়ে সে বাঁশি শুনছে। তিনি লোকটাকে ভালো করে দেখে যারপনাই অবাক হলেন, খান সাবনিবিষ্ট মনে শরীরের সমস্ত শক্তি মুখে এনে বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছেন। সুর ছড়িয়ে পড়ছে বারোয়ারী কোলাহলময় হাটে।
তিনি রাস্তায় হাঁটছেন, নাকি বাজারে প্রবেশ করেছেন তা বলতে পারছেন না। বাজারে যিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন, আসলেই কি তিনি খান সাব? তা কী করে হয়। তিনি তো বলেছেন কেবল বাঁশিতে সুর তোলার কারণেই পরীবানু মারা গেছে। তিনি জীবনে আর বাঁশি হাতে নেবেন না। অথচ কী দেখতে পাচ্ছেন তিনি। নিজের শরীরে চিমটি কাটেন তিনি, চেতবোধ আছে কিনা যাচাই করার জন্য। দৃষ্টি পরীক্ষা করার জন্য গাছের দিকে তাকালেন। সবই ঠিক আছে। যদি সবঠিক থাকে তবেখান সাবের বাঁশির সুরে পরীবানু কী করে নাচছে? সে তো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছে। বাজারের ভেতরে প্রবেশ করে তিনি কি ভেলকির মধ্যে পড়ে গেলেন। নাকি খান সাবঅতি চালাকির আশ্রয় নিয়েছেন। আসলে পরীবানু মরে নি। খান সাবতাকে নিয়ে অন্য গ্রামে সংসার পেতেছেন। তারা দুজন গ্রামের চেনা মানুষের আড়ালে গিয়ে নাচ গান করে অর্থ উপার্জন করছেন। গ্রামে পরীবানুকে তিনি কখনো নাচতে দেখেননি। এমনও হতে পারে পরীবানু মারা গেছে। তারই আদলের অন্য কোনো মেয়েকে দিয়ে তিনি পরীবানুর মহড়া দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন। আচমকা তার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। আকাশে চক্কর খাওয়া ঘুড়ির মতো অবস্থা হলো তার। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? এই গল্প যদি তিনি গ্রামের কাউকে বলেন, তা হলে কেউ বিশ্বাস করবেনা। খান সাবযে ইদানীং বেশিরভাগ সময় গ্রামে থাকেন না। দূর অঞ্চলে এসে নাচ-গান করছেন, সুন্দরী নারী জুটিয়ে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। হেমিলনের বাঁশিওয়ালার মতো বাঁশি বাজাচ্ছেন খান সাব, আর পরীবানু সিনেমার নাচনিওয়ালির মতো কোমর দুলিয়ে নেচে যাচ্ছে। কী এক অপূর্ব দৃশ্য। তিনি ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর চোখ খুললেন। একই দৃশ্য তিনি দেখতে পেলেন। খান সাবের কণ্ঠ একই, তবে মহিলা কণ্ঠ পরীবানুর মতো তার কাছে মনে হচ্ছে না। মহিলার হাসিটা পরীবানুর মতোই।
২৭.
অনেকদিন থেকেই খান সাবের মনটা ভীষণ অস্থির। এই অস্থিরতার কার্যকারণ সূত্র অনেক। উজ্জ্বল যে দিকটি তা হলো বাঁশি বাজাতে না পারা। তিনি শপথ নিয়েছেন কখনোই আর বাঁশি বাজাবেন না। কিন্তু একটি ঘটনা তাকে অবাক করে দিল এবং তার মনোজগতে ব্যাপক পরিবর্তন এলো। হঠাৎ হঠাৎ দূরে কোথাও চলে যাওয়া তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটা তিনি যেমন জানেন, জানেন এলাকার মানুষও। হাঁটতে হাঁটতে তিনি একটি বাজারের কাছে এলেন। এই বাজারটি তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে, যেখানে সপ্তায় একদিন হাটও বসে। তিনি দেখতে পেলেন একটি মেয়ে কোমর দুলিয়ে তারপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে হাসলো মেয়েটি। মেয়েটিকে দেখামাত্র পরীবানু বলে ডাকলেন তিনি। মেয়েটি দেখতে হুবহু পরীবানুর মতো। ডাকামাত্রই মেয়েটি সাড়া দিল। বলল, আমারে ডাকছেন। আমি পরীবানু না ফুলবানু। পরী-বানুর ছোট বোন। আসলেই মেয়েটি পরীবানুর ছোট বোন, এমনটাই মনে হলো খান সাবের কাছে। অবাক ব্যাপার মেয়েটি একেবারেই পরীবানুর মতো। তার মনে হলো ওরা যমজ বোন। চোখ, হাসি, কথা বলার ধরন, সবই এক। মেয়েটি বলল, তোমার হাতে বাঁশি ক্যান, বাজাইতে পারো। জান, বাঁশির সুর আমারে দিওয়ানা করে। কতকাল বাঁশির সুর শুনি না। বাজাও না তোমার বাঁশি। তোমার বাঁশির সুরে আমার মনডা নাচাইতে চাই। সবাই মন নাচাইতে পারে না। মন নাচাইতে জাদু লাগে। আমি জানি তুমি ডাকুকর। বাঁশির জাদুকর। এবার নাচাও আমার মন। খান সাব মেয়েটির কথায় আবিষ্ট হলো। তার মনে হলো এ পরীবানুর বোন না, পরীবানুই। নদী ঝাঁপ দেওয়ার পরও সে মরে নাই। ভাটির টানে এই এলাকায় চলে এসেছে। তার কথায় খান সাব বাঁশি বাজাতে শুরু করলেন। তার বাঁশির সুরে মেয়েটি নাচতে লাগলেন। এমন নাচ তিনি জীবনেও দেখেননি, মেলার যাত্রা দলেও না।
ভোরের শীতল বাতাসের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল খান সাব দূরগ্রামে পরীবানুকে খুঁজে পেয়েছে। ও আসলে মরে নি, এমনকি সে রাতে নদীতেও ঝাঁপ দেয়নি। এতদিন খান সাবই তাকে আড়াল করে রেখেছে। তিনি তাকে কেবল বিয়েই করেন নি, ঘরের বাইরেও তাকে নিয়ে আনন্দ-ফুর্তি করছেন। হাটে-বাজারে তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন আর পরীবানু নাচছে। খান সাবনাকি সেখানে জমি কিনে ওকে ঘর তৈরি করে দিয়েছেন। খান সাবযে মাঝে মাঝে নিজ এলাকা থেকে উধাও হয়ে যান, এর কারণ পরীবানু। তবেযারা এলাকার সচেতন মানুষ তারা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে চান না, তিনি আরেকটা বিয়ে করেছেন এবং তার স্ত্রী পরীবানু। তারা এও বিশ্বাস করতে চান না খান সাবহাটে-বাজারে বাঁশি বাজাবেন। তার চরিত্রের সঙ্গে এটা যায় না। কারণ তার মধ্যে এক ধরনের বনেদিপনা রয়েছে। এই বনেদিআনা পারিবারিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত। শখের বসে বাঁশি বাজানো আর বাণিজ্যিকভাবেবাজানো এক কথা নয়। এলাকাবাসী মনে করে পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছে এটাই সত্য। যদি তাই না হবে, তা হলে অই ঘটনার পর খান সাবের নদীপ্রীতি বেড়ে গেল কেন? তিনি তো সময়ে অসময়ে নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এলাকায় এটাও প্রতিষ্ঠিত তিনি কেবল পরীবানুর কারণেই বাঁশি বাজানো ছেড়ে দিয়েছেন। যে বা যারা দূরগ্রামে তাকে বাঁশি বাজাতে দেখেছে তারা ভুল দেখেছে। এটা বিবাগী খান সাবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার মাত্র। যিনি জলে ডুবেযান তিনি তো জলেই ডুবেযান। যার বদনাম হয় সবক্ষেত্রেই হয়। যা কিছু হারায় কেষ্টা বেটাই চোর।
২৮.

পাঠাগার গড়ার স্বপ্নটি তার ভেতর থেকে মরে যায়নি। তার ধারণা ছিল খান সাবমাস তিনেকের মধ্যেই পাঠাগারের কাজে হাত দেবেন। সম্ভবত সে কারণেই তিনি তাকে বই পড়তে দিয়েছিলেন। তিনিও খান সাবের কথায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। তার ভেতর এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এলাকায় একটি পাঠাগার গড়ে উঠলে মানুষের মধ্যে পড়ার অভ্যাস তৈরি হবে। অন্যদিকে তারও পড়ার বইয়ের অভাবহবেনা।
তিনি দ্রুততম মানবের মতো যেন দৌড়াচ্ছেন। এ দৌড় মনের। অজানা কারণে তার মন আজ ভীষণ অস্থির। তিনি যতই পায়ের বেগ বাড়াতে চান, মনের বেগ বেড়ে যায়। বই পড়ার ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ ছিল না। এই আগ্রহ তৈরি করেছেন খান সাবই। তিনি তাকে লাইব্রেরি তৈরি করে দেওয়ার স্বপ্নও দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন মানসিক প্রস্তুতির কথাও। এ নিয়ে এলাকার শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা মানুষের সঙ্গে কথাও বলেছেন। অনেকেই আগ্রহ দেখিয়েছেন। খান সাবতাকে একাধিকবার বলেছিলেন লাইব্রেরির জন্য তিনি জমি ও অবকাঠামো তৈরি করে দেবেন। আজ তিনি তার অবস্থান থেকে সরে গেছেন। তিনি দূর গ্রামে গিয়ে রং-তামাশায় মত্ত রয়েছেন। বাঁশি বাজাচ্ছেন, নেচে বেড়াচ্ছেন। তিনি নারীকে কেন্দ্র করে নতুন জীবন পেয়েছেন। যে জীবন অনেকে প্রত্যাশাই কেবল করে না, অই জীবনে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। খান সাবও দেখেছিলেন, হয়তো বা তিনি প্রকাশ করেননি। যাদের অসম্ভবনারীপ্রীতি রয়েছে তারা যে কোনো সময় অঘটন ঘটাতে পারেন। এটা তারা

তাদের জীবনের অনিবার্য অংশ মনে করেন। এ ক্ষেত্রে লাইব্রেরি করা এলাকায় সাংস্কৃতিক বিস্তার ঘটানো একেবারেই গৌণ। অন্যরা যাই করুক খান সাবের কাছ থেকে তিনি এটা প্রত্যাশা করেননি। তার কারণে একটা শুভ উদ্যোগ মাঠে মারা গেল। এই ঘটনায় তার নিজের ওপর জিদ বেড়ে গেছে। তাই তিনি পায়ের বেগ বাড়াতে চাচ্ছেন, কিন্তু অকারণে মনের বেগ বেড়ে যাচ্ছে, যা রূপ নিচ্ছে ভয়ংকর জিদে। যেন খান সাবকে সামনে পেলে তিনি গলা চেপে ধরবেন।

বিকালের মরা রোদ মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছেন তিনি। অনেকদিন থেকেই খান সাবের ওপর যারপনাই বিরক্ত তিনি। যে আলোর পথ একদিন তিনি দেখিয়েছিলেন, সে পথ ধরে তিনি অনেকদূর যেতে চেয়েছিলেন। মাঝপথে হোঁচট খেলেন তিনি। তার মনটা বিষিয়ে উঠল। নাচনেওয়ালিকে নিয়ে আসলেই তিনি ঘর করছেন কিনা। তা ছাড়া বাজারে দুজনে নিয়মিত রঙ্গ-তামাশা করছেন কিনা তাও নিশ্চিত হওয়া দরকার। এর আগে তিনি দুজনকে বাজারের ভেতর যেভাবেআবিষ্কার করেছিলেন তা সত্য নাও হতে পারে।

অথবা পুরোটাই ছিল তার চোখের বিভ্রম। হয়তো খান সাবের মতো কাউকে তিনি বাজারের ভেতর ভিড়ের মধ্যে দেখেছেন। তার সঙ্গের মেয়েটিকে দেখে তার পরী-বানুর মতো মনে হয়েছে। তার চিন্তাঘোর দ্বিধা কাটানোর জন্য তিনি তার এক বন্ধুকে নিয়ে দূর গ্রামে রওয়ানা দিলেন। অবাক ব্যাপার হচ্ছে ওই বাজারে খান সাবপরীবানু কাউকেই দেখা গেল নে। এমন কি আশপাশে তাদের যে থাকার কথা ছিল, এরকম হদিসও পাওয়া গেল না। তা হলে কি তিনি স্বপ্নে এসবচটকদার ঘটনা আবিষ্কার করেছিলেন। এসবভেবেতার মনোজগৎ এলোমেলো হয়ে গেল। এই মুহূর্তে খান সাবের চেহারাটা তিনি মনে করতে পারছেন না। কে যেন হঠাৎ ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল। মনে হলো খান সাবআকাশে উড়ছে।

২৯.

খান সাবের নারী বিষয়ক জীবন যেমন, তার জীবন তেমন কি না, এমন এক প্রশ্ন নিজেকে করে অনেকটা বোকা বনে গেলেন তিনি। তিনি গানও জানেন না, জানেন না বাঁশি বাজাতেও। নারীকে আকৃষ্ট করতে যে বিশেষ গুণের প্রয়োজন তাও তার নেই। তাই তার জীবনে কোনো নারী আসেনি। তবে একজনকে তার ভালো লেগেছিল, তাকে তিনি চিঠিও দিয়েছিলেন, একটি নয় দশটি। একটারও উত্তর পান নি। যাকে তিনি চিঠি দিয়েছিলেন, চিঠির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায় নি। দশটি চিঠির ভাষা প্রায় একই ছিলো, এই কারণে যে প্রথম চিঠির উত্তর না পেয়ে তিনি প্রায় একই ভাষায় পরের চিঠি লিখেন। দ্বিতীয় চিঠির উত্তর না পেয়ে তৃতীয়টি। এভাবেউত্তর না পাওয়ার কারণে পর পর দশটি চিঠি লিখেন তিনি। যার ফলে ভাষা প্রায় একই হয়ে যায়। প্রথম চিঠির উত্তর না পেয়ে কী কারণে তিনি পরপর দশটি চিঠি লিখতে গেলেন এটা কিছুতেই তার মাথায় ধরছে না। এখন বুঝতে পারছেন তিনি যা করেছেন সম্পর্কের অধিকারে নয়, আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে। তার অই কাজে প্রচণ্ড আবেগ ছিল। না হলে চিঠির উত্তর না পেয়ে কেউ এতটা চিঠি লিখে। খান সাবের জন্য পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। তার জন্য তো কেউ নদীতে ঝাঁপ দেওয়া তো দূরের কথা চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেয়নি। এ ক্ষেত্রে খান সাব সৌভাগ্যবান। তার জন্য একজন মরেছে। আবার তিনি নাকি পরীবানুর মতো আরেকজন পেয়েছেন। তার হৃদয় শূন্যই থেকে গেল, জীবনেও পূর্ণতা পেল না। ভালোবাসার ক্ষেত্রে তিনি অনাথ অসহায়। তার এই শূন্যতা এই জীবনে ঘুচবেনা।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে তিনি অনাথ অসহায়। এই কথাটি তিনি মেনে নিতে পারছেন না। পৃথিবীর কোনো মানুষই ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনাথ অসহায় হয় না। কেউ না কেউ তাকে ভালোবাসে। বৃক্ষ ফুল নদী প্রকৃতি তাকে ভালোবাসে। বাতাস তাকে ভালোবাসে। তিনি যে পথ দিয়ে হেঁটে যান সে পথ তাকে ভালোবাসে। লতাগুল্ম তাকে জড়িয়ে ধরে। আকাশ তাকে দেখে হাসে। সাগর পাহাড় তাকে ডাকে। বৃষ্টি তাকে মধুর আহ্বান করে। গ্রামের লোক তাকে ভালোবাসে। তিনি যখন হাজার রজনীর গল্প পড়তেন নিবিষ্টচিত্তে, তখন রাত তাকে আহ্বান করতো, তার সঙ্গে মিশে যেতে। প্রবল জোছনার আকর্ষণে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন। রাতের নীরবপ্রকৃতি তাকে গভীরভাবেআকর্ষণ করত। সকালের রোদ তাকে নিজস্ব কায়দায় অভিবাদন জানাত। যার চারদিকে এমন দৃশ্য-মুগ্ধকর আয়োজন, এত আহ্বান, তার কি নারীর ভালোবাসা খুবজরুরি। এমন এক প্রশ্ন নিজেকে করলেন তিনি। জীবনে ভালোবাসা দরকার, তা যে মাধ্যম থেকেই আসুক না কেন। এসবকথা ভেবে তার মনটা শূন্যতায় ভরে গেল। আজ তার খান সাবকে দরকার। কিন্তু তিনি তো অনেকদিন হলো এলাকার বাইরে। দ্বিতীয় পরীবানুকে নিয়ে যে সংসার করার গুজবএলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে, এটাও সত্য নয়। কারণ তিনি নিজে গিয়ে মাঠপর্যায়ে তদারক করে এসেছেন। তিনি মনে করেন, খান সাবের সঙ্গে কম দেখা হলেও তিনি, একটি সম্মোহনী চরিত্র। তিনি কেবল পরীবানুকে নয়, তাকেও আবিষ্ট করেছেন। যার কারণে ব্যক্তি জীবনে তার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করলেও তিনি ঈর্ষান্বিত হন না। কারণ তিনি নিজে গিয়ে মাঠপর্যায়ে তদারক করে এসেছেন। তিনি মনে করেন, খান সাবের সঙ্গে কম দেখা হলেও তিনি, একটি সম্মোহনী চরিত্র। অর্থ ক্ষমতা নারী এই তিনটি শব্দ প্রতিটি মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। মোগল হেরেমে নারী বইয়ে তিনি এটা পাঠ করেছিলেন। তিন দিন পর বিষয়টি তার কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেল, এই কারণে যে নারী বিষয়ে তার ভেতর নতুন ভাবনার উদয় হলো। তিনি মনে করেন, জীবনের নানা ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য নারীর সঙ্গে গভীরভাবেজড়িয়ে না যাওয়াই উত্তম। তিনি এও ভাবেন নারী যেভাবেসুখ আনন্দ দিতে পারে, তার অন্য কেউ পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসের বড় অংশজুড়ে রয়েছে অর্থ ক্ষমতা নারী এই তিন বিষয়ের উপাখ্যান। মানুষের উত্থান-পতনের দালিলিক প্রমাণ এই তিনটিই। মানুষের এগিয়ে যাওয়া পিছিয়ে থাকা এই তিনটির ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে থাকে। তিনি বিষয়গুলো নিয়ে যেভাবেভাবছেন, অন্যের সঙ্গে হয়তোবা তার ভাবনা মিলবেনা। অথচ তিনিই এক সময় বলতেন নারী প্রকৃতির অংশ। নারী ছাড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য পরিপূর্ণতা পায় না। তিনি মনে করতেন নারী কীটের মতো নয়, ফুলের মতো। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য নারীর মধ্যে নিহিত। নারী পুরুষের জন্য যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে পুরুষ তা পারে না। পরীবানু খান সাবের জন্য নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে। এই সমাজে মজনু চণ্ডিদাস কেবল উদাহরণ নয়, পরীবানু এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি এও মনে করেন একজন পুরুষকে পরিপূর্ণ জীবনের দিকে যেতে হলে, সঙ্গে নারী লাগবে। নারীবিহীন জীবন মরুভূমির মতো। তিনি বুঝতে পারেন তার কথার মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে। জীবন কখনোই স্থায়ী কোনো সাজানো বাগানের মতো নয়, ঝড় বন্যা আসবেবিপদ আসবে। নারী আসবেনারী যাবে। যেমন করে এসেছে আবার চলে গেছে খান সাবের জীবনে। নারীকে কেন্দ্র করে তিনি কেমন জীবন চাচ্ছেন, এটাই নিশ্চিত হতে পারছেন না। তবেএটা তিনি বুঝতে পারছেন যে, তার ভাবনায় নারী ঢুকে গেছে। তার জীবনকে আরও শূন্য করে দিচ্ছে।

খান সাবকে নিয়ে এলাকায় যত কথাই উঠুক না কেন, এটা সত্য যে তিনি পরীবানুর মতো একজনকে পেয়েছিল অলৌকিকভাবে। এমন ঘটনা কারো কার জীবনে ঘটে। অতীতের দিকে যখন তিনি তাকান তখন স্পষ্ট দেখতে পান, কিছু জীবনচিত্র। তিনি জীবনকে সাজাতে চেয়েছিলেন, নিজের মতো করে, অন্য অনেকের মতো। শেষ পর্যন্ত পারলেন না। বারবার ঝড় আসে, করুণ ঝড়, বেদনার ঝড়। উড়িয়ে নিয়ে যায় সবস্বপ্ন-আশা। জীবনের প্রথম ঘর বেঁধে তিনি সুখী হতে চেয়েছিলেন। সেটা সম্ভবহয়নি। দোষ তার না অন্যের তা তিনি জানেন না। জানার ইচ্ছেও নেই। দ্বিতীয়বার ঘর বেঁধে তিনি সুখ খুঁজেছিলেন। সুখ সোনার হরিণ, ধরা দেয়নি। এর মাঝখানে ঝড়ের



মতো নয়, বসন্ত বাতাসের মতো এলো পরীবানু। ওকে ভালোভাবে বোঝার আগেই ও চলে গেল পরপারে, অভিমান করে। কেউ যদি কারও জন্য নদীতে ঝাঁপ দেয়, এর চেয়ে বেদনার আর কী হতে পারে। সে বেদনা হয়তো বা তাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। শোক বেদনা কাটিয়ে ওঠার আগেই তার জীবনে যে এলো সে অবিকল পরীবানুর মতোই। আনন্দের জোয়ারে ভেসে গেলেন তিনি। ভুলে গেলেন নিজস্ব সত্তা। তার জন্য নাচলেন গাইলেন বাঁশি বাজালেন, নিজ এলাকা থেকে চলে এলেন। কই তাকে তো তিনি ধরে রাখতে পারলেন না। আসলে ভাসমার শেওলা সবসময় ভাসমান। যে পাখি কেবল আকাশে ওড়ে তাকে কেন আশ্রয়ের আহবান করা হয়। তিনি অনেক পরে বুঝতে পারলেন, একজন আরেক জনের বিকল্প নয়। সবাই ভালোবাসার জন্য নদীতে ঝাঁপ দেয়া সাহস সক্ষমতা রাখে না। পরীবানু একজনই।

৩০.

হেমন্তের মরা রোদের মৌসুম শেষ হয়ে আসছে। বিকাল হলেই বাতাসে শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে, রাত যতো গভীর হয় শীত মহড়া দিতে শুরু করে। সন্ধ্যা নামার আগেই খান সাব পৌঁছে গেলেন তার ডেরায়, যেখানে তিনি বাজারে কুড়িয়ে পাওয়া পরীবানুকে রেখে নিজ গ্রামে গিয়েছিলেন দুই দিনের জন্য। হেমন্তের শীত শীত আমেজকে উপভোগ করতে করতে তিনি আনমনে সামনের দিকে এগুচ্ছিলেন, তার হাতে ছিল লাল পেড়ে সবুজ জমিনের শাড়ি, যা তিনি সোনাতলা হাট থেকে কিনেছিলেন। এই শাড়ি পরে নাচলে ওকে সত্যই পরীর মতো লাগবে। শাড়ি হাতে থাকার কারণে তার সারা শরীরে শিহরণ জাগছে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে লোকজ নাচের মুদ্রা। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, কে যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে, চোখের ইশারা দিচ্ছে, দর্শক মাতানোর মতো। একটা অজানা শক্তি তার পায়ের বেগ বাড়িয়ে দিল, সূর্য ডোবার আগ মুহূর্তে তিনি ডেরায় গেলেন। মোলায়েম স্বরে ওকে ডাকলেন। তার ডাকের মধ্যে ছিল আন্তরিকতা ভালোবাসা। না কোনো সাড়া-শব্দ নেই। অসময়ে গেল কোথায় ও। ও তো বলেছে একা একা আর নাচ-গান করবে না বাঁশিওয়ালা ছাড়া। তা হলে গেল কোথায় সে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পরও দেখা পাওয়া গেল না। তার ভেতর রহস্য খেলা করতে লাগল। কদিন যাবৎ তার কেবলই মনে পড়ে কে যেন ওকে ডাকে। অদৃশ্য কোনো শক্তি।

নতুন পরীবানু কীভাবে কোথায় হারিয়ে গেল খান সাব টের পেলেন না। তার ধারণা ও নতুন কোনো তরুণের সঙ্গে জুটি বেঁধে দূরে কোথাও নেচে বেড়াচ্ছে। কারণ নাচে যার নেশা সে তো কোনোদিন দমে কিংবা থেমে থাকতে পারে না। তাই তিনি দূরগ্রামের দুটো বাজারে ওকে খুঁজতে বের হলেন। তিনি যে বাজারটিতে ঢুকলেন, ওই বাজারে একটি মেয়ে সাপের খেলা দেখাচ্ছে। মেয়েটি দেখতে অবিকল ওর মতো। এটা তার চোখের বিভ্রম কিনা তা যাচাই করার জন্য ডান হাতের পিঠ দিয়ে চোখে ডলা দিলেন। না তিনি ঠিকই আছেন। মেয়েটি আসলেই ও। খেলা দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে কোমর দোলাচ্ছে মেয়েটি। ও হাসলে আগের মতোই। তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলল, বুড়া নাগর আমারে তালাশ করতে আইছে। আমি তো তোমারে ফাঁকি দিছি। আমি নাচনেওয়ালি নই ভয়ংকর সাপুড়ে। সাপ খেলা দেখাই আবার ছোবলও মারি। এর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। তা হলে ও সাপুড়ের মেয়ে। এই সত্যটি তার কাছে গোপন করেছিল ও। কিন্তু তাতে ওর লাভ কী। ও তো তার কাছ থেকে বড় ধরনের সাহায্য নেয়নি। তা হলে তাকে ফাঁকি দিয়ে ও দূর গ্রামে চলে এলো কেন? নাকি মূল পেশায় ফিরে আসার জন্য। তার চারপাশে সারিবদ্ধ নানা কিসিমের মানুষ। সবার নজর ওর দিকে। সাপ ভয়ংকর কিন্তু ও অনেক সুন্দর। এই সত্যটি ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো। প্রতিধ্বনিত হলো চারদিকে। খান সাবের কানে বেদনা হয়ে বাজতে লাগল। তিনি মহা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলেন। যে সংলাপ তিনি শুনতে পেলেন, সেটা কি ওর, নাকি আকাশ থেকে ভেসে এলো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। ওর আহবানে তিনি সাড়া দিলেন না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি অবাক চোখে তাকালেন, ওর দিকে। ও আবার হাসলো, হাত দিয়ে ঈশারা করল ওর কাছে যেতে। তিনি বুঝতে পারছেন, ও তাকে সাপুড়ে হয়ে যেতে বলেছেন। তিনি যদি সাপুড়ে হন, কেবল তা হলেই ও তার সঙ্গে জুটি বাঁধবে।

নতুন পরীবানু অই দিন যা বলেছিল তা কি সত্য? ও কি আসলেই তাকে সাপুড়ে হয়ে যেতে বলেছে। বাজারে তিনি যাকে দেখেছেন সে যদি নতুন পরী-বানু না হয় তা হলে তাকে কেন বলবে- বুড়া নাগর আমারে তালাশ করতে আইছে। আমি তো তোমারে ফাঁকি দিছি। আমি নাচনেওয়ালি নই ভয়ংকর সাপুড়ে। সাপ খেলা দেখাই আবার ছোবলও মারি। ওই দিন বাজার থেকে ফেরার পর খান সাব নির্জন নদীর মতো হয়ে পড়লেন। কিছুতেই ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। আসলে মেয়েটি কে, যে তরুণের সঙ্গে নাচছিল। যারা বিভিন্ন জায়গায় সাপ খেলা দেখায় তারা সুযোগ বুঝে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। মেয়েটি সে রকমই। তার হাসি শরীরের বাঁক নাচের মুদ্রা কিছুতেই তিনি ভুলতে পারছেন না। জীবনে যেসব দৃশ্য চোখে সেঁটে থাকে, যেসব অনুভূতি হৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে দোল খায় জোয়ারের জলের মতো উছলে ওঠে যা কখনো ভোলা যায় না। ওকেও তিনি কোনোভাবেই ভুলতে পারছেন না। যেন ও তার হৃদয়ে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। যে পরীবানু তার জন্য জীবন দিয়েছে, তাকেও তিনি ভুলতে বসেছে। এমন মুগ্ধতা তার জীবনে কখনো আগে আসেনি। বলা হয়ে থাকে অর্থঘোর নারীঘোর ক্ষমতাঘোর এই তিন ঘোর মানুষ কাটাতে পারে না। তিনিও পারছেন না। তবে তার ঘোর একটাই নারীঘোর। নারীর সৌন্দর্য হাসি তার লাবণ্যময় শরীর এসবতার আকর্ষণের বিষয়। তিনি মনে করেন যতোক্ষণ নারীর কাছে থাকা যায় ততক্ষণই প্রশান্তি। নতুন পরীবানুকে তার চাই। প্রয়োজনে ওই তরুণের কাছ থেকে তিনি ছিনিয়ে আনবেন। তিনি হবে প্রাগৈতিহাসিক গল্পের ভিখু। ওই দিন বাজার থেকে ফেরার পর তার ঘুম হলো না। তিনি ওকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন তরুণের সঙ্গে। ওকে মনে হলো আকর্ষণের আধার। ও যখন তার কাছে ছিল তখন তিনি ঠিক এভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। জীবন চলার পথে কেউ কেউ অনিবার্য হয়ে পড়ে। খান সাবের মনে হলো, ও তার জীবনে অনিবার্য নারী। ওকে হারানো যাবে না। তিনি গ্রাম থেকে আবার অদৃশ্য হলেন। তিনি শপথ করলেন ওকে খুঁজে বের করবেনই। যদি ওকে খুঁজে না পাওয়া যায় তিনি গ্রামে ফিরবেন না।

৩০.

প্রত্যেক এলাকায় কিছু মানুষ থাকে সমাদৃত, কিছু মানুষ সমালোচিত। মিশ্র গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও কিছু মানুষ আত্মতুষ্টি নিয়ে বেঁচে থাকেন। খান সাব শেষ দলের। তিনি নারীকেন্দ্রিক বিষয়ে নানা সময়ে সমালোচিত হলেও, এলাকার কিছু লোক তার অন্ধ ভক্ত। তিনি কেবল সংস্কৃতিমনাই নন, তার ভেতর যে রসবোধ রয়েছে, তা এলাকার কারও মধ্যে নেই। যে কোনো বিষয়ে তার উপস্থাপনভঙ্গি অসাধারণ। তিনি গল্প বলেন আরব্য উপন্যাসের আদলে, সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ যা-ই থাকুক না কেন, শুনতে বেশ মজা লাগে। তার কথার জাদুতে এলাকার সাধারণ মানুষ ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়। এই ধরনের বিশেষ গুণ সবার থাকে না। যারা প্রেমিক ও মানবিক, অন্যের দুঃখে যার মন কাঁদে, তিনিই মানুষের ভালোবাসা পেতে পারেন। তিনি নারীরও ভালোবাসা পেয়েছেন তার মনহরণকারী ও মুগ্ধকর ব্যবহারের জন্য। যৌক্তিক কারণেই এলাকার একশ্রেণির মানুষ চাচ্ছেন না, তিনি বারবার এলাকা থেকে নিরুদ্দেশ থাকুক। তিনি যখন এলাকায় থাকেন না, তখন এলাকায় চলে আসে মরুভূমির আবহ। যেন পাখির কলতান বন্ধ হয়ে যায়, থেমে যায় প্রবহমান নদী। এলাকার মানুষ হাসতে গান গাইতে ভুলে যায়। এটা খান সাবের কোনো জাদুকরী জাল নয়, সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত বিশেষ কিছু। অতীতে তিনি যখন উধাও হয়েছেন এবং দিন কয়েক পরে এলাকায় ফিরে এসেছেন, তখন তার প্রতি অনুরাগীরা অনুরোধ করেছে, যাতে তিনি এলাকা ছেড়ে চলে না যান। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আত্ম অভিমানে কিংবা অদৃশ্য মায়ার টানে তিনি হঠাৎ উধাও হয়ে যান। এটা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এবারের উধাও হওয়াটা ব্যতিক্রম। এক মাস অতিবাহিত হতে চলল, খান সাব এলাকায় ফিরে আসছেন না। এর মধ্যে বাতাসে মেঠোপথে নদীর ঘাটে বাজারে নানা কথা উড়ে বেড়াচ্ছে। এর বেশিরভাগ কথাই পুরনো। দূরগ্রামে তিনি বিয়ে করেছেন, অন্য নারীর প্রেমে পড়ে, তার বাড়ির চারপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করছেন। থাকছেন হয়ত আশপাশের কোনো আত্মীয়ের বাসায়। এমনও গুজব উঠেছে, তাকে নাতি কেউ কেউ দেখেছে ভিক্ষুক বেশে। তাকে নিয়ে যে যাই বলুক না কেন, তিনি এলাকায় ফিরে আসেননি, এটাই সত্য।

৩১.

খান সাব দীর্ঘদিন থেকে তার ভাগ্নীর বাড়িতে অবস্থান করছেন। গ্রামে ফেরার তার আদৌ ইচ্ছে নেই। ভাগ্নী করিমা তাকে বলেছে, মামা অনেকদিন পর আইছেন, কোনো অসুবিধা নাই, আপনি ইচ্ছামতো বেড়ান। আমার দক্ষিণের ঘরটা তো খালি পইড়া থাকে। আর খাওয়া দাওয়ার তো কোনো সমস্যা নাই। করিমার কথায় খান সাব মনোযোগ দেন না। তিনি আনমনা অবস্থায় শুয়ে বসে সময় পার করেন। তার নিজ এলাকার মতো এখানেও একটি নদী রয়েছে। নদীর তীরে তার যেতে ইচ্ছে

করে না। তার গ্রামের নদীর মতো এই নদীও তাকে ডাকে, ঘুমের ঘোরে। নিরালা ঘুমাও ক্যান আমার কোলে আস। ভয় নাই। পরীবানু এখানে ঝাঁপ দেয় নাই। আমার কাছে তোমার কোনো স্মৃতি নেই। প্রথম রাতে তিনি যখন এই স্বপ্ন দেখলেন, তখন যারপরনাই বিস্মিত হলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগলো নদী কি কথা বলতে পারে। পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছে, অন্য নদীতে এই নদী এই গোপন খবর জানল কী করে। তা হলে কি রাতের বেলা এক নদী আরেক নদীর সঙ্গে কথা বলে ভাববিনিময় করে। পৃথিবীর সবনদী তা হলে কি এক। কেবল ভৌগোলিক অবস্থান তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। খান সাবের সারা শরীরে ঘাম দিল। মন অস্থির হয়ে উঠল। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরীবানুকে ভোলার জন্যই তিনি এতদূর এসেছেন, যাতে এলাকার কোরো সঙ্গে তার দেখা না হয়। পরিচিত কেউ যাকে নদীতে ঝাঁপ দেয়া পরীবানুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে না পারে। নাচনেওয়ালীর বিষয়ে কেউ যাতে খোঁচা দিতে না পারে। অথচ তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন একটি অচেনা নদী যার জীবনের স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বেদনাদায়ক ঘটনার জ্বলন্ত সাক্ষী। এই স্বপ্ন তিনি একবার দেখেননি, দেখেছেন একাধিকবার। নদী উচ্চ শব্দে হেসে তাকে পরিহাস করছে। এই প্রথম তিনি নদীর হাসি শুনতে পেলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগল নদী কি কাঁদে। নদীর কি বেদনা দুঃখ রয়েছে। নাকি বোধহীন নদী ঘুমিয়ে থাকে তার বাঁকা শরীর বিছিয়ে।



তার ভাগ্নী যখন তাকে নদীতে গোসল করতে যেতে বলেন ঠিক তখনই তিনি কুঁচকে যান। অজানা ভয় তার ভেতর কাজ করে। তারা ছাড়া এই বাড়িটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভয় অস্থিরতা নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। এই বাড়িতে স্বামীর হাতে খুন হয়েছিলেন তার একমাত্র বোন। ভাগ্নী করিমাকেও ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয়েছিল। ভাগ্যচক্রে করিমা বেঁচে গেলেও বোনকে হারাতে হলো তাকে। সে কথা মনে হলে গা কেঁপে ওঠে। বীভৎস সে ঘটনা যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ওই ঘটনা আজো এলাকার মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

এই এলাকায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে কাঁপন ধরে। ধীরে ধীরে শরীর অবশ হতে থাকে। তার মন বিষাদে ছেয়ে যায়। ঘটনাটি বিশ বছর আগের হলেও, তার স্মৃতিতে আজো উজ্জ্বল। খান সাবের মনে হচ্ছে এই সেদিন রাতে এটি ঘটেছে, যে রাত ছিল তার বোনের জন্য অভিশপ্ত ও শেষ রাত। মৃত্যু যেহেতু জানান দিয়ে আসে না, তাই তার বোন জমিলার পক্ষে এটা বোঝা অতটা সহজ ছিল না। জমিলার সঙ্গে বাকি শিকদারের সংসার ভালোই চলছিল। গ্রামের মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সংসার যেমন হয়ে থাকে। বাকি শিকদার অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। স্ত্রী ও মেয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তিনি। দুজনকেই গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বিপত্তি দেখা দিল দুর্ঘটনার মাসছয়েক আগে, এক জোছনা রাতে। তখন আকাশব্যাপী জোছনার প্রাবল্য। বাড়ির সবাই উঠানে বসে জোছনা উপভোগ করছেন, গ্রামে যা হয়। ওই সময়ে ঘরে ঘরে সন্তান পয়দার হিড়িক থাকলেও শিকদার সাবের ছিল একটিই মেয়ে। মেয়েটি তার বড় আদরের। জলচৌকিতে জোছনা গায়ে মেখে বসে আছেন শিকদার। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, আমি এত অন্ধার দেখতাছি ক্যান। আমার চোখ দুইডা কে যেন উপড়াইয়া নিয়া গেল। ধর ধর ওই যে নিয়া গেল আমারে অন্ধ বানাইয়া। কী করলি তোরা ভূতটারে ধরতে পারলি না। এই বলে তিনি আলোকিত জোছনার মধ্যে দৌড় দিয়ে অদৃশ্য হলেন। পরিবারের কেউ বুঝে উঠতে পারল না, তিনি হঠাৎ এভাবেএক জোছনাকবলিত মধুময় রাতে উধাও হবে। মানুষ সাধারণ অন্ধকার রাতে লুকিয়ে উধাও হয়। কিংবা কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে আর ফিরে না। শিকদারের উধাও হওয়াটা ছিল বিস্ময়কর। তিনি আসলে কিছু দেখে কিংবা অজানা ভয়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন কিনা সে রহস্য আজো অজানা। এলাকার মানুষের ধারণা কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল অজানায়, গ্রাম থেকে দূরে অনেক দূরে। যেখান থেকে তিনি আর কোনোদিনই ফিরে আসতে পারবেন না। স্ত্রী-কন্যার সামনে থেকে প্রবল জোছনার মধ্যে কেউ কি তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল অসীমে। তাকে কি তখন মানুষ থেকে অন্য কোনো উড়ন্ত প্রাণীতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। দ্য মেটামরফোসিস উপন্যাসে মতো। ফ্রানৎস কাফকা রচিত একটি জার্মান ভাষার উপন্যাস, যা ১৯১৫ সালে প্রথম জার্মানিতে প্রকাশিত হয়। এটি ২০শ শতকের জার্মান কথাসাহিত্যের আসামান্য কাজ হিসোবউদ্ধৃত হয়ে থাকে এবং পশ্চিমা বিশ্বের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণার বিষয়। এই উপন্যাসে নায়ক ঘুম থেকে উঠে দেখেন তিনি বহু পা বিশিষ্ট পোকায় পরিণত হয়েছেন।

৩২.

অনেক খুঁজেও কোথাও শিকদারের দেখা পাওয়া গেল না। চোখের সামনে এভাবেএকটা জ্বলজ্বলে মানুষ উধাও হয়ে যেতে পারে, ভাবতে অবাক লাগে। শিকদারের পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। গ্রামের মানুষ ভাবল, ওই দিন জোছনা রাতে জিন তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে আকাশে। । গ্রামের কেউ কেউ বললেন ওই সময়ে তারা নাকি রাতের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। রাতের আকাশ ছিল স্বচ্ছ আয়নার মতো। তাদের দৃষ্টিসীমা মধ্য আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তারা দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পেল এক অনিন্দ্য সুন্দর পরী শিকদারকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বহুবর্ণিল পাখায় আবেষ্টন করে। গ্রামের মানুষ এও জানে যাকে পরী একবার আকাশে তুলে নিয়ে যায় সে আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না। শিকদারেরও আর ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। এসব কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে শিকদার বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে। চোখের দৃশ্যের বাইরে নয়, একেবারে সামনে থেকে তিনি উধাও হয়ে গেলেন। গ্রামের মানুষ বিগত ৫০ বছরে এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি। একথা যখন গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ কালু শেখের কানে পৌঁছে, তখন তিনি অবাক হন না। উপরন্তু তিনি বলেন এই ধরনের ঘটনা এই গ্রামে আরও দুটো বার ঘটেছে। তবে কেউ আর ফিরে আসেননি। শিকদার ফিরে আসতে পারবেনা। জোছনা রাতে এই গ্রামে নাকি জিন-পরী নামে এবং তাদের পছন্দের মানুষকে উঠিয়ে নিয়া যায়। তাই জোছনাকাতর মানুষ ভয়ে কাতর হয়ে যায়। কখন কে উধাও হয়ে যায়, সে ভয়ে থাকে।

অবশেষে এলাকার সবাইকে অবাক করে দিয়ে জমিলার স্বামী বাকি শিকদার বাড়িতে ফিরে আসেন। তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন, কীভাবেছিলেন, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর তিনি দিতে পারেন না। দেওয়ার সক্ষমতাও তার নেই। কারণ তিনি যখন ফেরত আসেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বিকারগ্রস্ত। তাকে দেখলে মনে হয়, তার ওপর এখনো জিন ভূত-পরী ভর করে আছে। তার কথার কোনো পারম্পর্য নেই। এলাকার মানুষকেও তিনি ঠিকমতো চিনতে পারেন না। এমনকি তার স্ত্রী-কন্যাকেও আগের মতো দেখেন না। কোথায় যেন বড় ধরনের একটি ফাঁক রয়েছে। তার মুখ কিঞ্চিত বিকৃত হয়ে গেছে। চোখ দুটো আগের চেয়ে বেশি তির্যক। তার কথার মধ্যে যথেষ্ট অসংলগ্নতা রয়েছে। তিনি যেভাবেতাকান, তাতে মনে হয় এখনই কাউকে গিলে খাবে। স্ত্রী জমিলা খাতুন তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কী অইছে। ড্যাবড্যাবকরে অইভাবে তাকায়া আছ ক্যান। তুমি কি আমাগো চিনতে পারছ না? স্ত্রী জমিলার কথায় তিনি কোনো উত্তর করেন না। তবেতিনি কী যেন বলতে চান। কিন্তু বলতে পারছেন না। এরমধ্যে পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল, বাকি শিকদার বোবা ও পাগল হয়ে গেছে। তিনি এখন আর বাড়ির বাইরে বের হন না। বাড়ির ভেতরই পাখির মতো চক্কর খেতে থাকেন। এই পরিস্থিতে পরিবারের লোকজন ভীত হয়ে পড়ল। শিকদার ঠিকমতো খান না, ঘুমান না। তা হলে আসলেই কেউ তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। নাকি তিনি স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিলেন।

ভোরের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে একটি ভয়ানক শোকার্ত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল এলাকাব্যাপী। খবরটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুরো এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিলো। একই সঙ্গে তারা বিস্ময়ে

কাতর হয়ে পড়ল। শিকদার তার স্ত্রী জমিলাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। কেন কী কারণে তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো, তার অপরাধ কী- এসব কারণ এলাকাবাসী অনুসন্ধান করতে লাগল, যার যার অবস্থান থেকে। বারো বছরের সংসার শিকদারের। এর মধ্যে স্ত্রী জমিলার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া হয়নি। জমিলা চরিত্রগত দিক থেকেও প্রশ্নবিদ্ধ নয়। তারপরেও সে স্বামীর হাতে খুন হলো। এলাকার অনেকেই মনে করেন, শিকদার অদৃশ্য কোনো শক্তির নির্দেশ পেয়েই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। কেউ কেউ এও মনে করছেন, তিনি দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে ছিলেন হত্যার পরিকল্পনা করার জন্য। যে যেভাবেই ঘটনার ব্যাখ্যা করুক না কেন, জমিলা শিকদারের হাতে খুন হয়েছে এটাই চরম সত্য। অবাক ব্যাপার যে খুন করার পর তার ভেতর কোনো অনুশোচনা নেই। তিনি রক্তমাখা হাতেই হাসছেন। যেন স্ত্রীকে খুন করার পর তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছেন। এটা তার জীবনের একটি সফল কাজ। কে তাকে ঘৃণা ও ধিক্কার জানালো সে দিকে তার খেয়াল বা মনোযোগ নেই। খুনের পর থানা থেকে পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়। জমিলার লাশের পাশে হাউমাউ করে কাঁদে একমাত্র মেয়ে। আত্মীয়স্বজন এসে বাড়িতে ভিড় করে। কেউ কেউ জমিলার রক্তাক্ত লাশের পাশে বসে কাঁদতে থাকে। কেউ কেউ মেয়েটির ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। একটি সুন্দর সংসার এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, এটাও বলে কেউ কেউ। জমিলা কি গভীর রাতে এমন কোনো আপত্তিকর কথা বলেছিল, যার কারণে উত্তেজনার পারদ একেবারে উপরে উঠে গিয়েছিল। আর সে উত্তেজনা সামাল দিতে না পেরেই শিকদার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। আজ পুরো এলাকায় শোক নেমে এসেছে। গল্পের ডালাপালা চারদিকে বিস্তার লাভ করছে। অথচ প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসছে না। জমিলা হত্যার সাত দিন পর্যন্ত এলাকার মানুষ ঠিকমতো ঘুমাতে পারেনি। তাদের একটিই প্রশ্ন কেন জমিলাকে খুন করা হলো।

৩৩.

সেই ভরা জোছনা রাতে শিকদার যখন পরিবারের সঙ্গে খোশ গল্পে মত্ত ছিলেন, তখন অনিন্দ্য সুন্দরী একজন তাকে ডেকেছিল। এমন সুন্দরী নারী তিনি জীবনেও দেখেননি। এই শিকদার কী করছো আমার কাছে আসো। তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে সব দেব। তোমার জীবন কানায় কানায় ভরিয়ে দেব। তুমি আমার কাছে আসো। শিকদার তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। অনিন্দ্য সুন্দরী তাকে নিয়ে গিয়েছিল জোছনার শেষ সীমানায়, যেখানে অন্ধকার খেলা করে। শিকদার ভেবেছিলেন তিনি তার সঙ্গে ধবল জোছনায় অবগাহন করবেন, সারাজীবন তিনি এভাবেই থাকবেন। তার জীবনে হয়ে উঠবে কেবল জোছনাময়। অন্ধকারের কালিমা তাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। আসলে এ উদাত্তস্বর ছিল ছলনায় পরিপুষ্ট। তার জীবন ও পরিবার তছনছ করার জন্যই শিকদার চরম ভেলকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আর এই ভেলকিই তার জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছে। তাই তিনি জোছনায় ভাসতে ভাসতে একসময় অন্ধকারে তলিয়ে গেলেন, তলিয়ে দিলেন নিজের পরিবারকেও। অন্ধকার তাকে আত্মধ্বংসের শিক্ষা দিয়েছিল। শিক্ষা দিয়েছিল পরিবার ধ্বংসের। যার অসহায় শিকার হলো স্ত্রী জমিলা। তিনিও হয়ে গেলেন বিকারগ্রস্ত। যে তাকে আলোর পথে প্রলোভিত করে অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিল যে কি মানুষ না জিন পরী। এলাকার মানুষ তো তাই বলে। শিকদার একে বলে অশুভ শক্তি। জীবনের এক মহাঘোর মহাআকর্ষণ। যে ঘোর যে আকর্ষণ কেবল আত্মধ্বংস ডেকে আনে। শিকদারকে পুলিশ থানায় নেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কাছের মানুষকে চিনতে পারতেন না, স্ত্রীকে খুন করেছে কিনা তাও তিনি নিশ্চিত নন। পুলিশ কেন তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন তাও তিনি জানেন না। তিনি কেবল একটি জিনিস জানেন, জোছনার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিলেন, যে অন্ধকার তার চিরসঙ্গী।

শিকদার সাবকখনোই ভাবতে পারেননি, তাকে নিজ স্ত্রী খুনের অপরাধে হাজত বাস করতে হবে। জমিলাকে তিনি ভালোবাসতেন, তা হলে তেন তিনি তাকে খুন করলেন। কোনো অদৃশ্য শক্তি কি তার ওপর আছর করেছিল? ধারালো দা কেন তিনি হাতে নিয়েছিলেন? বাড়ি থেকেই বা তিনি বেশ কিছুদিন কোথায় ছিলেন? প্রবল জোছনার ঢল কি তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কোনো অশুভ শক্তির কাছে, যে তাকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে, প্ররোচিত করেছে জমিলাকে হত্যা করার ব্যাপারে। যে রাতে তিনি তাকে হত্যা করেন, তার দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে ফেটে পড়তে চেয়েছিল। তার দুহাত নিসপিস করছিল কিছু একটা করার জন্য। তাই তিনি ধারালো দা খুঁজছিলেন। তিনি ওই রাতে আত্মরক্ষার জন্য দা হাতে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন ধারালো বঁটি হাতে জমিলা তাকে খুন করার জন্য হিংস্র গতিতে এগিয়ে আসছে। জমিলা বলছে, কই ছিলা সংসার ফালাইয়া, কার কাছে ছিলা। তোমারে আজ আমি কুপামু। সারা বাড়িতে রক্ত বহাইয়া দিমু। আমারে তুমি চিন। আমি খাঁ বংশের মাইয়া। নিরুপায় হয়েই শিকদার দা হাতে নিয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তিনি জোছনার টানে উধাও হয়েছিলেন এবং অন্ধকারের মহা-আকর্ষণে আজ হাজতে। ওই দিন গভীর অন্ধকার দাঁত কেলিয়ে হাসছিল। তাকে পরিহাস করছিল এই বলে যে, শিকদার তুমি একদিন প্রবল জোছনার তোড়ে ভেসে গিয়েছিলে, আমাকে উপেক্ষা করে। আমার শক্তি সম্পর্কে তুমি অবহিত নও। আমি অন্ধকার যা পারি, তা জোছনা পারে না। পৃথিবীতে জোছনা একটি বোকা চরিত্র। সবকিছু লেজে-গোবরে মাখিয়ে ফেলে। তারপরেও মানুষ জোছনার পাগল। আমার ভয়ংকর রূপ মানুষ জেনেও সবাই জোছনার প্রত্যাশা করে। জোছনাও বোকা, পৃথিবীর মানুষও বোকা। শরৎ বাবু আঁধারের রূপ দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। আর শিকদার তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে জোছনার রূপ দেখে। এবার কী করবে তুমি? আমাকে অবহেলা করার পরিণাম এবার তীলে তীলে উপলব্ধি করতে পারছো। শিকদারের কেন আজ এসবকথা মনে পড়ছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি মনে করছেন ওই দিন আত্মরক্ষার কোনো দরকার ছিল না। জমিলা যদি তাকে খুন করত সেটাই ভালো ছিল। তিনি চিরতরে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতেন। জোছনা আর অন্ধকারের দ্বন্দ্বে তা পড়তে হতো না।

শিকদারের এলাকার মানুষ সবসময়ই শান্ত নদীর মতো নিস্তরঙ্গ। তারা সাতে-পাঁচে নেই।

৩৪.

কৃষিনির্ভর পরিবারগুলো কোনো রকম ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না। সাদামাটা জীবনের আয়েশি ভাবতাদের মধ্যে রয়েছে। এদের পারিবারিক ও আত্মীয়তার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। বর্ষা মৌসুমে তাদের কোনো কাজ থাকে না। তারা খায় ঘুমায়, নানা ধরনের খোশ গল্পে মেতে ওঠে। সন্ধ্যাবেলা আসর জমিয়ে পুঁথি পাঠ করে। নৌকা করে আত্মীয়ের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যায়। অবসরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গল্প করে, সন্তানদের সঙ্গ দেয়। অতিথি আপ্যায়নেও তাদের জুড়ি মেলে না। এলাকার প্রবীণরা যতটা স্মরণ করতে পারেন, তাদের উজ্জ্বল স্মৃতি যতটা সহায়ক হয়, তাতে তারা কোনোভাবেই স্মরণ করতে পারেন না, গত ৫০ বছরে এই এলাকায় স্ত্রী হত্যার ঘটনা ঘটেছে। যে কারণেই স্ত্রী হত্যার ঘটনা ঘটে থাকুক, এটা এই এলাকায় আলোড়ন তুলেছে। কারণ এটা ছিল এই এলাকার সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। জমিলার মতো মেয়েকে শিকদার কীভাবে খুন করল, এই প্রশ্ন তাদের মনে আজীবন রেখাপাত করে থাকবে।

তারা কাজের ফাঁকে কিংবা অবসরে, ঘরোয়া আসরে এই কাহিনী স্মারক করে। কেউ কেউ জমিলার জন্য চোখের জল ফেলে। তাদের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে জমিলার হাসিমাখা মুখ, তার সুন্দর আচরণ। গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে তার হেটে চলার ছন্দ তাদের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। শিকদার জমিলাকে খুন করে এই গ্রামকে কলঙ্কিত করেছে, এই গ্রামের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। দূর গ্রামের মানুষ ধিক্কার দিচ্ছে, বলছে বউ মারার গ্রাম, খুনিদের গ্রাম। অই গ্রামে মেয়ে বিয়া দিওন যাইবো না।

খান সাব যেদিন ভাগ্নি করিমার কাছে এসেছিলেন, সে সময়ও আকাশব্যাপী জোছনার ঢল ছিল, করিমার ধারণা এই জোছনাই তার মা জমিলা খাতুনকে তার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে। বিশ বছর আগে একদিন ভরা পূর্ণিমার রাতে শিকদার তার পরিবারের সঙ্গে খোশ গল্পে মত্ত ছিলেন এবং সেখান থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। বিশ বছর পর আজ মামার সঙ্গে করিমা জোছনা উপভোগ করছে বিষাদঘন স্মৃতি তড়পানোর মধ্যদিয়ে। মামা-ভাগ্নি মুখোমুখি বসে আছে, কারও মুখে কোনো কথা নেই। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জোছনারও যেন পরিবর্তন এসেছে, পরিবর্তন এসেছে রাতেরও। এই রাত অভিশাপের নাকি সৌভাগ্যের তা বলতে পারছে না করিমা, এমনকি শিকদারও। শিকদারের ঘটনাবহুল জীবনের এটিও এক করুণ অধ্যায়। যে শিকদার কথায় এত মুখরা, তিনি হঠাৎ চুপসে গেছেন। কেবল আজই নয়, জমিলার মৃত্যুর পর যতবার এই গ্রামে এসেছেন ঠিক ততোবারই। তার নিজের গ্রামের মতোই এই গ্রামও তার ভালো লাগত, তাই তিনি বারবার ছুটে আসতেন এই গ্রামে। জমিলার মৃত্যুর পর এই গ্রাম তাকে আর আগের মতো টানে না। তবুও করিমার জন্য তাকে মাঝেমধ্যে আসতে হয়। জমিলার মৃত্যুর পর করিমা তার কাছেই ছিল, তখন এই বাড়িতে কেউ থাকত না। মানসিক বিকারগ্রস্ত প্রমাণিত হওয়ায় শিকদার কয়েক বছরের মাথায় জেল থেকে ছাড়া পান। এরপর তিনি গ্রামে ফেরেননি। তিনি বেঁচে আছেন

কি মরে গেছেন, গ্রামের কেউ তা বলতে পারবেনা। গ্রামের মানুষের স্মৃতিতে একটা ঘটনাই উজ্জ্বল হয়ে আছে, তিনি জমিলাকে কুপিয়ে হত্যা করেছিলেন। তবেগ্রামের কেউ কেউ বলেন, তারা শিকদারকে দরবেশ বেশে বন্দরের মাজারে দেখেছেন। তাকে কোনোভাবেই চেনা যায় না। তবেতারা তার চোখ দেখে চিনেছিলেন। তারা ভয়ও পেয়েছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল অই চোখে বিস্ফোরক মাখা এবং অই চোখ কোনো ফকির-দরবেশের নয়? একজন ভয়ংকর খুনির চোখ।

৩৫.

খান সাবআর তার ভাগ্নি করিমা মুখোমুখি বসে আছে ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। প্রথমদিকে তাদের মধ্যে হালকা কথা হলেও, এখন কেউ আর কথা বলার আগ্রহ পাচ্ছে না। প্রবল জোছনার মধ্যে মামার মুখটি দেখতে পাচ্ছে করিমা। মামা বিষণ্ন। তাকে অনেকটা বিকারগ্রস্ত মনে হলো। করিমা তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছে না। রাত গভীর হচ্ছে, দূরে কোথাও করুণ সুরে কুকুর ডাকছে। গাছের মগডালে নাম না জানা কোনো পাখি পাখা ঝাপটাচ্ছে। তার কম্পন এসে করিমার হৃদয়ে লাগছে। মায়ের কথা তার খুবমনে পড়ছে, মনে পড়ছে বাবার কথাও। বাবা মাকে খুন করলেও তার দৃষ্টিতে তিনি অপরাধী নন। করিমা মনে করে এটা নিয়তি। তার মায়ের মৃত্যু হয়তো এভাবেই হওয়ার কথা। মানুষের মৃত্যু কতভাবেহয়। নিষ্ঠুরতা পৈশাচিকতার বেড়াজালে মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পড়ে যায় বড় ধরনের বিভ্রমে। শিকদার হয়তো এমন কোনো বিভ্রমে পড়েছিলেন, যার কারণে নিজের স্ত্রীকে খুন করেছেন। খান সাব চেয়ে আছেন ভাগ্নির দিকে। করিমার মনোভাবতিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। ও কী ভাবছে, ওর কি অতীত মনে পড়ছে? মনে পড়ছে কি বাবা-মায়ের স্মৃতি। করিমা খান সাবকে অনেকবার বলেছে, বাবাকে খুঁজে বের করতে। তার বাবা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আর বাড়িতে ফেরেনি। যে বাবা করিমার মাকে নিষ্ঠুরভাবেহত্যা করেছে, সে বাবাকে কেন করিমা খুঁজে আনতে বলছে? এটা খান সাবের কিছুতেই মাথায় ধরে না। তিনি ভাগ্নির মনোভাব ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। রাতের মতো গভীর নির্জন এখন করিমার জীবন। একইভাবে বেদনায় ঘেরা। এই পৃথিবীতে যার বাবা-মা নেই, সে চরম অসহায়। এই অসহায়ত্ব আজ করিমার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। যা খান সাব জোছনা রাতে স্পষ্ট অনুভবকরতে পারছেন।

তিনি আগের মতোই গ্রামের মেঠোপথ ধরে হালকাচালে হাঁটছেন। অজানা দুঃখ তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে তার বিষাদের মাত্রাটা একটু বেশি। খান সাবতার বয়সে বড় হলেও একটি জায়গায় তারা সমমানসিকতায় পৌঁছেছিলেন। বইকেন্দ্রিক মানসিকতা তাদের একই ছিল। নারী বিষয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা ও স্বপ্ন হয়তো এক ছিল। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে খান সাবশিল্প-রসিক মানুষ, তার নামে যত বদনামই থাকুক। জীবনকে যারা জীবন দিয়ে বিবেচনা করেন, যারা আনন্দ উপহার দিতে পারেন তার কথায় কাজে, খান সাব তেমন একজন মানুষ। তিনি আনন্দ বিলিয়ে দুঃখ কিনতে পারেন। এমন মানুষ সমাজে বিরল। তার সাহচর্যে যিনি যাবেন তার জীবন বদলে যাবে। খান সাবতার জীবনকেও বদলে দিয়েছে। তিনিই তাকে বইমুখী করেছেন, জীবনের বিচিত্র পথের ও অনুভবের সন্ধান দিয়েছেন। তার মনোভূমিতে রস-সঞ্চার করেছেন তিনিই। আজ অনেকদিন তিনি গ্রামে নেই। বরাবরের মতো উধাও হয়েছেন তিনি। এই উধাও হওয়ার পেছনে কতটা আত্মাভিমান কতটা জিদ বঞ্চনা তা তিনি জানেন না। বিকালে বেড়ানো ঝাঁকবাঁধা পাখি নিজস্ব শব্দ করে তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। দূরে কোথাও অতিচেনা শব্দ হলো, গানও বেজে উঠল। এখন তার স্মরণে এলো খান সাব এক সময় এলাকার ঘরোয়া অনুষ্ঠানে গান গাইতেন এবং পরে বাজারে তরুণীর সঙ্গে গেয়েছেন। মোঘল হেরেমের নারীরা বইতে তিনি পড়েছিলেন যে গান ভালোবাসে না, সে মানুষ খুন করতে পারে। কথাটা তার মনে ধরেছিল। তিনি গান গাইতে পারেন না, এটা সত্য, তবেতিনি গান ভালোবাসেন। কোথাও গান বাজলে তিনি স্থির দাঁড়িয়ে যান। আজ তার কেন যেন মনে হচ্ছে খান সাবকে দরকার। তিনি যেন তার জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ ও সঙ্গী। তাকে কাছে পেলে কেবল তার হৃদয়েই নয়, চারদিকে আনন্দ-ধ্বনি উঠবে। তার মনে প্রশান্তির কোমল প্রবাহ শুরু হবে।

৩৬.

তিনি হাঁটছেন নাকি এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। অদৃশ্য কোনো শক্তি যেন তার হাঁটার গতি থামিয়ে দিচ্ছে। তার পা অবশ হয়ে আসছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। বুকের গভীর থেকে অচেনা ব্যথা চিনচিনিয়ে উঠছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রের সেনাদের মতো কারা যেন তার চারদিক ঘিরে ফেলেছে। তিনি ইচ্ছে করলেই আর নিজস্ব সত্তা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছেন না। খান সাবজীবিত, অথচ তার প্রেতাত্মারা হাসির রোল তুলছে, যা তার কানের ভেতরে তীব্র যন্ত্রণার সৃষ্টি করছে। আকাশের দিকে তাকালেন তিনি, তার কাছে মনে হচ্ছে আকাশ তার চেয়েও অসহায় বৈচিত্র্যহীন ফ্যাকাশে। আকাশ যেন কারও দাপুটে আগমনে ভয়ে কাঁপছে। আকাশে মেঘ নেই তবুও ঝড়-বৃষ্টির আলামত লক্ষ করা যাচ্ছে। ভয়ার্ত শরীরে তিনি চারদিকে তাকালেন। রোদের আলামত লক্ষ করা যাচ্ছে, তীব্র রোদ। তা হলে একটু আগে যা তিনি প্রত্যক্ষ করলেন এ সবই কি আত্ম-বিভ্রম। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, গাছের সবুজ পাতা নড়ছে। হয়তো বা এখনই দমকা বাতাস প্রবাহিত হবে। হঠাৎ রোদ চলে গিয়ে পরিবেশ বেশ শীতল হয়ে গেল। সামনে যে তিন রাস্তার মোড়, এই মোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি এবং খান সাবঅনেক কথা বলাবলি করেছিলেন। খান সাবতাকে বলেছিলেন, ভালোবাসা কী জিনিস তুমি জানো বা বোঝো? তিনি কেন তাকে এমন বিব্রতকর প্রশ্ন করেছিলেন, তা আজও তার কাছে স্পষ্ট নয়। তখনো এলাকায় পরীবানুর প্রেম কাহিনী জানাজানি হয়নি, পরীবানুও খান সাবের জন্য নদীতে ঝাঁপ দেয়নি। অথবা এমনও হতে পারে পরীবানুও নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার আগের দিন তিনি তাকে এ প্রশ্ন করেছিলেন। পরী-বানুর নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার কদিন পরে, ঘটনাটি যখন এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল, যখন পরীবানুকে কেন্দ্র করে তার মন ভীষণ খারাপ, তখন আলো-আঁধারির মধ্যে তার সঙ্গে খান সাবের দেখা হয়েছিল। এই নির্জন পরিবেশে তাকে দেখে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পরীবানু সংক্রান্ত কিছু বলবেন। না কোনো প্রসঙ্গেই তিনি গেলেন না। কেবল তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন। তাকে বিষণ্ন বিরক্ত উদাসীন মনে হয়েছিল। এদিনও তিনি প্রশ্ন করলেন, ভালোবাসা কী, তাকি তুমি জানো বা বোঝো?

খান সাব কেন তাকে বারবার একই কথা বলছেন, ভালোবাসা কী, তাকি তুমি জানো বা বোঝ? তিনি তাকে ভালোবাসার প্রশিক্ষণ দিতে চাচ্ছেন? তিনি এ বিষয়ে যা ভাবেন বা বোঝেন, তার মর্মার্থ হলো, এটা সম্পূর্ণ বোধের ব্যাপার এবং হৃদয়ঘটিত। এ বিষয়ে একজন আরেক জনকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে কিনা, তা তার জানা নেই। তবে খান সাবের উদ্যোগ বিষয়ে এখন তার কিছুটা সন্দেহ তার ভেতরে কাজ করছে। যে বিষয়টি তিনি এর আগে কখনো ভাবেননি। তা হলে কি তিনি ভালোবাসা বিষয়ে সাবালক করার জন্য দুটো বই পড়তে দিয়েছিলেন। হাজার রজনীর গল্প আর মোঘল হেরেমের নারী-দুটো বইয়েই রয়েছে ভালোবাসার কাহিনী। কথায় বলে কেউ প্রেমে পড়লে তখন অন্যকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে। আবার বিরহে ভুগলে বা আঘাত পেলে তখন বলে কখনো এ পথ মাড়িও না। বড়ই খারাপ পথ। জীবন ধ্বংস করে দেয়। ভালোবাসার বোধ বিষয়ে এই যে বৈপরীত্য এটা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে থাকে। তিনি পরীবানুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার কারণেই তার মনোজগতের যে পরিবর্তন, সেই পরিবর্তন থেকেই হয়তো বা তাকে বারবার এ কথা বলেছেন। খান সাব এখানেই থেমে থাকেননি। অন্য আরেকদিন নদীর পাড়ে দেখা হলে আরেকটি প্রমান তাকে করেন। বলেন, জীবন সম্পর্কে তোমার ধারণা কী। তিনি একটি বইয়ে পড়েছিলেন, জীবন সংগ্রামশীল স্বপ্নময় স্মৃতিকাতর ভয়াবহ এক নরককুণ্ড অথবা সুখের হাতছানি। জীবন জীবন নয় কিংবা জীবন ক্ষণিকের। জীবন সম্পর্কে যত কথাই বলা হোক না কেন, জীবনের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কোনো কবি-সাহিত্যিক মনীষী, পণ্ডিত, দার্শনিক এ পর্যন্ত জীবনের সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারেননি। জীবনকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না বলেই জীবন এত তাৎপর্যপূর্ণ বৈচিত্র্যময়, নানা রং ও রেখার দ্বারা জীবনের প্রতিটি পরত ও বাঁক আঁকা। তাই খুব সহজে কেউ জীবনের মায়া ত্যাগ করতে চায় না। সবাই আত্মপ্রেমে মশগুল থাকে। খ্রিষ্টের জন্মেরও বহু পূর্বে তাই গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন- 'নিজেকে চেনো'। তাই কোনো মানুষ এক জীবনেও নিজেকে চিনতে পারে না। অথবা এভাবেবলা যায় যে নিজেকে চেনা সহজ নয়। নিজেকে চিনতে পারলে মানুষ ও জগৎ চেনা যায়। জীবনকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করা যায়। এ সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের জীবন সম্পর্কে কোনো গভীর উপলব্ধি নেই। তারা মনে করেন জীবন একভাবে কেটে গেলেই হলো। খান সাব যে এ দলের নন, তা তার প্রশ্নে ধরন দেখেই বোঝা যায়। ভালোবাসার উপলব্ধি জীবন উপলব্ধিরই অনিবার্য অংশ এটা তিনি বুঝতে পারেন। তারপরেও খান সাবের কথার তিনি কোনো উত্তর করেন না। বোকা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তিনি মনে করেন, যিনি জীবনকে গভীরভাবে

উপলব্ধি করতে পারেন না, তার ভেতর কীভাবে গভীর ভালোবাসাবোধ জন্মাবে? খান সাবতাকে যে দুটো প্রশ্ন করেছেন, তা যথার্থ এবং দুটোই জীবনের অনিবার্য অংশ। তবেএতদিন পরে তাকে কেন এই প্রশ্ন করা হলো? এর উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন না। জীবন সংকট ও ভালোবাসার সংকট কি খান সাবের না তার? তিনি যতটুকু বোঝেন বা উপলব্ধি করেন তাতে এই দুটো সংকট কম-বেশি সবমানুষের মধ্যেই আছে। ঠিক এই মুহূর্তে প্রতি তুলনা এসে গেল অনেকটা তার নিজের অজান্তেই। এই সংকট কার সবচেয়ে বেশি, তার না খান সাবের? তিনি একজনকে ভালোবেসেছিলেন, যাকে তিনি পাননি। তার জন্য মনটা এখনো হুহু করে ওঠে। তিনি যখন ভালোবাসার সংকটে আবর্তিত হলেন, তখন তার ভেতর জীবন সংকটও দেখা দিল। তার মনে হলো এই পৃথিবীতে না আসাই ভালো ছিল। বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন। এই চরম নাভিশ্বাসের আবর্তে তিনি যেন ঘুরপাক খেতে লাগলেন। তিনি ধীরে ধীরে আত্মহননপ্রবণ হয়ে ওঠেন। আবার তা থেকে ফিরেও আসেন। মানুষ কেন আত্মহননের পথ বেছে নেয়, এই প্রশ্নের উত্তর তিনি তখন পেয়েছিলেন। অনিয়ন্ত্রিত আবেগই মানুষকে ওই জায়গায় নিয়ে যায়। খান সাবের কথা চিন্তা করেন তিনি। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু এবং পরীবানুর নদীতে ঝাঁপ দেওয়াকে কেন্দ্র করে তার যে জীবন সংকট তৈরি হয়েছিল, সে সংকট আজও কাটেনি। যার কারণে বেশির ভাগ সময়ে তিনি অস্থির থাকেন। তার মনোবিকলন ঘটে। তার মনে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। কখনো প্রবল জোয়ারে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়- আবার ভাটার টানে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন। জোয়ার-ভাটার টানাহেঁচড়ার মধ্যেই চলছে তার জীবন। গভীর দুঃখ ও হতাশাবাদী মানুষ অনেক সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে স্থবির হয়ে যায়। বিষাদকে লালন করতে থাকে, দুঃখকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে। খান সাবঅনেকটা এ রকমই। তারপরেও তার জীবনবোধ ও ভালোবাসাবোধ অন্যরকম। তার মানবিক বোধও ভিন্ন, যা তাকে সবসময় আকৃষ্ট করে। খান সাবের শূন্যতা তিনি তীব্রভাবেঅনুভব করছেন। এলাকায় খান সাবনা থাকার অর্থ হচ্ছে, গ্রাম মরুভূমিতে পরিণত হওয়া।

বরাবরের মতো একই খবর শুনতে পান তিনি। খান সাবদূরগ্রামে তার আত্মীয়ের বাড়িতে আছেন। তার আত্মীয়ের তো অভাব নেই। কোন বাড়িতে তিনি রয়েছেন, এটা কেউ নিশ্চিত করতে পারছে না। বাউল জীবন তার। কখন কোন জায়গায় অবস্থান করেন বলা কঠিন। তবে তিনি যেখানেই যান নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। মানুষের সঙ্গে মেশার তার রয়েছে অসম্ভবক্ষমতা। তিনি খুব সহজেই মানুষকে সম্মোহিত করতে পারেন। এ ধরনের ক্ষমতা সবার থাকে না, যা খান সাবের রয়েছে। তিনি তার কথার জাদু বিস্তার করে বাঁশিতে সুর তুলে গান গেয়ে অনেককেই মোহিত ও আবিষ্ট করেছেন। একদিন সকালে তিনি খান সাবকে খুঁজতে বের হলেন। গত রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, খান সাব ভীষণ অসুস্থ। তিনি জীবন সংকটে রয়েছেন। যে কোনো সময় তিনি পরপারে চলে যেতে পারেন। স্বপ্ন দেখার পর তিনি ঘেমে উঠলেন। কারণ এই গ্রামে তার একান্ত ঘনিষ্ঠ মানুষ খান সাব। তাকে নিয়ে এমন দুঃস্বপ্ন তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তাই তিনি তাকে খুঁজতে বের হলেন। তিনি দু'একটি আত্মীয়ের বাড়ি চেনেন। প্রথমে ভাবলেন সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে। যদি না পাওয়া যায় তবে, ওই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অন্য আত্মীয়ের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে সেখানে যাবেন তিনি। যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কেন তিনি এমন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজেও জানেন না। তার পায়ে বেগ নেই, তারপরেও তিনি হেঁটে চলেছেন। দুর্বল পা বেশিদূর যেতে পারে না। দুর্বল মনও জীবনের সাড়া পায় না। তবুও তিনি সামনে এগিয়ে চলেন, নিজস্ব গতি ও ছন্দে। পথে যেতে যেতে এক জায়গায় থেমে গেলেন তিনি। এমন সুন্দর দৃশ্য তিনি জীবনেও দেখেননি। এক গাছ আরেক গাছের সঙ্গে আলিঙ্গন করে আছে, যেন জীবনেও তারা বিচ্ছিন্ন হবেনা। গাছের সঙ্গে গাছের এই যে সুগভীর ভালোবাসা, এটা বিরল। মানুষ গাছের মতো ভালোবাসতে পারে না। গাছের মতো নীরবও থাকতে পারে না। গাছের সহনশীলতা আর মানুষের সহনশীলতা এক নয়। ভালোবাসা প্রকাশের ধরনও এক নয়। গাছ নিশ্চল নীরব। যেন জগতের সব দুঃখ একা ধারণ করে আছে।

৩৭.

জীবনে বহুবার নির্জন রাতে তিনি একাকী দাঁড়িয়ে থেকেছেন। রাতের নির্জনতা একেক সময় একেক ধরনের আনন্দ দিয়েছে তাকে, জাগিয়েছে অদ্ভুত শিহরণ। মাঝেমধ্যে ভয়ও কাজ করেছে তার মধ্যে। আজকের রাতের পরিবেশ তার কাছে অতিমাত্রায় ভীতিকর মনে হয়েছে। রাত গড়িয়ে যাচ্ছে রাতের ভেতর, অন্ধকার তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের ভেতর। এ যেন রাতের রাহস্যিক খেলা। এ খেলায় তিনি জড়িয়ে গেছেন। তিনি নিশ্চতভাবেই জানেন, রাতের খেলা বড় ভয়ংকর। এ খেলায় রাত বাদে, যে-ই অংশ নিয়েছে হারিয়ে কিংবা তলিয়ে গেছে। রাত যেভাবে খেলতে জানে অন্য কেউ সেভাবে পারে না। রাত মানেই চির গোপনীয়তার নীরবউৎসব। চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগেই, যেন অন্ধকারের ভয়ে পালিয়ে গেছে। তিনি নিজেও কাঁপছেন, এ সবকথা স্মরণে এনে। প্রথমে তার পায়ের তলা থেকে ধীরে ধীরে কাঁপন উঠল। তারপর ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। তার মনে হলো পেছন থেকে তাকে খান সাব ডেকে বলছেন, আমাকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা করো না। আমি স্বেচ্ছায় অদৃশ্য হয়ে গেছি। এলাকায় আমি আর ফিরবনা। ওখানে শান্তি স্বস্তি ভালোবাসা কিছুই নেই। তিনি চমকে উঠলেন। তার কাঁপন আরও বেড়ে গেল। পেছনে তাকানোর সাহস তিনি হারিয়ে ফেললেন। দূরে কোথাও শোকের বিলাপ শোনা যায়। তার ঘাড়ের কাছে কে যেন কাঁদছে। অন্ধকার ভেদ করে কেবল কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এমন ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে তিনি সাহস করে আকাশের দিকে তাকালেন। রাতের আকাশ অন্ধকারে ঠাসা। যেন অন্ধকার বিলি করে বেড়াচ্ছে। এই প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে খান সাবের সুন্দর মুখাবয়বতার সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুহূর্তে খান সাব পুর আকাশকে আলোকিত করে ফেললেন। তিনি হাসছেন, অম্লান এই হাসি। তিনি আকাশে উড়ছেন স্বচ্ছন্দে সুখে। তার সঙ্গে পরীর বেশে রয়েছে পরীবানু। পরীবানুও হাসছে। দুজনে উড়ে যাচ্ছে অসীমে। তারা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবেনা কোনোদিন। এই দৃশ্য দেখে তার ভয় আরও বেড়ে গেল। পরীবানু জীবিত না মৃত এটাও থেকে গেল তার বোধের বাইরে। ভয় জাগানো রাতের পরিস্থিতির মধ্যে তার আনন্দ এই যে, তিনি বহুদিন পর পরীবানুকে দেখতে পেলেন। পরীবানু খান সাবকে ভালোবাসলেও তার সঙ্গে ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তার স্মৃতিতেও সে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার অতি কাছ থেকে অচেনা শব্দ ভেসে এলো। রাতের নির্জনতা শব্দের তোড়ে তার মাধুর্য হারিয়ে ফেলল। তিনিও হয়ে পড়লেন ত্রাসভারী মানুষ।

অন্ধকার দলা পাকিয়ে জানান দিচ্ছে রাত কতটা ভয়ংকর হতে পারে। যারা রাতের অপরাধী তারা রাতকে উপভোগ করতে পারে না, অপরাধকর্মে তাদের মনোযোগ বেশি থাকে। আর যারা রাতকে উপভোগ করার জন্য ঘরের বাইরে বের হন, তারা দেখতে পান অন্যরকম এক পৃথিবীকে। রাতের পৃথিবী আর দিনের পৃথিবী আকাশ-জমিন পার্থক্য। যার মনের ভেতর সারাক্ষণ অন্ধকার খেলা করে, তার কাছে দিনও এক মহাতস্কের। আর যার মনের ভেতর আলোর ঝলকানি, তার কাছে অন্ধকার দারুণ উপভোগ্য বিষয়। তিনি আজ অন্ধকারকে উপভোগ করছেন নিজের মতো করে। এর আগেও রাতের অন্ধকারে তিনি একা দাঁড়িয়ে থেকেছেন। তখন তার চারপাশের পরিবেশ অচেনা মনে হয়নি। কোন জায়গা দিনে কেমন ছিল, রাতেই বা কেমন হয়, তার আন্দাজের মধ্যে ছিল। কিন্তু আজকের রাত ও অন্ধকার তার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা মনে হয়েছে। যেন এই ভীতিকর জনপদে তিনি নতুন এসেছেন। এর চারপাশ কিছুই তার পরিচিত নয়। অন্ধকার মানুষের জীবনে নাকি আলাদা আবেদন তৈরি করে, মানুষকে সাহসী হতে শেখায়। কেউ কেউ অপরাধী হওয়ারও তকমা নেয় অন্ধকার থেকে। তিনি অন্ধকার থেকে কিছুই শেখেননি, তা নয়। জীবনের নানা আপদে কীভাবেনীরবহয়ে যেতে হয়, কীভাবে নির্জনতা মানুষকে গ্রাস করে তা তিনি অন্ধকার থেকেই শিখেছেন। রাতের জোছনাও তাকে মহান ও উজ্জ্বল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। কীভাবেজীবন থেকে আলো আহরণ করতে হয়, তাও তিনি শিখেছেন জোছনা থেকে। জোছনার প্লাবন মানেই জীবনের উজ্জ্বলতার প্লাবন।

তিনি মনে করেন খান সাব এই এলাকার আলোকবর্তিকা। তিনি যেখানে যেভাবে গিয়েছেন, কেবল আলো ছড়িয়েছেন। মানুষের অন্তরকে আলোকিত করেছেন। তাদের চিত্তে সুখ আনন্দ জাগিয়ে তুলেছেন। মানুষকে নানাভাবেআনন্দ দেওয়া, মানবকল্যাণের একটি বড় দিক। যে আনন্দ সবাই দিতে পারে না। কেউ কথার জাদুর মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেন, কেউ বা নেচে গান গেয়ে বাঁশিতে সুর তুলে মানুষকে আনন্দ দেন। এ ক্ষেত্রে খান সাবের তুল না হয় না। তা ছাড়া তিনি এলাকার সাধারণ মানুষের মনোজগতের খবর জানার চেষ্টা করতেন। কেবল একজনের মনোগজতের খবর জানার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। সে হচ্ছে পরীবানু। ওর মন তিনি বুঝতে চাইতেন না, এটা তার জীবনের এক ধরনের ব্যর্থতা। আজ আবার তিনি কেন হঠাৎ পরীবানুর কথা স্মরণে আনলেন। কান টানলে মাথা আসে। তার কাছে খান সাবআর পরীবানু অভিন্ন আত্মা। একজন জীবিত অন্যজন পরপারে চলে গেছেন।

খান সাবের পাশাপাশি তার কেন বারবার পরীবানুর কথা মনে পড়ছে। ওর প্রতি তার কি কোনো দুর্বলতা ছিল। তিনি যখন নির্জনে একাকী বসে থাকেন তখন খান সাবের পাশাপাশি পরীবানুর কথাও মনে পড়ে। এই মনে পড়ার অর্থ এই নয় যে, পরীবানু খান সাবের কারণে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, তার জন্য তার দুঃখ হচ্ছে। প্রকৃত অর্থে পরীবানু দু-চারবার তার সঙ্গে কথা বলেছে, হাসি দিয়েছে, বাঁকা চোখে তাকিয়েছে। এই তার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা। পরীবানুর কথা মনে হলেই তিনি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। খান সাবএকভাবেমানুষের মাঝে আলো ছড়িয়েছেন, পরীবানু ছড়িয়েছেন অন্যভাবে। দুজনই আলোকিত মানুষ। এ সবভাবতে ভাবতে তিনি কখন যে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারেননি। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, নদীতে দুটো লাশ ভেসে যাচ্ছে, একেবারেই পাশাপাশি। তিনি লাশ দুটোর চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। লাশ দুটোর মুখে হাসি। একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে, হাসছে। লাশ কি হাসতে পারে, তাকাতে পারে। এই প্রশ্ন তাকে বিদ্ধ করল। ভালো করে তাকিয়ে তিনি যা আবিষ্কার করলেন, তাতে নিজেই বিস্মিত হলেন। এ তো খান সাবও পরীবানুর লাশ। ঘোর কেটে গেলে তার প্রশ্ন এটা কী করে হয়? খান সাবতো জীবিত। আর পরীবানু মরে গেছে অনেক আগেই। তিনি বোধশূন্য কিনা, সে জন্য নিজের শরীরে চিমটি কাটেন। চারদিকে ঝাপসা চোখে তাকান। কেন যেন জায়গাটি তার কাছে অচেনা মনে হচ্ছে। এটা তার গ্রামের নদী নয়। এ নদী অন্যরকম। মনে হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের কোনো নদী। যে নদীতে মরা মানুষ বেঁচে যায় অলৌকিকতায়। জীবিত মানুষও মরা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে, হাসতে পারে অনায়াসে।

তিনি নদীর দিকে তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেন। এ যেন মায়া-নদী সৌরভমাখা নদী। তিনি দেখতে পেলেন নদীতে হাজার হাজার বাঁশি ভেসে বেড়াচ্ছে। বাঁশিরা নিজেরাই সুর তুলছে অপূর্ব কায়দায়। এমন সুর পৃথিবীর কেউ কোনোদিন শোনেনি কখনো। হেমিলনের বাঁশির সুর এই সুরের তুলনায় কিছুই না। হেমিলন শহরের অবোধ শিশুরা কী কারণে যে বাঁশির সুরে বিমুগ্ধ হয়েছিল এবং অদৃশ্যে চলে গিয়েছিল তার সঠিক কারণ আজও অজানা। চারদিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, নদী পাড়ের সবমানুষ বাঁশির সুরে নেচে উল্লাস করছে। তারা বাড়িতে ফিরতে এবং খাবার খেতে ভুলে গিয়েছে। বাঁশির সুর নদী থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দূর-দূরান্তে। এলাকার সমস্ত পাখি এসে নদীর তীরে চক্কর খাচ্ছে। তারাও সুরের তালে পাখা ঝাপটাচ্ছে। এক সঙ্গে এত বাঁশি এত সুর কখনো তিনি প্রত্যক্ষ করেননি। তার চোখ-কানকে তিনি বিশ্বাস করতে করতে পারছেন না। বাঁশির তীব্র সুরে নদীর জল আরও বেড়ে যাচ্ছে। শান্ত নদী গতি পেয়েছে অনেক বেশি। আবারও তার মনে হচ্ছে, এই নদী তার চির পরিচিত স্বজন-নদী নয়, নয় তার আত্মার নদী। নদী পাড়ের যে সবমানুষ তিনি দেখছেন এরা তার পরিচিতি নয়। এমনকি ঝাঁকবাঁধা যে সবপাখি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, এ সবপাখি অতিথি হয়ে এসেছে, বাঁশির সুরে। তা হলে কি তিনি স্বপ্নঘোরে আবিষ্ট। নাকি এটাই বাস্তব। তিনি খান সাবকে যে বাঁশি বাজাতে দেখেছেন, ওই আদলের একটি বাঁশিও এখানে নেই। এ সববাঁশি অনেক বড় এবং রং বাহারি। এর শরীরে একদিকে ছিদ্র নয়। তার সারা শরীরেই অদ্ভুত ধরনের ছিদ্র। তার আরও মনে হচ্ছে, এই বাঁশি বাঁশের তৈরি নয়। বাঁশের চেয়ে হালকা কোনো জিনিস দিয়ে তৈরি, যা হয়তো সোলার ওজনের কাছাকাছি। সুর তুলে বাঁশিগুলো কীভাবে জলের মধ্যে অদ্ভুত কায়দায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ তারা নদী দখল করে আছে। ছড়িয়ে দিচ্ছে বিরহমাখা সুর। এমন করুণ সুর তিনি জীবনেও শোনেননি। বাঁশি যেন সুরের মাধ্যমে খান সাবআর পরীবানুর স্তুতি করছে। এই সুরের তালের যথেষ্ট উত্থান-পতন রয়েছে। তবেআবিষ্টতার দিক থেকে কোনো উত্থান-পতন নেই। সুরে মাতোয়ারা উড়ন্ত পাখির ডানা খসে পড়ছে নদীর মধ্যে। খসে পড়া ডানায় আলাদা সুর ও আবেদন তৈরি করছে। এই যে নদীকে কেন্দ্র করে মহা-সমারোহ মহা-আয়োজন, এটা কি কেবল তার চোখের দৃশ্য, নাকি বাস্তব? একজন মানুষ নদীর তীরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? এক থেকে দুই ঘণ্টা। এর বেশি যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে মানুষ তাকে দেখবে ভিন্ন দৃষ্টিতে। তিনি যতক্ষণ একনাগাড়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন, এত সময় খান সাবও দাঁড়িয়ে থাকেননি। অথচ পরীবানু নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর থেকে খান সাবকেই এলাকার মানুষ নদীর তীরে সবচেয়ে বেশি সময় দেখতে পেত। তিনি সকালে এসে নদীর তীরে দাঁড়িয়েছেন, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। সন্ধ্যাও নামি নামি করছে, অথচ তার বাড়িতে ফেরার নাম নেই। তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন, আর দেখছেন অদ্ভুত সব ঘটনা। নদীতে রাত নামলে তিনি আর খান সাব কিংবা পরীবানুর মুখ দেখতে পেলেন না। এমনকি বাঁশির বহর, নিমগ্ন সুরলহরী, কিছুই তার কানে বাজছে না। নদীর পাড়ের মানুষও কখন যে চলে গেছে, তাও তিনি খেয়াল করেননি। নদীতে অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে পাখির ঝাঁকও তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এমনও হতে পারে, রাতের অন্ধকারের সঙ্গে পাখির ঝাঁক একাকার হয়ে গেছে। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের নিজস্ব শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি তার দৃষ্টিকে নদীর দিকে ভালোভাবেপ্রসারিত করলেন। এই অচেনা নদী তার কাছে আরও অচেনা হয়ে উঠল। নদীর মাঝে কেবল গুচ্ছ গুচ্ছ অন্ধকার। একটু পরে তিনি যা দেখলেন, তাতে তিনি যারপরনাই অবাক হলেন। দূর থেকে অসংখ্য তারা নদীর জলে ভেসে আসছে। নানা রঙের তারা জলকে বহুবর্ণিল করে তুলেছে। জলের কোনো অংশ নীল কোনো অংশ লাল বেগুনি হলুদ। সাদা আলোও পড়ছে কোথাও কোথাও। নদীর এমন রূপ তিনি জীবনেও দেখেননি। পাখিদের মতো তারারাও গান গাচ্ছে অত্যন্ত মিহি সুরে। তার প্রশ্ন, এই তারাগুলো কি আকাশ থেকে খসে পড়েছে। আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। আজকের আকাশ গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। যতদূর চোখ যায়, কেবলই অন্ধকার। এবার তিনি নিশ্চিত হলেন, আকাশের তারাগুলোই নদীতে ভাসছে। জলের স্পর্শে একেকটি তারা শিল্পী হয়ে উঠেছে। আকাশে তাদের গান গাইবার কোনোই সুযোগ ছিল না। তারা ছিল নিথর নিশ্চুপ অথবা বধির।

৩৮.

এর আগেও গ্রামের মোড়ের বড় বটগাছটির নিচে তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। তখন খান সাব তার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ। বড় গাছের নিচে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে নেই, নিজেকে ছোট মনে হবে। কী কারণে নিজেকে ছোট মনে হবে, তার ব্যাখ্যা তিনি দেননি। কিন্তু তার ধারণা এ ক্ষেত্রে খান সাবের মতো নয়। তিনি মনে করেন বড় গাছের নিচে, বড় পাহাড়ের পাদদেশে কিংবা সাগরের তীরে দাঁড়ালে মন আরও বড় হয়ে যায়। মনের আবিলতা সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়। যে বা যিনি বড়, তার কাছ থেকে বড়ত্ব শিখতে হয়। বড়ত্ব শিখতে পারলে মন উদার মহৎ হয়। মনের ভেতরে মানবিক বোধ জন্মে। অবাক ব্যাপার, তিনি খান সাবকে একাধিক দিন বড় বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই স্ববিরোধিতা বা বৈপরীত্য রয়েছে। এটা ব্যক্তি স্বীকার করতে চান না। এটা খান সাবের মধ্যেও সক্রিয় রয়েছে। হয়তো বা এমনও হতে পারে, এর আগে তিনি বড় বটগাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন, এটা ভুলে গেছেন। কোনটা সঠিক, কোনটা অনুমাননির্ভর তা তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না। প্রত্যেক এলাকায়ই কালের সাক্ষী হিসেবে, একটি বড় বটগাছ থাকে। ওই গাছকে কেন্দ্র করে জন্ম নেয় নানা কল্পকাহিনীর। এই বটগাছটাও তার ব্যতিক্রম নয়। বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র আবিষ্কার করেছেন, বৃক্ষের জীবন আছে। কিন্তু জীবন থাকলেও নিজের কথা নিজের মতো করে কাউকে বলতে পারে না। না পাখিকে, যারা তার ডালে এসে আশ্রয় নেয়, বিশ্রাম করে এবং না বলে ইচ্ছেমতো দূর অজানায় উড়ে চলে যায়। না বলতে পারে পথিক কিংবা কৃষককে যারা ক্লান্তি দূর করার জন্য তার ছায়ায় বসে, না বলতে পারে ওইসবরাখাল ছেলেদের যারা তারই নিচে তার শরীরে হেলান দিয়ে স্বস্তি পায়, মনের সুখে কিংবা দুঃখে আনন্দে কিংবা বেদনায় হাতের বাঁশিতে সুর তোলার চেষ্টা করে।

বৃক্ষের জীবন আছে। নিজস্ব ভাষাও আছে। তবে অন্যসবপ্রাণী তা বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না। সেই অর্থে বৃক্ষটি প্রাণহীন মূক। ইচ্ছানুযায়ী কিছু করার স্বাধীনতা তার নেই। এ সবকথা ভেবেতিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। গাছটিকে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করলেন। তার জন্মের পর থেকে গাছটি যেন একই আছেন। তিনি নিজের মনের গভীরতা বোঝার আগে বটগাছটির গভীরতা বোঝার চেষ্টা করলেন। ঠিক এই মুহূর্তে তার বোধের জায়গাটি উর্বর নয়। তবু তিনি স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। তাকে কি খান সাবপেছন থেকে ডাকছেন। তার মায়াবী শীতল মুখ বারবার কেন ভেসে উঠছে। তিনি কি আর কখনো গ্রামে ফিরবেন না। নাকি তিনি পরীবানুর মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। তিনি দেখতে পেলেন, শত শত বাঁশি ও বই আকাশে উড়ছে। যেন অনন্তকাল আকাশে বাঁশি বাজতে থাকবেকরুণ সুরে। বই পড়ে আকাশ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। তার বাঁশি থেমে গেলেও লাইব্রেরি গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। সে স্বপ্ন তার জীবনের সঙ্গে উবে গেছে।



করোনার মহামারির শুরুর সময়ে বৈশ্বিক বিপর্যস্ততা রিজোয়ানের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। তিনি চিকিৎসা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দাবিতে স্ত্রী সন্তান নিয়ে প্লেকার্ড হাতে ছবি ছড়িয়ে দেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। মূকাভিনয় তৈরি করেন 'যিশু আবার' শিরোনামে এক অনবদ্য পরিবেশনাকলা। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের পক্ষ হয়ে একাই লড়ে যান চরিত্র থেকে চরিত্রে মুক্তির বার্তা নিয়ে। রিজোয়ান বলেন, তিনি নীরবতার সাধনা করেন। এই নীরবতা এক ধরনের শক্তি। এই শক্তিই তাকে হাজার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস জোগায়।

মূকাভিনয়

মূকাভিনয় সংগ্রামী রিজোয়ান রাজন

অপূর্ব কুমার কুণ্ডু

প্রচলিত ধারার বিপরীতে যিনি মূকাভিনয়কে তত্ত্বকথা আর বিধি বিধান থেকে যুক্ত করে আরও সহজ ও স্বাবলীল করেছেন তিনি চট্টগ্রামের মূকাভিনয় শিল্পী, সংগঠক ও প্রশিক্ষক রিজোয়ান রাজন। মূকাভিনয় মানে কালো টাইপ পোশাক আর সাদা পুরু মেকাপ এই ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। রিজোয়ান মনে করেন, মূকাভিনয়ের ভাষা যদি আন্তর্জাতিক ও সার্বজনীন হয় তবে এর সর্বোচ্চ ব্যবহার জরুরি। যদি শিল্পীর যথার্থ ব্যবহারটাই করতে না পারি তবে এই সার্বজনীনতার কী মূল্য আছে? সার্বজনীনতা জ্ঞাপন করতে চাই ন্যূনতম সুযোগ, যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে মূকাভিনয়ের উপস্থাপন। এ বিশ্বাস থেকেই তিনি পথে নামেন, আন্দোলনে শরিক হোন কিংবা সংগঠক হলে নেতৃত্ব দেন। কে সঙ্গী হলো, কতজন পেছনে দাঁড়াল এগুলো তাকে ভাবায় না। তিনি যা বিশ্বাস করেন সে বিশ্বাসে সামনে

এগিয়ে যান, পেছন ফিরে তাকান না। সত্যের পক্ষে তিনি বরাবরই লড়াকু। এভাবেই গত ২৮টা বছর মূকাভিনয়ে পথ চলেছেন। এখনো নতুন নতুন স্বপ্ন নিয়ে নতুন পথে তিনি চলেন।

রিজোয়ান রাজনের জন্ম ১৯৭৫ সালের ২০ জুলাই, চট্টগ্রামের রাউজানে। রাউজান হলো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী সূর্যসেন, মধ্যযুগের কবি নবীন চন্দ্র সেনসহ দেশসেরা আরও শিল্পী ও রাজনৈতিকদের জন্মভূমি। রিজোয়ান বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। বড় ও ছোট ভাইয়ের সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততা ছিল। বড়ভাই রায়হান নব্বইয়ের দশকে চট্টগ্রামের নাট্য আন্দোলনের একজন সক্রিয় সংগঠক ছিলেন। ছোটভাই ওয়াসিম সাফকাত ফটোগ্রাফি করেন এবং বাঁশি বাজাতেন। অন্যদিকে মায়ের প্রশ্রয় আর পারিবারিক অনুকূল পরিবেশে তার শিল্পচর্চা শুরু হয়।

শৈশব-কৈশোরে কর্ণফুলীর তীরঘেষা জুস মিলের নির্মল পরিবেশে তিনি বেড়ে ওঠেন। পরিবেশটা সুশৃঙ্খল, সাংস্কৃতিক আর খেলাধুলা উপযোগী ছিল। ক্রিকেট আর অ্যাথলেটিকস পারদর্শী হয়েও তিনি কলেজজীবন থেকেই নাটকের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ১৯৯৫ সাল থেকে তার নিয়মিত গ্রুপ থিয়েটার চর্চা এবং ১০ সাংগঠনিক মূকাভিনয় চর্চার নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা।

এ সময় তিনি যুক্ত হন মূকাভিনয় সংগঠন প্যান্টোমাইম মুভমেন্টে। দলটির সঙ্গে বাম ছাত্র রাজনীতির সখ্য ছিল। তাই নানা ইস্যুতে রাজনীতির মতো প্যান্টোমাইম মুভমেন্টেও রাজপথে সরব থেকেছে নিয়মিত। নব্বই দশকের পুরোটাই মৌলবাদ, সন্ত্রাস, ইয়াসমীন হত্যা, সুষ্ঠু নির্বাচন এসব বিষয়ের মূকাভিনয় করেই তিনি সমাজ ও শিল্পের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। মূকাভিনয় সরব হয়েছেন রাজু ভাস্কর্য উদ্বোধনে, উদীচীর সম্মেলনে বোমা হামলায়, ইরাকে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে পাশাপাশি তারকা হোটেলে ধূমপানবিরোধী ক্যাম্পেইনে, বাংলাদেশে সফটওয়্যার কোম্পানি-উইন্ডোজ ভিসতার সূচনায়, জলবায়ু-পরিবর্তনে বিশ্ব নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ কিংবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার বা মেরিল প্রথম আলোর জমকালো অনুষ্ঠানে তিনি বা তার দল প্যান্টোমাইম মুভমেন্ট। দল থেকে কর্মশালা, সেমিনার উৎসবসহ নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে তিনি দলকে করেছেন সুসংগঠিত এবং নিজেকে প্রকাশ করেছেন দক্ষ সংগঠক রূপে। নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, দেশ থেকে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন, মূকাভিনয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং স্বীকৃতি পেয়েছেন দেশে-বিদেশে।

রিজোয়ান দেশপ্রেমী মূকাভিনয় সচেতনতা তৈরি এবং মূকাভিনয় আগ্রহী করে তুলতে 'প্যান্টোমাইম' নামে একটি ঐতিহাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সহযোদ্ধাদের পাঠিয়ে মূকাভিনয় দল গঠনে উৎসাহ দেন। এভাবে ২০১০ সালে তিনি জাতীয় মূকাভিনয় কর্মী সম্মেলনের ডাক দিয়ে দেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে সারাদেশ থেকে একশত বিশজন এই সম্মেলনে যোগ দেন। যেখানে নতুনদের সঙ্গে পুরনো মূকাভিনয় শিল্পীরাও একত্রিত হন। গঠিত হয়ে যায় বাংলাদেশ মূকাভিনয় ফেডারেশন। এই বিপুল কর্মযজ্ঞে আরও যারা ভূমিকা রাখেন তারা হলেন রাজঘোষ, সোলেমান মেহেদী, আদনান মাহমুদ এবং মাসউদুর রহমান। গত বার বছর ধরে ফেডারেশনটি অত্যন্ত দায়িত্বশীলভাবে নিয়মিত কার্যক্রম করে যাচ্ছে। ফেডারেশনের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম মাইম ডিরেক্টরস মিট দেশ-বিদেশের মূকাভিনয় শিল্পীদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আবাসিক এই মিটের পরিকল্পনা এবং প্রধান সংগঠকের দায়িত্ব পালন করছেন রিজোয়ান রাজন। সময়ের পরিক্রমায় তার হাত দিয়ে বাংলাদেশ পথমূকাভিনয় পরিষদও গঠিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। সৃজনশীল এই মানুষটি 'মূকাভিনয় আড্ডা', 'মাইম রেসিডেন্সি' ইত্যাদির মাধ্যমে মূকাভিনয়ের উন্নয়নে সদা ব্যস্ত থাকেন। রাজপথ থেকে কর্পোরেট সব ধরনের অনুষ্ঠানেই নিয়মিত প্রদর্শনী করেন। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে একক মূকাভিনয় শিল্পীদের একটি প্লাটফর্ম গঠনে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ওয়ার্ল্ড মাইম অর্গানাইজেশন, ওয়ার্ল্ড মাইম কমিউনিটি এ ধরনের কয়েকটি সংগঠন থাকলেও তিনি মনে করেন একক শিল্পীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু মূকাভিনয়ের বিকাশে আরও সংগঠন হতে পারে। বাংলা ভাষায় মূকাভিনয়ের গ্রন্থ খুব একটা চোখে পড়ে না। এই অভাববোধ তার শিল্পীজীবনের প্রথম থেকেই তাড়া করে ফিরছিল। এ ছাড়া নাট্যকলার শিক্ষার্থীরাও মূকাভিনয়ের সঠিক ইতিহাস বা তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারে না। এসব কিছু বিবেচনায় তিনি ২০১৭ সালে 'মূকাভিনয় জানা-অজানা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

ইদানীং রিজোয়ান ট্রাভেলিং থিয়েটার ধারণায় একক মূকাভিনয়ে আগ্রহী হয়েছেন। আজকাল দল নিয়ে কাজ করার জায়গাগুলো সীমিত হয়ে গেছে। মহড়া কক্ষ সমস্যা, অর্থনৈতিক টানাপড়েন, যাতায়াত বিড়ম্বনা, সময় ব্যবস্থাপনা-সহ নানাবিধ ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে নবধারার মূকাভিনয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন। এ যাত্রার প্রথম মূকাভিনয় হিসেবে 'দ্য আর্টিস্ট' মূকাভিনয়টি নিয়ে গত বছর পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটি নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণসহ চট্টগ্রাম, ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জে একাধিকবার প্রদর্শনী করেছেন। তিনি নবধারার মূকাভিনয়কে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, মূকাভিনয় হলো বলা না বলা কথার যুগলবন্দি আর স্বতঃস্ফূর্ত দৃশ্য চিত্র কাব্যের রসাস্বাদন। রিজোয়ান তার দীর্ঘ মূকাভিনয় চর্চায় নানা মাত্রায় কাজ করেছেন। মঞ্চ থেকে রাজপথ, রাজপথ থেকে তারকা হোটেলে আবার তারকা হোটেল থেকে বিয়েবাড়ির আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে। সবখানেই তার উজ্জ্বল উপস্থিতি, স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে করেছে সময়োপযোগী, প্রাসঙ্গিক এবং বর্ণিল।

নিছক বিনোদন নয় বরং সমাজ রাষ্ট্রের প্রাসঙ্গিক করে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে চান তিনি মূকাভিনয়ে। তার মূকাভিনয় শুধু নির্দিষ্ট অঞ্চল বা একটি দেশের সীমায় থাকে না, হয়ে ওঠে সব মানুষের নির্বাক প্রতিবাদ আর নীরব হাসি-কান্নার প্রতিচ্ছবি। সাম্প্রতিক তার 'প্রাণ-প্রকৃতি' মূকাভিনয়টি বাংলাদেশকে ছাপিয়ে সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক করুণ বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। এখানে শিল্পের সার্বজনীনতা আর গল্পের সার্বজনীনতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় আর মহাকাব্যিক চেতনায় দর্শক মুখোমুখি হন বাস্তবতার।

করোনার মহামারির শুরুর সময়ে বৈশ্বিক বিপর্যস্ততা রিজোয়ানের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। তিনি চিকিৎসা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দাবিতে স্ত্রী সন্তান নিয়ে প্লেকার্ড হাতে ছবি ছড়িয়ে দেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। মূকাভিনয় তৈরি করেন 'যিশু আবার' শিরোনামে এক অনবদ্য পরিবেশনাকলা। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের পক্ষ হয়ে একাই লড়ে যান চরিত্র থেকে চরিত্রে মুক্তির বার্তা নিয়ে। রিজোয়ান বলেন, তিনি নীরবতার সাধনা করেন। এই নীরবতা এক ধরনের শক্তি। এই শক্তিই তাকে হাজার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস জোগায়। মূকাভিনয় শিল্পটিকে কমেডি বা সার্কাস টাইপ কিছু মনে করেন অনেকে। এটা অবশ্য স্বস্তা জনপ্রিয়তায় আগ্রহী বা অনুকরণ প্রিয়দের কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্ম। শিল্পে এই লোকগুলোর কোনো অবস্থান তৈরি না হলেও শিল্পটির ক্ষতিটা তারা করে যান। শুদ্ধ ও শৈল্পিক মূকাভিনয় চর্চা করতে গিয়ে রিজোয়ান মূকাভিনয়ের আদি সত্যের সন্ধান পান। প্রাচীন গ্রিসের মূকাভিনয় কথাও গানের ব্যবহারে অনন্য হয়ে উঠত। রামায়ণ মহাভারত উপস্থাপনেও আমরা গ্রন্থিক ও শৌভিকদের কথা জানি। গ্রন্থিকরা পাঠ করতেন আর শৌভিকরা অঙ্গাভিনয়ের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করতেন।

বাঙলার প্রাচীন নাট্যগীতের পরিবেশনাও আঙ্গিক বাচিক মিলে একাকার। অর্থাৎ মূকাভিনয় উপস্থাপনে গীত, নৃত্য বাচিক সহযোগী শিল্প হিসেবে ব্যবহার হতে পারে এবং এটাই মূকাভিনয়ের সৌন্দর্য। সম্প্রতি তিনি দেশের প্রাচীন এবং প্রথম প্রজন্মের মূকাভিনয় শিল্পী আমেরিকা প্রবাসী কাজী মশহুরুল হুদার সঙ্গে বাঙলা মূকাভিনয় গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছেন। প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে দেশের মূকাভিনয় চর্চাকে প্রণোদনা এবং বাংলাদেশের নিজস্ব মূকাভিনয় রীতি বা আঙ্গিক প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন তারা। নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা এই ত্রয়ীর মিলিত রূপই হলো মূকাভিনয় শিল্পী। সাধনা এবং একাগ্রতার মধ্য দিয়ে এই তিনটি গুণই অর্জন করা সম্ভব বলে রিজোয়ান মনে করেন।

মূকাভিনয় থিয়েটার থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো শিল্প নয়। মূকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে রিজোয়ান মূলত থিয়েটারটাই করেন। ব্যক্তিগত জীবনে চিত্রশিল্পী তামিমা সুলতানা এবং ঋষাণ তাহমিদ খানকে নিয়ে তার ছোট সংসার। আগামীতে এই শিল্পী দম্পতি একই বিষয় নিয়ে ক্যানভাসে এবং মঞ্চে আসবেন বলে জানান, আমরাও তাদের সেই যুগল কর্মের সাক্ষী হতে চাই। সুন্দর হোক রিজোয়ান রাজনের আগামীর পথচলা।



চলচ্চিত্র

সোনালী যুগের নূতন

জাহিদ রহমান

বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালি যুগের জনপ্রিয় নায়িকা নূতন। মূল থেকে পার্শ্ব-প্রায় তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। সত্তর-আশির দশকে সুজাতা, কবরী, সুচন্দা, শাবানা, ববিতার ভিড়ে তিনিও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে এসেছিলেন। আকর্ষণীয় মিষ্টি চেহারা আর নৃত্যব্যঞ্জনায় দর্শক পরিচিতি আর জনপ্রিয়তা পেতে তাই সময় লাগেনি তার। দ্রুতই সময় আর দর্শকদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। 'ওরা ১১ জন', 'সংগ্রাম', 'রাজনর্তকী', 'পাগলা রাজা', 'রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত', 'বসুন্ধরা', 'প্রাণসজনী' 'প্রেমবন্ধন', 'রূপালী সৈকতে' 'লাইলী মজনু', 'কাজল লতা', 'স্ত্রীর পাওনা', 'মানসী', 'রাজমহল', অবিচার', 'ফকির মজনু শাহ', 'বদলা', 'ননদভাবী', 'রাঙাভাবী', 'অলংকার', 'বদনাম', 'শাহজাদা', 'সৎভাই', 'কন্যাবদল', তাজ ও তলোয়ার', 'কাবিন', সোনার চেয়ে দামী, 'বাঁশিওয়ালা', 'সত্য-মিথ্যা', পাহাড়ী ফুল, অশান্ত, 'মালামতি' 'বাঁশিওয়ালা', 'আবদুল্লাহ'সহ এরকম অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। শুধু সিনেমাতে অভিনয় নয়, আশির দশকের প্রারম্ভে প্রথম

ল্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল সোপের মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপনেরও মডেল হন। এই বিজ্ঞাপনে অপরূপ স্নিগ্ধতা ও কোমলতায় নিজেকে মেলে ধরেছিলেন তিনি।

স্বাধীনতার আগেই সিনেমাতে অভিষেক ঘটেছিল ময়মনসিংহ শহরের এই মেয়েটির। নূতন নামের আগে রমা বা রত্না চক্রবর্তী হিসেবেই আপন বলয়ে পরিচিত ছিলেন। আকর্ষণীয় চেহারার এই তরুণীর তখন স্বপ্ন ছিল গায়িকা হবেন। তাই গানই ছিল তার প্রিয়, গানের তালিম নিতেন নিজ শহরেই। কিন্তু ৬৯ সালে মুস্তফা মেহমুদ পরিচালিত 'নতুন প্রভাত' ছবিতে তার অভিষেক ঘটলে স্বপ্নের পথ পাল্টে যায়। নতুন এক দরজাও যেন উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পরে অভিনেত্রী হিসেবে বড় বেশি আলোচ্য হয়ে ওঠেন তিনি। চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি 'ওরা ১১ জন' ছবিতে অভিনয়ের মধ্যদিয়ে সর্বমহলে তার পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। এই ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে নায়ক খসরুর বিপরীতে তিনি অভিনয় করেন। নূতনের সেই মুগ্ধময় অভিনয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথার মণিমুক্ত হয়ে আছে। এই ছবির নাম শুনলেই আমাদের সবার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত বেদনা ও বিজয়ের বিষাদময় গল্প। এই একটি ছবি দেখেই ৫০ বছর আগে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের জীবন্তচিত্র এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত এই ছবিটি তাই যুগ যুগ ধরে চিরায়ত হয়ে আছে। এই ছবিটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অনবদ্য প্রামাণ্য দলিল। 'ওরা ১১ জন'-এই ছবি দেখলে এখনো দর্শকদের চোখ ভিজে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সংগ্রাম ছবিতেও অভিনেত্রী নূতন গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্রে অভিনয় করেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও নূতন

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি মনে পড়লেই কেঁদে ওঠেন সোনালি যুগের বড় পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী নূতন। খুব মন খারাপ হয়ে যায় তার। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি দিনই ছিল তার কাছে ভীষণ দুঃসহ ও বেদনার। পাক-হানাদার আর রাজাকারদের আক্রোশ থেকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে প্রিয় মাকে নিয়ে ময়মনসিংহ শহর ছেড়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন অচেনা-অজানা ত্রিশালের এক গ্রামে। ভয়ে কখনো ঝোপ-জঙ্গলে লুকিয়েছেন। আবার নিজ চোখে দেখেছেন পাক-হানাদারদের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচতে দুই গ্রাম্য তরুণীর আত্মহত্যার ঘটনা। এখানেই শেষ নয়, দিনের পর দিন খেয়ে না খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। কখনো শুধু ভাতের ফ্যান খেয়েছেন। কখনো না খেয়ে থেকেছেন।

যুদ্ধের প্রারম্ভে নূতন তখন সবে তরুণী। ফুটফুটে মায়াবী চেহারার এক মেয়ে। তরুণদের চোখে একেবারে রাজকন্যা। ডাগর কালো চোখ আর সাদা মেঘের হাসি ছড়ানো দুরন্ত এক কন্যা। নাচ, গান তার ভীষণ পছন্দ। ঢাকায় এসে গুণী অভিনেত্রী সুমিতা দেবীর কাঁঠালবাগানের বাসায় আশ্রয় নিয়েছেন। কদিনের মধ্যেই 'নূতন প্রভাত' নামে একটি ছবিতে অভিনয় করেন। নূতন যেন সবার কাছে আরও নূতন হয়ে ওঠেন। অনেক পরিচালকই তাকে কাস্ট করার জন্য যোগাযোগ করতে থাকেন। নূতনও সিনেমা জগৎ নিয়ে বিস্তর স্বপ্নের এক ঘোরে পড়েন। সুজাতা, কবরী, শাবানা, ববিতার পরেই যেন তিনি। সিনেমাজগতে সত্যিই অভিনয় দিয়ে অভিনেত্রী নূতন এক নূতন সুবাস ছড়িয়ে চলেছেন।

এর মধ্যে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। সব পরিকল্পনা, স্বপ্ন তাই দ্রুতই এলোমেলো হয়ে যায়। একসময় সুমিতাদেবী বলেন, তিনি ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঢাকায় থাকা আর নিরাপদ মনে করছেন না। নূতন খানিকটা দুশ্চিন্তায় পড়েন। ময়মনসিংহ শহরে রয়েছে তার মাসহ অন্য বোনেরা। নূতন সিদ্ধান্ত নেন মায়ের কাছে চলে যাবেন। ঢাকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে তাই চলে যান ময়মনসিংহ নিজ বাড়িতে। আসুন এবারে অভিনেত্রী নূতনের মুখ দিয়েই শুনি পরের ঘটনাবলি।

'একাত্তরে ৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পরই বুঝতে পারি দেশে বড় কিছু হতে যাচ্ছে। আসলে এর আগে অনেককিছুই টের পাই। চলচ্চিত্রে পা রাখার পর জহির রায়হানের মতো দেশপ্রেমিক পরিচালককেও দেখি আন্দোলন সংগ্রাম করতে। চলচ্চিত্রের মানুষ দেশের জন্য রাস্তায় নেমেছে। তারাও আন্দোলন করেছে। ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকসেনারা অতর্কিত নৃশংস হামলা চালালে ভীষণ ভয় পাই। আমি তখন কলাবাগানে সুমিতা দির বাসায় থাকি। উনি আমার অভিভাবক। আমার শ্রদ্ধাভাজন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একদিন সুমিতা দি জানালেন তিনি ভারতে চলে যাবেন। আমি ভারতে যাওয়ার জন্য সায় দিলাম না। কেননা মা আমার বাড়িতে থাকে। আমাদের বাড়ি ময়মনসিংহ শহরের চরপাড়াতে। আমি ময়মনসিংহ চলে গেলাম। নানান ভয়ভীতি আর সংশয়ের মধ্যে ময়মনসিংহে থাকতে লাগলাম। চারদিকে সংশয়। নানান কথামালা। হিন্দু পরিবারগুলো প্রতিদিন ভারতের দিকে ছুটে চলেছে। আমরা বাসাতেই। কিন্তু বারবার ভাবী এই বুঝি কেউ এলো, আক্রমণ হলো। একসময় খবর পেলাম পাকবাহিনী আমাদের এলাকাতে আসতে পারে। হামলা করতে পারে। আমার মা তাই সবাইকে নিয়ে খুব চিন্তা করতে লাগলেন। আমার বাবা নেই। অভিভাবকহীন সংসারে মা'ই সব। আমাদের পুরো পরিবার নিয়ে দূরে কোথাও সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মা। ময়মনসিংহের পাশেই ত্রিশাল থানা। ওখানে ভূঁইয়া বাড়িতে আশ্রয় নিলাম আমরা। ওই বাড়িতে ছিল ৭ ভাই আর ১ বোন। আমরা ওখানেই থাকতে লাগলাম। একদিন সত্যি ওখানে পাকসেনা আর রাজাকাররা আসে। সেদিন আমরা সবাই মিলে একটা গাছে আশ্রয় নিই। ওখানে ছিল অনেক গাছ ও জঙ্গল। এই দিনটির কথা আমি ভুলতে পারবনা। সেদিন প্রতিটি মানুষকে দেখেছি বাঁচার জন্য যে যেখানে পারছে পালাচ্ছে। ওখানেই একটা ঘটনা ঘটেছিল। একদিন ওই জনপদে পাকসেনারা ঢুকে। অনেক মা-বোনের ইজ্জত তারা নষ্ট করে। খবর পেলাম পাশেই আপন দুইবোন আত্মহত্যা করেছে শুধু পাকবাহিনীর কাছ থেকে নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য। এ সব ঘটনা মনে পড়লে খুব খারাপ লাগে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি দিনই নানা কষ্ট করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে কোনো কাজ করার উপায় ছিল না। মানুষ হাটবাজার করতে পারত না। অর্থসংকট চারদিকে। কত বেলা যে না খেয়ে থেকেছি তার ঠিক নেই। একবেলা খেয়েছি তো আর একবেলা খেতে পারিনি।'

'ওরা ১১ জন'-এর নূতন

একাত্তরের আগেই অভিনেত্রী নূতনের চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে। 'নতুন প্রভাত' নামে একটি ছবিতে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্রে পা রাখেন। বড় বড় তারকার ভিড়ে ভীষণ আকর্ষণীয়া আর মায়াময় চেহারার নূতন তখন অনেকটাই অচেনা। কিন্তু 'ওরা ১১ জন' মুক্তি পাওয়ার পর অভিনেত্রী নূতন যেন আরও নূতন রূপে আবির্ভূত হন। দ্রুতই দর্শকদের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। শুধু পরিচিতি নয়, অপূর্ব অভিনয়শৈলী দিয়ে দর্শকদের মনও জয় করেন। তার অভিনয় দেখে সিনেমা হলে বসে সে সময় অনেকেই কেঁদেছেন। শেষ দৃশ্যে নূতনের অভিনয়কে আর অভিনয় মনে হয়নি, সবার কাছেই মনে হয়েছে এটি যেন তাদেরই পরিবারের কোনো এক নির্যাতিত বোন।

মুক্তিযুদ্ধের পরপরই আলোচিত 'ওরা ১১ জন' ছবিটি নির্মাণ করেন বিখ্যাত পরিচালক প্রয়াত চাষী নজরুল ইসলাম। ছবিটি প্রযোজনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেই সময়কার ছাত্রলীগ নেতা মো. মাসুদ পারভেজ, যিনি নায়ক সোহেল রানা হিসেবে সর্বজনে পরিচিত। ছবিটি মুক্তি লাভ করে ৭২ সালের ১৩ আগস্ট। 'ওরা ১১ জন' ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন খ্যাতিমান বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল আলম খান খসরু।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যিনি ঢাকা অঞ্চলের গেরিলা কমান্ডার ছিলেন। তার সাথে আর যে অন্য ১০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা অভিনয় করেন তারা হলেন- মঞ্জু, অলীন, হেলাল, আবু, আতা, নান্টু, বেবী, মুরাদ, আলতাফ এবং ফিরোজ। এর পাশাপাশি 'ওরা ১১ জন' ছবিটিতে তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন নায়ক রাজ রাজ্জাক, শাবানা এবং নূতন। এ ছাড়াও এই ছবিতে অভিনেত্রী রওশন জামিল, মিনারা জামান, সুমিতা দেবী, গুণী অভিনেতা মেহফুজ, সৈয়দ হাসান ইমাম, খলিল, রাজসহ অন্যরা অভিনয় করেন। ছবিতে রাজাকারের চরিত্রে অভিনয় করেন এটিএম শামসুজ্জামান। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেন প্রখ্যাত সুরকার খোন্দকার নূরুল আলম। ছবিটিতে মোট 'ও আমার দেশের মাটি', 'আমায় একটি ক্ষুদিরাম দাও বলে কাঁদিস না মা', এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা'-এই তিনটি গান ব্যবহার করা হয়। ৭২ সালে এই ছবিটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে।

এই ছবিতে নায়ক খসরুসহ অন্য যারা অভিনয় করেন তাদের সবাই ছিলেন রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসা বীর মুক্তিযোদ্ধা। 'ওরা ১১ জন' ছবির শুটিং হওয়ার কিছুদিন আগে যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে আসেন। কয়েকজন ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহধন্যও। এই ছবির পরিচালক, কলাকুশলীদের

> পরিচালক মোস্তফা মেহমুদ, ইবনে মিজান, সুভাষ দত্ত, আলমগীর কবীর, মোস্তফা আনোয়ার, মাসুদ পারভেজসহ অনেককেই জীবন চলার পথে মান্য করেন নূতন। স্মরণে-শ্রদ্ধায়, প্রার্থনায় রাখেন তাদের। নায়ক রাজ রাজ্জাককে হৃদয় থেকে মুছতে পারেন না কখনো। পাগলা রাজাসহ বেশ কয়েকটি ছবিতে তিনি একক নায়িকা হিসেবে নায়ক রাজ্জাকের বিপরীতে অভিনয় করেছেন। আর সুমিতা দেবী তার হৃদয়মন্দিরে বিরাজমান সবসময়। নূতন বলেন, 'অভিনেত্রী সুমিতা দি'র কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। সে তো আমার জননী। তার আত্মার শান্তি কামনা করছি। এই অসাধারণ অভিনেত্রীর হাত ধরেই আমার চলচিত্রে উত্থান। আমি কলাবাগানে উনার বাসায় থাকতাম। সেই স্বাধীনতার আগে ঢাকায় এলে প্রথম উনার বাসায় উঠতাম। শুটিং করে আবার ফিরে যেতাম ময়মনসিংহে। দিদির এই ঋণ কোনোদিন শেষ হবে না।'
> অভিনেত্রী নূতন এখনো নাচকেই সর্বজ্ঞান মনে করেন। নাচের বাইরে আর কিছু ভাবেন না।

অনেকেই বেঁচে নেই। পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম, নায়ক রাজ্জাক, অভিনেত্রী রওশন জামিল, সুমিতা দেবী, অভিনেতা মেহফুজ, খলিলসহ অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত হয়েছেন 'ওরা ১১ জন' ছবির সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ।

এই ছবির অন্যতম একটি চরিত্রে অভিনয় করেন আমাদের সিনেমার সোনালি যুগের জনপ্রিয় নায়িকা নূতন। ছবিতে তিনি নায়ক রাজ্জাকের ছোট বোন (শীলা), যিনি পাক-হানাদার কর্তৃক ধর্ষিতা হন। নায়ক খসরু যাকে ভালোবাসতেন। দেশ স্বাধীন হলে তিনি হানাদারদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেলেও ক্ষোভ আর অপমানে প্রিয় মানুষ খসরুর হাতের উপরে মারা যান।

সেই ৪৯ বছর আগে অভিনয় করা মুক্তিযুদ্ধের এই অনন্য ছবিটি হৃদয়ের মধ্যে ধরে আছেন অভিনেত্রী নূতন। এই ছবির কথা তিনি কখনই ভুলতে পারেন না। এই ছবির কথা স্মরণে আনলেই আবেগাপ্লুত হন। এই ছবি নিয়ে প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বলেন, 'এই ছবিটিই তো আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। এই ছবির ঘটনাবলির মধ্যেই এ দেশ আমরা কীভাবে পেয়েছি তা বিস্তৃত হয়েছে। এই ছবিটি এক অনন্য ইতিহাস। আমি গর্বিত যে আমি এই ইতিহাসের অংশ। এই ছবি আমার আত্মার অংশ। জীবনের যত অর্জনই থাক এই ছবিতে আমার আবদানটুকু আমার জীবনের সেরা অলংকার। এই ছবিটিকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি।' অভিনেত্রী নূতনের কাছ থেকে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তিনি ঢাকাতেই ছিলেন অভিনেত্রী সুমিতা দেবী'র বাসায়। কিন্তু সুমিতা দেবী একসময় সিদ্ধান্ত নেন তিনি ভারতে চলে যাবেন। বিষয়টি নূতনকে বলেন। তখন নূতন সিদ্ধান্ত নেন তিনি ময়মনসিংহ শহরের চরপাড়াতে নিজ বাসাতে চলে যাবেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি মায়ের কাছে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধে শেষে তিনি ফিরে আসেন ঢাকাতে। ঢাকার মোহাম্মদপুরের হুমায়ূন রোডে সুমিতা দেবীর কাছে চলে আসেন। স্মৃতি আওড়িয়ে বলেন, 'এই ছবিটিতে আমাকে কাস্ট করার আগে প্রযোজক মাসুদ পারভেজ ভাই এবং চাষী ভাই সুমিতাদি'র বাসায় আসেন। আমাকে উনারা দেখেন, কথা বলেন। উনারা বুঝতে পারেন শীলা চরিত্রের সাথে আমি মানানসই। আর আমিও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম একজন। চোখের সামনে সব ঘটেছে। আমার মধ্যেও প্রচণ্ড আবেগ। উনারা আমাকে চূড়ান্তভাবে কাস্ট করেন। স্ক্রিপ্ট পড়ার পর চাষী ভাইয়ের ডিরেকশনে আমি আমার চরিত্র নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকি। আসলে তখন অন্যদের মতো আমারও চোখে-মুখে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি। ভয়, আতংক মন থেকে মুছে যায়নি। এরপর শুরু হলো শুটিং পর্ব।' নূতন জানান তিনি সাভার এবং এফডিসির ২ নম্বর ফ্লোরের পেছনেসহ বিভিন্ন জায়গাতে শুটিং-এ অংশ নেন। এই ছবিকে জীবন্ত করতে সবাইকে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। ছবিতে গোলাবারুদের ব্যবহারে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। সবই ছিল বাস্তব। ফলে অনেক ঝুঁকি নিয়ে সবাইকে শুটিং-এ অংশ নিতে হয়। যুদ্ধের বিভিন্ন অংশে আসল অস্ত্রই ব্যবহার করা হয়েছে। নূতন বলেন, 'যুদ্ধের পরপরই চাষী ভাই কত না পরিশ্রম করে এই ছবিটি বানালেন। এই ছবিতে অন্যতম বিষয় ছিল ঐতিহাসিক ৭ মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ সংযোজন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চেও ভাষণ সংযোজনের ফলে ছবিটি আরও পরিপূর্ণতা লাভ করে। ছবির মধ্যে ভীষণ রকম একটি গতি তৈরি হয়। সবচেয়ে বড় কথা পুরো ছবিটির মধ্যেই দর্শক তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি দেখতে পেয়েছে। ফলে দর্শকদের অনুভূতিতে একাকার হয়ে গেছে ছবিটি।'

ছবির ওরা ১১ জন সম্পর্কে নূতন বলেন, 'আসলে আমার মনে হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা খসরু ভাইসহ অন্য বীর মুক্তিযোদ্ধারা এই ছবিতে অভিনয় করতে আসেননি, উনারা যুদ্ধের বাস্তব চিত্রই তুলে ধরতে এসেছেন। সেটাই করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। যুদ্ধদিনের বিষাদময় ঘটনা, ত্যাগ, বিজয় এবং অন্যান্য বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে রণাঙ্গনের চেয়েও এখানে তাদের বেশি কষ্ট করতে হয়েছে। তারা সেই কষ্ট-শ্রমের মূল্যও পেয়েছেন মানুষের কাছ থেকে।' 'ওরা ১১ জন' ছবি সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে অভিনেত্রী নূতন বলেন, "এই ছবি তৈরির মূল উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাসটা সেলুলয়েডের ফিতায় ধরে রাখা। সেখানে শতভাগ সফল হন প্রখ্যাত পরিচালক শ্রদ্ধেয় চাষী নজরুল ইসলাম। এ কারণেই এই ছবিটি কালজয়ী। ছবিটি মুক্তি পাবার পর চাষী ভাই আমার অভিনয়ের প্রচণ্ড প্রশংসা করেন। বারবার আমাকে বলতেন, তুই যে অভিনয় করেছিস তা বলার মতো নয়।' তিনি আরও বলেন, 'এই ছবি করার আগে বারবার আমার হৃদয়ে অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ, তার অনড় উদাত্ত আবার হৃদয়স্পর্শী সেই-আহ্বান 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো..। তার জন্যই আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। সেই মানুষটিকে সবসময় স্মরণ করি। তার কণ্ঠস্বর, তার আহ্বান আমাকে সবসময় মুগ্ধ করে।'

নূতনের মতে, 'ওরা ১১ জন' ছবি তার আত্মার অংশ। যখনই এই ছবির কোনো ক্লিপ দেখেন, গান শোনেন, তিনি ফিরে যান একাত্তরে। এই ছবির সাথে তার যে আত্মিক বন্ধন তা তাকে সব

সময় রোমাঞ্চিত করে। তিনি মনে করেন প্রয়াত সুমিতা দেবী, পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম, মাসুদ পারভেজের সহযোগিতা না পেলে এই অবিস্মরণীয় ইতিহাসের অংশ তিনি হতে পারতেন না।

নূতন বলেন, ''কালজয়ী 'ওরা ১১ জন' ছবির কলাকুশলী, অনেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম, সংগীত পরিচালক খোন্দকার নূরুল আলম, চিত্রগ্রাহক আব্দুস সামাদ, শ্রদ্ধেয়া সুমিতা দেবী, রওশন জামিলসহ অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী আর নেই। ওরা ১১ জনের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেও চলে গেছেন। বেঁচে থাকতে নান্টু ভাই, মুরাদ ভাই- এর সাথে দেখা হতো, কথা হতো। নান্টু ভাই, মুরাদ ভাইও মারা গেছেন। খসরু ভাইসহ কারও সাথেই এখন আর দেখা হয় না। এই ছবির প্রতিটি কলাকুশলী এক একটা ইতিহাস। আমিও একদিন চলে যাবো। আমরা সবাই চলে যাব। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় পাতায় যুগযুগান্তর ধরে থাকবে 'ওরা ১১ জন' ছবির মর্মস্পর্শী ঘটনা।''

নৃত্য পটিয়সী নূতন

অভিনেত্রী নূতন আর নৃত্য সমার্থক। প্রায় সব ছবিতেই তিনি বিশেষত্ব পেয়েছেন অপূর্ব নৃত্যশৈলীর কারণে। কীর্তনিয়া, শাস্ত্রীয়, কত্থক, ভারতনাট্যম, সর্পনৃত্য, বাউল, ফোক, আধুনিক, ওয়েস্টার্ন-চরিত্র অনুযায়ী নানা ধরনের নৃত্য সমাহারে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন বিভিন্ন সিনেমাতে। তার প্রাণময়, গতিশীল মনোমুগ্ধকর নৃত্য সিনেমা দর্শকদের স্মৃতি থেকে একবিন্দু হারিয়ে যায়নি। নূতনের পরে যারাই এসেছেন তারা কেউ যে তাকে টপকাতে পারেনি তা বলাই বাহুল্য। সেই টপকাতে না পারার অন্যতম কারণ তার বৈচিত্র্যময় অপূর্ব নৃত্য উপস্থাপন। এখনো তাই চলচিত্রের নৃত্যে তাকে আলাদা করে স্মরণ করতে হয়। আশির দশকে 'মানসী' ছবিতে তিনি রুনা লায়লার গাওয়া 'মন চায় প্রতিদিন, তুমি আমি একদিন' গানে লিপ করেছিলেন। রুনা লায়লার গাওয়া ভীষণ মেলোডিয়াস এই গানটি তিনি দর্শক হৃদয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাণবন্ত সৌন্দর্যময় এক নাচ উপহার দিয়ে। নূতনের ভক্তদের কাছে এই নাচ এখনো স্বর্গসম।

আশির দশকে নায়ক রাজ রাজ্জাক পরিচালিত 'পাগলা রাজা' ছবি সুপারহিট হয়েছিল। এই ছবিতে রুনা লায়লার কণ্ঠে নায়িকা অলিভিয়ার লিপে 'বনে বনে যত ফুল আছে' গানটিতে তিনি যে নাচ উপহার দিয়েছিলেন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। সেই সময় 'অ্যাক্রোবেটিক' নাচে তিনি অসম্ভব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। আশির দশকে তার এক নাচেই নায়িকা 'নূতন' দর্শকদের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লাইলী মজুন ছবিতে 'জান্নাতে হুর আমি' গানটিতে নূতনের নাচ ছিল বিস্ময়কর। তার অসাধারণ নাচ ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনার ছবি 'অবিচার'-এ ভারতের নায়ক মিঠুনের সাথে আশা ভোঁশলের কণ্ঠে লিপ করেছিলেন 'নাগর আমার কাঁচা পিরিত পাকতে দিল না'। গানে-নাচে অভিনেত্রী নূতন যেন আকাশে উড়ে গিয়েছিলেন। আবার বুলবুল আহমেদ পরিচালিত 'রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত' ছবিতে সাবিনা-সুবীর নন্দীর গাওয়া 'বিধি কমলও করিয়া পাঠালো আমায়, লাগলাম নাতো কারো পূজাতে'- এই গানে তার বাউল নৃত্য অসম্ভব এক শিল্পীত রূপ পেয়েছিল।

অভিনেত্রী নূতন বলেন, 'আমি সবসময় নাচে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছি। নাচতে গিয়ে অবর্ণনীয় কষ্ট করেছি। অনেক সময় পা ফুলে গেছে। কিন্তু তবুও সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পরিচালক আর ড্যান্স ডিরেক্টদের নির্দেশে দিনের পর দিন রিহার্সেল করতে হয়েছে। তবে অনেক নাচেই আমি আমার মতো করে সৃজনশীলতা দেখাতে হয়েছে।' অভিজ্ঞ অভিনেত্রী নিজের নাচের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, 'নৃত্য এক সৃজনশীল কলামাধ্যম। কত কষ্ট করতে হয় এখানে। শরীরকে ভেঙেচুরে উপস্থাপন করতে হয়। কিন্তু আমরা উপেক্ষিত। চলচ্চিত্রের নাচের শিল্পীদের স্বীকৃতি নেই, মর্যাদা নেই।' দীর্ঘ অভিনয় জীবনে নাচতে গিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তি আর ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। বলেন, ''আড়ালে-আবডালে থাকা সে সব দীর্ঘ নিশ্বাসের কথা কেউ জানে না। জীবন বিপন্নের খবরও কেউ রাখেনি। সবাই শুধু চেয়েছে যেন চরিত্র অনুযায়ী পারফেক্টলি নাচ উপস্থাপনটা করতে পারি। মনে আছে একবার জামসেদুর রহমান পরিচালিত 'ননদভাবী' ছবির একটি গানের শুটিং-এ প্রায় আগুনে পুড়ে মরতে বসেছিলাম। গানটি ছিল রুনা লায়লার কণ্ঠে 'মনেরও মানুষ পেলে..'। এই গানটিতে মোমবাতির ব্যবহার ছিল। মোমের মধ্যে আগুন ছিল, সেই আগুনে পুড়ে মরতে বসেছিলাম।''

শ্রদ্ধেয় প্রয়াত পরিচালক ইবনে মিজানের কথা স্মরণে এনে বলেন, ''উনি আমাকে 'মা' বলে ডাকতেন। খুব পারফেক্টলি সবকিছু চিত্রায়ন করতেন। উনার ডিরেকশন ছিল চমৎকার। উনি 'রাজনর্তকী' ছবিতে আমাকে নায়িকা বানিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রিয় অভিনেতা নায়ক রাজ রাজ্জাকের সাথে। এই ছবিতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল প্রতিটি গানকে নাচের সাথে সৌন্দর্যময়ভাবে উপস্থাপন করার জন্য।'' অভিনেত্রী নূতন আরও বলেন, 'জীবনের প্রতিটি সময়েই কাজকেই ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছি। কিন্তু জীবন চলার পথে উপেক্ষা, অবহেলা, ষড়যন্ত্রও দেখেছি। তবে সফলও হয়েছি। স্মৃতি থেকে বললেন, ''নব্বই দশকে পরিচালক তোজাম্মেল হোসেন বকুল যখন 'আব্দুল্লাহ' ছবি নির্মাণ করবেন তখন দিলদারের বিপরীতে নায়িকা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কেউ ঝুঁকি নিতে চায় না। আমি ঝুঁকি নিলাম। দিলদারের নায়িকা হলাম আমি। 'আব্দুল্লাহ' ছবি সুপার হিট হলো সেই সময় ছবিটি তিন থেকে চার কোটি টাকার ব্যবসা করল।''

অপরাজিত এক নূতন

জীবনের অনেক পথ পেরিয়ে এসেছেন অভিনেত্রী নূতন। লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন থেকে অনেকটাই দূরে। এখন সেই আগের ব্যস্ততা নেই। স্বভাবতই পুরনো স্মৃতির মাঝে ডুবে থাকেন নিত্য। তবে বরাবরের মতোই তিনি ভীষণ স্পষ্টবাদী। সাহস নিয়ে সত্য বলেন। কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। তিনি মনে করেন একজন শিল্পীর জীবন মানেই অভিনয় নিয়ে ব্যস্ততা। কিন্তু সিনেমার সেই স্বর্ণকাল না থাকার কারণে শিল্পীদের ব্যস্ততা নেই। পুরনো শিল্পীরা অনেকটাই বেকার। এ বিষয়টি তাকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে। তার মতে, এখন যে সবনাটক, সিনেমা বানানো হয় সেখানে তারা অপাঙতেয়। তাদের জন্য কোনো চরিত্র নেই।

পরিচালক মোস্তফা মেহমুদ, ইবনে মিজান, সুভাষ দত্ত, আলমগীর কবীর, মোস্তফা আনোয়ার, মাসুদ পারভেজসহ অনেককেই জীবন চলার পথে মান্য করেন নূতন। স্মরণে-শ্রদ্ধায়, প্রার্থনায় রাখেন তাদের। নায়ক রাজ রাজ্জাককে হৃদয় থেকে মুছতে পারেন না কখনো। পাগলা রাজাসহ বেশ কয়েকটি ছবিতে তিনি একক নায়িকা হিসেবে নায়ক রাজ্জাকের বিপরীতে অভিনয় করেছেন। আর সুমিতা দেবী তার হৃদয়মন্দিরে বিরাজমান সবসময়। নূতন বলেন, 'অভিনেত্রী সুমিতা দি'র কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। সে তো আমার জননী। তার আত্মার শান্তি কামনা করছি। এই অসাধারণ অভিনেত্রীর হাত ধরেই আমার চলচিত্রে উত্থান। আমি কলাবাগানে উনার বাসায় থাকতাম। সেই স্বাধীনতার আগে ঢাকায় এলে প্রথম উনার বাসায় উঠতাম। শুটিং করে আবার ফিরে যেতাম ময়মনসিংহে। দিদির এই ঋণ কোনোদিন শেষ হবেনা।' অভিনেত্রী নূতন এখনো নাচকেই সর্বজ্ঞান মনে করেন। নাচের বাইরে আর কিছু ভাবেন না। বলেন, 'আমি কৈশোরে ময়মনসিংহ বাফাতে গান ও নাচ শিখতাম। আমার ওস্তাদজী ছিলেন পূর্ণ চন্দ্র সরকার। এই মানুষটিকে সারাজীবন শ্রদ্ধার আসনে রেখেছি। তাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারবনা, ভুলবো না। ওস্তাদজী পূর্ণ চন্দ্র সরকার ভালো তবলা বাজাতেন। পরে ওস্তাদ মিথুন দে'র কাছেও আমি গান শিখেছি।' একটা প্রশ্ন অভিনেত্রী নূতনের হৃদয়কে নিত্য কুরে খায় এই ভেবে- যে শিল্পের পেছনে তিনি জীবনের সবক্ষণ-দিন পার করলেন কী পেলেন সেখান থেকে? হ্যাঁ, দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি নিরন্তর। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলেনি। তবে নূতন মনে করেন তাকে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখবে 'ওরা ১১ জন' ছবিটি। নূতন বলেন, ''মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজে রণাঙ্গনে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে না পারলেও স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক 'ওরা ১১ জন' এবং পরবর্তীতে 'সংগ্রাম' নামে আরও একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবিতে অভিনয় করে সেই ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করতে পেরেছি। আমার জীবনের সার্থকতা এটুকুই। এই দুই ছবিতেই আমি অভিনয় করেছি। এই দুই ছবির নাম উচ্চারিত হলে আমার নামটিও উচ্চারিত হবে। জীবনে এই প্রাপ্তির চেয়ে বড় প্রাপ্তি হয় না। এই প্রাপ্তিই আমার নিরন্তর অহংকার।''

সবশেষে নূতন তার প্রিয় নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে বলেন, 'জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের শিল্পীদের প্রতি যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়েছেন সেটে তুলনাহীন। এর আগে এরকম কেউ এগিয়ে আসেনি। আশা করি দেশের সিনেমা শিল্পও ঘুরে দাঁড়াবে তার নেতৃত্বেই।'


www.fsiblbd.com
সবার জন্যে সবসময়
airtel
টেলিটক
CLOUD
রবি
Banglalink
গ্রামীণফোন
FSIBL CLOUD
দিয়ে যেকোন অপারেটরে
মোবাইলে রিচার্জ করুন সহজে
Download FSIBL Cloud app
Google Play
App Store
Call Center
16257
24/7
FSIB
ISLAMI BANK
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ
فارست سيكيوريتي اسلامي بنك ليميتد FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD.



ঈদ ফ্যাশন

ঈদ ফ্যাশনে বৈচিত্র্য

সাবিকুন্নাহার রীপা

ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানেই নতুন পোশাক। ঈদ বরাবরই নতুন পোশাক ও ফ্যাশনের কানিভাল। ঈদে যেনতেন পোশাক হলে তো আর হয় না। ঈদের আনন্দকে বাড়িয়ে তোলার জন্য চাই ফ্যাশনেবল পোশাক। শিশু-কিশোর তরুণ-তরুণী বৃদ্ধ সবারই চাই হাল আমলের ফ্যাশনেবল আরামদায়ক মানানসই পোশাক। এ বছরে ঈদে কেমন হবে সাজ, পোশাকও ফ্যাশন ট্রেন্ড। গরমের কথা মাথায় রেখে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিগুলো কাপড়ের ধরন, রং ও ডিজাইন সিলেক্ট করেছে। বৈশ্বিক স্টাইল স্টেটমেন্ট অনুসরণের পাশাপাশি রয়েছে স্বদেশী ফ্যাশন ও সাজের নতুন ধারণা।

বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণের ছোট-বড় ফ্যাশন হাউস গড়ে উঠেছে। এই ফ্যাশন হাউস বা বুটিক হাউসগুলোর মধ্যে সেরা বুটিক হাউসের তালিকায় রয়েছে আড়ং, ক্যাটস আই, রিচম্যান, ইয়েলো, এক্সট্যাসি, রঙ বাংলাদেশ, কে ক্র্যাফট, অঞ্জনস, বিবিয়ানা, দর্জিবাড়ি। বাঙালির উৎসবপার্বনে নারীর প্রধান পোশাক শাড়ি। শাড়িতে সুন্দরী বাঙালি নারী। উৎসবহলে তো কথাই নেই। শাড়িতে নতুনত্ব আনতে ডিজিইনরা বরাবরই সচেষ্ট থাকেন। উৎসবের আগে ক্রেতারাও নতুন ডিজাইনের অপেক্ষায় থাকেন। বাঙালি রমণী এবং শাড়ি যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আধুনিক এই যুগে এসেও রমণীদের দুর্বলতার


হামদর্দ
১৯০৬ সাল হতে
বিশুদ্ধ নাম, পরিশ্রিত পণ্য
শরবত
রুহ আফজা®
শত বছরের স্বাদ
শত বছরের আস্থা
www.roohafza.com.bd
হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ
১৯০৬ হতে মানব সেবায় নিবেদিত অনন্য প্রতিষ্ঠান



জায়গায় রয়ে গেছে চিরায়ত বাংলার শাড়ি।
ঈদ আর পহেলা বৈশাখ একই মাসে হওয়ার কারণে শাড়ির ফ্যাশনে রয়েছে জোড়া উৎসবের আমেজ। বড় ফ্যাশন হাউসগুলো বৈশাখী উৎসবের জন্য লাল, সাদা, সবুজ, কমলা, উজ্জ্বল রঙের শাড়ির আয়োজন রেখেছেন। আড়ং ঈদ ফ্যাশনে শাড়ির ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে কটন, জামদানি, হাফসিল্ক, সিল্ক, কাতান, মসলিন, নকশিকাঁথা, তাঁত, ব্রাক সিল্ক। রঙের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন ডিজাইনাররা। কটনের মধ্যে রয়েছে সাদা প্রিন্ট, সাদা প্রিন্ট ও টাইডাই, সাদা প্রিন্ট ও অ্যাম্ব্রয়ডারি, ব্লক প্রিন্ট। হাফসিল্ক জামদানির মধ্যে রয়েছে গ্রে কালার, আকাশী নীল, হলুদ, পিংক, গ্রিন, ডিপ ব্লু, লাইট গ্রিন, লাইট সায়ান কালার। প্রিন্টেড মসলিন শাড়ির মধ্যে রয়েছে অ্যাম্ব্রয়ডারি ওয়ার্ক। টাঙ্গাইল চোষা কাতানের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো কালার। সিল্ক শাড়ির মধ্যে রয়েছে নকশীকাঁথা অ্যাম্ব্রয়ডারি ওয়ার্ক। মীরপুর কাতান শাড়ির মধ্যে রয়েছে বাহারি সবরঙের সমাহার। ডিজাইন কালার আর কাপড়ের কোয়ালিটিতে রয়েছে আভিজাত্যের ছোঁয়া। জুয়েলারি কালেকশনে বরাবরই স্থান পেয়ে এসেছে গোল্ড, সিলভার, মেটাল, দেশীয় লোকজ প্রডাক্টের অর্নামেন্টস। অঙ্কনস্-এ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেলে সমসাময়িক ট্রেন্ড নিয়ে এবারের আয়োজনে থাকছে জামদানি, কাঁথা, কলকা, ফুলকারিসহ বিভিন্ন ধরনের জিওমেট্রিক ও ফ্লোরাল মোটিফ। আর পোশাকের প্যাটার্ন চলমান ট্রেন্ড অনুসরণ করেই করা হয়েছে। আয়োজনে মেয়েদের জন্য, শিশু-কিশোরদের জন্যও থাকছে শাড়ি।

দেশের অন্যতম ফ্যাশন ব্র্যান্ড কে ক্র্যাফট রঙ ও মোটিফের বৈচিত্র্য এবং ফেব্রিক ও স্টাইলিংয়ে সাজিয়েছে তাদের ঈদ সম্ভার। কে ক্র্যাফট ডিজাইনার গ্রুপ নানা ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তুলেছে সময়োপযোগী ও আধুনিকতার আদলে। ট্র্যাডিশনাল কাঁথা, কাঁথা স্টিচ, অরনামেন্টাল বিডস, মুঘল শৈলী, মুঘল সময়ের আর্ট, উইভিং মোটিফের অনুপ্রেরণা ছাড়াও গুজরাটি, ইক্কত, কলকা আর্ট, জামদানি, ফ্লোরাল, ট্র্যাডিশনাল, টার্কিশ আর্ট ও ইসলামিক মোটিফের ছোঁয়ায় বৈচিত্র্যময় কাপড় ও প্যাটার্নে সাজানো হয়েছে এবারের ঈদ আয়োজন। ফেব্রিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কটন, ডিজাইনড কটন, হ্যান্ড লুম কটন, টু-টোন, লিনেন, জর্জেট, ক্রেপ জর্জেট, সিল্ক, হাফসিল্ক, মসলিন, টিস্যু ও সাটিন। ব্ল্যাক, টেন গোল্ড, মেরুন, মেজেন্টা, ফিরোজা, কফি, পার্পল, ভায়োলেট, ল্যাভেন্ডার, চেরি রেড, অরেঞ্জ, হট ও কোরাল পিঙ্ক, অলিভ গ্রিন, ফরেস্ট গ্রিন, মিন্ট গ্রিন, ব্রোঞ্জ গ্রিন ছাড়াও বিভিন্ন নীল রঙ যেমন- রয়্যাল, নেভি, মেরিনো, ক্যাডেট, স্কাই-এর মতো নানা রঙের পোশাকে হাতের কাজ, অ্যাম্ব্রয়ডারি, স্ক্রিন ও ব্লকপ্রিন্ট, কারচুপি, মেটালিক এবং টাইডাই-এর মাধ্যমে অলংকরণ করা হয়েছে।
দেশী দশের প্রতিষ্ঠানগুলো ঈদ ফ্যাশনে যথেষ্ট নান্দনিক পোশাকের সম্ভার উপস্থাপন করেছে। শাড়িতে দেশীয় মোটিফের ডিজাইনে এনেছেন অফিস এবং ঘরে পরার উপযোগী করে। দেশীয় তৈরি শাড়ির পাশাপাশি বিদেশি তথা ভারতের বিভিন্ন এলাকার শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। সাধারণত বিয়ে ও যে কোনো উৎসবে বেনারসি শাড়ির জন্য ঢাকা তথা বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থান মিরপুর বেনারসি পল্লী। মিরপুর বেনারসি পল্লীতে বেনারসি, মাসলাইস কাতান, মিলেনিয়াম কাতান, জুট কাতান, কোটা কাতান, ব্রোকেট বেনারসি, কার্পেট বেনারসি, হানিকোট বেনারসি, রাজকোট বেনারসি, কোরা বেনারসি, জামদানি, বালুচুড়ি বেনারসি, শাটিন বেনারসি, মসলিন সিল্ক, ঢাকাই মসলিন এবং জর্জেট শাড়ি পাওয়া যায়। এ ছাড়া ঢাকা শহরে গড়ে উঠেছে শুধু শাড়ির ব্র্যান্ডের কিছু শোরুম। গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, উত্তরা, ওয়ারী এবং এলিফ্যান্ট রোডে নিজস্ব বা অভিজাত শপিং মলে এ সবব্র্যান্ডের শোরুম এবং চেইন শপ রয়েছে।
শাড়ির বাজার ঘুরলে চোখে পড়ে শাড়ির পাশাপাশি পরার ক্ষেত্রেও এসেছে নতুনত্ব। শাড়ির সঙ্গে স্টাইলিশ ব্লাউজ, ক্রপড টপ দেখা যাবে এবার ঈদে। এ যুগের তরুণীরা পছন্দ করছেন ক্রপট টপ, শার্ট, টপ এবং টি-শার্ট। এগুলো ট্রেন্ড সেটাররা পরছেন শাড়ির সঙ্গে। ট্র্যাডিশনাল ব্লাউজের বদলে এগুলো যেন একটু বেশিই আধুনিক করে তুলছে। সেই সঙ্গে বাড়িয়ে তুলেছে শাড়ির জলুস। তাই বলে যে ব্লাউজের কদর কমে গেছে তা নয়। চমৎকার শাড়ির সঠিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে চাই মানানসই ব্লাউজ। ফ্যাশন ধারায় শাড়ির সঙ্গে আগের থেকে কদর বেড়েছে ব্লাউজের। রং, কাটিং ও প্যাটার্নে মনোযোগ দিলে এক ব্লাউজ মানিয়ে যায় অনেক শাড়িতে। বিভিন্ন কাটছাঁটের ব্লাউজের ট্রেন্ড চলছে এখন। ডিপনেক, বোটনেক, ক্রপট ব্লাউজ, স্লিভলেস, চায়নিজ কলারের পাশাপাশি রয়েছে কোল্ড শোল্ডার। মখমলের ব্লাউজও আবার ফিরে এসেছে। কাতান


বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
ঈদ মোবারক
উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

ব্লাউজ তো আছেই। শাড়ির নকশায় এসেছে নানা ভ্যালুর অ্যাডিং। ব্লক প্রিন্টের ব্যবহার ফিরে এসেছে নবধারায়। শুধু সুতি নয়, মসলিন, সিল্ক, হাফসিল্কের পোশাকেও দেখা যাবে ব্লকের প্রিন্ট। গয়নায় মোটিফের ব্যবহার হবে লক্ষণীয়। সাজে বেসিক টোন মানে স্কিন টোনই রাখতে চাইবেন সবাই।

মহামারির দুঃসময় পেরিয়ে যখন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে জীবন সেই মুহূর্তগুলো বর্ণিল করতেই ঈদ আয়োজনের ধারায় ফিরল বুটিক হাউসগুলো। মহামারির অন্ধকার সময়কে বিদায় জানাতেই যেন পোশাকে রঙিন আর উজ্জ্বল রঙের দাপটের আয়োজন ডিজাইনারদের। নতুন বছরে ট্রেন্ডে থাকবে ঢিলেঢালা ফ্যাশন। উৎসবে আবারও ফিরেছে সত্তর বা আশির দশকের চুমকি। দাপটের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে চুমকি। বাংলাদেশের ফ্যাশনে স্থান করে নিয়েছে লোকশিল্প থেকে অনুপ্রাণিত বাণী, চিত্র বা ছাপ। জিনস, টপস, শার্ট, টিশার্ট, ক্রপ টপ, মিদি ড্রেস সবখানেই এসেছে ওভারসাইজের প্রতি আগ্রহ। মানুষ এখন স্বস্তিদায়ক পোশাকে ফ্যাশন করতে আগ্রহী। প্রিন্টে ফুলেল নকশা আর অ্যানিমাল প্রিন্ট দুটোই আছে ট্রেন্ডে। এই যেমন ডেনিমের জ্যাকেটের একটা পাশে চলছে কাঁথাফোঁড়।

দেশীয় লিডিং বুটিক হাউস আড়ং-এর সালোয়ার-কামিজের মধ্যে রয়েছে কটন, ভিসকোস কটন, হ্যান্ডলোম কটন, ভয়েল, কটন রেয়ন, এন্ডি সিল্ক, সিল্ক। সবক্যাটাগরিতেই রয়েছে প্রিন্টেড ও অ্যাম্ব্রয়ডারি ওয়ার্ক করা। আড়ং-এর টাগা তরুণীদের এক বিশেষ আকর্ষণ। কটন, লিনেন, সিল্ক, নেট ফেব্রিকের মধ্যে রয়েছে লাইট ও ডিপ কালার আর ঢিলেঢালা গরমে পরার মতো আরামদায়ক সব ডিজাইন। ক্যাজুয়াল, সেমিড্রেসি, এক্সক্লুসিভ সালোয়ার কামিজ, কুর্তি ছাড়াও মেয়েদের জন্য কটন পাঞ্জাবির রয়েছে বিশাল সমাহার। কাফতান গত কয়েক বছর আলোচনায় ছিল। আর ম্যাক্সি তো একটু বয়সি নারীরা পরতেন। এই দুই পোশাক এবার হাজির হয়েছে পার্টি বা কোনো দাওয়াতে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের হট ফ্যাশন ট্রেন্ড স্কার্ফ ফিরে এসেছে প্রবল প্রতাপে। রেশমি স্কার্ফের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে মানুষ। প্রিন্ট প্যাটার্নে ব্লক লেটার, ফুল ও হিজিবিজি মোটিফের চাহিদাও উল্লেখযোগ্য। বোল্ড রং, যেমন টকটকে লাল স্কার্ফের প্রতিও আগ্রহী ফ্যাশন-সচেতনেরা। স্টাইলিংয়ের ক্ষেত্রে থুতনির নিচে অথবা মাথার পেছনে স্কার্ফ দিয়ে নট বাঁধা। ব্যাগের হাতলেও স্কার্ফের দেখা মিলেছে। নানা ডিজাইনের গাউনও রয়েছে তরুণীদের পছন্দের তালিকায়। এ ছাড়া রয়েছে কোয়ালিটি দোপাট্টা। কটনের মধ্যে আছে প্রিন্ট ও অ্যাম্ব্রয়ডারি করা ফ্যাশনেবল নাইটওয়্যার। পোশাকের সাথে ব্যাগটিও হওয়া চাই ফ্যাশনেবল। আর পোশাকের সাথে ম্যাচিং করে নেওয়ার মতো দেশীয় প্রডাক্ট যেমন কটন ও সিল্ক ফেব্রিক, কাতান, জামদানি, ভেলভেট, জুট ও লেদারের তৈরি ফ্যাশনেবল সবহ্যান্ড ব্যাগ, পার্স। ইয়েলোতে গর্জিয়াস কালেকশনই বেশি। আনারকলি উইথ পাতিআলা সালোয়ার, গর্জিয়াস গাউন কালেকশন, পালাজ্জো স্যুট কালেকশন, বেনারসি সিল্ক শাড়ি, কটন স্ট্রেইটকার্ট ট্রাউজার, নেট অ্যাম্ব্রয়ডারি লেহেঙ্গা, জর্জেট স্ট্রেইটকার্ট ট্রাউজার, এছাড়া রয়েছে গর্জিয়াস ওয়েডিং শাড়ি, লেহেঙ্গা। ঈদের জন্য পারফেক্ট ড্রেসের সমাহার রয়েছে এক্সট্যাসিতে। বাহারি লোনের কালেকশন রয়েছে এক্সট্যাসিতে। লোন কালেকশনের মধ্যে আবায়ান লাক্সারি লোন কালেকশন, আদানস লিবাস ট্রপিকাল লোন, আদানস লিবাস ইউজিন লোন, আফরোজে লোন কালেকশন, আলকারাম ঈদ কালেকশন, আনায়া লাক্সারি লোন, আলকারাম ম্যাকস ছাড়া লোন কালেকশনের আরও বিশাল সমাহার। কোয়ালিটি লোন ফেব্রিকের মধ্যে রয়েছে নানা রঙের বিভিন্ন ডিজাইনের থ্রিপিস। আকর্ষণীয় চমকপ্রদ আরামদায়ক উৎসবের কালেকশন রয়েছে এক্সট্যাসিতে। দেশীয় বড় বুটিক শপ অঞ্জনস্-এ রয়েছে সালোয়ার-কামিজ-ওড়না, কুর্তি, কাফতান, টপস, লং টপস, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, স্কার্ফ, প্যান্ট, ব্যাগ, পার্স। টিন এজারদের জন্য রয়েছে চমৎকার কালার আর ডিজাইনের টপস, ফতুয়া। অঞ্জনস-এ পাঞ্জাবি. শাড়ি. থ্রিপিস, ফতুয়া, টপসে ব্লু কালারের চমৎকার কালেকশন রয়েছে। অঞ্জনসের জুয়েলারি কালেকশনে বরাবরই স্থান পেয়ে এসেছে সিলভার, মেটাল, দেশীয় লোকজ প্রডাক্টের অর্নামেন্টস। ঈদে আরও নতুনত্ব আনা হয়েছে। ফ্যাশন ডিজাইনারদের মতে, 'উৎসবেসবাই একটু পার্টি মেজাজে থাকতে পছন্দ করেন। এ জন্য জরি, চুমকি ও পাথরের কাজ করা ভারী ডিজাইনের পোশাকের প্রতি ঝুঁকছেন তরুণীরা। লেয়ারের পোশাকের প্রতি ছেলেমেয়েদের আগ্রহ শুরু থেকেই। কয়েক স্তরের এমন পোশাক শীতে বেশি জনপ্রিয়। আবার গরমের সময় পরার জন্য লেয়ার দিয়েই আলাদা নকশা করা হয়েছে মেয়েদের পোশাকে। পোশাকের পাড়ের কাজেও রয়েছে বৈচিত্র্য। শর্ট



২৩ এপ্রিল ২০২২

প্রতিষ্ঠার ৩৮ বছরে

ন্যাশনাল লাইফ

গৌরবের এই দিনে সম্মানিত বীমা গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার, শুভানুধ্যায়ী ও দেশবাসীকে জানাই

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

১৯৮৫-২০২১ পর্যন্ত অর্জন

সর্বমোট বিক্রিত বীমা পলিসি	৫৭ লক্ষাধিক
সর্বমোট প্রিমিয়াম আয়	১৩,৩৬২ কোটি টাকা
লাইফ ফান্ড	৪,৪২২ কোটি টাকা
বিনিয়োগ	৪,৭৩৬ কোটি টাকা
সম্পদ	৫,২৮৭ কোটি টাকা
সর্বমোট দাবী প্রদান	৭,৫৮৯ কোটি টাকা

ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

নিশ্চিত ভবিষ্যতের সুহৃদ সাথী

কামিজের চেয়ে লং কামিজ, কুর্তার দিকে ঝোঁক এবার বেশি।

পাঞ্জাবিবাঙালির ঐতিহ্যবাহী পোশাক হিসেবেই বাংলাদেশে দারুণভাবেসুপরিচিত ও সমাদৃত। বাঙালির ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত এই বিশেষ পোশাকটি অবশ্য এ দেশের প্রেক্ষাপটে একটি ঐতিহাসিক পোশাক হিসেবেও বিবেচিত। যার কারণে বাঙালির প্রত্যেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবগুলোয় পাঞ্জাবিহয়ে ওঠে ছেলেদের প্রথম পছন্দ। তবে ছোট-বড় বিভিন্ন উৎসবছাড়াও বিয়ে-শাদি অথবা জন্মদিনের মতো অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবিও শেরওয়ানির চাহিদা আমাদের দেশে রীতিমতো ঈর্ষণীয়। পাঞ্জাবি ছাড়া ঈদের কথা ছেলেরা ভাবতেই পারে না। বরাবরের মতোই নতুন কাট ও নকশার পাঞ্জাবিনিয়ে এসেছে ফ্যাশন হাউসগুলো। অনেকেই শুধু ঈদের নামাজ নয়, প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজেও নিয়মিত পাঞ্জাবি পরেন। যাদের প্রিয় পোশাক পাঞ্জাবিতারা ঈদ, শুক্রবার এবং পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবিপরতে পছন্দ করেন। তরুণদের মধ্যে পাঞ্জাবিপরার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। আগে বিভিন্ন উপলক্ষে পাঞ্জাবি বেশি পরতে দেখা গেলেও এখন তরুণরা সে সবহিসাবকরে না। যখন-তখন পাঞ্জাবিপরে চলাফেরা করছে। ঈদ উপলক্ষে জমকালো পোশাকই সবার পছন্দ। এ সবচাওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে কাটিং-এর সঙ্গে কাপড়, কাপড়ের বুনন, নকশা আর থিমেও এসেছে ভিন্নতা। নরমাল কাটের পাঞ্জাবির পাশাপাশি কাবুলি কাট, শেরওয়ানি কাটের পাঞ্জাবি তরুণদের পছন্দে এগিয়ে রয়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে আরামদায়ক ফেব্রিকস। দেশি ফেব্রিকসের সঙ্গে ভারতীয়, ইন্দোনেশিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশের ফেব্রিকস যুক্ত হয়েছে। তাই শুধু ফ্যাশন নয় আরামের দিকটিও নিশ্চিত করা হয়েছে। ফ্যাশন বদলের ধারায় কাবুলি কাট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কাবুলির সঙ্গে ম্যাচিং পাজামাও রয়েছে মার্কেটে। সলিড কালারের কাবুলির প্রতি তরুণদের আকর্ষণ বেশি। ঈদের দিন বিকেলে ঘোরাঘুরিতে অভিজাত ভাব আনতে এসবপাঞ্জাবির সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে নতুন নকশার কটি। পাঞ্জাবির হাতা ও গলার কাজের সঙ্গে ম্যাচিং করে কটির নকশা করা হয়েছে। তরুণদের পছন্দের চাহিদা অনুযায়ী পাঞ্জাবিতে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার বেড়েছে। কে ক্র্যাফটের পাঞ্জাবিতে মোগল, ইসলামিক মোটিফ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আড়ং-এ রয়েছে পাঞ্জাবির বিশাল সমাহার। এবার ঈদে স্লিম ফিট পাঞ্জাবিই প্রাধান্য পেয়েছে। কটন, সিল্ক, এন্ডি সিল্ক, জামদানি, হ্যান্ডলুম, টাইডাই, প্রিন্টেড ও অ্যাম্ব্রয়ডারি সবধরনের পাঞ্জাবিই রয়েছে। পাজামার মধ্যে আছে হোয়াইট কটন ও এন্ডি কটনের এলিগরি, ফিটেড, চুরিদার আর সালোয়ার পাজামা। পাঞ্জাবির সাথে খাকি কটন, ভিসকস কটন, রেয়ন কটনের মধ্যে আছে প্রিন্টেড ও অ্যাম্ব্রয়ডারি করা কটি। এ ছাড়া রয়েছে স্লিম ফিট শর্ট কোর্তা। আরামের বিষয়টি মাথায় রেখে শার্টের মধ্যে রয়েছে কটন ও মিক্স কটনের সলিড কালার, প্রিন্টেড, চেক, টাইডাই, স্ট্রাইপ, ওয়েক্স ডাই এক্সিকিউটিভ ও ফিটেড হাফশার্ট, ফুলশার্ট। কটন, সিল্ক, এন্ডি সিল্কের সলিড কালার, প্রিন্ট ও অ্যাম্ব্রয়ডারি ফতুয়া ও ঈদ ফ্যাশনে রয়েছে। ছেলেদের টাগায়ও রয়েছে কোয়ালিটি ফেব্রিক, মানানসই ডিজাইন আর রুচিশীল রঙের বাহার। বাঙালির পোশাকে লুঙ্গি তো থাকতেই হয়। লুঙ্গির মধ্যে কটন চেক, স্ট্রাইপ, চেক-স্ট্রাইপ বরাবরের মতোই প্রাধান্য পেয়েছে। এই গরমে আরামদায়ক পোশাকের মধ্যে টি-শার্টের তুলনাই হয় না। কটন প্রিন্টেড,



অ্যাম্ব্রয়ডারি, হ্যান্ডপেইন্টের টি-শার্টও রয়েছে ঈদ ফ্যাশনে। কালারের মধ্যে বয়স বিবেচনায় লাইট ডিপ সবধরনের কালারই প্রাধান্য পেয়েছে। পাঞ্জাবিপাজামার সাথে টুপি তো লাগবেই। টুপির মধ্যেও প্রাধান্য পেয়েছে কটন টুপি। সলিড কালার আর নানা রঙের মধ্যে অ্যাম্ব্রয়ডারি করা ও কুশিকাটা কাজের টুপিই বাঙালির ফ্যাশনে স্থান করে রেখেছে। আর ফ্যাশনেবল স্যান্ডেল না হলে তো চলেই না। লেদারের বিভিন্ন কোয়ালিটির স্যান্ডেল ছাড়াও রয়েছে নাগ্রা। ফ্যাশনেবল তরুণরা পছন্দের পোশাকের সাথে ম্যাচিং করে কিনে নিতে চায় মানানসই ওয়ালেট আর বেল্ট।

ঈদ ফ্যাশনে শিশুদের জন্যও রয়েছে নানা ডিজাইন আর আরামদায়ক ফেব্রিকের আকর্ষণীয় পোশাক। ছেলে শিশুদের জন্য রয়েছে পাঞ্জাবি, পাজামা, ফতুয়া, লুঙ্গি, নিমা, শার্ট, শার্ট প্যান্ট সেট, কটি, থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট, ডেনিম শর্টস, টি-শার্ট, স্যান্ডেল, বেল্ট, টুপি, মাস্ক। কন্যা শিশুদের জন্য আছে ফ্রক, ঘাগরা, চোলি সেট, স্কার্ট টপস সেট, লেহেঙ্গা, থ্রিপিস, টপস, সালোয়ার কামিজ। বুটিক শপগুলোতে রয়েছে সেইম কালারের ফ্যামিলি ড্রেস কালেকশন। দেশের ব্র্যান্ড শপ এবং ফ্যাশন হাউসগুলো শিশুদের পোশাকে প্রতিবছরই আনছে নিত্যনতুন ডিজাইন। ফেব্রিকের পাশাপাশি সমানভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে ডিজাইনও। অঞ্জনস, আড়ং, সাদাকালো, নগরদোলা, রঙ বাংলাদেশ, দেশালসহ প্রায় সবফ্যাশন হাউস নিজস্ব ডিজাইনের পোশাক তৈরি করেছে ঈদকে সামনে রেখে। এসব হাউস ঘুরে দেখা যায়, বড়দের মতো ছোটদের পোশাকেও রঙে রঙিন হয়ে আছে। ফতুয়া, পাঞ্জাবি, টুপি, ফ্রকসহ সবধরনের পোশাকই রয়েছে। দেশীয় ঢঙে তৈরি এ সব পোশাক বেশ আরামদায়ক। শিশুদের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি পোশাকের রং ও থিম নির্ধারণ করা হয়। পোশাকগুলোতে রয়েছে ব্লক, টাইডাই, অ্যাম্ব্রয়ডারি ও মিক্স ফিউশনধর্মী কাজ। আর আরামের কথা ভেবেসুতি, সিল্ক ও ধূপিয়ান কাপড়ের ব্যবহার হয়েছে। এ ছাড়া পাঞ্জাবি, ফতুয়া থ্রিপিসসহ সবধরনের পোশাকে থাকছে দেশীয় ঐতিহ্যের ছোঁয়া। নিউবর্ন বেবীদের জন্যও রয়েছে আরামদায়ক পোশাক। পশ্চিমা পোশাকের আদলে শিশুদের নতুন জামা নিয়ে এসেছে লা রিভ, সেইলর, ইয়েলো, টেক্সমার্ট, সারাসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। এসবপোশাকে ওভেন ফেব্রিকস, স্ট্রাইপ ফেব্রিকস, সুতি, ডেনিম কাপড়ের চল বেশি। প্রতিটি পোশাকের ডিজাইনে দেখা যাবেবৈচিত্র্য। নীল, সবুজ, সাদা ও হলুদ রং বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। বড় ও ছোট দুই ধরনের হাতাই ব্যবহার করা হয়েছে ছেলেদের কটন শার্টগুলোয়। আর মেয়ে শিশুদের জন্য এনেছে ফ্রিল দেওয়া পার্টি ফ্রক, হাতের জমকালো কাজ করা সালোয়ার-কামিজ, ঘাগরা চোলি। সালোয়ার ও প্যান্টের কাজে নকশা এবং কাটে দেখা গেছে বৈচিত্র্য। ছেলেশিশুদের পাঞ্জাবিতে কাপড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এন্ডি, সিল্ক, মসলিন ও খাদি। উৎসবের আমেজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন রকম হাতের কাজ দিয়ে। পোশাকে ভিন্নতা আনতে মেয়েদের পোশাকে ব্যবহার করা হয়েছে বেল্ট। শূন্য থেকে ১২ বছর বয়সি শিশুদের সবধরনের পোশাকই থাকছে। করোনা পরবর্তী ঈদে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য রয়েছে বিভিন্ন কোয়ালিটির মাস্ক। থ্রি লেয়ার কটন মাস্ক, কটন সিল্ক, সাটিনের উপর পুঁতির কাজ করা, স্টোন ওয়ার্ক করা ও অ্যাম্ব্রয়ডারি করা নানারকমের মাস্ক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।


বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
জাতীয় পার্টি জিন্দাবাদ
Ramadan
kareem
কুমিল্লা ৮ বরুড়া আসনের
সর্বস্তরের জনগণকে জানাই
পবিত্র ঈদ উল ফিতরের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
ডক্টর ইরফান বিন তোরাব আলী
সভাপতি, জাতীয় ওলামা পার্টি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।
সভাপতি, জাতীয় পার্টি, বরুড়া উপজেলা, কুমিল্লা।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

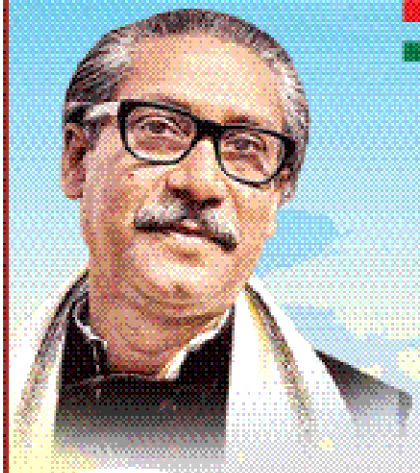



ঈদ মুবারক

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই প্রাণঢালা

শুভেচ্ছা



সম্মানিত পৌরবাসীর প্রতি আহবান

- নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন এবং অন্যকে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করুন।
- আজ পলিথিন ব্যবহার করুন ও পরিবেশ নিরাপদ রাখুন।
- যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলুন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
- অবৈধ পৌষ্টির, নিরাপদ বেড় স্থাপন ও নেয়োন লিখা থেকে বিরত থাকুন, শহরের সৌন্দর্য বজায় রাখুন।
- খালেরেখা করবাদিন ও কার্টিজ নিশানো থেকে বিরত থাকুন, জেরেজ খাল বর্জন করুন।
- নিরাপদ পানি পান করুন, পরিত্র অপচয় রোধ করুন এবং নিয়মিত পানির বিল পরিশোধ করুন।
- পার্শ্ববর্তী জন্ম নিবন্ধন আপনার নাগরিক অধিকার, এই অধিকার নিশ্চিতকরে যথাসময়ে জন্ম নিবন্ধন করুন।
- রেজিষ্ট্রার যথাসময়ে মৃত ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করুন।
- পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন ধরনের নির্মাণ কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- ফুটপাতে দোকান বসানো থেকে বিরত থাকুন, যানজটমুক্ত শহর রাখুন।
- বেশী করে গাছ লাগান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করুন।
- ট্রেড লাইসেন্সসহ যাবতীয় লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়ন করে পৌর উন্নয়নে সহায়তা করুন।
- ঘরের দুয়ার বিকল নহি, অপনার শিশুকে স্কুলের দুয়ে পাঠান।
- যানবাহনে না বসুন, যানবাহন সমান শহে তুলুন। ■ বিদ্যুতের অপচয় রোধ করুন।
- যৌতুক এবং বাল বিবাহ রোধ করুন। ■ অপনার ছেলে মেয়েকে স্কুল/মাদ্রাসায় পাঠান।
- পারিবারিক সুরক্ষা বজায় রাখুন। ■ আজ অনিলকর কর্তৃক রাদর সমাধানযোগ্য অবশ্যই মেনে চলুন।
- পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে আসুন।

শহিদ উল্যাহ খাঁন
মেয়র, নোয়াখালী পৌরসভা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা ● জয় বঙ্গবন্ধু



পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী
এবং
রূপগঞ্জ ইউনিয়নের
সকলকে জানাই



ঈদ মোবারক



মুশফিকুর রহমান (রিপন)
সভাপতি, রূপগঞ্জ ইউনিয়ন যুবলীগ
আহ্বায়ক, দলিল লেখক ও স্ট্যাম্পভেন্ডার কল্যাণ সমিতি
রূপগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ



রূপচর্চা



ঈদে রূপচর্চা

তাসমিন আহমেদ

উৎসবমানেই হাজারটা কাজের ফাঁকে নিজেকে সুন্দর, পরিপাটি করে সাজিয়ে তোলার একটা উপলক্ষ। বিভিন্ন ধরনের কাজ তো করতে হবে, তাই বলে কি বাদ যাবে সাজগোজ? মোটেই না। বরং ঈদের কিছুদিন আগে থেকেই শুরু করে দিন প্রস্তুতি। গনগনে গ্রীষ্মের তপ্ত সময়ে ত্বক মলিন, নিষ্প্রাণ হওয়াসহ শুষ্ক হয়ে পড়ে। ত্বকের মলিনতা, ডার্কসার্কলস ব্রণ, র‍্যাশ নানান সমস্যায় পড়তে হয়। আর এই সমস্যার সমাধান ঈদের আগেই করে নিন। তাই শুধু মেকআপ নয় প্রয়োজন বিশেষ যত্নেরও। জেনে নেওয়া যাক রূপসজ্জার ও নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপনের কিছু উপায়।

ত্বকের যত্নের মূল কথা হলো ত্বক পরিষ্কার রাখা। বিশেষ করে মুখত্বক। কারণ শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় মুখের ত্বক বেশ কোমল ও স্পর্শকাতর হয়। তাছাড়া যারা বেশ কিছুটা সময় চুলার আঁচে কাটান তাদের ত্বক কোনো না কোনো ক্ষতির কবলে পড়ে। এছাড়া ঘাম, দূষণ, ধুলোবালিতে ত্বক ময়লা হয়ে নানা সমস্যায় পড়ে। এমন ত্বকে মেকআপ প্রয়োগ করলে বা সাজলে ভালো দেখায় না। তাই ত্বক পরিষ্কার রাখতে ব্যবহার করুন ভালো ব্র্যান্ডের ফেসওয়াশ ও ক্লিনজিং। মাঝে মাঝে মৃত ত্বক ও লোমকূপের গোড়ায় জমে থাকা ময়লা দূর করতে প্রয়োজন হয় স্ক্রাব। এটি ব্ল্যাক হেড দূর করতেও সমান কার্যকর। স্ক্রাবনিয়ে আলতো করে মুখে ম্যাসাজ করে নিন। এটি এক্সফোলিয়েশনেরও কাজ করবে। সপ্তাহে দুইদিন এটি করে নিতে পারেন। তবেব্রণ থাকলে স্ক্রাব এড়িয়ে যান।

চেহারার মলিনতা দূর করতে বেশ কার্যকর উপায় হচ্ছে এক্সফোলিয়েশন। খেয়াল রাখতে হবে কাজটি করতে গিয়ে ত্বকে যেন কোনো চাপ না লাগে। আলতো ম্যাসাজ করে নিন। এতে ভালো কাজ দেবে। মুখ ত্বকের হাইড্রেশন এই গরমে খুবজরুরি। তাই প্রচুর পানি পান করুন।

চেহারার ক্লান্তি দূর করার বেশ ভালো উপায় হতে পারে অ্যালোভেরা। ত্বক প্রশান্ত করার জন্য এর থেকে ভালো দাওয়াই আর হতে পারে না। অ্যালোভেরা জেলের একটি পাতলা আবরণ সকালেই পুরো মুখে লাগিয়ে নিন। শুধু ত্বকের শুষ্কভাব কাটিয়ে সতেজই করে তোলে না, চোখের নিচের ফোলা কমাতেও এটি সহায়ক। ডার্ক সার্কেল হলে পুরো চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাঢ় বা কালো হয়ে থাকা জায়গায় সানস্ক্রিন সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার লাগাতে পারেন। এটি ত্বকে উজ্জ্বলতা তৈরি করে এমন দীপ্তি ছড়ায় যে আপনার ইলুমিনেটরেরও দরকার হবেনা। শুধু আলতো করে এটি চোখের কালো অংশে লাগিয়ে নিন।

আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু



পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের মহিমা
সকলের জীবনের ফিরিয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ

ঈদ মোবারক



ফাহিম রহমান খান রনি

সদস্য, মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ
নগদ ডিস্ট্রিবিউটর, মানিকগঞ্জ জেলা

ত্বকে চটজলদি জেল্লা আনতে জুড়ি নেই পাকা পেঁপের। এর সঙ্গে টকদই মিশিয়ে ত্বকে লাগিয়ে বিশ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলুন। এটি নির্জীব ত্বকে প্রাণ ফিরিয়ে আনতেও বেশ কার্যকর।

ক্লান্তির ভাব দূর করে ত্বকে সতেজতা ফিরিয়ে আনতে ও ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ফেসিয়াল জরুরি হয়ে পড়ে। ঈদের দিনটিতে খুব বেশি মেকআপের ঝক্কি না নিতে চাইলে ফেসিয়ালের বিকল্প নেই। ডিপ ক্লিনজিং ফেসিয়াল, কোলাজেন, ভেজিটেবল, ফ্রুটি, হার্বাল, অ্যালোভেরা ফেসিয়াল ত্বকের অবস্থা বুঝে ঈদের সপ্তাহ খানেক আগেই কাজটি সেরে নিন। এছাড়া কিছু ঘরোয়া প্যাকও ভালো কাজ দেবে।

গরমে অনেক সময় শ্যাম্পু করার পরও দেখা যায় ঘামের কারণে চুল স্যাঁতসেঁতে বা তেলতেলে হয়ে আছে। শ্যাম্পু করার আধঘণ্টা আগে মাথার ত্বকে ভিনেগার হালকা করে ম্যাসাজ করে নিন। এতে ত্বকে তৈলাক্ত ভাবকমে যাবে, চুলও ঝরঝরে হবে। চুলে গ্লেজ আনতে চাইলে ব্যবহার করুন গ্ল্যাজ মাস্ক। চুলের কোনো ট্রিটমেন্ট করাতে চাইলে তা ঈদের দুদিন আগে করিয়ে নেওয়া ভালো। আর চুল কাটিং ও সেটিং করিয়ে নিতে হবে অন্তত এক সপ্তাহ আগে।

বেশিরভাগ মেয়েই সকালের সাজে শাড়ি বেছে নেন। আবার বিকেলে বা সন্ধ্যার আড্ডা বা পারিবারিক দাওয়াতে টপস বা সালোয়ার-কামিজেই স্বাচ্ছন্দ্য থাকেন। তবে ঘরে বা বাইরে ঢিলেঢালা ও আরামদায়ক পোশাকই বেছে নেওয়া ভালো। সিনথেটিক বা মোটা কাপড়ের বদলে পাতলা ও সুতি, লিনেনের মতো আরামদায়ক কাপড়ের পোশাক দেবে স্বস্তি।

ঈদের মতো উৎসবে সবাই চান নিজেকে একটু আলাদা ও ট্রেন্ডি লুকে সাজিয়ে নিতে। প্রতি বছরই থাকে ব্যতিক্রম হয়ে ওঠার চেষ্টা। নতুন হালের মেকআপ, হেয়ার স্টাইলের বৈচিত্র্যে উৎসবের সাজ পায় ভিন্নতা। তার প্রস্তুতিও চলে তাই কিছুটা আগে থেকেই। এবারো তার ব্যতিক্রম নয়। তবে বিপত্তি হলো গরম নিয়ে। সাজ ঠিকঠাক থাকবে তো? কেমন সাজে নিজেকে সাজাবেন সেই চিন্তাতো আছেই। নিজস্ব সংস্কৃতি, বা আটপৌরে আর ট্রেন্ডি- এই দুটি বিষয় নিজের মতো করে মিলমিশ করে নেয়াটাই এখন চল। যেমন শাড়ির সঙ্গে ট্রেন্ডি লুক আর হাল ফ্যাশনের কোনো পোশাকের সঙ্গে ক্লাসিক লুক দেওয়া যায় অনায়াসেই। প্রয়োজন শুধু গরমবান্ধব মেকআপ পণ্য।









একটু টানা কাজল, ছোট্ট টিপ, হালকা মেকআপ আর কয়েক গোছা চুড়ি। ব্যাস এটুকু সাজই যে কোনো শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে যায়। ঘেমে যাতে সাজ নষ্ট না হয় তার জন্য প্রয়োজন হয় ওয়াটার প্রুফ কিংবা দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ উপকরণের। প্রথমেই বেইজ। মুখ-ত্বক পরিষ্কার করে টোনার লাগিয়ে নিন। এবার আপনার ত্বকের ধরন বুঝে ত্বক ময়শ্চার করে নিন। এটি ত্বকে বসে যেতে মিনিট পাঁচেক সময় দিন। যেহেতু গরম তাই বেইজ খুব পুরু হবে না। প্রাইমারের ব্যবহার আপনাকে সাহায্য করবে ঠিকঠাক ফেস ক্যানভাস পেতে। এটি ত্বককে দীপ্তিময় করে তোলে। ত্বকের রঙের সঙ্গে মানানসই রঙের লিকুইড ফাউন্ডেশন লাগিয়ে তারপর কনসিলার দিন। দুটিই ম্যাট হবে। এটি অসাধারণ একটি বেইজ হাইলাইটার ও স্কিন টোন চমৎকারভাবে উজ্জ্বল করে তোলার উপায়। কনসিলার ডার্ক সার্কেল ঢেকে দিতে সাহায্য করবে। ত্বক তৈলাক্ত হলে আগে কিছুটা লুজ পাউডার লাগিয়ে নিতে পারেন। এতে মেকআপের স্থায়িত্বও বাড়বে। হালকা বেইজে দিনের বেলায়ও একটুখানি শিমারি পাউডার বুলিয়ে নিলে বেশ প্রাণবন্ত দেখাবে।

এবার চোখের সাজ। শেপ অনুযায়ী চোখের সাজটা দিতে হবে। আইব্রো এঁকে নিন প্রথমে। ঘন হলে আইব্রো না আঁকলেও চলে বা হালকা করে এঁকে নিতে হবে। চোখে দিন গাঢ় করে ওয়াটারপ্রুফ কাজল। চাইলে আইশ্যাডোর হালকা প্রলেপ ও সরু করে লাইনার ও কাজল লাগিয়ে নিতে পারেন। শ্যাডোর রঙ পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে বা মানানসই কোনো রঙ বেছে নিতে পারেন। অথবা লাগিয়ে নিতে পারেন ট্রেন্ডি কোনো কালার। অবশ্যই পোশাকের রঙের বিষয়টা মাথায় রেখে। এখন শিমারিং বা ম্যাট শ্যাডো দুটিই সমান তালে চলছে। ব্রাইট বা ন্যাচারাল যে টোনই হোক না, যে কোনো রঙকেই এটি প্রমিনেন্ট করে তোলে। এক্ষেত্রে গোল্ডেন শ্যাডোই জুতসই হবে। কারণ গাঢ় বা হালকা প্রায় সব রঙের সঙ্গেই এটি মানিয়ে যায় সহজে। সঙ্গে কাজল আর মাসকারা। গালে হালকা ব্রাউন বা পিঙ্ক ব্লাশঅন চিক ও থুতনিতে লাগিয়ে নিন। রোমান্টিক আবেদন তৈরি করতে পারেন ডাস্টি রোজ ব্লাশ প্রয়োগে। বাইরে যেতে এর শেড একটু গাঢ় করে নিন। কেননা তখন অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। আর এ কারণে ব্লাশঅন কিছুটা মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেছে নিন ম্যাট লিপস্টিক। পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে বা মানানসই কোনো রঙের। তবে লাল লিপস্টিক সব ধরনের সাজকেই দৃষ্টিনন্দন করে তোলে। আর ওয়াইন রেড হলে তো কথাই নেই।

ঈদের পরদিন সাধারণত পারিবারিক গেট টুগেদার থাকে। অনেকদিন বাদে আপনজনদের সঙ্গে দেখা। তাই সাজটাও থাকে একটু বেশি বেশি। বেইজের পুরুত্ব খানিকটা বাড়িয়ে দিন। চোখে পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে শ্যাডো লাগিয়ে নিন। ব্রাশের সাহায্যে শ্যাডো ভালো করে ব্লান্ড করে নিন যাতে চোখের পাতার কোনো অংশে কম বা বেশি মনে না হয়। চোখের উপরের পাতায় ও নিচে কাজল বা লাইনার লাগিয়ে নিন। আর কালারফুল শ্যাডোর বদলে কাজলকালো চোখ চাইলে ওপরের ও নিচের পাতায় কালো শ্যাডো মোটা করে লাইনার লাগানোর মতো করে লাগিয়ে নিন। এরপর ভেতরের অংশে গাঢ় করে কাজল লাগিয়ে নিন। কিংবা করে নিতে পারেন ডার্ক আই মেকআপ। সবশেষে মাসকারা। এই ডার্ক আই মেকআপ শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ যে কোনো পোশাকের সঙ্গেই মানিয়ে যাবে।

এবার লিপস্টিক। এক্ষেত্রে ডিপ ব্রাউন, মেরুন, মেজেন্টা কিংবা পোশাকের রঙের সঙ্গে মানানসই কোনো রঙের প্রগাঢ় শেড আপনার সাজে এনে দেবে উৎসবের আমেজ। তবে লিপস্টিক ক্রিমি বা গ্লসি না হওয়াই ভালো।

টিনদের সাজপোশাক অন্যান্য বয়সিদের থেকে খানিকটা আলাদা হয়। বয়সটাই প্রাণচঞ্চল। লুকে থাকে কোমল একটা ভাব। তাই মেকআপের বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। শুধু তৈলাক্তভাব এড়াতে এক্কেবারে লাইট বেইজ মেকআপই যথেষ্ট। ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে সামান্য ময়শ্চারাইজার ও টোনার লাগিয়ে নিলে সাজ অনেকক্ষণ সতেজ ও সুন্দর থাকবে। ফাউন্ডেশন বাছাই করতে হবে স্কিন টোনের সঙ্গে মিলিয়ে। হালকা লিকুইড বেইজ ফাউন্ডেশন লাগিয়ে তার ওপর কনসিলার বা ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার লাগাতে হবে। শুষ্ক ত্বকের জন্য ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার এবং তৈলাক্ত ত্বকে কমপ্যাক্ট পাউডার ভালো। চোখে শ্যাডোর বদলে কালারফুল লাইনারের প্রগাঢ় রেখা বয়সের সঙ্গে মানিয়ে যাবে বেশ। একটু বৈচিত্র্য চাইলে প্রথমে কালো আইলাইনার দিয়ে লাইন টেনে তার ওপর পোশাকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে এক বা দুটি রঙিন পেনসিলের টান বেশ সুন্দর একটা লুক নিয়ে আসবে চোখে। চোখের এই সাজের সঙ্গে ঠোঁটে পিংক, কোরাল, পিচ এমন রংগুলো মানিয়ে যাবে।

লাল লিপস্টিক বা বোল্ড লিপ চাইলে চোখের রঙে একটু মিতব্যয়ী হতে হবে। সে ক্ষেত্রে চোখে যে কোনো একরঙা শিমারি শ্যাডো চলতে পারে। আর লুকে বাড়তি সতেজতা আনতে চাইলে হালকা একটু ব্লাশঅনেই কাজ হয়ে যাবে। গরম যেহেতু চরম পড়ছে তাই চুল বেঁধে রাখাই ভালো। বেণির বিভিন্ন রকমের বান বা পনিটেল বেশ স্বস্তিকর। খানিকটা উঁচু করে খোঁপাও বেঁধে নিতে পারেন। বিভিন্ন ফুলেল বা স্টোনের অ্যাকসেসরিজ দেবে উৎসবের পূর্ণতা। নজর রাখুন সাজ আর পোশাকের সামঞ্জস্য যেন ঠিক থাকে। সাজসজ্জা যেন কোনোভাবে আপনার অভিরুচি ও ব্যক্তিত্বে বিরূপ প্রভাব না ফেলে। আর অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনেই উৎসব পালন করুন। আনন্দ যেন কষ্টকর অভিজ্ঞতায় পরিণত না হয়।

আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু



পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের মহিমা
সকলের জীবনের ফিরিয়ে আনুক সুখ ও সমৃদ্ধি

ঈদ মোবারক



মোঃ জাহিদুল ইসলাম

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
মানিকগঞ্জ জেলা বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, অটোটেম্পু ওনার্স গ্রুপ
সাধারণ সম্পাদক, মানিকগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগ
পরিচালক, মানিকগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্প প্রতিষ্ঠান

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ এর

উৎপাদিত চিনি, ভিনেগার, ডিনেচার্ড স্পিরিট ও অন্যান্য ডিস্টিলারী পণ্য ব্যবহার করুন

১। চিনি ঃ-

- আখ হতে উৎপাদিত স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কেরুজ চিনি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।
- কেরুজ উৎপাদিত দেশীয় চিনি ১ কেজি / ২ কেজি প্যাকেটে বাজারজাত হচ্ছে।

২। ভিনেগার ঃ-



- কেরুজ মল্টেড ও সাদা ভিনেগার বাজারের সেরা।
- গুণে মানে ও স্বাদে অতুলনীয়।
- আচার, সস্ সংরক্ষণে অদ্বিতীয়।
- সুস্বাদু সালাদ তৈরিতে সর্বোত্তম।
- পরিপাকে সাহায্যকারী।

৩। ডিনেচার্ড স্পিরিট ঃ-



- কেরুজ ডিনেচার্ড স্পিরিট গুণে মানে অতুলনীয়।
- বার্ণিশের কাজে কেরুর ডিনেচার্ড স্পিরিট ব্যবহার করুন।

৪। কেরুজ জৈবসার ঃ-



- মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং মাটির বুনট ও গঠন উন্নত করে।
- মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- মাটিতে বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করে ও মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- গাছের পুষ্টি ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।
- মাটির অম্ল ও ক্ষারের সমতা বিধান করে।
- মাটির দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- কেরুজ জৈবসার দেশের একমাত্র সালফার সমৃদ্ধ জৈবসার-এ সার শতকে ২-৩ কেজি হারে প্রয়োগ করলে বাড়তি কোন সালফার ব্যবহার করতে হবে না।

৫। কেরু'জ হ্যান্ড স্যানিটাইজার



- হাত এবং ত্বক জীবাণুমুক্তকরণে হ্যান্ড স্যানিটাইজার একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল জীবাণুনাশক সলিউশন।

৬। আমাদের উৎপাদিত অন্যান্য ডিস্টিলারী পণ্য ব্যবহার করুন।

কেরুর পণ্য
গুণে মানে অনন্য

"বীমা ফসল হিসেবে অধিক আখ
আবাদ করে অধিক লাভবান হউন।"

কেরুর পণ্য
কিনে হউন ধন্য

বহুমুখি সেবার মাধ্যমে আমরা জনগণের বন্ধু হতে চাই।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ

(বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

ডাকঘর ঃ দর্শনা, জেলা ঃ চুয়াডাঙ্গা।

ঈদের রান্না

ঈদ রেসিপি

ঈদ উপলক্ষে বাড়িতে অতিথিদের আনাগোনা বাড়ে। অতিথি আপ্যায়নে তাই সহজেই ভিন্ন স্বাদের ও সহজ রান্নার জন্য আমাদের এই আয়োজন। গ্রন্থনা করেছেন- শরমিন আহমেদ



১. গরুর মাংসের কিমা খিচুড়ি রান্নার রেসিপি

গরম গরম খিচুড়ি সামনে পেলে সবারই মন ভালো হয়ে যায়। অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে খিচুড়ি রান্না করেন। আপনি যদি একটু ভিন্ন উপায়ে স্বাদু খিচুড়ি রাঁধতে চান, তাহলে তৈরি করুন গরুর কিমা খিচুড়ি। একবার খেলেই মুখে লেগে থাকবেএর স্বাদ।

উপকরণ

১. গরুর মাংসের কিমা ১ কাপ
২. সেদ্ধ চাল ২ কাপ
৩. মুগ ডাল আধাকাপ
৪. পেঁয়াজ কুচি আধাকাপ
৫. তেজপাতা ২টি
৬. এলাচ ৩টি
৭. দারুচিনি ২টি
৮. আদা বাটা ১ টেবিল চামচ
৯. রসুন বাটা ১ চা চামচ
১০. হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ
১১. লবণ স্বাদমতো
১২. জিরার গুঁড়া ১ চা চামচ
১৩. গাজর আধা কাপ
১৪. আলু আধা কাপ
১৫. পানি আধা কাপ
১৬. চিনি ১ চা চামচ
১৭. গরম মসলার গুঁড়া আধা চা চামচ
১৮. আস্ত কাঁচা মরিচ ২টি ও
১৯. তেল আধা কাপ।

পদ্ধতি

একটি বড় গভীর প্যানে তেল গরম করে নিন। এবার একে একে পেঁয়াজ কুচি, তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ, আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদের গুঁড়া, লবণ ও জিরার গুঁড়া মিশিয়ে দিন।

ভালো করে মসলাগুলো নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিন। লেগে এলে সামান্য পানি মিশিয়ে নিতে পারেন। কষানো হলে এর মধ্যে গরুর মাংসের কিমা মিশিয়ে দিন।

এরপর এতে সেদ্ধ চাল, মুগ ডাল, গাজর, আলু ও পানি দিয়ে ঢেকে দিন। এবার এর মধ্যে চিনি, গরম মসলার

গুঁড়া, আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন।
রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন সুস্বাদু কিমা খিচুড়ি। শীতের দিনে ধোঁয়া ওঠা গরম গরম গরুর এই কিমা খিচুড়ি আপনার মন ভালো করে দেবে।

২. মোরগ পোলাও রান্নার সহজ রেসিপি

ছুটির দিনে সবাই বিকাষ কিছু খাবার রান্না করে পরিবারসহ খেতে বসেন। আজকে না হয় তৈরি করে নিন মোরগ পোলাও। সবসময় তো বিরিয়ানি হাউস থেকেই কিনে খান এটি। এবার না হয় ঘরেই তৈরি করলেন।
অনেকেই মনে করেন ঘরে মোরগ পোলাও রান্না করা বেশ কঠিন। আপনি চাইলেই কিন্তু খুবসহজে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই তৈরি করতে পারবেন মোরগ পোলাও।

উপকরণ
১. পোলাওয়ের চাল আধা কেজি
২. মোরগ/মুরগির মাংস দেড় কেজি
৩. কাঠ, কাজু ও পেস্তা বাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ
৪. পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ
৫. পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ
৬. আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ করে
৭. গরম মসলা গুঁড়া আধা চা চামচ
৮. তেজপাতা ২টি
৯. টকদই ২ টেবিল চামচ
১০. কিশমিশ ও আলু বোখারা কয়েকটি
১১. দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ ৩-৪টি করে
১২. জায়ফল ও জয়ত্রী বাটা ১ চা চামচ
১৩. লবণ পরিমাণমতো
১৪. ঘি ২ টেবিল চামচ
১৫. সয়াবিন তেল আধা কাপ
১৬. পানি ১ চা চামচ
১৭. গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
১৮. কাঁচা মরিচ কয়েকটি
১৯. জিরা বাটা ১ চা চামচ
২০. তরল দুধ ১ কাপ
২১. ধনে ও মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
২২. গোলাপজল ও কেওড়ার জল ১ টেবিল চামচ ও
২৩. পানি ৩ কাপ।

পদ্ধতি
মোরগ বা মুরগির চামড়া ছাড়িয়ে হাড়সহ পছন্দমতো টুকরো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর এতে সবমসলা মিশিয়ে নিন। এতে আলু বোখারা ও টকদই দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে কমপক্ষে ঘণ্টাখানেক মেরিনেট করে রাখুন।
অন্যদিকে পোলাওয়ের চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর চুলায় প্যান বসিয়ে ঘি ও তেল গরম করে এতে পেঁয়াজ-কুচি দিয়ে নাড়ুন। বাদামি হয়ে গেলে পেঁয়াজের বেরেস্তাটুকু আলাদা তুলে রাখুন।
ওই তেলেই গরম মসলা ও তেজপাতার ফোঁড়ন দিয়ে মাখানো মাংস কষাতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে গেলে মাংসের টুকরা তুলে রাখুন।
ওই পাত্রেই পোলাওয়ের চাল দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। তারপর ৩ কাপ পানি, ১ কাপ তরল দুধ ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে ঢেকে দিন।
চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। চাল ফুটে উঠলে মাঝে মাঝে নেড়ে দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে রাখুন। পোলাওয়ের পানি শুকিয়ে এলে কিছুটা পোলাও উঠিয়ে রান্না করা মোরগের মাংসের টুকরাগুলো দিয়ে দিন।
এরপর কাঁচামরিচসহ বাকি পোলাও দিয়ে মৃদু আঁচে কিছুক্ষণ দমে রাখুন। ১০ মিনিট পর হালকাভাবে নেড়ে দিয়ে আবার দমে রেখে কিশমিশ, গোলাপ জল ও কেওড়ার জল দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট পর নামিয়ে ফেলুন।
পরিবেশনের সময় বেরেস্তা পোলাওয়ের ওপর ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেল মজাদার মোরগ পোলাও।

৩. রংধনু সবজির রেসিপি

শীত আসতেই বাজারে দেখা মেলে রং- বেরঙের সবজি। এ সবই স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। প্রতিদিনের ডায়েটে সবজি রাখা বাধ্যতামূলক। এতে আপনার শরীর থাকবে সুস্থ ও মুক্তি মিলবে নানা রোগ থেকে।
অনেকেই বিভিন্ন উপায়ে সবজি রান্না করেন। কেউ সবজি ভাজি করেন আবার কেউ রান্না করেন মাছ-মাংস দিয়ে। অনেকেই সবজি দিয়ে ভাজাপোড়া মুখরোচক খাবারও তৈরি করেন।
তবে চাইলেই বিভিন্ন রঙের সবজি দিয়ে স্বাস্থ্যকর এক পদ রংধনু সবজি রাঁধতে পারেন। খুবকম উপকরণেই সহজে তৈরি করতে পারবেন এই পদ।
জেনে নিন রেসিপি-





উপকরণ

১. ঘি এক টেবিল চামচ
২. আদা বাটা আধা চা চামচ
৩. রসুন বাটা আধা চা চামচ
৪. এক চা চামচ কাঁচামরিচ বাটা
৫. ফুলকপি এক কাপ
৬. গাজর কুচি এক কাপ
৭. পটোল কুচি আধা কাপ
৮. টমেটো কুচি এক কাপ
৯. বরবটি কুচি এক কাপ
১০. লবণ পরিমাণমতো
১১. চিনি এক চা চামচ
১২. তেঁতুলের মাড় ৩ চা চামচ
১৩. বাঁধাকপি এক কাপ
১৪. পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ

পদ্ধতি
প্রথমে চুলা জ্বালিয়ে ফ্রাইপ্যানে ঘি গরম করে নিন। গরম ঘিয়ের মধ্যে আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে হালকা ভেজে নিন।
ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে ফুলকপি, গাজর, পটোল, টমেটো, বরবটি কুচি দিয়ে আঁচ কমিয়ে ভেজে নিন।
এবার লবণ, চিনি ও তেঁতুল মাড় দিয়ে নাড়ুন।
এরপর বাঁধাকপি ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালোভাবেরান্না করুন। রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার রংধনু সবজি।

৪. গাজরের হালুয়া তৈরির সবচেয়ে সহজ উপায়

সুজির হালুয়া তো সবাই খেয়েছেন! বিভিন্ন উপকরণ দিয়েই হালুয়া তৈরি করা যায়। এমনকি সবজি দিয়েও তৈরি করা যায় হালুয়া। ঠিক যেমন গাজরের হালুয়া। এটি ছোট-বড় সবাই খেতে পছন্দ করেন। স্বাদে ও গন্ধে এই হালুয়া সবাইকেই মুগ্ধ করে। একবার খেলে মুখে লেগে থাকে সবসময়।
তবেএজন্য সঠিক উপায়ে হালুয়া তৈরি করতে হবে। জেনে নিন গাজরের হালুয়া তৈরির সবচেয়ে সহজ উপায়-

উপকরণ

১. ঘি ১/৩ কাপ ও ২ টেবিল চামচ
২. গাজর ১/৩ কাপ (সেদ্ধ করা)
৩. দারুচিনি ১টি
৪. তেজপাতা ২টি
৫. এলাচ ৩টি
৬. চিনি স্বাদমতো
৭. তরল দুধ ১ কাপ

৫. সেমাইয়ের বরফি তৈরির রেসিপি

সেমাই খেতে কে না পছন্দ করেন! বিভিন্ন উৎসব-আয়োজন থেকে শুরু করে বিকালের নাশতার টেবিলে মানিয়ে যায় সেমাই। সেমাইয়ের বিভিন্ন পদ তো খেয়েছেন! তবেকখনো কি এর বরফি খেয়েছেন? রান্নাঘরে থাকা কয়েকটি উপকরণ দিয়ে সহজেই তৈরি করা যায় মজাদার সেমাইয়ের বরফি। জেনে নিন এটি তৈরির সহজ রেসিপি-

উপকরণ
১. সেমাই এক কাপ
২. ঘি আধা কাপ
৩. নারকেলের দুধ আধা কাপ
৪. চিনি সামান্য পরিমাণ
৫. কনডেন্স মিল্ক এক কাপ
৬. এলাচের গুঁড়া আধা চা চামচ
৭. কিশমিশ পরিমাণমতো ও
৮. সামান্য পরিমাণ ফুড কালার।

পদ্ধতি
প্রথমে প্যানে ঘি গরম নিন। এতে সেমাই দিয়ে হালকা ভেজে নিন। এরপর এতে নারকেলের দুধ, চিনি, কনডেন্স মিল্ক, এলাচের গুঁড়া, কিশমিশ ও ফুড কালার দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। তারপর সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার সেমাইয়ের বরফি।

৬. ৩ উপকরণে ১০ মিনিটেই তৈরি করুন টকদই

টকদইয়ের স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক। স্বাস্থ্য সচেতনরা দৈনিক পাতে এই উপাদানটি রাখেন। ছোট-বড় সবার স্বাস্থ্যেরই উন্নতি ঘটায় টকদই।
বিকায় করে টকদই অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। অন্ত্রের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দূর করে ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়ায় টকদই। ফলে শরীরের অতিরিক্ত ওজনও দূর হয় সহজেই।
তবেবাজার চলতি টকদইয়ের চেয়ে নিজ হাতে তৈরি করা দইয়ের স্বাদই আলাদা। তবেসময় বেশি লাগে বলে অনেকেই ঘরে টকদই তৈরি করতে চান না। তবেচাইলে মাত্র ৩ উপকরণে ১০ মিনিটেই ঘরে বসে তৈরি করে নিতে পারবেন টকদই। চলুন তবে জেনে নিন রেসিপি-

উপকরণ

১. গুঁড়ো দুধ
২. গরম পানি ও
৩. লেবুর রস।

পদ্ধতি
হালকা গরম পানিতে গুঁড়া দুধ ভালো করে মিশিয়ে নিন। যেন দানা বেঁধে না থাকে। এক কাপ পানির জন্য প্রয়োজন হবে৩ চা চামচ গুঁড়ো দুধের।
এবার এতে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। প্রতি কাপ পানির

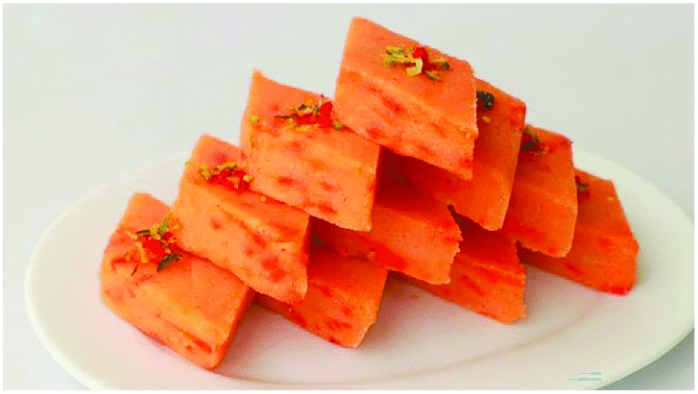

জন্য ২ চা চামচ লেবুর রস নিন। এরপর মিশ্রণটি ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন।
দেখবেন ১০ মিনিট পরই তৈরি হয়ে যাবেজমাট বাঁধা টক দই। এটি এবার ব্যবহার করতে পারবেন রান্নায়, রায়তা বা লাচ্ছি তৈরিতে।
এমনকি রূপচর্চাতেও নিজ হাতে তৈরি টকদই ব্যবহার করতে পারবেন। ফ্রিজে রেখে বেশ কয়েকদিন খেতে পারবেন স্বাস্থ্যকর টকদই।

৭. ভুনা মাংসে খিচুড়ি রান্নার সহজ রেসিপি

খিচুড়ি খেতে কে না পছন্দ করেন। সবজি খিচুড়ি থেকে শুরু করে বিফ, চিকেন কিংবা পাতলা খিচুড়ি সবই জিভে পানি এনে দেয়।
বিকাষ করে ভুনা মাংসে খিচুড়ি রান্না করা হলে এর স্বাদ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ঘরোয়া আয়োজন থেকে শুরু করে ছুটির দিনে পরিবারসহ খাবার উপভোগ করতে পারেন মজাদার খিচুড়ি। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক এর সহজ রেসিপি-

উপকরণ
১. গরুর মাংস ১ কেজি
২. পোলাও চাল ২ কাপ
৩. তেজপাতা ৩টি
৪. দারুচিনি ছোট ২টি
৫. এলাচ ৫টি
৬. ঘি ১ টেবিল চামচ
৭. গোলমরিচ আধা চা চামচ
৮. লবঙ্গ ১০টি
৯. আদা বাটা দেড় চা চামচ
১০. রসুন বাটা দেড় চা চামচ
১১. তেল ৪ টেবিল চামচ
১২. মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ
১৩. হলুদ আধা চা চামচ
১৪. ধনেপাতা ১ চা চামচ
১৫. জিরা দেড় চা চামচ
১৬. লবণ দেড় চা চামচ
১৭. গরম পানি ২ কাপ
১৮. মুগ ডাল ১ কাপ
১৯. গরম মসলা ১ চা চামচ
২০. কাঁচা মরিচ ৬-৮টি
২১. পেঁয়াজ দেড় কাপ
২২. গরম পানি সাড়ে ৩ কাপ ও
২৩. লবণ দেড় দেড় চা চামচ।

পদ্ধতি
প্রথমে চুলায় প্যান বসিয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। পেঁয়াজ হালকা বাদামি রং হলে এতে তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ, গোলমরিচ ও লবঙ্গ দিয়ে নাড়ুন।
এরপর আদা ও রসুন বাটা মিশিয়ে ভালো করে নেড়ে নিন। তারপর সামান্য পানি মিশিয়ে মসলা ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার গরুর মাংসের টুকরো যোগ করুন। অন্যদিকে ভাজা মুগ ডাল ও পোলাওর চাল আগে থেকেই ভিজিয়ে রাখুন। একে একে এবার মরিচের গুঁড়া, হলুদ, ধনে ও জিরার গুঁড়া মিশিয়ে নিন।
স্বাদমতো লবণ যোগ করুন। এবার উচ্চ তাপে ১০ মিনিট মাংস কষিয়ে ২ কাপ গরম পানি মিশিয়ে দিন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ৩০-৪০ মিনিট কম আঁচে রান্না



করুন। মাঝেমধ্যে মাংস নেড়ে দিন।
এ পর্যায়ে পোলাওর চাল মাংসের মধ্যে দিয়ে দিন। সাড়ে ৩ কাপ গরম পানি যোগ করুন মাংসে। স্বাদমতো লবণ মিশিয়ে দিন।
ঢাকনা দিয়ে এবার অল্প আঁচে আরও ২০ মিনিট রান্না করুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেল জিভে জল আনা ভুনা মাংসের খিচুড়ি।

৮. মুড়িঘণ্ট রান্নার সহজ রেসিপি

বড় মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট রান্না করা হয়। সব বাঙালির কাছেই এ পদ ভীষণ প্রিয়। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যে মুড়িঘণ্ট অন্যতম। অনেকেই এই খাবারটি ঠিকভাবেরান্না করতে পারেন না। ডাল-চাল ও বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয় এই পদ। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক রেসিপি-

উপকরণ
১. রুই মাছের মাথা ১টি ও মাছ ২ টুকরো
২. পেঁয়াজ কুঁচি ১ কাপ
৩. গরম মসলা ও তেজপাতা ১টি
৪. এলাচ ২টি ও দারুচিনি ১ টুকরো
৫. কাঁচা মরিচ ২টি
৬. মুগ ডাল ১/৪ কাপ
৭. পোলাও চাল ২-৩ টেবিল চামচ
৮. আদা বাটা ১ টেবিল চামচ
৯. রসুন বাটা আধা টেবিল চামচ
১০. হলুদ ১ চা চামচ
১১. লবণ পরিমাণমতো
১২. মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ
১৩. টালা জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
১৪. কুসুম গরম পানি পরিমাণমতো
১৫. আস্ত কাঁচা মরিচ ২টি
১৬. পেঁয়াজ কুঁচি ২ টেবিল চামচ
১৭. ধনেপাতা কুঁচি ১/৪ কাপ
১৮. তেল/ ঘি আধা কাপ

পদ্ধতি
প্রথমে মুগ ডাল একটি প্যানে টেলে নিন। এবার ২০-২৫ মিনিট ভেজে নেওয়া ডাল পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।
এরপর ডাল ও পোলাওর চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার মাছের মাথা ও টুকরোগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এর সঙ্গে সামান্য লবণ ও হলুদ মাখিয়ে তেলে ভেঁজে তুলে রাখুন।
মাছ ভাজা হলে তেলে একে একে গরম মসলা, পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ দিন। পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে সামান্য পানি দিন। এরপর এতে আদা, রসুন, হলুদ, মরিচ, লবণ ও জিরা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন।
মসলা কষানো হলে এর মধ্যে ডাল ও পোলাও চাল দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে অল্প পানি দিন। এ পর্যায়ে চুলার আঁচ মাঝারি রেখে পাত্র ঢেকে দিয়ে ৫-৬ মিনিট রান্না করুন।
৫-৬ মিনিট পর ডালের মধ্যে মাছের মাথা ভেঙে দিন। সব একসঙ্গে এবার কষিয়ে নিন। মাছের মাথা কষানো হলে অল্প করে পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করুন।
ঝোল মাখামাখা হলে উপরে ধনেপাতা ও আস্ত কাঁচা মরিচ ছড়িয়ে ঢেকে ৫ মিনিট রান্না করুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু মুড়িঘণ্ট।

৯. ৬ উপকরণেই রাঁধুন মেজবানি মাংস

মেজবানি মাংসের স্বাদই যেন ভিন্ন! চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এই পদ সবারই প্রিয়। তবে অনেকেই স্বাদ ঠিক রেখে ঘরে মেজবানি মাংস রান্না করতে পারেন না! তারা চাইলেই কিন্তু মাত্র ৬টি উপকরণ দিয়েই তৈরি করে নিতে পারবেন গরুর মাংসের জনপ্রিয় এক পদ মেজবানি মাংস।
কম সময় ও উপকরণে সহজেই ছুটির দিনে তৈরি করে পরিবারসহ উপভোগ করতে পারেন এই পদ। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক এর সহজ রেসিপি-

উপকরণ
১. সরিষার তেল ৩ টেবিল চামচ
২. গরুর মাংস ১ কেজি
৩. পেঁয়াজকুচি ১ কাপ
৪. গরম মসলা ১ টেবিল চামচ
৫. লবণ স্বাদমতো ও
৬. কাঁচামরিচ ৮-১০টি।

পদ্ধতি
প্রথমে গরুর মাংস সামান্য মসলা দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে

হবে। এরপর সসপ্যানে তেল গরম করে নিন। এতে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভেজে নিতে হবে।
এবার সেদ্ধ করা গরুর মাংস দিয়ে নাড়তে থাকুন। এরপর একে একে গরম মসলা, লবণ ও কাঁচামরিচ মিশিয়ে নেড়ে দিন।
হালকা আঁচে এবার এক ঘণ্টা রান্না করতে হবে। প্রয়োজনে হালকা গরম পানি মিশিয়ে নিতে পারেন। বারবার নেড়ে দিতে হবে, যেন নিচে লেগে না যায়। নামানোর আগে সামান্য গরম মসলার গুঁড়া ছড়িয়ে দিন। ব্যস রেডি আপনার মেজবানি মাংস। এবার গরম গরম পরিবেশন করুন জিভে জল আনা মেজবানি মাংস।

১০. ইলিশ মাছের সুস্বাদু কাবাব

ইলিশ মাছ বাজারে এখন বেশ সহজলভ্য। এ সময় অনেকেই বেশি করে ইলিশ মাছ কিনছেন। কেউ কেউ তো দীর্ঘদিন ধরে খাওয়ার জন্য সংরক্ষণও করে



রাখছেন ইলিশ।
সবাই তো ইলিশ মাছের বাহারি পদ খেয়ে থাকেন। যেমন- সরিষা ইলিশ, ইলিশ বিরিয়ানিসহ একেকজন ইলিশের নানা পদ তৈরি করে খাচ্ছেন। চাইলে স্বাদ পাল্টাতে তৈরি করতে পারেন ইলিশ মাছের কাবাব। একবার খেলেই মুখে লেগে থাকবে এর স্বাদ। ঘরে থাকা কয়েকটি উপকরণ ব্যবহার করেই খুবকম সময়ে তৈরি করে নিতে পারবেন এই কাবাব। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক রেসিপি-

উপকরণ
১. ইলিশ মাছ ১টি মাঝারি
২. আলু সেদ্ধ ১ কাপ
৩. পেঁয়াজ দেড় কাপ
৪. কাঁচা মরিচ ৭-৮টি
৫. আদা বাটা ১ চা চামচ
৬. রসুন বাটা ১ চা চামচ
৭. গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
৮. মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ
৯. টমেটো সস ৩ টেবিল চামচ
১০. ডিম ১টি
১১. লবণ স্বাদ অনুযায়ী
১২. তেল পরিমাণমতো ও
১৩. পরিবেশনের জন্য শসা, টমেটো ও গাজর।

পদ্ধতি
প্রথমে ইলিশ মাছের মাথা ও লেজ বাদ দিয়ে কেটে নিন টুকরো করে। এরপর মাছে আদা-রসুন বাটা ও লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন।
এবার সাবধানতার সঙ্গে মাছের কাটা বেছে নিন। তারপর মাছের সঙ্গে পেঁয়াজ ও তেল ছাড়া সব উপাদান মিশিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন।
এবার মাছ ও মসলার মিশ্রণটি ঢেকে রাখুন ১ ঘণ্টার জন্য। অন্যদিকে লেজ ও মাথা সামান্য হলুদ, মরিচ ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে ভেজে রাখুন।
এবার প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে নিন। এরপর মাছ কাবাবের আকৃতি দিয়ে নিন। তারপর ডুবো তেলে মাছের কাবাবগুলো ভেজে নিন। কাবাব ভাজার সময় এপিঠ-ওপিঠ উল্টে বাদামি রঙা করে ভেজে নিতে হবে। কাবাবগুলো ভাজা হয়ে গেলে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, শসা ও টমেটো দিয়ে পরিবেশন করুন।

১১. মোগলাই পরোটার সহজ রেসিপি

মোগলাই পরোটা বিকালের নাস্তায় সবচেয়ে বেশি খাওয়া হয়। অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে পরিবারের সব সদস্য নিয়ে বিকালের আড্ডায় চায়ের সঙ্গে জমে ওঠে মোগলাই পরোটা।
সাধারণত হোটেল থেকেই মোগলাই কিনে খান সবাই। তবে চাইলেই ঝটপট মোগলাই পরোটা তৈরি করে নিতে পারেন ঘরেই। জেনে নিন মোগলাই পরোটা তৈরির সহজ রেসিপি-

উপকরণ
১. ময়দা ১ কাপ
২. ডিম ২টি
৩. কাঁচামরিচ কুচি ২টি
৪. ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ
৫. গোলমরিচ গুঁড়া সামান্য
৬. পেঁয়াজ কুচি ১টি
৭. লবণ স্বাদমতো
৮. গরম মসলা গুঁড়া সামান্য
৯. বিট লবণ ও চাট মসলা সামান্য
১০. তেল পরিমাণমতো

পদ্ধতি
প্রথমে ময়দার সঙ্গে লবণ ও তেল মিশিয়ে মাখিয়ে নিন। একটু করে পানি দিয়ে নরম ডো তৈরি করে বাটিতে রাখুন। সামান্য তেল হাতে মাখিয়ে ডোয়ের গায়ে লাগিয়ে দেন। এবার পাতলা প্লাস্টিক দিয়ে বাটি মুড়ে রাখুন আধা ঘণ্টা।
ডিমের মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এজন্য বাটিতে পেঁয়াজ, ধনেপাতা ও কাঁচা মরিচ কুচির সঙ্গে লবণ, গরম মসলার গুঁড়া ও গোলমরিচ গুঁড়া মিশিয়ে নিন। ডিম ভেঙে ভালো করে মিশিয়ে নিন।
ময়দার ডো দু'ভাগ করে নিন। প্রতিটি ভাগ পাতলা করে বেলে নিতে হবে। রুটির ওপর ডিমের মিশ্রণের অর্ধেক অংশ দিয়ে দিন। এবার রুটি দুই দিক থেকে ভাঁজ করে নিন।
বাকি দুটি পাশও ভাঁজ করে সামান্য চেপে নিন। এবার চুলায় প্যানে তেল গরম করে ডুবো তেলে ভাজুন ভেজে নিন মোগলাই পরোটা। মাঝারি আঁচে ভাজবেন যাতে পুড়ে না যায়।
কারণ চুলার আঁচ বাড়িয়ে দিলে ভেতরের অংশ সেদ্ধ হবেনা। এপিঠ-ওপিঠ উল্টে ভালো করে ভেজে নিন। নামিয়ে তেল ঝরিয়ে নিন।
পিস করে কেটে পরিবেশন করুন ঘরে তৈরি গরম গরম মোগলাই পরোটা। উপরে চাট মসলা ও বিট লবণ ছিটিয়ে টমেটো সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

১২. চিলি গার্লিক নুডলস তৈরির সহজ রেসিপি

নুডলস খেতে কে না পছন্দ করে! ছোট-বড় সবারই পছন্দের এই পদ। অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তৈরি করেন নুডলস। কারও পছন্দের সুপি নুডলস আবার কারও মাসালা নুডলস।
বিকালের নাস্তায় অনেকেরই আবার নুডলস না হলে চলে না। এমনকি শিশুদের স্কুলের টিফিন ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা সবখানেই মানিয়ে যায় নুডলস।
তবে একঘেয়েমি স্বাদের নুডলসের বদলে এবার তৈরি করে নিন ভিন্ন স্বাদের চিলি গার্লিক নুডলস।
অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে বিকালের নাস্তায় দারুন মানিয়ে যাবে এই পদ। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক রেসিপি-

উপকরণ
১. চিলি ফ্লেক্স ২ চা চামচ
২. চিলি সস ২ চা চামচ



৩. সয়া সস ২ চা চামচ
৪. রসুন কুচি ৩ কোয়া
৫. সাদা তিল সামান্য
৬. পেঁয়াজ কলি কুচি ২-৩টি
৭. নুডলস ১৪০ গ্রাম ও
৮. তেল পরিমাণমতো।

পদ্ধতি
প্রথমে নুডলস সেদ্ধ করে নিন। এরপর ছাঁকনি দিয়ে পানি ছেঁকে নিন। ঠান্ডা পানি দিয়ে একবার সেদ্ধ নুডলস ধুয়ে একেবারে পানি ঝরিয়ে নিন।
এবার একটি বাটিতে, চিলি ফ্লেক্স, চিলি সস, সয়া সস, সাদা তিল ও রসুন হালকা আঁচে ভাজতে থাকুন।
তারপর ঢেলে দিন তেল।
আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা নুডলস ঢেলে নিন বাটিতে। ভালো করে মিশিয়ে মসলায় মিশিয়ে ওপর দিয়ে পেঁয়াজকলি ছড়িয়ে দিন।
রান্না হয়ে এলে নামিয়ে নিয়ে সাজিয়ে নিন প্লেট আর উপভোগ করুন আপনার চিলি গার্লিক নুডলস।

১৩. সুজির রেইনবো হালুয়ার রেসিপি

হালুয়া খেতে কে না পছন্দ করেন। আর তা যদি হয় সুজির হালুয়া তাহলে তো কথায় নেই! বিভিন্ন উপায়ে রান্না করা যায় সুজির হালুয়া। কেউ কেউ তরল হালুয়া খেতে পছন্দ করেন, আবার অনেকেই বরফি আকারে সুজির হালুয়া খেতে ভালোবাসেন।
যারা সুজির বরফি হালুয়া খেতে পছন্দ করেন তারা কিন্তু চাইলেই তৈরি করতে পারেন রেইনবো হালুয়া। এই হালুয়া দেখতেও যেমন সুন্দর, খেতেও সুস্বাদু। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করবেন সুজির রেইনবো হালুয়া। রইল রেসিপি-

উপকরণ
১. ভাজা সুজি ১কাপ
২. চিনি ৩ টেবিল চামচ
৩. ঘি ৪ টেবিল চামচ
৪. পানি ১ কাপ ও
৫. ফুড কালার কয়েক ফোঁটা (সবুজ)

পদ্ধতি
পানিতে সুজির সঙ্গে চিনি মিশিয়ে চুলায় অল্প আঁচে জ্বাল দিতে হবে। কিছুক্ষণ জ্বাল দিলেই সুজি ঘন হয়ে যাবে। তখন একটু ঘি ও ফুড কালার মিশিয়ে দিন।
হালুয়া ঘন হয়ে প্যানের গা ছেড়ে এলে আবার একটু ঘি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে ফেলতে হবে। একইভাবে সবরঙের আলাদা আলাদা হালুয়া বানিয়ে নিতে হবে।
তারপর ঘি ব্রাশ করা ট্রেতে হালুয়া ঢেলে দিতে হবে। সুজির হালুয়া হতে বেশি সময় লাগে না। তাই একটি হালুয়া ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার আগেই আরেকটা হালুয়া তৈরি করে সেটার ওপর ঢেলে চামচ দিয়ে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন।
হালুয়া একটার ওপর আরেকটা দিয়ে চামচ দিয়ে হালকা করে চাপ দিয়ে সমান করতে হবে। তাহলে ভেতরে ফাঁকা হয়ে থাকবে না আবার সহজেই জোড়া লেগে যাবে।
এবার ফিজের নরমালে সুজির হালুয়ার ট্রে রেখে দিন ঘণ্টাখানেক। এরই মধ্যে হালুয়া সেট হয়ে যাবে।
এরপর ফ্রিজ থেকে নামিয়ে ইচ্ছেমতো আকৃতিতে কেটে নিন হালুয়া।
ব্যস তৈরি হয়ে গেল সুজির রেইনবো হালুয়া। উপরে বাদাম কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন এই হালুয়া।



১৪. গোলাপ ফিরনি যেভাবে রাঁধবেন

গোলাপ ভালোবাসার প্রতীক। শুধু তা-ই নয়, এই ফুল খাবারের স্বাদ ও গন্ধ বাড়াতেও সাহায্য করে। প্রাচীনকাল থেকেই গোলাপ ফুলের পাপড়ি খাদ্যে ব্যবহারের প্রচলন আছে।
গোলাপ যেহেতু সুগন্ধি ফুল, তাই এটি ব্যবহার করার পদ্ধতিও ভিন্ন। গন্ধ ও স্বাদের জন্যই এর জনপ্রিয়তা বেশি। বিশেষ করে মোঘলাই খাবারে গোলাপজল ব্যবহার করা হয় স্বাদের জন্য।
এ ছাড়া বিভিন্ন কন্টিনেন্টাল খাবারের ডেকোরেশনেও গোলাপের পাপড়ি ব্যবহৃত হয়। আজ যেহেতু রোজ ডে, তাই প্রিয়জনকে চমকে দিতে তৈরি করুন গোলাপ ফিরনি।
এই ফিরনি তৈরিতে ব্যবহার করতে হবে গোলাপের শুকনো পাপড়ি। এতে স্বাদ ও সাজানো দুটোই হবে।
চলুন নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করবেন এই ফিরনি-

উপকরণ
১. বাসমতি বা পোলাও চালের গুঁড়া ১০০ গ্রাম
২. দুধ ১ লিটার
৩. চিনি ১/৪ কাপ
৪. এলাচ গুঁড়া ১/৪ চা চামচ
৫. জাফরান ২ চা চামচ
৬. পেস্তা কুচি পরিমাণমতো
৭. ১৫-২০টি শুকনো গোলাপের পাপড়ি ও
৮. রোজ সিরাপ সামান্য।

পদ্ধতি
প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়ে একেবারে ঘন ক্ষীরের মতো করে নিন। তার মধ্যে সামান্য পানি ও চালের গুঁড়া দিয়ে আবারও নাড়াতে থাকুন। যাতে জমাট বেঁধে না যায়।
এবার এই মিশ্রণ ফুটিয়ে নিন।
মিশ্রণটি যখন আরও গাঢ় বা ঘন হয়ে আসবে, তখন

আঁচ কমিয়ে দিন। তারপর আরও কিছুক্ষণ নেড়ে ওই মিশ্রণে এলাচ গুঁড়া ও শুকনো গোলাপের পাপড়ি মিশিয়ে দিন।
যদি ফিরনির রং হালকা গোলাপি করতে চান, তাহলে এতে সামান্য রোজ সিরাপ মিশিয়ে দিতে পারেন। এবার জাফরান ভেজানো দুধ ঢেলে দিন।
আরও একবার ভালো করে নেড়ে মিশ্রণটি নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে তারপর চিনি মিশিয়ে নিন। চাইলে গুড়ও মেশাতে পারেন।
ব্যাস তৈরি হয়ে গেল গোলাপ ফিরনি। এবার বাটিতে ফিরনি ঢেলে ওপর থেকে ছড়িয়ে দিন পেস্তা। কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে ওপরে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন গোলাপ ফিরনি।

১৫. হাতে কাটা সেমাই পিঠার সহজ রেসিপি

শীত আসতেই ঘরে ঘরে পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। শুধু ভাঁপা কিংবা চিতই পিঠা নয় পুলি থেকে শুরু করে পাটিসাপটাসহ নানা ধরনের পিঠা এ সময় খাওয়া হয়। তেমনই গ্রামবাংলার জনপ্রিয় এক পিঠা হলো হাতে কাটা সেমাই, সই কিংবা চুষি পিঠা। ঘরেও এই পিঠা খুব সহজেই তৈরি করতে পারেন। জেনে নিন এই পিঠা তৈরির সহজ রেসিপি।

উপকরণ
১. চালের গুঁড়া ১ কাপ
২. পানি ১ কাপ
৩. লবণ সামান্য
৪. দুধ ১ লিটার
৫. দারুচিনি ২ টুকরা
৬. এলাচ ২টি
৭. তেজপাতা ১টি
৮. চিনি বা গুড় ও
৯. নারকেল কোড়া স্বাদমতো।

পদ্ধতি
হাতে কাটা পিঠা তৈরি করবেন যেভাবে-
এজন্য চুলায় প্রথমে ১ কাপ পানি গরম তার মধ্যে সামান্য লবণ মিশিয়ে চালের গুঁড়া ঢেলে দিন। এরপর একেবারে হালকা আঁচে ঢেকে রাখুন ৪-৫ মিনিট। যাতে চালের গুঁড়া ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে।
এরপর ভালো করে নেড়ে নিন। চুলা বন্ধ করে দিয়ে খামিরটি কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। এরপর ভালো করে মথে নিন। রুটি বেলার পিড়িতে অল্প একটু খামির নিয়ে হাত দিয়ে চিকন লম্বা করে সুতার মতো বেশ কয়েকটি গড়ে নিন।
এরপর পিড়িতে সামান্য চালের গুঁড়া ছড়িয়ে এই লম্বা খামিরটি রেখে আরেক হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ছোট ছোট করে সেমাই কেটে নিন। সব সেমাই তৈরি হয়ে গেলে তা রান্না করার পালা।

১৬. যেভাবে রান্না করবেন সেমাই পিঠা

এজন্য প্রথমেই গুড় বা চিনি পানিতে মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। এই মিশ্রণ নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। অন্যদিকে একটি প্যানে দুধ জ্বাল দিয়ে নিন। দুধে বলক আসতেই এর মধ্যে তেজপাতা, দারুচিনি ও এলাচ মিশিয়ে দিন। এরপর দুধে সামান্য লবণ মিশিয়ে সেমাই পিঠাগুলো অল্প অল্প করে দুধে মিশিয়ে দিন। একবারে সব ঢেলে দেবেন না, তাহলে দলা বেঁধে যেতে পারে।
এ সময় চুলার আঁচ হালকা করে নিন। একটু পরপর নেড়ে দিন, যাতে নিচে লেগে না যায়। তারপর নারকেল কোড়া মিশিয়ে হালকা হাতে নেড়ে দিন। এ পর্যায়ে চুলার আঁচ বন্ধ করে কিছুক্ষণ এভাবেই রাখুন সেমাই।
হালকা ঠান্ডা হলে এর মধ্যে গুড় বা চিনির সিরা একটু একটু করে ঢেলে নেড়ে দিন। গরম পিঠার মধ্যে গুড় বা চিনির পানি মেশাতেই তা ফেটে যেতে পারে।
তাই পিঠা ও গুড়ের সিরা দুটোই হালকা ঠান্ডা করে নিন। গুড় মেশানো হতেই চুলায় মাঝারি আঁচে ২-৩ মিনিটের জন্য জ্বাল করুন। ব্যস তৈরি হয়ে যাবে মজাদার সেমাই পিঠা। এবার পরিবেশন করুন হাতে কাটা সেমাই পিঠা।



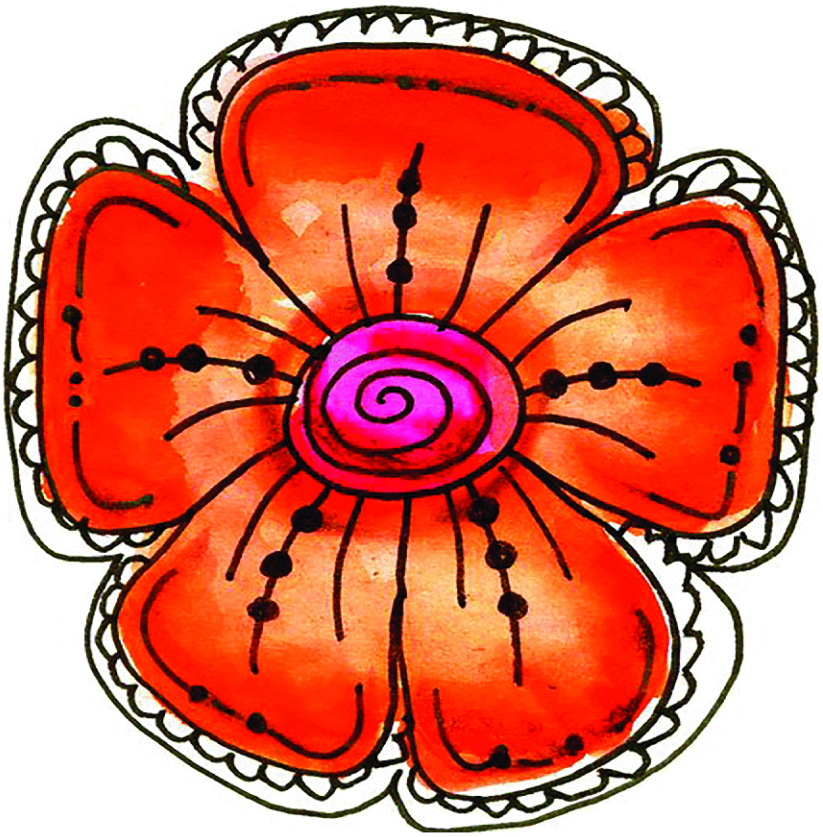

গল্প

আমাদের গ্রামে ফুটেছিল অলকানন্দা ফুল

সমীর আহমেদ

আমাদের গ্রামে কোনো ফুলের বাগান ছিল না। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন মোল্লার বাড়িতেই প্রথম দেখি ফুলের বাগান। তার বউ লাইলী বেগম নাকি ফুল খুব ভালোবাসেন। তিনিই নাকি করেছেন বাগানটা। আবার সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে নাকি দারুন গানও গায়। যে কোনো গান নাকি তিনি অনায়াসে তুলতে পারেন গলায়! যদিও তার গান শোনার সৌভাগ্য আমাদের কোনোদিনও হয়নি। একবার আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার কালাম মিয়া স্কুলের ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাকে গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি হননি। রাজি হলে ভালোই হতো, আমরা তার মধুর কণ্ঠে গান শুনতে পারতাম। আমাদের মনে আর কোনো আফসোস থাকতো না। কেন যে সেদিন তিনি অনুষ্ঠানে এলেন না, তার যথার্থ কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাই না।

শাহাবুদ্দিন মোল্লা একটি বেসরকারি কলেজের বাংলার অধ্যাপক। খুবই সাদা মনের মানুষ। তার বউয়ের মতো তিনিও ফুল ভালোবাসেন কিনা তা আমরা জানি না। তবে তিনি নাকি কবিতা লেখেন। মাঝে মাঝে তার কবিতা নাকি ছাপা হয় দেশের নামকরা সব পত্রপত্রিকায়। কিন্তু আমরা কোনোদিন তার কবিতা পড়ে দেখিনি। কাজেই তা ভালো না মন্দ, আমরা জানি না। কবিতা আমাদের কারোরই প্রিয় বিষয় নয়। তা বিচার করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। তবে তিনি যে কবিতা লিখতে পারেন, আমাদের বিশ্বাস হয়। প্রায়ই শাহাবুদ্দিন মোল্লাকে আমরা দেখি হাতে কিংবা বগলে ছোট-বড় দু-একটি কবিতার বই নিয়ে নীরবে কলেজের দিকে হেঁটে যেতে, আবার একই কায়দায় বিকালে বাড়ি ফিরে আসতে। রাস্তাঘাটে কারও সঙ্গে তার তেমন আলাপচারিতা নেই। কবিতার ধ্যানেই হয়তো তিনি ডুবে থাকেন। বাড়ি ফেরার সময়, মাঝে মাঝে কবিতার বইয়ের সাথে যোগ হয় গোলাপ। একহাতে ১/২টি কবিতার বই আরেক হাতে দু-একটি গোলাপ। রাস্তায় পরিচিত কারও সাথে দেখা হলেই তিনি মুখ কাচুমাচু করেন লজ্জায়। কোনো কথা শুরু হওয়ার আগেই তিনি সেখান থেকে দ্রুত কেটে পড়েন। ফুল হাতে নিয়ে বাড়ি যেতে কেন তিনি এত লজ্জাবোধ করেন, তা প্রথমে আমরা মোটেও বুঝতে পারি না। কারণ আমরা যতদূর জানি, আমাদের পেয়ারা নবী হযরত মুহম্মদও (স.) ফুল ভালোবাসতেন। শাহাবুদ্দিন মোল্লার অস্বস্তিভাব

দেখে আমরা নিজেরাই বলাবলি করি, কেনই বা তিনি ফুল নিয়ে যান, আর কেনই বা এত অস্বস্তিবোধ করেন। আমাদের কেউ বলে, তার কন্যা রুবিনা ফুল ভালোবাসে। কেউ কেউ বলে, না না, তার বউ ফুল খুব ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি কলেজের অধ্যাপক, এই বয়সেও বউয়ের জন্য প্রায়ই ফুল নিয়ে গেলে গ্রামের মানুষ কী ভাববে? বুড়ো ভাম? বউপাগল, মজনু মিয়া কিংবা রোমিও ভাববে না? এই গ্রামেও তো তার দু-চারজন ছাত্রছাত্রী আছে। হয়তো এ কারণে তিনি লজ্জা পান। তাছাড়া গ্রামের কলেজে চাকরি করে কয় টাকা আর বেতন পান, ফুলের যে দাম, একটা গোলাপ তো পনেরো-বিশ টাকার নিচে কিনতে পারেন না। এই আক্রার বাজারে এত দাম দিয়ে ফুল কিনতে হয়তো তার খুব অস্বস্তি লাগে। কিন্তু বউয়ের মনরক্ষা বলে কথা! তাই মাঝে মাঝে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি গোলাপ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এভাবে বাড়ি যান।

তাদের কথা সত্যি কিনা জানি না। তবে এ যুক্তি আমাদের খুব মনে ধরে। কিন্তু কিছুদিন পর তাকে গোলাপ হাতে আর বাড়ির দিকে হাঁটতে দেখি না। আমরা জানতে পারি, গ্রামের কিছু দুষ্টু পোলাপান তাকে নিয়ে একটা ছড়া লিখেছে- 'বউপাগল বুড়ো অধ্যাপকের মাথায় নেই চুল/বউয়ের জন্য রোজ রোজ কিনে আনেন রক্তরাঙা ফুল।' ছড়াটা হয়তো তিনি আড়ালে-আবডালে দুষ্টু পোলাপানের মুখে শুনেছেন। তাই ফুল কেনা বাদ দিয়েছেন। কিংবা এমনও হতে পারে, তার স্ত্রী-কন্যার কানেও এ ছড়াটা পৌঁছে গেছে। তারা হয়তো তাকে ফুল কিনতে নিষেধ করেছেন। কিংবা লাইলী বেগম হয়তো এখন আর ফুল পছন্দ করছেন না। কেউ কেউ বলে, আসলে, ব্যাপারটা তা নয়, গোলাপের শখ বউ লাইলী বেগমের মোটেও মিটে যায়নি, বরং বেড়েছে। তাই নিজের আঙিনাতেই তিনি ফুলের বাগান করেছেন। সেখানে লাগিয়েছেন নানা রকম ফুলগাছ। তার মধ্যে একটি নাকি অলকানন্দা ফুল। আমরা গাঁও-গ্রামের মানুষ। গোলাপ, জবা, জুঁই, চামেলি, বেলি, বকুল, হাসনাহেনা, গন্ধরাজ, গেন্দা, কাঁঠালিচাঁপা এরকম অনেক ফুলের নাম জানি এবং এসব ফুল কম-বেশি দেখছিও। কিন্তু অলকানন্দা ফুল কেমন, তার পাতা বা কাণ্ডই বা কেমন, কোনোদিন কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিংবা দেখলেও আমরা চিনি না, তাই ফুলটি আমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

আমরা তাদের বাড়ির সামনের হালট দিয়ে যাওয়া-আসার সময় প্রায়ই আঙিনায় ছোট্ট ফুলের বাগানটার দিকে তাকিয়ে থাকি। এত ফুলগাছের মধ্যে কোনটা যে অলকানন্দার চারা, তা আমরা চিনে উঠতে পারি না। বাড়ির কাউকে জিজ্ঞেসও করি না। দূর থেকে সব চারাগাছ তো প্রায় একই রকম মনে হয়। আগে ফুল ফুটুক, তারপর দেখা যাবে। বেশির ভাগ ফুল তো আমরা চিনিই; যে ফুলটি একটু আলাদা, অন্যরকম দেখতে, সেটিই হবে অলকানন্দা।

দেখতে দেখতে ফুলবাগানে অনেক জাতের গোলাপ ফোটে, অন্য অনেক ফুলও ফোটে। কিন্তু এ সবই আমাদের অত্যন্ত চেনাজানা। এর মধ্যে এখনো ফোটেনি অলকানন্দা! কবে ফুটবে সেই ফুল! বর্ণবিভায় আলাদা হবে। একটি অলকানন্দা ফুলের জন্য আমরা শুধু অপেক্ষা করতে থাকি। অপেক্ষা করতে করতে কত সময় চলে যায়, আমরা জানি না। এক সময় আমাদের মনে হতে থাকে এই বাগানে আদপে অলকানন্দা ফুলের গাছ নেই। থাকলে এত দেরি হয় কেন ফুল ফুটতে? বাগানের কোথাও কি আছে গাছটি? নাকি তারা এখনো অলকানন্দা ফুলের চারা রোপণই করেনি? নাকি বাগানের কোথাও আমাদের চোখের আড়ালে-আবডালে বেড়ে উঠছে চারাটি! হঠাৎ একদিন ফুল ফুটে আমাদের চমকে দেবে! নাকি খুব তাড়াতাড়ি তারা রোপণ করবে অলকানন্দা ফুলের চারা! কোনটি সত্য কোনটি অসত্য, আমরা বুঝতে পারি না। এ ব্যাপারে আমরা সবাই খুব দ্বিধাগ্রস্ত। সত্য ও অসত্য আমরা গুলিয়ে ফেলি।

তবে ফাল্গুন মাসের শেষে একদিন সকালে আমরা তাদের বাগানের অলকানন্দা ফুলগাছটি ঠিকই চিনতে পারি। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিনের কন্যাটিও সেদিন বাগানে আসে। কাছেধারে কোনো গাছের ডালে পাতার আড়াল থেকে ভেসে আসছে কোকিলের অনবরত কুহু কুহু ডাক। সে বালতি থেকে মগে পানি নিয়ে বাগানে প্রতিটি ফুলগাছের গোঁড়ায় ঢেলে দিচ্ছে। বেশ সতেজ হয়ে উঠছে গাছগুলো। তার কন্যাটিও গায়েগতরে যেন তাড়াতাড়িই বেড়ে উঠেছে। গায়ের রংও বেশ উজ্জ্বল, স্বর্ণপ্রভার বিচ্ছুরণ। ডাগর ডাগর চোখ। কী সুন্দর চেহারা! প্রায় অলকালতার মতো একহারা গড়ন। তার মতো সুন্দরী আমাদের গ্রামে আর একজনও নেই। ঠিক যেন ফুলবাগানে ফুটে থাকা একটি অসাধারণ গোলাপ। একবার দেখলে চোখ যেন আর কিছুতেই সরানো যায় না। এমন সুন্দরী মেয়েকে লাইলী বেগম একা একা বাগানে কখনো ছেড়ে দেন না। মেয়ের সাথে তিনিও বাগানে। মেয়ের কাজকর্ম পরিদর্শন করেন।

একদিন আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করি, অলকানন্দা গাছে ফুটে আছে হুক্কার মাথায় বসানো কলকি বা মাইকের মতো হলদে রঙের একটি ফুল। ভেতরে একটু লালচে আভা। কী সুন্দর! দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। এই ফুলের নামই তাহলে অলকানন্দা! আমাদের গ্রামে কোথাও অলকানন্দা গাছ নেই। এর আগে কোথাও দেখিনি এরকম সুন্দর ফুল। এই ফুলের কী বীজ হয়, নাকি এটা কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ? কলম কেটে এর বংশবিস্তার ঘটানো হয়? আমরা ঠিক জানি না। তবে আমরা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি আমাদের বাড়ির আঙিনায় এই জাতের একটি চারা রোপণ করার। আর আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখি, অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন মোল্লার মেয়ে রুবিনা গোলাপ নয়, অলকানন্দার সাথেই ঢের খাপ খায়! সে রকমই তার গায়ের রং- উজ্জ্বল!

শুধু অলকানন্দার কারণেই কিনা জানি না, অধ্যাপক শাহাবুদ্দিনের বাড়ির সামনের হালট দিয়ে আমাদের যাতায়াত বেড়ে যায়। আমরা মুগ্ধদৃষ্টিতে অলকানন্দার দিকে তাকিয়ে থাকি। বাতাসে অলকানন্দার লতার মতো নরম ডাঁটা বাতাসে মৃদু দোলে। পাঁচটি পাপড়িতে ফুটে আছে অলকানন্দা ফুল। তার কোনো গন্ধ আছে কিনা জানি না। তবে বাতাসে বাগান থেকে ভেসে আসা মিষ্টি সুবাসে আমরা যেন ভ্রমরের মতোই মাতোয়ারা হয়ে যাই। অলকানন্দার হলদে আভায় আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমরা এতে এতটাই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি যে, সকাল-বিকাল এ ফুলটি না দেখলে আমাদের ভালো লাগে না। এ সময় রুবিনাও বাগানে আসে। বাগানের পরিচর্যা করে। প্রতিটি গাছে পানি দেয়। মরা পাতাগুলো হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। বেঢপ ডালাগুলো কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেয়। তার পেছনে সবসময় ছায়ার মতো লেগে থাকেন লাইলী বেগম। ফলে আমরা বেশিক্ষণ হালটে দাঁড়িয়েও থাকতে পারি না। যদি লাইলী বেগম কিংবা রুবি- না কিছু মনে করে! তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা হালট দিয়ে একবার ওদিকে কিছুদূর যাই, আবার এদিকে ফিরে আসি। আমাদের ইচ্ছে হয় বাগানে ঢুকে কিংবা হালটে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণই অলকানন্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে। কিন্তু লোকে কী বলবে, অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন স্যার বা পরিবারের লোকজনই বা কী ভাববেন! বড় জোর দু-একদিন, তারপর হয়তো তারা আমাদের অলকানন্দা ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকা মোটেও সহ্য করবেন না। তাদের সরল ধারণা- নিশ্চয় এর মধ্যে অন্য কোনো কারণ লুকিয়ে রয়েছে। তারা আমাদের সরাসরি এখানে আসতে নিষেধ করে দেবেন। কথা না শুনলে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবেন মারতে। এ সব হাঙ্গামা তো ভালো না। লোকে ছিঃ ছিঃ করবে। তাই আমরা যতটা সম্ভব রয়ে-সয়ে সকাল-বিকাল অলকানন্দা ফুল দেখার জন্য হালট দিয়ে বারবার যাওয়া-আসা করি। আমাদের দিকে তাকিয়ে রুবিনা মিটিমিটি হাসে। সে কি তাহলে জানে অলকানন্দা না দেখলে আমাদের ভালো লাগে না!

অলকানন্দা নিয়ে আমাদের লোকমান হাকিম রীতিমতো গবেষণায় ডুবে যায়। বই, পত্রপত্রিকা ও ইন্টারনেট ঘেঁটে নানারকম তথ্য সে সংগ্রহ করে। সে বলে, এ ফুলের আদি নিবাস ব্রাজিল। এ হিসাবে গোলাপও আমাদের দেশীয় ফুল না। এর আদি ভূমি ইরাক-তুর্কি। পশ্চিমা দেশে অলকানন্দা অ্যালামান্ডা নামে পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম অ্যামান্ডা ক্যাথারটিকা। একে গোল্ডেন ট্রামপেট বা ইয়েলো বেল নামেও ডাকা হয়। এটা লতাজাতীয় উদ্ভিদ। বেড়া বা লাঠিতে ভর দিয়ে বেড়ে ওঠে। তবে কাণ্ড ছেঁটে দিলে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের মতো বাড়ে। ছাঁটাছাঁটি না করলে এটি প্রায় বিশ ফুটের মতো লম্বা হয়। পানি জমে না এমন জায়গায় অলকানন্দা ভালো জন্মে এবং রৌদ্র ঝলমলে দিনে সবচেয়ে ভালো ফোটে। অলকানন্দা ম্যালেরিয়া দূর করতে পারে। এ ফুলের কোনো গন্ধ নেই।

কিন্তু আমাদের তা বিশ্বাসই হতে চায় না। লোকমান হাকিম নিজেও তা বিশ্বাস করে না। সে বলে, আমার কী মনে হয় জানো? অলকানন্দারও একটা বিশেষ গন্ধ আছে, যা হাসনাহেনার মতো তীব্র নয়, হালকা, চাপা, কিন্তু সুরার মতো এক ধরনের নেশা ছড়িয়ে দেয় দেহ ও মনে।

আমরা ভাবী, ঠিক। তা না হলে অলকানন্দা ফুল নিয়ে আমরা এত ভাববো কেন?

আমাদের স্বপ্নের মধ্যেও অলকানন্দা ফোটে।

আমরা যখন ঘরের জানালা খুলে আঙিনার দিকে তাকাই রাশি রাশি অলকানন্দা ফুটে থাকতে দেখি। মৃদুমন্দ বাতাসে কী সুন্দর দোলে! আর তার গন্ধ আমাদের মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। গতকাল লোকমান হাকিম নাকি আঙিনার দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই বলে ওঠে, অলকানন্দা, অলকানন্দা...।

শুনে, তার ছোটবোন ময়না মুখ টিপে হাসে, কোথায়?

কেন আমাদের বাগানে? কী সুন্দর অলকানন্দা ফুটেছে।

ভাইয়া, আমাদের বাড়িতে তো ফুলবাগানই নেই।

লোকমান হাকিম হতভম্ব, তাহলে?

ময়না বলে, আসলে, অধ্যাপক বাড়ির অলকানন্দা তোমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

কী জানি! হবে হয়তো।

কিন্তু বাইরে বের হলে লোকমান হাকিম নাকি এ ফুলের চাপা ঘ্রাণ টের পায়। সে বলে, ঝলমলে রোদের মধ্যেও অলকানন্দার প্রভা। বিশেষ করে সকালে কিংবা বিকালে যেদিকে তাকাই সেদিকেই যেন হয়ে ওঠে অলকানন্দাময়। হাতের কাছেই রাশি রাশি ফুল। বারবার ইচ্ছে জাগে মনে, একবার ছুঁয়ে দেখি। কিন্তু হাত বাড়াতে সাহস পাই না। যদি হাতের স্পর্শে চুপসে যায় কিংবা ঝরে পড়ে অলকানন্দা! এক সময়, মনে হয়, এ ফুল ছাড়া বাঁচতে পারবো না। আমার একটি অলকানন্দা ফুল চাই।

কেউ কেউ বলে, লোকমান হাকিমের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। সে কথায় কথায় টেনে আনে অলকানন্দা। চারদিকে দেখে অলকানন্দা। অলকানন্দা ফুল দেখতে সে নাকি এখন ওদিকেই পড়ে থাকে বেশি। সেদিন দুপুরে, সাধারণত এ সময় কেউ ফুলবাগানে আসে না, কিন্তু সেদিন রুবিনা এসেছিল। সবমুগ্ধতা ছড়িয়ে সেও দাঁড়িয়েছিল অলকানন্দার পাশে। শরমের মাথা খেয়ে তাকেই নাকি লোকমান হাকিম বলেছিল, একটি অলকানন্দার চারা কি দেয়া যায়?

কেন?

আমি একটি ফুলের বাগান করব- শুধুই অলকানন্দার। স্বর্ণপ্রভা ছড়িয়ে ফুটে থাকবে ফুল। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকব।

রুবিনা কিছুটা লাজুক ও মুচকি হেসে বলেছিল, খুব বুঝি ভালোবাসেন অলকানন্দা ফুল!

কেন, বিশ্বাস হয় না?

কী জানি! হতেও পারে। কিন্তু এ গাছের খুব পরিচর্যা করতে হয়। তা না হলে ফোটে না অলকানন্দা ফুল।

পারব।

কীভাবে? কোনোদিন কি ফুলবাগানে কাজ করেছেন? অভিজ্ঞতা আছে?

আমার চৌদ্দ পুরুষ চাষা। আমার সব নিষ্ঠা ও শ্রম ঢেলে দেবো বাগানে।

বাগান করা সহজ কিন্তু ফুল ফোটানো সহজ নয় গো।

দেখে নিও রুবি, আমি পারব। একবার একটি চারা দিয়েই দেখো।

আবার বাবা-মাকে বলে দেখেন। যেমন ফুলপ্রেমিক মানুষ আপনি, তাতে তারাই হয়তো আপনার হাতে তুলে দেবেন একটি অলকানন্দা।

মুচকি হেসে রুবি চলে গিয়েছিল বাড়ির ভেতরে। আমাদের লোকমান হাকিম নাকি তখন বেশ ধন্দে পড়ে। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন মোল্লা কিংবা তার বউ লাইলী বেগম কি সত্যি সত্যি তার হাতে তুলে দেবেন একটি অলকানন্দা ফুল কিংবা চারা? তারা কি বুঝতে পারবেন, এ যুবকের চোখে লেগে গেছে ফুলের নেশা। সাধ ও সাধ্যিসাধনায় সেও একদিন হয়ে উঠবে যথার্থ মালি?

বাগান করার বেদম নেশায় পেয়ে বসেছে লোকমান হাকিমকে। তারে এখন পাগল পাগল লাগে। আমরা বলি, বাগান করার যদি তোমার এতই শখ লোকমান হাকিম, তাহলে যাও না কেন অধ্যাপক বাড়ি? সে চুপ করে থাকে। আমরা বুঝতে পারি, ফুলের চারা চাইতে অধ্যাপক বাড়ি যেতে তার খুব খুব বাধো বাধো লাগছে। কী করব বুঝতে পারি না। একটি অলকানন্দা ফুলের চারা তো তাকে জোগাড় করে দিতেই হবে। এ নিয়ে যখন আমরা অনেকেই খুব ঘোরের মধ্যে, তখন একদিন শুনি, অধ্যাপক বাড়ির ফুলবাগানের দিকে চোখ পড়েছে আমাদের গ্রামের তালেব মিয়ার পাগলা ষাঁড়টির। দুদিন আগে ফুলবাগানে নাকি ষাঁড়টি ঢুকে পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু চারদিকে শক্ত বেড়া থাকায় এবং অধ্যাপক বাড়ির লোকজন বাইরে বেরিয়ে আসায় ঢোকেনি। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে বাড়ির লোকজনের দিকে তাকিয়েছে। আর বাগানের দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে কয়েকবার নাকি লকলকে জিহ্বা বের করে চেটেছে। বেশি না তার একটি অলকানন্দা ফুল চাই। সেটি দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় দিয়ে সে আনন্দে ঘুরে বেড়াবে চারদিক।

অধ্যাপক বাড়ির লোকজন নাকি থ হয়ে গেছে ষাঁড়টির কথা শুনে। অবিকল মানুষের মতো গলা! তবে মানুষ নয়, একটি ষাঁড় মাত্র। সেও চায় অধ্যাপক বাড়ির অলকানন্দা ফুল! লাইলী বেগম নাকি বলেছে, না, তা কিছুতেই সম্ভব নয়। গরুর গলায় কি শোভা পায় অলকানন্দা ফুল?

আমরা ভাবী, ঠিক জবাবই দিয়েছেন লাইলী বেগম। গরু হয়ে কেন ফুলের দিকে নজর? তাও অধ্যাপক বাড়ির অলকানন্দা ফুল!

আমাদের লোকমান হাকিম বলে, ও শালাকে আমি জবাই করে ফেলব।

আমরা বলি, থামো। গরু তো গরুই। তার মাথার কোনো ঠিক আছেনি। একবার দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে পারলেই লেঠা চুকে যাবে।

লোকমান হাকিম বলে, কিন্তু সেই কাজটি কে করবে?

আমরা চুপ করে থাকি। মানুষ হয়ে কীভাবে গরুর সাথে লড়াইয়ে নামি! লোকমান হাকিম বলে, সেদিন রাগে, ক্ষোভে আঙিনায় দাঁড়িয়েই ষাঁড়টি নাকি পা দিয়ে মাটি খুঁড়েছে কয়েকবার। তারপর চলে গেছে। এতে খুব স্বস্তিতে নেই ও বাড়ির লোকজন। সারাক্ষণ তো বাগান পাহারা দিয়ে রাখা যায় না। ফাঁক পেয়ে কখন ষাঁড়টি বাগানে ঢুকে পড়ে, কে জানে! তাই অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, তার পক্ষে গ্রামের মুরুব্বি গোছের দুজন লোক পাঠিয়েছিলেন তালেব মিয়ার কাছে; যাতে তার পাগলা ষাঁড়ের গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। তালেব মিয়া নাকি মিটি মিটি হেসে বলেছে, বেশি কিছু তো চায়নি আমার ষাঁড়। একটা মাত্র অলকানন্দা ফুল। না দিলে ও ফুল ঝরেই যাবে।

এক কালের হতদরিদ্র তালেব মিয়ার গলায়ও এমন স্বর বাজতে পারে, তা আমরা ভাবিনি। তার শরীরেও এখন চেকনাই ভাব ফুটে উঠেছে। উঠবেই তো। তার ষাঁড়ের কী ক্ষমতা এখন! ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারে! ও রকম একটা ষাঁড় থাকলে, কারই বা না হয় এমন! ক্ষোভ চেপে রেখেই তারা চলে এসেছে।

আমরা জানি ওই ষাঁড়ের ক্ষমতা অনেক। কয়েক বছর আগে, তালেব মিয়া যখন খুব গরিব ছিল, ফি রোজ ঠিকমতো ভাত জুটতো না, তখন তার গাভীটি বিয়ায়। ছোটবেলা থেকেই তালেব মিয়া বাছুরের গলায় দড়ি দিত না। আমাদের এর ওর ফসলের ক্ষেতে চরেই বাছুরটি আড়ালে-আবডালে এত বড় ষাঁড় হয়ে উঠেছে। তখন আমরা কেউ কোনো পাত্তা দিইনি। তালেব মিয়ার একটাই তো ষাঁড়, চরুক না। আর কিছুদিন পর তালেব মিয়াই ওর গলায় দড়ি পরিয়ে দেবে। এখন তো ওর গলায় দড়ি পরানোর কথা ভাবাই যায় না। যার তার ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়ে। খেয়াল খুশিমতো ফসল খায়, নষ্ট করে। কিছু বললেই পা দিয়ে মাটি খোঁড়ে। চোখ রাঙিয়ে, লেজ উঁচিয়ে ভয় দেখায়। চোখা শিঙ দিয়ে তেড়ে যায় মারতে বা গুঁতো দিতে। মানুষ দৌড়ে কূল-কিনারা পায় না।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কদিনই বা সহ্য করা যায়! আমরা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি, শুধু অধ্যাপক বাড়ির অলকানন্দা ফুল চেয়েই ক্ষান্ত হবে না তালেব মিয়ার ষাঁড়টি। যখন-তখন আমাদের গ্রামের যে কারও বাড়িতে ঢুকে সব কিছু শেষ করে দেবে। ফসলের মাঠ ধ্বংস করে দেবে। লোকমান হাকিম বলে, আমরা একা না পারি, সবাই মিলে এক সাথে এগিয়ে যেতে হবে তালেব মিয়ার পাগলা ষাঁড়ের গলায় দড়ি পরাতে। তা না হলে, অলকানন্দার বাগান করে লাভ কী? ওই নচ্ছর ষাঁড় বাগানে ঢুকে সব ধ্বংস করে দেবে। সবার আগে তো বাঁচাতে হবে অলকানন্দা ফুল। ষাঁড়টিকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়, এ নিয়ে যখন আমরা গোপনে লোকমান হাকিমের সঙ্গে শলাপরামর্শে খুব ব্যস্ত সময় পার করছি, তখন একদিন সকালে অধ্যাপক বাড়ির দিক থেকে হৈ চৈ কান্নার স্বর ভেসে আসে। আমরা ভাবী ষাঁড়টি বুঝি আবারও বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। আমরা সবাই দৌড়ে যাই। যার যতটুকু শক্তি আছে, তা দিয়েই আজ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা একেবারে বোবা হয়ে যাই। কারও মুখেই কোনো কথা ফোটে না।

গতকাল গভীর রাতে বাগানে ঢুকে ষাঁড়টি সব ফুলের গাছ দুমড়ে-মুচড়ে ফেলেছে। কোথায় আমাদের অলকানন্দা! সেদিকে তাকিয়ে সবার বুক হাহাকার করে ওঠে। লাইলী বেগম ঘরের ভেতর বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন মোল্লা দুয়ারে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যেন পাথরের একটা করুণ ভাস্কর্য। রুবিনাকে আমরা কেউ কোথাও দেখতে পাই না।



উপাখ্যান

মমতাজের শেষ বাসনা ও আগ্রার তাজমহল

ভালোবাসার অমর নিদর্শন বিশ্বের সপ্তাশ্চার্যের অন্যতম তাজমহল সপ্তদশ শতাব্দীতে মোঘল সম্রাট শাহজাহান তার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিকে চিরভাস্বর ও অম্লান করে ধরে রাখার জন্য বিশ্বখ্যাত এই তাজমহল নির্মাণ করেন। তাজমহলের স্থাপত্য-সৌকর্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের মনে একই রকম বিস্ময় জাগিয়ে যাচ্ছে। তাজমহলের এত জৌলুসের মূলে রয়েছে শোক, বিচ্ছেদ, কাতরতা।

সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি. দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন) তখন বুরহানপুরে খানজাহান লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। সময়টা ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। খবর গেলো সম্রাটের কাছে মমতাজ সন্তানসম্ভবা। সন্তানের জন্মগ্রহণ আসন্ন। শাহজাহান ত্বরিতগতিতে দিল্লি পৌঁছালেন। মমতাজ স্বামীর আগমনের খবর পেয়ে, সমস্ত রীতি-নীতি ভুলে গিয়ে প্রিয়তম স্বামী সম্রাট শাহজাহানকে প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। প্রসবযন্ত্রণায় মমতাজ তখন কাতর। চোখে তার বেদনার অশ্রু ঝরে পড়ছে। মমতাজের অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে সম্রাটের বেদনা বিহ্বল দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ। মমতাজ তাকালেন স্বামীর দিকে। সম্রাটকে ইশারায় জানালেন আমার মন বলছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আমার হয়তো মৃত্যু ঘটবে। বাঁচবার আমার আর কোনো আশাই নেই। এই পৃথিবীর সমস্ত মায়া কাটিয়ে আমি চলে যাবো সেই অমরত্বের দেশে। হে সম্রাট আমি বহুদিন তোমার সুখ-দুঃখের অংশীদার ছিলাম। যাবার আগে আমার মনের শেষ কথা তোমাকে বলে যেতে চাই। সম্রাট মমতাজের আরও কাছে গিয়ে বসলেন। মৃত্যু পথযাত্রী সম্রাজ্ঞী তখন সন্তান প্রসব করেছেন। বললেন আমার দুটি ইচ্ছাই হলো শেষ কথা। আল্লাহ আমার গর্ভে তোমার ৪টি পুত্র সন্তান যথাক্রমে- দারাশিকো, সুজা, আওরঙ্গজেব এবং মুরাদ

ও ৪টি কন্যা সন্তান আঞ্জুমান আরা বেগম, জিনাত আরা বেগম, জাহানারা বেগম, নবজাতক শিশু কন্যা ধয়ের আরা বেগমকে রেখে গেলাম। বংশ রক্ষায় এরাই যথেষ্ট। যত সুন্দরী নারী হোক না কেন যেনো আর কোনো নারীর গর্ভে তোমার কোনো সন্তান না হয়। আর দ্বিতীয় ইচ্ছাটি হলো, আমার মৃত্যুর পরে আমার সমাধির উপর মর্মর পাথরের এমন একটা স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করবে যা হবে এ পৃথিবীতে অনুপম সৌন্দর্যের উৎসস্থল।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মমতাজ তার শেষ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন। দিনটি ছিল ইতিহাসের পাতায় ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন। রেখে গেলেন সদ্যজাত শিশু কন্যা ধয়ের আরা বেগমকে। শোনা যায় পত্নীর বিয়োগে শোকার্ত সম্রাট টানা দু'বছর রাজদরবারে শোক পালন করেছিলেন। আরও শোনা যায় সম্রাট শাহজাহান শোকে এমন মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিলেন যে, কয়েক মাসের মধ্যে ধবধবে সাদা হয়ে যায় তার দাড়ি ও চুল। ১৯ বছরকাল সুখে-দুঃখে স্বামী সম্রাট শাহজাহানের ঘর সংসার করেছেন মমতাজ।

পত্নীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে সম্রাট শাহজাহান প্রবল উদ্যোগী হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মৃত পত্নীর এই সমাধির উপর এমন একটা প্রাসাদ তৈরি করবেন যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে আর ভবিষ্যতে তা দেখে লোকেরা শাহজাহান আর মমতাজের প্রেমের কথা চিরদিন স্মরণ রাখবে। কে এই শাহজাহান? ও মমতাজ মহল? ইতিহাসের বিখ্যাত মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ৪ পুত্রের মধ্যে খসরু, পারভেজ, শাহজাহান ও শাহরিয়ার অন্যতম। এই শাহজাহান ১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশবে নাম ছিল খুররম। মেবারের রানা উদয় সিংহের কন্যা জগৎ গোসাইন ছিলেন তার মাতা। তিনি পিতামহ মহামতি দিল্লিশ্বর, জগদিশ্বর, আকবরের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন চটপটে, বুদ্ধিমান ও উচ্চাভিলাষী। ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আহাম্মদ নগরের শক্তিশালী মালিক অম্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম হলে তদ্বীয় পিতা বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রীত হয়ে তাকে 'শাহজাহান' বিশ্ব সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেন। মমতাজ মহল ছিলেন পরাক্রমশালী মোঘল অভিজাত আসফ খানের একমাত্র কন্যা। তার জন্ম হয় ১৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে যুবরাজ খুররাম (সম্রাট শাহজাহান)-এর সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। পারস্য রাজকন্যা মমতাজ মহলের আসল নাম আরজুমান্দ বানু বেগম। ইতিহাসে শাহজাহানের প্রিয়তমা রানী আরজুমান্দ বানু বেগম পরবর্তীতে মমতাজ মহল নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। এটি ছিল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় বিয়ে। সেকালে মমতাজ মহলের ন্যায় উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্না কোনো মহিলাই ইতিহাসে এত বেশি খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন নাই। তিনি যেমন সম্রাটকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসতেন তেমনি সম্রাটও তাকে অকৃত্রিম ও সুগভীরভাবে ভালোবাসতেন।

পত্নীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে তাই তিনি উদ্যোগী হলেন। শুরু হলো এক বিরাট কর্মকাণ্ড। যার পরিণয় বিশ্বের অনুপম তাজমহল। মমতাজের মৃত্যুর পরপরই তাজমহলের নির্মাণ কাজে হাত দেওয়া হয়নি। মৃত্যুর পর তার কোমল দেহখানি আগ্রার একটা জায়গায় রাখা হয়। সেখানে সযত্নে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দীর্ঘ ৯ মাস রাখার পর এখন যেখানে তাজমহল নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে আনা হয়। ৯ মাস দূরদর্শী সম্রাট শাহজাহান দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীদের দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মডেল করিয়েছেন। তাজমহলের সবনকশা প্রথমে কাঠের ছাঁচে তৈরি করা হয়েছিল। তুর্কিস্থানের আফ্রিদীর তৈরি ছাঁচ সম্রাটসহ পাত্র-মিত্র সবারই খুব পছন্দ হলো। বস্তুত মডেলটি সম্রাট শাহজাহানের খুবমনে ধরেছিল, কাঠের তৈরি মিনি তাজমহল। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে লোক এলো কাজ করতে। ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও ভাস্কর্য শিল্পে দক্ষ একাধিক গুণী ব্যক্তিকে তাজমহলের নির্মাণ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় সর্বমোট ১৫ জন নির্মাণবিদ তাজমহল তৈরিতে সক্রিয়ভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন।

সমরখন্দ থেকে এসেছিল আফ্রিদী ও তার সহকর্মী শিল্পী মো. শরীফ। মুলতান থেকে আমীর আলী আর রোশন খাঁ এলেন ফুল বাগান সাজাতে। দিল্লি থেকে এলেন আব্দুল্লাহ্ এবং বলখ থেকে মোহাম্মদ সজ্জন খাঁ। মিশর থেকে এলেন খ্যাতনামা লেখক আমানত খাঁ। এরপর এলেন মেসনারির সুপারিনটেনডেন্ট ও ডিরেক্টর মোহাম্মদ জানাফ খাঁ। সুদূর বাগদাদ থেকে এসেছিলেন আরও একজন লেখক তার নাম মোহাম্মদ খাঁ। এছাড়া গম্বুজের কাজে পারদর্শী হিসেবে ঈসমাইল খাঁ, মোহন লাল মোসারী ও লাহোর থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল মিনা ওয়ার লাল ও মোহব্বত লাল এবং খাটিম খানকে। এদের সবারই বেতন ছিল সে আমলে পাঁচশত থেকে এক হাজার টাকা।

মর্মর পাথরের স্থাপত্য কীর্তি পৃথিবীতে বহু আছে কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো মর্মর স্থাপত্য তাজমহলের অনুরূপ খ্যাতি লাভ করতে পারেনি। এর জন্য সম্রাট শাহজাহানকে অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরেছেন সম্রাটের লোকজন সর্বোৎকৃষ্ট মহার্ঘ্য পাথরের সন্ধানে। প্রচুর সাদা মার্বেল পাথর নিয়ে আসা হয়েছিল জয়পুরের মাকরানা আর রাইওয়ালা থেকে। লাল বেলে পাথর আনা হয়েছিল ফতেপুর সিক্রি থেকে। এছাড়া বাগদাদ, ইয়ামেন, গ্রান্ড তিব্বত, সিংহল, কানাডা, দক্ষিণ ভারত, মিশরের নীল নদ, গঙ্গা, গোয়ালিয়র, পারস্য, কুমায়ুন, মহারাষ্ট্র, জেহেরী, মাকরাণ, খামাচ, বিন্ধ্যাচল পর্বত, জব্বলপুর, রাজস্থান, হিমাচল থেকে সমতল, বাংলার সন্দীপ, মহেশখালী দ্বীপ- তাঁর দৃষ্টি থেকে কিছুই বাদ পড়েনি। সর্বসাকুল্যে ১৭ হাজার মন পাথর সংগৃহীত হয়েছিল। এটাতো গেলো শুধুমাত্র মর্মর পাথরের একটা মোটামুটি হিসাব। আরব থেকে আনা হয়েছিল প্রবাল ডালিম। দানার মতো উজ্জ্বল মণি এসেছিল বুন্দেল খন্ড থেকে, পারস্য থেকে (বর্তমান ইরান) আনা হয়েছিল পদ্মরাগ মণি। এছাড়া আগ্রার তাজমহলে মহামূল্যবান চুনি ছিল- ৬০ মণ, পান্না- ১০০ মণ, নীলকান্ত মণি- ১৬০ মণ, নানান রঙের সংমিশ্রণে তৈরি উজ্জ্বল মণি- ১৮০ মণ, ফিরোজা রঙের মণি- ৯০ মণ, গোয়ালিওর স্টোন- ৯৯০ মণ, উজ্জ্বল দ্যুতিময় পাথর- ৮০ মণ, চুম্বক লোহার আকর (ম্যাগনেটিক আয়রন)- ৮০ মণ। এছাড়া আরও ২৩০ মণ মহামূল্যবান মণি এবং খাঁদবিহীন স্বর্ণের বার ছিল আনুমানিক ২০০ মণ।

আজ থেকে সাড়ে ৩ শত বছর আগে সম্রাট শাহজাহান মণে মণে স্বর্ণ, হীরা, চুনি, পান্না, মণি-মানিক্য সংগ্রহ করে সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তাজমহলে লাগিয়ে ছিলেন। আর আজ আমরা এ যুগের মানুষ হাতের অঙ্গুলিতে দুই বা এক রতি দামি পাথরের আংটি পরিধান করে নিজেদের ভাগ্য ফিরবে বলে নিজেকে ধন্য মনে করি। সুতরাং যে স্থাপত্যকীর্তিতে এত মণি-মানিক্যের সমাবেশ তার সংস্পর্শে আসা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাজমহল দর্শনে তার রূপ যে কতটা আকর্ষণীয় ও শিল্প নান্দনিক হতে পারে তা চোখে না দেখলে অনুমান করা সম্ভবনয়। ঐতিহাসিকগণের 'শ্বেত মর্মরে স্বপ্ন' বলে অভিহিত এই মনোরম স্থাপত্য শিল্পের রানী বিশ্ব বিখ্যাত তাজমহলটির স্থপতি ছিলেন তুরস্কের ইস্তাম্বুলের বাসিন্দা ওস্তাদ ঈসা খাঁ। কিংবদন্তী আছে তাজমহলের বিকল্প আর কোনো সৌধ যাতে কারিগররা গড়তে না পারে; এজন্য নির্মাতাদের দুটি হাত কেটে ফেলা হয়েছিল এবং অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তাদের চোখ। খ্রিষ্টান লেখক মিস্টার ভিনসেন্ট বলেছেন- "বাদশাহ শাহজাহানের ঐশ্বর্য বিলাস, স্থাপত্য প্রীতি, প্রাসাদ-দুর্গ, বিশেষ করে তাজমহল নির্মাণ অনেককে অবাক করে দিয়েছে। কিন্তু এই বিলাসিতার অন্তরালে অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নৃশংস হত্যালীলার কদর্যতা লুকিয়ে আছে।" আগ্রার যমুনা নদীর তীরে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিকে চির অম্লান ও ভাস্বর করার উদ্দেশ্যে তাজমহল নামক পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম স্মৃতিসৌধ (১৬৩১-১৬৫৩ খ্রি.) নির্মাণ করে শাহজাহান আজও ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। সে সময় এই সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আগ্রার তাজমহল (১৬৩১-১৬৫৩ খ্রি.) তৈরি করতে ২০ হাজার কারিগর ২২ বছর দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে এই পরম স্মৃতি সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন। এটি নির্মাণে গোটা ভূ-ভারত ও মধ্য এশিয়া থেকে আনা হয়েছিল নির্মাণ উপকরণ ও মণি-মানিক্য। আর এসব উপকরণ আনতে ব্যবহৃত হয়েছিল সহস্রাধিক হাতি। তখনকার দিনে সমস্ত মিলিয়ে আগ্রার তাজমহলে সম্রাট শাহজাহানের কোষাগার থেকে সর্ব সাকুল্যে ব্যয় হয়েছিল ৪ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার ৮ শত ২৭ টাকা ৬ আনা ৬ পাই। সে'সব হীরা, চুনি, পান্না কি তাজমহলের গায়ে আজও আটা আছে? পূর্ণিমার রাতে তাজের অঙ্গ কি এখনও অতীত দিনের মতো চক্ চক্ দ্যুতিময় হয়ে উঠে? ইতিহাস বলে না। আসল মনিমুক্তা, স্বর্ণ তাজের গাত্রে এখন আর নেই। কালের গর্ভে সবলুণ্ঠিত হয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যমুনার অপর তীরে আর একটি তাজমহল নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন শাহজাহান। কালো পাথরের এই তাজটি হতো সম্রাটের নিজের সমাধি। এই সৌধ বানানোর কাজ শুরুও করেছিলেন সম্রাট শাহজাহান। কিন্তু পুত্রদের সঙ্গে বিরোধের কারণে এটি আর বানানো সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। সিংহাসনে বসা পুত্র আওরঙ্গজেব সেটি আর নির্মিত হতে দেননি।

স্থাপত্যের জনক হিসেবে খ্যাত সম্রাট শাহজাহান জগদ্বিখ্যাত আগ্রার তাজমহল ছাড়াও আরও যেসব শিল্পকর্ম তৈরি করে ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মতি মসজিদ, দিল্লির জুমা মসজিদ, ময়ূর সিংহাসন, আগ্রার খাসমহল, শীশ মহল, দিল্লির দিওয়ান-ই-আম,

দিওয়ান-ই-খাস এবং দিল্লির উপকণ্ঠে শাহজাহানাবাদ নগরী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। শাহজাহান দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৬২৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি।

তাজমহলের প্রবেশ পথটি লাল বেলে পাথরে তৈরি। এটি প্রায় ১০০ ফুট উঁচু। তোরণে আরবিহরফে উৎকীর্ণ রয়েছে কোরআনের বাণী। ১৮৭ ফুট উঁচু মূল মিনারটি রয়েছে ৬০ ফুট ব্যাসের জায়গা জুড়ে। মূল মিনারের চারপাশে রয়েছে ছোট ছোট মিনার। এগুলোর উচ্চতা ১০৮ ফুট। আর তাজমহলের মাঝখানে রয়েছে একটি আটকানো ঘর। এখানেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন সম্রাট শাহজাহান আর মমতাজ মহল। আগে শুধু মমতাজের সমাধি ছিল। সম্রাটের মৃত্যুর পর তাকেও স্ত্রীর পাশে সমাহিত করা হয়। ১৯৮৪ সালের পর থেকে মূল সমাধিতে আর কাউকেই ঢুকতে দেয়া হয় না। এই সমাধির ওপর তলায় বানানো হয়েছে ঠিক একই রকমের আরেকটি নকল সমাধি। পর্যটকরা এই নকল সমাধি দেখার সুযোগ পান।

তাজমহল অজস্র মণি-মানিক্য খচিত ছিল। ছিল মিনারে কারুকার্য খচিত একটি ঝাড় লণ্ঠন। গোটা মিনারের গায়ে ছিল ৩৫ রকমের রংবেরঙের অমূল্য পাথর। এখন সেগুলো নেই। জাঠ দস্যুরা লুট করে নিয়ে গেছে। পরে লর্ড কার্জন পিতলের একটা ঝাড় লণ্ঠন বসিয়ে দিয়েছেন। প্রবেশ দ্বারের রুপোর দরজাও খুলে নেয় জাঠেরা। এখন রয়েছে পিতলের দরজা বসানো। এত লুট-তরাজের পরও কিছুটা জৌলুস হারায়নি তাজমহলের।

তাজমহলের গঠনশৈলী খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে, তাড়াহুড়ো করে দেখলে তাজের আসল সৌন্দর্য চোখে পড়বেনা। এর সৌন্দর্য ঠিকমতো বুঝতে হলে খুব ধীরস্থিরভাবে এটিকে লক্ষ্য করতে হবে। একটি সুন্দর রমণীকে যেভাবে চারদিক থেকে দেখতে হয় ঠিক তদ্রুপ তাজমহলকে বানানো হয়েছে চারকোণা করে, যাতে তাজমহল দেখার সময় মনে হয় যেন সুন্দরী নারী দেখছি। মূল ফটকটিও অনেকটা বাসর রাতে নব-পরিণীতা বধূর ঘোমটার মতো করে তৈরি করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সরাতে হবে সেই ঘোমটা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মূল সৌধটি শ্বেত মর্মরে তৈরি। পেছনে যমুনার উন্মুক্ত তীর। এর ফলে তাজমহলকে ঘিরে তৈরি হয় আলোর জাদু। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে দিনের একেক প্রহরে একেক রকম রং ধারণ করে তাজমহল। সকালবেলা কিছুটা লালচে, বিকেলে দুগ্ধ সাদা, আর জ্যোৎস্নায় স্বর্ণালি রঙের মনে হয় তাজকে। চাঁদের আলোয় মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলে পুরো তাজমহল। এমন কি একেক মৌসুমেও একেক রকম রং দেখা দেয় তাজের শরীরে। মনে করা হয় একটি নারীর বিভিন্ন মানসিক অবস্থার প্রতীক হিসেবে তাজমহল প্রতিনিয়ত রং বদলায়।

এই নিবন্ধে সম্রাট শাহজাহানের বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন সম্পর্কে দুটি কথা না বললে সবকিছুই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শাহজাহানের শিল্পানুরাগের আর একটি তার বিখ্যাত নিদর্শন হলো জগদ্বিখ্যাত এই ময়ূর সিংহাসন। শিল্পের সমঝদার বেবাদল খাঁর তত্ত্বাবধানে ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৮ বছর সময়ে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনি এটি নির্মাণ করেছিলেন। বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, সে সময়ে আগ্রার তাজমহলের চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয়ে শাহজাহান নির্মাণ করেছিলেন এই অপূর্ব ময়ূর সিংহাসনটি। এটি ছিল স্বর্ণ, হীরা ও দুর্লভ মরকত মণি খচিত। সিংহাসনের ৪টি পায়া নিরেট স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত ছিল এবং ১২টি মরকত মণির স্তম্ভের উপর চন্দ্রতাপ ছাদ আচ্ছাদন করা হয়েছিল। ছাদের চারিদিকে মীনা করা মণি-মুক্তা বসানো ছিল। এর ভেতরের দিকটা সবটাই মহামূল্যবান চুনি ও পান্নার দ্বারা মুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় মণি-মানিক্য খচিত এক জোড়া ময়ূর মুখোমুখি বসানো হয়েছিল এবং প্রতি জোড়া ময়ূরের মধ্যস্থলে এক একটি মণি-মানিক্য নির্মিত গাছ এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছিল যেন ময়ূর দুটি ঠোকরে গাছের ফল খাচ্ছে এরূপ প্রতীয়মান হতো। পুরো সিংহাসনে অনেকগুলো নকশা করা এবং নকশার মাঝে ফাঁকা অংশটুকু কারুকার্য করা হয় ক্ষুদ্রাকৃতির হীরা দিয়ে। হীরা-পান্না দ্বারা সুসজ্জিত তিনটি সিঁড়ির সাহায্যে উঠা-নামার ব্যবস্থা ছিল। সিংহাসনের উপরের চাঁদোয়ার চার কোণে বসানো হয়েছিল সারিবদ্ধ মুক্তা। চাঁদোয়াটির নিচেও ছিল হীরা আর মুক্তার বাহারি নকশা। রকমারি জাহরত দিয়ে সাজানো ময়ূরগুলোর লেজ ছিল নীল রঙের মণি দিয়ে তৈরি। এক একটি বিরাট আকারের চুনি বসানো ছিল ময়ূরের বুকে। সেখান থেকে ৫০ ক্যারটের একটি হলুদ রঙের মুক্তা ঝুলে থাকত। সিংহাসনটি ঠেস দিয়ে বসবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে অগণিত মণি-মুক্তা শোভা পেত। ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পারস্যের মহামান্য সম্রাট আব্বাস তৎকালীন ১ লাখ টাকা মূল্যের একটি হীরা বাদশাহকে উপহার দেন। সম্রাট শাহজাহান পিতার হীরাটিকেও ময়ূর সিংহাসনে সংযোগ করেছিলেন। এই ময়ূর সিংহাসনের নির্মাণ ব্যয় নিয় দুটো তথ্য পাওয়া যায়- সেকালে এটি নির্মাণ ব্যয় হয়েছিল ৮ কোটি টাকা। যা এই প্রবন্ধের আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে তৎকালীন ইউরোপীয় পর্যটক টাভার্নিয়ার উল্লেখ করেছেন, এই শিল্প মণ্ডিত বহু মূল্যের রত্ন খচিত সিংহাসনটি নির্মাণ ব্যয় হয়েছিল ৫ কোটি টাকার হীরা-মুক্তা পান্না, ৯০ লক্ষ টাকার জহরত, ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ তোলা ওজনের স্বর্ণ। এই মহামূল্যবান ময়ূর সিংহাসনটি ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ভারতবর্ষ অভিযানকালে লুণ্ঠন করেন। এর অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে পাগলপারা হয়ে নাদির শাহ এটাকে সঙ্গে নিয়ে যান নিজ দেশ পারস্যে। পরবর্তীতে এই ময়ূর সিংহাসনের জন্য তার প্রতিপক্ষের কাছে নিদারুণভাবে খুন হন তিনি। যদিও আজ এটা ভারত ছাড়া। তবুও পারস্যে এখন আর এটা নেই। অনেক রাজার রাজত্বে হাত বদল হয়ে কালের গর্ভে ধ্বংস হয়ে গেছে। বিশ্বখ্যাত কোহিনূর হীরা ময়ূর সিংহাসনে বসানো ছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশের হাতে কোহিনূর হীরাটি চলে যায়। ইংল্যান্ডের রানী মহারানী ভিক্টোরিয়ার মুকুটে সেটা শোভা পায়। বর্তমানে বংশ পরম্পরায় মহারানী এলিজাবেথের মুকুটে শোভা পাচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত কোহিনূর হীরা এক সময় আমাদের ভারতবর্ষের সম্পদ ছিল। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নাদির শাহ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন দিল্লির সম্রাট ছিলেন মুহাম্মদ শাহ্। মুহাম্মদ শাহ্ ২৯ বছর রাজত্ব করেন। (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি.)।

আবার ফিরে যাই তাজমহলের কথায়। ইতিহাসের উত্থান-পতনে বার বার তাজমহলের বুকে আঘাত হানা হয়েছে। কালের গর্ভে ইতিহাস তার সাক্ষী। দুর্দান্ত জাঁঠ দস্যুগণ কর্তৃক তাজমহলের গাত্রের মণি-মানিক্য ও নিরেট স্বর্ণ নির্মিত কারুকার্যময় দরজা-জানালা লুণ্ঠিত হয়েছে। তাজমহলের জীবনে নানা উত্থান-পতন ঘটেছে। মোঘলরা যতদিন ক্ষমতায় ছিল ততদিন একে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল। মোঘলদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাজমহলের প্রতি নেমে আসে দুর্যোগ। একদিকে বাগান ধ্বংস করা হয়, অন্যদিকে পানি প্রবাহের স্থাপনাগুলো নষ্ট করা হয়। আরেক দিকে চলে অবাধ লুণ্ঠন। তাজের মূল্যবান পাথর ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী খুলে নেয়া হতে থাকে। বিংশ শতকের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত তা চলতে থাকে। লর্ড কার্জন লক্ষ্য করেন- 'প্রায়ই দেখা যায় আনন্দ করতে আসা ব্যক্তিরা তাজের গাত্র থেকে বিকালে হাতুড়ি বাটাল দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে সম্রাট ও তাঁর প্রাণ প্রিয় রানীর কবর থেকে মূল্যবান পাথর বাগিয়ে নিচ্ছে।' এ ধরনের লুট তরাজের আগেও অতীতে তাজমহল আর একটি মারাত্মক নির্মম পরিণতির মুখে পড়েছিল। আর তা ঘটেছিল প্রজাহিতৈষী (!) হিসেবে পরিচিত লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের আমলে (১৮২৮-১৮৩৩ খ্রি:)। এই ব্রিটিশ আমলেই তাজমহলের সবচেয়ে ভয়ানক আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক। তিনি ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে তাজমহলের সব শ্বেত পাথর খুলে নিয়ে নিলাম করার সব ব্যবস্থা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন। কথা মতো ব্রিটেন থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পৌঁছে গিয়েছিল আগ্রায়। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আগ্রা ও দিল্লির সব মনুমেন্ট ভেঙে ফেলা হবে এবং সেগুলোর সব দামি সামগ্রী ইংল্যান্ডে নিয়ে বিক্রি করা হবে। তিনি সে কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন। খোদ লাল কেল্লার কিছু অংশ ভেঙে সেগুলোর মার্বেল পাথর ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল। তিনি তার অমানবিক কাজের আরেক পদক্ষেপ হিসেবে তাজমহলের ভাণ্ডার ঠিকাদারিও চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন। তাজমহলের বাগানটি ভাঙার কাজ দিয়ে এটি শুরু হচ্ছিল। কিন্তু তাজমহল ভাঙার কাজ আরম্ভ করার ক'দিন আগে লন্ডন থেকে একটা বার্তা আসে, 'কাজ বন্ধ থাকুক'। ছোট্ট এই বার্তাটি সেদিন না এলে সাধের তাজমহলের আর কোনো অস্তিত্বই থাকত না আমাদের এই পৃথিবীর বুকে। ভাগ্য ভালো- ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তদানীন্তন ডিরেক্টরগণ তাজমহলের এরূপ শোচনীয় প্রয়াস থেকে বেন্টিংকে নিবৃত্ত করেছিলেন। এর পরেও যে তাজমহলের বুকে ছোট খাটো আঘাত আসেনি তা নয়। অনেক বাধা-বিপত্তির পরেও তাজমহল আজও টিকে রয়েছে। শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বের একটি অবিস্মরণীয় বিস্ময় এই আগ্রার তাজমহল। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোঘল যুগের স্বর্ণ যুগ বলে অভিহিত করা হলেও তথাপি তার রাজত্বকালের শেষের দিকে সম্রাট যখন ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তার মৃত্যু আশঙ্কা করে তদ্বীয় ৪ পুত্রের মধ্যে দিল্লির সিংহাসন নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী ভয়ানক আত্মঘাতী যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সম্রাট শাহজাহান তখন বার্ধক্যের কোঠায়। ৪ ভাইয়ের আত্মঘাতী

যুদ্ধে তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবজয়লাভ করেন। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট দারাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সিংহাসনে বসেন আওরঙ্গজেব। পিতার দারার প্রতি অন্ধ সমর্থন ও ভালোবাসার জন্য দারার মাথা কেটে মহামূল্যবান উপঢৌকন হিসেবে পিতার নিকট পাঠিয়ে দেন। এ দৃশ্য অবলোকন করে মুহূর্তে শাহজাহান মূর্ছা যান। ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে সুজা আরাকানে পালিয়ে যান এবং সেখানে মগরাজার সৈন্যদের হাতে সপরিবারে করুণভাবেনিহত হন। ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে মুরাদকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুন পরম শ্রদ্ধেয় পিতাকে আগ্রার দুর্গে নজরবন্দি করে রাখেন আওরঙ্গজেব। বন্দি করে রাখেন পিতার সঙ্গে নিজ ভগ্নী জাহানারাকেও। আগ্রা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে যমুনার অপর পাড়ে আকবরের হাতে আগ্রা দুর্গের গোড়াপত্তন। এই দুর্গে নিথর নিস্তব্ধভাবে ঘরের মধ্যে বসানো আয়নায় তাজমহলের প্রতিবিম্ব দেখে দেখে শাহজাহান চোখের জলে হৃদয়ের গভীরতম অন্তরে প্রিয়তমা পত্নী মমতাজকে স্মরণ করেছেন আর কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের শেষ কয়টা দিন। আনন্দে নয়, বন্দি অবস্থায়। আওরঙ্গজেবের অধীনে তাকে এখানে বন্দি করে রাখা হয় এবং এখানেই এই আগ্রা দুর্গেই মৃত্যুকাল পর্যন্ত ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বন্দি অবস্থায় থাকেন ঔরসজাত সন্তানের হাতেই। এখানেই ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি ৭৪ বছর বয়সে সম্রাট শাহজাহান মারা যান। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস, যার কীর্তি তাজমহল, বিশ্বজোড়া খ্যাতি যার, তারই করুণ পরিণতি। সত্যিই আশ্চর্য হতে হয় সেই চরম দুর্দিনে শাহজাহানের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কুমারী জাহানারা রইলেন পিতার পাশে। স্থবির পিতার পরিচর্যা করলেন অমিত নিষ্ঠা ও অবিচলিত ধৈর্য নিয়ে। তারপর পিতার মৃত্যুর পর জাহানারা প্রত্যাবর্তন করলেন দিল্লিতে। অবশেষে রমজানের এক পুণ্য তিথিতে মৃত্যুর শান্ত শীতল ক্রোড়ে মুক্তি লাভ করলেন দুখিনী জাহানারা। তারই ইচ্ছায় তার সমাধি হলো দিল্লির দরবেশ নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার কবরের পাশে। জাহানারা ছিলেন- 'পবিত্র কুসুম রমনী রত্না'। আরবিও ফারসি ধর্মতত্ত্বে তিনি ব্যুৎপন্না ছিলেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন। জাহানারা বিদুষী রমণী ছিলেন। তিনি ফারসিতে খুব সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন। প্রেমের পবিত্র শিখায় বিন্দু বিন্দু পরশ দিয়ে হয়তো মমতাজ সম্রাট শাহজাহানের হৃদয়ে এই মহল গড়েছিলেন; কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যার ভালোবাসায় হৃদয়ের শেষ পরশটুকু উজাড় করে দিয়েছিল সেই প্রাণপ্রিয় সম্রাট শাহজাহানের আগেই মৃত্যুবরণ করেন মমতাজ। ইতিহাসে তাজমহল এক গভীর অকৃত্রিম প্রেমের নিদর্শন হিসেবেঅমর, অক্ষয় ও অনির্বাণ শিখা হয়ে আমাদের হৃদয়ে আজীবন বিরাজ করবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যে গড়া শ্বেত মর্মরের এই সৌধটি আজ ভুবন বিখ্যাত তাজমহল। মমতাজের সমাধির পাশেই রয়েছে শাহজাহানের কবর। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহান মারা গেলে পুত্র আওরঙ্গজেবপিতাকেও সমাধিস্থ করেন মায়ের কবরের পাশে এই তাজমহলে।

প্রথমে যিনি আরজুমান্দ বানু বেগম, পরবর্তীতে তাজবিবি, সর্বশেষ সেই মমতাজ আজ আর নেই। সম্রাট শাহজাহানও নেই। স্মৃতি হয়ে পড়ে আছে সেই অমর কীর্তি তাজমহল; যা অবাক বিস্ময়ে সমগ্র পৃথিবীর প্রেমিক-প্রেমিকাকে অভিভূত করে। কত কবি, শিল্পী, সাহিত্যিককে দান করেছে অমরতা। কীর্তির চেয়ে মহৎ এই মানুষটি মৃত্যু শয্যায় শায়িত প্রিয়তমা পত্নীর শিয়রে বসে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ইতিহাসে চির অক্ষয় হয়ে রইলেন। যদি মৃত্যু শয্যায় শায়িত মমতাজ মহল তার প্রতিজ্ঞার কথা স্বামীকে না বলে যেতেন হয়তো বা আমরা পেতাম না সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম এই তাজমহলকে। তাজমহল তৈরির মূলে ছিল মৃত্যুপথযাত্রী মমতাজের শেষ বাসনা।

জোবায়ের আলী জুয়েল

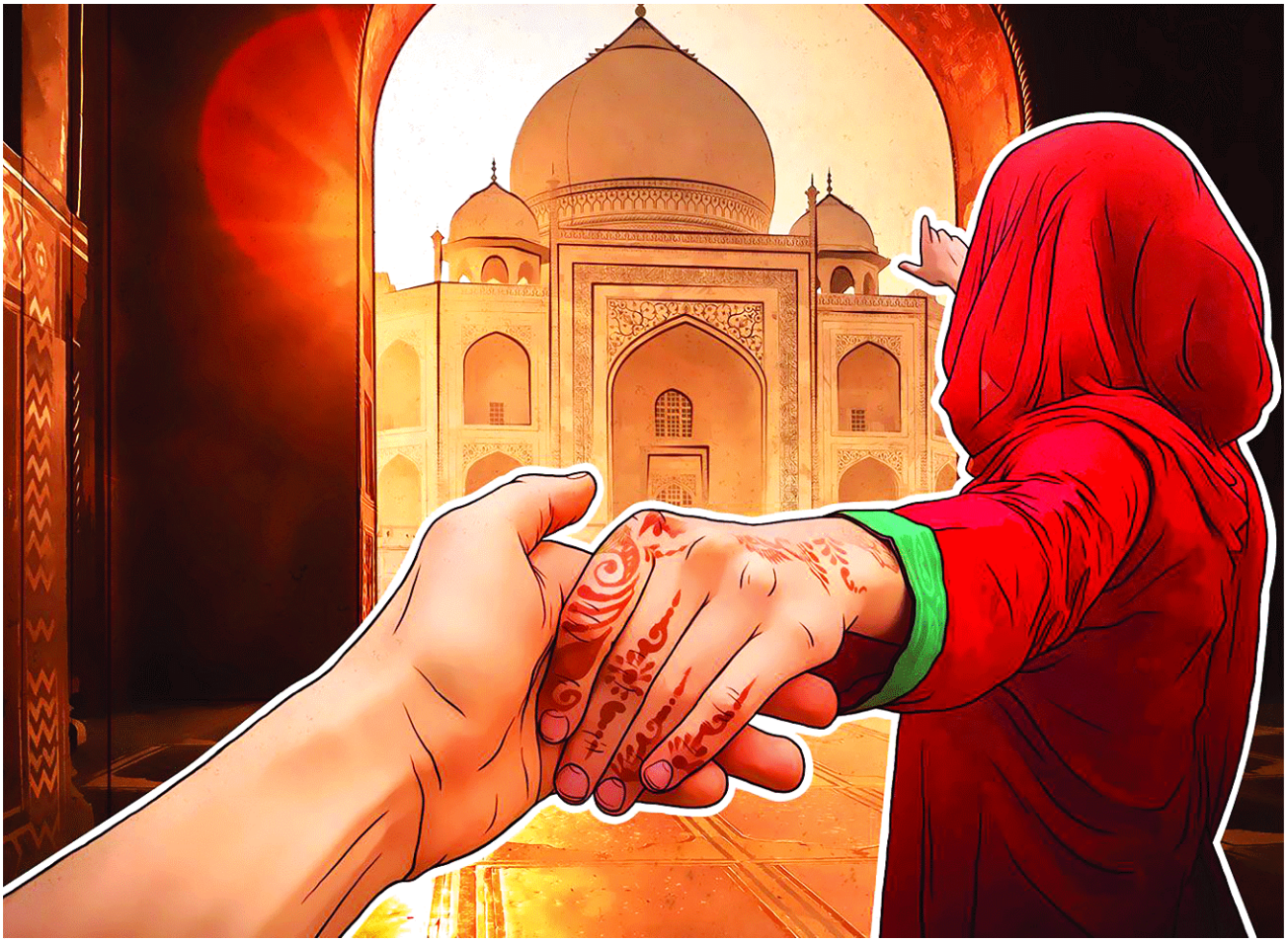



গল্প

রূপকথা

ফারহানা সিনথিয়া

টুংটাং কল বেলের শব্দে রেহানা দরজা খুলে দিলেন। নানি নানি বলে চিৎকার করে রুশা তার পা জড়িয়ে ধরল। কোঁকড়া চুলের গোলগাল রুশাকে দেখে প্রায়ই রেহানার ত্রপার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। ঠিক এমন ছিল ত্রপা। অনেক মিশুক ছিল।

রেহানা রুশাকে কোলে তুলে নিলেন। ত্রপা রেহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি একটু ঘুমাবমা। অনেক সকালে উঠেছি। তুমি একটু রুশাকে দেখ।'

'ওকে ঠিক আছে। তুমি নাশতা খাবেনা? টেবিলে দিতে বলি?'

'না মা তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

রেহানা একটু চিন্তায় পড়লেন। ত্রপা কখনো সাতসকালে খবর না দিয়ে আসে না। রাহাতের সঙ্গে ঝগড়া করে আসেনি তো?

ত্রপার বাম গালে লাল দাগ বেশ প্রকট হয়েছিল। প্রথম দর্শনে রেহানার মনে একটা বিশ্রী আশঙ্কা এসে ভর করেছিল। দেখে মনে হচ্ছে চড়ের দাগ। চোখ দুটোও কি ফোলা ফোলা ছিল? নাকি রেহানার মনের ভুল? একটু অস্বস্তি বোধ করছেন রেহানা। এসবকথা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা যায় না।

রেহানা ভাবলেন এত পড়াশোনা করে কী লাভ হলো যদি ভোরবেলাতে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে আসতে হয়? উনি আগেই বলেছিলেন রাহাতকে বিয়ে না করতে। রেহানার পছন্দের এত ভালো ভালো ছেলে রেখে শেষমেশ রাহাত?

বিয়ের সময় ফার্নিচার দিয়ে বাড়ি গুছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ত্রপা না করেছিল। এসবকরলে শ্বশুরবাড়িতে একটা প্রভাববজায় থাকে। তার বুদ্ধির জাহাজ কন্যার এসবকথা ভালো লাগেনি। বাচ্চা হওয়ার পরে দুবছর চাকরি করেনি। উনি অনেকবার বলেছিলেন বাচ্চা দেখবেন কিন্তু ত্রপা রাজি হয়নি। ত্রপার এক কথা যতদিন না রুশা পরিষ্কার করে কথা বলছে ততদিন ও কারও

কাছে রেখে চাকরি করতে যাবেনা। তখন রেহানা অনেকবার করে বুঝিয়েছেন। ত্রপার এক কথা আমি এখানে ভালো কোনো ডে কেয়ার পেলে যাব। নয়তো তিন বছর বয়সে প্লে-গ্রুপে ভর্তি হলে আমি চাকরিতে ফেরত যাব। ত্রপার বস অবশ্য কথা রেখেছিলেন। তিন বছর পরে ত্রপা তার পুরনো চাকরিতেই ফেরত গিয়েছিল। বিয়ের পরে ইফতার পাঠাতে চেয়েছেন তখন ও বাধা দিয়েছে এই বলে রাহাত এসব পছন্দ করবেনা। বিয়ের পর প্রথম কোরবানির ঈদে একটা ছাগল পাঠাতে চেয়েছিলেন তখন এই গাধা মেয়ে নিষেধ করেছিল। গলা উঁচিয়ে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করে।

রেহানা মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যান তার পেট থেকে জন্ম দিয়ে ত্রপা এমন হলো কেন? মেয়েরা একটু চুপচাপ থাকবে গলা নামিয়ে কথা বলবে। ত্রপার বয়সে তিনি কখনোই ত্রপার বাবা জামাল সাহেবের সঙ্গে তর্ক করতেন না।

এসবের একটা ফল আছে তো।

অবশ্য রুশাকে দেখে বেশ হাসিখুশি মনে হচ্ছে। রুশ হাসিমুখে ওর নানিকে বলল সিন্ডারেলার গল্পের বই পড়ে শোনাতে। রেহানা বই খুলে নাতনিকে পড়ে শোনাতে লাগলেন, 'ওয়ান্স আপন এ টাইম...'

ত্রপা ঘরে ঢুকেই ব্যাগটা প্রথমে মেঝেতে ফেলল। ব্যাগ থেকে ফোন বের করে চার্জ লাগিয়ে দিল। তারপর কি মনে করে ফোনটা সাইলেন্ট করে দিল। ওর একটা কড়া ঘুম দরকার। মা রুশাকে দেখবে ও নিশ্চিন্তে একটা ঘুম দিতে পারবে।

ওয়াল কেবিনেট খুলতেই মন ভালো হয়ে গেল ত্রপার। ওর হালকা গোলাপি পাজামা আর স্লিপশার্ট পরে একটা জম্পেশ ঘুম দেবে ত্রপা। পুরো পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেলেও এই ঘরটা বদলাতে দেয়নি ত্রপা। বেশ কয়েকদিন আগে মা এটাকে পাল্টে গেস্ট রুম বানাতে চেয়েছিল। ত্রপার আপত্তির মুখে সেটা সম্ভব হয়নি। এক কোণায় রাখা পড়ার টেবিলটা আছে। আর আছে লম্বা কারুকাজ করা আয়না।

পোশাক পাল্টে মুখের প্রসাধন তুলে একটা ঘুম দিল ত্রপা। বেশ কয়েকবার শব্দ করে ত্রপার ফোন কেঁপে উঠল। রাহাত ফোন করছে। ত্রপা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে ততক্ষণে।

বেশ কিছুক্ষণ ফোন দিয়ে হাল ছেড়ে দিল রাহাত। পরে ফোন করলেই হবে। এয়ারপোর্টে বোর্ডিং-এর ঘোষণা দেওয়া হলো। পা চালিয়ে গেটের দিকে হাঁটা দিল রাহাত। ফ্লাইট ল্যান্ড করলেই ত্রপাকে আবার ফোন দেবে রাহাত। এখন প্লেনের মধ্যে ফোন দিতে গেলে এয়ার হোস্টেসের ঝাড়ি খাবার একটা সম্ভাবনা আছে। ল্যাপটপে বেশ কিছু মুভি নিয়ে এসেছে। মন দিয়ে দেখতে পারছে না রাহাত। একটা ব্রডকাস্ট শুনতে থাকল রাহাত। বেশ কিছুক্ষণ উশখুশ করে একটা ঘুমানোর চেষ্টা করল রাহাত।

ত্রপা ঘুম থেকে উঠল প্রায় বিকেল নাগাদ। এর মাঝে ত্রপার বাবা কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছেন ত্রপার কথা।

রেহানা মুখ গজ গজ করে উত্তর দিয়েছেন, 'কি



জানি কি হয়েছে? তোমার মেয়ে সাতসকালে বাড়ি এসে ঘুম দিচ্ছে। ঝগড়া করে এসেছে বোধ হয়।'

ত্রপার বাবা চিন্তিত মুখে বারান্দায় চা নিয়ে বসেছেন। ওনার ধারণা তেমন কিছুই হয়নি। রেহানা তিল থেকে তাল বানাচ্ছে।

একটু পরে রেহানা এসে নিজের মনে যেন বলতে থাকলেন, 'বুঝলে ওর গালে একটা লাল দাগ দেখলাম।'

জামাল উদ্দিন এবার একটু চমকে তাকালেন। বললেন, 'ও ঘুম থেকে উঠলে জিজ্ঞেস করো।'

ত্রপার ঘুম ভাঙল বিকাল চারটায়। ঘুম থেকে উঠে মনে পড়ছে না কীভাবে এই ঘরে এলো। আসলে আজ এত সকালে উঠেছে। রাহাত ভোরবেলাতে উবার ডেকে এয়ারপোর্টে গেছে। কিছুক্ষণ পরে ত্রপাও বের হয়েছে রুশাকে নিয়ে। ঘুম ভালো হয়েছে। এখন পেয়েছে খিদে। ত্রপা হাসিমুখে এসে খাবার ঘরে একটা চেয়ার টেনে বসল। অবেলায় ঘুমের জন্য চোখ ফুলে গেছে।

চেয়ারে বসে ফুলি নামের মেয়েটাকে বলল, 'ফুলি ভীষণ খিদে পেয়েছে। তিন গামলা ভাত খেতে পারব। খাবার লাগিয়ে দাও টেবিলে।'

রাহাত ফোন করেছে। ত্রপা ধরল, 'হ্যালো তুমি পৌঁছেছো?'

'তোমাকে এয়ারপোর্ট থেকে অনেকবার ফোন করলাম। তুমি ফোন ধরলে না। এখনো রাগ করে আছ?'

'না পাগল নাকি? রাগ করে থাকব কেন?'

'আমি তোমাকে পরে ফোন করছি। হোটেলে চেক ইন ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।'

'ওকে বাই।'

ত্রপার গলার শব্দ শুনে রেহানা এসে বসলেন। ত্রপার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রুশাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। ও দুপুরবেলাতে ভাতও খেয়েছে।'

'তাই? বাড়িতে একেবারেই খেতে চায় না। এ সময় নুডলস খায়।'

'আচ্ছা? মাঝেমধ্যে নামিয়ে দিয়ে যাস এদিকে আমি ভাত খাবার অভ্যেস করিয়ে দেবো।'

'ঠিক আছে মা। আজকে পটল ভাজিটা অসাধারণ হয়েছে মা। থ্যাংকস ফর বেগুন পোসত।'

রেহানা একটু ইতস্তত করছেন কীভাবে জিজ্ঞেস করবেন বুঝছেন না।' ত্রপা তোমার গালে একটা লাল দাগ। তুমি কি ব্যথা পেয়েছো? আসলে না মানে ...

'আসল কথাটা কি মা? তোমার ধারণা রাহাত আমার গায়ে হাত তুলেছে?'

'না আমি সেটা বলিনি। কিন্তু তোমার চোখ-মুখ ফোলা ছিল।'

'অবশ্য তোমার জানার কথা মা। আমার হাতে খুব জোরে চাপ দিলেও কিন্তু রক্তের দাগ পড়ে। মনে আছে যেদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার দূর সম্পর্কের ভাইয়ের কাছে আমি পড়বনা সেদিন হাতে চাপ দিয়ে বলেছিলে একথা কাউকে না বলতে। কি যেন বলেছিলে দাঁড়াও মনে করছি আমি। চরিত্রে দাগ পড়লে নাকি সমস্যা।'

রেহানা একটু অস্বস্তি নিয়ে পাশের ঘরের দরজার দিকে তাকালেন। ত্রপার গলার স্বর উঁচু না হলেও পাশের ঘর থেকে জামাল উদ্দিন পুরোটাই শুনেছেন।

রেহানা বললেন, 'ত্রপা সেকথা এখন আসছে কেন?'

'আসবে না কেন? তুমি আমার মুখের দাগ নিয়ে এত চিন্তিত। সেদিন পাকাপাকিভাবে যে আমার মনে ধ্বসর দাগ পড়েছে সে খবর রেখেছিলে? রাখোনি সেদিন।'

রেহানা চুপ করে গেলেন। এখন কথা না বাড়ানোই ভালো। রেহানা এখনো মাঝেমধ্যে অপরাধবোধে ভোগেন এটা নিয়ে। নিম্নবিত্ত পাড়াতো আত্মীয়কে আর্থিক সাহায্য করার জন্যই বলেছিলেন এসে বাংলা পড়াতে। উনি কি করে জানবেন ওই ছেলে বাড়িতে এসে তার মেয়ের সঙ্গে অসভ্যতা করবে?

ত্রপা যোগ করল, 'মা রাহাত আমার গায়ে হাত তোলেনি। আমি নতুন হেয়ার কালার করিয়েছি। সেটার ফলাফল হিসেবে আমার এলার্জি হয়েছে। এক গালে রং কিছুটা পড়েছিল সেখানেই লাল দাগ। তুমি আমাকে সেদিন প্রতিবাদ করতে নিষেধ করেছিলে তাই তোমার ধারণা আমি মার খেয়ে প্রতিবাদ করতে পারবনা।'

রেহানা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বললেন, 'একটু চা করে দিতে বলি?'

'বল। মাথাটা ধরেছে আমার।'

রেহানা অস্বস্তি এড়াতে রান্নাঘরে ঢুকলেন। জামালুদ্দিন এসে টেবিলে বসলেন।

উনি ভেবেছিলেন ত্রপাকে এসে মন খারাপের কারণ জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু রুশা ঘুম থেকে উঠেছে। এ বাড়িতে কেউ রুশার সামনে কোনো গম্ভীর আলোচনা করে না। রুশা অভ্যস্ত নয়।

রুশা এসে ওর নানাকে জিজ্ঞেস করল, 'নানা ফেরি টেলগুলো সব সত্যি জানো?'

জামালুদ্দিন বললেন, 'অবশ্যই রাজকন্যা আছে তো?'

'তাহলে তো মনস্টার ও আছে নানাভাই।'

'অবশ্যই আছে। সে জন্যই সব রাজকন্যাদের



সঙ্গীত

প্লেব্যাক সিঙ্গার রুলিয়া আজম

বাংলা সিনেমার সোনালি যুগে রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, আবিদা সুলতানা, শাম্মী আখতারদের সাথে যার সুমিষ্ট কণ্ঠ রুপালি পর্দা হয়ে রেডিওতে ভেসে আসত তিনি রুলিয়া আজম। বিবাহপূর্বে যিনি সংগীত শ্রোতাদের কাছে রুলিয়া রহমান নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। আশির দশকের শুরুতে ড. খায়রুল আজমের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর নামের শেষে 'আজম' লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। বর্তমানে তিনি রুলিয়া আজম নামেই পরিচিত।

প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে রুলিয়া আজম আমাদের সিনেমা জগতে সমাদৃত এক নাম। আলাদা কণ্ঠবৈচিত্র্যের কারণে আশির দশকে রুনা-সাবিনার মতো তিনি সিনেমার অসংখ্য গানে কণ্ঠ দেন। বলতে দ্বিধা নেই তার কণ্ঠে ছিল আলাদা মাদকতা। এ কারণে পোশাকি ছবিতে তার চাহিদা ছিল আলাদা। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ঘটনা সমৃদ্ধ বেশিরভাগ ছবির গানে তিনি কণ্ঠ দেন।

তবেআশির দশকের শুরুতে তিনি শ্রোতা হৃদয়ে আরও বেশি ঝড় তোলেন 'আজ থেকে বারোটি বছর' গানটি গেয়ে। এই গানে সহশিল্পী ছিলেন এম. এ শোয়েব। সে সময় ডিসকো রেকর্ডিং থেকে জাহিদ হোসেনের সংগীত পরিচালনায় রুলিয়া আজম এবং এম. এ শোয়েবের ১২টি গান নিয়ে শোয়েব-রুলিয়া নামে একটি অডিও ক্যাসেট বের হয়। এই অডিও ক্যাসেটের 'আজ থেকে বারোটি বছর' গানটি সুপার হিট হয়। এই গানটির রেশ এখন শ্রোতাদের হৃদয়ে আগের মতোই আছে।

দু সন্তানের জননী রুলিয়া আজম অনেকদিন ধরেই সবার চোখের আড়ালে গেছেন। দেশের

কোনো টিভি চ্যানেল বা সংগীতানুষ্ঠানে একদম দেখা যায় না তাকে। এর কারণ অবশ্য একটাই তিনি অনেকদিন ধরে পরবাসী। মেয়ের সাথে ফিজিতে বসবাস করেন। ওখানে মেয়ে ড. নুসরাত আজমের সাথে স্বামীসহ থাকেন। তবে মাঝে মধ্যে দেশে আসেন। দুই সন্তানের জননী তিনি। তার ছেলে থাকেন পোলান্ডে।

আশি-নব্বই দশকে বেতার বাংলাদেশে অনুরোধের আসর, ছায়াছবির গান বা বিজ্ঞাপন তরঙ্গে নিয়মিত রুলিয়া আজমের কণ্ঠ বেজে উঠত। সিনেমায় প্রায় দুই শতাধিক গানে কণ্ঠ দেন তিনি। ৮৩ সালে 'গলি থেকে রাজপথ' ছবিতে সুরকার সুবল দাসের সুরে এন্ড্রু কিশোরের সাথে রুলিয়া আজমের গাওয়া 'আমি গাড়ি কিনি নাই, গাড়ি চড়ার মানুষ নাই' এই গানটি এখনও শ্রোতাদের হৃদয়ে অন্যরকম অনুরণন তোলে। সিনেমায় গানটিতে লিপ করেন নায়ক জাভেদ এবং নায়িকা জুলিয়া। একইভাবে দারাশিকো পরিচালিত 'প্রেমকাহিনী' ছবিতে কুমার বিশ্বজিতের সাথে গাওয়া আমি যে প্রেমে পড়েছি, আমি যে প্রাণে মরেছি' গানটি এখনও শ্রোতানন্দিত হয়ে আছে। আশির দশকে ইতিহাস নির্ভর এবং একই সঙ্গে প্রচুর ফ্যান্টাসি বা পোশাকি ছবিছিল সাধারণ দর্শকদের কাছে প্রিয় এক বিষয়। এসবছবিতে একক কণ্ঠে তিনি অনেক গান করেন। আবার নায়িকার সহপাঠী, বোন, বান্ধবী, ননদের চরিত্রে যারা অভিনয় করতেন তাঁদের লিপে বেশিরভাগ শোনা যেত রুলিয়া আজমের গান।

সত্তর দশকের শেষলগ্নে পোশাকি ছবির খ্যাতনামা পরিচালক ইবনে মিজান পরিচালিত 'বাগদাদের চোর' ছবির গানে কণ্ঠ দিয়ে প্লে-ব্যাক শুরু করেছিলেন তিনি। এরপর আর তাকে পেছনে ফিরতে হয়নি। একের পর এক সিনেমায় প্লে-ব্যাক করেন। যাদুনগর, গলি থেকে রাজপথ, প্রিন্সেস টিনা খান, শাহী চোর, আখেরী নিশান, প্রতিবাদ, গাঁয়ের ছেলে, সেলিম জাভেদ, আলতা বানু, রাজ সিংহাসন, রাজমহল, চম্পাচামেলি, রাজকন্যা, তাজ ও তালোয়ার, রাজার রাজা, আলিফ লায়লা, চাঁদ সওদাগর, সোহাগ মিলন, বাঁধনহারা, সবুজ সাথী, আলাদিন-আলীবাবা-সিন্দবাদ, রাজমহল, কেউ কারো নয়, নবাবজাদী-এরকম অনেক অনেক ছবিতে কণ্ঠ দেন। তাঁর গাওয়া এককভাবে উল্লেখযোগ্য গানগুলো হলো 'সুলতানে জাহান তুমি বড়ই মেহেরবান' (ছবি: শাহজাদী গুলবাহার: সুরকার: মনসুর আহমেদ), আমি জেনেশুনে হাতে কড়া পরেছি (ছবি: রাজকন্যা, সুরকার সুবল দাস), দুদিনের খেলা ঘরে যত খুশি খেলে যারে (ছবি: রাজকন্যা, সুরকার: সুবল দাস), তুমি যে আশা মোর ভালোবাসা (ছবি: তাজ ও তলোয়ার, সুরকার: মনসুর আহমেদ), 'এ রূপে লেগেছে আগুন দেখ না' (ছবি: রাজার রাজা, সুরকার: আলম খান), মঞ্জুর করো রাজা আমার সালাম (ছবি: চাঁদ সওদাগর, সুরকার: আজাদ রহমান), ইরান তুরান ঘুরে (ছবি: শাহী চোর, সুরকার: সুবল দাস), দিও না আমায় দিও না ফুল দিয়ে বিনিময়ে মন নিও না (ছবি: আলতা বানু, সুরকার: সত্য সাহা)। এরকম আরও অনেক গান রয়েছে।

রুপালি পর্দায় দ্বৈত কণ্ঠে তাঁর গাওয়া রয়েছে অনেক গান। উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে 'বন্ধু লিখেছে আমার প্রেমের আলাপন' (ছবি: আলিফ লায়লা, সুরকার সুবল দাস, সহশিল্পী: রুনা লায়লা), ভ্রমর ছোঁয়ায় ফুল ফোঁটে (ছবি: রাজমহল, সুরকার সুবল দাস, সহশিল্পী: রুনা লায়লা), 'চোখে আমার প্রেমের কাজল কণ্ঠে আছে গান' (ছবি: গাঁয়ের ছেলে, সুরকার: সুবল দাস, সহশিল্পী: উমা খান), 'এখন আমার মনের মানুষ চাই' (শাহজাদী গুলবাহার: সুরকার: মনসুর আহমেদ, সহশিল্পী: সুবীর নন্দী), রূপ দেইখা পাগল হইয়া পিরিতি কইরো না (ছবি: প্রতিবাদ, সুরকার আলম খান, সহশিল্পী: সৈয়দ আব্দুল হাদী), শোনো শোনো হয়েছে বাবা রাজি (ছবি: সেলিম জাভেদ, সুরকার: আনোয়ার পারভেজ, সহশিল্পী: খুরশিদ আলম), সখি ঘরে বাইরে (ছবি: আলতা বানু, সুরকার: সত্য সাহা, সহশিল্পী: খুরশিদ আলম), বুজান লো বুজান ঘোমটাখানি টান (ছবি: কেউ কারো নয়, সুরকার: আলম খান), আমি গুলশানেরই লাল গোলাপ (ছবি: রাজসিংহাসন, সহশিল্পী: রুনা লায়লা, সুরকার : সুবল দাস), মোরা চম্পা আর চামেলি (ছবি: চম্পা চামেলী, সুরকার: আলাউদ্দিন আলী, সহশিল্পী: সাবিনা ইয়াসমিন), ও আমার ময়না কথা আর কয় না (ছবি: সোহাগ মিলন, সুরকার: আনোয়ার পারভেজ, সহশিল্পী: খুরশীদ আলম), চাঁদনী রাতে আমার চোখেতে রঙের বাহার (ছবি: আলাদিন-আলিবাবা-সিন্দবাদ, সুরকার: আলম খান, সহশিল্পী: সাবিনা ইয়াসমিন) ইত্যাদি।

কিছুদিন আগে কথা হয় তার সাথে। সংগীত জীবনের গল্প করতে করতে ফিরে যান সেই তারুণ্যে। রাজধানীর স্মৃতিময় মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় বেড়ে ওঠা, গানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, প্লে-ব্যাক জীবনের অনেক কথাই বলেন। প্লে-ব্যাকের শুরুর কথা বলতে গিয়ে বললেন, "আমার প্লে-ব্যাকের শুরুটাও মিরাকল। আটাত্তর সালের দিকের কথা। আমি তখন বিটিভির তালিকাভুক্ত শিল্পী। সিনেমাতে গান গাওয়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু গান গাওয়ার ইচ্ছেটাও আবার আমার মধ্যে অতো প্রবল না। তখন রেডিওতে সিনেমার গানের অসম্ভব জনপ্রিয়তা। এর মধ্যে একটা ঘটল ঘটনা।

ধানমন্ডিতে একদিন আমার খালাতো বোনের বউভাত। আমরা সবাই ওখানে গিয়েছি। হঠাৎ এলেন সুরকার মনসুর আহমেদ। নামকরা সন্তুর বাদক। ওখানেই উনি আমাকে পেয়ে বললেন, তোমাকে সিনেমাতে প্লেব্যাক করতে হবে। আমিতো খুবই খুশি। আমার বড় ভাই জাহাঙ্গীরকে নিয়ে আমি মোহাম্মদপুরে সুরকার মনসুর আহমেদ-এর বাসাতে গেলাম। উনি গানটা হারমোনিয়ামে তুলে আমাকে সুর বুঝিয়ে দিলেন। গানটি 'বাগদাদের চোর' ছবির। ছবির পরিচালক ইবনে মিজান। জাভেদ-ববিতা নায়ক নায়িকা। গানের কথা- আমি জারিনা আমি মেহফিলে হাসিনা। গানটির সুর আরাবিয়ান ধাঁচে। পরে গানটি কাকরাইলে সাফাত ভাইয়ের ইপসা রেকর্ডিং স্টুডিওতে রেকর্ড করা হলো। এই ছবিতে আরও গাইলাম- তারা ভরা রাতে এলে যে বাহার। বাগদাদের চোর ছবিহিট হলো। আমার কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। এরপর একের পর এক সুরকাররা নতুন নতুন গান নিয়ে এলেন আমার।"

সুরকার মুনসুর আহমেদ-ই তার প্লেব্যাক জীবনের শুরুটা করে দেন। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। দিন-রাত গান গেয়েছেন। ব্যস্ত থেকেছেন স্টুডিওতে। রুলিয়া আজম দেশের প্রায় সবপ্রখ্যাত সুরকারদের সুরের গানেই কণ্ঠ দিয়েছেন। মনসুর আহমেদ ছাড়াও প্রখ্যাত সুরকার সুবল দাস, আনোয়ার পারভেজ, আলম খান, আলাউদ্দিন আলী, শেখ সাদী খান, আজাদ রহমানের সুরের একাধিক গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। তবে সুরকার মনসুর আহমেদ এবং সুবল দাস তার হৃদয়ে এখনও গেঁথে আছে নিরন্তর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায়। এ দুজনকে তিনি সবসময় মান্য করেন। তার মতে, 'সংগীত জীবনে যা প্রাপ্তি তা এই দুজন সংগীত গুরুর হাত ধরে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এ দুজন শুরুতেই আপন করে রুনা-সাবিনার পাশে আমাকে বসিয়েছিলেন। আর এ কারণেই আমি গাইতে পেরেছিলাম।'

ফিজিতে বসবাস করলেও গান ছাড়েননি রুলিয়া আজম। ওখানে যেসবঅনুষ্ঠান হয় সেখানে নিয়মিত অংশ নেন। এখনও প্রাণ খুলে গাইতে ভালোবাসেন। তাঁর সময়ের গানের মানুষদের হৃদয়ে অনুভবকরেন সবসময়। আরেক প্রখ্যাত শিল্পী আবিদা সুলতানা তার প্রিয় বান্ধবী। আবিদা সুলতানাসহ অনেকের সাথে কথা হয় তার নিয়মিত। পরিচিত প্রিয়জনদের খোঁজখবর রাখেন।

গানের মানুষ যারা চলে গেছেন তাদের স্মরণে এনে নস্টালজিক হয়ে পড়েন রুলিয়া আজম। বলেন, 'অনেকের সাথে গান গেয়েছি তারা চলে গেছেন দুনিয়া থেকে। তাদের সঙ্গে রয়েছে অনেক অনেক স্মৃতি।' ঢাকার সিনেমা হলগুলো তাঁর স্মৃতিতে এখনও অবিনশ্বর। বললেন, তার প্লেব্যাকের প্রথম ছবি 'বাগদাদের চোর' মুক্তি পাওয়ার পর এই ছবি দেখতে গিয়েছিলেন ফার্মগেটের আনন্দ সিনেমা হলে। যখনই তার গাওয়া গানের কোনো ছবিমুক্তি পেত সেই ছবি হলে বসে দেখতে ভুল করতেন না তিনি।

রুলিয়া আজমের কোনো অনুযোগ-অভিযোগ নেই। নিজের গাওয়া গানগুলো বরাবরই তাকে উচ্ছ্বসিত করে। অবসরে মনে করে করে নিজের গান গাইতে ভালোবাসেন। প্রখ্যাত সুরকারদের সাথে রাতদিন কাজ করা, ইপসা-শ্রুতি রেকর্ডিং স্টুডিওতে কণ্ঠ দেওয়া-এরকম হাজারো স্মৃতি তার জীবনের মূল্যবান সম্পদ। ফিজিতে বসে গুগলে যখন নিজের গাওয়া গান খুঁজে পান তখন তিনি আরও স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠেন। গানেই তিনি এখনও খুঁজে পান প্রাণ। গানই তার ভালোবাসা।

জাহিদ রহমান



গল্প

বুলু

জহির আহমেদ

বুলু আমার এক বাল্যবন্ধু কুকুরের নাম। প্রায় দুই মাইল দূর থেকে একদিন কোলে করে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। তখন আমি আট-নয় বছরের বালক। বাচ্চা বয়স থেকে আমৃত্যু সে আমাদের বাড়িতে ছিল।

আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে চন্দনাইল গ্রাম। সে গ্রামে এক কুলুর বাড়ি ছিল। সরিষা নিয়ে গিয়ে সে বাড়ি থেকে আমরা তেল ভাঙিয়ে আনতাম। কুলুরা একটি ঘোড়া দিয়ে সারাদিন ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সরিষা পিষে তেল বের করত। ঘুরানোর সময় দুই চোখে ঠুলি পরিয়ে ঘোড়াটির চোখ বন্ধ করে রাখা হতো। খোলা থাকলে সে দেখে ফেলে যে, এক জায়গায়তেই ঘুরছে। তখন চাবুক মারলেও সে হাঁটতে চায় না।

ঘোড়াটির দুর্ভাগ্য ও কষ্ট দেখে আমার খারাপ লাগত।

কুলুর কথা মনে হলে এখন ভাবি- দুনিয়ার প্রায় সবমানুষের চোখেই কোনো না কোনো অজ্ঞতার ঠুলি পরানো আছে। তারা নিজে অন্ধ থেকে পরের পুষ্টির ব্যবস্থা করে যায়। পরের পেটে তেল ঢেলে-ঢেলে, পরের মাথায় তেল দেয়। নিজে খড়-বিচালির মতো প্রায় অখাদ্য খেয়ে, ঘুরে-ঘুরে তেল বের করে পরকে তেলতেলা করে যায়। এভাবে সারাজীবন জলের দরে তেল বেচতে-বেচতেই মানুষ একদিন মরে যায়। মূলের বা তলের খবর কিছুই পায় না।

একবার সরিষা ভাঙাতে চন্দনাইল গ্রামে গিয়ে হালকা বাদামি রঙের গুলুমুলু একটি সারমেয় শাবক দেখে আমার খুব ভালো লেগে যায়। কারণ, এই রঙের কোনো কুকুর বা বাচ্চা আমি আগে কোথাও দেখিনি।

লোভ সামলাতে না পেরে, এক আত্মীয়ের বাড়িতে সরিষাগুলো রেখে, বাচ্চাটি কোলে নিয়ে খালের পাড় আর মাঠের মাঝ দিয়ে খুশিতে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি চলে আসি। বাচ্চাটি দেখে আমার ছোট দুই-বোন শিউলি-কাকলির আনন্দ যেন আর ধরে না। আর আম্মার হাসিমুখ দেখেই বুঝেছিলাম, আমাদের আনন্দ দেখেই তিনি খুশি।

আমাদের এলাকার সবচেয়ে বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ছিলেন আমাদের বাড়ির অভিভাবক রাজ্জাক মেম্বার। তার স্বভাবছিল কঠিন। তবে তার কঠিন নজরদারির কারণেই আমাদের বাড়ির সবাই শিক্ষিত হতে পেরেছে। তখন অনেকেই রাজ্জাক মেম্বারের আদর্শ অনুসরণ করে নিজের সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

এলাকার সবাই তাকে ভয় পেত- সম্মান করত। তার একটি দোতলা ঘর

ছিল। তাই আমরা তাকে 'দোতালা ঘরের দাদা' বলতাম।
দোতলা ঘরের দাদা বুলুর বিষয়ে কিছু না বলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,
ড় সরিষা কার বাড়িতে রাইখা আইছোস?
প্রশ্ন শুনে ভয় পেয়ে আত্মীয়ের নামটি মনে করতে গিয়ে 'ওই যে..... বলে যেই আঙুল উঠালাম, দাদা বললেন,
ড় এখান থাইকা আঙুল দিয়া তুই আমারে দেখাইবিনাকি?
আমি আরও ভয় পেয়ে বললাম,
ড় কালকে গিয়া নিয়া আসবো।
তিনি আর কিছু বললেন না।
শখ করেই বাড়ির কেউ কুকুর শাবকটির নাম দিয়েছিল 'বুলু'। বুলুকে অনেকেই পছন্দ করত। আম্মা তাকে নিয়মিত খাবার দিতেন। সে আমাদের বাড়িতেই থাকত। বড় হওয়ার পর তার জোরালো হুংকারে বাইরের কুকুর বাড়িতে ঢুকতে সাহস পেত না। সে সারারাত বাড়ি পাহারা দিত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলায়ও বাড়ির বাইরে যেতো না।
১৯৭৯ সাল। আমার বয়স দশ বা এগারো হবে। আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে শাহাগোদা গ্রামে বড় চাচার শ্বশুর বাড়ি। সেখানে চাচাতো ভাই নাহিদের জন্ম হয়েছে। আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় জামাল কাকা, আনার কাকা, মোমেন কাকাসহ আমারা পাঁচ-সাতজন মিলে নবজাতকের সাত দিনের 'ছড়ির' অনুষ্ঠানে দাওয়াত খেতে যাচ্ছি। পুরো পথ জমির মাঝ দিয়ে পাঁয়ে হেঁটে যেতে হবে।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠে নেমে দেখি- বুলুও দাওয়াত মিস না করে আমাদের সাথে রওনা দিয়েছে। আমাদের সাথেই সে সাথে হাঁটছে। এক সাথে এতজনকে যেতে দেখে, সে হয়তো কিছু একটা বুঝে নিয়েছে। এছাড়া আমাদের পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যও তার থাকতে পারে। সঙ্গী হিসেবে তাকে পেয়ে আমাদেরও ভালোই লেগেছিল।
আমরা দোপায়া, সে চারপায়া। আমরা নিমন্ত্রিত, সে অনাহূত। আমরা ভদ্র, সে ইতর। পার্থক্য এটুকুই। আবার অন্যরকম কিছু পার্থক্যও আছে। যেমন : কুকুরের মতো এত প্রভুভক্তি কি আমাদের আছে?
যাহোক, দাওয়াতে গিয়ে ভালো-মন্দ খাওয়ার আমাদের যেমন অধিকার আছে, বুলুরও তেমন আছে। আমাদের মতো মাছ-মাংস-পোলাও-কোর্মা না হোক, সেগুলোর এঁটো-কাঁটা-হাড়-বর্জ্যগুলোর কিছু অংশ তো সে পেতে পারে। তাই না? সেসব থেকে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। স্বেচ্ছায় যখন সে যেতে চাচ্ছে, যাক না আমাদের সাথে।
আমাদের সাথে প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে মনের আনন্দে নাচতে-নাচতে ঠিকই সে শাহগোদা গ্রামে গিয়ে পৌঁছাল।
দুপুরে সুস্বাদু খাবার খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে-তুলতে আমরা চাচার শ্বশুর বাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে এলাম। হঠাৎ দেখি, বুলুও আমাদের সামনে হাঁটছে। এতক্ষণ তার কোন খবরই আমাদের রাখা হয়নি। দু-একবার তার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু দেখা হয়নি। কোথায় ছিল, কিছু খেতে পেয়েছে কি-না, তা-ও জানি না। তবেমনে হলো- আমাদের কাছে তার কোন অভিযোগ নেই। অনাহূত এই অতিথি হয়তো উপযাচিত হয়েই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে কোনোভাবে তার রিজিকের কিছু অংশ ভোজন করে এসেছে।
মাঘ মাসের পড়ন্ত দুপুরে আমরা খোলা মাঠের মাঝ দিয়ে হাঁটছি। মাথার উপরে রোদ। হাঁটতে-হাঁটতে মাথার রোদের চেয়ে পায়ের নিচের স্যান্ডেলই বেশি অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের এলাকার জমিগুলো পলি মাটির স্তরে-স্তরে গড়া। আর্দ্রতা প্রচুর। এই মৌসুমে তাই



সারাদিনেও মাটি গরম হয় না।
আমাদেরও খালিপায়ে হেঁটে অভ্যাস। স্কুলেও খালিপায়েই যাই। বেড়াতে যাচ্ছি বলেই আজ স্যান্ডেল পায়ে দেওয়া। আমাদের পাগুলো যেন মাটির স্পর্শ পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। হাতে স্যান্ডেল নিয়ে হাঁটাও একটা বার্ডেন। স্মার্টনেসও নষ্ট হয়ে যায়। কী আর করা যায়!
বুলুর জন্মগ্রাম চন্দনাইল পেড়িয়ে এসেছি। মজা করে কেউ একজন আমাদের কয়েকজোড়া স্যান্ডেল একসাথে একটি রশি দিয়ে মালার মতো গেঁথে বুলুর গলায় ঝুলিয়ে দিলো।
আশ্চর্যের ব্যাপার হলোড়
এতক্ষণ আমাদের পাশাপাশি হাঁটলেও, জুতার মালা গলায় ঝুলানোর সাথে সাথেই সে দৌড়াতে থাকে এবং দেখতে-দেখতেই আমাদের চোখের আড়াল হয়ে যায়। হয়তো সে বুঝে নিয়েছে, তাকে একটি কাজ দেওয়া হয়েছে। আর গন্তব্যও বেশি দূরে নেই। মাঠ পেড়িয়েই আমাদের প্রিয় গ্রাম দুবাচাইল। এখন আমাদের পাহারা দেওয়ার বা সাথে থাকার দরকার নেই।
কিন্তু আমরা একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই, জুতাগুলো সে কোথাও ফেলে যায় কি-না! কিংবা কোনভাবে খোয়া যায় কি-না।
বাড়ি পৌঁছাতে আমাদের আরও দশ-বিশ মিনিট লাগল। পৌঁছে দেখি- বুলু আমাদেরই জুতার মালা গলায় পড়ে- আমাদেরই অপেক্ষায়- উঠানে বসে আছে। কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে তার অদ্ভুতরূপ দর্শন করছে।
এভাবেই বছরের পর বছর বিশ্বস্ততার সঙ্গে বুলু আমাদের সঙ্গ দিয়ে গেছে।
বুলুর যখন বয়স বেড়ে যাচ্ছিল, গায়ের পশম কমে দিনে-দিনে দেহ মলিন হয়ে যাচ্ছিল, তার ভেঙে পড়া শরীর দেখে তখন আমার খারাপ লাগত। কোনো শক্তিশালী কুকুর তখন আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকতে চাইলে, বুলু আর আগের মতো কুলাতে পারত না। আমাদের কারও পায়ের কাছে এসে আশ্রয় নিত। জীবন সংগ্রামে আজ সে ক্লান্ত।
একদিন সম্ভবত স্কুল থেকে এসে সারাদিনেও বুলুর দেখা পাইনি। দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। খবর জানতে চাওয়ায় কে যেন বলল,
ড় বুলু মারা গেছে।
নির্বাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করতেও কষ্ট লাগছিল কখন, কোথায় মারা গেছে? তার লাশটি কোথায়?
এমনও হতে পারে, বুলু তার ব্যর্থ-দুর্বল-অসুস্থ শরীর নিয়ে আরও দিন বেঁচে থাকতে বিব্রত বোধ করছিল। আবার এমনও হতে পারে, আমি কষ্ট পাব বলে, বিধাতা বুলুর মৃত্যুর সময় আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এর মানে বুলুই আমাকে কষ্ট না দিয়ে আমার চোখের আড়ালে বা দূরে কোথাও গিয়ে নিজের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে।
বুলুর শোকে আমি কেঁদেছি। তার বিরহ-বেদনা আমাকে বহু বছর সইতে হয়েছে। আমার প্রভুভক্ত এই বাল্যবন্ধুটিকে আমি আজও ভুলতে পারিনি।



গল্প

কাক খায় কাকের মাংস

মিতা সালেহ উদদীন

শাহজাদা মাঠে বসে পা নাড়াচ্ছিল। শীতের শুরু, শিশির এখনো গাঢ় হয়ে পড়েনি, মাথার উপর খোলা আকাশ, ভোরের ঠান্ডা। পার্কের মাঠে সবুজ ঘাস, চারদিকে গাছপালা রয়েছে। দূরে একটা চায়ের দোকান আর কিছু দূরে রেস্টুরেন্ট রয়েছে। আগে সে শার্ট-প্যান্ট পরতো আর এখন পার্কে এলে খুব ভোরেই মাথায় লম্বা টুপি এবং দামি পাঞ্জাবি, পায়ে দামি জুতা পরে আসে। শাহজাদা ইদানীং পার্কে এসে সাজিদের জন্য অপেক্ষা করে। কারণ আজকাল ওর প্রকাশনা ব্যবসা মন্দা, কাজ কমে গেছে, পকেটে টাকা-পয়সা তেমন থাকে না। অভাবঅনটনের কারণে মনেও অশান্তি বিরাজ করছে। সবমিলিয়ে ঘরেও ভালো লাগছে না তার।

মনের সবকথা সে সাজিদের সাথে শেয়ার করতে পারে। তাই হয়তো সে বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছে। সাজিদও পার্কে এসে ওর কথা মন দিয়ে শোনে এবং সহানুভূতি প্রকাশ করে। সাজিদ দুঃখ

করে ওকে বলে, কেন যে তোমার এমন অভাব দেখা দিল, তোমার তো এমন থাকার কথা ছিল না। তোমার সাথে যারা প্রকাশনা ব্যবসায় নেমেছে তারা তো সবাই কোটিপতি হয়ে গেছে। তুমি কেন পারলে না। শাহজাদা অকপটে তার ব্যর্থতা স্বীকার করে।

সাজিদ বাসা থেকে এসে প্যারেডের লোকদের মতো হাত-নাড়িয়ে মাঠে শাহজাদার সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে পার্কের অন্যান্য পুরানো বন্ধুরাও এসে হাজির হতে থাকে। এবার শাহজাদা তার পুরানো অভাব-অনটনের পেচাল রেখে নতুন আফসোস-গীত গাইতে থাকে। সাজিদ শোনো, ওই খাট্টা মনসুর আমাদের মাঠের সব ফসল কাছিয়ে কুছিয়ে নিয়া গেছে, সব ফসল, একটুও আমাদের জন্য রাখেনি। এখন আমাদের কী হবে বলো। সাজিদ স্বভাবে ভীষণ চতুর । ওরা আড্ডার সবাই এক গোয়ালের গরু। সে খুব দ্রুত শাহজাদার কথা বুঝতে পারে। সে মনে করল কালকে পার্কের ঘটনা শুনে শাহজাদা এখনো আপসেট হয়ে আছে। ও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু কিসের ফসলের কথা বলছে ও। মনু আপা বসে ভাবছিল মন দিয়ে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না সে। মনু আপা ভাবল এটা তো পার্ক, এখানে আবার কিসের ফসল, আর কে-ই বা কাছিয়ে নিল? কী বলছে শাহজাদা? ওর বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে । নইলে এ সব এলোমেলো কথা সকালবেলা বলবে কেন? প্রকাশনা ব্যবসা হারিয়ে ব্যাটা সত্যি সত্যি পাগল হয়েছে। ও হাত নাড়িয়ে হতাশা ব্যক্ত করছেন সাজিদের কাছে। সাজিদ অনেকক্ষণ চুপ ছিল। পুরনো কাহিনি শুনতে আর ভালো লাগছিল না। এবার সাজিদ আড্ডা ছেড়ে পরনের শার্ট ঝাড়া দিল, ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আরে দূর দূর পেচাল বন্ধ করো, ওই ব্যাটা মনসুর কিসের ফসল নিয়েছে? ফসল তো নেয়নি, নিছে সব চিটা-চিটা-চিটা।

সাজিদ চাকরিজীবী । ও ব্যস্ত থাকে নানা কাজে। তার ফাঁকে সকালে একবার ও রাতে অফিস ফেরতের সময় প্রায় প্রতিদিন পার্কে বন্ধুদের আড্ডায় শামিল হয়। আড্ডা না দিতে পারলে সাজিদের পেটের ভাত হজম হয় না। সাজিদ ছোট সময় থেকেই আড্ডাবাজ, তার ঘরে থাকতে ভালো লাগত না। বিয়ের বিশ বছর পরেও এখনো তার চরিত্রের তেমন পরিবর্তন হয়নি। তেমনি সাজিদের সাথে যারা পার্কে গল্প করেন তারাও বেশির ভাগ এমনই। কোনো কাজ না থাকলেও পার্কে গিয়ে সাজিদ বসে থাকে, সময় কাটায়। মাঝেমধ্যে সাজিদ আড্ডা দিয়ে মনের খুশিতে পার্কের কড়ই ফুল ছিঁড়ে হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে বাসায় ফেরে। সাজিদ চাকরির পাশাপাশি লেখালেখিও করে, সাজিদ রহমান নামে । এরই মধ্যে তার আট চল্লিশটি বইও প্রকাশ পেয়েছে। শাহজাদা তার দুই-তিনটি বইয়ের প্রকাশকও , সেই সুবাদেই দুজনের পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

পনেরো বছর আগের কথা। শাহজাদা ছিল পুরনো ঢাকায়। ওর গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা। এখন অবশ্য কুমিল্লা-ঢাকাইয়্যা মিশ্রণ চালচলন ওর। পুরনো ঢাকার অলিগলি সব ওর নখদর্পণে, কোথায় সস্তায় কাঁচাবাজার, কোথায় কম বাসা ভাড়া সবই তার জানা। অল্প খরচেই পুরানো ঢাকায় ছিল দীর্ঘদিন। শাহজাদার দীর্ঘদিন কোনো সন্তান ছিল না । এক পুত্রসন্তানের জনক হয়েছে ভাগ্যক্রমে, ওর বৌ ভীষণ ভদ্র-অমায়িক-ধৈর্যশীল। গুণ না থাকলে ওর সাথে সংসার হতো মাত্র একদিনের। কারণ শাহজাদার চরিত্র ঝাঁঝরের মতো। নারীঘটিত ব্যাপারে সে বেশ পটু । প্রকাশনার টাকা সবই উড়িয়েছে নারীদের পেছনে। কম বয়সি গরিব-অশিক্ষিত-কম শিক্ষিত সমস্যাগ্রস্ত নারীদের সমস্যার সুযোগ নিয়ে দয়ালু হাতেম তাই সেজে মুক্ত হস্তে টাকা দান করতো, বাসাভাড়া, রিকশা ও সিএনজি ভাড়া দিতো, কারও ড্রেস কিনে দিতো, কারও দুপুরের বাজার করে দিতো, কারও কসমেটিকস, গহনা কিনে দিতো। এমনকি গরিব কোনো লেখিকার দুস্থতার সুযোগ নিয়ে তার বই বের করে দিতো নিজের পকেটের টাকা খরচ করে। এমনি করে খাতির জমিয়ে সে মেয়েদের সাথে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যেতো মেহমান সেজে। একবার এমন এক মেয়ের ঢাকা আগমন উপলক্ষে ছয়টি খাসি কিনে জবাই করে ফুটানি করলো, মাংস বিলালো। যখন বই বেঁচা মৌসুমী টাকা তার হাতে এসেছে তখনই সে টাকা খইয়ের মতো উড়িয়েছে। তার সাথে যারা প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করেছিল সাজিদ জেনেছে তারা সবাই প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সিরাজ একবার সাজিদকে দেখে বলেছে, জানেন সাজিদ ভাই, ওই ব্যাটা উঠতে পারেনি একটি কারণে। সেটি হলো ও মেয়েমানুষের পেছনে টাকা উড়ায় আর অপবিত্র শরীরে দোকানে বসে। তাহলে কি ব্যবসা ভালো হতে পারে বলেন?

তাই ওর ব্যবসা মন্দা। ওর নারীঘটিত কাহিনী শুধু বাইরে কেন তার বৌ সুনন্দারও জানা। কিন্তু ওকে বৌয়ের কিছু বলার সাহস হতো না। ও সুবিধার লোক নয়। বৌয়ের বাপের বাড়ি বেড়াতে গেলে খালি বাসায় এমনকি বৌ অসুস্থ থাকার সময়েও অন্য রুমে নারী নিয়ে ফুর্তি করত। সুনন্দার মা-বাবা নেই। ভাইরাও নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত, কোথাও ঠাঁই নেই জেনে কিছু বলতো না বরকে। সুনন্দা স্বামীকে ভয় পেতো বাঘের মতো। ছেলে রাকিব এখন কলেজে পড়ে। ছেলেও বাপের চরিত্র সম্পর্কে জানে। তাই যদি সকালবেলা দেখে কখনো তার বাপ দামি পোশাক পরছে, পারফিউম ব্যবহার করছে তখন ছেলে বলে, পাপা তুমি ভালো হবা না, তুমি আবারও নামছো এ পথে। তোমার এই বুড়া বয়সে লজ্জা করে না। শাহজাদার এ সব ঘটনা হয়তো এলাকার কুকুরটা পর্যন্ত জানতো আর ওর দিকে করুণার চোখে তাকিয়ে লেজ নাড়াতো। এ ক্ষেত্রে শুধু ওর দোষ কেন হবে, মহল্লার নষ্ট মহিলাদেরও কি কম দোষ? গোপনে যারা পুরুষের কাছ থেকে টাকা দামি উপহার নিচ্ছে, ফুর্তি করছে, বাসাভাড়া দিচ্ছে, অবৈধভাবে শরীরী স্বাদ মেটাচ্ছে।

সাজিদ যখনই বাসায় ফেরে তখনই ফ্রেস হয়ে রাতের খাবারের জন্য সালাদ বানায় প্রায় প্রতিদিন। এ কাজ সে ভুলে যায় না কখনই। প্রথমে ছুরি বের করে টমেটো, গাজর, শশা, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, ধনিয়াপাতা কুঁচিকুঁচি করে তারপর লবণ মাখিয়ে লোভ-নীয় সালাদ বানায়। এই ফাঁকে স্ত্রী চৈতী খাবার দেয় টেবিলে। তারপর ও খেতে বসে। সাজিদ সালাদ দিয়ে ভাত-তরকারি খেতে খেতে সকাল-সন্ধ্যার আড্ডার কাহিনী বলতে থাকে মজা করে স্ত্রীর সাথে। চৈতী কখনো সাজিদের রম্যগল্প পুরোটা শোনে আবার কখনো শোনে না। আবার কখনো বা শোনার ভান করে ঘরের কাজ করতে থাকে । এই যেমন বাচ্চাদের পড়ানো, নিজের লেখালেখি, ঘুমাতে যাওয়া। কিন্তু সাজিদ যখন তার গল্প শুরু করে তখন একচেটিয়া বলতেই থাকে। সে মনে করে চৈতী তার গল্প শুনতে বাধ্য।

পার্কের আড্ডায় অনেকেই আসেন। অনেকেই ষাটের ঊর্ধ্বে। কেউ কেউ তার সমসাময়িক বা ছোট । বয়স কারও ত্রিশ-পয়ত্রিশ-চল্লিশ এই যা। এত বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বন্ধু আড্ডায় হাসিঠাট্টায় সবাই প্রাণবন্ত। মাঝেমধ্যে মাঠে সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে খাওয়ার আয়োজন হতো। ইফতার পার্টি, জন্মদিন, পিকনিক ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দিবস, ভালোবাসা দিবস পালন করা হতো। এ ছাড়া প্রতি আড্ডায় সিঙ্গাড়া, পুরি, সমুচা, পরাটা, চা সবই খাওয়া চলত হরদম। আবার এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বান্ধবীদের নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতেও যেতো। মনু আপার বয়স ষাটোর্ধ্ব, বিধবা। মাঠে মাঝেমধ্যে চাঁদা তুলে নিজ হাতে খিচুড়ি রান্না করে সবাইকে খাওয়াতেন তিনি এবং নিজেও আনন্দ পেতেন, এতে নিঃসঙ্গতাও তার দূর হতো। তিনি অবশ্য মাঠের কলি-মলিকে দুই চোখে দেখতে পারতেন না। কারণ ওরা মনু আপাকে রেখে বন্ধুদের হাত ধরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে প্রায়ই বিরিয়ানি, রোস্ট, কাবাব খেয়ে আসে এবং পুরুষ বন্ধুদের কাছ থেকে বিভিন্ন

সময় সুবিধা নেয়। যেমন ব্যাগ, কসমেটিকস, দামি শাড়ি, জুতা থ্রি-পিচ এমনকি কাঁচাবাজারও। অবশ্য ওদের এগুলো চাইতে হতো না, বন্ধুরাই স্বপ্রণোদিত হয়ে ওদের দিতো। মলি তো দুটো পার্কে যাতায়াত করত । চন্দ্রিমা উদ্যানে সকালে আর বাসার কাছে তাজমহল পার্কে বিকেল-সন্ধ্যায়। মলি এভাবে যেতে যেতে পার্কে কিছু নিয়মিত বন্ধু পেয়ে গিয়েছিল যাদের টাকায় ওর দৈনিক হাত খরচ চলত। আর এ সব দেখে মনু আপার জ্বালা ধরত ভীষণ। ওকে কেউ ডাকে না, কিছু দেয় না এ সবআর কী। মনু আপার সবরাগ কলি-মলির ওপর। আর এ সববিষয় নিয়ে প্রায়ই মনু আপা ঝগড়া লাগায়, খোঁচা মেরে কথা বলে ওদের সঙ্গে । এমনকি সাজিদের কাছে কয়েকবার বিচারও দিয়েছে এই দুজনের নামে। কারণ সাজিদ পার্কে এসে ডিকলার দিয়েছে জোর গলায় যে কলি হলো তার ছোট বোন, এলাকার মেয়ে, ওকে কেউ কিছু বলতে পারবেনা। সাজিদ মনু আপার অভিযোগ পাত্তা দেয় না কারণ কলিকে সে ভালো জানে, সে বিশ্বাস করে, সরলভাবে, কলি এমন কাজ করতে পারে না। সে ভাবেমনু আপাই লেগে থাকে সবার পেছনে সারাক্ষণ। সাজিদ যদিও মনু আপার অভিযোগ বিশ্বাস করে না, তারপরও সাজিদ এ অভিযোগ কলি-মলির সামনে তুলে ধরে। এই তোরা নাকি পুরুষদের কাছ থেকে সব সময় গিফট নেস, অনেক দূরে বেড়াতে যাস-এটা কি ঠিক শুনছি? সাজিদের কথা শুনে দুজনে নিজেদের মধ্যে মৌমাছির প্রেমের গুঞ্জন সারে কিছুক্ষণ, তারপর বাচ্চাদের মতো খিলখিল করে হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে পড়ে যেতে থাকে । ওরা মেয়েলি ন্যাকামিতে বলতে থাকে, না সাজিদ ভাই, আমরা এমন কাজ করি না, এটা কি আমরা করতে পারি? আপনিই বলেন, আপনি তো আমাদের সবসময় দেখেন চোখের সামনে, তা হলে এ প্রশ্ন কেন করছেন? ওই মনু মাগি একটা শয়তান। ও আমাদের দেখতে পারে না । কারণ বন্ধুরা আমাদের পছন্দ করে বেশি, ওকে জিগায় না । ও হিংসা থেকে আমাদের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। সাজিদ যখনই এরকম কারও দেওয়া অভিযোগ ওদের সামনে তুলে ধরছে, তখনই ওরা জোর গলায় অস্বীকার করে । শুধু তাই নয়-চেঁচিয়ে ঝগড়া স্টাইলে এমনকি বিষয়টিকে কর্পূরের মতো উড়িয়ে দেয় যেন এটা কিছুই না। একদিন মন্টু ভাইয়ের স্ত্রী তার এক পরিচিত ভাইকে আড্ডার মাঠে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জানতে যে কলি নামে কেউ আছে কিনা বা কলি কে? কারণ মন্টু নাকি ভুলে একদিন কলির ফোন ভেবে বৌয়ের ফোনে কথা বলছিলেন, কী গো আমার টিয়া পাখি কলি, প্রজাপতি, এত ভোরে কি ঘুম ভাঙলো তোমার। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, তুমি আমার জান, কতদিন তোমার হাত ধরি না প্রাণ। এ কথা শুনে তো মন্টুর বৌয়ের কান গরম হয়ে গিয়েছিল । তারপর মন্টুকে আচ্ছামতো বকেছিল। বুইড়া ভাম, এক পা কবরে গেছে, তারপরেও বজ্জাতি যায় না।

আরেক দিনের ঘটনা । সাজিদের কাছে বারবার কল আসতে থাকে । এটা দেখে সাজিদের স্ত্রী চৈতী জিজ্ঞেস করল, কে করেছে ফোন? সাজিদ বলল, রনির বৌ। চৈতির জিজ্ঞাসা, কেন করেছে? সাজিদ বলল, রনি নাকি বৌকে না জানিয়ে কোথায় কোথায় মেয়ে মানুষ নিয়ে ঘুরতে যায়। চৈতী বলল, তা মেয়ে মানুষটা কে? সাজিদ বলল, কে আর কলি।

কলির সাথে সাজিদের ভালো সম্পর্ক। চৈতী যখন জিজ্ঞেস করে সাজিদ তখন বলে কলি হলো ছোট বোনের মতো। কলি মাঝেমধ্যে সাজিদের বাচ্চাদের জন্য চকোলেট, চিপস, মিষ্টি উপহার দিত। সাজিদ সেগুলো বাসায় আনতো। চৈতী জিজ্ঞেস করত এগুলো কে দিয়েছে? বন্ধু না বান্ধবী? কারণ চৈতী জানতো তার বর সাজিদের মধ্যেও অনেক গোপন স্বভাবরয়েছে। সাজিদ এক্ষেত্রে মিথ্যা বললেও পরে স্বীকার করেছে যে বাচ্চাদের গিফট কলিই দিয়েছে। সাজিদ কলিকে অনেক ভালো জানতো, কলি দেখতেও অনেকটা সহজ-সরল মিশুক প্রকৃতির। চৈতী ওকে একবার দেখেছেও। মিষ্টি নিয়ে বাসায় এসেছিল। ওর বড় ছেলেকে দুবছর আগে পড়াশোনার জন্য বিদেশ পাঠিয়েছে, ছোটটা দেশে কলেজে পড়ছে। কলির ছোট বোন ডলি। দুই বোনের বরই বিদেশে। ওর ছোট বোন যক্ষ্মার রোগী। উভয় বোনের আত্মীয়স্বজন কলির বাসায় বেড়াতে আসেন, কলিই তাদের দেখভাল করে। বাসার বাজার, রান্না, কোনো আত্মীয় অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, চিকিৎসা করানো এবং বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এ সবই কলি উদার মনে করে থাকে। পাশেই কলির ননদের বাসা। ননদের বাসায় ঘন ঘন গিয়ে তাকে ম্যানেজ করে। কারণ ননদ মাঝেমধ্যে কলির বরকে ফোন দিয়ে ওর নামে যা তা বলে বিচার দেন। কলি নাকি না বলে কোথায় কোথায় যায়, গভীর রাতে ভিডিও কলে কথা বলেন ইত্যাদি । এ সবঅভিযোগ শুনে আবার কলির বর ওকে ফোনে বকেন, সতর্ক করে দেন।

অনেকদিন কলি-মলি মাঠে আসে না । হঠাৎ সাজিদ কাঁচাবাজার থেকে আসতে গিয়ে দেখে ওরা দুজন নাহার রেস্টুরেন্টের সামনে এক লোকের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। লোকটি ওদের খাইয়ে আবার হাতে খাবারের প্যাকেটও ধরিয়ে দিয়েছেন। ওরাও মহানন্দে গল্প করতে করতে বের হয়। লোকটি বিদায় নেওয়ার পর সাজিদ ওদের দুজনকে হাতেনাতে ধরে। সাজিদ বলে, এই তোরা যে ওই লোকটির প্যাকেট নিলি, ও কি তোদের অনেক দিনের পরিচিত? তোরা তার গিফট নিলি কেন? ওরা সাজিদের সরল কথা শুনে এর ওর গায়ে পড়ে লুটোপুটি খেয়ে পড়ে খিলখিল করে হাসতে থাকে। ওরা রং ঢঙে বলতে লাগল, না সাজিদ ভাই, নতুন দেখা হলো মাত্র, আমাদের কী দোষ, ওই লোকটাই তো আমাদের নিয়ে এসেছে এখানে ভোরের নাশতা করাতে, আমরা তো আসতেই চাইনি। আর কেউ যদি যেচে কিছু কিনে দেয় তাহলে নেবো না কেন। ওদের মুখে এ কথা শুনে সাজিদ ভাবল তাও তো কথা, কলিও তো মাঝেমধ্যে ওর বাচ্চাদের জন্য চকোলেট, মিষ্টি, চিপস দেয় তাও তো ও নেয়, তাহলে ওদের নিতে অসুবিধা কী। সাজিদ বলল, ঠিক আছে নে তোরা, যত নিতে পারিস।

আজ সকালের আড্ডায় সবাই বলতে গেলে হাজির । কিন্তু ডানে একটু দূরে যে লোকটি বসা তাকে সাজিদ চিনতে পারছে না। লোকটি দেখতে কালো, খাটো, রুক্ষ চেহারার। সাজিদ দেখল লোকটি ভদ্রমতো পাশে বসে বসে সবার গল্প মন দিয়ে শুনছে। এত ভদ্র নম্র মানুষ সাজিদ এর আগে কখনোই দেখেনি। সাজিদ পাশে বসা শিকদার ভাইকে জিজ্ঞেস করল, ভাই ওই যে লোকটা ও কবে থেকে এখানে এসেছে? শিকদার ভাই বললেন, আরও দু-একদিন এসেছে, মনে হচ্ছে ভালো, আমাদের গল্পের সময় সিঙ্গাড়া, পুরি, সমুচা খাওয়ায় সবাইকে। ধীরে ধীরে আড্ডায় লোকটির হাতেমতাই স্বভাব বেড়ে গেল। এমনকি সবার মন কেড়ে নিল। যেখানে বিশটি সিঙ্গাড়া লাগবে সেখানে ত্রিশটি, যেখানে চা পাঁচ কাপ লাগবে সেখানে দশ কাপ। নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে আসেন আনন্দে এবং বিলান সবাইকে। সবাই ওকে খাট্টা মনসুর বলে, এই খাট্টা মনসুরই এসেছে নতুন । কিন্তু আড্ডায় ওর জনপ্রিয়তা সবার ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল। ও শুধু পুরুষের কাছে নয় আড্ডার নারীদের কাছেও অতি জনপ্রিয়। খাট্টা মনসুর একদিন নারী বান্ধবীদের সামনে কোমর দুলিয়ে নাচ দেখালো, গান গাইলো। সেদিন সাজিদ শাহজাদাও উপস্থিত ছিল। সবাই তার রংচং দেখে প্রশংসা করছিল। খাট্টা মনসুর নারীদের সামনে গান গাইল, প্রেমের আগুনে, প্রেমের আগুনে জ্বলে গেলাম সজনী গো, সে আগুন চোখে দেখলাম না, সজনী গো আমারে করলে দিওয়ানা। আর গানের সাথে নাচলো কাঁধ, কোমর দুলিয়ে হিন্দি ফিল্মের নায়কের মতো । এভাবে

পার্কের সব বন্ধুর একে একে মন জয় করে নিল সে। খাট্টা মনসুর নিজেকে পরিচয় দিল সে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, তার বেতন এক লাখ টাকার ঊর্ধ্বে। তার দুই মেয়ে এক ছেলে। দুই মেয়ের বয়স একজনের ত্রিশ অন্যজনের বত্রিশ । দুজনারই বিয়ে হয়নি। ছেলেরও চাকরি হয়নি, এটা তার বড় সমস্যা। ছেলের বায়োডাটা সাজিদের হাতে দিয়ে তিনি বললেন, সাজিদ আপনি হলেন আমার আপন ছোট ভাই। আমরা দুজনেই ঢাকাইয়া, আমরা দেশি ভাই গলায় গলায় ভাব থাকলে কোনো চিন্তা নাই। আর কলি হলো আমার ছোট বোন। একদিন মনসুর কলিকে বলল, বোইন, তোমারে আমি অনেক ভালোবাসি। কলি তো এ কথা শুনে মহাখুশি। ও যখন খিলখিল করে হাসছিল তখন খাট্টা মনসুর বসা থেকে গাছের চিকন ডাল ধরে ঝুলে পড়লো, আর তখনই হঠাৎ ডাল ভেঙে পড়ে যায় সে।

কলি যখন এই দৃশ্য দেখে আরও হাসছিলেন এবং সেই সঙ্গে দূরে বসা জমজ দুটি বোনও হাসছিলো। খাট্টা মনসুর মাঠের নারীদের বোন ডাকলেও তাদের খুব পাশে ঘেঁষে বসে এবং পারলে হাত ধরে, হাত টেপে। এতে অবশ্য কেউ কেউ কিছু মনে করে না, আবার কেউ কেউ মাইন্ড করে এবং সাজিদের কাছে বিচার দেয়। বলে, লোকটা এমন বদমাশ, লুচ্চা কেন? খাট্টা মনসুর ভালো অভিনয়ও করতে পারে মাঠে।

সাজিদের সামনে কলিকে একদিন কান্নার সুরে বললে, আইজ নয় বছর অইলো আমার আব্বা নাই, আমার আব্বারে আমি হারাইছি। কলির আপার আব্বাকে আমি আব্বা ডাকতে চাই। কলির আপার আব্বাই আইজ হতে আমার আব্বা, ও আব্বাগো। তোমারে কত দিন ধইরা দেহি নাগো। কলি আপা আমি আমার আব্বারে দেখুম, আমার মনডা ভালো নাই, কবে নিয়া যাবা তোমার বাড়ি। সাজিদ তার কথা শুনে হাসছিলেন কিন্তু এরই মধ্যে কলির মন গলে গেল। ও তাকে আশ্বস্ত করল, বললো হ্যাঁ নিয়ে যাবো।

চৈতী লক্ষ্য করল সাজিদ কখনোই কারও জন্য এত দিওয়ানা ছিল না, যা ইদানীং এই লোকটির জন্য হয়েছে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় খাট্টা মনসুর ফোন দিলেই ছুটে যেত। মনসুরও এটা সেটা সাজিদকে কিনে দিত। একদিন চৈতী লক্ষ্য করল সাইক্লোনে ১০ নম্বর সিগনাল পড়েছিল, সেই সময়ে সাজিদ বাসায় বসে কার জন্য জানি দুশ্চিতা করছিল। চৈতী জিজ্ঞেস করল- কী হয়েছে তোমার? সাজিদ বলল- মনসুর ভাই চিটাগং গিয়েছে, এখন যে ওর কী হবে! সাজিদ এই নিয়ে মনসুরের ভালো-মন্দ জানার জন্য তাকে দশ-পনেরোবার ফোন দিয়েছে। অথচ নিজের ভাই-বোন তো দূরের কথা, সাজিদের নিজের ছেলে সন্ধ্যায় কোচিং-এ গিয়েছে তাকেও ফোন দেয়নি। চৈতী সাজিদকে তা মনে করিয়ে দেয় বেশ কয়েকবার। সাজিদ চৈতীর ওপর রেগে গিয়ে বলে- এত লেগে থাকো কেন মানুষের পেছনে? বিপদে কারও ভালো-মন্দ জানা কি দোষের? চৈতী বলল- না দোষের নয়, তবে ইদানীং লোকটির প্রতি তোমার বেশি মায়া কান্না হচ্ছে। আমি তো কখনো বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত তোমার ভাই-বোনের এভাবে খবর নিতে দেখিনি। দিন যতই এগোচ্ছে, লোকটির প্রতি সাজিদের দিওয়ানা হওয়া চৈতীর ভালো ঠেকছে না । মনে হচ্ছে সাজিদ কোনো বিপদে পড়ে যাচ্ছে। তাই ওকে স্ত্রী হিসেবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া চৈতীর দায়িত্ব । সাজিদ একথা শুনে চৈতীকে বলল- হ্যাঁ লোকটি দয়ালু তবে ধূর্ত মনে হয়, এখনো ঠিক ধরতে পারছি না, কেন এত ঘনিষ্ঠ হতে চাচ্ছে, এভাবে জীবনেও কাউকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখিনি। মনসুর যে শুধু সাজিদের জন্যই খরচ করেছে তাই নয়- দুই মাসের মধ্যে তার বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে আড্ডায়। এই যেমন কলিকে তিনটি দামি উপহার দিয়েছে, নগদ টাকা দিয়েছে, রেস্টুরেন্টে নিয়ে ভালো খাবার খাইয়েছে। অন্যদিকে গোপনে মলিকে দামি থিপিছ দিয়েছে তিনটি। মুন্নীকে গোপনে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছে। শরমিনকে দিয়েছে পাঁচ হাজার। শম্পাকে বেশ কবার টাকা দিয়েছে। সাজিদের জন্মদিনে কলি-মলি সাজিদকে নিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানি খেয়েছে, ছবিও তুলেছে।

এ ঘটনা আড্ডায় কেউ যানে, কেউ যানে না। যারা যারা মনসুরের কাছ থেকে গিফট নিয়েছে, কেউ কারোটা প্রকাশ করেনি। কিন্তু মনসুর প্রাণ খুলে সাজিদকে সব বলত, তাই সাজিদ সব জানত। সাজিদও এই নিয়ে বহুবার ভেবেছে কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর মেলাতে পারেনি। খাট্টা মনসুর কেন এতসব দিচ্ছে আড্ডার সবাইকে। কী কারণে? একদিন মনসুর অসময়ে সাজিদকে ফোন দিল। তখন রাত এগারোটা বাজে। বলল- ছোট ভাই, আমার মারাত্মক জ্বর, কাল পার্কে আসতে পারব না। বাসায় দেখতে আসেন একটু। চৈতী শুনে রাগ করল সাজিদের ওপর। চৈতী বলল- ওই লোকটির বাসায় যেতে হলে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। এটা শুনে, সাজিদ যাওয়া বন্ধ করল। শীতের সকাল। অনেকদিন হঠাৎ মনসুরের দেখা নাই। সাজিদের সাথে যোগাযোগ নেই। সাজিদ পার্কে বসে চিন্তা করছিল যে, যে মনসুর এত দিন সকাল-সন্ধ্যা তাকে ফোন দিত, সেই চেনা মুখ মনসুরের আজ খোঁজ নেই পনেরো দিন যাবত। এর কারণ কী হতে পারে? একদিন এই ছোট ভাইকে না দেখে যে থাকতে পারত না, মাঝে মাঝে খাওয়াতো, হাসতো হাসাতো এখন ভেবে সব খটকা লাগছে। সাজিদ পার্কে বসে ভাবলো কলিকে একটা ফোন দিই দেখি ও মনসুরের খবর জানে কি না। সে কী, কলির সিম তো বন্ধ। এবার সাজিদের টনক নড়ল। সাজিদ ভাবল অন্য কথা, তাহলে কী গোপনে ওরা দুজন যোগাযোগ রাখছে, তা কেন হবে? কী এমন হলো? এমনটা কি হতে পারে? না হওয়ারই বা সম্ভাবনা কী আছে? এ দুনিয়ায় অঘটনই তো ঘটে থাকে বেশি । এ সব নানা দুশ্চিতা তাকে সাময়িক গ্রাস করল। সাজিদ চৈতীর কথা মনে করল, চৈতী সবসময় লোকটি সম্পর্কে নেগেটিভ বলেছে, লোকটি ভালো নয়, লোকটি অতি ধূর্ত, ভণ্ড। ওর গিফট নিও না; কিন্তু কোনো কথাই সাজিদ বিশ্বাস করেনি। সাজিদ ভাবল, তা হলে কি কলির সর্বনাশ হবে!! তা হলে কি কলির নতুন ফোন সেট মনসুরই কিনে দিয়েছে? পরিবর্তন করিয়েছে সিম, যাতে মাঠের কেউ ওর সঙ্গে কথা বলতে না পারে।

সাজিদ এরই মধ্যে শুনেছে ওর এক বন্ধুর কাছে, মনসুর-কলি নাকি একসাথে হাত ধরে চন্দ্রিমা উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাজিদ ভাবছে মনসুর না হয় টাউট এমনটা করতে পারে কিন্তু কলি মহিলা হয়ে কেন এমনটা করবে। সাজিদের মনে পড়ল শিকদার ভাইয়ের কথা, শোনেন সাজিদ, আপনাকে একটা কথা বলি, ওই দুজন নারী কলি-মলি, ওরা হলো পুরুষ খেকো। সাজিদ পার্কে বসে শুধুই ভাবল, এতদিন যে মনসুর এখানে এলো, খাওয়ালো, মন জয় করল, গিফট দিল, পৃথিবীতে তাহলে কেউই স্বার্থ ছাড়া নড়ে না। চৈতীর কথা আবারও স্মরণ হলো, মনে রেখো খাট্টা মনসুরের কাছ থেকে কলি যা নিয়েছে সুযোগ পেলে মনসুর সুদে-আসলে আদায় করে ছাড়বে।

এবার সাজিদের পার্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় হলো। সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটতে শুরু করল, দেখল ভাগাড়ের পাশে কাকের জড়ো হওয়া, কা কা ঝগড়া-ঝাটি। ওর মনে হলো নর্দমার ময়লা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে কিন্তু কাছে এসে চোখ পড়তে অবাক কাণ্ড এ কী হচ্ছে? কাকের মরা দেহ নিয়ে কাকেরাই টানাটানি করছে!!! এমন তো হওয়ার কথা নয়!! কাক তো কখনো কাকের মাংস খায় না । তাহলে আজ কেন খাচ্ছে? কাকেদের ঝগড়া, তিক্ততা আর অসহ্য জ্বালা নিয়ে সাজিদ বাসায় ফিরল।



সংস্কৃতি

সব্যসাচী শিল্পী হাসান জাহাঙ্গীর

স্নিগ্ধা পাল নূপুর

সংস্কৃতি অঙ্গনে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে প্রতিনিয়ত আলো ছড়াচ্ছেন সব্যসাচী শিল্পী হাসান জাহাঙ্গীর। তিনি মননে ও চেতনায় একজন খাঁটি বাঙালি এবং বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার চরখাগরিয়া গ্রামে হাসান জাহাঙ্গীর জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আলহাজ আহমদ নবী একজন ব্যবসায়ী এবং মা বিলকিস সোলতানা গৃহিণী। স্ত্রী দিলরুবা খানম একজন জনপ্রিয় উপস্থাপক, নাট্য-আবৃত্তিশিল্পী ও লেখক। হাসান জাহাঙ্গীর একজন বরেণ্য আবৃত্তিশিল্পী, সংগীতশিল্পী ও নাট্য নির্দেশক। সেই সঙ্গে একজন সুঅভিনেতা। ছোটবেলা থেকেই সংগীত, আবৃত্তি, অভিনয়ে তার একনিষ্ঠ পদচারণা। শৈশবেই বিভিন্ন স্কুল ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে অর্জন করেছেন অসংখ্য পুরস্কার। সব্যসাচী শিল্পী হাসান জাহাঙ্গীর বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত আবৃত্তিশিল্পী, সংগীতশিল্পী, অনুষ্ঠান ঘোষক, সংবাদ পাঠক ও নাট্যশিল্পী। বাংলাদেশ বেতারে কোনো শিল্পীর পাঁচটি বিষয়ে তালিকা ভুক্তিই প্রমাণ করে, কতটা মেধাবী ও পরিশীলিত শিল্পী তিনি। শিল্পচর্চা তার মজ্জাগত। বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিয়মিত সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন তিনি। সুমিষ্ট ও বলিষ্ঠ কণ্ঠশৈলীর কারণে বহু বিজ্ঞাপন ও প্রামাণ্যচিত্রে সুনামের সঙ্গে কণ্ঠস্বর প্রদান করেছেন। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পত্রিকায় ও মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে তার পরিবেশনা নিয়ে প্রশংসাসূচক লেখা ও সংবাদ। এ বছর কলকাতা আকাশবাণী মৈত্রীতে প্রচারিত হয়েছে তার সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান 'ওপারের অতিথি'।

দুই বাংলার সুপরিচিত জনপ্রিয় আবৃত্তিশিল্পী হাসান জাহাঙ্গীর। তার নির্দেশিত আবৃত্তি প্রযোজনা ও শ্রুতি নাটকের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। তার নির্দেশিত প্রযোজনাগুলোর মধ্যে ছন্দে জাগুক আগামী প্রহর, শোনো আহ্বান, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, হাসিমুখে বাজাই বাঁশি, ভাষার লড়াই, ঝরা পাতা পুরনো পাতা, বৃষ্টিগাথা, মুক্তির সুর, একটি কণ্ঠ বজ্রকণ্ঠ, শুভেচ্ছা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তার লেখা রম্য শ্রুতি নাটক 'উচ্চারণ বিভ্রাট' আবৃত্তিপ্রেমী শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। এ ছাড়াও লাভ থেরাপি, হেয়ার এইড, পিতরি প্রীতিমাপন্নে, দূরভাষিণী প্রভৃতি তার নির্দেশিত উল্লেখযোগ্য শ্রুতি নাটক। স্বতন্ত্র, বৈচিত্র্যময় ও ব্যতিক্রমী নির্দেশনার কারণে প্রতিটি প্রযোজনা হয় দারুণ উপভোগ্য। তার রচনা গ্রন্থনায় গীতিকাব্য প্রযোজনা 'বঙ্গবন্ধু : ভালোবেসে হৃদয়ে রেখেছি' মঞ্চে এনেছে বাচিক সংগঠন কণ্ঠশীলন। এই প্রযোজনাটি হয়েছে বহুল প্রশংসিত ও দর্শকনন্দিত। দীর্ঘ সময় ধরে বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে প্রমিত উচ্চারণ ও আবৃত্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রিয় প্রশিক্ষকে পরিণত হয়েছেন। দেশের বাইরে ভারতের কলকাতা, পুরুলিয়া, ধর্মনগর, আগরতলায় বিভিন্ন মঞ্চে আমন্ত্রিত আবৃত্তিশিল্পী হিসেবে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন। কলকাতার এক মঞ্চে উপমহাদেশের খ্যাতিমান আবৃত্তিশিল্পী প্রদীপ ঘোষ আবৃত্তি পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন। ২০১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দর্শনীর বিনিময় একক আবৃত্তি অনুষ্ঠান 'তুমি আসবেবলেই' শ্রোতাদের মন কেড়ে নেয়। আবৃত্তিতে পেয়েছেন বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ আয়োজিত, বঙ্গবন্ধু জাতীয় আবৃত্তি উৎসবে আবৃত্তি সম্মাননা স্মারক, বিনোদনের রঙ্গ আবৃত্তি সম্মাননা, বর্তমান কথা ও শুভেচ্ছা নিউজ সম্মাননা, পাক্ষিক খবরিকা আবৃত্তি সম্মাননাসহ বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা। তবে স্মরণীয় হয়ে আছে কলকাতার এক সভাগৃহে 'আত্মজন' এর রবীন্দ্র-নজরুল আবৃত্তি সন্ধ্যায় প্রদীপ ঘোষের সঙ্গে একই মঞ্চে আবৃত্তি সম্মাননা গ্রহণের বিষয়টি। আবৃত্তি পরিবেশনায় হাসান জাহাঙ্গীরের রয়েছে স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গি, পরিশীলিত উচ্চারণ ও চমৎকার স্বর প্রক্ষেপণ। তার বলিষ্ঠ ও সুকণ্ঠের ওঠানামায় ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত এবং তৈরি করেছেন নিজস্ব শ্রোতাকূল। সোশাল মিডিয়ায় রয়েছে তার শ্রোতানন্দিত বহু আবৃত্তির ভিডিও।

শৈশবে সংগীতের সারেগামা শিখেছেন বিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষক বাবু স্বপন চক্রবর্তীর কাছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েছেন চট্টগ্রাম সংগীত পরিষদ থেকে। বিভিন্ন সময় ওস্তাদ স্বর্ণময় চক্রবর্তী, সংগীত পরিচালক মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং ছৈয়দুল হকের কাছে সংগীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রথম মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম 'রূপের কারিগর' নিয়ে শ্রোতাদের সামনে হাজির হন খ্যাতনামা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সংগীতার ব্যানারে ২০০৪ সালে। দ্বিতীয় মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম 'স্বপ্ন স্বপ্ন' ২০১০ সালে এবং তৃতীয় মিউজিক অডিও অ্যালবাম 'মনপাখি' ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়। তিনটি অ্যালবামেই কণ্ঠ প্রদানের পাশাপাশি সবকটি গানে সুরারোপ করেছেন শিল্পী নিজেই। আবার তিনটি অ্যালবামের অধিকাংশ গান লিখেছেন তিনি। সম্প্রতি আরও একটি মিউজিক অডিও অ্যালবাম প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এর মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে ইলেকট্রনিক এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে অনেকগুলো মিউজিক ভিডিও। ২০২১ সালে মুজিববর্ষে প্রকাশ করেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসাধারণ একটি গান 'কোটি কোটি মানুষের একটি শ্লোগান'। চমৎকার লোকেশনে ধারণকৃত এই মিউজিক ভিডিওটি বিটিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকপ্রিয়তা পায়। চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মুক্তমঞ্চে 'যদি নীল দাও' শিরোনামে, আনন্দী সংগীত একাডেমির আয়োজনে টিআইসি মিলনায়তনে, নাগরিক সমাজের ব্যানারে সাত রাস্তার মোড়সহ বিভিন্ন মঞ্চে একক সংগীত পরিবেশনায় অংশ নিয়ে মাতিয়েছেন সহস্র দর্শক।

গ্রুপ থিয়েটার চর্চার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত শিল্পী হাসান জাহাঙ্গীর। তার অভিনিত মঞ্চনাটকের সংখ্যা আটটি। 'দুই বিঘা জমি' নাটকে উপেন চরিত্রে, রাজারানী নাটকে রাজার চরিত্রে এবং অপেক্ষা নাটকে রাজাকারের চরিত্রে অনন্য অভিনয়ের জন্য পেয়েছেন প্রশংসা। নির্দেশনা দিয়েছেন প্রতিনিধি নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত 'সলিডশন এক্স', 'রাজারানী' এবং 'অপেক্ষা' নাটক।

হাসান জাহাঙ্গীর একজন দক্ষ সংগঠক। বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি কার্যকরী পরিষদে যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে। তার সাংগঠনিক পরিচয় সভাপতি, শব্দনোঙর আবৃত্তি সংগঠন; সাধারণ সম্পাদক, প্রতিনিধি নাট্য সম্প্রদায়; সভাপতি, সম্মিলিত আবৃত্তি জোট চট্টগ্রাম; নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ এবং দলপ্রধান, জাগরণ সংগীত দল। নিজের আবৃত্তি সংগঠনের অসংখ্য অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আয়োজন করেছেন তিনটি বৃহৎ বর্ণাঢ্য আবৃত্তিমেলার। বিশেষ করে মুজিববর্ষের ঠিক আগে ২০১৯ সালে আয়োজন করেন দেশে সর্বপ্রথম তিন দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি মেলার যেখানে ভারত বাংলাদেশের ১০০ জন আবৃত্তিশিল্পী বঙ্গবন্ধুকে নিবেদন করে আবৃত্তি পরিবেশন করেন। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী, সদালাপি, সাধক এই শিল্পী সম্পর্কে বরেণ্য চলচ্চিত্রাভিনেতা ও সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান (চিত্রনায়ক ফারুক) লিখেছেন, 'আত্মপ্রচারের এই যুগে তার মতো মেধাবী, রুচিশীল ও নিভৃতচারী শিল্পসাধক কমই চোখে পড়ে। গলায় সুর আছে বলেই ওর কণ্ঠের আবৃত্তি কেবল আবৃত্তি থাকে না, শ্রুতিমধুর শিল্পে পরিণত হয়। এখানেই তার সার্থকতা।' স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত শব্দসৈনিক ও বরেণ্য আবৃত্তিশিল্পী আশরাফুল আলমের মন্তব্য,' মেধাবী এই অনুজ স্বভাববিনয়ী, দক্ষ সংগঠক, মৃদুভাষী। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় যে কয়জন অনুজ আবৃত্তিশিল্পের প্রসারে নীরবে নিরলস শ্রম দিচ্ছেন প্রিয় হাসান তাদের একজন'। ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাস করা এই শিল্পী শিল্পচর্চার পাশাপাশি পেশাগত জীবনে খাদ্য বিভাগের একজন সরকারি কর্মকর্তা।

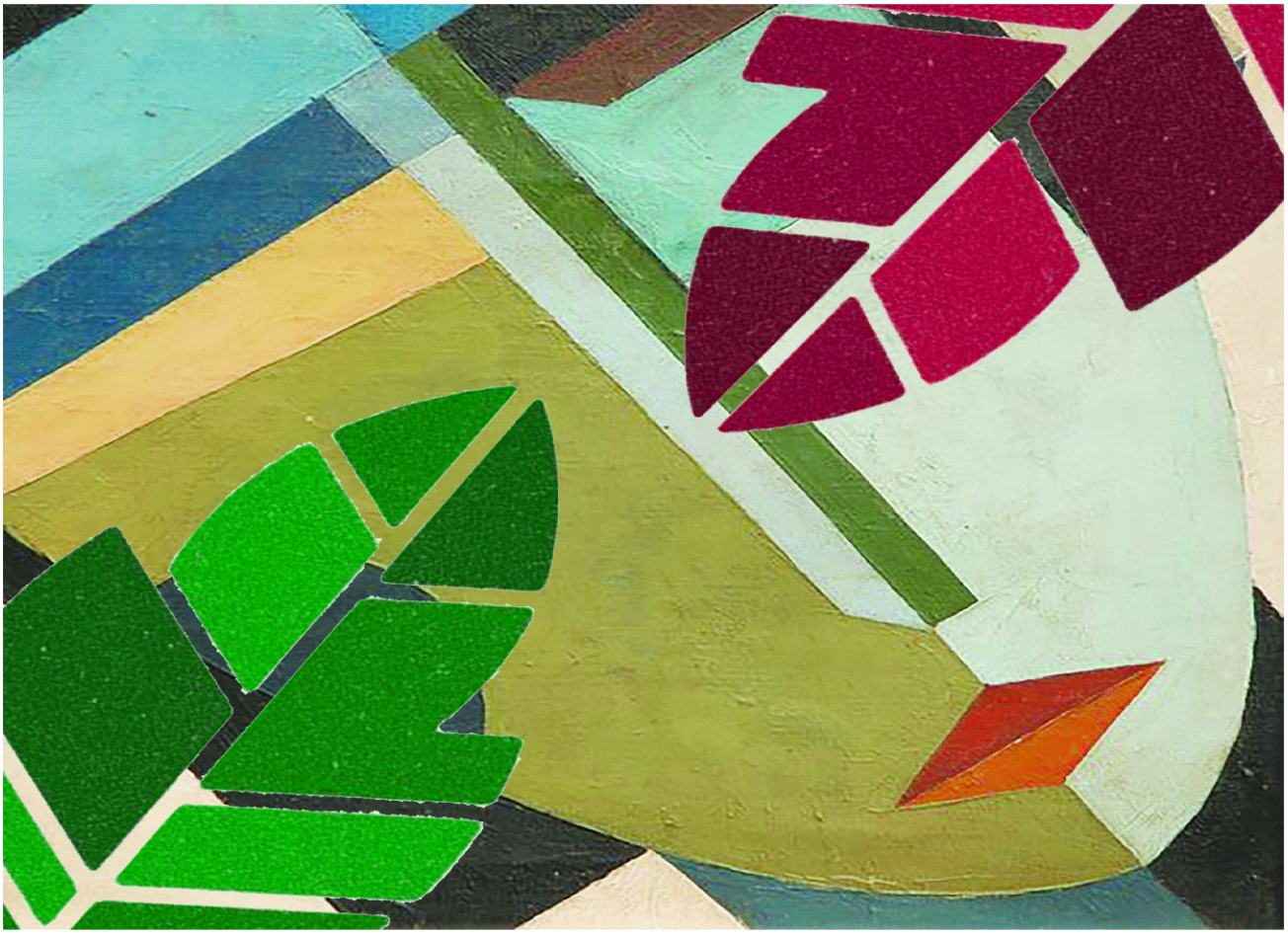

মাটির মেয়েটি

মূল- ইসাবেল আইয়েন্দে
ভাষান্তর- মিরন মহিউদ্দীন

অনুবাদ গল্প

প্রকৃতি মাঝেমধ্যে এরকম হয়ে যায়। এরকমই ভয়ংকর। তখন অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া মানুষের আর কোনো দ্বিতীয় রাস্তা থাকে না। অথচ আগাম সতর্কতা যে ছিল না, তা নয়। যখন ভূগর্ভস্থ পাথরে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল তার ফোঁপানি সমেত একটা তীব্র ঝাঁকুনি অনুভব করেছিল এলাকার সবাই। কাপাস তুলোর খেতগুলো প্রবল বেগে দুলতে দুলতে কাদার মতো বমি উগরাচ্ছিল হরদম। একটা ভয়ংকর কিছু হতে যাচ্ছে, খবর পেয়ে ভূবিজ্ঞানীরা সেখানে সিসমোগ্রাফ যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছিল কয়েকদিন আগেই। পাহাড়টা বোধহয় আবার জেগে উঠবে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা থেকে। তার জেগে ওঠা মানেই তীব্র অগ্ন্যুৎপাতে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে তাপমাত্রা। এই তাপের ফলে পাহাড়ের সমস্ত বরফ গলে জল হয়ে নেমে আসবে হড়পা বানের মতো। তখন কী হবে? এই আতঙ্ক ও জিজ্ঞাসা থেকেই সকলকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেউই কান দেয়নি সে কথায়। সবাই ভেবে নিয়েছিল এ সব নেহাতই গুজব, ভয় দেখানোর কৌশল। উপত্যকা শহরের মানুষ যথারীতি তাদের অফিস যাচ্ছিল, হাটবাজার করছিল। রাতে আহার ও মৈথুনেও কোনো শৈথিল্য ছিল না, নিরুৎসাহ ছিল না। সকালে বাচ্চাদের যথারীতি স্কুলে পৌঁছে দিচ্ছিল নিত্যদিনের মতোই। পাহাড়ের বুকে অথবা ভূগর্ভস্থ পাথরে কখনও অল্পস্বল্প কাঁপন জাগলো তাকে পাত্তা দিচ্ছিল না। না শোনার ভান করে এগিয়ে যাচ্ছিল নিজেদের রুটিন কাজগুলোর দিকে। ততক্ষণই এগিয়েছে যতক্ষণ না নেমে এসেছে সেদিনের সেই ভয়ংকর রাত। হ্যাঁ, সেই বিভীষিকাময় রাতে পৃথিবী যেন নিজেরই ধ্বংস ঘোষণা করেছিল প্রচণ্ড শব্দে। আগ্নেয়গিরি তপ্ত লাভা ও ম্যাগমা ছুড়তে শুরু করে দিয়েছিল তীব্র আক্রোশে। বিস্ফোরিত অগ্নিগিরির তাপবিচ্ছুরণে পাহাড়ের বরফ গলে গিয়েছিল। পাথরের ধস নিয়ে নেমে এসেছিল কাদার নদী। এই কাদার মহাপ্লাবনে ডুবে গিয়েছিল গোটা গ্রাম। পৃথিবীর উগরে দেওয়া মর্মান্তিক বমির কবরে চাপা পড়ে গিয়েছিল কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ। যারা প্রাণ

হাতে নিয়েও কোনোরকমের বেঁচে ছিল, এক বোধশূন্য আতঙ্কের ভেতর তারা কি দেখতে পাচ্ছিল প্রিয়জন, ঘরবাড়ি, সাদা তুলোর আবাদভূমি, সন্তানের অসহায় হাত?

অনেক দেরিতে যখন জীবিতদের উদ্ধার করতে সেনা ও স্বেচ্ছাসেবীরা গাঁয়ে এলো। তার অনেক আগেই কীভাবে যেন বাতাস থেকে খবরটা পেয়ে গিয়েছিল রোফ কার্লে। ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ভোরেই। আমরা কফি খাচ্ছিলাম এক সঙ্গে। কফি খেতে খেতে রোফ বলছিল- তুমি কোনো শব্দ পাচ্ছো?

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলাম, না তো।

রোফ বলেছিল, কান পাতো ঠিক শুনতে পাবে।

আমি মাথা নাড়ছিলাম অসহায় ভাবে।

তাহলে হয়তো বিভ্রম হবে, কিংবা রাতের স্বপ্নটা এখনও চাপ হয়ে সেঁটে আছে আমার গায়ে।

রোফের শান্ত উদাসীন গলা।

কী স্বপ্ন? নিছক কৌতূহল থেকেই বলেছিলাম।

কেউ যেন কাঁদছে...রোফ পুরো স্বপ্নটা বলতে পারেনি। তার আগেই জরুরি ফোনটা এসেছিল। সে শুধু শুনে যাচ্ছিল অন্যপ্রান্তের কথা, কিছু বলছিল না। কিন্তু তার মুখের রং বদলে যাচ্ছিল একটু একটু করে। দু'মিনিটও নয়, তার মধ্যেই রেডি হয়ে গিয়েছিল রোফ। রেডি বলতে ওর সবুজ ব্যাকপ্যাকে দরকারি কিছু জিনিস ভরে নেওয়া। আমাকে বলেছিল, বিদায় দাও এবার।

বিদায়! আমি যেন থমকে গিয়েছিলাম। কী হয়েছে?

এক ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে, আমাকে এখনই ঘটনাস্থলে যেতে হবে। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে সবগল্প করব। যেখান থেকে শুরু করেছিলাম গল্পটা ঠিক সেখান থেকেই।

রোফ বেরিয়ে যাওয়ার পর কিছুই ভালো লাগছিল না আমার। চুপচাপ বসে ছিলাম। একসময় টিভি খুলে দেখলাম অবাক করা কাণ্ড। থকথকে কাদার ভেতর আটকে আছে একটি মেয়ে। শুধু মাথাটা কোনোরকমে বাইরে বের করে রেখেছে। সেটা যে মানুষের মাথা তাও সহজে চেনা যায় না। মাথার ওপর উড়ছে কয়েকটা শকুন। তারা যেন খাদ্যের গন্ধ পেয়ে গেছে এখানে। মেয়েটির কাদা মাখা মাথাটাকে মনে হচ্ছিল কালো হাঁড়ির মতো। চারদিকে অজস্র অনাথ, আহত, আর্ত মানুষের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছিল বাতাস, যা ঢেকে দিচ্ছিল মেয়েটির নিঃশব্দ সাহায্য প্রার্থনা। জীবন হাতে নিয়ে বেঁচে থাকার এই নির্জন লড়াইয়ে রোফ তার কাছে পৌঁছে গেছে দেখে মন ভরে উঠল আমার।

মেয়েটি তার নাম বলল আসুসেনা। যার বাংলা মানে হয় শালুক ফুল। এই থকথকে কাদার ভেতর প্রাণ আঁকড়ে সে যেন শালুক ফুলের মতোই বেঁচে আছে। তার চোখ থেকে ঝর ঝর করে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের মতোই ঝরে পড়ছে নিঃশব্দ কান্না। মেয়েটির উদাসীন চোখের গভীরে কোথাও যেন জীবনের পিপাসা রয়েছে। তিরিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটি দৃশ্য চোখের সামনে থেকে আছে রোফের। অবিকল সেই দৃশ্য। যেন সে নিজেই আটকে আছে কতগুলো চোখের উদ্যত আক্রোশের সামনে। রোফ ধীর গলায় ডাকল-আসুসেনা। নড়াচড়া করো না একদম। বরং তুমি যা ভাবছো, সেই গল্পগুলো বলে যাও আমায়। সে মেয়েটির বিপন্নতা ভুলিয়ে দিতে চায়। তার নিরুচ্ছ্বাস মুখ ঘুরিয়ে দিতে চায় জীবনের দিকে। কেউই এখনো তার কাছে এসে পৌঁছাতে পারেনি। টিভির পর্দায় তার ক্যামেরা সহযোগীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি ভেসে উঠছিল। সেই কাদাপ্রান্তরের ভেতর হাঁটু মুড়ে বসে আছে রোফ। তার চারদিকে নারকীয় ধ্বংসস্তূপের ভয়াবহ ছবি। টিভির জগতে সুপরিচিত মুখ কার্লে রোফ। বহু বছর ধরে আকস্মিক দুর্ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার পরিবেশনায় তার কোমল এবং প্রত্যয়ী কণ্ঠের সাথে যাদের পরিচয় তারা জানে 'রোফ মানেই দুঃসাহসী খবর। কিন্তু বাস্তবে মানুষটা চুপচাপ কিছুটা ভীতুও। শুধু ক্যামেরা হাতে নিয়ে খবরের জগতে পা রাখলেই কেমন বদলে যায় সে। তখন ভয় ওকে স্পর্শ করতে পারে না। যদিও সে আমাকে অনেকবার বলেছে, বিশ্বাস করো, আমি তোমার চেয়েও ভীতু, আমি অসহায় ভীরু। কিন্তু ক্যামেরার লেন্স আমাকে কেমন যেন অন্যরকম করে দেয়। মেয়েটিকে যে ক্যামেরাম্যান প্রথম খুঁজে পেয়েছিল, সেও সেভাবে তাকে তুলে ধরতে পারেনি। রোফই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে থকথমে কাদার মধ্যে নেমে, যেখানে চোরাবালির সম্ভাবনা প্রবল, তাকে তাচ্ছিল্য করে মেয়েটির প্রায় কাছাকাছি এগিয়ে আসে। ক্যামেরা জুম করে মেয়েটির মুখ থেকে অন্ধকার সরিয়ে দেয়। আস্তে খুব ধীরভাবে একটা শক্ত দড়ি ছুড়ে দেয় মেয়েটির দিকে। কিন্তু সে দড়ি ধরার চেষ্টা করল না প্রথমে। সবাই চেঁচিয়ে বলল- তুমি দড়িটা ধরো, আসুসেনা। সে ধীরে ধীরে একটি হাত বাড়ালো দড়ির দিকে। কিন্তু জমাট কাদার অদ্ভুত চোরাবালিতে আটকে থাকা হাত বের করতে গিয়ে আরও তলিয়ে গেল মেয়েটি। রোফ কার্লে তার ব্যাকপ্যাক মাটিতে নামিয়ে রেখে সন্তর্পণে থকথকে আরও গভীর কাদার ভেতর নেমে গেল। কাদার ভেতর পচা লাশের গন্ধ। বমি আসছে, কিন্তু তাকেও উপেক্ষা করে রোফ বলল-দড়িটা শক্ত করে ধরে থাকো, আসুসেনা। ভয় নেই, আমি আছি তোমার সামনে। দড়িটা নিজের শরীরে জড়িয়ে একটা গিঁট দিল রোফ আর অন্যপ্রান্তে বেঁধে নিল আসুসেনাকে। জোরে টান দিলে এবার কাজ হবে ভেবে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। কিন্তু না, অঙ্কটা যত সহজ ভেবেছিল সে ততখানি সহজ নয়। দড়িতে টান পড়ার সাথে সাথেই সুতীব্র চিৎকারে কঁকিয়ে উঠল আসুসেনা। তার শরীর কিছুটা এগিয়ে এলেও পা দুটো যেন জড়িয়ে আছে অদ্ভুত শিকড়ে।

কোথায় আটকে আছে মেয়েটি?

একজন বলে উঠল, ওর পা দেওয়ালের নিচে চাপা পড়ে আছে, কিংবা কোনো শক্ত পাথর...

আসুসেনা বলে উঠল, শুধু দেয়াল বা পাথর নয়, মানুষের টানের চেয়েও বেশি। আমার ভাইবোনের লাশ ধরে আছে আমার দুটো পা।

চিন্তা করো না আসুসেনা, তোমাকে এখান থেকে বের করে আনবই। রোফ কার্লের দৃঢ় প্রত্যয়ী গলায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কথাগুলো। এই মুহূর্তটিতে আমার খুবভালো লেগে গেল। মনে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। রোফ এদিক-ওদিক নানারকম সরঞ্জাম খুঁজতে লাগল। আর ভাবতে লাগল কোনো প্রযুক্তি দিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করা যায়। একটা লাঠি কুড়িয়ে পেয়ে তাকেই লিভারের মতো ব্যবহার করল কিন্তু সন্তোষজনক কোনো ফল পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীর সাহায্যের জন্য সে প্রার্থনা করল। কিন্তু তারা কেউ তার কথা শুনতে চাইল না। তারা ছুটে গেল আরও অনেক বিপন্ন মানুষের দিকে। এই ব্যর্থ আবেদন বিভ্রান্ত চিৎকার আর মৃতদেহের দুঃসহ গন্ধে কোথায় মিলিয়ে গেল তারা। রোফ বুঝতে পারছিল মেয়েটির জন্য বরাদ্দ বাতাস কমে আসছে ধীরে ধীরে। কিন্তু আসুসেনার চোখে-মুখে তার কোনো ছাপ নেই। যেন তার কোনো তাড়াহুড়ো নেই। সে যেন অনন্ত অপেক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই কাদার মরুভূমিতে। জনতার মধ্য থেকে কেউ একজন নিয়ে এলো একটা সাইকেলের টায়ার এবং একটি চৌকি। চৌকিটাকে কাদার মধ্যে বসিয়ে সাইকেলের টায়ার মেয়েটির দুবাহুর মধ্যে পরিয়ে একটা মরিয়া চেষ্টা করল রোফ। এতেও লাভ কিছু হলো না। বরং সারা গায়ে-মুখে কাদার আবরণ পড়ে গেল। কী করা যায়? জেদ যেন চেপে বসেছে রোফের মাথায়। পাম্প দিয়ে সমস্ত কাদা শেষ করে দিলে মেয়েটিকে উদ্ধার করা বোধ হয় সহজ হবে। ভাবতে ভাবতে যেন একটা আশার আলো দেখতে পেল রোফ।

তোমরা যেভাবেই হোক আমাকে একটা জলপাম্প এনে দিতে পারবে? জিজ্ঞাসা নয়, মিনতির সুরে হাত জোড় করে যেন কথাগুলো বলল রোফ।

জল পাম্প! সে তো আজ রাতে আর সম্ভব নয়, কাল সকালে আমরা ঠিক জোগাড় করে আনব।

একক্ষণ অপেক্ষা করে থাকলে বোধহয় পৃথিবীর বাতাস শেষ হয়ে আসবে। অসহায়তা থেকে চিৎকার করে কথাগুলো বলল রোফ। আসলে সেও যেন বন্দি হয়ে গেছে তার সীমাবদ্ধ বাস্তব জ্ঞানের কাদায়।

অন্ধকার নেমে আসছিল দ্রুত। একজন ডাক্তার তার মধ্যেই আসুসেনাকে দেখে গেছে। তার হার্ট ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। আজ রাতটা পেরিয়ে যাবে।

আসুসেনা বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবেনা তো রোফ?

না, আসু। বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, আমি নিজেও তো বন্দি হয়ে আছি তোমার মতো...তারপর ফ্লাস্ক থেকে চা বের করে চামচ দিয়ে ওর মুখে ঢালতে লাগল রোফ। আসুসেনা যেন তৃপ্তি অনুভব করল। তার চঞ্চলতা ফিরে এলো নিমেষে।

আজ সারা রাত এই কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা জীবনের গল্প করব আসুসেনা।

সত্যি?

সত্যি তাই, তুমি শুরু করো বলতে।

আসুসেনা তার ছোট্ট জীবনের গল্প শোনাতে লাগল রোফকে। তার তেরো চৌদ্দ বছরের জীবন। সে বলতে লাগল তার বাবা, মা, পরিবার, ভাই বোনের কথা। অগ্নিগিরির বিস্ফোরণের আগে কেমন ছিল তাদের প্রতিদিনের ঘর-সংসার। নিজের গাঁয়ের বাইরের জগৎ সে দেখেনি। সে বলতে লাগল তার ছোট বৃত্ত। বলতে লাগল টুকরো টুকরো কথা।

এবার তোমার গল্প বলো রোফ। মাটি মাখা

মেয়েটি যেন জীবনের এক আশ্চর্য দ্বীপ খুঁজে পেয়েছে এভাবে কথাগুলো বলল। রোফ তাকাল কাদার দিকে যেখানে আটকে আছে প্রাণের স্পন্দন। আরও গভীরে যেখানে হাজার হাজার মৃতদেহ স্তূপ হয়ে রয়েছে কাদার ভিতরে। সেই স্তূপ থেকে তুলে মৃত গ্রামদেশের ভেতর থেকে তুলে আনতে হবে একটি মেয়েকে, তার গল্পকে হতে হবে ঠিক সেরকমই প্রাণদায়ী উদ্দীপক। রোফ শোনাতে লাগল তার রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের বিচিত্র কাহিনী। সবতার জীবনে ঘটেনি। সে নানা রং দিয়ে জীবন্ত করে তুলতে লাগল কল্পিত জীবনের আখ্যান, যা বাস্তবজীবনের চেয়ে আরও বেশি আকর্ষণীয় আরও শক্তিশালী।

বহুদূরে এক নিভৃত নির্ঘুম রাতে আমি দেখছিলাম এই ঘটনার ইথারবাহিত প্রতিচ্ছবি। মেয়েটির অসহায় মুখ আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল। আমি কিছুই করতে পারছিলাম না ওদের জন্য। তীব্র ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমি যেন কোনো এক মৃত নক্ষত্রের আলো খুঁজছিলাম, আর নিরুপায় ভাবে দেখে যাচ্ছিলাম স্বজন হারানো সারিবদ্ধ মানুষের জলের হাহাকার। দেখে যাচ্ছিলাম দুর্দশার চিত্রনাট্য।

এর মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। আসুসেনার মুখে যেন পূর্বাভাস পাচ্ছিলাম অনুচ্চারিত কান্নার। আমি তো আছি, ভয় পাচ্ছো কেন আসু? তোমাকে শান্ত থাকতে হবে। রোফ তার ক্লান্ত মুখে জোর করে আত্মবিশ্বাসের প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলছিল। শীত আর বৃষ্টির ভেতর দুজনেই হু হু করে কাঁপছিল। তবু রোফ তার পরাজয়ের গল্পগুলো বলল না মেয়েটিকে। বলল না কীভাবেঅতিবাহিত করে এসেছে তার জীবন, যুদ্ধে অনাহারে মরে যাওয়া প্রিয়জনের লাশ কীভাবে সে কবর দিয়ে এসেছে ইতিহাসের ভেতর। বলতে পারল না, বিদেশি সেনাদের নির্মম অত্যাচারের সেই অন্ধকার ধ্বনিগুচ্ছ। তার নিজের মাকে নগ্ন দেখার সেই নারকীয় স্মৃতি তার শৈশবের ভেতর ডুবেআছে বীভৎসভাবে যা তার নাড়িভুড়ি ছিঁড়ে ফালাফালা করে দিচ্ছিল। বুটের গুঁতোয় তার মাথা থেঁতলে দিচ্ছিল ওরা, তার সামনেই তার মায়ের শরীর থেকে খুলে নিচ্ছিল কাপড়ের শেষ চিহ্নটুকু। চারপাশে উদ্যত অস্ত্রের আস্ফালন। কাদায় ডুবে থাকা মেয়েটির মতো সেও ডুবে যাচ্ছিল অসহায়তায়। ঘৃণা নিয়ে রাগ নিয়ে ফুঁসে উঠতে গিয়েও গভীর গভীরতর কাদাভূমির ভেতর গেঁথে যাচ্ছিল তার নিষ্ফল আক্রোশ। স্মৃতির দরজা খুলে যেতেই ক্যাথেরিনের কথা তার মনে পড়ছিল নিশ্চয়ই। ক্যাথি তার বোন। শুধু মেয়ে হওয়ার অপরাধে যাকে একটা ছোট্ট খুপরিতে বন্দি করে রাখত তার বাবা। সেই ছোট ঘরটায় গুটিসুটি মেরে আটকে থাকতে থাকতে ক্যাথেরিন স্বপ্ন দেখত এই ভেবে যে একদিন তাকে জন্ম দেওয়ার সমস্ত গ্লানি ভুলে গিয়ে বাবা তাকে কোলে নেবে। এই ছোট বোনটার সঙ্গে সেই অন্ধকার ঘরে খেলতে খেলতে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে রোফ। কারো পায়ের আওয়াজ শুনলেই তারা লুকিয়ে পড়েছে আরও গভীর অন্ধকারের ভেতর। ক্যাথরিনের ঘাম বাতাসের সাথে মিশে কেমন একাকার হয়ে যেত ছড়িয়ে পড়ত বাতাসে, গন্ধটা যেন ঠিক মানুষের নয় তবু রোফ এই গন্ধের

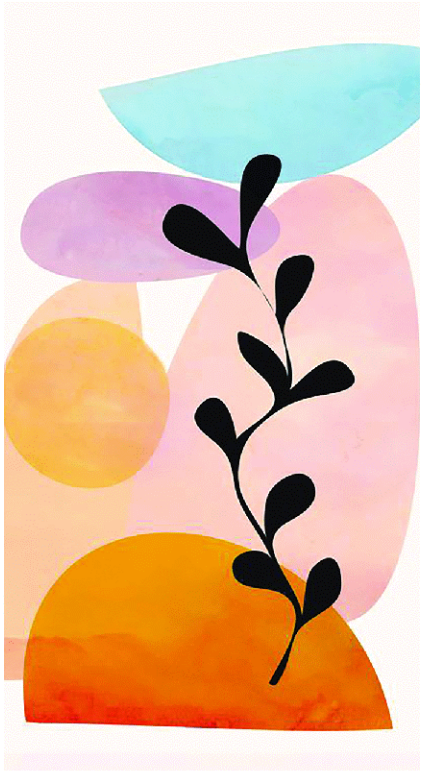

টানেই ছুটে আসত ঘুপছি ঘরটায়। তার সন্ত্রস্ত নিশ্বাস, মসৃণ চুল আর চোখের চাহনি নিয়ে এক দুঃসহ কান্না বেজে উঠত ক্যাথেরিনের বুকে। সেই বোনের মৃত্যুতে শোকে সে পাগলের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে পেরেছিল শুধু, আর কিছু পারেনি। আজ তার এই রিপোর্টারের জীবন সারা দুনিয়ার কাছে তাকে পরিচিত করলেও অপরিসীম খ্যাতি এনে দিলেও রোফ দেখল সেও আসলে দাঁড়িয়ে আছে এক বুক কাদায়। এক দুঃসহ স্মৃতির ভেতর ডুবেআছে তার বর্তমানের সমগ্র চেতনা।

কাদায় ডুবেথাকা এই মেয়েটিকে সে কীভাবে বলবে যে নিজেও বন্দি হয়ে আছে এক উপদ্রুত অতীতে।

আসুসেনা বলল, মৃত্যুকে আমার কোনো ভয় নেই, জানো। বাড়ির সবাই যখন চলে গেছে আমি বেঁচে থেকেই বা কী করব বলো, কার জন্য বাঁচব। এই তেরো-চৌদ্দ বছরের জীবনে কেউ আমাকে ভালোবাসেনি, একজনও না। ঘৃণা ঘৃণা আর অসহনীয় ঘৃণার ভেতর ডুবেথেকেছি সারাজীবন। এই কাদাজল কি তার চেয়েও পচা দুর্গন্ধময়? আফসোস এটাই যে ভালোবাসা কী জেনেই আমাকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে।

রোফ বলল, আমি সবগল্প তোমাকে বলতে পারি-নি, আমার মায়ের গল্প, আমার একমাত্র বোনের গল্প। বললে বুঝতে পারতে আমি তাদের কতখানি ভালোবাসি, তাদের মৃত্যুর এত বছর পরেও এক মুহূর্তের জন্য তাদের ভুলতে পারিনি। এমনকি পৃথিবীতে আরও কিছু মেয়ে যারা আমার হৃদয়ে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে। তাদের জন্য আমি কেঁদেছি, মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু কখনও মনে হয়নি তাদের জন্য আমি আমার জীবন দিতে পারি। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তোমার যদি এমন কিছু চাওয়ার থাকে যা আমার জীবনের বিনিময়ে তুমি পাবে এমনকি আমি অনায়াসে তা দিতে পারি। এমনকি আমাকে যদি কেউ বলে আমার জীবনের বিনিময়ে তোমাকে কাদা থেকে উদ্ধার করা যাবে, তাহলে আমি সেই শর্তে রাজি আছি। ভালোবাসা মানুষকে জীবন মৃত্যুর সীমারেখা ভুলিয়ে দেয় আজ তা অনুভবকরলাম। যেখানে সকল আমিত্ব এসে ডুবে যায় কাদার ভেতর। শুধু ভালোবাসার প্রতিবিম্ব জেগে থাকে ওপরে।

এক ব্যথাতুর যন্ত্রণা নিয়ে রোফ চুমু খেল মেয়েটির কপালে। তার চোখের জল ঝর্ণার মতো নেমে এলো গাল বেয়ে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আসুসেনা। জীবনে এরকম অশ্রু তাকে ভিজিয়ে দেয়নি কখনো। কান্নায় যে এত আনন্দ থাকে এত উচ্ছ্বাস থাকে এত প্রাপ্তি থাকে তা সে এই প্রথম জানলো। এখন তার মনেও হচ্ছে না সে আটকে আছে কাদার মরুভূমিতে। কেবলই মনে হচ্ছে সে স্বাধীন, মুক্ত। ধীর এবং অনুচ্চ কণ্ঠে আসুসেনা বলল, এরপর যদি মরেও যাই আমার কোনো আফসোস থাকবেনা, কিন্তু জানো আমি বাঁচব। আরও দীর্ঘসময় বেঁচে থাকতে সাধ হয় আমার।

পরদিন পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এসেও আসুসেনাকে আর উদ্ধার করতে পারেনি। সে তখন সমস্ত সুখ অসুখ বিপদ পেরিয়ে এক আশ্চর্য কাদার দেশে চলে গেছে। যেখানে আর মৃত্যুর ভয় নেই, জীবনের সংকট নেই। শুধু আছে ভেসে থাকার আনন্দ। রোফের নিষ্পলক চোখের সামনে সে চলে গেল। তার মাথাটাকে বুকের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে রাখল রোফ কার্লে। তারপর ছেড়ে দিল। কাদার মধ্যে একটু একটু করে তলিয়ে গেল একটি শালুক ফুল। যা একদিন মাটি থেকে জন্ম নিয়েছিল।

রোফ কার্লে এরপর আমার কাছে ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার অসমাপ্ত গল্প আর সে শেষ করতে পারেনি। শুধু বলেছিল, আমাদের আরও উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষতা থাকলে কাদার নিচে তলিয়ে যাওয়া গল্পটা আবার নতুন করে লিখতে পারতাম।।

ইসাবেল আইয়েন্দে স্প্যানিশ ভাষার সর্বাধিক জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। জন্ম ১৯৪২ সালের ২ আগস্ট, পেরুর লিমায়। বাবা নিখোঁজ হয়ে যান তার তিন বছর বয়সেই। মায়ের সাথে চলে আসেন চিলের সান্তিয়াগোতে। তার লেখালেখির সূত্রপাত মূলত ১৯৬৭ সালে Paula পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্মী হিসেবে। পরে Mampato পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করেন। জাদুবাস্তবতার এক বিশেষ ধরনই তার সাহিত্যের নিউক্লিয়াস। হাউস অফ দ্য স্পিরিট, সিটি অফ দ্য বিস্টস প্রভৃতি জনপ্রিয় গ্রন্থে উদ্ভাসিত হয়েছে জাদুবাস্তবতার এক অনন্য অধ্যায়। লিখেছেন অফ লাভ অ্যান্ড শ্যাডোস, দ্য ডটার অফ ফরচুন, কিংডম অফ গোল্ডেন ড্রাগন, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ব্যক্তিগত জীবনের সাথে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে তার সাহিত্যে। পেয়েছেন চিলির জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার, প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম (২০১৪) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ও সম্মান।



গল্প

নিঃসঙ্গতার চোরা স্রোত

আসিফ উদ্দিন রেজভী

অনেক দিন আগে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার স্মৃতিচারণ করাটা অনেকটা জাবরকাটার মতো। একটা জিনিস ঘটছে অনেক আগে, কিন্তু আপনি একদম অনেক বছর পর, শীত শীত মৌসুমে বসে, সেই জিনিসটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবার মনে করার চেষ্টা করতেছেন... এটা আসলে খুবই ডিজগাস্টিং একটা জিনিস। পৃথিবীর কেউই হয়তো এটা করতে চাইবেনা। আমার কথাবার্তার টোন দেখে বুঝে যাওয়ার কথা, আমিও হয়তো এ রকম একটা জিনিসের ভুক্তভোগী।

আমি যে ইচ্ছে করে করেছি ব্যাপারটা কিন্তু এ রকম না। ঘটনা ঘটেছে একদম অটোমেটিক স্টাইলে।

আয়োজন করে বসেছি একটা সিরিজ দেখার জন্যে। 'শাটিকাপ' নামের একটা জিনিস বাংলাদেশের কিছু কৌতূহলী তরুণ মিলে বানাইছে। জিনিসটা একদম মাটির কাছাকাছির গল্প। এমন খাঁটি গল্প আমাকে টানে। বাংলাদেশের ওটিটিতে এ রকম জিনিস আন-এক্সপেক্টেডলি।

ছয় নম্বর সিরিজে গিয়ে আমি একটু থামলাম। এভাবে একা একা এমন সুন্দর একটা রাতে সিরিজ দেখার আনন্দকে বাড়ানোর কয়েকটি উপায় হাতে রাখতে হয়। আমার হাতে জুতসই কোনো উপায় না থাকার কারণে আমাকে সবচেয়ে ক্লিশে উপায়টাকেই বেছে নিতে হয়েছে, সেটাকে উপভোগ করার জন্য আমার দরকার একটা গ্লাসের। আমি গ্লাস দিয়ে কী করব সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের আর বলতে হচ্ছে না? এমন তো নয় যে আমি গ্লাসে করে ঠান্ডা জল খাব।

রাত যথেষ্ট হয়েছে। এমন রাতে যখন সবকিছু চুপচাপ হয়ে যায়, তখন আমার ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে জানি না। কিন্তু ভালো লাগার একটা কারণ হচ্ছে, তখনই একমাত্র আমি উপভোগ করি, যে আমি আসলেই অনেক একা। বিষণ্নতার মেঘ ধীরে ধীরে জমতে শুরু করে আমার ভেতর।

এ রকম আরো একটা রাতের কথা মনে পড়ে। সম্ভবত বছর পেরিয়ে এসেছে ঘটনার। ঠিক মনে পড়ছে না। ঘটনার একটা ফর্মাল বর্ণনার জন্য ঘটনাটা এভাবে শুরু করা যেতে পারে, আজ থেকে অনেক দিন আগে কোনো এক রাতে ঠিক এভাবেই বেশি খাওয়া অবস্থায় ঘুমাতে যাচ্ছিলাম, তখনই ফোন এলো সুমনের।

'খালেদ তুই কি একটু তুষীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবি?'

তার গলা শুনে মনে হলো সে কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত। 'কেন কী হইসে?' বললাম আমি।

'তাড়াতাড়ি ওরে ফোন দে, রাখলাম আমি।' বলেই দুম করে লাইন কেটে দিল সে।

আজ এতদিন, এত বছর পর আমি তুষীকে ফোন দেব? কিন্তু কেন? এত রাতে ফোন দেওয়ার মতো কোনো সম্পর্ক তো আমাদের আর নেই। তাহলে? আর আসল কথা হচ্ছে, আমি ফোন দিয়ে কী দিয়ে কথা শুরু করব?

তুষীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের অবশিষ্ট আর কিছু না থাকলেও আমার বন্ধুদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। মাঝেমধ্যে ফেসবুকে আমি দেখি, যে বন্ধুরা তাকে নিয়ে ছবি দিচ্ছে। কষ্ট হতো খুব। মনে হতো কেউ বোধহয় আমার ভেতরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটা একটা করে ছিঁড়ে দিচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতিটা ধীরে ধীরে কমে আসছে। কিন্তু এ সময় এসে আমি যদি তার সঙ্গে আবার কথা বলি, তাহলে তো সবকিছু আবার নতুন করে শুরু হয়ে যাবে।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ফোন দেবনা। আর ড্রিংকও বেশি করে ফেলছি, এইটা ওর সঙ্গে কথা বলার উপযুক্ত সময় নয়। সুতরাং আমি ঘুমাতে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার ফোন। তখন আমি মোটামুটি ঘুমের পিকআপ ফর্মে। ঘুমের ঘোরে আমি আমার কিন্ডেলটা হাতাচ্ছি। মনে হচ্ছিল ওটাই ফোন। ফের হাতড়াতে শুরু করলাম ফোনটা, পেয়ে রিসিভ করে কানে দিতেই বুঝতে পারলাম, দিস ইস নট সুমন। সি ইস তুষী!

আমি পড়ে গেলাম ফাঁদে। তুষী এক্ষুণি বুঝে যাবেআমি প্রচুর খেয়ে বসে আছি। এই জিনিসটা নিয়ে আমরা ইউনিভার্সিটি জীবনে কত যে ঝামেলা করেছি। সে চাইতো আমি যেন এসবছুঁয়েও না দেখি। কসম কাটাতো আমাকে দিয়ে। আর আমি বাসায় এসে সুন্দরমত বসে যেতাম।

আসলে আমি সেসব ছেলেপেলের মতো না, যারা স্বপ্ন দেখে একদিন অনেক বড় কেউ হবে। যারা সারাক্ষণ নিজেদের জীবন নিয়ে আফসোস করে। বন্ধুদের নিয়ে এদিকে-সেদিকে ঘোরাঘুরি করে। আমি হচ্ছি একেবারে নিঃস্ব একজন মানুষ। আমার পাওয়ার আর হারানোর কোনো টেনশন নেই। আমি করি কি, মুরাকামির সেসব পুরুষ চরিত্রদের মতো নিজেকে নিয়ে সবসময় ছেলেখেলা করি। বই পড়ি, সিনেমা দেখি আর বেশিরভাগ সময়ই প্রচুর ড্রিংক করে ঘুমায়ে থাকি। এটাই আমার জীবন। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি কখনোই চাইনি।

তুষীর ফোন কানে রেখেই আমি চুপ করে আছি। দেখতে চাইতেছিলাম সে কী বলতে ফোন দিয়েছে। কিন্তু সে-ও দেখি আমার মতো চুপচাপ। ব্রেকআপের ঠিক পাঁচ বছর পর এসে দুজন এভাবে ফোন কানে চেপে ধরে বসে থাকার মানে কী হতে পারে? সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হলো। কথা আমাকেই শুরু করতে হবে। কিন্তু পৃথিবীতে এত এত কথা থাকার পরও আমি কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না, যে 'কথাটা' দিয়ে আমি 'কথা' শুরু করব। আমাকে নির্দিষ্ট কোনো টপিক নিয়ে কথা বলতে হবেব্যাপারটা এমন না, আমি চাইলে তার সঙ্গে সরাসরি সেক্স নিয়েও কথা শুরু করতে পারি।

'তুমি কে?' বললাম আমি।

এতক্ষণ ভেবে-টেবে কী রকম লোকাল একটা কথা দিয়ে শুরু করলাম! আমি যে প্রশ্নটা ওকে করেছি, ওটার ভেতরেই তো উত্তর লুকিয়ে আছে, যে আমি যাকে 'তুমি কে' বললাম, তাকে আমি চিনি।

'আমি তুষী, তুমি এতক্ষণ চুপ মেরে ছিলা কেন?'

'চুপ মেরে ছিলাম কই? ঘুমাচ্ছিলাম। এত রাতে মোবাইলে বলার মতো কথা মানুষের স্টকে দুম করে তো আর আসে না। তাই চুপ ছিলাম।'

তুষী এবার চুপচাপ। জবাবনা দিয়ে বসে আছে। একটু পর বলল, 'এখন কী করো তুমি?'

'গল্প লিখি', বললাম আমি।

'হ্যাঁ, তা তো দেখিই, মাঝেমধ্যে পড়িও। আচ্ছা কাল তুমি ফ্রি আছো?'

'আছি তো।'

'ওকে তাহলে, হলেই থাকো এখনো? না-কি বাসা নিছো?'

'বাসা নিয়েছি।'

'কোন জায়গায়?'

'সাভার, ক্যাম্পাসের একটু আগে করে।'

'আচ্ছা কাল আমি আসব তোমাকে নিতে। দশটার দিকে রেডি থাকিও।'

ফোন কেটে দিলাম। একটা চেনা ব্যথা অনুভব করছি। অনেক বছর পর এমন বাচ্চা বাচ্চা অনুভূতি মাখানো ব্যথা। তুষী কি তাহলে ফিরে আসবেআমার কাছে? এটা কি পসিবল?

সকাল দশটায় আমি রেডি হয়ে সুমনকে ফোন দিলাম। সে তার বউ নিয়ে চিটাগং যাচ্ছে। শালা বউয়ের কথা বলার সময় আলাদা একটু বেশি মালমসলা মিশিয়ে বলে। যেন আমার ভেতরে সুচের খোঁচাটা ভালোমত লাগে। নয়তো সে আমাকে চিটাগং যাচ্ছে এটা বলে দিলেই তো হতো, সে আমাকে একদম বলতেছে, 'তোর ভাবিসহ চিটাগং যাচ্ছিরে, ওখানে থাকব কিছুদিন। তোর ভাবির না-কি দম বন্ধ...' আমি লাইন কেটে দিলাম। ভাবি জাহান্নামে যাক। আমার জানার দরকার নেই।

আমার আর তুষীর দেখা হয়েছে এগারোটার দিকে। আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পত্রিকায় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দাঁড়িয়ে ছিলাম বলতে অপেক্ষা করতেছিলাম। পত্রিকাটা আসলে পড়তেছিলাম না, জাস্ট ভান ধরেছিলাম, যে আমি কারো জন্য অপেক্ষা করতেছি না। এই একটা জীবন ভান করে করেই কাটিয়ে দেবব লে মনে হচ্ছে।

'হেই তুষী? কী খবর?' বললাম আমি।

'কী খবর মানে? এখনো দাঁড়ায়ে আছো কেন? গাড়িতে এসে বোসা।' তুষী গাড়ির কাচ হালকা নামিয়ে বলল। আমি গিয়ে গাড়িতে বসতেই গাড়ি দৌড় দিল। ঢাকা শহরে গাড়ির দৌড় কপালের ওপর নির্ভর করে। পুরো রাস্তা ফ্রি। যেন এটা আমার জন্যই করে দিয়েছে কেউ। আমি আর তুষী যাববলেই শহর এক্সট্রা করে সেজেছে। ড্রাইভিং করতে করতে তুষী বলল, 'খালেদ তোমাকে একটু গাবতলী যাইতে হবে। ওখানে একজন আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে।' আমি বললাম, 'কে?'

'রফিক না-কি কুমিল্লা থেকে গাড়িতে উঠেছে, এসে পৌঁছেছে। তাকে পিক করতে হবে।' কথাটা বলেই সে গাবতলীর দিকে গাড়ি চালানো শুরু করেছে।

আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, কে এই রফিক? আর হঠাৎ তুষী আমাকে এভাবে ডেকে এনেছে কেন? হচ্ছেটা কী? না-কি এসবকিছু আমি স্বপ্নের ভেতর করতেছি? একবার তো আমি সুমনের চিটাগাং থেকে আনা গাঁজা খেয়ে গোটা ঢাকা শহর ঘুরেছিলাম। মনে করেছিলাম আমার সঙ্গে তুষী ছিল। কিন্তু যখন মেডিকেলের স্ট্রেচারে চিত হয়ে শুয়ে আছি, সুমন ঠেলতেছে আর হাউমাউ করতেছে, তখন বুঝতে পারছি ঘটনা অন্যকিছু। অ্যাক্সিডেন্ট করে যা-তা অবস্থা!

এবার সে রকম কিছুর সম্ভাবনা কম। কারণ আমি চোখে স্পষ্ট দেখতেছি পুরো রাস্তা ক্লিয়ার। ঝকঝকে। তুষীর কানের পাশ দিয়ে ফিনফিন করে উড়ছে চুল। গাড়িতে লো ভলিউমে বাজছে মান্না দে, 'গভীর হয়েছে রাত পৃথিবী ঘুমায়, হয়তো তুমিও গেছো ঘুমিয়ে...'

গাড়ির ভেতর এক ধরনের নৈঃশব্দিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দুজনই চুপচাপ। এটাকে ভাঙা দরকার। কিন্তু লজ্জা লাগছে। যেন তুষী আমার নতুন প্রেমিকা! আজই ফার্স্ট, আমরা ডেটে যাচ্ছি। আমাদের গন্তব্য একটা নিষিদ্ধ জায়গা এবং ওখানে গিয়ে আমরা প্রথমে ঠিক কোন জিনিসটা দিয়ে কথা শুরু করব সেটাই যেন ভাবতেছি দুজনে।

তুষী রফিককে পিক করে সোজা চলে যাচ্ছে। আমি পেছনে বসে আছি। তুষী আর রফিক সামনে। তাদের কথাবার্তার টোন শুনে যা আন্দাজ করা যাচ্ছে তার মোটামুটি সারমর্ম এই যে, তারা বিয়ে করতে যাচ্ছে এবং সাক্ষী হিসেবে কাউকে না পেয়ে এই হাবলা প্রেমিকের সাহায্য নিচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল নিজের ভেতর নিজে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছি। এই ভেঙে যাওয়া কখনোই থামবে না। এভাবে ভাঙতে ভাঙতে একটা সময় গিয়ে পুরোপুরি ভ্যানিস হয়ে যাব। আসলে এজন্যই আমি নিজেকে একটা গণ্ডির ভেতরে ঢুকিয়ে রাখি। বের হতে চাই না। আমি জানি আমার অভ্যাস খারাপ। আমি খুব ছোটখাটো বিষয়েও কষ্ট পাই, কিন্তু বলি না। এই না বলাটা কিন্তু ডেঞ্জারাস, এ রকম না বলতে বলতে একটা সময় গিয়ে নিজের ভেতর কষ্টের সমুদ্র হয়ে যায়। এটা হয়তো আমার রিডিং স্টাইলের প্রভাব। আমার পড়া বেশিরভাগ উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলোই এমন। তারা ভাঙে, দুঃখ পায়, নিঃসঙ্গতার দেয়াল টপকে বেরোতে চায়, কিন্তু পারে না। এটা করতে গেলে তাদের যে সমস্ত কাজ করতে হবে, সবগুলো কাজই তাদের কাছে লেইম। এইসব লেইম কাজ তারা করে না।

ঘটনা অনুমানের খুব কাছাকাছি। আমরা একটা রেস্টুরেন্টে বসলাম। তখন সন্ধ্যা। আমার নিত্যসঙ্গী কিন্ডেলটা টেবিলের ওপর রাখলাম। সারাদিন সিগারেট খেতে পারিনি বলে তুষীর সামনেই একটা সিগারেট জ্বালালাম। স্মোকিং জোন-টোন কই আছে জানি না। স্মোকারদের জন্য সবজায়গাই স্মোকিং জোন। অবাক করা বিষয় হলো, আমার সিগারেট জ্বালানোতে তুষীর কোনো আপত্তি নেই। সে সুন্দরমত রফিক নামের সেই ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছে। তুষী আমার কিন্ডেলটা হাতে নিয়ে নাড়ানাড়ি করে বলল, 'এই জিনিসটা ছাড়া তুমি থাকতে পারো না?'

আমি ধোঁয়া ছাড়লাম। রফিক নামের সেই ছেলে আমার ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'কেন পারবনা? অবশ্যই পারি। সবসময় যে বই পড়ি তা নয়, এমনিতেই সঙ্গে রাখি।'

তুষী একটু নড়েচড়ে বসল। তুষীটা কেমন জানি অচেনা এক জগতের মানুষ হয়ে গিয়েছে। তার চোখে কোনো অপরাধ বোধ নেই। সে আমার সামনে বসে আছে, সে দেখতে পাচ্ছে আমি প্রচুর কষ্ট পাচ্ছি, আমি ফেটে যাচ্ছি ভেতরে ভেতরে কিন্তু সে নরম স্বরে বলল, 'খালেদ, তোমার কথা রফিককে বলেছিলাম। সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে বলেই তোমাকে ডাকা।'

আমি বললাম, 'তোমরা বিয়ে করেছো?' 'আরে না না, বিয়ের কথা চলছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে রফিক ফ্রান্স যাওয়ার আগেই, মানে সামনের মাসে সবকিছু হয়ে যাবে।' কথাগুলো এমনভাবেবলল সে, যেন আমি তার বন্ধু। আমি জানি না রফিক কেন আমাকে দেখতে চেয়েছে। ছেলেটাকে দেখেই বুঝতে পারছি মালদার জিনিস। তুষীর জীবনের কত নম্বর সংস্করণ কে জানে! তুষীর সেই প্রেমিকের সঙ্গে পরবর্তী আরও আধা ঘণ্টা কথা হয়েছে। সে আমাকে ডিনার অফার করেছিল। কিন্তু আমি তো এক মাত্র ড্রিংকের অফার ছাড়া অন্যকিছু সহজে এক্সেপ্ট করি না। তুষী বাংলা সিনেমার মতো করে আমাকে একপাশে এনে বলল তাকে ক্ষমা করে দিতে। রফিক তাদের বিয়েতে যাওয়ার দাওয়াতও দিল। কি আশ্চর্য একটা দিনের জন্য তুষী আমাকে ডেকেছিল! আমি সবকিছুর পজিটিভ উত্তর দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। তারা ডিনার করেই নামবে বলল।

আমি যখন সিঁড়ি ভেঙে নামছি তখন মনে হচ্ছিল এই দুনিয়াতে যদি কেউ আমার খুব কাছের হয়ে থাকে, তাহলে সে হয়তো তুষী। নয়তো তাকে ছেড়ে আসার সময় এত কষ্ট হচ্ছিল কেন? এত কষ্ট তো আমি এর আগে কখনোই পাইনি। পৃথিবীতে কাছের মানুষগুলোই কেন বারবার হারিয়ে যায়?

ইচ্ছে করছিল লাফ দিয়ে মরে যাই। রাস্তায় নেমে আসতেই দেখি আমি কোথায় আছি আমি বুঝতে পারছিলাম না। রাত নেমে গেছে। আমি হাঁটছি। রাস্তাটা খুবই পরিচিত। এই রাস্তায় আমি আর তুষী কত হেঁটেছি। এত বেশি হেঁটেছি আমরা, মাঝেমধ্যে আমার মনে হয় সারাজীবনের সবহাঁটা আমরা খুবতাড়াতাড়ি হেঁটে ফুরিয়ে ফেলেছিলাম বলেই আমরা এখন আর হাঁটতে পারছি না।

রাস্তার দুপাশে বিশাল বিশাল দালান। আমি হেঁটে যাচ্ছি তার ঠিক মাঝখানে। চারদিকে শত শত মানুষ কিন্তু কারও সঙ্গে গিয়ে যে কথা বলব, এমন একটা মানুষও নেই। নিঃসঙ্গতার একটা চোরা স্রোত বইয়ে যেতে লাগল আমার ভেতর। হঠাৎ খেয়াল করলাম, চারপাশ থেকে ঝড়ের মতো মানুষ উড়ে উড়ে পড়ছে। যেন হঠাৎ করে মানুষের বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সবাই একসঙ্গে ছাদের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে একে একে ঝাঁপ মারছে। চারপাশে জমে উঠছে মৃত দেহের স্তূপ। আমি নির্ভীকের মতো সেগুলো পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এত এত মরা মানুষকে পাশ কাটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল আমি নিজেও মৃত, যার ভেতরে প্রাণ আছে কিন্তু আদতে মৃত...।

প্রবন্ধ

শিকড়ের পরিচয় কখনো ভুলে না যাই

গুলশান আরা



বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে যখন পেছনে তাকাই তখন ভাবতে অবাক লাগে। হ্যাঁ, আমি নারীর চলমান ইতিহাসের কথাই বলছি। নারীকে ঘিরে বর্তমান সময় খুবঅস্থির, ব্যস্ত, বিস্ফোরণোন্মুখও বলা যায়। নারীর অস্তিত্বকে মূল্যায়ন করতে যুগের পর যুগ কেটে গেছে। নারীর অন্তঃপুরবাসিনী চিত্র অতিক্রম করে বর্তমান কর্মমুখরও শিল্প বিপ্লবেনিবেদিত যে পরিচিতি, তার পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের বেদনা লাঞ্ছিত ইতিহাস। বর্তমান সময়টা আমরা ইন্টারনেট, মোবাইল, ফেসবুক ও নানা যান্ত্রিক অগ্রগতির সহায়ক শক্তির সঙ্গে অভ্যস্ত। কিন্তু তার সঙ্গে বিপরীত চিত্রও রয়েছে। একদিকে নারীর বিজয়গাঁথা রচনা করে তারা এভারেস্ট বিজয়ী হয়েছেন, শিল্পোন্নয়নে বিস্ময়কর দক্ষতার সাহায্যে দেশের অর্থনীতিকে পুষ্ট করেছেন। অন্যদিকে নারী নির্যাতন ও অবমাননার চিত্রও সমাজকে থেকে থেকে চমকে দেয়। তখন মনে পড়ে ফেলে আসা সুদীর্ঘ ইতিহাস। জীবনের বিশাল পশ্চাৎপট থেকে আমরা পেছনের অশ্রুলাঞ্ছিত নারী জীবনের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াই। আজকের নারীসমাজ জীবনের এক অপরিহার্য শক্তি কিন্তু অতীতে নারীর বিদ্রোহ, নারী দিবস ছিল অপরিচিত, অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকেও তারা ছিলেন বেগম রোকেয়ার ভাষায় 'Human ldogage' তারা অন্তঃপুরে অলঙ্কৃত করতেন, সন্তান উৎপাদন ও সংসার পরিচালনা করতেন। ঘরনীর ভূমিকাই ছিল তাদের জন্য নির্দিষ্ট। ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধিনিষেধের ভয়াবহ অপপ্রয়োগে মেয়েদের জীবনকে নানা ফাটকে পরিণত করেছিলেন। কথাটা মর্মান্তিক হলেও কঠোরভাবে সত্য। অতীত গৌরবস্মরণ করতে গিয়ে আমরা চাঁদ সুলতানা, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, কবিজেবুন্নেসা ও সুলতানা রাজিয়ার কথা অহঙ্কারের সঙ্গেই উল্লেখ করি। সাধারণ সমাজের নারী বা সাধারণ মানুষের অবস্থানগত পরিবর্তনের কোনো আভাস এ থেকে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া একেকটি যুগ তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পটভূমির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থানকে বদলে দেয়, যেমন দিয়েছিল এ দেশে বিদেশিদের আগমন এবং ঔপনিবেশিক পীড়ন। দীর্ঘ ২০০ বছরের পরাধীন জীবন, ধর্মীয় গোঁড়ামি, শিক্ষার অভাবএবং কুসংস্কার সব সমাজকে অধিকার করেছিল। এক জটিল বদ্ধ পরিবেশে পরদেশি শাসন ও ভাষার চাপ সত্ত্বেও, শত বছরের মধ্যদিয়ে এ দেশের মানুষ বিস্ময়করভাবেবাংলা ভাষার চর্চাকে ধরে রেখেছিল। তার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মানুষ অব্যাহতভাবে মাতৃভাষাকেই গতিশীল করে তুলেছে।

ইংরেজ শাসনামলে মুসলিমরা এক হতাশাগ্রস্ত জাতি হিসেবেপরিণত হয়। ইংরেজ শাসনের ইতিহাস এ দেশের মুসলমানদের প্রতি বৈরিতার কারণে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ও ব্যক্তির অবমাননা, ফারসি ভাষার পরিবর্তনে মুসলমানদের জাতিগত আত্মাভিমানে কঠিন আঘাত লাগে। মুসলিম আমলে বিদ্যাশিক্ষা পরিচালনা, মাদ্রাসা, মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ শাসকরা প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করতেন, যা ছিল করবিহীন। ইংরেজ সরকার এসবলাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। ফলে শত শত মুসলমান পরিবার ও প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি দারুণভাবেক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে শিক্ষা নারীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষাব্যবস্থার বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে হযরত মুহম্মদের (সা.)-এর প্রতি কটাক্ষ করে লেখা প্রকাশিত হয়। ফলে মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয়ে মিশনারি শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৪ সালে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ১৮৫৪-৫৬ সালে শিক্ষাবিষয়ক ডিরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এ যুগান্তকারী ব্যবস্থার সুযোগ মুসলমানরা নিতে পারেননি বা নেননি। ধর্মান্ধতা, আশরাফ-আতরাফের ভেদজ্ঞান ও ইংরেজের বৈরিতার মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে গেলেও তৎকালীন হিন্দু সমাজ এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে উন্নত শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য গুছিয়ে নেয়। কাজেই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলমান সমাজের অগ্রগতি ছিল পশ্চাৎপদ ও অনিশ্চিত। তবে সেই সঙ্গে ধীরে হলেও এক সময় সমাজের বিরাট অংশ নারী শিক্ষার প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। নানা ধরনের স্থবিরতা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজে একটু একটু করে

সচেতনতা লক্ষ করা যায়। ১৮৪৯ সালের ৭ মে JED Bethun কলকাতায় হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে নারী শিক্ষার একটা ধারা সৃষ্টি হয়। সেকালের বিদ্বজ্জন কেশবচন্দ্র সেন, রাজা রামমোহন রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহিত হন। তৈরি হয় 'বামা হিতৈষিণী সভা'। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সংবাদ প্রভাকর ও বামাবোধিনী সে সময় বিশেষ অবদান রাখে। অন্যদিকে দেরিতে হলেও মুসলমান সমাজেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নওয়াবআবদুল লতিফ তরুণদের শিক্ষা ও আধুনিকতায় যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য 'মোহমেডান লিটারারি সোসাইটি' গড়ে তোলেন। তারই চেষ্টায় ১৮৫৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় ফারসি বিভাগ প্রবর্তিত হয়। সব ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র বিশেষত মুসলিম ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার সুবিধার জন্য হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় (A Short accont of my pablic life : P-12, A Lateef)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এসে যে ক'জন শিক্ষিতা সমাজসেবীর কথা উল্লেখ করতে হয় ধীরে ধীরে নারীর জীবনে আসে আত্মাবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা তারা হলেন কুমিল্লার নওয়াবফয়জুন্নেসা, বেগম রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা খানম, দিনাজপুরের বোদা নিবাসী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী তাহিরুন্নিসা ও শাহাজাদপুরের লতিফুন্নেসা। তাহিরুন্নিসা ছিলেন প্রথম মুসলিম মহিলা গদ্য রচয়িতা। ১৮৬৫ সালে ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যা বামাবোধিনী পত্রিকায় নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লেখা এ রচনাটির মধ্যে একটা বলিষ্ঠতা, স্পষ্ট ভাষণ ও আড়ষ্টতাবিহীন প্রকাশ ভঙ্গি পাওয়া যায়। এ কৃতিত্ব তুলনাহীন। কিন্তু ইতিহাসকে বিচার করলে দেখা যায়, ঘন অন্ধকারের মধ্যে একাধিকবার এরকম বিরল প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেছে। হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের বোন জমিদার মনুজান তার বিশাল সম্পদকে শিক্ষা বিকাশের জন্যই তার ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালে কুমিল্লার নওয়াব ফয়জুন্নেসা কুমিল্লায় একটি উন্নত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যার খ্যাতি ও ধারাবাহিকতা এখনো অক্ষুণ্ন আছে। নওয়াবফয়জুন্নেসার জীবন ছিল ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতার প্রতীক। তার প্রবর্তিত শিক্ষাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত একদল বিদ্বান যুবক ১৮৮২ সালে ঢাকায় গড়ে তোলেন 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'। তারা অতিযত্নে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের পাঠ্যতালিকা নির্বাচন করে নারী শিক্ষা পদ্ধতিকে বিশেষভাবে গতিশীল করেন। ওই সময় কলকাতায় বেথুন স্কুলে মুসলমান মেয়েদের ভর্তিকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। ফলে আলাদা করে বিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৯৬ সালে লতিফুন্নেসা কলকাতা ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল থেকে ৫০ জন বালক ও বালিকার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৭ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় (৩৮৯ সংখ্যা জুন ১৮৯৭) তিনি একটি কবিতা লেখেন, যার শিরোনাম ছিল- 'বঙ্গীয় মুসলমান মহিলার প্রতি'। এভাবেই নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মপ্রকাশ শুরু।

নওয়াবফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর কথা এ ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে কারণ তিনি শক্ত হাতে দক্ষতার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করে গেছেন। সেই সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার জন্য মেয়েদের ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা, জেনানা হাসপাতাল ও আরও অসংখ্য জনহিতকর কাজ করে গেছেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করেন। তা ছাড়া তার আত্মজীবনীমূলক কাব্য রূপ জালাল প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। সে সময়ের পথিকৃৎ গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী (১৮৫৫-১৯২৪), কামিনী রায় এবং মানকুমারী বসুরও আগে।

পরবর্তীতে সমাজ কাঠামোর সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনে পরিবর্তন দেখা দেয়। দীর্ঘ সময়ের অবহেলা এবং অপচয়ের শেষেবাংলার মুসলমান সমাজের কর্মিষ্ঠ সমাজ সংগঠকরা এগিয়ে আসেন। মৌলভী আবদুল আজিজ বিএ, মৌলভী আবদুর রহিম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ফজলুর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক প্রমুখ প্রগতিশীল মানুষ এগিয়ে আসেন স্ত্রী শিক্ষা ও মুক্তির আহ্বানে। ফলে ১৯০১ সালে আদম শুমারিতে দেখা যায় '৪০০ মুসলিম মহিলা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছেন' (মিহির ও সুধাকর)। এর পেছনে কাজ করেছে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল (১৯১১) ও তার জীবনব্যাপী সংগ্রাম। বেগম রোকেয়ার সমগ্র প্রয়াস ছিল অজ্ঞানতা থেকে নারীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। জীবন যেন একটি শতাব্দীকে দিয়েছে শিক্ষা, দিয়েছে সমাজ পরিবর্তনের প্রবল আগ্রহ ও শক্তি, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং সাহস। তারপর নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রায় নারী গড়েছে ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারী ক্রমেই আত্মজাগরণের পথ খুঁজে পায়। বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে প্রথম বিএ এবং এমএ পাস করেন ফজিলাতুন্নেসা, তার পর পর আসেন অধ্যাপিকা খোদেজা খাতুন, লীলা নাগ, ডক্টর ফাতেমা সাদেক, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, ডক্টর বেগম আখতার ইমাম, জেবুন্নেসা রহমান, অধ্যাপিকা হামিদা খানম, ডক্টর হোসনে আরা, অধ্যক্ষা জেবুন্নেসা রহমান, বেগম আনোয়ারা মনসুর, মহিলা ডিডিপিআই বেগম আজিজুন্নেসা, অধ্যক্ষা হাসনা বেগম প্রমুখ। এসব বিদুষী মহিলা সে সময়ের সামাজিক পরিবর্তনের বিপুল অবদান রাখেন। বিংশশতাব্দী নারীর সর্বাঙ্গীন অগ্রগতিকে যে রূপে গড়ে দিয়েছে, তারা এক-এক দশকে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানচর্চায় তাদের ওপর ন্যস্ত প্রতিটি দায়িত্ব পালন করে নিজেদের অবস্থানকে চিহ্নিত করে গেছেন। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বিজ্ঞানচর্চায় অধ্যাপিকা মালেকা আলরাজী, অধ্যাপিকা কামরুন নাহার ইসলাম, অধ্যাপিকা রহমত আরার নাম উল্লেখ করতেই হয়। সত্য কথা বললে বলতে হয়, একটি বৃহৎ সময়কালের পূর্ণ তালিকা তৈরি করা অত্যন্ত দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ। তবুও এখানে যতটা সম্ভব শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের ও জাতির অগ্রযাত্রায় যাদের অসামান্য অবদানে এ দেশ ধন্য, তাদের নাম অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

বেগম রোকেয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ দেশের নারী যে বহু বিচিত্র জীবন কর্মে নিয়োজিত হন, তার মধ্যে সাহিত্য জগতের কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ও সারা তাইফুরের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সাহিত্য সংস্কৃতি, সমাজকে তারাই সমুন্নত রেখে গেছেন ও পথ দেখিয়ে দিয়েছেন উত্তর প্রজন্মকে। তারা একাধারে শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী। এ থেকে তারা প্রতিষ্ঠা করেছেন কর্মযোগ ও জীবন চেতনা। পত্রিকা প্রকাশনা, সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন ধ্যান-ধারণার বিপুল আবির্ভাবসঙ্গে নিয়ে ষাটের দশকের আবির্ভাব। এ সময় রাজনীতি ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ সূচিত হয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে এ দেশের চিন্তা-চেতনায় প্রগতিশীলতার চর্চা গতি পায়। ইতিহাস পরিক্রমায় লক্ষ করা যায়, ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিসেস হাসিনা মুর্শেদ ও মিসেস ফরহাদ বানু আসন লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে ঢাকায় প্রথম মুসলমান মহিলারা প্রকাশ্যে ঈদের নামাজ আদায় করেন বেগম সারা তৈফুরের নেতৃত্বে। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে 'কাইসার-এ-হিন্দ' সার্টিফিকেট ও মেডেল প্রদান করে সম্মাননা দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের সম্পাদিত আজিজন নেসা, নবনূর, মিহির, সুধাকর, সমাচার দর্পণ প্রভৃতি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। এরই মাঝখানে ১৩২৮ সালে প্রকাশিত হয় সুফিয়া খাতুন সম্পাদিত প্রথম মুসলিম মহিলা মাসিক পত্রিকা আন্নেসা (The Woman)। ১৩৪৪ সালে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ ও হাবীবুল্লাহ বাহার যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশ করেন 'বুলবুল' পত্রিকা। মুসলমান মহিলা সম্পাদিত প্রথম বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা, 'বর্ষবাণী' ও 'রূপরেখা'। প্রকাশ করেন জাহানারা বেগম চৌধুরানী। তারপরে নূরজাহান বেগম ও সুফিয়া কামাল সম্পাদিত 'বেগম' পত্রিকার প্রকাশ ঘটে ১৯৪৭ সালে। সেই সঙ্গে আমরা পাই সাংবাদিক হুসনা বানু খানমকে। বিংশ শতাব্দীর কালানুক্রমে বিশ্ব সভ্যতায় দুটি বিশ্বযুদ্ধ এসে তোলপাড় করে দিয়ে গেছে মানুষের চিন্তাজগৎকে।

মানুষের চিন্তা-চেতনার জগতে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। মানবজীবন পদ্ধতিকে ধারণ করে সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং জীবনধারাও বারবার গতি পরিবর্তন করেছে। তারই অংশীদার হয়েছে এ দেশের মানুষ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। সাহিত্য জগতে আমরা তারও গতিময় বিকাশ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছি। বিশ্বযুদ্ধের প্রবল প্রভাব যেমন পৃথিবীর সব দেশের জীবনচর্চাকে ওলট-পালট করে দেয়, আমাদের দেশও তার অন্যতম। ১৯৪৮-এর ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়। মানুষের ধ্যান-ধারণা, দেশপ্রেম সবই বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়। এ দেশে, জনজীবনে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন সৃষ্টি করে ভিন্ন চেতনা, ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা। কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক জীবনে নানা পরিবর্তন নিয়ে আসে।

মানুষ বিশ্বের অন্য দেশের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে পরিচিত হয়। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে আরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায় জীবন যাত্রায়। আন্তর্জাতিক বলয়ে প্রবেশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ, এভাবেই একটি জাতির পরিচয় চিহ্নিত হয়ে সে মাথা তুলে দাঁড়ায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা তার অংশীদার। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় খুঁজে পাই ভিন্নরূপ ভিন্ন সত্তার স্বাধীন নারীর পরিচয়। মানুষ ও ইতিহাস সর্বদা চলিষ্ণু। বাধাগ্রস্ত স্থবিরতার প্রাচীর সরিয়ে নারী যেভাবেবিশ্ব সমাজে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেছে, তা আমাদের জন্য গৌরবও আনন্দের। আমরা যেন সেই শিকড়ের পরিচয় কখনো ভুলে না যাই। ইতিহাসের কাছে এসে দাঁড়ানো আমাদের সেই কথাটাই মনে করিয়ে দেয়।

UGC & Govt. Approved
Sonargaon University (SU)
সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি (এসইউ)
RISE UP
SHINE

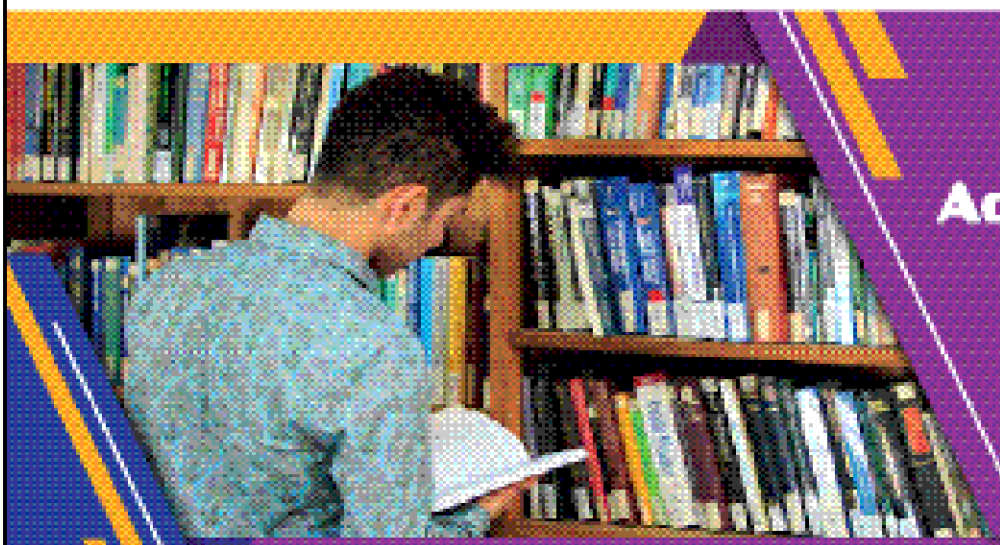

Admission Going ON

Post Graduate Programs

- MBA
- RMBA
- EMBA
- LLM (2 Year)
- LLM (1 Year)
- MBA in Supply Chain Management (MSCM)
- MBA in Textile & Fashion Marketing (MTFM)
- Master in Bank Management (MBM)
- MBA in Apparel Merchandising (MAM)

UnderGraduate Programs

- LLB (Hon's)
- BA (Hon's) in Bangla
- Bachelor of Business Administration (BBA)
- Bachelor of Architecture (B.Arch)
- B.Sc in Computer Science & Engineering (CSE)
- B.Sc in Electrical & Electronics Engineering (EEE)
- B.Sc in Mechanical Engineering (ME)
- B.Sc in Civil Engineering (CE)
- B.Sc in Textile Engineering (TE)
- B.Sc in Fashion Design & Technology (FDT)
- B.Sc in Naval Architecture & Marine Engineering (NAME)
- B.Sc in Apparel Manufacture & Technology (AMT)

Green Road Campus:
147/1 , Green Road, Tejgaon, Dhaka-1215.

Mohakhali Campus:
CP-Ja-146, Wireless Gate, Mohakhali, Dhaka-1212.

/SonargaonUniversity www.su.edu.bd

Ph: 02481122147, 01971337777, 01780330044, 01780330055, 01955529724, 01955529723, 02222292134, 01955529702, 01955529710, 01780220099, 01955529725, 01955529721, 01775000888, 01955529722

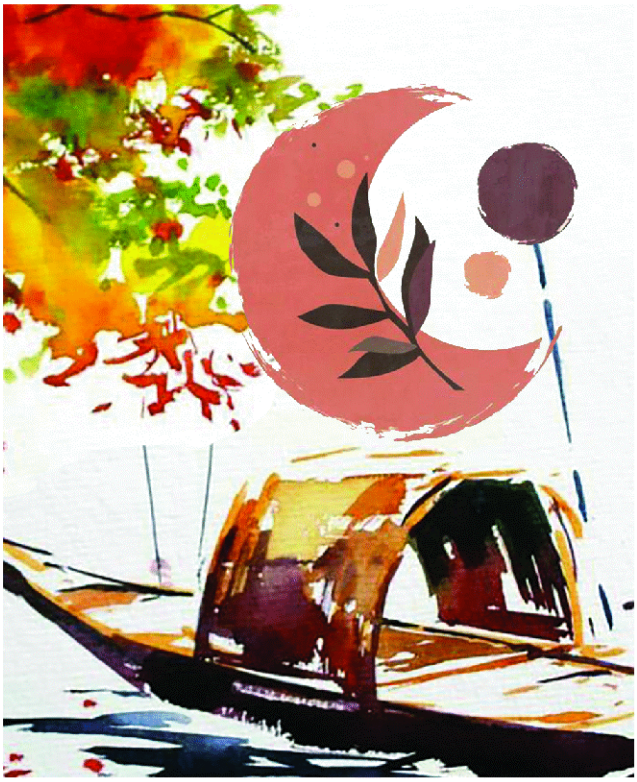

গল্প

সেদিনও উঠেছিল চাঁদ দিয়েছিল জ্যোৎস্না

আশরাফ উদ্‌দীন আহ্‌মদ

মফস্বল শহরের নিরাসক্ত এবং ভদ্রোচিত বিনম্র দুপুর। ফাল্গুনের বেলাবেলি এই শীতল সময় বড় উছাটন করে মন-প্রাণকে, মিষ্টি-মিষ্টি ঝিরিঝিরি সমীরণ আর রোদের মায়াবী লুকোচুরি খেলা এবং কৃষ্ণচূড়া গাছের লাল-লাল থোকা-থোকা ফুলের বিপুল সমারোহ ক্ষণিকের জন্য হলেও স্মৃতির অনেক-অনেক গভীর তলদেশে নিয়ে যায়, নিজের মধ্যে অন্যরকম ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে নিরিবিলি দুপুরের সবআয়োজন পেছনে রেখে চলে যেতে অভিলাশ জাগে অন্য কোথাও, অন্য কোনো জমাট চকচকে জাজিমে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঠিক-ঠিক বেশ কয়েক বছর পর একবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিলাম, পৈতৃক আবাস ছিল একসময়, ভারত বিভাগের পরপর ভিটা-মাটি কিছু বিক্রি এবং বিনিময়, তারপর চলে আসে পুরোপুরি এপারে, তবে কিছু ছিটেফোঁটা আত্মীয়-স্বজন তো রয়েছেই, হয়তো সে টানেই একটু ঘুরে-ফিরে আসা আর কি! আমি তখন নেহাত-ই ছোট।

নদীয়া জেলার শান্তিপুর মহকুমার বাঁউইগাছী পাড়ায় আমাদের পৈতৃক বাড়ি, গেইদে দিয়ে ভারতে প্রবেশ, তারপর রানাঘাট পেরিয়ে ট্রেন ঝমাঝম শব্দে চলে এলো শান্তিপুর জং, হেমন্তের শেষ দিন, হিন্দু সম্প্রদায়ের জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন চলছে পুরোদমে, হালকা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়, মন বলে চলো যাই বহুদূর, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে অনেক-অনেক দূরে, এর ঠিক কয়েকদিন পরেই আরেক রাসোৎসব, দোলপূর্ণিমায় রাসলীলা অর্থাৎ রাসেশ্বরীর স্মৃতিবন্দনা। রাসের আগমনী বার্তা পেয়ে শ্রীকৃষ্ণধাম শান্তিপুর নব-নবসাজে সেজেছে আজ। মৃদু-মন্দা বাতাস কি কথা বলে যায় কানে-কানে, শ্রী রাঁধিকার মনও হারিয়ে যায়, কিন্তু সে যে নারী, চোখে-মুখে লাজ-লজ্জা নিয়ে কীভাবে বাতাসের বুকে কান পেতে শুনবে আগমনী বার্তা।

সকালের মোলায়েম রোদে বসে নূপুরদের বাড়ির বিশাল কুলগাছটার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আমি, কতকালের গাছ কে বলে দেবে, কুয়োতলার পাশে হয়তো অযত্নে কিংবা একটু আদর-সোহাগেই ঝেড়ে বড় হয়েছে আর আজ সময়ের কাছে সাক্ষী হয়ে বুড়ো হতে যাচ্ছে, নূপুর নামের মেয়েটি এই বাড়ির সবচেয়ে দুষ্টু-মিষ্টি এবং খই ফোটা মুখের মেয়ে। সম্পর্কে আমার কে, তা আমি জানি না, হয়তো জানার প্রয়োজন মনে হয়নি। তবে সেই মেয়েটি আমার সঙ্গে খেলে, আমার সঙ্গে সারাদিন কাটায়। শান্তিপুরে আসা অবধি নূপুর আমাকে ছায়ার মতো আষ্টেপৃষ্ঠে আগলে রাখে, ওদের আমবাগানে নিয়ে যায়, পশ্চিমপাড়ার ব্যানার্জিদের কাকচক্ষু জলের দীঘিটাতে নাইতে গেলে সে আমাকে নেবেই নেবে। বাড়ির ওপাশে নতুনহাটে তেঁতুল কিনতে যাবে, ওর নানিবাড়ি বড় মাঠটা পার হয়ে ওদিকের সড়ক ধরে কিছুটা গেলেই গড়পাড়া, স্টেশনের কাছাকাছি লাইব্রেরির মোড় ধরে একটু এগোলে ওর বড় ফুপুর বাড়ি, যেখানেই সে বেড়াতে বা বাড়ির কথামতো গেলেই আমাকে সঙ্গে নেবেই নেবে। কতদিন আমরা দুজনে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছি, নদীর জলের নিরবচ্ছিন্ন বেগ দেখে হারিয়ে ফেলেছি নিজেদের, কখনো আবার অশ্বত্থগাছের নিচে শিবলিঙ্গ দেখে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। বুকের মধ্যে অন্যরকম কলগান তখন আমার, তামাম স্বপ্ন আর বাস্তবমিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, আরও যে কতশত জায়গায় আমাকে নিয়ে গেছে, আজ কিছুই মনে নেই। তবে সত্যি সত্যি বলতে গেলে বলতেই হয় অনেক-অনেক জায়গায় গেছি নূপুরের হাতে হাত ধরে, এভাবে দিন দিন ওর সঙ্গে আমার চমৎকার ভাবঅথবা সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ভাবমানে আমার সঙ্গে আত্মার নিবিড় মিলন, হয়তো বা তাই হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে।

রাসোৎসবের দিন নূপুর আর আমি একসঙ্গে গলায় হাত দিয়ে সমস্ত শান্তিপুর চষে বেড়িয়েছি, গড়পাড়া থেকে বাঁউইগাছী, ডাকঘর মোড়-বড়বাজার-শান্তিনগর-সুভাসচন্দ্র রোড-শ্রীমতি সিনেমা হল-স্টেশন বাজার-ঢাকিপাড়া তামাম চেনা-অচেনা সড়ক বাজার আমরা ঘুরে-ঘুরে দেখেছি, ছোটখাটো একটা মহকুমা ঘুরে-ফিরে দেখতে বড্ড ভালো লাগে বৈকি! ডানা ছাড়া পাখির মতো আমরা ছিলাম সেদিন দুজনে। রাসের মেলা কী? শুধু কি পাপর ভাজার গন্ধ, গুড়ের জিলেপি-ঢাকাইয়া পরোটা-শালিধানের চিঁড়ে-মচমচে নতুন ভাজা মুড়ি-চিঁড়ের নাড়ু-তিলের নাড়ু-চালের নাড়ু-বাঁশের বাঁশির প্যানপ্যানানি-মাটির পুতুল-হাতি-ঘোড়া-ছাগল-গরু বিক্রির আয়োজন, চটপটি-ফুচকা-লুচি-কুচরি-মিঠাই-মণ্ডা সন্দেশের জন্য উৎসব। না অবশ্যই সঠিক নয়, রাসের মেলা অর্থাৎ রাসোৎসব যে ভালোবাসার সেতুবন্ধন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলনস্থল। শত-শত মাটির প্রতিমা নিয়ে রিকশাভ্যান-ট্রাক-ঠেলাগাড়িতে চড়িয়ে প্রসেশন বের হয়, সমস্ত শহরটা প্রদক্ষিণ করে সারারাত্রি অবধি, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা রাঁধিকা দেবী সাজে, কৃষ্ণ সাজে, শহর সেজে



ঈদ মুবারক

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা



আলহাজ্ব মজিবুর রহমান

স্বত্বাধিকারী ঃ মেসার্স মজিবুর টিম্বার এন্ড সমিল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঃ মজিবুর টিম্বার এন্ড সমিল লিঃ
চেয়ারম্যান ঃ ইউ, এইচ ফিলাম্যান্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
সেরা করদাতা, মুন্সীগঞ্জ জেলা (৯ম বার) কর বাহাদুর পরিবার
সদস্য ঃ এফ.বি.সি.সি.আই
সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ বাংলাদেশ টিম্বার ইম্পোর্টার্স
এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
সভাপতি ঃ স্বর্ণগ্রাম আর.এন. উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ
সভাপতি ঃ মিতারা আশ্রাফুল উলুম মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদ।



ওঠে জমকালো পোশাক পরে, সে এক সত্যি এলাহী কাণ্ড! সবার চোখে-মুখে সে কি উত্তেজনা টান-টান আর অন্যরকম আনন্দ। নূপুর আর আমি দেখছি, এ দেখার যেন কোনো শেষ নেই, আসলে কি কারও অনুভূতি ভোঁতা হয়ে মরে যায়।

বাতাসে ধূপের গন্ধ, লোবানের গন্ধ, পোড়া ঘিয়ের সুভাসিত বাতাস এলোমেলো ছোটাছুটি করতে থাকে। আলোর ছড়াছড়ি আর বিপুল জনারণ্যে আমরা দুজন ছোট্ট প্রাণী, জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ জ্বলজ্বলে আকাশের বুকে লাখো-কোটি নক্ষত্ররাজী ভেসে কেমন ওঠে, ঠিক অমনি আমরা দুজন অরুন্ধতি-স্বাতী-মরীচী-অত্রি-অঙ্গিরা-পুলহ-ক্রতু-বিশাখা-পুলস্ত্য-বিশিষ্ট নামের কোনো অনাবিষ্কৃত নক্ষত্র, আকাশগঙ্গায় ভাসিয়ে সোনার তরী একদিন সোনার আলো মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো বলে সমস্ত সম্ভাবনাকে ভালোবাসতে চাওয়ার অপেক্ষায় বসে আছি, নদীর মতো কলকল ছন্দে থেমে যেত সেই নূপুর, যার রিনিঝিনি সুরনিক্কনে মোহিত হয়ে আমি নদী আর আকাশকে ভালোবেসে ফেলি একদিন, তারপর বাতাসের সঙ্গে হেসে-খেলে নদীর বুকে বুক মিলিয়ে আমি একাকার হয়ে যাই নূপুরের অশান্ত চোখের টলটলে সরোবরে। বেশ কয়েকদিন কেটে যায় আনন্দ আর ভালোবাসায়। একদিন আচমকা নূপুর আমাকে জানায়, জানো তোমাকে আমার খুউবভালোলাগে...

তারপর আরেকদিন আচম্বিতে আমাকে পেছন থেকে এসে চুমু খেয়ে ছুটে চলে যায়। আমি হতবাক হয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি, নদীর পাড়ের শুভ্র কাশবনের মাথায় তখন বাউরি বাতাস খেলছিল, ওর চোখ যেন কি এক কথা বলতে চায়। আমি সত্যিই কিছু বুঝে উঠতি পারেনি, হয়তো বা বোঝার চেষ্টা করেনি সেই বয়সে, ওর নক্ষত্রখচিত চোখের দিকে তাকিয়ে হয়তো মৃদু হেসেছিলাম অথবা লজ্জায় আরও খানিক লাল হয়ে নিজেকে শামুকের মতো লুকিয়ে ফেলেছিলাম মৃত্তিকায়। কি ছিল সেই চোখে, আমার পড়া হয়নি, ভালোবাসার চরকায় কখন যে দুলেছি জানি না, তখনো ভালোবাসা শব্দটি আমার কাছে ভিনদেশি পাখির মতোই অজানা, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কি এ জন্যই বলেছেন, 'বাঙালি মেয়েরা দশ/বারো বছরে যা বোঝে, বাইশ বছরের বাঙালি ছেলেরাও তা বোঝে না'। এ কথার সারমর্ম বুঝতে কত সময় লাগল, একসময় দেখি নূপুরের দু' চোখ গড়িয়ে, গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে, আমি তখন ওর চোখ মুছে দিই।

হেমন্তের হিমেল বাতাসে নূপুরের চুল উড়ে যেতে দেখেছি, কোথায় যেন বা একটা নাম না জানা পাখি মিষ্টি সুরে ডেকে যায়, বুকের ভেতরটা কেমন হ্যাঁচড়প্যাঁচর করে ওঠে। ওর হাসি নদীর নিরবধি সুরের মতো আজও সত্যিই টানে, কিন্তু আজ কেমন সবই ধোঁয়াটে স্মৃতি। খরস্রোতা নদী বিপুল জলরাশি বুকে নিয়ে বয়ে চলে আপন গতি ধরে দূর থেকে সুদূরিকায়, আর সেই চলার ফলে অকৃপণভাবে পলি দান করে দুপাড়ের ফসলি জমিতে, যার মূল্য অপরিসীম। আজ কত শতাব্দী ধরে আমি বুড়ো বটবৃক্ষের মতো স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে, কোনো-কোনো রাত্রে আমার চোখে একটুও ঘুম আসে না। ঘুম পালিয়ে যায়, তখন রাত্রের নীরবতা প্রত্যক্ষ করার জন্য নীল সামিয়ানার মতো ঝলমলে নক্ষত্র বিছানো আকাশ দেখি। এমন বিমুগ্ধ আকাশ আমাকে বড় বেশি চঞ্চল করে, আকাশের বুকে লুকিয়ে নীলের প্রলেপে হারিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় বড় জাগ্রত হয়, সোনার থালার মতো ওমন রূপসী চাঁদ রাজকন্যার মতো আমাকে ডাকে অহর্নিশি, কোনো কোনো গভীর রাত্রে পুরনো রাজবাড়ী থেকে অদৃশ্যভাবে ঝুমুরের নিক্কনধ্বনি ভেসে আসে বাতাসের ইথার তরঙ্গে, ঝাড়বাতির আলোয় ঝলমলে কক্ষ ত্রস্তপায়ে হেঁটে যাওয়া পুরনারী, রাতের তাবৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেসে আসা খেয়াল বা ঠুমরির বেসামাল সুর বা মূর্চ্ছনা আর ঘুঙুরের নেশাগ্রস্ত আওয়াজে অকস্মাৎ তন্দ্রা ভেঙে যায় তখন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করি। সমস্ত কষ্টগুলো বুকের নৈকট্যে কেমন জমাট বাঁধা কংক্রিটের মতো শক্ত হয়ে আছে, কখনো-সখনো আবার নিজেকে তুলে ধরি, বরেন্দ্র জাদুঘরের পুরাকালের নিথর পাথুরে মূর্তির মসৃণ সন্নিকটে গঙ্গাদেবীর ভগ্নাবশেষ স্পর্শ করে বুঝেছিলাম পাথরেরও প্রাণ আছে, নইলে এমন একটা পাথরকে শিল্পী কীভাবে মানুষের আদলে আনতে পারে, হয়তো প্রাণটি থাকে শিল্পীর পাঁজরের ভেতর, যা কখনো অপ্রেমিক দেখতে পায় না। দেবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি এক প্রেমিক যুবা সফেদ জ্যোৎস্নার প্রকরণ ও কারুকার্যে হারিয়ে যায়, তখন অন্যরকম একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি শিরদাঁড় থেকে সমস্ত শরীর অবধি শিহরিত হচ্ছিল ঠিক সেই রমণীয় মুহূর্তে।

বুকের ভেতরটা কেমন ধুকপুক করেছিল অথবা লীলায়িত প্রত্নতত্ত্বের বিক্ষিপ্ত চেতনায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল একটা জীবন্ত সত্তা কিংবা পর্যবেক্ষণমনা দীর্ঘ মিশ্রণের আরেক ধারাবাহিক চূড়ান্ত রূপের আলুলায়িত জীবনালেখ্য। পাথুরে প্রাণহীন গঙ্গাদেবী নয় সে, আমাদের নাগরিক জীবনের আধুনিক প্রজন্মের এক নারীমূর্তি গোত্রীয় প্রথার আবর্তে নিমজ্জিত জনবসতির মতো একটু-একটু করে সম্ভাবনার শেষ সীমান্তে উপনীত হতে চলেছে, নূপুর আজ শুধু বৃষ্টিবালিকা নয় মেঘকন্যা অথবা সাগরদেবী।

নব্বই দশকের প্রথমার্ধে ভালোবাসার নক্ষত্রের সন্ধানে আবার ফিরে যায় নদীর মতো মহাসাগরের সান্নিধ্যে, এখন নূপুর পুরন্তর এক পৌরাণিক দেবী। বঙ্গদেশের লাস্যময়ী ললনা নাকি রাঢ় অঞ্চলের অসমতল উর্বর লালচে মৃত্তিকা হয়ে জলঝড় বৃষ্টিতে আচম্বিতে বর্ষায় কোনো একদিন আমার মনের সুনিপুণ চিলেকোঠায় এসে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি সেদিনও ওই রুপালি আকাশ দ্রাঘিমায় টুকরো-টাকরা মেঘের ঘনঘটা লক্ষ্য করছিলাম এবং মেঘের ভেতর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে অনেকখানিক পথ নির্বিকার চিত্তে পাড়ি জমিয়ে তৎক্ষণাৎ পেছন ঘুরে তাকিয়ে কি এক অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে-মুষড়ে দিগন্তে নানান রঙের দ্রষ্টব্যের মধ্যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে সুবর্ণরেখার মাঝামাঝি নামিয়ে আকাশগঙ্গায় ডুবসাঁতার খেলে পুরোপুরি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম কি এক পুরনো ধন্দে। ঠিক সে মুহূর্তে ধূমকেতুর আর্বিভাব, রঙিন ধূপছায়া দেখে আমি সীমাহীন আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ি বেলা-অবেলায়, মাত্র কয়েকদিনে আবার আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিংয়ে শেষ বর্ষে পড়ছে সে এখন, কিসের একটা ছুটি কাটাতে বাবা-মা'র কাছে শান্তিপুরে এসেছে, যথেষ্ট প্রগেসিভ একজন তরুণী, কথা-বার্তায় বেশ মার্জিত এবং স্মার্ট এবং অসম্ভবসুন্দরী যাকে বলে সেই অপ্সরী, এদিকে আমি ইতোমধ্যে ইতিহাসে মাস্টার্স কমপ্লিট করে একটা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে সদ্য ঢুকেছি এবং পারিবারিক কারণে কলকাতা এবং শান্তিপুর গেছি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে,তবেমন-মননে নূপুর নামের ধূমকেতু রেখাপাত করেছিল বটে, আরেকটা পরিচয় করিয়ে দিতে চায়, তা হলো নূপুর আমার ছোটমামার বড়মেয়ে, বিশাল কেশরাশির এই যুবতী আমাকে কখন বা যেন একটু-একটু গ্রাস করে ফেলে হয়তো বা আমি আর আমিতে নেই। মিলেমিশে একাকার হয়ে যাই অথবা মিজরাবের হালকা ছোঁয়ায় নতুন সুরে নতুন আমেজে নতুন আনন্দে জেগে উঠি আরেকটু গভীরভাবে পৃথিবীকে দেখবো বলে, কেউ-কেউ শেকড়ের সন্ধানের প্রতি বেশ খানিকটা কৌতূহল হয়ে ওঠে, শেকড়ের কাছাকাছি নিজেকে নিয়ে যায় নতুন রূপে নতুন আঙ্গিকে চেনার জন্য বোঝার জন্য, একদিন নূপুর নদী বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, নদী এবং মানুষের মধ্যে নিবিড় বন্ধন অথচ এই নদীই মানুষকে নিঃশেষ করে, সর্বক্ষান্ত করে...

আমি তন্ময় হয়ে ওর কথাগুলো শুনছিলাম, একসময় নূপুর আবার বলল, নদীর তীরেই মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে, এই নদীই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে ইতিহাসকে, বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের সমস্ত নগরগুলো নদীর কাছাকাছি গড়ে উঠেছে, নীল নদের তীরে মিসরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমীয় সভ্যতা, হোয়াংহো আর ইয়াংসিকিয়াং নদীর মোহনায় চৈনিক সভ্যতা আর সিন্ধু নদের কোল ঘেঁষে সিন্ধু সভ্যতা গজে ওঠে, ঠিক অনুরূপভাবে বাংলার এবং বাঙালি জাতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে নদী কতখানি স্থান দখল করেছে, বাঙালি এবং বাংলা নামের এই ভূখণ্ডটির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি আর সভ্যতার পেছনেও নদীর অবদান সর্বাধিক। বীরভূম-বর্ধমান-হুগলি-নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলো সভ্যতার আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হয় সর্বপ্রথম। কারণ ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর-কোপাই-অজয়কুনুর-দামোদর-গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনা-সুবর্ণরেখা আর কংসাবতী নদীর তীর ঘেঁষেই প্রাচীনকালে বাঙালির সভ্যতা অঙ্কুরিত হয়, বাঙালি বিকশিত হতে শুরু করে, অর্থাৎ নদীর প্রবহমান ধারাই হলো বাঙালির রক্তের নিজস্ব ধারা বা গতি, নূপুরের ইতিহাস বিশ্লেষণ আর খণ্ডনমূলক কথা শুনে আমি হারিয়ে ফেলি নিজেকে, সমস্ত সৌন্দর্যের প্রতীক এই মেয়েটি, বাঙালির তাবৎ উপাদান ওর চোখে-মুখে শরীরে ফুটে আছে। চোখ দুটো যেন বা হংসশ্বরী মন্দিরের চূড়া, হংসশ্বরী কোনো প্রচলিত দেবদেবীর মূর্তিকল্পনা নয়, বরং অদ্বৈততত্ত্বের আভাসে সেই ব্রহ্মময়ী পরাশক্তির আরাধনার আহ্বানের আয়োজনই যেন বা পরিলক্ষিত হয় মূর্তি ও মন্দির স্থাপত্যের সর্বাঙ্গে, অবশ্য নূপুর তেমন কোনো দেবী নয় তবেমহাদেবী হয়তো, স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন সেটা আমার কাছে, পৃথিবীর তাবৎ প্রেমিকেরা এ' নিদর্শনকে ভালোবাসতে পারে কিংবা স্বপ্ন দেখতে পারে। নূপুরের চোখের দ্রাঘিমায় তাকিয়ে ভাবলেশহীন আমি নৃ-তাত্ত্বিক হয়ে যাই যেন বা মুহূর্তে, মেয়েটি কি নদী নাকি দূরতম কোনো দ্বীপের সমাহার, মাথার দু'চারটে চুল বাতাসে খেলতে-খেলতে মুখের সামনে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে যায়, বাংলাদেশ এবং বাঙালির রয়েছে সমৃদ্ধ হাজার বছরের ইতিহাস, এ ইতিহাস গৌরবগাথা ইতিহাস সন্দেহ নেই। ওর হাসির মধ্যে গুপ্ত ও গুপ্তপূর্ব যুগের কিছু নিদর্শন লুকিয়ে আছে, ডুবুরির মতো সাগরের তলদেশে অনুসন্ধান করে সেই ইতিহাস কি পাওয়া সম্ভব! বাবরি মসজিদ ধ্বংসের


আল্লাহ সর্বশক্তিমান
জয় বাংলা ● জয় বঙ্গবন্ধু
৫নং খাংড়া ইউনিয়নবাসীকে জানাই
পবিত্র ঈদ-উল ফিতর
এর ঈদ মোবারক
আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
জনাব শফিকুল ইসলাম (শফি)
চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী, ৫নং খাংড়া ইউনিয়ন পরিষদ
প্রচারে : ৫নং খাংড়া ইউনিয়ন পরিষদের সর্বস্তরের জনগণ


পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকল সম্মানিত
গ্রাহক- ক্রেতাদেরকে জানাই
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
ঈদ মোবারক
মেসার্স ভুঁইয়া টাইলস হাউস-২
এখানে সকল প্রকার টাইলস্ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
প্রোপ্রাইটর ঃ নুরুজ্জামান ভুঁইয়া।
শহিদ টাইলস্ মার্কেট (হাজী ফালু মিয়া সুপার মার্কেট)
নৌলাপাড়া, ভবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।
মোবাঃ ০১৭১২-৩৮৫৯৬১, ০১৯১৩-৪৪৩১৯১, ০১৭৩১-৩৭৩০০৪।

পূর্বেই কতিপয় উগ্রপন্থি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্নভাবেপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে বাবরী মসজিদের নিচে রামমন্দির আছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা কতিপয় উগ্র জাতীয়তাবাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলে, হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা যেটাকে বলা হচ্ছে, তা আসলে সঠিক নয়, এটা আসলে সরস্বতী সভ্যতা। পোড়ামাটি নির্মিত একটা কারুকার্যখচিত মন্দির আবিষ্কার করার জন্য সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসকে বিকৃত এবং ক্রমেই জর্জরিত করে ফেলছে মানবসভ্যতাকে। ওদের চোখে ধর্ম যতখানি বড়, মানুষ ততখানি ছোট, অথচ সবসভ্যতা মানুষকে সামনে রেখেই গড়ে উঠেছে, নূপুর একদিন জানালো, মানুষকে তার সভ্যতার ইতিহাস থেকে যত দূরেই রাখা হোক না কেন, সে কিন্তু তার শেকড়ের কাছে মোটা দাগে বলতে গেলে মৃত্তিকার সন্নিকটে ফিরে-ফিরে আসবেই আসবে...একদল নৃ-তত্ত্ববিদ-প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ধারণা অনুযায়ী বাঙালি বা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দেহবৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক তার রক্ত আর ভাষার প্রকৃতি, আদি বাঙালির বস্তুগত সংস্কৃতিড়-আধুনিক গবেষণায় এবং জরিপ করে জানা যায়, বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশের মূল ভূমি গঠিত হয়েছে কুড়ি থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর পূর্বে, ভূ-তাত্ত্বিকগণের ভাষায় সেটা 'পাওসিন যুগ'। তবেএ' ভূ-খণ্ডে কত আগে থেকে আদি মানবের অস্তিত্ব ছিল তা নিশ্চিতভাবেবলা কঠিন, প্রস্তর যুগের প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হওয়ার পর একটু নিশ্চিত হওয়া গেছে, প্রস্তর যুগে মানুষের বাস ছিল ভূ-খণ্ডেড়-তারপরও একটা প্রশ্ন রয়েই গেছে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যারা বসতি গড়েছিলেন, আধুনিক বাঙালি জনগোষ্ঠী কি তাদেরই উত্তরাসূরি! মৌর্য-গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর কালের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত হয়েছে বাংলা বা বাঙালির ইতিহাস।

নূপুরের চিবুকের বিন্দু-বিন্দু সাবু দানার মতো ঘাম দেখে মনে হয় শীতের প্রভাতে শিশিরে সিক্ত কচি দূর্বা ঘাসের ডগা। স্পর্শ করার একটা সূক্ষ্ম বাসনা মনের ভেতর ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, আঁকুপাঁকু করছে দু'কূল ছাপিয়ে ওঠা ভালোবাসা। হাজার বছরের লাবণ্য আর দমোদর নদীর তীরে বীরবানপুরে ছয় হাজার বছর আগের যে প্রত্ননিদর্শন পাওয়া যায়, তার চেয়ে অধিক হীরা-মানিক-জহরত খুঁজে পাওয়া যাবেঅফ্রিদিতি তোমার ওই সৌন্দর্যমণ্ডিত নকশাকাটা মুখাবয়বে। আমি তন্ময় হয়ে আকাশের মতো সাগরের তলদেশে হারিয়ে ফেলি নিজেকে, কোথায় আমার আমি, আমি যেন অন্যরকম একটা মানচিত্র। মনে হয় আমার আত্মার অভ্যন্তরে এখনো প্রাণ স্থাপিত হয়নি, বিনাশী মরণাস্ত্র আমার অস্তিত্বকে কোনোদিন ছিন্নভিন্ন করতে পারবেনা। কারণ আমি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে পেন্ডুলামের মতো বিরামহীন একটা গ্রহ। শুধু তোমার জন্য মেরিলিন মনরো আমার এই বেঁচে থাকা শামুকের খোলসে, বিহ্বলদন্তি হবো বলে রোমান্থর করছি না, আক্ষরিকভাবেপুনরায় বলতে চায়, আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি এবং সে কারণে আমার এ আখ্যান, আমার এই আচম্বি দীপাবলি।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর গল্পমালা আমি শুনেছি আব্বা-বড়চাচা এবং বয়জ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের মুখ থেকে। ১৯০৬-এ বঙ্গবঙ্গের ফলে যে জাতির স্বপ্নগুলো একটু-একটু করে অঙ্কুরিত হতে থাকে, মাথা তুলে দাঁড়াবার মর্যাদায় নিজেরা আনন্দে আত্মহারা, সেই জাতিকে ১৯১১-তে আবার তিমিরে পাঠিয়ে দিল কারা, কার ইশারায় এবং কূটকৌশলে বঙ্গভঙ্গ রদ হলো এবং মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর সমস্ত আয়োজন চিরতরে স্তম্ভিত হলো। অনেক মাথা ফাটিয়ে, চড়াই-উতরায় পেরিয়ে অবশেষে স্বাধীন একটা দেশ পাকিস্তান হলো, স্বপ্নরাঙানো সোনালি ভোরের দলিজে ডেকে উঠল একটা মাছরাঙা, কাকচক্ষু দীঘির পানিতে ভেসে ওঠে যে শাপলা-শালুক, তার জন্য মন পোড়ে, মন যেন হারিয়ে যায় কোথায়, কিন্তু তারপর, হয়তো তার আর কোনো পর নেই, এভাবেই হারিয়ে যায় একটা আদি সত্য, একটা আধুলি অথবা একটা খুব চেনা মানুষের মুখ এবং তারপর...শান্তিপুরের সুবিশাল নীলিমা-মৃত্তিকা ছেড়ে চলে আসে শত-শত পরিবার, যাদের চোখে স্বপ্ন-সাধ আর বেঁচে থাকার প্রত্যাশা দাউ-দাউ জ্বলছে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদিও ব্যবসায়ী, তারা সমগ্র বাংলায় ব্যবসার জন্য ছুটে বেড়িয়েছে একসময়। রাজশাহীর রাণীবাজারের 'ঘড়িঘর' আমাদের পূর্বপুরুষ মুন্সী গোলাম রহমান শাহর ব্যবসাকেন্দ্র এবং বসত ছিল, ঘড়ি-চশমার পাশাপাশি কলেরগান-হারমোনিয়াম-ডুগি-তবলা-তানপুরা প্রভৃতি বিক্রিসামগ্রী, (তৎকালীন সময়ে এসবের ক্রেতা ছিলেন শৌখিন রাজা-জমিদার) অঢেল জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তির মালিক, তারপরও তৎকালীন ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করতেন তিনি। তার চার ছেলে, মফিজ উদ্দীন আহমদ সবার বড় হলেও শান্তিপুরই জীবনের বেশি সময়টা কাটান, তার ছেলেরা পরবর্তী সময়ে এপার বাংলায় চলে আসে, রাজনৈতিক কারণের চেয়ে অর্থনৈতিক কারণটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমার নানা-মামাদের পরিবারের কেউই আর পূর্বপাকিস্তান আসেনি, কেন যে আসেনি, সে ইতিহাস অজানা একটা দ্বীপের মতো রয়ে গেছে আজও।

আজ কতগুলো বছর কেটে গেছে, জানালার শার্শি ধরে দূরের আকাশ দেখি, আকাশ বড় শান্ত, উদার তার নরম জমিন। কোথায় যেন হারিয়ে গেল সে সমস্ত রঙের দিন। নূপুর নেই, বাতাসে তার চুলের ঘ্রাণ বারবার ধাক্কা দেয় নাকে, ধাক্কা দেয় জীবনের অনেক-অনেক ভালোবাসা, নদীর গল্প, নীলকমল, চেতনার সুর, প্রজাপতি সময়, রঙিন ঘুড়ির সেই চঞ্চলা দিন। বেলা বয়ে যায়, অনেক দূর থেকে পাখির কলকাকলির সঙ্গে আসরের আজান ভেসে আসেড়-এমন দিনে কোথায় পাবো তারে/ মন বলে যারে পাগল, অনেক অনেক দূরে...মুয়াজ্জিনের আজানের মধুর রেশে মন-প্রাণ কেমন উদাসীন হয়ে যায়। দূরে-দূরে অনেক দূরে হারিয়ে যায় মনপবনের ঘুড়ি। নূপুরকে পায়নি, নূপুর নদীর মতো নিজের খেয়ালে নিরবধি সুর ধরে অনেক-অনেক দূরে চলে গেছে, আমার জীবনের তাবৎ খেলা-হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা সবসবই মৃত্তিকার ভেতর মাথা গুঁজে থাকে, আমি কেবলই নিরুপায়। দেখছি খেলা কে যেন খেলছে তামাম বিশ্বটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে, আমি কি চিনি, অথবা শুধুই মরীচিকার পেছনে দৌড়ানো, হয়তো এভাবেই দৌড়াতে-দৌড়াতে একদিন আদি পৃথিবীর কাছাকাছি পৌঁছিয়ে যাবো।

অন্ধ আমি পড়ে আছি নিজের খোলসে, চোখের সামনে একটা মস্ত প্রাচীর, সাতচল্লিশের দেশভাগের মতো আরেক খাপছাড়া দুর্ভেদ্য প্রাচীর। স্বপ্নগুলো দ্রবীভূত হচ্ছে প্রতিদিন, তারপরও অন্ধকারের বৈসাদৃশ্য বুঝতে বড় কষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক কাল ধরে এভাবেছুটে চলা হয়তো লক্ষ্যহীন কিন্তু অন্ধকারের মাঝে কে চিনিয়ে দেবেসেই জোনাক জ্বলা মেঠোপথ। বেত্রাঘাতে শরীর ছিন্নভিন্ন হলেও বাঁকাচোরা পথ ধরে ছুটে যায় সময়ের স্রোতে, নির্বিকার চাঁদ হয়তো নবোঢ়া সেজে বসে থাকবেসাদা চুনকামের ছাদে। অন্ধ হলেও বন্ধ কি হবে পেন্ডুলাম, অপরাজিতা সৌন্দর্য সাজিয়ে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দেবে। হায় অগ্রদূত, আর কতদূর ভালোবাসার সেই নদী, খরস্রোতা নদী বিপুল জলরাশি বুকে নিয়ে বয়ে চলে আপন বেগে, অকৃপণভাবেপলি দান করে দুই ধারের ফসলি জমিতে, আর ওই নদী আবার হয়ে ওঠে কখনো সর্বগ্রাসী, তারপর অন্য ইতিহাস, নিস্তব্ধতা, খেয়াল বা ঠুমরির সুর বা মুর্চ্ছনা আর ঘুঙুরের রিনিঝিনি আওয়াজ। তারপরও কদাচিৎ মাঝরাত্রে অনেক নদী-সাগর, পেরিয়ে নূপুর আসে চুপিচুপি ঘুমকাতুরে এই দেশের সবুজ মানচিত্রে। স্বপ্ন ঘোরে আমি ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকি নূপুরের জোড়া পায়েলের মতো, ধ্যাবড়া জ্যোৎস্না তখন প্রান্তিক আনন্দে দিশাহীন বেসামাল, বন-জঙ্গল আর নিবিড় বৃক্ষের জাফরি কাটা ছায়ায় মুখ লুকিয়ে রাখি, জ্যোৎস্না অন্ধকারের অনেক দূরের নক্ষত্রদের প্রত্যক্ষ করতে-করতে অকস্মাৎ আলো-আঁধারির মধ্যে হারিয়ে যাই। চৈত্র-সংক্রান্তির মেলায় হাজার লোকের ভিড়ে যেভাবেঅনেক-অনেক দিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল, আজ বহুদিন পর আবার হারিয়ে গেলাম রৌদ্রহীন আলো-ছায়ায়, বাতাসে হয়তো বনতুলসীর গন্ধ অথবা লোবানের ঘ্রাণে মাতাল হয়নি মন, শুধু ঘণীভূত নিরেট ভালোবাসার তোড়জোড়ে।

আবাদ

পার্থ কায়সার

ফুল পারে বাতাসে বিলাতে তার ঘ্রাণ
নদী পারে সাগরে বিলাতে তার জল
বৃক্ষ পারে অক্সিজেন আর ছায়া দিতে
ঝর্ণা পারে নিজ ধারা রাখতে সচল।

তবুও তো ফুল বাতাসে না বিলিয়ে ঝরে যায়
কত নদী তিতাসের মতো হয়ে মরে
প্রতিদিন কতশত বৃক্ষ নিধন হয়
সব ঝর্ণাই কি শেষ পর্যন্ত ঝরে?

কেবা রাখে টুপটাপ ঝরে পড়া শিশিরের খবর
ফিকে হয়ে পড়ে যাওয়া পাতার আর্তনাদ
উলুবনে মুক্তা খোঁজার সময় আছে কার
তবু নীরবে প্রকৃতি করে প্রকৃতির আবাদ।


আল্লাহ সর্বশক্তিমান
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
ঈদ মোবারক
সরিষাবাড়ী পৌরবাসীকে জানাই
ঈদুল ফিতরের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মো: মনির উদ্দিন মনির
মেয়র, সরিষাবাড়ি পৌরসভা


আল্লাহ সর্বশক্তিমান
জয় বাংলা ● জয় বঙ্গবন্ধু
ঈদ মোবারক
পবিত্র ঈদুল ফিতর
উপলক্ষে
সকলকে জানাই
পুষ্প অভিনন্দন
মোঃ হাবেদুর রহমান (খোকা সিকদার)
শরীয়তপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
শরীয়তপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি

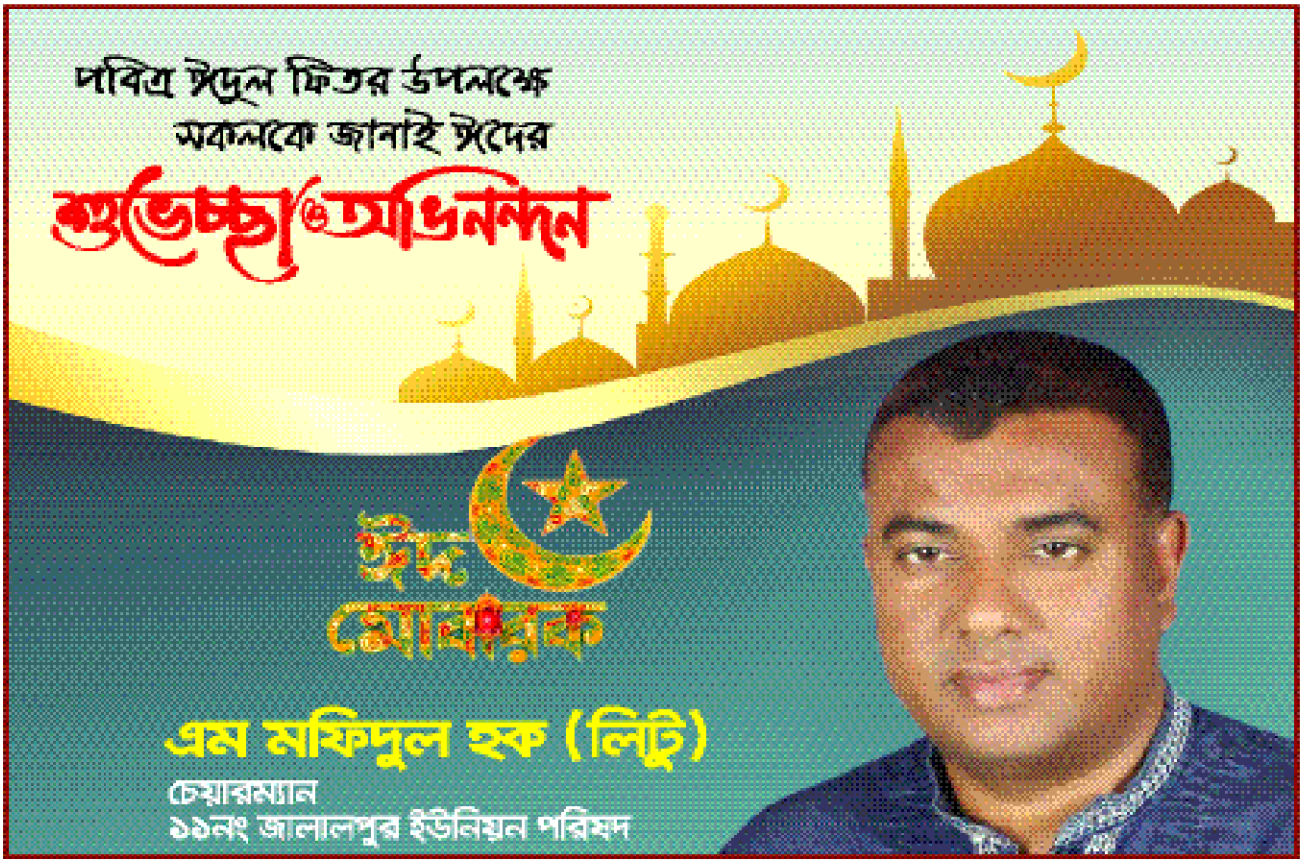
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই ঈদের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
ঈদ মোবারক
এম মফিদুল হক (লিটু)
চেয়ারম্যান
১১নং জালালপুর ইউনিয়ন পরিষদ


ঈদ মোবারক
পবিত্র ঈদুল ফিতর
উপলক্ষে
সকলকে জানাই
ঈদের শুভেচ্ছা
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
মুহাম্মদ শামীম আল মামুন
প্রধান শিক্ষক
শহীদ শাহেদ হাজারী উচ্চ বিদ্যালয়
ছাতিহাটী, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।



কেতাবপুরের হাট

গল্প

শওকত নূর

আগন্তুকের আগমন নিয়ে কেতাবপুর হাটবাসীদের কাউকেই কোনো ভ্রুক্ষেপে মাততে দেখা গেল না। ঘোড়ায় চড়ে সে যখন শূন্য হাটখোলায় এসে পৌঁছেছে, তখন ভর দুপুর। চৈত্র শেষের আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা না থাকলে প্রকৃতি অদৃষ্টে যা অবধারিত হয়ে ওঠে, হাট প্রকৃতিও তার ব্যতিক্রম নয়। তামাম খোলাজুড়ে কোথাও ঘাসের চিহ্ন নেই, জ্বলেপুড়ে গেছে প্রায় প্রতিটি গাছের পাতা ও মাথা। একমাত্র বিশাল বটগাছের নিচটাই এখনো ছায়া সুশীতল। ঘোড়ার পিঠে সেখানেই স্থির হয়েছে আগন্তুক। চারদিকের ছোট ছোট টিনের তৈরি দোকান ঘরগুলো খোলা থাকলেও রৌদ্র তাপের কারণেই ক্রেতার উপস্থিতি বিরল। দোকানিদের অনেকেই ঘুমাচ্ছে কিংবা ঝিমাচ্ছে। যাদের মধ্যে খানিকটা স্বাভাবিক ভাবলক্ষণীয় তারা আগন্তুকের বিষয়ে একেবারে নির্বিকার। আসলে আগন্তুকের বেশভূষা মনুষ্যকৌতূহল উদ্রেকের বিশেষ দাবিরাখে না। পরিচ্ছদ জীর্ণ ছিন্ন, চুল-দাড়ির উস্কখুস্কতা কেড়ে নিয়েছে মুখমণ্ডলের স্পষ্ট দৃশ্যমানতা; কাঁধের তেল চিটচিটে ঝোলাটি এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে ভিক্ষুক সম্ভাব্যতায় সন্দেহাতীতভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে দৃষ্টি নিক্ষেপকারীদের দৃষ্টিতে। আকার আকৃতি ও জলুসহীনতায় তার ঘোড়াটি একেবারে গাধাবৎ। ঘোড়া থেকে তাই খুব নির্বিঘ্নেই নেমে গাছের কোটরে আশ্রয় করে সে। কোটর থেকে থালা বাড়িয়ে ধরে বাইরে পাতা ছেঁড়া-সেলাই শতরঞ্জিতে। গাধার মতোই ছলছল হয়ে ওঠে শতরঞ্জি পাশে শুয়ে থাকা ঘোড়ার চোখ।

আজ হাটবার নয়; তবু পড়ন্ত বেলায় রৌদ্রদগ্ধতা কমে এলে চত্বর দিয়ে লোক চলাচল শুরু হতে থাকে। বাটিতে এক এক করে সশব্দে কিংবা নিঃশব্দে কিছু পয়সাকড়ি পড়তে থাকে। ঘোড়াটি জনমনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক করে না। এমন একটা গরিবি ঘোড়া থাকতেই পারে কোনো শৌখিন কিংবা বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকের। পয়সাকড়ি দিয়ে নিঃশব্দে চলে যায় সবাই। থামে না কেউ। এবারই প্রথম একজন থেমেছে। মোটরবাইকে উপবিষ্ট সে। থালায় পয়সা ছুড়ে কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্য এক বাইক আরোহী এসে তার গা ঘেঁষে বাইক থামায়। দু'জনে খানিকক্ষণ কথোপকথনে লিপ্ত হয়: এই শালা কেতাবপুরের হাটে যত রকমের কারবারি আছে সবনষ্ট মাল। বাতিল, পরিত্যক্ত। একটারও আর ফিটনেস নেই। যতসবআইলসার আইলসা, কুইঢ়ার রাজা। সেই কবেবাইক ঠিক করতে দিছি, কাজে হাত দেওয়ার নাম নেই। এরা সবনষ্ট হয়ে গেছে। অথচ ভাবে, তারা সবঠিক আছে। এমন কেউ কি আছে এদের গুঁতা মাইরা ঠিক পথে আনে? নাই, কেউ নাই। হায়রে, কেউ নাই।

কথা বলতে বলতে দ্রুত বাইক টান দেয় দু'জনে। তখনই গাছের কোটর থেকে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, আছি, আমি আছি।

আরে ব্যাটা ভিক্ষুকের বাচ্চা কয় কী? তামাশা পাইল নাকি ? হাঃ হাঃ হাঃ। উৎকট হাসতে হাসতে হাটচত্বর পেরিয়ে যায় দু'জন।

মোটরবাইকের শব্দ হাওয়ায় মেলাতেই টুঁ টুঁ শব্দে ঠিক ওখানেই দাঁড়ায় এক সাইকেল আরোহী। সেও কারও জন্য অপেক্ষায় রত। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্য এক আরোহী এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। আপাদমস্তক ঘোড়াটাকে নিরীক্ষণের ফাঁকে সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, নাহ! এই কেতাবপুরের হাট আর সেই হাট নেই। কার জানি মরা ঘোড়া! কারবারিরা সবনষ্ট, বাতিল মাল, পরিত্যক্ত। অথচ তারা ভাবে, তারা সবঠিক আছে। বয়স বাড়লে মানুষের কাজের দক্ষতা কমতে পারে, যদি না চেষ্টা দ্বারা নিজেদের ঠিকঠাক রাখা হয়। এরা তার ধারে-কাছে নেই। সব শামুকগতির, ঢিমে তেতালা, অথচ ভাবে তারা আগের মতোই আছে। তিন দিনেও নেপাল মুচি জুতাটা ঠিক করে নাই; কথা ছিল এক দিনে ঠিক করার। শুধু মুচি না,



আর হতাশা নয় সফলতার জন্য আসুন

জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশ্‌তী

আপনার মুখ দেখেই বলে দিতে পারেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ



রত্ন পাথর পরিধান করলে শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, নারী পুরুষের যৌবন বৃদ্ধি, রোগ থেকে মুক্তি, স্ত্রীদের লাবণ্য বৃদ্ধি, বার্ধক্যের ছাপ দূর করে। গোপন শত্রু থেকে মুক্ত হওয়া, দুর্বিপাক বিপদ-আপদ, মনের অশান্তি দূর করে, অর্থ সম্পদের সহায়ক, ব্যবসায়িক মন্দা দূর করে, জ্ঞান বৃদ্ধি, সন্তানের লেখাপড়ায় মনযোগী, দাম্পত্য কলহ দূর, বিবাহে বাধা, বাদ ফিরানো, স্বামীর পরকীয়া প্রেমের আসক্তি থেকে মুক্তি, জটিল মামলার সহজ সমাধান, বিদেশ যাত্রায় বাধা দূর হয় রত্ন পাথর ব্যবহারের মাধ্যমে। সব ধর্মের মানুষই রত্ন পাথর ব্যবহার করতে পারেন। অভিজ্ঞ জ্যোতিষের পরামর্শ ব্যতিত রত্ন পাথর ধারণ করবেন না? আপনার হাতের রত্ন পাথরটি সঠিক কিনা জেনে নিন। অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে সব ধরনের রত্ন পাথর পরীক্ষা করা হয়। রত্ন পাথর পরিধান করে সর্বপ্রথম নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত হীরা সহ সবধরনের রত্ন পাথর সুলভে বিক্রি করা হয়। এখানে সকল প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।



ভারতীয় বাংলা অভিনেত্রী দেবিকা মুখার্জী-এর হাত ও মুখ দেখে ভবিষ্যৎবাণী করছেন জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশ্‌তী।



ভারতীয় বাংলা অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী-এর হাত ও মুখ দেখে ভবিষ্যৎবাণী করছেন জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশ্‌তী।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মহানগরের মাননীয় মন্ত্রী এম. এ মান্নান এম.পি-এর নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ হিসাবে পদক গ্রহণ করছেন জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশ্‌তী।



কানাডা বিজনেস কাউন্সিল এর চেয়ারপার্সন ব্যারিষ্টার জেরজিনা বেনসিক এর নিকট হতে রত্ন বিশারদ হিসাবে সনদপত্র গ্রহণ করছেন জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশ্‌তী।

লিটন দেওয়ান চিশ্‌তীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: লিটন দেওয়ান চিশ্‌তী মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার বিবন্দী বাগবাড়ী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মো. আব্দুস সাত্তার দেওয়ান চিশতী ইসলামের আলোকে আলোকিত অতি উচ্চমানের একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। একইসাথে বিভিন্ন অলি আওলিয়া, দরবেশের দরবার ও মাজার শরীফ জিয়ারত করেছেন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় চিশতীয়া তরিকার আলোয় আলোকিত করেছেন। ওলিকুলের শিরোমণি, উপমহাদেশের বিখ্যাত ওলি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এর দরবার শরীফে যাওয়ার পর ২৩তম বংশধর আজমীর শরিফের বর্তমান পীর সাহেব হযরত সৈয়দ হাসনাইন চিশতী (রহ.) এর নিকট থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হন লিটন দেওয়ান চিশতী।

লিটন দেওয়ান চিশ্‌তীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ অবদান ও নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণীর স্বীকৃতিস্বরূপ লিটন দেওয়ান চিশতী-কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিচারপতি, আইন বিশেষজ্ঞ ও মন্ত্রীবর্গ বিভিন্ন সময়ে সনদ ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমাদের বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় সংসদের সাবেক স্পীকার মো. আব্দুল হামিদ। তাছাড়াও সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমীর হোসেন আমু, বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জমান খান কামাল এম.পি, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, বর্তমান পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহম্মেদ মজুমদার এম.পি, প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, সাবের হোসেন চৌধুরী, সাবেক শিল্পমন্ত্রী দিলিপ বড়ুয়া, ডেপুটি স্পীকার লে. কর্নেল (অব.) শওকত আলী, সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আনোয়ারুল কবির তালুকদার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন, সাবেক সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুল হক মোস্তফা শহীদ, আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি সিদ্দিকুর রহমান মিয়া, সাবেক বিচারপতি লতিফুর রহমান, বিচারপতি এম এ ওহাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভি সি প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ, এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণীর জন্য বিভিন্ন সময়ে সনদপত্র, প্রশংসাপত্র এবং স্বর্ণপদক প্রদান করেন। কিংবদন্তী অভিনেত্রী কবরী সারওয়ার এম.পি. এর নিকট থেকে বাংলাদেশ কালচারার সোসাইটি কর্তৃক লাইফ টাইম এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। প্রয়াত অভিনেতা নায়করাজ রাজ্জাক- এর নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী পদক গ্রহণ করেন। এছাড়াও সাবেক ইরাকের রাষ্ট্রদূত আদনান হাতাব ও ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রদূত সাহ্‌তা জারাব অভ্যর্থনার মাধ্যমে নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণীর জন্য পুরস্কার প্রদান করেন। ০৩-০৬-২০১০ইং তারিখে কানাডার টরেন্টোতে অবস্থানকালে কানাডা বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল-এর চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার জেরজিনা বেনসিক-এর নিকট থেকে রত্ন বিশারদ হিসাবে স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন।

আজমেরী ব্রেসলেট, আজমেরী লকেট, আজমেরী চেইন, আজমেরী শনী রক্ষাকবজ, আজমেরী ত্রিরত্ন, আজমেরী নবরত্ন, আজমেরী দ্রব্য

রোগী দেখার সময়ঃ সকাল ১০.০০ টা থেকে রাত ৮.০০ পর্যন্ত (মঙ্গলবার সাপ্তাহিক বন্ধ)

শেষ দর্শন আজমেরী জেমস হাউস লিঃ

দোকান # ৭৩, ৭৪, ৮৭, ১০০, ব্লক # ডি, লেবেল # ১, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স, ঢাকা-১২১৫। ফোনঃ ৯১৩৯৩৫৯, মোবাইল : ০১৭১১৫৯৪০৮৮, ০১৭৭৭০০৩৩৪৪, ০১৭৭৭০০৩৩৮৮,

E-mail: ajmerigemshousebd@gmail.com, www.ajmerigemshousebd.com ★ আমাদের বসুন্ধরা সিটি শপিংমল ছাড়া আর কোন শাখা নেই


আল্লাহ সর্বশক্তিমান
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
মহেশপুর সাব রেজিস্টার
অফিসের সকল দলিল
লেখকদের পক্ষ থেকে
ঈদুল ফিতরের
শুভেচ্ছা
ঈদ মোবারক
তাইজুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী
সভাপতি
মহেশপুর একতা দলিল লেখক সমিতি
মহেশপুর, ঝিনাইদহ।



আল্লাহ সর্বশক্তিমান
- জয় বাংলা
- জয় বঙ্গবন্ধু





২০৩০ সালের মধ্যে **বান্দরবান পৌরসভাকে** উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা, শতভাগ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্লাবসহ আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ পৌরবাসীর সকল কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত, পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন বজায় রেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আধুনিক মডেল পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা বান্দরবান পৌরবাসী বদ্ধপরিকর।

পৌর নাগরিক হিসেবে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করুন:

- সময়মতো পৌরকর পরিশোধ করুন।
- এ শহর আপনার-আমার, সকলে মিলে শহরটিকে পরিষ্কার রাখি।
- স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করুন, খোলা টয়লেট বন্ধ করুন।
- ভবন নির্মাণের পূর্বে পৌরসভার অনুমতি নিন এবং বিল্ডিং কোড মেনে চলুন।
- আপনার শিশুকে সময়মতো টিকা দিন, সময়মতো জন্ম নিবন্ধন করুন।
- ড্রেনে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে ডাস্টবিনে/নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলুন।
- পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আপনার বাড়ির আঙিনা ও আশপাশে গাছ লাগান।
- নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন ও পরিবারের সকলকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- পরিবেশ রক্ষার্থে পাহাড় কর্তন বন্ধ করুন।
- ড্রেন, ফুটপাত, রাস্তা দখল থেকে বিরত থাকুন।

ঈদ মোবারক



পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই ঈদের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মোহাম্মদ ইসলাম বেবী
মেয়র
বান্দরবান পৌরসভা।

উদয়ন - বাংলাদেশ, বাগেরহাট এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই

পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

ঈদ মোবারক



শুভেচ্ছান্তে

সাংবাদিক ইসরাত জাহান

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, উদয়ন - বাংলাদেশ, বাগেরহাট।

উদয়ন গ্রুপের প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

- উদয়ন স্কুল, শরনখোলা, বাগেরহাট
- উদয়ন অটিজম সেন্টার, বাগেরহাট
- উদয়ন ব্যাংক এশিয়া আউটলেট (শরনখোলা - মোড়েলগঞ্জ)
- রেডিও ভৈরব (কমিউনিটি রেডিও) বাগেরহাট
- আছাদ ইন্টারন্যাশনাল, বাগেরহাট
- ইসরাত কনস্ট্রাকশন, বাগেরহাট

শেখ আসাদ

চেয়ারম্যান, উদয়ন গ্রুপ, বাগেরহাট।

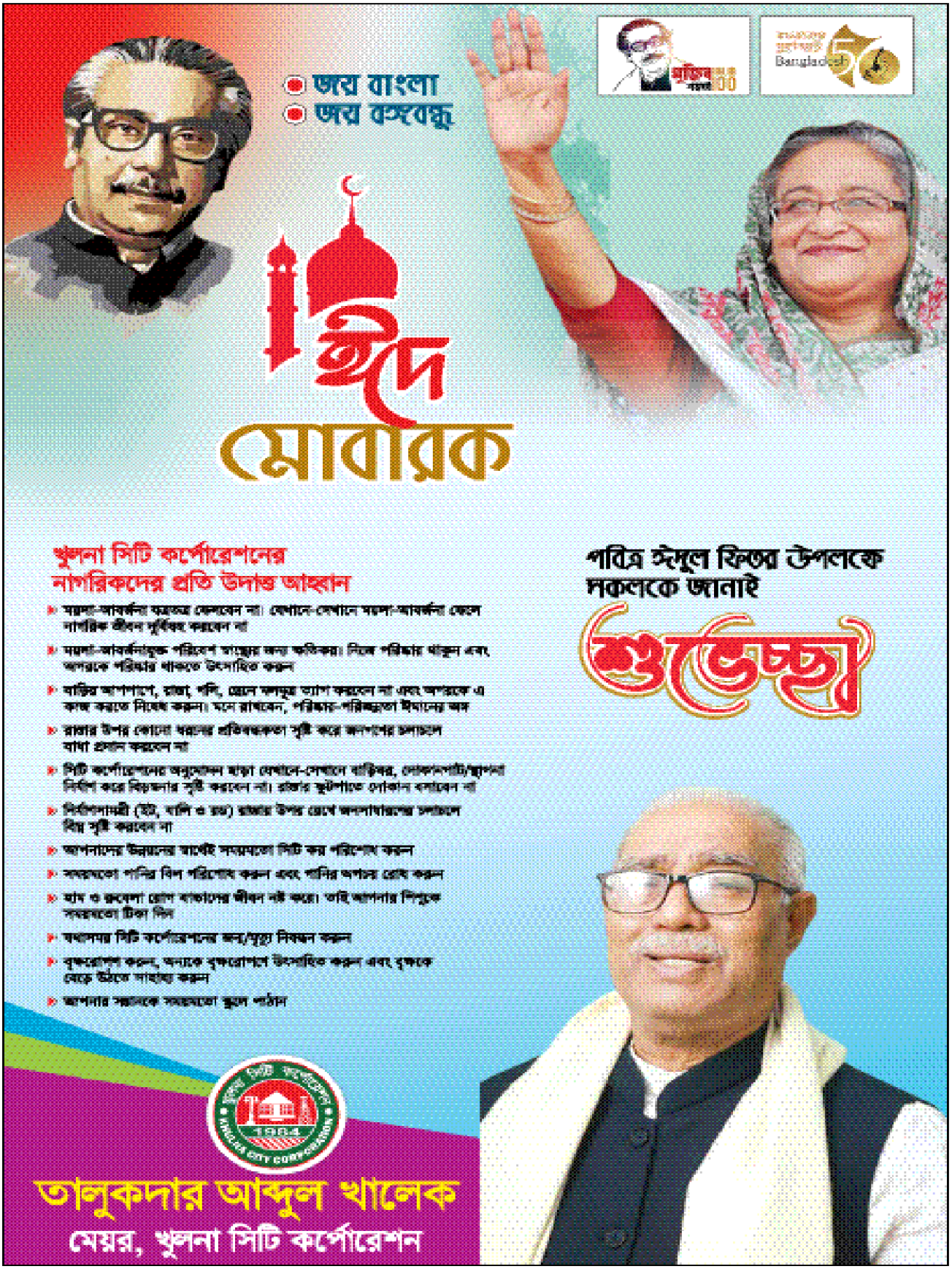
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
ঈদ
মোবারক
খুলনা সিটি কর্পোরেশনের
নাগরিকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান
ময়লা-আবর্জনা রাস্তায় ফেলবেন না। যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলে নাগরিক জীবন দুর্বিষহ করবেন না
ময়লা-আবর্জনামুক্ত পরিবেশ স্বাস্থ্যের জন্য অতিকর। নিজে পরিষ্কার থাকুন এবং অপরকে পরিষ্কার থাকতে উৎসাহিত করুন
বাড়ির আশপাশে, রাস্তা, পলি, ড্রেনে ময়লা ভাসা করবেন না এবং অপরকে এ কাজ করতে নিষেধ করুন। মনে রাখবেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ
রাস্তার উপর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জনগণের চলাচলে বাধা প্রদান করবেন না
সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন ছাড়া যেখানে-সেখানে বাড়িঘর, দোকানপাট/স্থাপনা নির্মাণ করে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করবেন না। রাস্তার ফুটপাতে দোকান বসাবেন না
নির্মাণসামগ্রী (ইট, বালি ও ছাই) রাস্তার উপর রেখে জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না
আপনাদের উন্নয়নের স্বার্থেই সময়মতো সিটি কর পরিশোধ করুন
সময়মতো পানির বিল পরিশোধ করুন এবং পানির অপচয় রোধ করুন
মাদক ও জুয়েনা রোগ বাঙালির জীবন নষ্ট করে। তাই আপনার শিশুকে সময়মতো টিকা দিন
যথাসময়ে সিটি কর্পোরেশনের জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন করুন
বৃক্ষরোপণ করুন, অন্যকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করুন এবং বৃক্ষকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করুন
আপনার সন্তানকে সময়মতো স্কুলে পাঠান
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
সকলকে জানাই
শুভেচ্ছা
1984
KHULNA CITY CORPORATION
তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন


আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান
জয় বাংলা ● জয় বঙ্গবন্ধু
বান্দরবান পৌরসভা ও ৬নং ওয়ার্ডবাসীকে জানাই
পবিত্র ঈদ-উল ফিতর
এর
ঈদ মোবারক
আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
সৌরভ দাশ (শেখর)
প্যানেল মেয়র, ৬নং ওয়ার্ড, বান্দরবান পৌরসভা, বান্দরবান।


আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান
জয় বাংলা ● জয় বঙ্গবন্ধু
ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ধামরাইয়ের
সূতিপাড়া ইউনিয়নবাসীকে জানাই
শুভেচ্ছা
ঈদ মোবারক
মোঃ রেজাউল করিম রাজা
চেয়ারম্যান, সূতিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
ধামরাই, ঢাকা।



বাংলাদেশে এই প্রথম
গ্রীন লাইন পরিবহন
নিয়ে এলো
ঢাকা-কক্সবাজার ও
চট্টগ্রাম-বেনাপোল এ
AC Sleeper Coach

বিশ্ববিখ্যাত সুইডেনের SCANIA
Luxurious Air Condition
Business Class Bus
ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, খুলনা ও বেনাপোলের সম্মানিত যাত্রীদের মন জয় করে এখন Silk City রাজশাহীতে নিয়মিত চলাচল করছে।
রাজশাহী: ০১৭৩০০৬০০৫০, ০৭২১৮১২৩৫০





সবচেয়ে দ্রুত গতির
M.V. GREEN LINE-1
এখন টেকনাফ-সেন্টমার্টিন-টেকনাফ
চলাচল করছে।
(Full AC Catamaran)

GREEN LINE PARIBAHAN
গ্রীন লাইন পরিবহন
All the way first class

বুকিং কাউন্টার

রাজারবাগ : ৮৩৩১৩০২, ৫৮৩১৩০০৫
কল্যাণপুর ১: ৯০০৮৬৯৪, ৮০৩২৯৫৭
ফকিরাপুল : ০৪৪৭৮৬৬০০১৫
উত্তরা : ০১৯৭০০৬০০৭৫
সিলেট : ০১৭৩০০৬০০৩৬
যশোর : ০১৭৩০০৬০০৩৮
আরামবাগ : ০১৭৩০০৬০০০৯
সায়েদাবাদ : ০৪৪৭৮৬৬০০১১
চট্টগ্রাম : ০১৯৭০০৬০০৮৫
কক্সবাজার : ০১৭৩০০৬০০৭০
বেনাপোল : ০১৭৩০০৬০০৩৫
খুলনা : ০১৭৩০০৬০০৩৭
কল্যাণপুর ২: ০১৭৩০০৬০০৮০
কলাবাগান : ০১৭৩০০৬০০০৬
চট্টগ্রাম : ০১৭৩০০৬০০৮৫
এ.কে. খান : ০১৭৩০০৬০০২১
কল সেন্টার:
০১৭৩০০৬০০০৪, ০১৭৩০০৬০০৭১
০১৭৩০০৬০০৭২, ০১৯৭০০৬০০০৪

চাল-ডালওয়ালা, তরকারিওয়ালা, হাঁড়ি-পাতিলওয়ালা, মিষ্টিওয়ালা, দইওয়ালা, দর্জি, কর্মকার, সোনারু 'কাঠমিস্ত্রি- সবব্যাটা একই গোয়ালের গরু। জগতের সবচেয়ে বড় আইলসার বাপ তারা। কোনো কাজ তাদের দিয়া আর সময়মতো হয় না। শুধু কি তাই? এই নির্জন ফাঁকায় হাট। ওপাশে খোলা বালুচর পাড়ি দিয়া কত দূরে লোকালয়! রাত-বিরাত প্রায়ই কত অপরাধ খোলা চরটাতে হয়- খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ কত কী! মানুষের চিৎকার চেঁচামেচিতে কোনো দিন এরা সাহায্যের জন্য এক পা আগায় না। একটু দলবদ্ধ আগালে কত প্রাণই না বাঁচতে পারত। এমন কী কেউ নেই এদের গুঁতানাথা দিয়া ঠিক করে? নাই নাই। কেউ নাই। এই কেতাবপুরে আইজ আর কেউ নাই। কথা বলতে বলতে প্যাডেলে চাপ দিতেই কোটর থেকে মাঝারি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, আছি, আমি আছি।

কী বলে ব্যাটা গাইছা ভিক্ষুক? হাতিঘোড়া গেল তল, গাধা বলে কত জল। নিশ্চয়ই ব্যাটার মাথার নাটবল্টু সব গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ। বেদম হাসতে হাসতে সাইকেল হাঁকিয়ে মাঠ ছাড়ে দু'জন।

সূর্যাস্ত যেতেই পুবাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। ঝকমকে গোল রুপালি চাঁদ। পূর্ণিমায় হাটবাসীদের মাঝে উত্তাপ-উচ্ছ্বাস নেই কোনো। প্রতিদিনের মতোই বেচাবিক্রিতে ধীরস্থির, নির্লিপ্ত তারা। কেউ ঝিমায়, কেউ ঘুমায়, কেউ দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পাখা করে। মনে হয় যত ঘুরার দায়িত্ব সবএক পৃথিবীর, চিরকাল সে ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে; ঘুরবে। তারা কেউ ঘুরবেনা। অতএব, নীরবনির্বিকার।

বটের ছায়া বিস্তৃত হয়েছে হাট মাঠের বেশ কিছুদূর অবধি। সে ছায়ায় থমকে দাঁড়ায় দু'জন স্ত্রীলোক। ছায়া ভীতিই তাদের দাঁড় করিয়েছে ছায়ায়। তারা চায় চাঁদ অতি শিগগির আরও উপরে উঠে আসুক। এমন উপরে যে গাছপালার ছায়া হবেনা তেমন, কিংবা হলেও হবেখুবই ছোট-সংক্ষিপ্ত। তবেই তারা নিরাপদে চর, নদী, নদীর ওপারের লোকালয় পাড়ি দেবে। তাদের কথোপকথনের ফাঁকে আগন্তুকের ঘোড়াটি চি-হি-হি করে ওঠে। চমকে ওঠে স্ত্রীলোক যুগল। কী যেন ফিসফিস করে। ক'মিনিট যেতেই আরও দু'জন স্ত্রীলোকের আবির্ভাব ঘটে। তারা জানায়, তারা একই পথের যাত্রী। তবেআর জোছনা রাতে একযোগে পথ চলতে ভয় কী? শিগগিরই একযোগে পা চালিয়ে তারা হাটখোলা ছাড়ে। খানিক হাঁটে, খানিক জিরায়; আবার হাঁটে, আবার জিরায়। এভাবেই চলতে থাকে।

চরের মাঝামাঝি বেশ খানিকটা জায়গায় কাশ ছোপ, আঁকড়ার ঝোপ। হাটখোলায় আগে দাঁড়ানো স্ত্রীলোক দু'জন এখানে এসে ইতস্তত করে। পরে যারা ওখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা অভয় দেয়। ঝোপ হলেও ওগুলো খাটো, এমন ভর জোছনায় কী এমন ভয়? আবারও চলতে শুরু করে চারজন একযোগে। খানিকক্ষণ হাঁটতেই ভিন্ন দৃশ্যপট জাগে। ওইসবখাটো ঝোপের আড়াল থেকে আচমকা উঠে আসে কতগুলো উদ্ভট মূর্তি। তাদের আপাদমস্তক সাদা আব্রুতে ঢাকা। শুধু দু'চোখ বরাবর গোলাকার দুই ছিদ্র। পিশাচের ভঙ্গিমায় ঘিরে ধরে তারা হাটখোলায় আগে দাঁড়ানো সেই স্ত্রীলোক দু'জনকে। প্রথমে ছিনিয়ে নেয়া হয় তাদের চটকলে চাকরি বাবদ প্রাপ্ত অর্থকড়ি। তারপর চলে তাদের সম্ভ্রম কাড়ার পালা। তাদের ফুসলে আনা সেই স্ত্রীলোক দু'জন এখন নেই। তাদের জায়গামতো ভিড়িয়ে কৌশলে সটকে পড়েছে তারা। অসহায় স্ত্রীলোক দু'জনের আর্তচিৎকারে কেঁপে ওঠে তামাম চর।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে মূর্তিদল: হাঃ হাঃ হাঃ। চিৎকারের মানে মিছে পাগলামো। ওদিকে আছেই যত সবঅর্থব কেতাবপুর হাটবাসী, বুঝলে গো? এখানে কেউ আসবেনা তোমাদের সম্মান বাঁচাতে। প্রাণে মরতে না চাইলে ভালোয় ভালোয় সবদিয়ে দাও। মিছে সময় নষ্ট করো না। বুঝতেই পারো তোমাদের রক্ষা করবেএমন কেউ নেই। একটা মেছি বিলাইও নেই। হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ হাঃ হাঃ। নেই, নেই, কেউ নেই।

তাচ্ছিল্য হাসি থামতেই ঠিক পেছনেই দৈবকণ্ঠের মতো উচ্চারিত হয় বাক্যটি, আমি আছি, আমি। অস্ত্রহাতে অলৌকিকের মতো ঝোপের আড়াল থেকে উঁচিয়ে ওঠে এক ভিন্ন মূর্তি। তার আপাদমস্তক কালো আব্রুতে ঢাকা।

কে তুই আহাম্মক? মূর্তিদল গর্জে ওঠে।

আহাম্মক নই, তোদের যম। চেয়ে দেখ চারদিকে। এমন ফোর্স এ দেশের প্রতিটি জনপদে আমার আছে। তোদের হত্যা করবনা; শুধু অপরাধের প্রমাণসহ জায়গামতো তোদের পৌঁছে দেবো। তোদের সব কীর্তিকলাপের চিত্র এই ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করা আছে। জানে বাঁচতে চাইলে ওদের ছেড়ে দিয়ে দ্রুত হাতকড়া নে।

মূর্তিদল টের পেল, তাদের প্রত্যেকের মাথায় অস্ত্র ঠেকানো হয়েছে। অতএব, আত্মসমর্পণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। হাতকড়ার উদ্দেশ্যে হাত তোলে তারা।

প্রতিবাদী মূর্তিটি, যার আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা, সে বলে চলল, ভাবিসনে তোরা আইনের চোখে ধুলো দিতে পরে কোনো ছলচাতুরির আশ্রয় নিবি। তাহলে আরও মরেছিস। যাদের উদ্ধার করে নিরাপদে পৌঁছে দিচ্ছি, তারাই আমাদের মদদ নিয়ে তোদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই লড়বে। ছিনতাই, রাহাজানি, Attempt to rape, Attempt to murder. সমাজে যতদিন তোদের মতো হিংস্র নরপশুরা আছিস, এ লড়াই ততদিন অব্যাহত থাকবে। মানে তোরা আছিস, আমি বা আমরাও আছি। আমি আছি, আমরা আছি, হাঃ হাঃ হাঃ।

জোছনালোকিত বালুচর ধরে একদল সাদা লেবাসধারী মূর্তি, যারা হয়তো চাঁদের আলোর সঙ্গে নিজেদের একাকার দেখাতেই সাদা বেশ ধরেছিল, তাদের হিংস্র বুকে আতঙ্কের অন্ধকার টেনে এনে অস্ত্রের মুখে দ্রুত দূর শহরের উদ্দেশে এগিয়ে যেতে থাকে আরেক দল কালোবেশধারী মূর্তি। প্রথম প্রতিবাদী মূর্তিটি বেশভূষা পাল্টে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের থেকে। তার গন্তব্য কেতাবপুর হাটের বটের কোটর। সে সেই ছদ্মবেশী আগন্তুক। দু'দিন পর ভর দুপুর। গাছের কোটর থেকে ঠিক তেমনিভাবে শতরঞ্জির বাটিতে হাত প্রসারিত করে আছে আগন্তুক। গাছের পেছনের পরিত্যক্ত দিক থেকে কথোপকথন ভেসে আসে কাদের। কোনো শিশুর সঙ্গে ভাবজমাবার চেষ্টা করছে বয়সি কেউ। কিছুক্ষণ আগে এখানেই খেলছিল পাঁচ ছ'বছর বয়সি এক মেয়ে শিশু। হয়তো তারই কণ্ঠ এটি। কিন্তু বয়স্ক কণ্ঠটি কার? কী বলছে সে শিশুটিকে? আগন্তুক খুব মনোযোগে কান পাতে:

সত্যি বলছো? শিশুকণ্ঠ।

হ্যাঁগো সোনা মানিক, একদম সত্যি।

দেবেতো?

কী যে বলো! তুমি হইলা গিয়া খোদার ফেরেশতা। তোমার লগে কি মসকারা করা যায়? তুমি আইসাই দেখ। দুই হাত ভইরা লজেন্স পাবা। আইসক্রিম, খেলনা আরও কত কী! সবতোমারে দিমু। তুমি হইলা বেহেশতি পরী। ওই যে কোনার লাল নিশানআলা দোকানটা, ওইটাই আমার, বুঝলা? তাইলে তাড়াতাড়ি আইসো। তোমার ভাই ফিরা আসার আগেই আইসো। সে আসলে কিন্তু তোমারে যাইতে দেবনা। আমি অহন যাই। তুমি একটু পরে তালি আস।

আইচ্ছা। কিন্তু তুমি ওই দিকে কই যাও?

আহ্হা, তোমারে শুরুতেই কইলাম না, ওই যে ওই ধারের টিপকলে পানির জন্য যাই। এই যে কলসি হাতে। তুমি একটু পরে আস, কেমন?

আইচ্ছা।

লম্পট কান্দু কসাই। করিস মাংসের দোকান। তুই এ বাচ্চাকে দিবিলজেন্স, আইক্রিম, খেলনা! কোটর থেকে বিড়াল আগন্তুক।

পানির কলসি কাঁধে ফিরে এসে দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ায় কান্দু কসাই। এ কি! তার দোকান ঝাঁপে ডাবল তালা কেন? পানি আনতে যাওয়ার আগে সে নিজে একটি তালা মেরেছে। এরই মধ্যে অপর তালাটি তবেকে লাগাল? ভেতরে আছে একটি মাত্র খাসি। নাকি তার ছেলে দূরের হাঁট থেকে গরু নিয়ে ফিরেছে? গরু রেখে আরও একটি তালা মেরে গেল? কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়! যদি তা হয়েই থাকে তবেকোথায় ছেলেটি? কখন এখানে ফিরবে? একটা ঝামেলাই বুঝি হয়ে গেল। ছটফটাতে থাকে কান্দু কসাই। কিন্তু বেশিক্ষণ ছটফটাতে হলো না তাকে। স্বপ্নের মতো একটি শিশু হাটের মাঠ পেরিয়ে বাঁক ঘুরে এসে দাঁড়ায় তার গা ঘেঁষে। আহ্লাদে মাথা ঝোঁকে সে : আহারে, আসছ মানিক। খুবভালো করছ। এখনই সবপাবা। কিন্তু সমস্যা হইল আমাকে না পাইয়া আমার ছেলে মনে হয় বারতি তালা মাইরা গেছে দোকানে। এই যে দেখো দুইটা তালা। তাতে সমস্যা নাই। ওই পেছন দিকটায় খোলা আছে। চলো ওই দিকে, কেমন? তারপর সবদেই।

হুম।

দোকানের পেছনে এসে একহাতে শিশুটির মুখ চেপে ধরে কান্দু কসাই। অন্যহাতে তাকে শূন্য করে দ্রুত পা ফেলে নিয়ে যায় পাশের ঝোঁপে। মুখ থেকে হাত সরে যেতেই চেঁচিয়ে ওঠে শিশুটি, তুমি এমন করো ক্যান? লজেন্স কই? খেলনা?

দাঁড়াও দিতাছি। খবরদার চিক্কুর দিবা না। তোমার মুখে আগে গামছার গিঁট মাইরা লই। তারপর দিতাছি তোমারে লজেন্স। আরও কত কি দিমু। অহনি দেখতে পারবা। এই চিক্কুর দিবা না। দিলেও লাভ নাই। এইটা ঘন জঙ্গল। খুবমজা হবেঅহন! তুমি আর আমি ছাড়া কেউ এই হানে নাই। কেউ নাই, হিঃ হিঃ হিঃ।

কথার ফাঁকে শিশুটির মুখে গামছা তুলতেই পেছনে ঝাঁঝালো কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, কেউ নাই তবেআমি আছি, আমরা আছি। তৎক্ষণাৎ ঘাড়ে প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে হাত কয়েক পেছনে ছিটকে পড়ে কান্দু কসাই। গাছের কাণ্ডে বাড়ি খেয়ে মাথার পেছন দিক জখম হয়ে যায়। তীব্র ব্যথায় যারপরনাই কঁকিয়ে ওঠে, মাগো, বাবারে, তুমি কে?

তোর যম।


অর্থনৈতিক উন্নয়নে
দেশের কল্যাণে
ঢাকা গ্রুপ
DHAKA GROUP
টমো ফিড লিমিটেড
আল-আমিন এগ্রোভেট লিমিটেড
Dhaka Transport
ঢাকা ট্রান্সপোর্ট
সাআদ বিল্ডার্স লিমিটেড
আল-আমিন ফিডস্ লিমিটেড
ঢাকা ফিসারিজ
DBHL
আল-আমিন পোল্ট্রি ফিড
সাগিদা ফিশারিজ
diez LIMITED
Dhaka Industrial Economic Zone Ltd.
NAT
এন.আর ট্রেডিং
কুমিল্লা মডেল কলেজ
প্রধান কার্যালয়:
রূপায়ন তাজ (৪র্থ তলা) ১,১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮-০২-৯৩৫৪৯৯৫, ই-মেইল : info@dhakagroup.com
www.dhakagroup.com

NRB Bank
Not Just Another Bank

Aarong আড়ং

ঈদ হোক আনন্দময়



এনআরবি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড
ব্যবহার করে উপভোগ করুন

২৬%
ক্যাশব্যাক

* ২৬% বা ৫০০ টাকা (যেটি তুলনামূলকভাবে কম) ক্যাশব্যাক প্রতিটি একক লেনদেন
* ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে সর্বোচ্চ ক্যাশব্যাক ১,৫০০টাকা
* ক্যাম্পেইনের মেয়াদকাল: ঈদের দিন ২০২২ পর্যন্ত

* শর্ত প্রযোজ্য

24 hours call center 16568
www.nrbbankbd.com
www.facebook.com/nrbbankbd


হাতের মুঠোয় রাকাব
DIGITAL BANGLADESH
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাকাবের অবস্থান
RAKUB eBanking app ডাউনলোড করুন
ঘরে বসে লেনদেন করুন
RAKUB eBanking
হিসাব খোলা, বিবরণী
bKash
নগদ
ট্রান্সফার
NESCO
বিল পে
টেলিটক
airtel
রবি
মোবাইল রিচার্জ
ডিজিটাল সেবাসমূহ:
কোর ব্যাংকিং (CBS)
ইন্টারনেট ব্যাংকিং
ইএফটি (EFT)
আরটিজিএস (RTGS)
এ চালান সিস্টেম (ACS)
এন.আই.ডি ভেরিফিকেশন
আয়কর, ভ্যাট ও ট্যাক্স
পাসপোর্ট ফি
মোবাইল App ও
ইন্টারনেট ব্যাংকিং
ঘরে বসে লেনদেন করুন
নিশ্চিন্তে আমানত রাখুন
ঋণ সেবা গ্রহণ করুন
ডিজিটাল সেবা উপভোগ করুন
Google play
App Store
বিস্তারিত জানতে
01708-806045
ebanking@rakub.org.bd
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
(সরকারি ব্যাংক)
www.rakub.org.bd
RTGS
EFT
bank Ultimus
bKash
নগদ
NESCO



‘আবাবিলে স্বাগতম হে কাবার মেহমান’

সকলকে জানাই
পবিত্র ঈদ উল ফিতরের
শুভেচ্ছা

ঈদ মোবারক

হজ্ব ও উমরাহ পালনের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

আবাবিল হজ্ব গ্রুপ

যোগাযোগ : ৫৫/এ, সিদ্দিক ম্যানশন, ৭তম তলা, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮-০২৯৫১৩১১৪, ০১৮১৯১০৯৭৪০, ০১৭০৫৩৪০৬২৬
e-mail: ababil358@yahoo.com

সম্পদের জন্য বীমা

ICI FOR ULTIMATE PROTECTION

ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
اسلامی کمرشیل انشورنس کمپنی لیمیٹڈ
Islami Commercial Insurance Company Limited

বীমা সেবায় আমরা

বীমা সংক্রান্ত যেকোনো সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেইলে ক্লিক করুন : iciclbd@gmail.com, Web : wwwiciclbd.com



নৌ-কার্গো ও নৌ-হাল বীমা



অগ্নি ও অন্যান্য বীমা



মোটর বীমা

"সারা বাংলাদেশে ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর নেটওয়ার্ক" আপনার সেবায় নিয়োজিত

ঢাকা বিভাগ
- স্থানীয় কার্যালয় ০১৮১৯-২২৯১৯৫
- বনানী শাখা ০১৭১৫-০৬৮২৩৩
- বিবি এভিনিউ শাখা ০১৭১২-৯২৬৮১১
- বাড্ডা শাখা ০১৮১৯-০৬৮৭২২
- সিটি সেন্টার শাখা ০১৬৭৬-৩৪২৬৭৭
- মতিঝিল শাখা ০১৭১৮-২৯৬০৫৪
- হাটখোলা শাখা ০১৯১১-৩৬০৩৪৪
- প্রিন্সিপাল শাখা ০১৭১৯-৭৮২৩৭৪
- দিলকুশা শাখা ০১৭১১-৮৩০১৪৪
- পল্টন শাখা ০১৮৪২-৪৫২৫৪২
- ভিআইপি রোড শাখা ০১৯২১-৫৬৭৬৭৯
- মৌলভী বাজার শাখা ০১৭১১-১৯৮২৫৫
- নবাবপুর শাখা ০১৭১৭-৩৩৯০০৮
- বংশাল শাখা ০১৭১৬-৪১৭১৩৩
- মিরপুর শাখা ০১৮১৯-৪০০৬৪২
- কাওরান বাজার শাখা ০১৭১১-৮০৭০০২
- মালিবাগ শাখা ০১৭২০-২৪৬৬৬৬
- ফরিদপুর শাখা ০১৭১১-৮৩০১৪৩
- নরসিংদী শাখা ৯৪৫২৬০৮
- নারায়ণগঞ্জ শাখা এস.এ মালেহ রোড

চট্টগ্রাম বিভাগ
- খাতুনগঞ্জ শাখা ০১৮১৭-০৯৫৩৬০
- আগ্রাবাদ শাখা ০১৭১১-২৪৫২৪১
- দেওয়ানহাট শাখা ০১৮১৯-৩৮১৪২১
- লালদিঘী শাখা ০১৬৩৩-৭৩৭৫৪২
- কদমতলী শাখা ০১৮১৭-৭১১৮৩৪
- কুমিল্লা শাখা ০১৭১১-৮৬৭১১৪

খুলনা বিভাগ
- খুলনা শাখা ০১৭১১-৮২০৯২৩
- কুষ্টিয়া শাখা ০১৭১৩-৩৬৬২০১
- যশোর শাখা ০১৮২৮-১৭১০১৮
- আহসান আহমেদ রোড শাখা ০১৭৩৯-৩২৩০৪৪ (খুলনা)

বরিশাল বিভাগ
- বরিশাল শাখা ০১৭০৯-১৯৫৫৫৩

রাজশাহী বিভাগ
- রাজশাহী শাখা ০১৭১১-৩৪৮০৬১
- পাবনা শাখা ০১৭১২-২৬৯৭১৫
- বগুড়া শাখা ০১৭১২-২৬৬০৯৮

ময়মনসিংহ বিভাগ
- ময়মনসিংহ শাখা ০১৭১২-৬৪৬০৬৭

রংপুর বিভাগ
- রংপুর শাখা ০১৭১৬-৫৪২৬৩০
- দিনাজপুর শাখা ০১৭১৮-০৬৬৭৯১

শৃঙ্খলার সাথে | ICI আর্থিক নিরাপত্তায় আপনার পাশে | অগ্রগতির পথে

প্রধান কার্যালয় ঃ সিটি সেন্টার (লেভেল-১৬), ৯০/১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন : ০২২২৩৩৮৩৪৩১, ০২২২৩৩৮৩৪৫১, ৪৭১১৩৭৯৩-৪ (পিএবিএক্স), ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৪৭১১৩৭৯১, ই-মেইল : iciclbd@gmail.com, Web : www.iciclbd.com


عيد مبارك
Eid Mubarak
পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবে এবারের
ঈদ হয়ে উঠুক আরও বেশি আনন্দময়।
সবাইকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা।
ঈদ মুবারক
GIB
Banking with faith
গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক
غلوبل إسلامي بنك Global Islami Bank
16671
www.globalislamibankbd.com

কেনাকাটায় সর্বোচ্চ ২২% ক্যাশ ব্যাক

এবার ঈদে যমুনা ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে যত ব্যবহার তত লাভ। নির্দিষ্ট দোকান থেকে যে কোন পরিমান কেনাকাটা করলেই আপনি পাবেন সর্বোচ্চ ২২% পর্যন্ত ক্যাশ ব্যাক।



15%	Apex 15%	10%	BOWLING 22%	10%	COUNTRY BOY Lifestyle 10%	10%
Dorjbari 10%	GENTLE PARK 10%	INFINITY 10%	10%	10%	sailor 10%	VASAVI 10%

প্রতি কেনাকাটায় সর্বোচ্চ ১,৫০০ টাকা ক্যাশ ব্যাক

* সকল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী এবং পিওএস ও অনলাইন কেনাকাটার জন্য প্রযোজ্য

হটলাইন ০১৭১৩ ০৬৭৭৭৯

* শর্ত প্রযোজ্য



jamunabankbd.com

JAMUNABANK

আমারে মারছো ক্যান?
তুই ইবলিশ, তাই।
আমি ইবলিশ না।
একজন শিশুধর্ষক ইবলিশেরও অধম, নরকের বিষাক্ত কীট! এবার যা, জায়গামতো গিয়ে তোর মতো সবইবলিশদের সঙ্গ দে। এই দেখ ভিডিও ক্যামেরা। বটগাছের পেছন থেকে শুরু করে এ জঙ্গল পর্যন্ত তোর সবঅপকর্মের সাক্ষী এ ক্যামেরা। শিশুটিকে আমি তার বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। মনে রাখবি, সমাজে তোর মতো ইতর লম্পটরা যতদিন আছিস, আমি বা আমরাও ততদিন আছি। A case of attempt to child rape and then murder.
তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দাও।
ক্ষমা, হাঃ হাঃ হাঃ। তোকে ক্ষমা করলে পরকালে আমরাই ফেঁসে যাব, আমাদেরই শূল, ফাঁসি হবেলাখো কোটি বার, হাঃ হাঃ হাঃ। একদল কালো পোশাক পরা অস্ত্রধারী লোক কান্দু কসাইকে হাতকড়া পরিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বিপরীত পথ নেয়। আগন্তুক শিশুটিকে নিয়ে হাটখোলায় ফেরে।
গত ক'দিনে জোছনা বেশ খানিকটা আলো খুঁইয়েছে। ওঠেও দেরি করে। হাটখোলায় বটগাছটির উত্তর দিকের নির্জন পথটি রাত হলে আরও বেশি নির্জন হয়ে ওঠে। শস্য মাঠের মধ্যদিয়ে গাঁয়ে যাওয়া আসার সরু পথ। চলার জন্য যেমন সুবিধার নয়; নিরাপত্তার প্রশ্নেও সহজে এ পথে কেউ পা তোলে না। কিন্তু সে রাতে বৃদ্ধ রমজান দম্পত্তি এ পথেই পা বাড়াতে বাধ্য হলো। মেয়ের বাড়ি থেকে আবেলায় রওনা হওয়াতে হাটখোলার মাঠে পৌঁছতেই সন্ধ্যা নামে। অর্থকড়ি তাদের কাছে তেমন নেই, ওদিকে বয়সেও দু'জনই বৃদ্ধ। সে মতে ভয় একমাত্র অন্ধকারে পথ দেখতে না পাওয়ার কষ্ট। তা থেকে পরিত্রাণ পেতেই চাঁদ ওঠার অপেক্ষা। হাটখোলার মাঠে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষার পর পা তোলে তারা। সরু পথটা এখানে এসে প্রশস্ত হলেও আলো স্বল্পতা আছে। দু'পাশে গাছের বাগান। বাগানের মাঝামাঝি এসে পথ খানিকটা উঁচু হয়ে আবার ঢালু হয়ে বেশ একটা নিচে নেমে গেছে। আবারও ফসলের মাঠ। মাঠ শুরুর হাত পঞ্চাশেক আগে বাঁয়ে একটা জগডুমুর গাছ। তাকে ঘিরে আছে খোকসার ঝোপ। ডুমুর গাছের নিচটা একেবারেই অন্ধকার। কারণ, চাঁদের আলো এখানে পৌঁছতে হলে চাঁদকে যেতে হবেখাড়া মাথার উপরে। ততটা যেতে আরও ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে চাঁদের। অন্ধকারে ভালো দেখতে না পেয়েই এখানে থমকে দাঁড়াল বুড়োবুড়ি। আর দাঁড়াতেই আচমকা উপর থেকে রশি লটকে যায় উভয়েরই গলায়। টু শব্দটি করার সুযোগ হয় না কারও। নিমিষেই বৃদ্ধের শরীরটি শক্ত রশির গিঁটে আঁটসাঁট হয়ে যায় ডুমুরের কাণ্ডের সঙ্গে। তার মুখেও পড়েছে কাপড়ের শক্ত গিঁট। আর বৃদ্ধাকে এরই মধ্যে হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড়ের গিঁট দিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে গাছটির বিপরীত দিকে।
সংখ্যায় জনা সাতেক তারা। একজন মাথা ঝুঁকে বলল, বুড়ি, জওয়ান বয়সে ভালো মাল ছিলিরে। আফসোস, তখন ছোট ছিলাম। তরে খালি চাইয়া চাইয়া দেখতাম। যহন একটু বয়স হইল, তরে কইলাম আর তুই লাথি দেখাই ছিলি, পায়ে থিকা জুতা খুলছিলি। আর আমার মায়ের লগে আমারেই করতে কইছিলি। তারপর তুই গাইট্টা ফুটাইয়া বিয়া বইলি। বিয়ার পর একদিন তোর জামাইও আমারে অপমান করল। আইজ অহন তুই-ই আমার মা। তর লগেই অহন। আমি একা না, সবাই মিল্যা..... হাঃ হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ হিঃ। বুড়ি আন্ধারে কুত কুতাইয়া চাইয়া কী দেহোছ! ভাবতাছোস মুখে কাপড় না থাকলে চিক্কুর দিতি? কোনো লাভ হইত না। এইখানে কেউ নাই। এই বয়সে তর সবকাইড়া লইয়া তরে মাইরা ফালামু। বুইড়ারেও মাইরা ফালামু। কেউ তগোর বাঁচাইতে আইবনা। কেউ নাই। এইহানে, কেউ নাই। তরে ফাঁসিতে ঝুলাবার আগে তর সবলইয়া লই।
কথা শেষ করে পিশাচটি ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃদ্ধার ওপর। বৃদ্ধা শরীরে মোচড় দিয়ে উঠলে পিশাচ বলে, লাভ নাই মোচড়ামোচড়িতে। তগোর বাঁচাইবার কেউ নাই, আইজ কেউ নাই।
ঠিক তখনই পেছন থেকে পিশাচের চুলের মুঠি টেনে ধরে বজ্রকঠিন এক হাত। চাপা কণ্ঠে বলে, এই যে আছি। আমি আছি। এক ঝটকায় বৃদ্ধার ওপর থেকে পিশাচটিকে টেনে তোলে আগন্তুক। কোমরে প্রচণ্ড লাথি কষে বলে, ওই দেখ সামনে তোর সঙ্গীদের ধরে আছে কারা। তুইও তাদের সঙ্গে হাতকড়া নে। ভাবিসনে। তোদের ফাঁসিতে লটকাবার কোনো প্রচেষ্টাই বাকি থাকবেনা। এই যে দেখতে পাচ্ছিস? এই ক্যামেরায় তোদের সবঅপকর্মের আলামত ধারণ করা আছে। ছ'মাস আগে এ গাছের ডালেই ফাঁসিতে ঝুলে মরা কিশোরী তাছলিমার বিষয়েও একটা কূল-কিনারা এবার হয়ে যাবে। A case of rape, then murder and another case of proceeding to rape and murder next.

পাকড়াও করা দলটিকে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকে অস্ত্রধারী কালো পোশাকি একটি দল। আগন্তুক বৃদ্ধার হাতে পায়ের ও মুখের গিঁট খুলে তার সদ্য উদ্ধার পাওয়া স্বামীর হাতে তাকে তুলে দিয়ে ভিডিও ক্যামেরায় তাদের জবানবন্দি ধারণ করে। তারপর তাদের যাওয়ার পথে তুলে দিয়ে খোকসা ঝোপের ওপাশে রাখা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। দম্পতির চলতে থাকা পথের দিকে দৃষ্টি ধরে স্থির দাঁড়ায় সে। চাঁদ এরই মধ্যে খাড়া মাথার উপরে চলে এসেছে। হেঁটে মাঠ পেরিয়ে ওপাশের গাঁয়ের পথে পা রাখে দু'জন।
সেদিন মাঝরাতে প্রবল ঝড় বয়ে গেছে। ঝড়ের বেগ কমে যেতেই শুরু হয় ভারী বর্ষণ। সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রপাত। বটগাছটি খুবপুরানো, অতি ঘন পত্রপল্লবাচ্ছাদিত হলেও, মাটি থেকে খানিক উপরে বড় বড় সবশিকড় নেমে এলেও, বৃষ্টির সূক্ষ্ম ঝাপটা এসে লাগতে থাকে আগন্তুকের অবস্থান নেওয়া কোটর মুখেও। আগন্তুক শীতে গুটিসুটি মেরে থাকে। সে দেখতে পায় একটা বজ্রপাত যেন গাছটার খুব কাছেই ঘটে গেল। বৃষ্টির টানা শব্দ একটা সময় ঘুম নামিয়ে দেয় তার চোখে। ভোরবেলা সে ঘুম থেকে জেগেই দেখে গাছের ছাউনি দেয়া জায়গাবৃত্তের খুব কাছেই মাঠের একটা জায়গার আধাপোড়া ঘাস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মাটিও যেন পুড়ে গেছে। কাছেই রাতে ঘটা বজ্রপাত তাহলে এখানেই হয়েছিল! আগন্তুক দেখতে পায় তার ঘোড়াটা মাটিতে নির্জীবচিৎ হয়ে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ, সামান্যতম নড়াচড়া নেই। ভরকে যায় আগন্তুক। দ্রুত ঘোড়ার কাছে গিয়ে তার চোখে মাথায় হাত বুলায়। ঘোড়া চোখ খোলে; তবেখুবধীরে, গায়ে বল শক্তি নেই যেন।
সূর্য খানিকটা উপরে উঠে এসেছে। আগন্তুক ঘোড়া নিয়ে মাঠ পাড়ি দিচ্ছে। ঘোড়া খুবধীরে পা তুলছে। কোনো কারণে খুবঅসুস্থ সে। হাঁটতে না পারার মতোই অবস্থা। আগন্তুক তার লাগাম টানার ফাঁকে লক্ষ্য করল হাটমাঠে জনমানবব্বলতে কেউ নেই। দোকান ঘরগুলোর প্রতিটিই ভেতর থেকে বন্ধ। সে ভাবে, তার ঘোড়াটার একটা চিকিৎসা দেওয়া গেলে সে সুস্থ হয়ে উঠত। কিন্তু কে দেবে চিকিৎসা? ওপাশে একটা পশু চিকিৎসালয় আছে। কিন্তু চিকিৎসক থাকে না। এলাকার লোকজন কোনো অসুস্থ পশু নিয়ে তার কাছে আসে না। সে জেনেছে, অসুস্থ পশু মরে গেলে তারা পানিতে ভাসায়, মাটিতে পোঁতে। অসুস্থ অবস্থায় কখনো চিকিৎসার কথা তারা ভাবেনা। কাজ নেই বলেই চিকিৎসক এখানে থাকে না। শহরে থাকে সে। আগন্তুকও ঘোড়া নিয়ে শহরে যাবে। খুবকষ্ট হবেঘোড়াটার। সে ভাবে, এখানেই যদি তাকে চিকিৎসা দেওয়ার মতো কেউ থাকত। কিন্তু তেমন কেউ কি আছে? কেউ নেই। তবু ফিরে তাকায় সে। দেখে তার পেছন থেকে হাটমাঠ অবধি ধু-ধু ফাঁকা। সে মুখ ফিরিয়ে হাঁটা ধরে। তখনই যেন পেছনে একটি শিশুকণ্ঠ শোনে, আগন্তুক, যেও না তুমি, ঘুরে দাঁড়াও। আমি আছি। তারপর একে একে আরও কটি কণ্ঠ ধ্বনিত হয়- নারী কণ্ঠ, বৃদ্ধের কণ্ঠ। তাদেরও একইরূপ আকুতি।
আগন্তুক আশা নিয়ে ফিরে তাকায়। দেখে পেছন দিকটা তেমনই নির্জন। সে মুখ ফিরিয়ে মনে মনে বলে, আমি আছি, শুধু আমি। হাটবাসীরা জাগেনি এখনো। তাই আমি আছি, আমরা আছি।

প্রেমসমুদ্র

প্রত্যয় জসীম

ঢেউয়ের মতো অবহেলায় নতমুখে ফিরে আসি
প্রতারক ঠোঁট বলে, খুবখুবভালোবাসি
ঠোঁটে যাই উচ্চারিত- সবইতো ভাষা
মানবভাষায় সবচেয়ে মূল্যবান শব্দ ভালোবাসা

ভালোবাসা আজ মুদির দোকানের পাল্লায়
ভালোবাসা ভালোবাসা বলে তবু প্রতারক চিল্লায়

সাগরকন্যা ভালো থেকো যতদূরে থাকো
জলকুমারী জলের তলে এই কবিকে রেখো
ঢেউ আসুক জোয়ারে ভাসুক পাঁজরের হাড়
কবিতো প্রেমসমুদ্র, কবির বুকটাই প্রেমের পাহাড়।

ঈদ মোবারক





ঈদ সবার জীবনে বয়ে আনুক
অনাবিল সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি

সকলকে জানাই
পবিত্র ঈদ উল ফিতরের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মো. জহিরুল ইসলাম তালুকদার
মহাসচিব
বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবুল হোসেন তালুকদার ফাউন্ডেশন
আহিম, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।









বিলাসবহুল ক্রুজশীপে

সমুদ্রের নীল জলরাশি আর আকাশের মিতালি, গোধূলি বেলা, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে পৃথিবীর অনিন্দ্য সুন্দর প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন ভ্রমণ করতে চট্টগ্রাম-সেন্টমার্টিনের মধ্যে চলাচল করছে জাপানি মিটসুবিশি কোম্পানির রাজকীয় ক্রুজশীপ 'বে ওয়ান'। যাওয়ার পথে রাতের জোছনা আর সমুদ্রের নীল জলরাশির মিতালি অসাধারণ। রাতটি জোছনাহীন হলে জাহাজের বিশালাকৃতির অডিটরিয়ামে বিভিন্ন শিল্পীর সাথে নাচে-গানে কেটে যায় শিষ্যি। এ ছাড়া জাহাজের চারপাশের বিশাল বারান্দা ও রুমটপে আড্ডায়-গল্পে কেটে যেতে পারে চমৎকার কিছু মুহূর্ত। একই সঙ্গে বাফেট রেস্তোরাঁয় বিভিন্ন ঘানের পেট পুজোরও সময়টা ভালো কেটে যায়। যেখানে আছে কন্টিনেন্টাল ও চায়নিজসহ ট্র্যাডিশনাল বিভিন্ন লাঞ্চ, ডিনার ও ব্রেকফাস্ট। পাশাপাশি আছে কমন রেস্তোরাঁ, একাধিক কফি হাউস এবং আইসক্রিমবারও।

বিলাসবহুল ক্রুজশীপে
চট্টগ্রাম-সেন্টমার্টিন ও বঙ্গোপসাগর ভ্রমণ
হটলাইন: ০৯৬১০ ৮৪৯ ৯৭০/০১৮৭০ ৭৩২ ৫৯৬
www.facebook.com/MVBAYONECruise

Karnafuly Ship Builders Ltd.
Phone : +88-02-55040813
Fax : +88-02-9854964
Mobile : 01709194704
E-mail : ksbidhaka@gmail.com


MARCEL
Fridge
CONTROL AT
YOUR FINGERTIPS
MARCEL
www.marcelbd.com
Real
Tempered
১২


T.K. GROUP
পুষ্টি
ড্রিংকিং ওয়াটার
লাইফ চলুক ভরপুর উচ্ছ্বাসে
সুস্থতার জন্য পানির বিশুদ্ধতা অপরিহার্য
এজন্যই পুষ্টি পানি নিয়ে এসেছে ৭ স্তরে
পরিশোধিত বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি।
7 LAYER PURIFICATION
● ১০০% জীবাণু ও ভারি ধাতবমুক্ত
● বিশ্বমানের প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত ● প্রাকৃতিক খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মদিন "শেখ রাসেল দিবস -২০২১" উদ্‌যাপন





পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর উদ্যোগে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মদিন শেখ রাসেল দিবস -২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া কোম্পানীর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলী। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও কোম্পানীর সিনিয়র কনসালট্যান্ট আবদুল আউয়াল হাওলাদার, সাবেক যুগ্ম সচিব ও কোম্পানীর সিনিয়র কনসালট্যান্ট মোঃ আনিস উদ্দিন মিঞা, সাবেক প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রক (ইনচার্জ) ও কোম্পানীর সিনিয়র কনসালট্যান্ট রায় দেবদাস, ডিএমডি আলমগীর ফিরোজ রানা সহ কোম্পানীর অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

জীবন বীমায় বিশ্বস্ত নাম

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ACBSP
GLOBAL BUSINESS ACCREDITATION
ACBSP ACCREDITED

IEB ACCREDITED

UNITED INTERNATIONAL UNIVERSITY

www.uiu.ac.bd

Admission
Summer 2022

Apply Online admission.uiu.ac.bd

Admission Test: May 20, 2022 (Friday)



BBA || BBA in AIS || BS in Economics || BSc in CSE || BSc in EEE
BSc in Civil Engineering || BSS in Environment and Development Studies
MBA || EMBA || MSc in CSE || MS in Economics || MDS || MIHRM

Transportation available from major locations of Dhaka city

Hostel accommodation Available

Credit Transfer & Exchange Program facility

Strong faculty line up with 55 full time Ph.D. faculty members

Result based 25% to 100% scholarship in every semester

For details of tuition waiver and scholarship policy please visit:
https://www.uiu.ac.bd/admission/tuition-fees-payment-policies/tuition-fees-waiver/

Ranked by QS Asia in 2019, 2020, 2021 and 2022

Impact Ranked by Times Higher Education in 2020 and 2021

09604-848 848
(Ext-1301-4)

Admissions Office

01759039451
01759039465
01759039498
01914001470

United City, Madani Avenue, Dhaka - 1212